অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম

অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম

অনন্ত সিংহ

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ।। কলিকাতা ৯
অফিস : ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন ।। কলিকাতা ৯

উৎসর্গ

শহীদদের আত্মত্যাগ-মহিমা-ধন্য "অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম" বইটি ভাবীকালের সবুজ অন্তরে যদি সামান্যতমও বৈপ্লবিক প্রেরণা জাগাতে সক্ষম হয়, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব, এবং সেই আশায় গ্রন্থখানি তরুণ-তরুণীদের সবল হস্তে অর্পণ করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি।

অনন্ত সিংহ

ভূমিকা

বন্ধুবর শ্রীঅনন্তলাল সিংহ "অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম" গ্রন্থে ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের পটভূমিকা, প্রস্তুতি ও ঘটনাসমূহ বিবৃত করবার চেষ্টা করেছেন। অনন্তলাল যা' লিখেছেন তা' শুধু চট্টগ্রাম বিদ্রোহের ইতিহাস নয়, তার চাইতেও আর কিছু বেশী—ইতিহাসের সঙ্গে এখানে আত্মবিবরণমূলক কাহিনীও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। যা' ঘটে গেছে মোটামুটিভাবে তার নিরপেক্ষ বিবৃতিই সাধারণভাবে ইতিহাস। সেই বিবরণের মধ্যে আবেগ, উচ্ছ্বাস, ক্রোধ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রভৃতি কিছুই থাকে না—তার মধ্যে থাকে না পক্ষপাতিত্ব। কিন্তু আত্মবিবরণমূলক কাহিনী ঠিক তা' নয়। যিনি কাহিনীকার, তিনি নিজেই বিবরণের সময় মনে মনে ঘটনায় অংশগ্রহণ করেন। তাই তাঁর বিবৃতিতে থাকে উচ্ছ্বাস, বিদ্বেষ, ক্ষোভ, আনন্দ, আশা, নিরাশা, প্রভৃতি আবেগের প্রকাশ। সেই-জন্যই কাহিনী হয়ে ওঠে সরস, প্রাণবন্ত—ইতিহাসের মত নীরস ও শুষ্ক নয়। অবশ্য এ কথাও সত্য, এই গ্রন্থে কোথাও ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়নি। অবশ্যই এ কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, অনন্তলালের এই বিবৃতির মধ্যে ঘটনাসমূহকে, অর্থাৎ ইতিহাসকে, কোথাও নিজের মনোমতভাবে উপস্থিত করবার জন্য বিন্দু-মাত্রও বিকৃত বা ক্ষুন্ন করবার চেষ্টা হয়নি।

অনন্তলাল শুষ্ক ইতিহাস লেখেননি, আদৌ সে চেষ্টাও তিনি করেননি—বাস্তব ঘটনাসমূহকে তিনি চিত্তাকর্ষক কাহিনীর আকারে বিবৃত করেছেন মাত্র। যে ঘটনাসমূহকে ভিত্তি করে এই কাহিনী তিনি লিখেছেন, তার প্রায় প্রত্যেকটির সাথেই তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন; অনেকগুলিই নিজের প্রেরণা ও উদ্যোগে ঘটিয়েছিলেন। তাই প্রায় প্রত্যেকটি ঘটনাকেই তিনি বিশদরূপে ও সঠিকভাবে বলতে পেরেছেন।

যে সময়কার ঘটনা অনন্তলাল বলেছেন, সে সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের দেশের প্রায় কারও নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব ছিল না। অনন্তলাল নিজে তো ছিলেনই না এবং তাঁর লেখার ভেতর দিয়েও তিনি ঐতিহাসিক হিসাবে নিরপেক্ষতার মিথ্যা ভান করবার কোনরূপ চেষ্টাও করেন নি। তাই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রচন্ড ঘৃণা এবং দেশপ্রেমিকদের সম্পর্কে অপরিসীম দরদ তাঁর প্রতিটি লেখার ভেতর দিয়ে খুব সুস্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে। ঘটনাগুলি ছিল আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের অঙ্গ, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশের জনগণের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি অংশ। অনন্তলাল ছিলেন এই মুক্তি-যুদ্ধের একজন প্রত্যক্ষ সংগ্রামী সৈনিক ও সেনাপতি। ঘটনাগুলির পরিণতির সাথে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মঙ্গলামঙ্গল ও ভবিষ্যৎ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। ঘটনাগুলি ঘটবার সময় মনের ভিতর যে উৎকণ্ঠা আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছিল, তাঁর লেখার ভেতর দিয়ে অনন্তলাল সুনিপুণভাবেই তা' ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। তাই এই কাহিনী এত প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, এবং আমার বিশ্বাস তা' সহজেই পাঠকের মন স্পর্শ করতে পারবে।

চট্টগ্রামের সেই যুগের বিপ্লবী আন্দোলন এবং তার পরিণতিতে ১৯৩০ সালের বিদ্রোহ কোন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আমাদের দেশের যে বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে অনন্তলাল লিখেছেন, সেই আন্দোলন প্রথমে গড়ে ওঠে গত

শতাব্দীর শেষ দশকে; এবং আত্মপ্রকাশ করে প্রথমে পশ্চিম ভারতে—মহারাষ্ট্র অঞ্চলে। তারপর তা' ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে দেশের অন্যান্য স্থানে। তদানীন্তনকালে বাংলার যুব-সমাজ মোটামুটিভাবে ঐ আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়ে আন্দোলনের প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে এবং একটি অংশ সক্রিয়ভাবে ঐ আন্দোলনকেই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের কার্যকর পন্থা হিসাবে গ্রহণ করে।

এখানেই বলে রাখা ভাল এই বিপ্লবী আন্দোলন ছিল, সাধারণভাবে বলতে গেলে, দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লেখাপড়া জানা তরুণ-তরুণীদের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের মুক্তি অর্জনের প্রচেষ্টা। বাংলা দেশে এই বিপ্লবী আন্দোলন প্রধানতঃ নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লেখাপড়া জানা ছেলে মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ কথা হয়ত নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, বাংলাদেশে কেবলমাত্র ইংরেজের প্রতি অনুরক্ত স্বল্প কয়েকটি পরিবার ভিন্ন, সর্বস্তরের প্রায় সকল মানুষই দেশের যুবকদের এই বিপ্লব প্রচেষ্টা ও বিপ্লবী কর্মধারার প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থনের মনোভাব পোষণ করতেন।

জাতীয় মুক্তি অর্জনের জন্য তরুণদের এই প্রচেষ্টার ভিতর পন্থার প্রশ্ন বড় ছিল না, বড় ছিল লক্ষ্য অর্জনের বিষয়। স্বভাবতই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ যেখানে মূলতঃ হিংসা ও পশুবলের ভিত্তিতে আপন শাসন ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল, সেখানে সেই সাম্রাজ্যবাদী শৃংখল চূর্ণ করবার ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থা উৎখাত করবার প্রশ্নের সমাধান হিসাবে হিংসার পন্থাকে বিশেষভাবে পরিহার করবার বিষয় যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতিভাত হয়নি।

সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থা বিধ্বস্ত করে জাতির পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের ফলে দেশের ভিতর যে পরিবর্তন আসবে, তাই তো হবে দেশের রাজনৈতিক বিপ্লব। সেই জন্যই সেই যুগে যাঁরা যথার্থভাবে জাতির পরিপূর্ণ স্বাধীনতা কামনা করতেন, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লবকামী এবং বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন। সেই কারণেই তাঁদের কাছে হিংসা অহিংসার প্রশ্ন লক্ষ্যের চাইতে কখনই বড় হয়ে দেখা দেয়নি।

এ কথা এখানে নিশ্চয়ই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আজকাল যাঁরা নিরন্তর এ কথা ঘোষণা ও দাবী করেন যে একমাত্র তাঁরাই তাঁদের প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা এনেছেন, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও পেষণের যুগে কিন্তু তাঁরাই প্রকাশ্যে নিরন্তর ঘোষণা করতেন যে, তাঁদের কাছে জাতির লক্ষ্য কখনই মুখ্য নয়, পন্থাই সর্বপ্রধান। এ কথাও তাঁরাই বলতেন যে, অহিংসার পথে যদি স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব না হয় তাহলে জাতির স্বাধীনতা স্থগিত থাক। হিংসার পথে জাতির স্বাধীনতা কখনই কাম্য নয়—কখনই কাম্য নয়।

পন্থাকে মুখ্য করে তুললে লক্ষ্যের প্রতি একনিষ্ঠা বর্জিত হয়। কেউ কেউ বলেন, অহিংসার পথেই জাতির স্বাধীনতা এসেছে—এ কথা কি সত্য নয়? এ প্রশ্নের সাথে সাথে মনের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে ওঠে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের দীর্ঘ বিসর্পিল পথ-প্রান্তের, ১৯৪৫, ১৯৪৬ সালের সেই অবিস্মরণীয় ঘটনাসমূহ, যেগুলি ইতিহাস বিকৃতকারীদের সমস্ত চক্রান্ত প্রচেষ্টা ও কুৎসা উপেক্ষা করে ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের চিরস্থায়ী সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। এ কথা আজ আর প্রমাণের কোন অপেক্ষা রাখে না যে অন্যান্য কারণের সাথে জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐসব দুর্নিবার সংগ্রামসমূহও ১৯৪৭ সালের আপোষ ত্বরান্বিত করেছে।

প্রসংগত মনে রাখা প্রয়োজন যে, গত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ১৯২৯ সালের শেষ অবধি, আমাদের দেশের রাজনৈতিকভাবে সচেতন মুখর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কিন্তু রাজনৈতিক দাবী হিসাবে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার কথা কখনও উচ্চারণ করেননি। এই দীর্ঘকাল তাঁদের দাবী ছিল সাম্রাজ্যবাদী আওতায় স্বায়ত্বশাসন।

কিন্তু সেই যুগে বিপ্লবী আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল এবং গড়ে উঠেছিল পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার দাবী নিয়ে; আপোষ নয়, স্বায়ত্ব-শাসন নয়—পরিপূর্ণ জাতীয় মুক্তি। জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতির সামর্থ্য অথবা যোগ্যতার বিষয় উত্থাপন করা শুধু অবাস্তব নয়, হাস্যকর। সে প্রশ্ন সাম্রাজ্যবাদের এবং সাম্রাজ্যবাদের দেশীয় অনুচরদের।

এই বিপ্লবী আন্দোলনের প্রকাশে সাম্রাজ্যবাদ কিছুটা আতঙ্ক বোধ করে। আতঙ্কিত সাম্রাজ্যবাদ প্রথম থেকেই অতি নিষ্ঠুরভাবে এই আন্দোলন দমন করবার পন্থা গ্রহণ ব্যতীত জনসাধারণের মনে এই আন্দোলন সম্পর্কে আশঙ্কা ও ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই বিপ্লবী আন্দোলনের প্রেরণাকে "সন্ত্রাসবাদ" ও এই কর্ম-প্রচেষ্টাকে "সন্ত্রাসবাদী" বলে হেয় করবার চেষ্টা করেছে। আমাদের দেশের মানুষের একটি অংশও ইংরেজ শাসকদের সাথে সুর মিলিয়ে এই বিপ্লবী আন্দোলনকে হেয় করবার চেষ্টা করেছে, কিছু কিছু লোক এখনও করে। দাসত্বের আবহাওয়ায় এই মনোবৃত্তিতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

একথা আদৌ সত্য নয় যে, সে যুগের বিপ্লবী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল বিদেশী শাসকদের ও তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্বিচারে হত্যা করা এবং ঐভাবে শাসকদের মনে ত্রাস ও বিভীষিকা সৃষ্টি করা। যারা এই কুৎসা প্রচার করেছে এবং এখনও করে তাদের খুব ভালভাবেই জানা ছিল এবং জানা আছে যে, ওই আন্দোলনের উদ্যোক্তা সমর্থক ও অংশগ্রহণকারী বহু কর্মী ও নেতাদের অসংখ্য বিবৃতি বক্তব্য ও লেখা থেকে এ কথা অতি সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে যে, ওই আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল চূর্ণ করে পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দেশব্যাপী সংগ্রাম সংগঠিত করা। জাতীয় মুক্তির জন্য রাজনৈতিক বিপ্লব সৃষ্টির এই সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যকে যারা কেবলমাত্র রাজকর্মচারীদের হত্যার সাথে, অর্থাৎ সন্ত্রাস সৃষ্টির সাথে এক এবং অভিন্ন বলে বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছে, তারা ইচ্ছাকৃত এবং সুপরিকল্পিতভাবেই ওই রাজনৈতিক লক্ষ্যকে বিকৃত করবার এবং ওই আন্দোলনকে সাধারণের কাছে অসত্য পন্থায় হেয় করবার চেষ্টা করেছে। এই অসাধু প্রচেষ্টা নিন্দার্হ।

এ ঘটনা আজ ইতিহাস পর্যায়ভুক্ত যে, প্রথম মহাযুদ্ধের কালে এই বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রেরণায় ও প্রচেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদী শাসন উৎখাতের উদ্দেশ্যে দুই দুইবার সমগ্র ভারতব্যাপী বিদ্রোহের বাস্তব আয়োজন সংগঠিত হয়েছিল। সেই প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তখন অসাফল্য প্রসূত হতাশার ফলে বিপ্লবী কর্মীরা অত্যাচারী শাসক ও তাদের অনুচরদের শাস্তি দেবার ব্যাপক কর্মপন্থা গ্রহণ করে।

আর তা' ছাড়াও মুক্তিপ্রয়াসী বিক্ষুব্ধ পরাধীন জাতি কখনও কখনও যদি অত্যাচারী বিদেশী শাসকদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে, তাহলে তার ভিতর অস্বাভাবিক কিছু আছে কি? কেবলমাত্র সেই জন্যই কোন একটি জাতীয় মুক্তি আন্দোলন "সন্ত্রাসবাদের" পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়তে পারে কি?

এখানে হিংসা অহিংসা সম্পর্কে বিস্তারিত বা বাস্তবতা নিরপেক্ষ শুধুমাত্র নীতিগত আলোচনার কোন অবকাশ নেই। সেই যুগের সেই পরিস্থিতিতে ওই বিপ্লবী আন্দোলন ভাল ছিল কি মন্দ ছিল সে সম্পর্কে কোন যুক্তি দেবার অথবা ওই বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গতি ও কার্যকারিতার সপক্ষে কোন যুক্তির অবতারণা করবার প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে প্রধান বিচার্য বিষয়, সেই যুগের সেই বিপ্লব প্রচেষ্টা জাতির অগ্রগতি ব্যাহত করেছিল, না, মুক্তিপথে জাতিকে উৎসাহিত এবং

উদ্বুদ্ধ করেছিল? কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদের দেশীয় অনুচর এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রসাদে যারা সৌভাগ্যের সুযোগ পেয়েছিল, তাদেরই ছিল স্বার্থের বিরোধিতা, তাদেরই বক্তব্য ছিল ঐ আন্দোলন প্রগতির পরিপন্থী। অথচ ঐ আন্দোলনের ফলেই ব্যাপকতম জনসাধারণ উৎসাহিত বোধ করেছে এবং নানাভাবে ঐ আন্দোলনকে সমর্থন করেছে। তবুও একথা অতি সঠিক ও সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে, আন্দোলনের এই ধরনের বিকাশই হচ্ছে ইতিহাসের অমোঘ গতি। পুঁজিবাদ বা ধনবাদী শিল্প গড়ে ওঠার সাথে সাথে যেমন দেশের ভিতর জাতীয় ভাবধারার উন্মেষ হয়, ঠিক তেমনি কালক্রমে এই জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ জনগণের একাংশ জাতির পরিপূর্ণ মুক্তির প্রশ্নকেই সর্বাগ্রে এবং সর্বোচ্চে স্থান দেয়। তাদের কাছে লক্ষ্যই হয় প্রধান এবং মুখ্য, অন্য সব কিছুই গৌণ ও অপ্রধান। যতদিন পর্যন্ত সমাজের অগ্রগতির ফলে নূতন এক সমাজ-বিপ্লবের বাস্তব পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, ততদিন পর্যন্ত এই ধরনের স্বদেশ বা জাতীয় প্রেমের ভাব-ধারাই প্রগতির বাহক হিসেবে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এর মধ্যে বাস্তবতা নিরপেক্ষ ভালমন্দ বিচারের কোন অবকাশ নেই।

বাংলা দেশে ১৯০৮, ১৯০৯ এবং ১৯১০ সালে যে বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টা হয়েছিল তার ভেতর বহু পরিমাণে ত্রুটি ও দুর্বলতা ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে তা' থাকাই স্বাভাবিক ও অপরিহার্য। তা' সত্ত্বেও ক্ষুদিরাম, কানাইলাল প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় শহীদেরা অতুলনীয় দেশপ্রেম ও মাতৃভূমির মুক্তি প্রচেষ্টায় আত্মত্যাগের যে অত্যুজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করেন তার ফলে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি দেশের জনসাধারণ শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে এবং যুব-সম্প্রদায় আকৃষ্ট হয়।

ওই পর্যায়ে বাংলাদেশে বা দেশের অন্য কোথাও বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মসূচী বিশেষ কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি; পদে পদে প্রায় প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পরিণতি লাভ করে।

এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে আমাদের দেশে প্রধান বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা হিসাবে দুইটি পরিকল্পনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে দেশীয় সৈন্যদের সহযোগিতায় সমগ্র ভারতবর্ষে একটি বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার ভেতরেও বহু ত্রুটি ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই পরিকল্পনা বাস্তবভাবে আরম্ভ করবার সুযোগ পেলে ঐ ব্যাপক বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা যে কি পরিণতি লাভ করত তা' আজ কল্পনা করা কঠিন। ঠিক সেই সময়ে ফরাসী দেশের রণাঙ্গনে যুদ্ধের অবস্থা অনিশ্চিত। জার্মানরা ইংরাজ-ফরাসী ব্যূহ ভেদ করবার জন্য বদ্ধপরিকর। ওই ব্যূহকে রক্ষা করবার জন্য পৃথিবীর সব দেশ থেকে প্রচুর সংখ্যায় দখলকারী ইংরেজ সৈন্যদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে সেই সময়ে দেশীয় সিপাহীদের তুলনায় দখলকারী ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা ছিল অতিশয় সামান্য, নগণ্য। ঠিক সেই অবস্থায় ভারতের বিভিন্ন ছাউনী ও কেল্লায় বিপ্লবী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবান্বিত সিপাহীদের সহায়তায় সমগ্র ভারতবর্ষে যদি বিপ্লবী অভ্যুত্থান দেখা দিত, তা' প্রতিরোধ বা দমন করা বিপন্ন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অতিশয় কঠিন হ'ত। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। আয়োজন পূর্ণতা লাভের পূর্বাহ্নেই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা-জনিত বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পরিকল্পনা উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে ও বিনষ্ট হয়।

ওই সময়কার অপর একটি অসমসাহসিক এবং ব্যাপক বিপ্লবী প্রচেষ্টা ছিল জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় অস্ত্র আমদানী করে সমগ্র দেশে আর একবার বিপ্লবী অভ্যুত্থানের আয়োজন করা। যতীন মুখার্জী, মহেন্দ্রপ্রতাপ হরদয়াল,

বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় এই পরিকল্পনাও অনেক দূর অগ্রসর হয় এবং জার্মান সরকারও আমেরিকা থেকে এ দেশে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র-শস্ত্র প্রেরণের বাস্তব পন্থা গ্রহণ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নানা কারণে এই প্রচেষ্টাও সফল হতে পারেনি।

ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের এই দ্বিতীয় পর্যায়ের ইতিহাসও ব্যর্থতার ইতিহাস। এ পর্যন্ত বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টা আমাদের দেশে কোন উল্লেখ-যোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। বিপ্লবী সংগঠন অবশ্যই কিছু পরিমাণে ব্যাপকতর হয়ে গড়ে উঠেছিল, বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে সময়ে সময়ে অতুলনীয় বীরত্বের প্রকাশও দেখা গিয়েছিল এবং সেই সাথে সাথে বিপ্লবী কর্মীদের আত্মদানের অবদানও দেশের মানুষকে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল করে তুলেছিল।

আপোষ আলোচনার মাধ্যমে অসহযোগ আন্দোলনের এক বছর দেশব্যাপী, বিশেষভাবে বাংলাদেশে, বিপ্লবী কর্মসূচী স্থগিত ছিল। তারপরই বাংলাদেশে আবার স্থানে স্থানে সেই আন্দোলন দেখা দেয়। তবে ব্যাপকতা এবং গুরুত্বের দিক থেকে সে সব পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ।

ভারতবর্ষের ঐ যুগের বিপ্লবী আন্দোলনের শেষ পর্যায়ের প্রারম্ভিক অভিব্যক্তি ছিল ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম বিদ্রোহ। শ্রীঅরবিন্দ, বারীন, পুলিন দাস, পি, মিত্র, উল্লাস কর প্রমুখ আমাদের দেশের সেই যুগের বিপ্লবী মনীষীরা ভারতবর্ষে যে বিপ্লবী আন্দোলন গঠনে প্রেরণা সৃষ্টি করেছিলেন এবং উদ্যোগ নিয়েছিলেন, পরবর্তী কালে ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম বিদ্রোহ তারই অন্যতম এক পরিণতি। অবশ্যই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা প্রসূত শিক্ষার ফলে চট্টগ্রামের বিদ্রোহ প্রচেষ্টা যে সমৃদ্ধ ছিল এ কথা বলাই বাহুল্য। এই বিদ্রোহের সূচনা হয়, চট্টগ্রামে সফলভাবে সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকেন্দ্রসমূহ অধিকার করে এবং চট্টগ্রামে স্বাধীন জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে। কিন্তু পরিকল্পনার পরবর্তী অংশসমূহ সফল হয়নি। সমর বিজ্ঞানের বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য এবং প্রচেষ্টার মধ্যে নানাবিধ ত্রুটির জন্য সামগ্রিকভাবে বিপ্লবের পরিকল্পনা সফলভাবে কাজে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সূচনাতেই প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে অসতর্ক সাম্রাজ্যবাদকে সাময়িকভাবে একেবারে পঙ্গু করে ফেলতে পারার জন্য ও তারপর জালালাবাদ পাহাড়ে সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যদলের সাথে বিপ্লবী সেনাবাহিনীর যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের মর্যাদাকে যে আঘাত দেওয়া সম্ভব হয়েছিল তার ফলে, সমগ্র দেশের এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশের যুবশক্তি প্রগাঢ় বিপ্লবী অনুপ্রেরণা লাভ করে।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহকে অরাজনৈতিক কর্মপন্থা বা সন্ত্রাসবাদ বলে কুৎসা করবার কোন সুযোগ ছিল না। ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস লাহোর অধিবেশনে সর্বপ্রথমবার ভারতের জাতীয় লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা বলে ঘোষণা করে। কিন্তু এই লক্ষ্য কেবলমাত্র প্রস্তাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, অচিরে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথাসঙ্গত কোন প্রচেষ্টা আরম্ভের সম্ভাবনা নাই—এই ছিল যথার্থ আশঙ্কা। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল, চট্টগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান করে সূর্য সেনের নেতৃত্বে স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার পেছনে ছিল সশস্ত্র বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর শক্তি ও সমর্থন।

বিরাট দেশ ভারতবর্ষের একপ্রান্তে ছোট একটি জেলায় সাম্রাজ্যবাদী শাসন ক্ষমতা উৎখাত করে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করার ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বাস্তবে কতখানি আঘাত করা এবং দুর্বল করা সম্ভব হবে, সে প্রশ্ন বড় ছিল না। চট্টগ্রাম

বিদ্রোহের মাধ্যমে ভারতের মুক্তিকামী জনসাধারণের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপায়িত করবার পরিকল্পনা অবশ্যই খুবই ক্ষুদ্র এক প্রচেষ্টা, কিন্তু তাই বলে তার গুরুত্ব কম ছিল না এবং সেইজন্য দেশবাসীর কাছে চট্টগ্রাম বিদ্রোহ সেদিন পেয়েছিল প্রত্যক্ষে এবং অপ্রত্যক্ষে অকুণ্ঠ সমর্থন। যদিও পন্থা সম্বন্ধে যাঁরা শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন তাঁরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই বিদ্রোহকে সেদিন স্বীকৃতি দেননি, বরং হিংসাত্মক বলে এই বিদ্রোহকে নানাভাবে তুচ্ছ ও নিন্দাই করেছিলেন। অবশ্য ঠিক সেই সময়ে বীর গাড়োয়াল সৈন্যদলকেও তো তাঁরা নিন্দা করেছিলেন! '৩০ সালের মে মাসে যখন পেশোয়ারে ওই গাড়োয়ালী সৈন্যদল ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ অমান্য করে নিরস্ত্র নর-নারীর উপর অকারণে গুলি বর্ষণ করে তাদের হত্যা করতে অস্বীকার করেছিলেন, তখন এই শুচিবায়ুগ্রস্তেরাই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সেনাপতির হুকুম অমান্য করে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন এই অভিযোগে এঁদেরও প্রকাশ্যে ধিক্কার দিয়েছিলেন; কিন্তু দেশবাসীর কাছে তাঁরা দেশপ্রেমিক বীরের মর্যাদা ও সম্মানই পেয়েছেন।

১৯৩০ সালের কিছুদিন আগে থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে জাতীয় অবমাননাকর যে সব নীতি গ্রহণ করে তার ফলে সমগ্র জাতি গভীরভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং দেশের যুবশক্তির ভিতর ব্যাপকভাবে চাঞ্চল্য ও অধীরতা সৃষ্টি হয়। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের প্রাথমিক সাফল্য দেশের যুবশক্তির একাংশকে বিপ্লবী কর্মপন্থার দিকে দুর্নিবারভাবে আকর্ষণ করে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দেশের বিভিন্ন স্থানে নানাভাবে বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করে।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে সাফল্য লাভ না করলেও প্রথম পর্যায়ে যে সাফল্য লাভ সম্ভব হয়েছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে একান্ত সীমাবদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে অসম সাহসিকতার সাথে দীর্ঘকাল ধরে যে বিপ্লবী কর্মধারা অব্যাহত রাখা গিয়েছিল তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বিপ্লবী সংগঠনের ভিতর থেকে গোয়েন্দাদের কোনরূপ সংবাদ সংগ্রহে পরিপূর্ণ ব্যর্থতা।

দূরদর্শিতা এবং বিশেষভাবে অভিজ্ঞতার অভাবজনিত দুর্বলতার জন্য বিপ্লবী কর্মীদের গোয়েন্দাদের অশুভ প্রভাব ও ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে দূরে রাখা সম্ভব হয়নি বলেই ১৯৩০ সালের পূর্বে ভারতবর্ষে কোন বড় রকম বিপ্লবী প্রচেষ্টা সফল বা আংশিকভাবেও সফল হতে পারেনি। দেখা গেছে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রস্তুতি পূর্ণ হবার পূর্বেই পরিকল্পনার বিস্তারিত সংবাদ গোয়েন্দাদের হস্তগত হয়েছে। বিপ্লবী আন্দোলনের প্রায় চল্লিশ বছরের ইতিহাসে বার বার এই দুর্ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। গোয়েন্দাদের এই সর্বনাশা অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা বিপ্লবী সংগঠনের পক্ষে ১৯৩০ সালের পূর্ব পর্যন্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

বিপ্লবী সংগঠনের দীর্ঘকালের এই দুর্বলতাই ছিল আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দুর্বলতা। এই দুর্বলতা সম্পর্কে দীর্ঘকাল অনুসন্ধান, চিন্তা, বিবেচনা, গবেষণা ও আলোচনার পর বিগত ঘটনাসমূহ থেকে যথাসম্ভব শিক্ষা গ্রহণ করে শেষ বারে চট্টগ্রামে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার সময় সংগঠনকে যথাসম্ভব ত্রুটি মুক্ত রাখবার চেষ্টা করা হয় এবং অবিরত অনন্যসাধারণ সতর্কতার সাথে বিপ্লবী দলের নেতা ও কর্মীদের গোয়েন্দা বিভাগের অশুচি স্পর্শও প্রভাব থেকে নিরাপদে দূরে রাখার সমস্ত ব্যবস্থা যথাসম্ভব কঠোরভাবে প্রতিপালনের চেষ্টা করা হয়। সেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থার ফলে গোয়েন্দাদের পক্ষ থেকে সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের সংস্পর্শে আসবার সমস্ত প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। সেইজন্য বিদ্রোহের পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য আরম্ভের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও

গোয়েন্দা বিভাগ কিছুই জানতে পারে নি। সেইজন্যই অভ্যুত্থানের পূর্বাহ্নে সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপে ঐ প্রচেষ্টা ব্যর্থতার অন্যতম ইতিহাসে পরিণত হতে পারে নি। এই সাফল্যই চট্টগ্রাম বিদ্রোহের একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যুগে ভারতবর্ষের, বিশেষভাবে বাংলার, গোয়েন্দা বিভাগ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের হীনতম স্বার্থরক্ষার কাজেও কিছু পরিমাণে নিপুণতা দেখাতে পেরেছিল। কিন্তু সেই নৈপুণ্য নিশ্চয়ই বুদ্ধিমত্তাপ্রসূত ছিল না, যতটা ছিল অপরিমিত অর্থব্যয়, রাষ্ট্রশক্তির যথেচ্ছ অপব্যবহার এবং বর্বরোচিত ও অমানুষিক নিষ্ঠুর পদ্ধতি অবলম্বনের কারণে। একথা অনস্বীকার্য যে, বিপ্লবী সংগঠনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত কোন নেতা বা কর্মীর কাছ থেকে কোন খবর না পেলে গোয়েন্দাদের পক্ষে সংগঠনের কোন কর্মসূচী অথবা নেতা বা কর্মীদের গতিবিধি সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু জানা কোনমতেই সম্ভব নয়। তাই গোয়েন্দা বিভাগের সতত এবং সর্ববিধ চেষ্টা ছিল এই রকম ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে তাদের প্রভাবান্বিত করা। গোয়েন্দা বিভাগের এই প্রচেষ্টা কেমন করে ব্যর্থ করা যায় সেই প্রশ্নই ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের একটি প্রধান সমস্যা। বস্তুতঃ গোয়েন্দাদের অশুচি স্পর্শ অনেক ক্ষেত্রেই বিপ্লবী সংগঠনের অভ্যন্তরে বহুদূর অবধি পৌঁছাত। বিপ্লব আন্দোলনের কোন কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিও যে সংগোপনে গোয়েন্দাদের প্রভাবাধীন ছিল, এমন ঘটনাও বিরল নয়। এর ফল অনিবার্যভাবে যা হবার তাই হয়েছে। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতার উৎস প্রধানতঃ এইখানেই।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের উদ্যোগ পর্বে সংগঠনের এই দিক সম্পর্কে প্রগাঢ়তম লক্ষ্য রাখাই ছিল নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এ সম্পর্কে অনন্তলালের অবদান অপরিসীম। অল্প বয়সে অনন্তলাল গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘকাল গোয়েন্দাদের ঘনিষ্ঠ নৈকট্যে অন্তরীণ ছিলেন। সেই সময়ে তিনি গোয়েন্দাদের কার্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানবার এবং বুঝবার সুযোগ পান। অনন্তলালের সেই শিক্ষা পরবর্তীকালে বিশেষভাবে চট্টগ্রাম বিপ্লবের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছে।

বিপ্লবীদের সুপরিকল্পিত এবং সুকৌশল চেষ্টায় গোয়েন্দা বিভাগকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করা সম্ভব হয়েছিল বলে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করা গিয়েছিল। একথা সত্য যে, গোয়েন্দা বিভাগকে বিভ্রান্ত করা খুবই কঠিন, তাই এ কাহিনী যথার্থই খুব কৌতুহলোদ্দীপক। অনন্তলাল এ সম্পর্কে অল্প কিছু লিখেছেন। এবিষয়ে সামান্য কিছু উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

গান্ধীজীর ডান্ডী সত্যাগ্রহ তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বাংলার বিভিন্ন জেলা তখন খুবই সক্রিয় এবং কর্মব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কোন কোন জেলায় আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু বিদ্রোহের দিন চূড়ান্তভাবে ১৮ই এপ্রিল ধার্য করা হয়েছে বলে চট্টগ্রামে আইন-অমান্য আন্দোলনের কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। অথচ শত শত ব্যক্তি প্রত্যহই উৎকণ্ঠার সাথে অনুসন্ধান করছে চট্টগ্রামে কবে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম আরম্ভ হবে। সূর্য সেন ছিলেন জেলা-কংগ্রেসের সম্পাদক, তাই গণ-সংগ্রামের কর্মসূচী স্থির করবার মোটামুটি দায়িত্ব ছিল তাঁর উপরেই। ঠিক সেই সময় সূর্য সেন ও অন্যান্য জননেতাদের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি ইস্তাহার প্রকাশ করে একথা ঘোষণা করা হয় যে, ১৯শে এপ্রিল বৈকালে জনসভায় নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ করে চট্টগ্রামে আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হবে। এই ইস্তাহারে অন্যান্য জননেতাদের সাথে সূর্য সেন অনন্তলাল সহ অন্য সকল বিপ্লবী নেতাদেরও স্বাক্ষর ছিল। এই ঘোষণার ফলে গোয়েন্দারা খুব পুলকিত হয়ে ওঠে। তারা মনে ভেবেছিল এইবার এতদিনে সব বিপ্লবী নেতাদের গ্রেপ্তার করে আটক করা

সম্ভব হবে এবং সেই আয়োজনে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ইতিহাস তাদের জন্য ১৯শে এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি; ১৮ই তারিখ সন্ধ্যাবেলা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চট্টগ্রামে বিধ্বস্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল অর্থ সংগ্রহের পন্থায়। বিপ্লবী সংগঠন গড়বার জন্য এবং কর্মসূচী পালনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থ অনেক সময় সংগ্রহ করা হ'ত সরকারী বা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের অর্থ বিদেশী বণিক প্রতিষ্ঠানের অর্থ অথবা জনগণের অপ্রিয়—ধনী জমিদার, জোতদার, মহাজন বা ঐ স্তরের ব্যক্তিদের অর্থ অধিকার করে। এইরূপ প্রচেষ্টার ফলে অনেক সময় পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হ'ত না, অনেক সময় ভুল সংবাদের জন্য সমগ্র প্রচেষ্টা প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'ত। কোন কোন সময় এই ধরনের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ও অনাকাঙ্ক্ষিত রক্তপাত হ'ত। কিন্তু প্রায় প্রতিটি ঘটনার পরই ব্যাপক আকারে সরকারী অত্যাচার আরম্ভ হ'ত, যার ফল বহু সময়েই সংগঠনের পক্ষে খুব ক্ষতিকর হ'ত। আর তা' ভিন্ন এমনও দেখা গেছে, সংগঠনের কোন কোন কর্মী বিপ্লবের কর্মসূচী পালনের জন্য নিজেদের বাড়ি থেকে অর্থ সংগ্রহ অপেক্ষা অপরের অর্থ বলপূর্বক সংগ্রহের বিষয় বেশী উদ্যোগ প্রদর্শন করে এবং বেশী উৎসাহী হয়ে ওঠে। এই মনোভাব যে বিপ্লবী কর্মীদের মূল আদর্শ ও নীতির পরিপন্থী, একথা পূর্বে বহু সময়েই সংগঠনের নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। কিন্তু বিশ্লেষণে, এই বিষয়টি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি অত্যন্ত জটিল মনস্তত্ত্বের সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছে।

এমন ঘটনাও আছে, যে ক্ষেত্রে বিত্তবান কর্মী অথবা নেতৃস্থানীয় ধনী কর্মী নিজ গৃহ হতে সহজেই প্রয়োজনীয় অর্থ না দিয়ে অন্যত্র থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করেছে বা যাবজ্জীবন সাজা নিয়েছে।

চট্টগ্রামে শেষবারে সংগঠন গড়বার সময় এ সমস্যার কথা মনে রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থই নিজেদের বাড়ি থেকে সংগ্রহ করতে হবে; জাতীয় মুক্তির জন্য ত্যাগের কর্মসূচী সর্বপ্রথমে নিজের গৃহ থেকেই আরম্ভ হোক্। এই পদ্ধতির দু'টি খুব ভাল দিক আছে। প্রথমতঃ, নিজেদের গৃহ থেকে অর্থ দেবার বিরুদ্ধে যে মানসিক বিরোধিতা, তা' কেটে গিয়ে ত্যাগের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়ে যায়। আর দ্বিতীয়ত, এই ভাবে অর্থ সংগ্রহ করলে সমগ্র সংগঠনের পক্ষে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না। কারণ, সরকারের পক্ষে সে সংবাদ জানবার আদৌ কোন সুযোগ থাকে না।

পরিকল্পনা অনুযায়ী এই পন্থা অনুসরণ করবার ফলে চট্টগ্রাম বিপ্লবের সমুদয় অর্থই শান্তিপূর্ণভাবে ও অতি সংগোপনে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। কেবল মাত্র একটি ক্ষেত্রে একজন অভিভাবক বাড়ির গহনা অপহরণ সম্পর্কে পুত্রকে সন্দেহ করে কিছুকাল পরে থানায় সংবাদ দেন। কিন্তু পুলিশের পক্ষে এই সংবাদের উপর নির্ভর করে কোন কিছুই করা সম্ভব হয় নাই; কারণ, তাদের কাছেও এই সংবাদ যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য মনে হয় নাই।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সফলতার কারণ হিসাবে আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে দুই তিনটি অতি নির্ভুল শিক্ষা পাওয়া গেছে। একথা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, বিপ্লবী নেতা ও কর্মীদের মধ্যে যারা একবার কোন না কোন কারণে গোয়েন্দাদের সংস্পর্শে এসেছে বা আসতে বাধ্য হয়েছে তাদের সকলকেই পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করা খুব নিরাপদ নয়। বিপ্লবী সংগঠনে ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা এক্ষেত্রে আদৌ কোন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় নয়। পরবর্তীকালে

নিজের জীবন যথার্থভাবে বিপদাপন্ন করে লক্ষ্যের প্রতি অচঞ্চল আনুগত্য প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ঐরূপ কর্মী বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংগঠনের কেন্দ্রীয় চক্রে গ্রহণ করার অর্থ সমগ্র সংগঠনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তোলা।

এই শিক্ষা যথাযথভাবে উপলব্ধি করে চট্টগ্রামে সংগঠন গড়ে তোলবার সময় সর্বাধিক গুরুত্ব এবং দৃষ্টি দেওয়া হয় স্কুলের অল্প বয়সের তরুণদের প্রতি। এইসব তরুণদের কখনও গোয়েন্দাদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ হয়নি, তাই বিপ্লবী সংগঠনের কিছু শিক্ষা পাওয়ার পর এই তরুণেরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী ও নির্ভর-যোগ্য বলে নিরাপদে পরিগণিত হতে পারে। আর তা' ভিন্ন এই অল্প বয়সের তরুণেরা কোন সময়েই কোন প্রকার বিপদের সম্মুখীন হতে কখনই ইতস্ততঃ করে না বা পিছপাও হয় না। গোয়েন্দাদের স্পর্শ মুক্ত এই সকল স্কুল-কলেজের তরুণেরাই চট্টগ্রাম সংগঠনের প্রধান শক্তি ছিল।

সেই সময়কার চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংগঠনের নেতৃত্বের এই বিচার এবং সিদ্ধান্ত যে অত্যন্ত সঠিক এবং নির্ভুল ছিল, ১৮ই এপ্রিলের বিদ্রোহের প্রায় পরিপূর্ণ সাফল্যই তা' প্রমাণ করেছে। পরবর্তীকালে নির্মম নির্যাতনে কেউ কোন প্রকার দুর্বলতা দেখিয়েছে কিনা সে কথা আদৌ বড় নয়, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচী আরম্ভের পূর্বেই প্রচেষ্টা সম্পর্কীয় কোন খবর গোপনে পাচার হয়ে গেল কিনা। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কালে তা' হয়নি।

অনন্তলালের দীর্ঘ পুস্তকের এই পরিচিতিলিপিও অস্বাভাবিক দীর্ঘ হয়ে পড়ছে এবং আশংকা হচ্ছে বাস্তব ঘটনা অনুসন্ধানে উৎসুক পাঠক পাঠিকাদের বিরক্তি উৎপাদন করবে। তাই সম্বিতলাভের সঙ্গে সঙ্গেই সংযত হওয়া দরকার। যথার্থই, অনন্তলালের পুস্তকের পরিচিতির কোনই প্রয়োজন ছিল না।

আজ থেকে দীর্ঘকাল পূর্বে সম্পূর্ণ অপর এক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমাদের বিরাট দেশ ভারতবর্ষের এক কোণে যে ঘটনা ঘটেছিল, আজ আনুপূর্বিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব না থাকলেও সেই ঘটনা-সমূহের ঐতিহাসিক মূল্য নিঃশেষ হয়ে যায় নি নিশ্চয়ই। একটি পরাধীন জাতির মুক্তি প্রয়াসে সমস্ত বিদ্রোহ, বিদ্রোহের প্রচেষ্টা, সমস্ত প্রকার বিরোধিতা ও প্রতিবাদ সেই জাতির অতি গৌরবের ঐতিহ্য। দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন একটি অংশ জাতির মুক্তি সংগ্রামে অহিংস পন্থা ভিন্ন, অন্য কোন প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিতে চান না এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সুযোগে তাঁরা জাতির ইতিহাসকেই সুপরিকল্পিতভাবে এবং সুকৌশলে বিকৃত করবার চেষ্টা করছেন। কোন কোন ব্যক্তি শহীদ ক্ষুদিরামের মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করতে অস্বীকার করে নিজেকে ইতিহাসে ব্যঙ্গ ও করুণার পাত্রেই পরিণত করেছেন। "কেবল মাত্র চরকা ঘুরিয়ে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আনা যায় না, চরকার গুঞ্জনের পরিধি কেবল মাত্র শোষণ অব্যাহত রেখে আপোষ অবধি"—যাঁরা কৌতুকচ্ছলেও একথা বলেন, তাঁরাও দেশের ব্যাপকতম জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবার কাজে অহিংসা কর্মনীতির অপরিসীম অবদান সম্পর্কে পরিপূর্ণ মাত্রায় শ্রদ্ধাশীল।

তিন যুগেরও বেশী কাল পরে আজকের দিনের দেশবাসীর কাছে এবং বিশেষভাবে আজকের যুগের তরুণ-তরুণীদের কাছে সে যুগের এক বিপ্লবী প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক কাহিনী বলে অনন্তলাল যথার্থই দেশপ্রেমিকের কর্তব্য পালন করেছেন। অনন্তলাল যা লিখেছেন তা' কিন্তু গল্প বা পরিকল্পিত কাহিনী নয়। তিনি বাস্তব ঘটনাসমূহকেই যথার্থভাবে বিবৃত করেছেন। তাঁর বলার ভিতর অতিশয়োক্তি নাই বা চমকপ্রদ করবার চেষ্টায় নাটকীয় করা হয়নি। তাঁর লেখা

পড়লে অনেক সময়েই মনে হবে এমন বহু বাস্তব ঘটনা আছে যা, পরিকল্পিত কাহিনী অপেক্ষাও অধিক চমকপ্রদ।

অনন্তলাল তাঁর লেখার মধ্যে বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টার শুধু ভাল দিকটাই দেখান নি, ঐ প্রচেষ্টার মধ্যেকার দোষত্রুটিগুলিও যথাসম্ভব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই এই যে, আজকের দিনের যুব-শক্তি যেন সেদিনের বিপ্লবী-ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ তরুণ-তরুণীদের যথাযথভাবে বিচার করতে সক্ষম হয়।

অনন্তলালের লেখা একটু বেশী মাত্রায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনে হবে। আমার মনে হয় তা' হওয়াই স্বাভাবিক। আগেই বলেছি তিনি যেমন ইতিহাসকে বিকৃত করেন নি, তেমনি আবার তাঁর লেখাকে নৈর্ব্যক্তিক বলে দাবীও করেন নি। অনন্তলাল লিখেছেন ঐতিহাসিক কাহিনী সে যুগের বাস্তব ঘটনাসমূহকে ভিত্তি করে এবং সেই ঘটনাসমূহকে তিনি যে ভাবে দেখেছেন ও নিজের মনে মনে যে ভাবে গ্রহণ করেছেন, তাঁর লেখার ভেতর দিয়ে তিনি সেই ভাবেই বলতে এবং ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর লেখা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক হয়েছে। অনন্তলাল তাঁর লেখার ভেতর দিয়ে পাঠকদের সেই যুগের বাস্তব ঘটনার মধ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন এবং আমার ধারণা তিনি তা' পেরেছেন।

অনন্তলাল শুধুমাত্র ইতিহাস লিখলে দেবু ও আনন্দ গুপ্তের মা এবং বাবা, রজতের মা এবং বাবা, বেলোনিয়ার সেই কৃষক, যে একজন 'খুনী আসামী'কেই নির্বিঘ্নে কুমিল্লায় পেঁাছে দিয়েছিল, এবং এমন আরও বহু চরিত্র তাঁর লেখায় স্থান পেতেন না। এ'রা সকলের কাছেই অজ্ঞাত থেকে যেতেন, যদিও চট্টগ্রামের বিপ্লব প্রচেষ্টার সাথে এ'দের অনেকেই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলেন। এ'রা সব এবং এ'দের মত আরও অনেকেই 'ইতিহাসে উপেক্ষিত'; যদিও নাটকের মতই এইসব অগণিত চরিত্র পাদ-প্রদীপের অন্তরালে থেকে ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে সমৃদ্ধ ও সফল করে তুলতে সাহায্য করেছেন।

আমার বিশ্বাস অনন্তলালের এই বইখানি বর্তমান যুগের সকল বয়সের এবং সকল স্তরের দেশপ্রেমিকদের ভাল লাগবে।

গণেশ ঘোষ

মুখবন্ধ

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনতাপাশ ছিন্ন করবার জন্য ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা ঊনিশ শতকের শেষ দশক থেকেই বিভিন্ন ধরনের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সুরু করেছে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পুণায় বিপ্লবী-বীর দামোদর চাপেকার অত্যাচারী ইংরেজ অফিসার র‍্যাণ্ড (Rand) ও লেফ্‌টেন্যান্ট আয়ার্স্টকে (Ayarst) হত্যার ষড়যন্ত্রে ধৃত হন। দামোদরকে ধরিয়ে দেবার অপরাধে চাপেকার সঙ্ঘের সভ্যরা দুইজন বিশ্বাসঘাতককে নিহত করে। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিশোধপরায়ণ হিংস্র বৃটিশ আদালত চাপেকার সঙ্ঘের চারজন সভ্যের প্রাণদণ্ড দেয়। সেই সময় থেকে সারা ভারতে এই ধরনের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকে। এই রকম বৈপ্লবিক আক্রমণ ও বিদ্রোহের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল ১৯৪৬ সালের বৃটিশ নৌবহরের অধীনে ভারতীয় জঙ্গী নাবিকদের ঐতিহাসিক বিদ্রোহের দিনটি পর্যন্ত। এই সব ঘটনাবলী সম্বন্ধে ইতিমধ্যে বাঙলা দেশে ও ভারতবর্ষে অনেক তথ্যপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ্‌ ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তিনটি খণ্ডে বৃহদাকারে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করেছেন। অনুরূপ ধরনের ইতিহাস লেখার আরও অনেক প্রচেষ্টা হয়েছে। শান্তিনিকেতনের শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ধারাবাহিক তথ্য সম্বলিত করে ও তাঁর নিজস্ব মতের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে "ভারতের জাতীয় আন্দোলন" গ্রন্থটি লিখেছেন। শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ভারতের গণ-আন্দোলন ও বৈপ্লবিক সশস্ত্র সংগ্রামের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর চিত্র বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে পরিবেশন করেছেন। তা'ছাড়া কিছুদিন আগে শ্রীকালীচরণ ঘোষ প্রণীত 'Roll of Honour' প্রকাশিত হয়েছে। কালীদার গ্রন্থটি কেবলমাত্র শহীদদের জীবনী রচনায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ থাকলেও শহীদদের পরিচিতি এবং কার্যাবলী বর্ণনার জন্য তাঁকে বহু অনুসন্ধান করে ধারাবাহিক ভাবে সারা ভারতের বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর বিন্যাস করতে হয়েছে। ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়ে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের প্রামাণ্য ইতিহাস হিসেবে এই গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই রকম একটি গ্রন্থ রচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কালীদা তাঁর বহু জনসমাদৃত 'Roll of Honour' বইটি প্রকাশ করে আগ্রহান্বিত দেশবাসীর সেই প্রয়োজন মিটিয়েছেন।

"অবিস্মরণীয়" গ্রন্থটিও প্রায় সম-সাময়িক। এটি অগ্নিযুগের অতীত ঘটনাবলী বহন করে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক আমাদের বিশেষ বন্ধু—শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র। হরিদার (হরিনারায়ণ চন্দ্রের) ছোট ভাই গঙ্গা। হরিদা দক্ষিণেশ্বর—শোভাবাজার—ভুবন চ্যাটার্জী হত্যা মামলায় জড়িত হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করেন। গঙ্গানারায়ণও বৃটিশ রাজরোষে পড়ে জেল ভোগ করেছে। "অবিস্মরণীয়" গ্রন্থটিতে সারা ভারতের অগ্নিযুগের ইতিহাস রচনা করা হয়েছে। নিষ্ঠার সঙ্গে লেখা এইরূপ সর্বাত্মক ইতিহাস যত বেশী প্রকাশিত হবে, অগ্নিযুগ সম্বন্ধে দেশবাসীর জানবার আকাঙ্ক্ষা মিটাতে ততবেশী সাহায্য করবে, তা'তে সন্দেহ নেই।

আমার লেখা 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' বইটি প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগেই বিপ্লবী যুগের ব্যাপক ইতিহাসের বিশেষ অধ্যায় চট্টগ্রামের সশস্ত্র যুব-অভ্যুত্থানের

বহু কাহিনী পুস্তকাকারে বেরিয়েছে। সব গ্রন্থকারই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে চট্টগ্রামের এই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিবরণ পরিবেশন করেছেন। এই বই-গুলির সব ক'টি দেখবার বা পড়বার সুযোগ আমার হয়নি। কাজেই সেগুলি সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু চারুবাবু (চারু বিকাশ দত্ত) কর্তৃক গ্রথিত "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" বইটি প্রথমেই বিপ্লবী মনকে বিদ্রোহী করে তোলে। চট্টগ্রাম বিদ্রোহকে বৃটিশ সরকারী পক্ষের Chittagong Armoury Raid, বা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন আখ্যা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের মহৎ আদর্শকে লোকের চক্ষে হেয় করা, এবং 'লুণ্ঠনকারী' বলে অপপ্রচার করে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা চালানো। যদি চারুবাবুর বইয়ের শিরোনামা—'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন!' উদ্ধৃতি ও আশ্চর্যবোধক চিহ্ন সমন্বিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করত তাহলেও হয়ত মানিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু কোন ভারতবাসীর পক্ষে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় কি করে চিন্তা করা সম্ভব যে, সূর্য সেন (মাস্টারদা) অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করতে গিয়েছিলেন? ইংরেজ সরকার Chittagong Armoury Raid (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন) নাম দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করলেও তাদের সব ক'টি প্রধান সাক্ষী স্বীকার করেছে যে, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল 'সম্রাটের' (বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করে ট্রাই-ব্যুনালের প্রেসিডেন্ট ইংরেজ জজ, মিঃ জে ইউনী, 121 A. I. P. C. ধারা অনুযায়ী, (যার অর্থ—To wage war against the King Emperor—সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা) আমাদের প্রাণদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা দিলেন। তিনি জাজমেন্টে লিখেছেন: " ..we further observe, however, that the facts in evidence do disclose as the *ultimate goal* which the conspirators had in view, *the overthrow of the British Government in India* and that therefore they might have legitimately been prosecuted and charged under section 121 A. I. P. C. ......We have come to the conclusions after careful consideration that our discretion should not be exercised so as to impose on the accused we have convicted any sentence graver than the maximum provided for *the offence of conspiracy to wage war against the king*........ (Emphasis mine)"...... (আমরা আরও মন্তব্য করিতেছি যে, সাক্ষ্য প্রমাণাদির তথ্য হইতে প্রকাশ পাইতেছে, ষড়যন্ত্রকারীদের চরম লক্ষ্য ছিল **ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকারকে উচ্ছেদ করা** এবং সেই হেতু তাহারা ন্যায্যত ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ক ধারা অনুসারে ফৌজদারী মামলায় সোপর্দ এবং অভিযুক্ত হইতে পারে।........ খুব মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আসামীদিগকে শাস্তি দিবার সময় **রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ষড়যন্ত্রের** অপরাধে উচ্চতম দণ্ড অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ দণ্ড প্রয়োগ করা সমীচিত হইবে না)।

তাছাড়া ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিভিন্ন স্থানে "সন্ত্রাস-বাদী" সংগঠনের পরিবর্তে আমাদের যুব-সংগঠনকে বিপ্লবী সংগঠন বলে আখ্যা দিয়েছেন। —"....and all six immediately after their release set about the formation of a *Secret Revolutionary Society.*" (Emphasis mine). (এবং মুক্তি পাওয়ার পর মুহূর্ত থেকে এই ছয় জনই **গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি** গড়বার কাজে লেগে গেল)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে চারুবাবুর—'অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' বইটি বিচার করলে তাঁর বিরুদ্ধে গভীর অভিযোগ থেকে যায়। চারুবাবু যদি একজন রাজনীতিজ্ঞ বলে নিজেকে মনে না করতেন, তবে তাঁর বইয়ের শিরোনামা ভ্রান্তিবশতঃ দেওয়া হয়েছে বলে মনে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু চারুবাবুর ক্ষেত্রে সেইরূপ মিথ্যা সান্ত্বনা পাওয়ার কোন সুযোগ নাই। বৃটিশ সরকারের সংগে সুর মিলিয়ে—'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' শিরোনামা দিয়ে বই ছাপানো কেবল যে চট্টগ্রামের বিপ্লবী ঐতিহ্যের প্রতি চারুবাবুর বিমাতৃসুলভ মনোভাবের পরিচায়ক তা নয়, বীর শহীদদের আত্মদানের প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ভাবও প্রতিফলিত হয়।

১৯৪৭ সালে শ্রীআনন্দ গুপ্ত 'চট্টগ্রাম বিদ্রোহ' নাম দিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে। আনন্দ চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল এবং চন্দননগরে গুলী বিদ্ধ হয়ে বন্দী হয়। তারপর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে নির্বাসিত হয়। মুক্তি পাওয়ার কিছুদিন পরে সে 'চট্টগ্রাম বিদ্রোহ' গ্রন্থটি প্রকাশ করে। সেই গ্রন্থটিতে আমার লেখা একটি ছোট ভূমিকা আছে। আনন্দ এই গ্রন্থটিতে যে ভাবে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করেছে তার ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। আমার মনে হয় ১৯৪৭ সালে, আমাদের সকলের মুক্তি পাওয়ার পর, চট্টগ্রামের যুব-অভ্যুত্থানের ঐরূপ একটি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আনন্দ সময় মত ঐ গ্রন্থটি রচনা করে বাঙ্গলার যুব সমাজের কাছে তার বৈপ্লবিক কর্তব্যের পরিচয় দিয়েছে।

যে সব বৈপ্লবিক আন্দোলন বা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি, 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' সেইরূপ ইতিহাসের ভাষায় বা ভঙ্গীতে লেখা হয়নি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অগ্নিযুগের বিভিন্ন বিপ্লবাত্মক ঘটনার সমন্বয় হ'ল অগ্নিযুগের স্বয়ংসম্পূর্ণ ইতিহাস। 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' এই অখণ্ড ইতিহাসের একটি মাত্র অধ্যায়। আমার মনে হয়, সারা ভারতের সর্বাত্মক অখণ্ড বৈপ্লবিক ইতিহাস তখনই রূপায়িত হতে পারবে, যখন তা' বিভিন্ন অধ্যায়ের বিশদ বিবরণে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হবে। তাই বলে আমি বলছি না যে, বিশদ বর্ণনাপূর্ণ ঘটনার সমন্বয় ছাড়া তথ্যপূর্ণ ইতিহাসের প্রয়োজন নাই। আমার কথা এই যে, সাধারণভাবে ব্যাপক ও সর্বাত্মক তথ্যপূর্ণ ইতিহাসের সংগে আমাদের পরিচিত হওয়ার সুযোগ অনেক হয়েছে। সেইজন্য মনে হয় বিশদভাবে মর্মস্পর্শী, সজীব ও প্রাণবন্ত বর্ণনার মাধ্যমেও যদি বাস্তব ঘটনার পরিবেশন হওয়া সম্ভব হয়, তবে তা' উপলব্ধি ও প্রেরণা দিয়ে বৈপ্লবিক যুগের ইতিহাস বুঝতে সাহায্য করবে।

যে কোন একটি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, চমকপ্রদ বা ব্যাপক বৈপ্লবিক কার্যকলাপ হঠাৎ সংঘটিত হয়নি। প্রতিটি ঘটনার পিছনে, প্রতিটি বিপ্লবী যুবকের আত্মত্যাগের মূলে, প্রতিটি বিপ্লবী সংগঠনের কর্ম প্রস্তুতি ও পরিণতির পথে ছোট ছোট অসংখ্য জটিল সমস্যা ও সূক্ষ্ম মনঃস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার বিস্তারিত ইতিহাস আছে।

সেই অনুদ্‌ঘাটিত ইতিহাসের বিস্তারিত বিবরণ যদি বলা না হয় তবে কোনদিনই জানতে পারা যাবে না যে, পর্দার অন্তরালে কী হৃদয়গ্রাহী ও বীরত্ব ব্যঞ্জক বৈপ্লবিক কাহিনী লুকানো রয়েছে! ইতিহাসের সেই সব ভুলে যাওয়া পাতায় কত দরদী বন্ধুর সাহায্য, বিপদের মুখে কত গরীব চাষীর বিপ্লবীদের অকাতরে আশ্রয় দানের কাহিনী, কত নিঃস্ব সর্বহারা প্রতিবেশীর নীরব স্বার্থত্যাগের অমর গাথা সৃষ্টি করেছে, জাতীয় ঐতিহ্যের তা' এক অমূল্য সম্পদ। ইতিহাসের সেই কটি ছিন্ন পাতার সমাবেশ যদি আজও না হয়, তবে আমাদের অগোচরেই থাকবে সেই সব সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদের কথা—যাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালে বৈপ্লবিক প্রয়োজনে দিয়েছেন অর্থ; অজানা থাকবে—"ইংরেজ ভক্ত রাজপুরুষদের" রোমাঞ্চকর গল্প—যাঁরা গোপনে

দিয়েছেন 'কূটনৈতিক' পরামর্শ ও সরবরাহ করেছেন সরকারের আভ্যন্তরীণ গুপ্ত তথ্য; আর দিনের আলোতে কোনদিনই হয়ত আত্মপ্রকাশ করবে না, যদি লুপ্ত অতীত তার দুয়ার উন্মুক্ত করে আজও আমাদের না বলে সেই সব চাকুরীজীবিদের বিপদ-উপেক্ষা করা সক্রিয় সমর্থনের বাস্তব কাহিনী। বিস্মৃতির অতল গহ্বরে কত শত ভগিনীর ও আত্মীয়ার করুণ কাহিনী এবং তাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও মরণপণ বৈপ্লবিক নিষ্ঠার নিদর্শন প্রোথিত হয়ে আছে। কত শ্রদ্ধাভাজন পিতৃতুল্য দেশ-ভক্তের সংকট মুহূর্তের লেখা অজস্র বৈপ্লবিক অবদানের বিবরণ ইতিহাসের পাতায় মলিন আবরণে অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। শত শত মাতার বুকভরা সঞ্চিত ব্যথা ও নীরব অশ্রুধারা, কত দুঃখ ভারাক্রান্ত অথচ পুত্র গর্বে গর্বিতা জননীর বুকভরা স্নেহাশীষ, পুত্রের প্রতি তাঁদের আন্তরিক সমর্থন, স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বর্ণ সোপান রচনা করেছে তার কাহিনী লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যাবে যদি ইতিহাসের সেই সব অধ্যায়ের বিবরণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্থান না পায়।

"অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম" বইটি লেখবার সময় বৈপ্লবিক ইতিহাসের এই বিশেষ দিকটি যেন উপেক্ষিত না হয় সেদিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রেখেছি। তা'ছাড়া সাংগঠনিক বিষয় এবং সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত মানসিক প্রস্তুতির যে অপরিহার্য অধ্যায়—যার উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত বৈপ্লবিক ঘটনা রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম হয়, সেই অধ্যায়ের অন্তর্নিহিত তথ্য যদি অপ্রকাশিত থাকে, তবে মনে হয়েছে চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহের ইতিহাস মাত্র আংশিক জানা যাবে। এই কারণে, এই দু'টি মূল বিষয়ে দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' লিখতে চেষ্টা করেছি। প্রায় ছে'চল্লিশ বছর পরে, আজ ১৯৬৬ সালের তরুণ-তরুণীদের কাছে ১৯২০—১৯৩৪ সালের অগ্নিযুগের এই অধ্যায়টিকে তুলে ধরতে হলে সেই যুগের বাস্তব অবস্থার সংগে তাদের নিবিড়-ভাবে পরিচিত করতে হবে। তাই পাঠ্য বইয়ের ভাষায় ও ছকে ফেলে এই ইতিহাস লিখলে চলবে না। সেই বৈপ্লবিক ইতিহাসটিকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলা প্রয়োজন। যদি কোন বলিষ্ঠ হস্তের নিপুণ তুলি পাঠকবর্গের মানসপটে সেই যুগের একটি বাস্তব স্বপ্ন চিত্রায়িত করতে পারে, তবে এই সুদীর্ঘ দিনের সুবিশাল পথ, পরিক্রম করার পরও তারা সার্থকতার সংগে সেই ঐতিহাসিক কাহিনী উপলব্ধি করতে পারবে। যে আশা করে লিখতে সুরু করেছিলাম হয়ত নিজের অক্ষমতার জন্য সেই পর্যায়ে গিয়ে পেঁাছাতে পারিনি। তবুও অগ্নিযুগের খন্ড খন্ড অধ্যায়ের সংগে যাঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত, তাঁদের মধ্যে আর কেউ যদি তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা বিশদভাবে বর্ণনাবহুল এবং কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর মাধ্যমে বর্তমান যুগের প্রবীণ ও নবীন পাঠকবর্গের কাছে পরিবেশন করতে উৎসাহিত হ'ন তবে বর্তমানে আমার চেষ্টা আংশিক সার্থক হয়েছে ভেবে নিজেকে ধন্য মনে করব। "অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম"-এ আমি প্রধানতঃ সেই চেষ্টাই করেছি।

এই গ্রন্থটিতে 'চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের' বিশেষ অধ্যায়টি মূল উৎপত্তি স্থল হতে বিচ্ছিন্ন করে লিখলে সফলতার প্রধান ভিত্তির ইতিহাস উহ্য থেকে যাবে। তাই মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বৈপ্লবিক সংগঠনের প্রারম্ভ, প্রাথমিক প্রস্তুতি, সক্রিয় বৈপ্লবিক কার্যকলাপ, মূল্যবান অভিজ্ঞতা এবং ঐ সবের অভিজ্ঞতা বজায় রেখে কি করে আমাদের গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছিল সেই অত্যাবশ্যক অধ্যায়টি লিখেছি। তা'ছাড়া এই গ্রন্থে বৃটিশ আমলে পুলিশ ও বিশ্বাসঘাতকদের নিরবচ্ছিন্ন চক্রান্তে ভারতের বিপ্লবী প্রচেষ্টা কি ভাবে, অংকুরে বিনষ্ট হয়েছে সেই বিষয়ে আমার নিজের বিশ্লেষণ ও গবেষণা লিপিবদ্ধ করেছি। সেই সব মূল্যবান ঐতিহাসিক শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে যুব-অভ্যুত্থানের পূর্বে কি ভাবে

আমাদের গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিতে পুলিশের চর ও বিশ্বাসঘাতকদের প্রবেশ-দ্বার সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলাম ইতিহাসের সেই একান্ত প্রয়োজনীয় অধ্যায়টি লেখার কথা আমি সব চেয়ে বেশী দরকার বলে মনে করেছি।

'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' গ্রন্থ ১৯১০-২০ সালের ঘটনাবলীর বিবরণ থেকে আরম্ভ হয়েছে। তখন থেকেই মাস্টারদার নেতৃত্বে আমাদের বিপ্লবী দল দানা বাঁধতে সুরু করে। সেই সময় গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন সারা ভারতে জোয়ার তুলেছে। সেই কারণে অহিংস আন্দোলনের পটভূমির সংগে যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্য রেখে আমাদের বৈপ্লবিক কর্মধারা পরিচালিত হয়েছে ও অহিংস আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন গুরুত্ব নিয়ে সশস্ত্র কার্যক্রম প্রকাশ পেয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিকভাবে কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনের বিষয় উল্লেখ করেছি। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থাকে সমূলে উৎখাত করবার জন্য 'অহিংস গান্ধীবাদ' ও আমাদের 'সশস্ত্র বিপ্লব বাদের' যে মূলগত পার্থক্য বর্তমান ছিল তার মধ্যে কোন আপোষ করা সম্ভব নয়। তাই বলে 'অহিংস গান্ধীবাদের' প্রভাবে কংগ্রেসের ভারতময় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের বাস্তব ঐতিহাসিক অবদানের সঠিক মূল্য অস্বীকার করে জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস বিকৃত করতে চাইনি। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের আরও প্রায় বিশ বছর আগে থেকে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত হিংসাত্মক বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা চলেছিল ভারতের বুকে। তারপর ১৯২০ সাল থেকে অহিংস জাতীয় আন্দোলনের পাশে পাশে ১৯৪২ সালের কংগ্রেসের অহিংস 'ভারত ছাড়' সংগ্রাম পর্যন্ত গুপ্ত বিপ্লবী দল অবিরাম সশস্ত্র প্রস্তুতি চালিয়ে গেছে এবং নানাভাবে তারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে সশস্ত্র আক্রমণ করেছে। ১৯৪৬ সালের ইংরেজ নৌবহরের অধীনস্থ ভারতীয় জঙ্গী নাবিকদের বিদ্রোহকে ধরে নেওয়া যায় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের পরিসমাপ্তি। এই সুদীর্ঘ ছে'চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিপ্লবীদের আপোষহীন সশস্ত্র সংগ্রামের বাস্তব মূল্যায়ণ করতে যদি কোন অহিংস গান্ধীবাদী ইতিহাসবিদ্ ইতস্ততঃ করেন বা গররাজী থাকেন তবে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ-দোষ থেকে তিনি রেহাই পাবেন না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন ভারতবাসী নিষ্পেষিত ও সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারে জর্জরিত, তখন অহিংস সংগ্রামের 'রণনীতি' বা 'রণকৌশল' হিসাবে গান্ধীজী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করবার জন্য নির্দেশ দিলেন। গান্ধীজী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের সৈনিক হিসাবে সর্বপ্রথমে মনোনীত করলেন বিনোবাভাবেজীকে। গান্ধীজীর 'ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের' রণনীতির সংগে বিচার করে দেখতে হবে সারা ভারতের ছে'চল্লিশ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের খণ্ড খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন সশস্ত্র বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সঠিক মূল্য কি? ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বিশেষ অধ্যায়টি সাহিত্যাকারে লিখতে গিয়ে গান্ধীজীর অহিংসবাদ ও আমাদের বিপ্লববাদের পরস্পর মত বিরোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদ উপেক্ষা করতে পারি নি।

এই বিশেষ ধরনের বিবরণপূর্ণ ও বর্ণনামূলক ভাবে রচিত "অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম" গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ লাভ করবে বলে আশা করছি। এই গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনী সুরু হয়েছে ১৯২০ সালে সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের সূচনা থেকে, আর এর সমাপ্তি হবে ১৯৩৪ সাল, ১২ই জানুয়ারী মধ্য রাত্রের ঘটনায়—যখন ফাঁসীর মঞ্চ থেকে মাস্টারদার উদাত্ত আহ্বান সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসনকে উৎখাত করবার জন্য বিপ্লবী যুব-শক্তিকে দৃঢ়সঙ্কল্প করে তুলল।

প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে ১৯৬১ সালের জুন মাস থেকে পুরো একটি বছর, প্রতি সপ্তাহে ইংরেজী দৈনিক—Hindusthan Standard-এ (হিন্দুস্থান

স্ট্যান্ডার্ড') Chittagong Heroes Fight for Freedom (চট্টগ্রাম বীরদের স্বাধীনতার যুদ্ধ) শিরোনামা দিয়ে সেই অধ্যায়ের ঘটনাবলী লিখি। সেই সময় আমার 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রামের' বাংলায় লেখা পাণ্ডুলিপি বিদ্যোদয় লাইব্রেরীর হেফাজতে দিয়েছিলাম মুদ্রিত করে প্রকাশ করবার জন্য। বন্ধুবর গণেশ ঘোষ আমার অনুরোধে সেই সময়, প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে—'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন। আমাদের বন্ধু-বান্ধব ও অনেক শুভানুধ্যায়ীরা বিশেষভাবে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' গ্রন্থটির সঠিক ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারণের জন্য শ্রীগণেশ ঘোষ লিখিত ভূমিকার সংযোজন একান্ত প্রয়োজন। প্রায় পাঁচ বছর পরে, বর্তমানে এই বইটি প্রেসে ছাপতে যাওয়ার পূর্বক্ষণে আমি গণেশের অভিমত পুনরায় গ্রহণ করে সেই অমূল্য ভূমিকাটি প্রকাশকের নিকট পাঠালাম। ভূমিকাটির সবল উক্তি ও সেই যুগের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী পাঠকবর্গকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আকৃষ্ট করবে এবং তাঁরা নিজেরাই যাচাই করতে সমর্থ হবেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার কতটা ঐতিহাসিক মূল্য এবং প্রয়োজনীয়তা আছে।

আমি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করছি "অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম" বইটি অসম্পূর্ণ থাকত যদি শ্রীগণেশ ঘোষের লেখা ভূমিকাটি এতে সংযোজিত না হ'ত। অকপট ভাবে আরও বলতে চাই যে, দেশবাসী অনেক বেশী উপকৃত হ'ত যদি শ্রীঘোষ কেবলমাত্র ভূমিকাটি না লিখে এই বিপ্লবী অধ্যায়ের বিশদ বিবরণ তাঁর সবল বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে পরিবেশন করতেন।

জীবনে যখন আর কিছু করবার থাকে না তখনই বোধ হয় অতীত দিনের মরচে পড়া দিনগুলির কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করে আত্মপ্রসাদ লাভের ইচ্ছে হয়। আমার এই বই লেখাও—সত্যি বলতে কি যেন ঠিক তাই। 'এক কালে আমিও একজন বিপ্লবী ছিলাম'—এইটি জাহির করাই যেন জীবনের শেষে আমার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। জীবনের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছি, এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে আর কখনও তো আমার এই কুবুদ্ধি হয়নি! আজ চৌষট্টি বছর বয়সে কিসের এই তাগিদ! কেন অন্তরের এই মহাশূন্যতা! কি কারণে হৃদয়ের দীনতার এই নির্লজ্জ অভিলাষ!

আমার অতি নিকটতম স্নেহের পাত্র ও পাত্রীদের বহুদিনের দাবী—আমার মৃত্যুর আগে এই বিপ্লবী অধ্যায়টি, যার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল, তা' লিখে রেখে যেতে হবে। যখন আমার বর্তমান জীবন, আমার অতীত বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকে উপহাস করে, তখন আমার উপর তাদের এই অন্যায় দাবী কেন—কেন এই গুরুত্বপূর্ণ ভার চাপানো হ'ল অপাত্রে? আমার নিকটতম সেই সব তরুণ ভাই-বোনদের উপর দায়িত্ব রইল এই প্রশ্নের জবাব দেবার—কেন তারা আমার জীবন-সায়াহ্নে আমাকে প্ররোচিত করেছে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে—এই কর্তব্য পালন করতে? আরও একটি প্রশ্ন রইল—ভবিষ্যতের ইতিহাস কে রচনা করবে? তাতে আমার কি অংশ থাকবে?

সূচীপত্র

১

অহিংস আন্দোলনের পটভূমিতে প্রাথমিক বৈপ্লবিক সংগঠন

"If anybody tells you that an act of armed resistance, even if offered by ten men only—even if offered by men armed with stones—any and every such man, who tells that such an act of resistance is premature, imprudent or dangerous, shall at once be spurned and spat at for the remark he thus puts, and recollect that some how some where and by somebody a beginning must be made and that the first act of resistance is always and shall ever be premature, imprudent, unwise and dangerous."

Before the Irish Revolution: LALOR

'টক্', 'টক্'—'টক্'। দরজায় মৃদু করাঘাত। ঘুম ভেঙে গেল।
......মনে পড়ে সেদিনের কথা!—

তখনো ভোর হয় নি। ঘুম-জাগা পাখির দল বাসায় বসেই তাদের অস্তিত্ব জানাচ্ছে—আমার দরজায় শব্দ হল 'টক্' 'টক্', একটু থেমেই আবার 'টক্'। পরিচিত সঙ্কেত; আগন্তুক আমার সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রমোদ—ক্লাসের সেরা ছেলেদের একজন। সেদিন সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে আমি কি কল্পনাও করতে পেরেছিলাম যে, আজ সকালে যার সঙ্গে পরিচয় হবে আমার, সে আমার জীবনে এক নতুন পথের দরজা খুলে দেবে, যে পথে প্রতি পদক্ষেপে আছে বিপদের সঙ্কেত, জীবন-সংশয়, আর মৃত্যুর প্রতি তাচ্ছিল্য, আর সেই বন্ধুর রক্তঝরা পথের অপরপ্রান্তে রয়েছে উজ্জ্বল আশার আলো—মাতৃভূমির বন্ধনমোচন স্বপ্ন। সেদিন স্বপ্নেও কি অনুমান করেছিলাম আমার প্রিয়তম বন্ধু প্রমোদ চৌধুরী আর দশ বছরের মধ্যেই হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরবে? সেদিন কে জানতো আমার অন্যতম সহপাঠী ও অকৃত্রিম বন্ধু গণেশ ঘোষ হবে আমার জীবনের প্রতিটি দিনের সাথী—জয়-পরাজয়, বন্ধন-মুক্তি, আনন্দ-নিরাশা সবকিছু ভাগ করে নেব দু'জনে সমান ভাগে?

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে প্রমোদ। মা-বাবা এবং প্রতিবেশীদের অগোচরে সাবধানে দরজা খুলে বাইরে এলাম। আমার দাদা ও দিদি ছিলেন কাজে আমার সহায়ক। প্রমোদ খবর এনেছে—আমাকে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে; জায়গা চিনিয়ে দেবে সে। নিঃশব্দে অনুসরণ করলাম তাকে। বাঁধানো রাজপথ ছেড়ে কাঁচা সড়ক—মাঝে মাঝে পায়ে-চলা পথে মাঠ পেরিয়ে পথের দূরত্ব কমিয়ে আনছি। তবু যেন পথ আর শেষ হয় না। জানি না কি জন্য চলেছি,—শুধু জানি প্রশ্ন করলে উত্তর পাব না—কারণ প্রশ্ন করাটাই নিয়মের ব্যতিক্রম।

চট্টগ্রাম শহরের একপ্রান্তে কর্ণফুলীর তীরে পাথরঘাটা নামে পল্লী। সেখানে গিয়ে থামলাম আমরা। আঙুল তুলে দেখাল প্রমোদ—নদীর ধারে একটা খড়ের ঘর, ঐ আমার গন্তব্যস্থল। আর কোন কথা না বলে সে চলে গেল।

যে রাস্তা দিয়ে আসছিলাম সেটি নদীর ঘাটে গিয়ে শেষ হয়েছে। কুটিরটিতে যেতে হলে অসমান মাঠ, শুকনো নর্দমা আর ভাঙাচোরা ইট-পাথরের ওপর দিয়ে এগোতে হবে।

ঘাটে এসে চারিদিকে তাকালাম। সেই দিনের সেই সকালে প্রকৃতি-দেবী তাঁর সমস্ত সৌন্দর্য অকৃপণ হাতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আমার চোখের সামনে। সারা আকাশ লাল হয়ে উঠেছে; পূর্বপ্রান্তে সূর্যোদয়ের আভা, নদীতে পড়েছে তার ছায়া। সেই আবীরগোলা জলের ওপর দিয়ে নাচতে

নাচতে ছুটে চলেছে কয়েকটি সাম্পান (চট্টগ্রামের বিশেষ ধরণের নৌকা), বড় নৌকার মাঝিরা পাল তুলে মাঝদরিয়ায় যাবার চেষ্টা করছে; দূরে নোঙর করা দু-একটি স্টীমলঞ্চ, তাদের এখনো ঘুম ভাঙে নি। কোন এক সাম্পানের মাঝি দেশীয় সুরে অবোধ্য ভাষায় গান ধরেছে—সে গানের সুরও এই বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে এক ছন্দে গাঁথা।

কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ছিলাম নীরবে। তারপর বুকভরে নদীর বাতাস নিয়ে এগিয়ে চললাম সেই বন্ধুর পথে কুটিরের উদ্দেশ্যে। কি ভাবছিলাম তখন? হায় রে প্রকৃতির অজস্র সম্পদ! আমার মনের মধ্যে তখন অন্য প্রকৃতির লীলাখেলা চলছে। ভাবছি, আজ নিশ্চয় এরা আমাকে একটা রিভলভার দেখাবে, আর শিখিয়েও দেবে তার গোপন তথ্য—কোন্ অঙ্গে কেমন করে হস্তস্পর্শ করলে একটা শুধু শব্দ, ব্যস্—একজন ইংরেজ রাজপুরুষ খতম।

সেই বয়সে বিপ্লব সম্বন্ধে এর বেশি ধারণা এগোয় নি। চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহের আগে ভারতবাসীর কাছে ইংরেজের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার কল্পনা আকাশকুসুম মাত্র ছিল। অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকদের হত্যা করে, সরকারী অর্থ এবং সরকার-সাহায্য-পুষ্ট ধনীর অর্থ লুঠ করে, দেশময় একটা বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করে ইংরেজদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে এদেশে তাদের অর্থ এবং প্রাণ কোনটিই নিরাপদ নয়—এটাই ছিল সে যুগে বিপ্লবীদের মূল উদ্দেশ্য। আমি তখন সবেমাত্র বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে এসেছি; বিপ্লব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বয়স তখনও হয় নি, কাজেই একটিমাত্র রিভলভারই আমার কাছে বিপ্লবের সিংহদরজা খুলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

সেদিন সেই সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কী বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল তা' আমি জানতাম না। কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে সূর্যের ভাস্বর রূপ দেখবার প্রতীক্ষায় ছিলাম, কারণ তার পূর্বে কুটিরে ঢোকা নিষেধ ছিল। ভাবছিলাম এই সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের একমাত্র আশা সফল হবে, আমার হাতে আসবে একটি রিভলভার—আর সেই রিভলভারের গুলীর শব্দে ঘোষিত হবে ইংরেজ শাসনের প্রতিভূ কোন রাজপুরুষের মৃত্যুদন্ড। হৃৎপিন্ডের দ্রুতগতি নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছিলাম—আর কয়েক সেকেন্ড মাত্র, তার পরেই—। মূর্খ আমি, সেদিন কুটির থেকে ফেরার পথেও বুঝতে পারি নি সত্যিই অজান্তে আমার জীবনগগনে নব-অরুণোদয় হল—নবজীবনের মন্ত্রে দীক্ষার পথে হল প্রথম পদক্ষেপ।

সঙ্কেত মত দরজায় ধাক্কা দিতে কুটিরের দরজা খুলে গেল, বুকের ওপর তিনটে আঙুলে সঙ্কেতচিহ্ন এঁকে দিয়ে বোঝালাম আমি মিত্রপক্ষের লোক। ঘরের মধ্যে একটিমাত্র খাট, আর একজন মাত্র লোক—তাঁর চেহারা হাবভাব কিছুই আমার স্বপ্নে গড়া বিপ্লবী নেতার অনুরূপ নয় যার কাছ থেকে পাব আমি আগ্নেয়াস্ত্রে দীক্ষা। তিনি কিন্তু আমাকে দেখে চিনলেন, বললেন, "ও বুঝেছি, তুমি অনন্ত। তোমার কথা আমি শুনেছি"—তারপর একটু হেসে প্রশংসার সুরে বললেন—"তুমি তো তোমাদের স্কুলের রামমূর্তি!"

এখানে একটু ইতিহাস আছে। ছোটবেলায় বাবা যখন মা-দিদিকে বিপ্লবীদের কাহিনী বলতেন—ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, প্রফুল্ল চাকী প্রভৃতির নানা

চমকপ্রদ কাহিনী—তখন তা' শুনে শুনে সেই বয়সেই নিজেকে ভবিষ্যতের বিপ্লবীরূপে কল্পনা করতাম। বড় হয়ে স্কুলে ভর্তি হয়ে সৌভাগ্যবশত প্রমোদ, গণেশ, আফ্‌সরউদ্দীন ও অন্য মেধাবী ছাত্রদের সঙ্গ পেয়েছিলাম। স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রবন্ধুরা সকলেই আমাদের এই উৎসাহী দলটিকে পছন্দ করতেন। তাঁদের আশীর্বাদ ও সহযোগিতা আমাদের ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু তখন পর্যন্ত আমাদের কার্যধারা সীমিত ছিল স্কুল ম্যাগাজিন, ডিবেটিং ক্লাব এবং Physical culture Association-এর মধ্যে।

এই সময়ে শহরে এলেন রামমূর্তি—দেখালেন তাঁর অবিশ্বাস্য শারীরিক ক্ষমতা—বিরাট হাতী বুকে তুলে, লোহার ভারী শেকল ভেঙে ফেলে, মোটর-গাড়ির গতিরোধ করে যুবকসমাজে আলোড়ন জাগিয়ে দিলেন—আর চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর একটি ছাত্রকে নিজের অজান্তে দীক্ষা দিয়ে গেলেন। সেদিন থেকে আমার ধ্যানজ্ঞান হল কি করে প্রোফেসার রামমূর্তির মত শক্তির অধিকারী হব।

শুরু হল একলব্যের সাধনা। হাতীর দুষ্প্রাপ্যতা বিচলিত করতে পারল না আমাকে—বসবার বেঞ্চ বুকে নিয়ে তার ওপর দাঁড় করালাম আটজন ছাত্রকে, শেকলের অভাব মোচন করল মোটা দড়ি, আর মোটর গাড়ির বদলে কুড়িজন ছাত্রের বিরুদ্ধে একা দড়ি টানাটানি করে স্থির রইলাম।

এতেও কিন্তু শিষ্যের তৃপ্তি হল না। গুরুর মত প্রদর্শনীর আয়োজন না করলে শক্তি সঞ্চয় তো বৃথা! তার ব্যবস্থাও হল। মনে আছে দিনটি ছিল শুক্রবার, কারণ মুসলমানদের সাপ্তাহিক নমাজের দিন বলে একঘণ্টা টিফিনের ছুটি ছিল। এ সুযোগ কাজে লাগানো গেল। পূর্বাহ্নের আয়োজন ও বিজ্ঞপ্তি অনুসারে মাঠের একপাশে জড়ো হল ছাত্রেরা। প্রমোদ চৌধুরী পরিচয় করিয়ে দিল আমাকে সকলের সামনে, "প্রোফেসার এ সিং—ইনি আজ আমাদের এই সভায় অদ্ভুত শারীরিক ক্ষমতার নিদর্শন দেখাবেন"—সবাই কৌতুকে হাততালি দিয়ে উঠলো।

আমি তখন চলনে বলনে একেবারে প্রোফেসার রামমূর্তি—ইউনিফর্ম পরে ইংরাজীতে কথা বলতে শুরু করেছি। একে একে সবরকম ক্রিয়াকৌশল দেখালাম। সমবেত ছাত্ররা উৎসাহে, আনন্দে, কৌতুকে বারবার হাততালিতে ফেটে পড়ছে। তখন বুঝিনি আমার ক্ষমতার প্রদর্শনীর চেয়ে রামমূর্তির অনুকরণ ভঙ্গীটাই তারা বেশি উপভোগ করেছিল।

তাই সেদিন অপরিচিত মুখে সেই ঘটনার উল্লেখে কুণ্ঠিত হলেও একটু-খানি গর্বও অনুভব করেছিলাম। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি—বয়সই বা কি—তাই প্রশংসা ভালই লেগেছিল। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য তখন ভিন্ন। ঘরের চারি-দিকে তাকিয়ে দেখছি কোথায় সেই অজ্ঞাত রত্নটি লুকানো থাকতে পারে? ঘরের একটিমাত্র খাটে মাদুর পাতা, বালিশ নেই। একটি টেবিল, বুকশেল্‌ফে কয়েকটি বই, ব্যস্‌। সব দিনের আলোর মতই পরিষ্কার। একটা আলমারি বা একটা ট্রাঙ্ক পর্যন্ত নেই যে, যেখান থেকে হঠাৎ দেখা দেবে আমার চির-ঈপ্সিত সাধনার ধন একটি রিভলভার। নদীর ধারে এই নির্জন কুটিরটিকে

পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য দান করেছে কেবলমাত্র একটি কালীমূর্তি, আর অতি সাধারণ চেহারার একজন অসাধারণ লোক।

আমার চোখের দৃষ্টিতে যে হতাশা প্রকাশ পেয়েছিল তা' তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। প্রশ্ন করলেন, "মনে হচ্ছে তুমি নিরাশ হয়েছ! এখানে কি দেখতে পাবে আশা করেছিলে?"

—"ভেবেছিলাম একটা রিভলভার পাব, আর কি করে ছুঁড়তে হয়—"

—"রিভলভার? কেন আমি ত পুলিশও হতে পারি? যদি তোমাকে ধরিয়ে দিই!"

—"না না, আপনি পুলিশ নন। কখনই না।"

—"যাক্ গে। আসল কথা, আমার কোন রিভলভার নেই, তোমাকে দিতেও পারব না।"

—"একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

—"আপনি কি একজন স্বদেশী? আপনি কি নিজে রাজনৈতিক ডাকাতি করেছেন, সাহেব মেরেছেন?"

দ্বিধাহীন শান্ত সুরে উত্তর পেলাম,—"না, এমন কিছু করি নি এখনো যা' বলে তোমাকে খুশি করতে পারি।" কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। আমার মুখে নিরাশার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি তা বুঝতে পেরেই ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করলেন,—

"রামমূর্তি আর দেশপ্রেমিক কি এক? দেশকর্মী হতে হলে, বিপ্লবী হতে হলে, মনকে আগে প্রস্তুত করতে হবে—শুধু শারীরিক শক্তিই যথেষ্ট নয়।"

কথাটা খুব ভাল বুঝতে পারলাম না। প্রশ্ন করলে বালকসুলভ অজ্ঞতা প্রকাশ পাবে কি না ভেবে ইতস্ততঃ করছি—দেখি তাঁর মুখ আরও গম্ভীর আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো,—তাঁর ধীর গভীর কণ্ঠস্বরে ছোট ঘরটির বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল—

"বুকের ওপর হাত রেখে ভেবে দেখ—ভেবে দেখ কতখানি তোমার মনের শক্তি। মনে কর পুলিশ তোমার ওপর অমানুষিক অত্যাচার করছে—পারবে তুমি তোমার ঠোঁট বন্ধ করে রাখতে? ভাল করে ভেবে বল, দেশের জন্য বিপ্লবের জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে? মুহূর্তের নির্দেশে পারবে তুমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে—শাসকের সদাজাগ্রত রক্তচক্ষুর অন্তরালে দিনের পর দিন অনাহারে অনিদ্রায় পথে পথে ঘুরে বেড়াতে?"

এ প্রশ্নের উত্তর আমার তৈরিই ছিল,—কিন্তু তিনি বাধা দিলেন,—"না, আজ নয়। বাড়ি যাও, এক সপ্তাহ সময় দিলাম—ভাল করে ভেবে দেখ। তারপর আমাকে জানিয়ে যেও আমার প্রশ্নের উত্তর।"

বোধ হয় ভেবেছিলেন এ কথার পর আমি চলে যাব। কিন্তু আমি বসেই রইলাম। কেন, তা' নিজেও জানি না। ভাবছিলাম আরো কিছু বলবেন, কিম্বা আরো কিছু শুনতে চাইছিলাম—এখন ঠিক মনে নেই। উঠতে ইচ্ছা করছিল না, এটাই মনে আছে।

আমার মনের ভাব বুঝে তিনি তখন অন্য কথা তুললেন—দেবীচৌধু-

রাণীর কথা। ভবানী পাঠক কি করে বছরের পর বছর তাঁকে শিক্ষা দিয়ে পরীক্ষা করে তৈরি করে নিলেন—কাঁচা লোহাকে ইস্পাতের তলোয়ারে পরিণত করে যুদ্ধের উপযোগী করে তুললেন; বললেন—"দেবীচৌধুরাণী পড়, আনন্দ-মঠ পড়—আমার কথা বুঝতে পারবে আরো ভাল করে।"

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। এখন আর মাথায় রিভলভারের চিন্তা নেই—যাদুকরের যাদুকাঠিতে শান্ত হয়েছে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, ঘুমিয়ে পড়েছে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাস। একদিন প্রোফেসার রামমূর্তির সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ দেখে মন অশান্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, আজ এই ক্ষীণকায় লোকটির সংস্পর্শে এসে সেই চঞ্চলতার পরিবর্তে দেখা দিল স্থির প্রশান্তি। আমি নিজের মনের মধ্যে ডুবে গিয়ে তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম, সত্যিই কতদূর আমার শক্তির পরিধি। আর ভাবতে লাগলাম শীর্ণদেহী অথচ অসামান্য মানসিক শক্তির অধিকারী কে এই ব্যক্তি?

তখন সেই ১৯১৮ সালে কে জানতো যে চট্টগ্রাম শহরের একপ্রান্তে কর্ণ-ফুলী নদীর তীরে ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন এক কুটিরের একান্ত নির্জনতায় সমাহিত রয়েছেন ভারতের একজন মহান দেশপ্রেমিক ও সর্বজনবরেণ্য বিপ্লবী নেতা? কে জানত যে আত্মজিজ্ঞাসায় মগ্ন সেই নিরীহ শিক্ষকের স্থির প্রশান্ত চোখ দুটি একদিন জ্বলে উঠে মাতৃভূমির দ্বিশতাব্দীব্যাপী অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হবে? রবার্ট ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের বেইমানীর প্রতি-শোধ—১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য বর্বর অমানুষিক অত্যা-চারের প্রতিশোধ—জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ! কে জানত যে অতি সাধারণ চেহারার এই মানুষটিকে চট্টগ্রামের বীর সন্তানেরা বিনা দ্বিধায় তাদের অবিসংবাদী নেতা বলে মেনে নিয়ে তাঁর পতাকা তলে সমবেত হবে! কে জানত সেই শীর্ণ বাহু ও ততোধিক শীর্ণ পদযুগলের অধিকারী একদিন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাজশক্তির বৃহত্তম আয়োজনকে ব্যর্থ করে—তার সমস্ত ক্ষমতাকে উপহাস করে বৎসরের পর বৎসর চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলবে?

কে এই মহাপ্রাণ মহাবিপ্লবী?

ইনিই মাস্টারদা, আমাদের প্রিয়তম নেতা, মাস্টারদা—মাস্টার সূর্য সেন, যাঁর কিছুটা বর্ণনা দেওয়া সম্ভব একমাত্র কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের ভাষায়, —"সেদিন বর্মা অয়েল কোম্পানীর কারখানা ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম;...... কালো পাহাড়ের মত একটা প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড,—কিন্তু জড়পিণ্ডের বেশি সে আর কিছুই নয়। হঠাৎ তার একটা দরজা খুলে যেতে মনে হল যেন গর্ভেতে তার অগ্নির প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। সেখানে এই পৃথিবীটাকেও তাল করে ফেলে দিলে নিমেষে ভস্মসাৎ করে দেবে। শুনলাম সে একাই নাকি এই বিরাট কারখানা চালিয়ে দিতে পারে। দরজা বন্ধ হল আবার সেই শান্ত জড়পিণ্ড, ভিতরের কোন প্রকাশই বাইরে নেই।........."

সেদিন পূর্বদিগন্তে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর এক নতুন সূর্যের সঙ্গে পরিচয় হল আমার। সূর্য সেনের প্রাণের দীপ্তিতে জ্বলে উঠল অনি-র্বাণ অগ্নিশিখা। আদি শ্লোক রচনার পূর্বাহ্নে মহর্ষি বাল্মীকির অশান্ত হৃদয়ের মত স্বাধীনতার সৈনিকের জিজ্ঞাসা ঘুরে বেড়াচ্ছিল দিশাহারা হয়ে—

কে হবে তার পথপ্রদর্শক, কে হবে নেতা, কে হবে সেনাপতি? সে প্রশ্নের উত্তর মিলল যখন, তখন আর মনে কোন দ্বিধা রইল না।

সর্বজনপূজ্য নেতাকে সেনাপতি পদে বরণ করে সৈনিক আজ তৃপ্ত গর্বিত। শুধু সে জানতে চায় সেনাপতির আদেশের মর্যাদা কি সে রক্ষা করেছে? যে দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছিল সে কি তা' পালন করতে পেরেছে?

কিন্তু কে দেবে উত্তর? সেনাপতি আজ আর পৃথিবীতে নেই। মাতৃভূমির অপমানের জ্বালা বুকে নিয়ে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের মত চট্টগ্রাম জেলার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আগুনের শিখা জ্বালিয়ে চলেছিলেন তিনি; কিন্তু একদিন মীরজাফরের উত্তরপুরুষ বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেনের জঘন্য চক্রান্তে অতর্কিতে মিলিটারী বেষ্টনীতে পড়ে তিনি ধরা পড়লেন—তাঁর ফাঁসী হ'ল। কিন্তু নেত্র সেনকেও এই হীনতম পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ল। দেশপ্রেমিক জনগণের বিচারশালার চির উদ্যত শাণিত খড়্গের আঘাতে তার দেহ বিচ্ছিন্ন, মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত হ'ল। বিশ্বাস-ঘাতকের ধূলি-লুণ্ঠিত ছিন্ন মস্তক ভারতবাসীর অন্তরে এক বিন্দু করুণা বা সহানুভূতির উদ্রেক করল না—করল শুধু ঘৃণা ও ধিক্কারের। সে আর এক কাহিনী। সে কাহিনী এই স্মৃতিচিত্রের যথাস্থানে বিবৃত করা হবে।

মাস্টারদার সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী জীবনে যে সব সূক্ষ্ম অতিসূক্ষ্ম অনুভূতি ও উপলব্ধির পথ খুঁজে পেয়েছি তা প্রত্যক্ষভাবে আর কারো কাছে পাই নি। আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন এবং সুযোগ হলে এখনও বহু বন্ধুবান্ধব জিজ্ঞাসা করেন মাস্টারদা সম্বন্ধে। তাঁরা জানতে চান কোন্ মহৎ গুণে তিনি অতজন বিপ্লবী সংগঠকদের ও কর্মীদের পরিচালনা করেছিলেন? কি করে তাঁর পক্ষে সম্ভব হল সমকালীন ও সমপর্যায়ের বিপ্লবী সংগঠকদের একতা অখণ্ড ও অটুট রাখতে? মাস্টারদার সেই সম্মোহন ক্ষমতার গূঢ় তথ্য যা আমার জ্ঞানবুদ্ধিতে বুঝেছিলাম তা' এক কথায় বা অল্প কথায় বলা যায় না। তবু এক কথায় বলতে হবে মাস্টারদা ছিলেন সীমাহীন, অন্তহীন গভীর স্বদেশপ্রেমের এক জাজ্জ্বল্যমান বিপ্লবী প্রতীক ও আপোষহীন সশস্ত্র সংগ্রামের চিরন্তন উৎস। মাস্টারদার বিপ্লবী জীবনের ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গকে সমষ্টিগতভাবে বুঝতে পারলে তবেই সেই মহান্ বিপ্লবীকে চুম্বকে বোঝা যেতে পারে। তাই এই অগ্নিযুগের অধ্যায়ের বর্ণনার মধ্যে দেখতে পাব মাস্টারদার বিপ্লবী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি, অতিশয় সঙ্কট মুহূর্তে তাঁর তীক্ষ্ম দূরদৃষ্টি ও তৎকালীন সীমিত কর্মসূচী সম্পাদনে তাঁর সুনির্দিষ্ট নির্দেশ।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র অভিযানের অধ্যায়টি লেখার জন্য আমার প্রয়াস সেটি মাস্টারদার বিপ্লবী জীবনেরই ধারাবাহিক চিত্র। মাস্টারদাকে ঘিরে ছিলাম আমরা। আমাদের সবার সমষ্টিই হলেন মাস্টারদা। তবু তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল অতি সূক্ষ্ম ও গভীর বৈপ্লবিক চরিত্রে। যদি মাস্টারদার বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য খুঁজে বেড়াই সশস্ত্র প্রস্তুতি, বিভিন্ন অস্ত্রশিক্ষা, ঘোড়ায় চড়া বা মোটর চালানো শিক্ষার বাহ্যিক ক্ষেত্রে তবে আমাদের নিরাশ হ'তে হবে। চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহের বাহ্যিক চিত্রটিই সব নয়। সংগঠন ও প্রস্তুতির পথে জটিল সমস্যার সমাধান, গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা ও অতি সঙ্কটজনক

মুহূর্তে বৈপ্লবিক নির্দেশ দান প্রভৃতি মাস্টারদার জীবনের আড়ম্বরহীন, প্রকাশহীন গভীরতম দিক। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহকে সার্থক করেছে—তাঁর সেই অপরিহার্য ভূমিকা। সশস্ত্র প্রস্তুতি ও আক্রমণের বাহ্যিক অথচ অতি প্রয়োজনীয় সহস্র কার্যকলাপের অন্তরালে মাস্টারদার এই বৈপ্লবিক অবদান যদি অনুধাবন করা না যায় তবে এই সার্থক অধ্যায়ের অপরিহার্য বিষয়বস্তু ইতিহাসের পাতা থেকে বাদ পড়ে যাবে। তাই সন্ধিক্ষণে মাস্টারদার নির্ভুল নির্দেশ ও জটিল সমস্যার সহজ সমাধান—যে সমস্ত ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে বিরাট রূপে প্রতিফলিত হয়েছে তা সেই সমস্ত ব্যাপারের সংস্পর্শে যথাস্থানে প্রকাশ করা যুক্তিসংগত হবে—এবং তা' হলেই বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টি ও স্থির মস্তিষ্কের নির্দেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে।

মাস্টারদার সঙ্গে যখন আমার দেখা হল তখন আমার দৃষ্টি খুঁজে বেড়াচ্ছিল একটি রিভলভার। মাস্টারদার কুটিরটি ও তাঁর ছোট্ট ক্ষীণকায় দেহ দেখে আমি নিরুৎসাহ হয়েছিলাম। তবু সোজা প্রশ্ন করে জেনে নিতে চেয়েছিলাম—তিনি স্বদেশী ডাকাতি ও বৃটিশ সরকারের প্রতিভূ—কোন সাহেবকে হত্যা করেছিলেন কিনা। অতি সোজা প্রশ্ন! অতি প্রয়োজনীয় তথ্য! যদি অগ্নিযুগের নেতার রাজনৈতিক ডাকাতির বা সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শত্রুকে নিহত করবার অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে তাঁর কাছ থেকে কি শিখতে পারবো? বিপ্লবী সভ্যদের এইরূপ সোজা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নেতাদের পক্ষে কত শক্ত! প্রশ্ন শুনেই সাধারণত অসাধারণ ক্ষমতাবান বিপ্লবী নেতা ছাড়া প্রায় সব ক্ষেত্রেই তেমন তেমন বিপ্লবী নেতা খুব স্বাভাবিকভাবে আশঙ্কা করবেন যে, যদি এরকম কোন ব্যক্তিগত বিপ্লবী কার্যের অধিকারী তিনি না হন, তবে সত্যকথা বললে হয়ত বা প্রশ্নকারী সেই উৎসাহী বিপ্লবী যুবককে তিনি হারাবেন। এখানেই অন্যান্যদের তুলনায় মাস্টারদার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি।

আমার লেখার মধ্যে কাউকে ছোট করবার ইচ্ছে আমার নেই। তবে মাস্টারদার বিশেষ দিকটি প্রকাশ করার ইচ্ছে আমার আছে। তাই একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করছি।

বিপ্লবীদের আমরা জানতাম "স্বদেশী" নামে। আমার বন্ধু আফ্‌সার-উদ্দীন একদিন আমাকে পাথরঘাটার এক মেসে নিয়ে যায়। সে আমার সঙ্গে একজনের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, "উনি একজন স্কুলের শিক্ষক, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই যে, উনি দেশের মুক্তিযুদ্ধে সৈনিক হ'তে প্রস্তুত।" তাঁর বয়স ও বলিষ্ঠ দেহ দেখে এবং তাঁর ঘরটিতে একটি কালীমূর্তি যখন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তখন আমি আপনা থেকেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে পড়ি। আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি এমন একজন গুরু, যিনি আমাকে বিপ্লবের পথে দীক্ষা দেবেন। আমার কিশোর মনে তাঁকে দেখেই ধারণা হয়েছিল উনি একজন স্বদেশী—অর্থাৎ লর্ড কার্জনের আমলে বাংলায় যে রক্তযুগের সূত্রপাত হয় সে সময় রাজনৈতিক ডাকাতি, হত্যা, ইত্যাদিতে যোগ দিয়ে তিনি নিশ্চয়ই বন্দী বা অন্তরীণ ছিলেন।

মনের উদ্বেগ আর সামলাতে পারলাম না। খোলাখুলিভাবে তাঁকেও সেই একই প্রশ্ন করলাম—"আপনি কি রাজনৈতিক ডাকাতি বা সাহেব হত্যা

করেছেন? আপনি কি বৃটিশ কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন?" আশ্চর্য! তিনি কিন্তু আমার সেই ধারণা ভাঙতে চেষ্টা করেন নি! ভাবে জানালেন আমার ধারণাই সত্য। তিনি সেদিন থেকেই আমার কাছে দেবতা হয়ে উঠ্‌লেন। পরে যেদিন জান্‌তে পারলাম তিনিও সেই সময় মাস্টারদার সমপর্যায়ের একজন বিপ্লবী নেতা এবং তিনিও তখন পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে কোনরূপ সন্ত্রাস সৃষ্টির ভূমিকা গ্রহণ করেন নি বা জেলও খাটেন নি অথচ আমার কাছে মিথ্যা ভাণ করেছেন, তখন সেই আঘাত সহ্য করা আমার মত ভাব-প্রবণ কিশোরের পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন সশস্ত্র আক্রমণের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন বল্‌লে আমাকে বিপ্লবী দলে টানা সহজ হবে। কিন্তু এই মিথ্যা বড়াইয়ের চেষ্টা যে কত ভুল—নিজেকে কত অসার প্রতিপন্ন করে তা' বোঝবার ক্ষমতা সকলের থাকে না; তাঁরও ছিল না। এখানেই অন্যদের সঙ্গে মাস্টারদার পার্থক্য, এখানেই মাস্টারদার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। আজ ভাবতেও শিউরে উঠ্‌ছি—যদি মাস্টারদার সাক্ষাৎ আমি না পেতাম—আর সূর্যসেনের পরিবর্তে যদি চট্টগ্রামের বিপ্লবী তরুণদল এ হেন নেতার নেতৃত্বাধীনে থাক্‌ত!

পৃথিবীতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের মনে বঞ্চনা ও হতাশার বেদনা যখন পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে ও সামান্য ইন্ধনের অপেক্ষা মাত্র থাকে, তখন উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে তা স্ফুলিঙ্গের মত হঠাৎ জ্বলে উঠে এক ফুৎকারেই নিভে যায়। সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস ও গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের পূর্ববর্তী অগ্নিযুগের ইতিহাস এইরকমই অসংগঠিত বিপ্লবের কাহিনী। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং মাতৃভূমির প্রতি আবেগময় অনুভূতিই ছিল সেই দিন আমাদের একমাত্র সম্বল। দেশ-মাতৃকার স্বাধীনতা—এই মন্ত্র বুকে নিয়ে ঘরের আরাম তুচ্ছ করে যে তরুণদল বেরিয়ে পড়েছিল, তারা দেশের নেতাদের কাছ থেকে সশস্ত্র বিদ্রোহের নির্দেশ পায় নি, শ্রেণী-সচেতনতা তাদের বিপ্লবের প্রকৃত রূপটি দেখতে সাহায্য করে নি; গান্ধীজীর অহিংসা মন্ত্রও তখন দেশের তরুণদের ডাক দেয় নি—কংগ্রেসের নরম পন্থায় তাদের মন বিন্দুমাত্র আস্থা খুঁজে পায় নি। শুধু ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল, সত্যেন বসু ও অন্যান্য মরণজয়ী বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের আদর্শ সামনে নিয়ে এগিয়ে চলছিল তারা। তাই সংঘবদ্ধ আন্দোলনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধিদের হত্যা করাটাই বিপ্লবের পথ বলে মনে করা হত।

ক্ষুব্ধ মনের প্রতিক্রিয়া—রক্তের বদলে রক্ত, অত্যাচারের জবাবে অত্যাচার, —এইটিই মূল মন্ত্র বলে মেনে নিয়েছিল বিপ্লবী তরুণদল। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবকদের আদর্শ ছিল সোজা ও সুস্পষ্ট—বৃটিশ রাজশক্তির কবল থেকে মাতৃ-ভূমির মুক্তি। তাদের কর্মপন্থাও ছিল তদনুরূপ সংক্ষিপ্ত ও জটিলতা মুক্ত—সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ অফিসারদের হত্যা করে তাদের মধ্যে ত্রাস সঞ্চার করা ও তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যে এ দেশে তাদের জীবন নিরাপদ নয়। এই আদর্শ ও কর্মপন্থা গ্রহণ করবার আরও উদ্দেশ্য ছিল দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের সামনে—আত্মত্যাগ ও বীর্যের নিদর্শন স্থাপন করে তাদেরও অনুরূপ কার্যে উদ্বুদ্ধ করা—যেন বৃটিশের গুলী, ফাঁসির দড়ি বা দ্বীপান্তরের বিভীষিকা

যুব-বিপ্লবের এই ধরনের গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাশ সৃষ্টির অগ্রগতিকে রুদ্ধ ও নিশ্চল করে দিতে সমর্থ না হয়।

উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচী এরকম হওয়ায় স্বভাবতই দেশ জুড়ে একটা আন্দোলন গড়বার চেষ্টা হয় নি। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতারা নিজেদের শক্তি ও বুদ্ধি অনুসারে ছোট ছোট বিপ্লবী দল গড়েছেন এবং তৎকালীন বিপ্লবী কর্মসূচী কার্যে পরিণত করার জন্য তাঁরা সভ্যদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। ১৯১৮ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতারা দলের সদস্যদের যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতেন তা' শ্রীঅরবিন্দ, কানাইলাল, ক্ষুদিরাম—এঁদের সময় থেকে খানিকটা আলাদা হলেও মূল নীতির দিক থেকে একই বলা যেতে পারে।

কিন্তু ১৯২৮ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ আমাদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটবার আগের সময়টাতে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণা করেছিল। চট্টগ্রাম শহরে বৃটিশের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারলে তাকে কেন্দ্র করে সারা বাংলায় বিপ্লবীদলে আলোড়ন হবে, সর্বত্র একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে বৃটিশকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশের মুক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে—এরকম একটা অপরিণত ধারণা আমাদের মনে ছিল। আর ভেবেছিলাম যদি সফল না-ও হই, তবু দেশের যুবকদের বিপ্লবের পথে প্রেরণা দিতে পারবো—আমাদের আত্মত্যাগ ও আন্তরিক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার উদাহরণ দেখিয়ে।

এখন ১৯১৮ সালে ফিরে যাচ্ছি, যখন সবেমাত্র অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছি। আমাদের প্রাত্যহিক রুটিন ছিল ধরাবাঁধা—সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে উঠে মা কালীর কাছে প্রার্থনা, প্রয়োজন মত ব্যায়াম, ভাগবদ্গীতা থেকে খানিকটা অংশ পাঠ, তারপর নিজের মনের ভাব বিশ্লেষণ করে প্রাত্যহিক ডায়েরী লেখা: এর পরে ব্যক্তিগতভাবে নেতাদের সঙ্গে দেখা করা, তারপর সকলে একত্রে বসে রাজনীতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা।

চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের কেন্দ্র গঠিত হয়েছিল নিম্নলিখিত পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে—

১। সূর্য সেন (মাস্টারদা)—ন্যাশনাল হাই স্কুলের সিনিয়র গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক।

২। অনুরূপ সেন—চব্বিশ পরগনায় বুরুল হাই স্কুলের গ্র্যাজুয়েট সহকারী প্রধান শিক্ষক। (আদিনিবাস চট্টগ্রাম)।

৩। নগেন সেন (জুলু সেন)—৪৯নং বেঙ্গল রেজিমেণ্টের ভূতপূর্ব সদস্য—প্রথম মহাযুদ্ধ প্রত্যাগত।

৪। অম্বিকা চক্রবর্তী—

৫। চারুবিকাশ দত্ত—

এ'দের অধীনে দলের প্রথম সারির সভ্য হল:—(১) নবীন, (২) সত্যেন, (৩) আফসরউদ্দীন, (৪) নারায়ণ, (৫) নির্মল সেন (নির্মলদা), (৬) প্রমোদ চৌধুরী, (৭) যশোদা, (৮) নন্দ সিং (আমার দাদা), (৯) অবনী ভট্টাচার্য এবং (১০) আমি—অনন্ত সিং। দলের প্রথম সারির অন্তর্গত হলেও এ'রা সকলেই

যে প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী ছিলেন তা' কিন্তু বলা যায় না; কারণ এ'দের মধ্যে কেউ কেউ কোনো সক্রিয় কাজে যোগ দেবার আগেই বিপ্লব জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এটা বলা বাহুল্য যে প্রথম কোন সংগঠন, বিশেষ করে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তোলার সময় যোগ্যতা অনুসারেই সকল সদস্য গৃহীত হবে সে আশা করা যায় না। চলার পথে পরীক্ষা ক্ষেত্রেই তাদের যোগ্যতার বিচার হওয়া সম্ভব। বিপ্লবের বন্ধুর পথের কাঠিন্য ও আত্মত্যাগের বাস্তব চিন্তার সম্মুখীন হয়ে অতি উৎসাহী যুবকেরও গতি ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে আসে। সেই কারণে আমরা দশজন সর্বপ্রথম দলে যোগ দিয়েছিলাম বলেই প্রথম সারিতে ছিলাম, কিন্তু যোগ্যতার পরিচয় দেওয়ার সময় আমাদের মধ্যে অনেকেরই বিদায় নিতে হয়েছে।

আমরা প্রথম সারির দশজনও এক সঙ্গে বা এক সময়ে সদস্যভুক্ত হই নি। আমরা যখন সদস্যপদ লাভ করলাম আমাদের উপর নির্দেশ ছিল বিপ্লবী দলের সদস্য হবার উপযুক্ত লোক খুঁজে বার করা ও তাদের দলভুক্ত করে নেওয়া। নির্দেশ মত উঠে পড়ে কাজে লেগে গেলাম। "Charity begins at home." সুতরাং প্রথমেই নজর পড়লো আমার দাদা ও দিদির দিকে, তারপর আমার পিসতুতো বোন শকুন্তলা ও হিরন্ময়ীর দিকে। ধীরে ধীরে সমস্ত পরিবারটিই চলে এলো আমাদের বিপ্লবীদলের সমর্থনে—বাবা মা সবাই।

তারপর এল ক্লাসের বন্ধুরা। আফসরউদ্দীন আর গণেশ ছিল ভাল ছাত্র ও পরস্পর বন্ধু। জানি না কেন আফসরউদ্দীন গণেশকে দলে টানতে চায় নি। আমার তখনো কিন্তু প্রতি মুহূর্তে মনে হত গণেশকে বলি সব কথা! সে আমার বিশেষ বন্ধু, আর তা'ছাড়া ক্লাসের ভাল ছাত্র। আমার ধারণা ছিল যারা মেধাবী ও পরিশ্রমী তারা আমাদের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা জানলে নিশ্চয়ই দলে যোগ দিতে দ্বিধা করবে না। ইতিহাস জানে আমার এ ধারণা মিথ্যে নয়। প্রকৃতপক্ষে দেশের সেরা ছেলেরাই সেদিন দেশপ্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল—সহস্র মন একসূত্রে বাঁধা হয়েছিল, সহস্র জীবন এক কার্যে সঁপে দেওয়া হয়েছিল।

কতবার ভেবেছি আমার প্রিয়বন্ধু গণেশকে বলি আমার নতুন জীবনের কথা—কতবার বলতে গিয়েও বলা হয়ে ওঠে নি। দ্বিধার একটু কারণও ছিল। আমাদের ক্লাসে বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করত যে ছেলেটি, ভেবেছিলাম তার মেধা, তার বিচার-বুদ্ধি তাকে দেশমাতৃকার বন্ধন মোচনের মন্ত্রে দীক্ষা নিতে অনুপ্রাণিত করবে। অনেক আশা বুকে নিয়ে তাকে বলেছিলাম বিপ্লবী-দলে যোগ দিতে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সে এক কথায় এড়িয়ে গেল। তাই তখন গণেশকে বলতে গিয়েও বারবার ফিরে এসেছি, ভেবেছি যদি সে-ও নিরাশ করে! যদি সে বলে, "না, আমি ছাত্র, এখন লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময়, বাজে হুজুগে যোগ দিয়ে কি হবে?" তখন সেই প্রত্যাখ্যান কি আমি সহ্য করতে পারবো? এখন বুঝতে পারি গণেশের সঙ্গে সেই ছাত্রটির তুলনা চলে না। কিন্তু সেদিন তো বুঝতে পারি নি কাঁচ আর কাঞ্চনে প্রভেদ! তাই ভয় ছিল আমার সব কাজের সঙ্গী—আমার প্রিয়তম বন্ধু গণেশ যদি আমাকে বলে, "না, তোমার পথে আমি যেতে চাই না"—তবে কি আমার সমস্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে না?

এই আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও বিপ্লবের যে উজ্জ্বল আশাভরা চিত্র চোখের সামনে রয়েছে, গণেশ তার অংশীদার হবে না—এ কথা চিন্তা করাও আমার কাছে কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। তাই একদিন দ্বিধা সংকোচ ত্যাগ করে বলেই ফেললাম কথাটা।

ফল পাঠকের অজানা নয়। গণেশ তো শুনে লাফিয়ে উঠলো। পারলে তখনি গিয়ে নেতাদের সঙ্গে দেখা করে। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নেবার জন্য, দেশের মুক্তি যুদ্ধে সৈনিকের দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য সে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল। আমি তাকে নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করলাম মাত্র। তারপর যখন সে আমার দ্বিধার কথা শুনলো, তখন তার তিরস্কার ও অনুযোগে আমিই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। বারবার ক্ষমা চাইলাম তার দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার প্রতি মনে সন্দেহ পোষণ করেছিলাম বলে।

এক কথায় ঘটনাটা বললেও আমরা কিন্তু হঠাৎ একদিন কাউকে বলতাম না যে, 'এস, বিপ্লবী দলে যোগ দাও।' নানা রকম আলোচনা করে আগে তার মন বুঝতে হত, পুলিশের গুপ্তচর কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে হত, তারপর ধীরে ধীরে কথায় কথায় তাকে প্রশ্ন করা হত যে, এ রকম কোন দলের সঙ্গে সে কাজ করতে ইচ্ছুক কি না। এসব বিষয়েও আমরা নেতাদের কাছ থেকে নির্দেশ পেতাম। তার ওপর নিজের বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করে অগ্রসর হতে হত।

বিপ্লব সম্বন্ধে ধারণা আমাদের কি রকম ছিল তা তো আগেই বলেছি। সে যুগে আমাদের নেতারা মাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি, ডি ভ্যালেরা, লেনিন, সান ইয়াৎসেন ইত্যাদি সবাইকে একই পর্যায়ে ফেলে তাঁদের দেশপ্রেম ও বীরত্বের কাহিনী শোনাতেন—শোনাতেন ক্ষুদিরাম, কানাইলালের আত্মোৎসর্গের কথা, আর শোনাতেন বালাসোরে বুড়ীবালামের তীরে যতীন মুখার্জীর নেতৃত্বে চিত্তপ্রিয় ও অন্যান্য বিপ্লবীদের জীবনপণ যুদ্ধের কাহিনী।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিপ্লবের কাহিনী আমরা পড়তাম—মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হত বৃটিশ সরকারের প্রতি ঘৃণা; মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতাম। দেশপ্রেমের মহামন্ত্র কানে দিয়ে নেতারা শেখাতেন কেমন করে সশস্ত্র শত্রু-বাহিনীর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে সাহস ও বীরত্বের জোরে জয়ী হব, কেমন করেই বা মৃত্যুকে তুচ্ছ করে হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি বরণ করবার ক্ষমতা অর্জন করবো। বৃটিশ শক্তির সমস্ত অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে এতদিনকার শোষণ-শাসন ও অবিচার অপমানের প্রতিশোধ নেব—এ বিষয়ে আমরা ছিলাম স্থির-সঙ্কল্প। তখন বুদ্ধিজীবী পার্লামেন্টারী প্রতিযোগিতার যুগ নয়; বিচারের চেয়ে হৃদয়ের প্রয়োজন ছিল বেশি, চিন্তার চেয়ে কার্যের। মাস্টারদার নেতৃত্বে সে যুগের উপযোগী হয়েই গড়ে উঠেছিলাম—নির্ভীক আবেগ চঞ্চল একদল যোদ্ধা।

পাঁচজন নেতার কথা উল্লেখ করেছি আগে। এঁদের মধ্যে অনুরূপদার নাম পরে আর শোনা যায় নি। ১৯২৩-২৪ সালে কিম্বা ১৯৩০ সালে যদি তিনি আমাদের মধ্যে থাকতেন তবে হয়ত, আমার মনে হয়, তিনিই হতেন দলের প্রধান পরিচালক। কারণ মাস্টারদা, জুলুদা, অম্বিকাদা—তিনজনেই তাঁকে সম্মান করতেন। বহু ক্ষেত্রে অনুরূপদার যুক্তিই তাঁরা মেনে চলতেন।

তাঁর সুস্থ দেহ দেখে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নি যে অপরিণত বয়সে বিপ্লবের সমস্ত আয়োজন অসম্পূর্ণ রেখে নিঃশব্দে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন। আমরা জেলে বিনা বিচারে আটক থাকার সময়—১৯২৬ সালের শেষের দিকে তিনি কঠিন রক্ত-আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন, ঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে গ্রামে অন্তরীণ থাকা অবস্থাতেই তিনি মারা যান। সেদিন কেউ কাঁদল না, কেউ জানলো না বাংলাদেশের আরো একটি তরুণ সূর্য অকালে অস্তমিত হল।

ভাল বলতে পারতেন, ভাল লিখতে পারতেন অনুরূপদা; অল্প কথায় নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারতেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের গোপন সংবিধান রচনা করেছিলেন তিনিই—পরে সেটা অনুমোদন করি আমরা সকলে। অসহযোগ আন্দোলনের সময়, প্রায় আড়াই বছর, অনুরূপদার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পেয়েছি আমি। তখন তিনি ছিলেন বুরুল স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আর আমি ছিলাম মাণিকতলার বি. টি. ইনস্টিটিউশনের (বর্তমান যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ) ছাত্র। সেই সময় লক্ষ্য করেছি তাঁর বৈপ্লবিক নিষ্ঠা ও প্রতিভা, ইস্পাতের মত দৃঢ়তা অথচ মানুষকে বশ করবার অসীম ক্ষমতা। বুরুল গ্রামের বহু গৃহস্থের গৃহকোণ তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র রক্ষণের কেন্দ্র ছিল। গ্রামের যুবকরা ছিল তাঁর একান্ত অনুগত।

একটা ঘটনা খুব স্পষ্ট মনে আছে। জুলুদার নির্দেশে একটি অটোমেটিক্ পিস্তল আনতে গিয়েছি। অনুরূপদার সঙ্গে সেই আমার বুরুলে প্রথম দেখা। আমি যে যাবো তা তাঁকে আগে জানানো হয় নি। তাই একটু বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হলেন তিনি। সন্দেহ দূর করলাম আমি সঙ্কেত বাক্য বলে—"খোকা।" নিশ্চিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—"কোন্ পিস্তলটা চাই তোমার ?" —"জুলুদা বলেছেন ৭ সট্ অটোমেটিক্ পিস্তল, যাতে 'S+S' এই চিহ্ন আর একটা বাড়তি ম্যাগাজিন আছে।"

কখন নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল জানি না। বিকেল নাগাদ জিনিসটা এসে গেল—একজন প্রিয়দর্শন বলিষ্ঠ যুবক নিঃশব্দে হাতের প্যাকেটটি রেখে গেল অনুরূপদার বিছানায়। সে চলে যাবার পর প্যাকেট খোলা হল। মুগ্ধ-চোখে তাকিয়ে দেখলাম। রিভলভারের ট্রেনিং ভালভাবে হলেও পিস্তল সম্বন্ধে আমি তখনও অজ্ঞ ছিলাম। যে অস্ত্র চালাতে জানি না তা' বহন করা আমার কাছে নিয়ম বিরুদ্ধ বলে মনে হত। তাই অনুরূপদাকে অনুরোধ করলাম এর রহস্য উদ্ঘাটন করে দেখাতে।

মাস্টারদা বা অনুরূপদা—কেউই তখন অস্ত্র চালনায় খুব দক্ষ ছিলেন না। শারীরিক নয়, মানসিক শক্তির জোরেই তাঁরা বড় হয়ে উঠেছিলেন—বিপ্লবের পথে অটল ছিলেন।

পরে যখন ছোট ছোট আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার শিক্ষার জন্য সৈন্যবিভাগের ছাপানো বই পড়েছি তখন জেনেছি কোনো গুলীভর্তি অস্ত্রের ব্যবহার শেখাবার সময় বন্দুক বা পিস্তল প্রভৃতির মুখটি—হয় মাটির দিকে, নয় তো আকাশের দিকে রাখতে হয়। নইলে হঠাৎ গুলী ছুটে গিয়ে সামনের কোন জিনিসকে আঘাত করতে পারে। আগ্নেয়াস্ত্রের বিপজ্জনক ক্রিয়া সম্বন্ধে অনুরূপদার সঠিক উপলব্ধি ছিল না আর এই নিয়মটাও জানতেন না। কারণ

অসাবধানে হাত পড়ে হঠাৎ কি থেকে কি হয়ে গেল! ক্লিক্ করে একটা শব্দ—আমার কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে কি বেরিয়ে গেল—তারপরই রান্না-ঘরে রাঁধুনীর আর্তনাদ। তার ডান হাতে সামান্য ক্ষত সৃষ্টি করে গুলীটি তখন মেঝেতে গিয়ে পড়েছে।

অনুরূপদা বিস্ময়ে বিমূঢ়। যখন বুঝলেন সত্যিই আমি অক্ষত দেহে আছি তখন তাড়াতাড়ি পিস্তলটা লুকিয়ে ফেলে রান্না ঘরে ছুটলেন। রাঁধুনীর শারীরিক আঘাত সামান্য—প্রাথমিক চিকিৎসাতেই আয়ত্তে আনা গেল। কিন্তু পিস্তলের সামান্য আওয়াজ নির্জন গ্রামের অধিবাসীদের কানে পোঁছে গেছে। সেইজন্য তখন রাঁধুনীর মানসিক চিকিৎসারই প্রয়োজন বেশি। সে তো আর বিপ্লবী দলের লোক নয়—এই 'সাংঘাতিক' ঘটনা লোকের কাছে বলতে ছাড়বে কেন? অনেক কষ্টে কোনমতে বুঝিয়ে তাকে শান্ত করা গেল।

পিস্তল, কার্তুজ, ম্যাগাজিন সব গুছিয়ে আমার হাতে দিয়ে অনুরূপদা বললেন, "পালাও শীগ্গির।"

পালাবার জন্য প্রস্তুতই ছিলাম। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ছুটে যাবার উপায় নেই, লোকে সন্দেহ করবে। ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। একবার পেছন ফিরে দেখি মেসের দরজায় রীতিমতো ভিড়: থানা বেশি দূরে নয়। এর মধ্যেই সেখানে খবর পোঁছে গেছে; একজন ইউনিফর্ম পরা পুলিশ অফিসার একটি কনস্টেবলকে নিয়ে সেই ভিড়ের দিকে এগিয়ে আসছেন।

আমি এ অঞ্চলে অপরিচিত। ধরা পড়বার সম্ভাবনা বেশি। স্টেশনের দিকে দ্রুত পা চালালাম।

সেই রাত্রেই পিস্তলটি নিয়ে আমি কলকাতায় চলে এলাম। আমাদের সংগঠনের জন্য অর্থের প্রয়োজন—সেই অর্থ সংগ্রহের জন্য ডাকাতি করতে হবে, যাকে সেযুগে বলা হত স্বদেশী ডাকাতি—এরকম একটা অভিপ্রায় আমাদের ছিল। তবে এ বিষয়ে দ্বিধাও ছিল প্রচুর। দ্বিধার কারণ, সেই সময়ে ১৯২২ সালে যখন অগ্নিযুগের আগুন বাইরে থেকে নির্বাপিত হয়ে দেশের যুবকদের মনে তুষের আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলছে, তখন এরকম একটা ডাকাতির অর্থ—পুলিশকে সতর্ক করে দেওয়া যে আবার সশস্ত্র রাজ-নৈতিক আন্দোলনের গোপন প্রস্তুতি চলছে। তাই অস্ত্র সংগ্রহের জন্য অর্থের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আমরা চট্ করে কোথাও ডাকাতি করতে চাইছিলাম না। আবার কোথা থেকে যে অত টাকা পাবো সেও একটা দারুণ সমস্যা হয়ে উঠেছিল। অবিলম্বে প্রচুর টাকা চাই আর সে টাকা সংগ্রহ করতে হবে পুলিশের অগোচরে।

যে সময়ের কথা বলছি তখন গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন পুরোদমে চলছে। ছাত্ররা বেরিয়ে এসেছে স্কুল-কলেজ ছেড়ে; আইনজীবীরা আদালত ত্যাগ করেছেন; বিশেষ বিশেষ দিনে সর্বত্র হরতাল পালিত হচ্ছে—সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে চলেছে সভা-শোভাযাত্রা। সে এক নতুন যুগ, নব-জাগরণ! নেতাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে দেশবাসী—বৃটিশ পণ্য বয়কট্ করে, বিলাতী কাপড়ে আগুন ধরিয়ে, দলে দলে পিকেটিং আর শোভাযাত্রায়

যোগ দিয়ে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাদের মনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও ঘৃণার পরিচয় দিচ্ছে।

ভারতের পূর্বপ্রান্তে পার্বত্য শহর এই চট্টগ্রামেও সে ঢেউ-এর দোলা এসে লেগেছে। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন মহিম দাস, ত্রিপুরা চৌধুরী, কাজেম আলি সাহেব—আন্দোলন পরিচালনা করছেন তাঁরা। ১৯২১ সালে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে দু'টি ঐতিহাসিক ধর্মঘট হওয়ায় চট্টগ্রামের নাম ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতবর্ষে; প্রথমটি 'বুলক্ ব্রাদার্স' নামে বিলাতী স্টীমার কোম্পানীর ধর্মঘট, দ্বিতীয় 'আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে' ধর্মঘট।

আমাদের গোপন বিপ্লবী দলের সদস্যরাও পিছিয়ে নেই। সূর্য সেন ও অনুরূপ সেনের নেতৃত্বে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে অসহযোগ আন্দোলনে। স্কুল-কলেজের ধর্মঘট এবং ঐ দু'টি বড় ধর্মঘটে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে আমাদের রাজনৈতিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। যে সময়ের কথা নিয়ে এই অধ্যায় সুরু করেছি, অর্থাৎ ১৯২২ সালের মাঝা-মাঝি, তখন আমরা দেড় বছর ধরে অহিংস আন্দোলন করে রাজনীতির ক্ষেত্রে খানিকটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি।

এর মধ্যে তিনবার বাবার সঙ্গে আমার মনোমালিন্য হওয়ায় তিনবার বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়ে আন্দোলনে যোগ দিতে হয়েছে। কিশোর বয়সের প্রথম উত্তেজনা, আদর্শের জন্য প্রাণ দানের আগ্রহ, পিতার উদ্যত ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে মুক্তি-সৈনিকের দায়িত্ব গ্রহণে প্রেরণা দিয়েছে।

মনে আছে, আরো অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী পিতার মত, আমার বাবাও, আমাকে নিরস্ত করবার জন্য কত যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছিলেন—কত রকম ভয় দেখিয়েছিলেন! কিন্তু তাতে আমার মনের দৃঢ়তাই শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে, বাবার উদ্দেশ্য সফল হয় নি। বাবা বলেছিলেন—

"দেখ, তুমি আন্দোলনে যোগ দাও তাতে আমার আপত্তি নেই; কিন্তু আগে গান্ধীজী, সি. আর. দাস—এ'দের মত বড় হও, শিক্ষিত হও, তবে তো? তুমি এখনো কত ছোট! পৃথিবীতে যে সব স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছে তার ইতিহাস তুমি কিছুই পড় নি। আগে নিজেকে তৈরি কর। কিছু না বুঝে শুনে হুজুগে পড়ে আন্দোলনে যোগ দিয়ে কি হবে?"

বাবার এই ধরনের যুক্তির উত্তরে কি বলতে হবে জানতাম না। তবু নিজের সাধারণ বুদ্ধিতে যা এসেছে বলেছি—

"না বাবা, তুমি যা বল্‌ছ তা স্বার্থপরের মত কথা। স্বাধীনতার জন্য, দুশো বছরের পরাধীনতার শেকল ভাঙবার জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছে। এখনি এই মুহূর্তে যে যেমন অবস্থায় আছে তাকে এগিয়ে আসতে হবে। এখন যদি আমি এবং আমার মত আরো লক্ষ লক্ষ ছেলে বলে যে আগে গান্ধীজীর মত হই তখন যোগ দেব,—তবে এখন এই আন্দোলন চলবে কি করে? ডাক যখন এসেছে, সে ডাকে সবাইকে সমানভাবে সাড়া দিতে হবে......।"

এরপর বাবা অন্য পথ ধরেছেন—

"নিরস্ত্র দেশবাসী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কি করে দাঁড়াবে? সরকার

তো নির্মমভাবে আন্দোলন ধ্বংস করবে। কী করতে পেরেছ এতদিনে তোমরা? দলে দলে লোক জেলে গিয়েছে; কতজনের ফাঁসি হয়েছে, দ্বীপান্তর হয়েছে,—পুলিশ আর মিলিটারী এসে অত্যাচার চালিয়েছে, সব নষ্ট করে দিয়েছে! এ সব পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কি? এরকম পাগলামীকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট কর না।"

সত্যিই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস কিছুই পড়ি নি। তবু মনে যে ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল তা থেকে উত্তর দিলাম—

"হ্যাঁ, এ পর্যন্ত সব আন্দোলনই ধ্বংস হয়েছে এটা ঠিক। ভবিষ্যতেও এরকম হবে: বৃটিশ সরকার প্রাণপণ শক্তিতে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ করে দেবে। কিন্তু একদিন আসবে যেদিন আমরা জয়ী হব: সেই আন্দোলনই শেষ—। জানি না সেই শুভদিন কবে আসবে—এখনি, না আরো অনেকদিন পরে! কিন্তু তাই ভেবে ত হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারব না। সকলেই যদি এই ভেবে বসে থাকে যে 'সেই শেষ আন্দোলনে যোগ দেব', তবে সেইদিন আর কখনই আসবে না।"

আমার এইসব যুক্তি-তর্কের অবশ্য কোনই দাম নেই বাবার কাছে। তাঁর মতে তাঁর আদেশ আমাকে মানতেই হবে। এইসব বাজে হুজুগ থেকে সরে আসতে হবে। আমি কিন্তু বাবার হুকুম মেনে সরে আসতে পারলাম না—আদেশ অমান্য করতে হল।

ছাত্র ধর্মঘট সফল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি তখন। আমাদের স্কুলের হেড মাস্টার স্বর্গীয় দুর্গামোহন গুহ মহাশয় আমার বাবাকে চিঠি লিখে জানালেন যে, আমার নাম যেন স্কুল থেকে কাটিয়ে নেওয়া হয়। কারণ তাঁর মতে আমিই ছাত্র-ধর্মঘটের 'রিং-লিডার' বা 'প্রধান নেতা'।

স্কুলে পড়বার ইচ্ছে তখন আমার নেই। অসহযোগ আন্দোলনের পুরো-ভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন গান্ধীজী এবং দেশবন্ধু। কলকাতায় ১৯২০ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি লালা লাজপত রায় ডাক দিয়েছেন দেশবাসীকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। ইংরেজের সংগে কোন বন্ধুত্ব নয়। কেউ যাবে না ইংরেজের অফিস-আদালতে, কেউ ঢুকবে না স্কুলের গোলামখানায় ইংরেজের চাকর তৈরি হবার আশায়। দেশবন্ধু ছেড়ে দিয়েছেন আদালত যাওয়া। গান্ধীজী আর দেশবন্ধুর ডাকে আমরা বেরিয়ে এসেছি স্কুল থেকে। ইংরেজের হুকুম মত চলে যে বিদ্যালয়, সেখানে আমরা আর যাব না।

এই উদ্দেশ্য সফল করতে তখন স্কুলে স্কুলে গ্রুপ মিটিং করছি। কলেজ এবং স্কুলগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা হচ্ছে যাতে একযোগে সর্বত্র ধর্মঘট শুরু হয়।

দেশবন্ধু আসবেন চট্টগ্রামে—তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার আয়োজন চলছে। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাদের এই সমস্ত কাণ্ড-কারখানা দেখে ভয় খেয়ে গেলেন। সমস্ত স্কুলগুলি সাত দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল যাতে ছাত্ররা স্কুলে এসে জড় হতে না পারে।

কিন্তু আন্দোলনের বন্যা যখন আসে তখন কোন বাধাই ঠেকাতে পারে না তাকে। এই সাতদিন আমরা প্রত্যেক স্কুলের অগ্রণী ছাত্রদের বাড়ী বাড়ী

গিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে কর্মপন্থা স্থির করতে লাগলাম। যেদিন স্কুল খুলবে সেদিন থেকেই বিদ্যালয় বর্জন করা হবে—এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

সাতদিন পর নির্ধারিত সময়ে স্কুলের দরজা খোলা হল। আমি মিউনিসিপ্যাল স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়তাম। সেই স্কুলের ভার আমার ওপর। স্কুল বসবার আগে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে উঁচু ক্লাসগুলিতে গিয়ে ছাত্রদের কাছে আবেদন জানাতে শুরু করলাম এই 'গোলামখানা' ছেড়ে যেন তারা বেরিয়ে আসে।

এমন সময় আমাদের ক্লাস-টিচার আমাকে বল্‌লেন যে হেড মাস্টার মশাই আমাকে ডাকছেন। একটু ইতস্তত করছিলাম, কারণ এখনি ঘন্টা পড়বে, আমি না থাকলে হয়ত ছাত্ররা শিক্ষকদের ভয়ে ক্লাসে ঢুকে পড়বে। তবু যেতে হল, কারণ তাঁর আদেশ অমান্য করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা।

লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখি অন্য শিক্ষকদের মধ্যে হেড মাস্টার মশাই বসে আছেন। সোজা হয়ে দাঁড়ালাম তাঁর সামনে নির্ভয়ে। একটুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে দেখে নীরবতা ভঙ্গ করলেন তিনি,—

"অনন্ত, তোমার বাবা স্কুল থেকে তোমার নাম কাটিয়ে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে তুমি স্কুলে এসে শৃঙ্খলা ভঙ্গ কর, এটা আমরা চাই না।"

আমি বুক ফুলিয়ে উত্তর দিলাম,—"স্যার, চিরকালের জন্য গোলামখানা ছেড়ে চলে যাব, আর আসব না।"

ঠিক তক্ষুণি একজন শিক্ষক বললেন,—"ক্লাসের সময় হয়েছে: দপ্তরীকে ঘন্টা দিতে বলি?"

"হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি"—আদেশ দিলেন হেড মাস্টার।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি তখনও দশ মিনিট বাকি—ক্লাস বসতে। মুহূর্তে এঁদের উদ্দেশ্যটা বুঝে নিলাম—আমাকে আটকে রেখে ওদিকে ক্লাস বসিয়ে দেবেন। কিন্তু আমি অত সহজে ঠকতে রাজী নই। ওঁদের কিছু বুঝবার অবসর না দিয়ে হেড মাস্টার মশাই ও অন্যান্য শিক্ষকদের নত হয়ে প্রণাম জানিয়ে একেবারে ছুটে বেরিয়ে এলাম লাইব্রেরী ঘর থেকে।

ঘন্টা তখন বাজতে শুরু করেছে। ক্লাস টিচার ঢুকবার আগেই আমি ক্লাসে ঢুকে আমার বন্ধুদের সম্বোধন করে বক্তৃতা দিতে লাগলাম। সংক্ষিপ্ত আবেদনের পর সমবেত ধ্বনি উঠ্‌ল— "বন্দে মাতরম্", "আল্লা হো আকবর", এবং "গান্ধীজী কী জয়"।

ধীরে ধীরে ক্লাস শূন্য হয়ে গেল। শুধু বেঞ্চি আর চেয়ার-টেবিল ছাড়া শিক্ষকের বক্তৃতা শুনবার জন্য আর কেউ রইল না। আমার সঙ্গীরা অন্যান্য ক্লাসে গিয়ে ঐভাবেই ছাত্রদের ডাক দিল। সমস্ত স্কুল ভেঙে ছাত্ররা এসে দাঁড়াল আমাদের পেছনে—তারপর সমবেতকণ্ঠে ধ্বনি তুলতে তুলতে বিরাট শোভাযাত্রা চলল রাজপথ দিয়ে।

চল্‌তে চল্‌তে একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, স্কুলের বারান্দায় শিক্ষকমণ্ডলীর সঙ্গে প্রধান শিক্ষক বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের প্রতি আন্তরিক স্নেহ এবং দেশের কাজের জন্য সহানুভূতি থাকা

সত্ত্বেও তাঁরা যে বিদ্যালয়ের মধ্যে এরকম বিশৃঙ্খলা দেখে অসন্তুষ্ট হয়েছেন তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

তাঁদের এ অসন্তোষ পরে আমরা দূর করেছি। অসহযোগ আন্দোলনে আমাদের দায়িত্ববোধ এবং দৃঢ়তা, তারপর ১৯২৩-২৪ সালের ব্যক্তিগত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা, আমাদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ মামলার বিচার, জেল অন্তরীণ (internment) শেষে মুক্তি পাবার পর শরীর চর্চা ও যুবসংগঠন এবং সর্বশেষে ১৯৩০-এর সশস্ত্র অভ্যুত্থান—তাঁদের মনের সমস্ত সংশয়-বিরাগ দূর করে আমাদের প্রতি স্নেহ-প্রীতিতে অভিষিক্ত করে দিয়েছেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন কেবল হুজুগে মেতে আমরা সেদিন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিনি; দেশকে বিদেশী শাসনমুক্ত করব—এই সঙ্কল্প চিরদিন অটুট রেখেছি।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যখন শহরে রীতিমত সাড়া পড়ে গেছে ঠিক তখনি একজন জনপ্রিয় কর্মচারীকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে 'বুলক্ ব্রাদার্স' নামে এক স্টীমার কোম্পানীতে ধর্মঘট শুরু হয়। বৃটিশ কর্তারা একেই এই আন্দোলনকে দমন করবার উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না, আবার বিলিতী কোম্পানীতে ধর্মঘট শুরু হওয়ায় অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়লেন। তাঁদের সহযোগিতায় কোম্পানী কর্তৃপক্ষ অনমনীয় মনোভাব নিয়ে বসে রইল।

ধর্মঘটের দশম দিনে একটা মজার ঘটনা ঘটল। এস্. এস্. লঙ্কা নামে কোম্পানীর একটি জাহাজ চট্টগ্রাম ও রেঙ্গুনের মধ্যে যাতায়াত করত। সেই জাহাজটি কর্ণফুলী নদীতে নোঙর করা ছিল। নবম দিনের রাত্রে আমরা অল্প কয়েকজন অতি সন্তর্পণে নাবিকদের ব্যবহার করবার একটি পথ দিয়ে গোপনে জাহাজে পৌঁছলাম। নাবিকদের সঙ্গে কথা বলে ধর্মঘটে তাদের যোগ দিতে রাজী করানো হল।

পরদিন জাহাজ জেটী ছেড়ে একটু দূরে যেতেই দেখা গেল তার ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে, আর নাবিকরা সব ঝুপ ঝুপ করে জলে পড়ে সাঁতরে তীরে চলে আসছে।

তীরে দাঁড়িয়ে আছেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন বিরাট এক মিছিলের পুরোভাগে। নির্দিষ্ট সময় মত এই ব্যবস্থা করবার জন্যই আমাদের গভীর রাত্রে জাহাজে যেতে হয়েছিল।

ত্রয়োদশ দিনে গভর্ণমেন্ট প্রায় বারো জন ধর্মঘটী নেতাকে গ্রেপ্তার করল। তার মধ্যে ছিল আমার বন্ধু প্রেমানন্দ। সে আমার প্রতিবেশী, আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়। চট্টগ্রাম বন্দরে প্রিভেন্টিভ অফিসার ছিল সে। দেশবন্ধু আইনব্যবসা ছেড়ে দেবার পর প্রথম যেবার চট্টগ্রামে আসেন সেবারই সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসের কাজে যোগ দেয়। আমাদের গুপ্ত বিপ্লবী দলের সঙ্গে তখনো তার যোগসূত্র স্থাপিত হয় নি।

চৌদ্দ দিনের দিন শান্তিপূর্ণ কংগ্রেস শোভাযাত্রার ওপর কর্তৃপক্ষের আক্রমণ শুরু হল। ধর্মঘটের নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে যতীন্দ্রমোহন এবং জেলা কংগ্রেসের অন্যান্য কর্মীদের নেতৃত্বে বিরাট শোভাযাত্রা চলেছিল রাজপথ দিয়ে। বর্বর আক্রোশে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশ-বাহিনী তাদের লাঠি, বন্দুক আর বেয়নেট নিয়ে।

জেলা-শাসক ছিলেন তখন 'মিস্টার স্ট্রং'। নামে 'স্ট্রং' হলেও আসলে তিনি ছিলেন রোগা, লম্বা, কুঁজো। চেহারা দিয়ে তো আর ক্ষমতার বিচার হয় না। সমস্ত জেলা তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে। তাঁরই আদেশে বন্দী হলেন নেতারা, বন্দী হলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

আমি আর গণেশ সামনা সামনি সব কিছুই দেখলাম। এত সামান্য কারণে বন্দিত্ব বরণ করবার ইচ্ছে ছিল না, তাই শোভাযাত্রায় যাই নি আমরা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রীদের ওপর পুলিশের অত্যাচার লক্ষ্য করছিলাম। আর, তখনই মনে মনে ভাবছিলাম, এই পথে চললে কি পাব যা চাই আমরা?

শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার ওপর পুলিশের এই তীব্র আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের জনগণ এবার গর্জন করে উঠল। শহরের সাধারণ মানুষ, যারা আন্দোলনে এসে যোগ দেয় নি, শিশু-নারী-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল, এল আশেপাশের গ্রাম থেকে নিরীহ শান্তি-প্রিয় মানুষেরা—জনারণ্যের স্রোত এগিয়ে চলল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কেউ তাদের ডাকে নি, কেউ বলে নি 'চল, চল'।

সেই বিরাট মনুষ্যস্রোত এসে জড় হল জেলের সামনে। সারা রাত বসে রইল তারা। অপেক্ষা করতে লাগল তাদের প্রিয় নেতাদের জন্য। সকাল বেলা যখন বন্দীদের নিয়ে পুলিশের গাড়ি চলল আদালতের দিকে, তখন জনতাও চলল তাদের সঙ্গে।

শহরের মাঝখানে একটি পাহাড়ের ওপর আদালত-ভবন। পাহাড়ের নিচের রাস্তা থেকে আরম্ভ করে পাহাড়ের ওপরে আদালতের চারিদিক ঘিরে শিশু-বৃদ্ধ-নর-নারীর ভিড়—কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই। গাছের ডালে ডালে লোক বসে আছে। মোটরগাড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে দেখছে সবাই। কয়েক সহস্র কণ্ঠে মাঝে মাঝে ধ্বনিত হচ্ছে সমবেত আওয়াজ—"বন্দে মাতরম্", "আল্লা হো আকবর"। গগনবিদারী শব্দে স্পন্দিত হচ্ছে আদালত-ভবনের প্রতিটি কক্ষ। তারই একটাতে বিচারক-পদে আসীন 'স্ট্রংম্যান'। মিস্টার স্ট্রং-এর হৃদয়ও কি বারেবারে কেঁপে কেঁপে উঠছে না ভবিষ্যতের আশঙ্কায়?

সেই আশঙ্কাই জেলা-শাসককে আপোষ-মীমাংসার ব্যবস্থা করতে বাধ্য করল। আদালতে আলোচনার পর 'বুলক্ ব্রাদার্স' নতি স্বীকার করল।

ধর্মঘটের অভূতপূর্ব সাফল্যে চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠল। আদালতের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—বিরাট জনতাকে সম্বোধন করে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। এখনো চোখের সামনে জেগে ওঠে সেই নির্ভীক প্রশান্ত মূর্তি, কানে আসে সেই দৃপ্ত কণ্ঠস্বর:

"এই যে ক'দিন থেকে পুলিশের অত্যাচার চলেছে, গুর্খারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, বেপরোয়াভাবে গভর্ণমেন্ট দমন-নীতি প্রয়োগ করেছে,—তার প্রতিবাদ করছি——ঘোর প্রতিবাদ করছি! আমি গভর্ণমেন্টকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি—ক্ষান্ত হও! এখনো ক্ষান্ত হও, নইলে তোমাদের পরিতাপের সীমা থাকবে না!"

সেদিন সেই বক্তৃতা শোনার পর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম চট্টগ্রামের শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের ওপর এই পুলিশী অত্যাচারের—এই হিংস্রতার প্রতিশোধ নিতেই হবে। অত্যাচারীর দম্ভের উপযুক্ত জবাব আমরা দেব।

এক মাসের মধ্যেই চট্টগ্রামের বুকে আবার গণ-আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগল। গান্ধীজী দেশবাসীকে ডাক দিয়ে বললেন,—"আমাকে এক কোটি টাকা আর এক কোটি স্বেচ্ছা-সৈনিক দাও—আমি তোমাদের এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেব।"

এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আন্দোলনের জন্য যখন প্রস্তুতি চলছে চট্টগ্রামে, তখনই এল আর একটি ধর্মঘটের ডাক।

চা-বাগানের শ্রমিকদের একটি বিরাট দল মালিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বাগান ছেড়ে এসে চাঁদপুর রেলওয়ে এবং স্টীমার স্টেশনে জড় হয়েছিল। বিভাগীয় কমিশনার কে. সি. দে'র আদেশে পুলিশ এবং গুর্খা সৈন্য এই দরিদ্র অসহায় শ্রমিকদের ওপর নির্বিচারে অত্যাচার চালাল। বুটের লাথি, বেয়নেটের গুঁতো, বন্দুকের গুলী—কোন কিছুই তারা বাদ দিল না; উপরন্তু মৃত আহত মজুরদের নদীতে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল।

নিরীহ চা-বাগান-শ্রমিকদের ওপর এই বর্বর অত্যাচার ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের কাহিনী এসে পৌঁছল চট্টগ্রাম শহরে—তার ওপর শোনা গেল স্টেশন মাস্টার চারুবাবু আহত হয়ে বন্দী হয়েছেন। রাত্রি একটার সময় খবর এল। সেই রাত্রেই বিভিন্ন দলের নেতারা জেলা-কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হলেন যতীন্দ্রমোহনের বাড়ীতে। গভর্ণমেণ্টের এই পৈশাচিক প্রতিহিংসাপরায়ণতা প্রতিটি সাধারণ মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে তুলল—যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে সহস্র চট্টগ্রামবাসী একতাবদ্ধ হয়ে স্থির সংকল্প করল—এই অত্যাচারের সমুচিত জবাব দিতে হবে।

চা-বাগান শ্রমিকদের দাবি-দাওয়ার সমর্থনে এবং নিজস্ব কয়েকটি দাবির ভিত্তিতে শুরু হল আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট। যতীন্দ্রমোহনের আহ্বানে প্রত্যেকটি রেলশ্রমিক যোগ দিল ধর্মঘট সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য। শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করল। কেরানীরা কলম বন্ধ করল,—আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের কর্মীরা একযোগে সেই অবিস্মরণীয় ধর্মঘটকে সফল করে তুলতে বদ্ধপরিকর হল।

এই ধর্মঘটে যতীন্দ্রমোহনের পাশে এসে দাঁড়ালেন গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির নেতারা—সূর্য সেন, অনুরূপ সেন, চারুবিকাশ দত্ত, গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী, আর এলেন যুব নেতা বিনয় সেন, সতীশ নাগ, সুখেন্দু সেনগুপ্ত, প্রেমানন্দ, সিরাজুল হক এবং আরো অনেকে। এই বিরাট ধর্মঘটকে সফল করে তুলবার জন্য আমরাও রাতদিন খাটতে লাগলাম। তিন মাস ধরে চলল স্ট্রাইক,—কত বাধাবিপত্তি, কত দুঃখকষ্ট অতিক্রম করে!

নব্বুই দিন ধরে পাঁচ থেকে দশ হাজার পর্যন্ত ধর্মঘটী কর্মীদের বিভিন্ন ক্যাম্পে খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঘরে ঘরে ভিক্ষে করে, পথে পথে চাঁদা তুলে, দিন চালান হত। কত স্বদেশ-প্রেমিক ধনী অকাতরে দান করেছেন, মেয়েরা হাসিমুখে গায়ের গয়না খুলে দিয়েছেন। ধর্মঘটকে সফল করব, অত্যাচারী সরকারের কাছে মাথা নত করব না—এই ছিল চট্টগ্রামবাসীর প্রতিজ্ঞা।

নেতারাও বিস্মিত হয়েছিলেন সাধারণ মানুষের এই অসাধারণ দৃঢ়তা দেখে। কত রাতে দেখেছি গান্ধী-ময়দানে ধর্মঘটীদের সঙ্গে জনসাধারণ এসে

একত্রে সভা করেছে—সারা রাত ধরে চলেছে বক্তৃতা—সারা রাত ধরে স্লোগানে স্লোগানে চট্টগ্রামের আকাশ বিদীর্ণ হয়েছে।

এতদিন ধরে টাকা তুলে, অন্ন, বস্ত্র, ওষুধপথ্য জোগাড় করে ধর্মঘটীদের সাহায্য করা—এবং সর্বোপরি তাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ। প্রতি তিন-চার মাইল অন্তর আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ঘাঁটি ছিল যাতে ট্রেন বন্ধ থাকা সত্ত্বেও চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত প্রায় নব্বুই মাইল আমাদের নিজস্ব সাইকেলে ডাক চলাচল ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে। এ ছাড়া মাঝে মাঝে গ্রুপ মিটিং করে ধর্মঘটীদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা হত।

প্রথম মাসটা বেশ চলছিল। প্রথম চোটে অর্থ সাহায্যও বেশ পাওয়া গিয়েছিল, ধর্মঘটে যোগ দেবার উৎসাহও অটুট ছিল। যত দিন যেতে লাগল, কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাব দেখে ততই স্বভাবত দুর্বলচিত্ত লোকেরা ভয় পেতে লাগল। এদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক লোক কাজে যোগ দিতে লাগল।

তখন যতীন্দ্রমোহন অন্য নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে নির্দেশ দিলেন যে যারা কাজে যোগ দিচ্ছে তাদের বয়কট্ বা একঘরে করা হবে। অর্থাৎ তাদের বাড়ীতে কোন ঝি-চাকর কাজ করবে না। ধোপা-নাপিত বন্ধ, গোয়ালা দুধ দেবে না, ঝাড়ুদার ঝাঁট দেবে না। এই করে তখনকার মত তবু খানিকটা কাজে যোগ দেওয়া বন্ধ হল।

ধর্মঘট যখন প্রায় দু' মাস ধরে চলেছে তখন আবার কিছু কিছু লোক কাজে যাওয়া শুরু করল। এরা আবার অন্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। দানের টাকায় আর কতদিন চালাবে তারা? তার চেয়ে স্ট্রাইক ভাঙলে কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়বে। আমরাও প্রাণপণে আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করে চলেছি। সারাদিন স্নান নেই, খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই, ঘুম নেই—ধর্মঘটীদের মধ্যে প্রচার চালাচ্ছি আর টাকা-চাল-কাপড় যোগাড় করে যাচ্ছি।

এই অবস্থায় যখন কিছু কিছু লোক কাজে যোগ দিতে লাগল তখন আমরা নেতাদের নির্দেশে অন্য পথ ধরলাম। নানাভাবে এদের বিরক্ত করতাম, অপমান করতাম, আরও নানারকম বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে হাজার রকমে তাদের লোকচক্ষে হেয় করতাম।

শেষ পর্যন্ত অহিংস নীতি ছেড়ে এদের ওপর কিছু কিছু আক্রমণও চালাতে হল। ফলে কেউ হারাল কান, কেউ নাক, কেউ আঙুল, কেউ বা মাথার কয়েক ফোঁটা রক্ত। সঙ্গে সঙ্গে চলল ট্রেন লাইনচ্যুত করে ধ্বংসাত্মক কাজ চালান।

প্রথমে ছাত্রধর্মঘট, তারপর 'বুলক্ ব্রাদার্স' এবং এ. বি. রেলওয়ে ধর্মঘট —এ সবই হয়েছিল কংগ্রেসী নেতা যতীন্দ্রমোহন, মহিম দাস, ত্রিপুরা চৌধুরী এবং অন্যান্যদের নেতৃত্বে। তবে আমাদের গুপ্ত বিপ্লবীদলের সভ্যরা এতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। আমি এবং আমার সহকর্মীরা অন্য সমস্ত কাজ বন্ধ রেখে, নাওয়া খাওয়া ভুলে শুধু ধর্মঘটের কাজে লেগে-পড়ে ছিলাম; এক-দিকে ধর্মঘটীদের জন্য অন্নবস্ত্র আর অর্থসংগ্রহ—অন্যদিকে ধর্মঘট ভঙ্গকারী-দের শাস্তিদান ও ধ্বংসমূলক কাজ—এই দ্বিধাবিভক্ত প্রোগ্রামে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলাম।

জনসাধারণ কিন্তু এ সময়ে সম্পূর্ণ অহিংসভাবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল—কর্তৃপক্ষ তার জবাব দিচ্ছিল লাঠি, বুটের গুঁতো, সঙ্গীনের খোঁচা আর বন্দুকের গুলী দিয়ে। আমাদের বিপ্লবী নেতারা সব সময় সতর্ক ছিলেন যাতে দলের কোন কর্মীকে বন্দিত্ব বরণ করতে না হয়। কারণ তা হলে অহিংস আন্দোলনেই সমস্ত শক্তি ক্ষয় হয়ে যাবে,—ভবিষ্যতে হাতিয়ার নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করবার মত সামর্থ্য থাকবে না।

শেষ পর্যন্ত সরকার কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করলেন—যতীন্দ্রমোহন, কাজেম আলি মিয়া, ত্রিপুরা চৌধুরী, মহিম দাস এবং অন্যান্য নেতারা বন্দী হলেন। একটা বিচারের প্রহসন করে তাঁদের কলকাতা জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা হল।

মনে আছে সেদিনের কথা—জেল থেকে রেল-স্টেশন পর্যন্ত সমস্ত পথ লোকে লোকারণ্য, তিল ধারণের স্থান নেই। সবাই এসেছে তাদের প্রিয় নেতাদের দেখতে, যাঁদের এখনি পাঠিয়ে দেওয়া হবে নির্বাসনে—চট্টগ্রাম শহর থেকে বহু দূরে। বাড়ীর ছাদে, গাড়ির মাথায়, গাছের ওপরে, সর্বত্র লোকের ভিড়—নিশ্বাস নেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন ব্যাণ্ডপার্টির বাদ্য, বিলিতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব, বোমাবাজীর উৎসব আর ঘন ঘন আকাশ ফাটানো 'বন্দেমাতরম্', 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি—সব মিলে সেদিন যে দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল, চট্টগ্রামের লোকেরা তা কোনদিন ভুলতে পারবে না।

বন্ধ গাড়িতে কড়া পুলিশ পাহারায় নেতাদের যখন জেলের বাইরে আনা হল তখন জনতা ক্রোধে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে। কিন্তু মুখে ঐ এক 'বন্দেমাতরম্' আওয়াজ ও বিলিতী কাপড় পোড়ান ছাড়া আর কোনরকম সে ক্ষোভ প্রকাশ করবার পথ নেই।

বন্ধুদের সঙ্গে স্টেশনের দিকে পা বাড়ালাম নেতাদের সঙ্গে শেষ দেখা করবার আশায়। স্টেশনে পেঁছে দেখি সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, অন্ধকার প্লাটফর্মের প্রতিটি গেট বন্ধ করে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী মোতায়েন করা হয়েছে।

সামনের দরজা বন্ধ দেখে পেছনের পথ অবলম্বন করতে হল। রেল-লাইনগুলি পার হয়ে স্টেশন চত্বরে দাঁড়ান কয়েকটি ট্রেনের কামরার ভেতর দিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ালাম প্লাটফর্মে—দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনকে নিয়ে যাবার জন্য নির্দিষ্ট কামরাটির সামনে।

মিলিটারী এবং পুলিশ কর্ডনের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রিয়তম নেতাকে আনা হল কামরাটিতে। কিন্তু কি আশ্চর্য! যে জন-সমুদ্র দেখে এলাম বাইরে তার সামান্যতম অংশও প্লাটফর্ম পর্যন্ত এল না! তাদের 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিও তো শোনা যাচ্ছে না! ব্যাপার কি?

একই উপায়ে প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে যখন সামনের দিকে এসে স্টেশন রোড পেঁছলাম তখন বোঝা গেল কারণটা।

একদল গুর্খা সৈন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে ছিল। জনতার মিছিল স্টেশন রোড থেকে প্লাটফর্মমুখী হতেই এরা ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছে তাদের ওপর। অতর্কিতে এসে এই বিরাট জনতার ওপর আক্রমণ চালানোর ফলে সমস্ত মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে।

পোষাক-পরিচ্ছদ, জুতো, ঘড়ি, চশমা, মানিব্যাগ সব কার কোথায় পড়েছে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের গতি এবং তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে বাংলার অন্যান্য বিপ্লবীদের মত আমাদেরও মনে সংশয় ছিল। ধর্মঘটের সময় স্বতঃস্ফূর্ত গণ-বিক্ষোভ দেখে আমরা এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছিলাম। এমন সময় এই ঘটনা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে দিল। দেখলাম, এই বিরাট গণ-আন্দোলনেরও সমাপ্তি হল মাত্র কয়েকটি ভাড়াটে গুর্খা সৈন্যের আক্রমণে। নিরস্ত্র দেশবাসী সশস্ত্র সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কি ফল পেতে পারে?

নীতিগতভাবে বলা যায় যে, সশস্ত্র সৈন্যের আক্রমণেও যদি জনগণ অবিচলিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত তবে কি করতে পারত ঐ কটি মুষ্টিমেয় সৈন্য? কিন্তু জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এইরকম সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে থেকে গান্ধীজীর মত অবিচলিত ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়।

যখন শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সশস্ত্র-বাহিনী ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিল তখন আমরা একেবারে নিশ্চিত হলাম যে, কেবলমাত্র এইভাবে নিরস্ত্র বিক্ষোভেই আমরা স্বাধীনতা পাব না। এই নীতি অনুসরণ করলে বৃটিশ সরকারকে গদীচ্যুত করে মুক্তি অর্জন করবার স্বপ্ন আকাশ-কুসুমে পর্যবসিত হবে। যদি দেশের গণশক্তি বৃটিশ সৈন্যদলকে পরাজিত করবার মত উপযুক্ত অস্ত্রের সাহায্য না পায় তবে শুধু মুখ বুজে মার খাওয়াই সার হবে। আজ যদি আমরা আরো কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, আরো যতীন মুখার্জীর মত বিপ্লবী যুবক সৃষ্টি করতে পারি, তবে আমাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জনসাধারণও সশস্ত্র সংগ্রামে এগিয়ে আসবে।

সেই যুগে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিপ্লব বুঝতে চাই নি—অন্তরের বিপ্লবী প্রেরণা দিয়ে উপলব্ধি করেছি সোজা জিনিস। এইরূপ উপলব্ধি ত্রুটিহীন হতে পারে না। তবু মোটকথা এইটুকু বুঝেছিলাম যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে আপোষহীন, ক্ষমাহীন, নিরবচ্ছিন্ন সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে যেতে হবে। সেই সশস্ত্র অভিযান সর্বশেষ রূপ পরিগ্রহ করবে, যখন জনসাধারণ আমাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অস্ত্রসজ্জিত হবে এবং সুযোগ-সুবিধা বুঝে অতর্কিতে মুষ্টিমেয় বৃটিশসৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের বিধ্বস্ত করবে। যখন সশস্ত্র আক্রমণ এইরূপ ব্যাপক আকার ধারণ করবে তখন বৃটিশ সরকারের পাষাণবেদী টলমল করে উঠবে।

তাই জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ। আমরা যদি এক-একজনে একটিমাত্র অস্ত্র নিয়ে একটি করে ইংরেজ রাজ-পুরুষকেও হত্যা করতে পারি তবে এই বিক্ষুব্ধ জনতা বুঝতে পারবে অস্ত্র হাতে নিয়ে বৃটিশ শক্তির সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত এ. বি. রেলওয়ের ধর্মঘট সফল হল না। ধর্মঘটী কর্মী এবং জনসাধারণের মনোবলের অভাব ঘটে নি; সমানে সমানে বিরোধ

চলেছিল; পরাজয় হলেও তা' অনেক সহজ জয়ের থেকে কম গৌরবের হয় নি। এ বিষয়ে একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মনীষী বলেছেন :

"Well-contested battle even if lost will have the same moral effect like those of the easily won victories."

ধর্মঘটের শেষে সে যুগের সংগ্রামী নেতারা অপমানজনক শর্তে সন্ধি করেন নি, ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনেরও অভাব ঘটে নি। গান্ধীজী নিজে লিখেছিলেন :

"Chittagong is in the fore of the movement."

তবু ধর্মঘট বিফল হল। আমাদের এতদিনের এত পরিশ্রম, ধর্মঘটীদের এত ধৈর্য, আত্মত্যাগ সবকিছু ব্যর্থ করে দিল বৃটিশ সরকার—শুধুমাত্র তার অস্ত্রশক্তির জোরে। এই অস্ত্রশক্তিকে যদি জয় করতে না পারি, সামরিকশক্তি ও কুশলতা যদি অর্জন করতে না পারি, তবে আমাদের প্রতিটি প্রচেষ্টাই এই-ভাবে বিফল হয়ে যাবে—এই শিক্ষা আমরা গ্রহণ করলাম এ. বি. রেলওয়ে ধর্মঘট থেকে।

আমাদের গুপ্ত বিপ্লবীদলের সভ্যরা যখন সক্রিয়ভাবে কংগ্রেস নেতাদের পরিচালিত ছাত্র-ধর্মঘট, বুলক্ ব্রাদার্স ধর্মঘট ও পরিশেষে এ বি রেলওয়ে ধর্মঘটে নানারকম সাহায্য করছিল, সেই সময়ে পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন চলেছিল।

আগেই বলেছি, আমাদের দলের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা ছিলেন পাঁচজন—চারু-বিকাশ, জুলুদা (নগেন্দ্র নাথ সেন), অনুরূপদা (অনুরূপ সেন), অম্বিকাদা (অম্বিকা চক্রবর্তী) এবং মাস্টারদা—এঁরাই দল পরিচালনা করতেন। অম্বিকাদাকে আমরা প্রথম দিকে দেখি নি। তিনি রেঙ্গুন থেকে ফিরবার পরে তাঁকে দেখেছি।

যতদূর মনে পড়ছে রেলওয়ে স্ট্রাইকের সময়েই আমাদের দলে সঙ্কট স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং তার ফলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিল।

অনুশীলন পার্টির একজন নেতা (সম্ভবত 'প্রতুলদা'—প্রতুল গাঙ্গুলী) এই সময়ে চট্টগ্রামে এসে চারুবাবুর সঙ্গে গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ করেন। তার পরেই পাঁচজন নেতার মধ্যে ঘন ঘন বিশেষরকম আলোচনা হতে থাকে। আমরা দলের প্রধান গ্রুপে থাকা সত্ত্বেও এঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু স্পষ্ট জানতাম না।

বুঝতে পারছিলাম এঁদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ চলছে; মনে হচ্ছে হয়ত শেষ পর্যন্ত এই বিরোধ বিচ্ছেদে পরিণত হবে। একদিকে চারুবাবু অন্যদিকে চারজন। চারুবাবুর মনোগত অভিলাষ আমরা যেন পূর্ণ আবেগে গান্ধীজীর প্রকাশ্য আন্দোলনে যোগ দিই,—কিন্তু অন্যরা অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী নন ব'লে একেবারে সামনে এগিয়ে গিয়ে কারাবরণ করে নিজেদের শক্তিক্ষয় করতে রাজী নন।

আমরা যাতে আন্দোলনের উত্তেজনার সামনে এগিয়ে পুলিশের দৃষ্টি-পথে না পড়ি সেদিকে নেতাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। মনে আছে প্রকাশ্য সভায় এগিয়ে গিয়ে কংগ্রেসকর্মীদের সঙ্গে সমান গৌরবের ভাগী হবার ইচ্ছা দেখে মাস্টারদা আমাকে খুব বকেছিলেন। আমাদের উদ্দেশ্য, অর্থসংগ্রহ করে দলকে

শক্তিশালী করবার উপায় এবং প্রকাশ্য আন্দোলনে আমাদের প্রকৃত ভূমিকা ইত্যাদি তিনি ভাল করে আমাকে বুঝিয়ে দেন।

আমাদের পার্টির এইরকম মতবাদ থাকা সত্ত্বেও তা' থেকে সরে গিয়ে চারুবাবু প্রকাশ্য আন্দোলনে এগিয়ে গেলেন। বাকী চারজন নেতা কিন্তু এটাকে ভাল চোখে দেখলেন না।

ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে অনুশীলন পার্টির নেতা এসে গোপনে চারুবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এর পর থেকে অন্তর্দ্বন্দ্ব আরো প্রবল হয়ে উঠল। এই বিরোধ আমাদের সংগঠনের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ আমরা স্পষ্ট করে ওঁদের বিরোধের কারণ জানতাম না, জানতাম না তা' আদর্শগত, নীতিগত না শুধুই কৌশলগত। চারুবাবু আমাদের সকলের সঙ্গেই পৃথকভাবে আলোচনা করে এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সংগঠনের নীতি অনুযায়ী অন্য নেতারা চলছেন না। নানারকম কাহিনী ফেঁদে আমাদের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মালেন যে, এরকম বিশৃঙ্খলা এবং বিরোধের জন্য অন্যপক্ষই দায়ী।

আবার অপরপক্ষ সংগঠনের নীতি বর্ণনা করে নানাভাবে দেখাচ্ছিলেন যে, চারুবাবুই আদর্শ থেকে সরে গিয়ে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন। এইভাবে নেতাদের মধ্যে চলল পরস্পর দোষারোপ।

আমাদের গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির নেতাদের মধ্যে অবিশ্বাস, ঘৃণা এবং বিদ্বেষের ফলে সংগঠনের ঐক্য দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। অস্বাভাবিক এক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে আমরা কখন হতবুদ্ধি হয়ে যাচ্ছি, কখন বা নেতাদের কাউকে কাউকে দোষী ভেবে দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়ছি। এক কথায় পালছেঁড়া নৌকার মত সকলে যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছি।

মনে আছে একবার চারুবাবু আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালেন যে জুলুদাই এই সমস্ত বিপত্তির মূলে আর আমি প্রায় মনস্থির করি যে জুলুদাকে খুন করে সংগঠনকে বাঁচাব। আবার জুলুদার কাছে চারু বাবুর বিশ্বাস-ভঙ্গের কাহিনী শুনে সেটাই সত্য বলে মনে হল, তাঁকে আশ্বাস দিলাম যে চারুবাবুকেই আমার হাতে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

কল্পনা করা যায় না কি ভীষণ অবস্থা! আবহাওয়া কতখানি বিষাক্ত হলে, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ কতখানি চরমে উঠলে, এভাবে সমাধানের কথা মনে আসতে পারে। প্রায় পনের দিন পর্যন্ত এরকম বিশৃঙ্খলা চলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আমিই প্রস্তাব করলাম, প্রকাশ্য সভায় আমরা সকলে দুই পক্ষের মতভেদের কারণ জানতে চাই। নেতাদের সঙ্গে দলের প্রধান গ্রুপের সদস্যদের মিলিত হবার সুযোগ দেওয়া হোক্। সেখানে খোলাখুলি আলোচনা হবে। তাঁদের নিজেদের মনে যাঁর যা অভিযোগ আছে স্পষ্ট বলবেন, আর আমরাও সোজাসুজি তাঁদের কাছ থেকে জানব সংগঠনের কোথায় গলদ হয়েছে।

প্রস্তাবমত জায়গা ঠিক হল রহমতগঞ্জ পোস্ট অফিসের বিপরীত দিকের পাহাড়ের পাদদেশে। জায়গাটি নির্জন, পুলিশের চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই। সময় ঠিক হল বিকালবেলা, যখন মাইলখানেকের মধ্যেই গান্ধীময়দানে জনসভা চলবে। সব লোক সেখানে চলে যাবে, আমাদের কেউ বিরক্ত করতে আসবে না।

এইভাবে ব্যবস্থা করা হল সেই "ঐতিহাসিক মিটিং"-এর, যে মিটিং-এ আমাদের দলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির হল, যে মিটিং আমাদের দলের পরবর্তী অধ্যায়ের বুনিয়াদ তৈরি করল।

নির্দিষ্ট সময়ে জড় হয়েছি নির্দিষ্ট স্থানটিতে। পাঁচজন নেতা এবং আমরা দশজন। আমি বসে আছি আমার বন্ধু প্রমোদের পাশে, আমার মুখোমুখি নির্মলদা। পরিবেশ গম্ভীর; প্রত্যেকেই ভাবছি আজকের এই দুর্যোগের শেষ হবে কোথায়?

কিছুক্ষণ সভা নিস্তব্ধ, কারো মুখে কোন কথা নেই।

শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভঙ্গ করলেন অনুরূপদা,

"চারুবাবু, আপনার মতটা সকলে জানতে চায়, আপনার যা বলবার আছে বলুন। আপনি কি চান?"

গত পনেরো দিন ধরে পৃথক পৃথক ভাবে আমরা সকলেরই মত শুনেছি। চারুবাবু সকলের কাছেই বিস্তৃতভাবে তাঁর মতবাদ বর্ণনা করেছেন। এখন আর নতুন কি বলবেন? তবু প্রত্যক্ষভাবে সকলের সামনে বলতে হবে। তাই তিনি সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য বিষয় বললেন,

"আমাকে শঙ্করদা (গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী) দীক্ষা দিয়েছেন। শঙ্করদা অনুশীলন পার্টির লোক। তিনি ১৯১৮ সালে জেল থেকে মুক্তি পাবার পর আমাকে গুপ্ত বিপ্লবী দলে গ্রহণ করেন। তখন থেকেই আমি জানি আমি অনুশীলন পার্টির সদস্য। তারপর এখানে যখন আমি এঁদের সঙ্গে পরিচিত হই এবং আমরা পাঁচজনে মিলে একটা দল গঠন করি তখনো আমার ধারণা ছিল যে, আমাদের এই ছোট দলটি অনুশীলন পার্টিরই একটি অংশ।"

এইটুকু চারুবাবুর বলবার কথা। এরপর অনুরূপদা সংগঠনের ইতিহাস বলে চারুবাবুর কথার সত্যতা অস্বীকার করলেন। প্রতিটি কথায় জোর দিয়ে ধীর-গম্ভীর স্বরে বললেন,

"চারুবাবু হয়তো তাঁর প্রথম বিপ্লবী চেতনা অর্জন করেছিলেন শঙ্করদা বা অনুশীলন পার্টির যে কোন নেতার কাছ থেকে—সেটা চারুবাবুর ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা পাঁচজনে যখন একটি গ্রুপ করি তখন তো গিরিজাশঙ্করকে (শঙ্করদাকে) আমরা এতে নিই নি। চারুবাবু অস্বীকার করতে পারেন তা? এই তো রয়েছে আমাদের সংগঠনের সংবিধান।"

একটি খাতায় ইংরাজীতে হাতে লেখা সংবিধানের ধারাগুলি দেখালেন অনুরূপদা,

এই দেখ এর মধ্যে একটি অংশ হচ্ছে:

"We are pledged in the name of our country that we must remain revolutionary life-long..Five of us shall devote ourselves to build up the revolutionary organisation quite independently from any old party, or old group. In the meantime we shall try to explore Anusilan Party, Jugantar Party or any other old group led by Purna Das etc., to ascertain who have the precise programme and adequate arms to satisfy us in the best manner?..We shall

meet together and discuss over the data collected by us. Then we will decide ourselves to whom we shall give our allegiance." (স্বদেশের নামে শপথ করিতেছি আমরা আজীবন বিপ্লবী থাকিব।...আমরা পাঁচজন অন্য কোন পুরাতন পার্টি বা পুরাতন গ্রুপ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়া বিপ্লবী সংগঠন গড়িয়া তুলিতে আত্মনিয়োগ করিব।... ইতিমধ্যে আমরা অনুশীলন পার্টি, যুগান্তর পার্টি বা পূর্ণদাস প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত যে কোন পুরাতন গ্রুপের সহিত সংযোগ রাখিয়া অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিব কাহারা আমাদের সংক্ষিপ্ত কার্যসূচী এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট করিতে পারিবে।......এই সব সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আমরা একত্র বসিয়া আলোচনা করিব। তার পর আমরা স্থির করিব কোন দলের প্রতি আমরা আনুগত্য স্বীকার করিব)। এই সংবিধানটি পড়বার পর অনুরূপদা জিজ্ঞাসা করলেন, "চারুবাবু আপনি এই সংবিধান অস্বীকার করেন?"

চারুবাবু নীরব। খানিক পরে অস্পষ্টস্বরে কি বললেন বোঝা গেল না। তবে তিনি আবার জানালেন যে, শঙ্করদাকেই তিনি নেতা বলে মানেন এবং নিজে তিনি অনুশীলন পার্টির সদস্য।

জুলুদা এবার যুক্তি দিয়ে চারুবাবুকে বোঝাতে চাইলেন,

"আপনি এতটা জেদ করছেন (adament) কেন? আমরা তো বলছি না যে আমরা অনুশীলন পার্টিতে যোগ দেব না? এমন তো হতে পারে যে, অনুশীলন পার্টির কাছ থেকেই আমরা বেশি সুযোগসুবিধা ও সাহায্য পাব? প্রথমে আপনারই গ্রহণ করা সংগঠনের সংবিধান আপনি মেনে নিন্। তার পর আসুন আমরা বাংলা দেশের সব বিপ্লবী পার্টি এবং গ্রুপের সংবাদ সংগ্রহ করি। সব শেষে আমরা সকলে মিলে আলোচনা করব যে, কোন্ পার্টিতে আমরা যোগ দেব। এত সহজ যুক্তির কথা, মেনে নিন না কেন?"

আমি ভেবেছিলাম জুলুদার অনুরোধের পর সংবিধান মেনে নিয়ে চারু-বাবু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবেন। কিন্তু তিনি তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্তে অবি-চলিত রইলেন। জোর দিয়ে বললেন যে তিনি এটাই ঠিক করেছেন—অন্য সভ্যরা নিজেদের মর্জিমত তাঁদের ভবিষ্যত ঠিক করে নিতে পারেন।

বোঝা গেল ঐক্য অটুট রাখা গেল না, তা' ভেঙে পড়বে। একদিকে চারুবাবু, অন্যদিকে বাকী চারজন।

অনুরূপদা চারুবাবুর এরকম মনোভাব মোটেই পছন্দ করছিলেন না। আমার মনে হল প্রত্যেকেই চারুবাবুর অগণতান্ত্রিক মনোভাবে অসন্তুস্ট হয়েছে। অনুরূপদা তারপর সংবিধানের শেষ লাইনটি পড়ে শোনালেন,

"Anybody who will violet the fundamentals of the constitution shall be done away with." (যে কেহ এই সংবিধানের মুখ্য ধারাগুলি অমান্য করিবে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।)

অনুরূপদার গম্ভীর কণ্ঠস্বর থামল। সূচীভেদ্য নীরবতা চারিদিকে। খানিক বাদে নিষ্ফল জেনেও শেষ প্রচেষ্টা করলাম আমি। তাঁদের কাছে আমি তখন কত ছোট! তবু সেদিন চোখের সামনে এতবড় একটা সর্বনাশ দেখে চুপ করে থাকতে পারলাম না। আমার কিশোর মনের আবেগ নিয়ে বললাম,

"চারুদা, আপনাদের আলোচনা আমরা শুনলাম। আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি বিপ্লবের প্রয়োজনে আপনি আপনার অগণতান্ত্রিক মনোভাব ত্যাগ করুন। বেশ তো, বিভিন্ন দলের অবস্থা পর্যালোচনা করে সকলে মিলেই ঠিক করা যাক না যে কোন্ দলে যোগ দিলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে? ক্ষতি কি তাতে? চারুদা, ঈশ্বরের দোহাই, আমাদের এই ছোট দলটিকে দ্বিধাবিভক্ত করবেন না!"

চারুবাবু অনমনীয় রইলেন। এখন আমাদের প্রকাশ্য সভায় জানাতে হবে কার প্রতি আমরা আনুগত্য স্বীকার করব—চারুবাবুর না অন্য চার-জনের প্রতি?

প্রমোদ আমাকে বলল, প্রথমে আমার মত জানাতে। আমি কিন্তু উল্টে তাকে অনুরোধ করলাম অন্যরা বলবার আগেই তাকে বলতে। এটা আমার জীবনের একটা বড় ভুল যে, সেদিন আমি সর্বপ্রথমে আমার মত দিই নি। তাহলে হয়ত প্রমোদ এবং আমি কয়েক বছরের জন্য হলেও পৃথক দলে চলে যেতাম না।

প্রমোদ জানাল সে চারুবাবুর দলে। এবার আর আমি দেরি করলাম না। অন্য কেউ কিছু বলবার আগেই এই ব্যাপারে চারুবাবুর মতবাদের ত্রুটিগুলি বর্ণনা করে আমি চারজন নেতার পক্ষে মত দিলাম। বাকি আট-জনও একে একে এই মতই সমর্থন করল। তারাও চারুবাবুর ভূমিকা ভাল চোখে দেখে নি।

'ঐতিহাসিক সভা' শেষ হল। চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংগঠনের নাটকীয় প্রথম অধ্যায়ের শেষে যবনিকাপাত হল।

এই সময় থেকে চারুবাবুর নেতৃত্বে অনুশীলন পার্টির একটি সংগঠন চট্টগ্রামে গড়ে উঠল। তার পাশে পাশে চলল সূর্য সেন এবং তৎসহ অনুরূপদা, জুলুদা ও অম্বিকাদার নেতৃত্বে বাংলার অন্য বিপ্লবী দল থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি দলের ক্রমবিকাশ। ইতিমধ্যে আমাদের চারজন নেতা অভিজ্ঞ বিপ্লবীদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে লাগলেন, ওঁরা কে আমাদের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবেন?

দল বিভক্ত হবার পরে আমাদের গ্রুপটি একদিকে সশস্ত্র প্রস্তুতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল; অন্যদিকে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করল।

১৯২১ সালের ২১শে নভেম্বর একটি স্মরণীয় দিন। প্রিন্স অব ওয়েলস্ পদার্পণ করবেন ভারতে তাঁর ভাবী সাম্রাজ্য দর্শন করতে। গান্ধীজী আহ্বান জানিয়েছেন—'সারা দেশে হরতাল পালন কর, বুঝিয়ে দাও ভারতের অসন্তোষ, জানিয়ে দাও আমাদের স্বরাজ অর্জনের দাবির কথা।'

গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়েছে সারা দেশ। সর্বত্র হরতাল পালন করা হবে—প্রদেশে প্রদেশে, জেলায় জেলায় চলেছে তার প্রস্তুতি।

চট্টগ্রামও পিছিয়ে নেই। আমরাও প্রাণপণে খেটে চলেছি যাতে বয়কট আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয়।

সেই দিনটির কথা স্পষ্ট মনে আছে বিশেষ করে একটি ঘটনার জন্য।

১৯২১ সালের ২০শে নভেম্বরের রাত্রি। স্টেশন সংলগ্ন রেলওয়ে

ময়দানে প্রতি বৎসরের মত এবারেও সরস্বতী পূজা উপলক্ষে যাত্রাগানের ব্যবস্থা হয়েছে। ভাড়াকরা যাত্রা-পার্টি; কি প্লে ঠিক মনে নেই। লোকের ভিড়ে বিরাট মাঠে তিল ধারণের স্থান নেই। হাজার পনেরো লোক ত হবেই।

রাত্রি প্রায় একটার সময় প্লে আরম্ভ হল। আমিও গিয়েছি বন্ধুদের সঙ্গে যাত্রা শুনতে। এরা যে আরম্ভ করতেই এত দেরি করবে তা কে জানত? অস্বস্তি বোধ করছি,—নিশ্চিন্তে প্লে'র দিকে মন দিতে পারছি না। তার কারণ, হিসেব করে দেখা যাচ্ছে সকাল ৮টার আগে যাত্রা শেষ হবে না। এদিকে ২১শে নভেম্বর সকাল ৬টা থেকে পূর্ণহরতাল শুরু হবে। তাহলে কি চট্টগ্রাম শহরের লোকেরা আন্দোলনের ডাকে সাড়া না দিয়ে বসে বসে যাত্রা শুনবে? কি বলবে সকলে এ কথা শুনলে? এই চট্টগ্রাম সম্বন্ধে গান্ধীজী না বলেছেন, "Chittagong is in the fore of the movement?"

যাত্রার দিকে মন দিতে পারছিলাম না। ক্রমশঃ রাত শেষ হয়ে আসছে। পূব আকাশে লাল আভা দেখা দিচ্ছে। বন্ধুরা এবং আশেপাশে সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছে, আমি যেন স্থির থাকতে পারছিলাম না—এ-পাশ ও-পাশ তাকাচ্ছি, উসখুস করছি। বন্ধুরা একবার জিজ্ঞাসা করল, শরীর খারাপ লাগছে কিনা। আমি 'না' বলায় আবার তারা নিশ্চিন্ত হয়ে নাটকের মধ্যে ডুবে গেল।

দেখতে দেখতে ৬টা বাজতে লাগল। ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি। কি অসহায় অবস্থা! এদিকে নাটকও তখন চরমে উঠেছে। এক কিশোর রাজপুত্রকে মা-কালীর চরণে বলি দেওয়া হবে,—সেই দৃশ্য সাজানো হচ্ছে। একটি কালীমূর্তি এনে বসিয়ে সামনে যূপকাষ্ঠ রাখা হয়েছে। এখুনি দৃশ্যটি শুরু হবে।

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। একলাফে স্টেজে উঠে নাটকীয় ভঙ্গীতে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালাম। দর্শকেরা বোধ হয় ভাবল নাটকেরই কোন দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে!

প্রাণপণে চীৎকার করে দর্শক সাধারণকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলাম, "ভাই সব, বন্ধুগণ! শুনুন ......শুনুন......বিশেষ ঘোষণা আছে।......"

কাছে একটা চেয়ার ছিল। তার ওপরে উঠে বিস্মিত দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য জানালাম,

"আপনারা জানেন মহাত্মা গান্ধী আজ সারা ভারতে হরতাল ঘোষণা করেছেন। দোকানপাট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, আমোদ-প্রমোদ, সব বন্ধ থাকবে সকাল ৬টা থেকে। চট্টগ্রাম কি পিছিয়ে থাকতে পারে? আসুন আমরা গান্ধীজীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি, 'প্রিন্স অব ওয়েলস' তুমি ফিরে যাও! ভারত তোমাকে চায় না। চট্টগ্রাম তোমাকে ঘৃণা করে।

"চট্টগ্রাম তার ঐতিহ্য বজায় রাখবে। আপনাদের পক্ষ থেকে আমি প্রস্তাব করি এক্ষুণি যাত্রা বন্ধ হোক। ......বন্দে মাতরম্, আল্লা হো আকবর, মহাত্মা গান্ধী কী জয়!"

চট্টগ্রামের জনগণ প্রস্তুত ছিল, শুধুমাত্র সামান্য আহ্বানের অপেক্ষা। ধীরে ধীরে সেই বিরাট জনসমুদ্র অদৃশ্য হয়ে গেল। রাজপুত্রের ভাগ্যে কি ঘটল সেদিন তা দেখবার জন্য আর কেউ বসে রইল না।

কংগ্রেসের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যেই তখন

আমাদের কাজ চলছিল। স্কুল-কলেজ ধর্মঘট, বুলক্ ব্রাদার্স ধর্মঘট এবং এ বি রেলওয়ে ধর্মঘটে আমরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এরপর যখন গান্ধীজী আইন অমান্য করবার জন্য দেশবাসীকে ডাক দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকার তার চরম পশুশক্তি প্রয়োগ করে সেই আন্দোলনের টুঁটি টিপে ধরল, নির্বিচারে লক্ষ লক্ষ লোককে জেলে পুরতে শুরু করল, তখন আমরা ঠিক এই অহিংস আন্দোলনে এগিয়ে গিয়ে নিরর্থক বন্দিত্ব বরণ করা সমীচীন মনে করলাম না। আমরা বিশ্বাস করতাম বিনা অস্ত্রে শত্রুকে পরাজিত করা যাবে না। তাই অস্ত্র সংগ্রহ করে গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়াই আমরা তখনকার দিনে প্রয়োজন বলে মনে করলাম।

আইন অমান্য করে ছোট ছোট সত্যাগ্রহীদল জেলে ঢুকতে লাগল। চট্টগ্রাম জেল আইনঅমান্যকারী বন্দীতে ভরে গেল। চারদিকে সাড়া জাগল। কিছুদিন পর্যন্ত বেশ চলেছিল। কিন্তু শেষকালে, সরকারের পীড়ন ও অত্যাচার চরমে উঠবার পর জেলে যাবার জন্য লোক সংগ্রহ করে আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল।

আগেই বলেছি আমরা, অর্থাৎ আমাদের গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্যরা, এভাবে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে যোগ দিই নি। এতদিন ধর্মঘটের জন্য আপ্রাণ খেটেছি, অথচ জেলে যাবার সময় হলে আর আমাদের দেখা পাওয়া গেল না,—এতে সকলেই আমাদের নিন্দা ও বিদ্রূপ করতে লাগলেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত সকলেই আমাদের তিরস্কার করতে লাগলেন।

মনে আছে লেডী ডাক্তার মিসেস এস. মুখার্জী, আমাদের পরিবারের বিশেষ বন্ধু,—আমি তাঁকে মাসীমা বলতাম,—নানাভাবে কংগ্রেস আন্দোলনে সাহায্য করেছেন তিনি। রহমতগঞ্জে বড় রাস্তার ওপরে তাঁর বাড়ী। একদিন তাঁর বাড়ীর বারান্দা থেকে রাস্তায় আমাকে দেখে ধমকাতে শুরু করলেন,

"অনন্ত, তুমি একটা কাপুরুষ। তোমার মত সবাই যদি কাজের সময় দলত্যাগ করে তবে কি করে স্বরাজ আসবে? একদিন তুমি না আন্দোলনে এগিয়ে গিয়েছিলে? বাপ-মাকে অগ্রাহ্য করে দেশের কাজের জন্যই না তুমি পড়াশুনা ছেড়েছ? বাবার সাথে ঝগড়া করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে কি জন্যে,—লম্বা লম্বা স্বদেশী বুলি আউড়েছিলে কেন? দেশের কাজ করবে বলে বাড়ী ছেড়ে পালালে—তোমাকে ধরতে গিয়ে কি নাস্তানাবুদ না হতে হয়েছিল আমাকে, ভুলে গিয়েছ? আমি কিন্তু ভুলি নি। এই দেখ, এখনো আমার হাতে দাগ রয়েছে।"

তাঁর হাতের দাগ দেখে আমারও ঘটনাটা মনে পড়ল। আগেই বলেছি, স্কুলের হেডমাস্টার মশাই আমাকে বিপজ্জনক আখ্যা দিয়ে স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে নেবার জন্য বাবাকে অনুরোধ জানান। বাবা চান নি যে আমি অতটুকু বয়সেই স্কুলের পড়া ছেড়ে দিই,—কোন অভিভাবকই তা চাইতে পারেন না। কিন্তু আমার তখন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা হয়ে গেছে, আমাকে দমন করবার সাধ্য কারো নেই। কাজেই পিতাপুত্রে বাধল বিরোধ, অভিমানভরে গৃহত্যাগ করলাম।

মা অনেক কান্নাকাটি করেছিলেন, আমাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমি ফিরে যাই নি। এই সময় একদিন মাসীমা

আমার দেখা পেয়ে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন ; তাঁর 'মতলব' আমি আগে বুঝতে পারি নি। যখন বুঝলাম যে আমার বাড়ীতে খবর পাঠিয়েছেন আমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য, তখনি দ্রুতগতিতে উঠে পালাবার চেষ্টা করলাম। দরজা আগলে বসেছিলেন মাসীমা। তাঁকে প্রায় একরকম ধাক্কা দিয়েই বেরিয়ে গেলাম,—দরজার পাটটা সজোরে গিয়ে তাঁর হাতের ওপর পড়লো। তারই ওই ক্ষতচিহ্ন।

মাসীমা সেই পুরনো কথা তুলে আমাকে বকতে লাগলেন, "কোথায় গেল তোমার সেই তেজ, সেই আগুন? এখন কাপুরুষের মত পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন?"

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে তিনি তাঁর প্রতিবেশীদের এবং পথচারীদের ডেকে উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন, "দেখ, দেখ, তোমরা দেখ! দল ছেড়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে! যখন সত্যিকার আন্দোলন শুরু হয়েছে, যখন লাঠি খাবার জন্য, জেলে যাবার জন্য কর্মীর প্রয়োজন—তখন এ পালিয়ে যাচ্ছে! এ দেশের কোনো আশা নেই......!"

তাঁর স্বদেশপ্রীতি তাঁর আন্তরিকতা উপলব্ধি করে মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালাম। কিন্তু উত্তর দেবার উপায় নেই। মাসীমাকে—শুধু মাসীমাকে কেন, দলের বাইরে কাউকেই তো জানাতে পারি না যে আমরা নিরস্ত্র হয়ে অসহায়ের মত জেলে গিয়ে বসে থাকতে চাই না। আমাদের মন্ত্র—জেল ভাঙতে হবে। তার জন্য চাই অস্ত্র। তারই প্রস্তুতি চালাচ্ছি গোপনে।

আমাদের গলিতে ঢুকতে প্রায়ই দেখা হত প্রসিদ্ধ আইনজীবী শ্রীরজনী বিশ্বাসের সঙ্গে। ইনি ১৯২৪ এবং ১৯৩০ সালে, দুবারই আমাদের বিরাট মামলায় যতীন্দ্রমোহন, শরৎ বসু, এন. আর. দাশগুপ্ত ও অন্যান্য আইন-জীবীদের সঙ্গে একত্রে দাঁড়িয়ে আমাদের পক্ষ সমর্থন করেছেন। কিন্তু এই ১৯২১ সালের ঘটনায় বিরক্ত হয়ে প্রায়ই আমাকে বিদ্রূপ করে বলতেন,

"অনন্ত, কি হয়েছে তোমার বলতো?" ......"আজকাল তুমি কোথায়?" ......"দেখ অনন্ত, লোকেরা তোমাকে ক্ষমা করবে না। সবাই জানে, তুমি বিশ্বাসঘাতক।"

নতমস্তকে অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে সরে আসতাম। উত্তর দেবার উপায় নেই—মুখ বন্ধ।

আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দাদামণি (সত্যরঞ্জন সেনগুপ্ত) ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের একজন অফিসার। আমাদের পরিবারের প্রতি তাঁর সহানুভূতির সীমা নেই। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনিও আমাকে প্রায়ই বলতেন,

"অনন্তলাল ভয় খেয়ে গেলে!"

"এত সাহস তোমার কোথায় গেল?"

"তোমাকে যে সবাই ছি ছি করছে!"

ব্যাপারটা চরমে উঠল সেদিন, যেদিন, বাবা আমি শুনতে পাই এমন-ভাবে, দিদি আর মাকে ডেকে বললেন,

"লোকে অনন্তর কথা জিজ্ঞাসা করলে আমি লজ্জায় মরে যাই। কেন

ও চুপ করে বসে আছে কারো কাছে জবাব দিতে পারি না। ......আইন অমান্য আন্দোলনে অল্পবয়সী ছেলেদের তিনমাসের বেশি তো জেল হয় না.........।"

বাবার মনের কথাটা বুঝতে দেরি হয় নি। তিন মাসের বেশি যখন জেল হয় না, তখন একবার ঘুরে আসুক না! নাম হবে; সবাই বলবে, হ্যাঁ দেশের জন্য জেলে গেছে। বাবার মুখ উজ্জ্বল হবে। আমার বাবা-মাও বোধ হয় ভাবছিলেন আমি জেলের ভয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি না।

কি কষ্টে, কি নিদারুণ যন্ত্রণায় মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে সব! সেই মুহূর্তে মনে হয়েছে বাবা-মাকে গিয়ে বলি, "মা, বাবা, তোমাদের অনন্ত ভীরু নয়, কাপুরুষ নয়। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিয়ে তিন মাসের জন্য জেলে গিয়ে বাহবা কুড়োতে সে ঘৃণা বোধ করে। সে চায় বুলেট দিয়ে বৃটিশ বুলেটের উপযুক্ত জবাব দিতে। সে চায় সম্মুখ যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনীকে পরাজিত করতে, অথবা হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বরণ করতে!"

কিন্তু স্বদেশের জন্য, দলের জন্য কোন কিছু প্রকাশ করা চলবে না। সমস্ত নিন্দা বিদ্রূপ বিনা প্রতিবাদে হজম করতে হবে।

বাবার কথাগুলি শুনে দিদির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলাম। দাদা ও দিদির মুখে চাপা হাসি। তারা আমার সকল কাজের সঙ্গী, আমাদের দলের সঙ্গে জড়িত,—তারা তো সবই জানে! তাই বাবার এই আক্ষেপে তারা কৌতুক বোধ করছিল। আবার বাবার স্বদেশ-প্রীতিতে গৌরব বোধ করছিলাম আমরা ভাই বোনে।

আমার বাবার বরাবরই জেল সম্বন্ধে একটা ভীতি ছিল। সেজন্য তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে কখন যোগ দিতেন না। ছাত্রধর্মঘটের এক বছর আগে একবার বিপিন পালের শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলাম বলে আমাকে কঠিন শাস্তি পেতে হয়েছিল।

কিন্তু সময়ের পরিবর্তন—কালের অগ্রগতি—গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ আমার বাবাকেও আজ অনুপ্রাণিত করেছে! বাবা চাইছেন আজ তাঁর অনন্তও ইংরেজের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিক। দেশের জন্য হোক না কেন তার তিন মাসের সাজা!

এমনি ভাবেই বিপ্লব এগিয়ে যায়। বৃটিশ শাসন উচ্ছেদের জন্য জনসাধারণ এমনিভাবেই জড়তা, দ্বিধা ও ভীরুতা কাটিয়ে দলে দলে এসে যোগ দিয়েছে। শত দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম ডাকেই আমাকে "তিন মাসের" কারাবরণের অনুমতি দিতে আমার বাবার মত লোকেরাও তখন প্রস্তুত! বাবা কিন্তু তখনও জানতেন না বিপ্লবী ভারতের ভবিষ্যৎ তাঁর আরও কত মত পরিবর্তন, আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণের প্রতীক্ষায় আছে! কে জানত তখনও—যে বাবা ধীরে ধীরে আমাদের বিপ্লবী কার্যকলাপের সমর্থক হবেন—এবং যতদূর সম্ভব আমাদের গোপনে সাহায্য করবেন! এও কি কখনও তিনি ভেবেছিলেন যে আমার সমস্ত অবাধ্যতা একদিন তিনি সস্নেহে ক্ষমা করবেন—স্বয়ং জেলে যাবেন, দু'বছর ধরে আমাদের সঙ্গে একই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে "অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার" বিচারের প্রতীক্ষায় থাকবেন!

ভারতে ইংরেজের বিরুদ্ধে অসহযোগ সংগ্রাম, বিপ্লবী যুবকদের একাগ্রতা

ও নিষ্ঠা, আমাদের তিন ভাই-বোনের বৃটিশের বিরুদ্ধে আপোষহীন ক্ষমাহীন সশস্ত্র সংগ্রামের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—আমাদের স্বদেশ প্রেমের প্রতি মায়ের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ আমাদের "গৃহ বিপ্লবে" যে প্রবল বন্যার সৃষ্টি করেছিল তা বাবার পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে তাঁকেও এগোতে হ'ল।

কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ যখন চট্টগ্রামে এসে পেঁছল, কানাঘুষায় শোনা যেতে লাগল যে, উকিল মহিমচন্দ্র দাস ওকালতি ছেড়ে দেবেন। তখন বোধ হয় আমার বাবা ও কথাটা সম্পূর্ণ গুজব বলে ভেবেছিলেন; আমাদের কাছে বলেছিলেন,

"মহিম দাস কখন ওকালতি ছাড়তে পারেন না। তিনি যদি আদালতে যাওয়া বন্ধ করেন তবে আমিই সকলের আগে প্র্যাক্‌টিস্ ছেড়ে দেব।"

সত্য-সত্যই যখন মহিম দাস তাঁর ওকালতি পেশা ছেড়ে দিলেন তখন আমরা তিন ভাই-বোনে বাবাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম তাঁর কথা রাখবার জন্য। আমি আমার বন্ধুদের এবং কংগ্রেসের নেতাদের কাছে গল্পচ্ছলে আমার বাবার ওকালতি ছাড়ার সর্তের কথা উল্লেখ করলাম। মিটিং-এ যেই বলা হল মহিম দাস তাঁর পেশা ত্যাগ করছেন, অমনি কে একজন বলে দিল যে গোলাব সিংও পেশা ত্যাগ করবেন। মহিম দাসের নামের সঙ্গে বাবার নামও উল্লেখ করা হতে লাগল, কাগজে দু'জনের নামই প্রকাশিত হল। এদিকে দাদা, দিদি এবং আমি—তিনজনে মিলে প্রাণপণে তাঁকে বোঝাতে লাগলাম। ঘটনার পাকচক্রে পড়ে তাঁকে রাজী হতে হল।

পুরা দু'বছর বাবা আদালতে যান নি; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—এক দিনের জন্যও কোন জনসভায় যোগ দেন নি। না যাওয়ার একমাত্র কারণ জেল-ভীতি। আজ গণ-চেতনার এতখানি বিকাশ হয়েছে, কারাবরণের গৌরবময় দিকটা এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে আমার জেলে যাওয়াটা পর্যন্ত তিনি যেন তবু মানিয়ে নিতে পারছিলেন—কিন্তু তখনও নিজের আন্দোলনে যোগ দেওয়া সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ মনোভাব ছিল।

শক্তিশালী ভারতকে আফিম খাইয়ে শিকলে বেঁধে রেখেছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী দস্যু। মোহের ঘোর কেটেছে তার, অনুভব করছে সে বন্ধনের বেদনা, তাই বারবার চেষ্টা করছে শেকল কেটে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু গণশক্তির জাগরণের মাধ্যমে সারা ভারতের ঘুম ভাঙাতে আর কোন নেতা বা নেতৃত্ব আগে কখনও এতখানি ব্যাপক সফলতা লাভ করেনি—যতখানি সফলতার সঙ্গে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ভারতের জনগণকে জাগিয়ে তুলল। গান্ধীজীর প্রতিভাদীপ্ত মস্তিষ্কপ্রসূত এক অভিনব আন্দোলনের ধারায় সর্বভারতের জনগণের বিক্ষোভ প্রকাশিত হবার সুযোগ পেল—দু'শো বছরের অধীনতা পাশ ছিন্ন করবার এই অহিংস ও শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত, তড়িৎ অথচ ব্যাপক জন-জাগরণের সক্রিয় পন্থা চোখের সামনে দেখতে পেয়ে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে,—"তোমাদের (ইংরেজ সরকারের) কোন কাজে সাহায্য আমরা করব না—তোমাদের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ অসহযোগ।"

গান্ধীজী চেয়েছিলেন এক কোটি টাকা, এক কোটি স্বেচ্ছাসেবক আর

এক বছর সময়। এক বছরের মধ্যে হিমালয় থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত কেঁপে উঠল বিক্ষুব্ধ জনতার গর্জনে—'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল এক কোটির অনেক বেশি স্বেচ্ছাসেবক—অর্থও সংগ্রহ হল এক কোটির বেশি। চট্টগ্রাম এগিয়ে গেল গান্ধীজীর ভাষায়—'সকলের সামনে', কিন্তু চট্টগ্রামের তথা সারা দেশের গণ-আন্দোলনকে গলা টিপে মেরে ফেলল মুষ্টিমেয় সশস্ত্র বৃটিশ সৈন্য! আমরা, বিপ্লবী দলের সভ্যরা, নীরবে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখলাম! অস্ত্রের অভাবে আমরা নিরুপায়!

গান্ধীজী অহিংস ধর্মকে জীবনে আদর্শ (creed) হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আমরা অহিংস আন্দোলনকে উপায় (policy) হিসেবে প্রয়োগ করি।

গান্ধীজী বলতেন ঃ

"I can sacrifice Country for the Truth ?" (আমি সত্যের জন্য স্বদেশকে আহুতি দিতে পারি)।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের উক্তি ঃ

"I can sacrifice Truth for the Country"—(আমি স্বদেশের জন্য সত্যকেও বিসর্জন দিতে পারি)—আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। অহিংস আন্দোলনের পুরো সুযোগ নিলাম আমরা। অহিংসার অন্তরালে আমাদের সহিংস প্রস্তুতি চলল অবাধে।

বাংলা দেশের বিপ্লবীরা তখনো ঋষি বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরাণী' আর 'আনন্দমঠের' আদর্শ থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করছিল। বাংলা দেশের যুবকরা বেশি চিন্তাশীল, বেশি ভাবপ্রবণ। তারা ভুলতে পারে নি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর "বাণিজ্যের স্বাধীনতা" আদায় করবার ছলে যুদ্ধ ঘোষণা করে রাজ্য অধিকারের কাহিনী, ভুলতে পারে নি কবি নবীন সেনের "পলাশীর যুদ্ধে" বর্ণিত ক্লাইভের বিশ্বাসঘাতকতা আর ওয়ারেন হেস্টিংসের বর্বর অত্যাচারের ইতিহাস। ক্লাইভ আর হেস্টিংসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছে যে বৃটিশ শাসকরা—তারা দিন দিন শাসন ও শোষণের নব নব কৌশল আয়ত্ত করে ভারতের বুক থেকে জীবনধারণের উপযোগী প্রতি বিন্দু রস নিংড়ে বার করে নিয়েছে—বিনিময়ে ভারতবাসী পেয়েছে বুটের লাথি, চাবুক, অনাহার ও অশিক্ষা।

আজ যখন ভারতের সেই পুঞ্জীভূত বেদনা অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশিত হবার উপক্রম হল, তখন বৃটিশ শাসকের ক্রোধ উন্মত্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র দেশবাসীর ওপর। আমরা, তার নীরব অসহায় দর্শক, প্রতিজ্ঞা করলাম এর প্রতিশোধ নিতে হবে। রক্তের বদলে রক্ত, প্রাণের বদলে প্রাণ।

বাংলার যুবসমাজ ভীরু নয়, দুর্বল নয়। ক্ষুদিরামের অজেয় প্রাণ শতধা হয়ে ছড়িয়ে পড়ুক বাংলার ঘরে ঘরে—কানাইলালের ক্ষমাহীন রক্তচক্ষুর ভ্রূকুটি দেশদ্রোহীর প্রাণে মৃত্যুভয়ের সঞ্চার করুক—যতীন মুখার্জি, চিত্তপ্রিয়ের আত্মদান যে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে সেই পথে নবযুগের বিপ্লবীদের যাত্রা শুরু হোক। অগ্রগামীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বৃটিশ শাসকদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য, বাংলার যুবকদের হাতে পিস্তল-রিভলভার-বোমা-ডিনামাইট আবার গর্জন করে উঠুক। সঙ্গে সঙ্গে 'বিলাতীপণ্য বর্জন আন্দোলনে'র আহ্বান ছড়িয়ে পড়ুক দিকে দিকে।

একদিন বাঙালীর এই সমবেত প্রতিরোধ বাংলার বুকে অস্ত্রচালনার জন্য কার্জনের উদ্যত নিষ্ঠুর হস্তকে নিশ্চল করে দিয়েছিল। এবার আবার গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত-বিপ্লবীদের লুপ্তশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠুক—এই ছিল আমাদের মনোভাব, এই ছিল আমাদের মরণ পণ প্রতিজ্ঞা!

সব চেয়ে বড় কথা অস্ত্র চাই। অহিংস আন্দোলনের ডাকে দেশবাসী সাড়া দিয়েছে—গণ-চেতনার অভ্যুদয় হয়েছে। এখন আমাদের কাছে প্রশ্ন, বিপুল বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ছাড়া সংগ্রাম আর কতদূর চালান সম্ভব? গণ-শক্তি জাগ্রত থাকতে থাকতে আমাদের অস্ত্রশক্তির পরিচয় দিতে হবে। আমরা সামান্য কয়েকজন বিপ্লবী যদি আত্মত্যাগের আদর্শ রেখে যেতে পারি তবে জনতাও এই পথে চলে মুষ্টিমেয় বৃটিশ সৈন্যকে পরাজিত করতে পারবে।

আমাদের এই ধরনের একটা কল্পনার কারণ ছিল এই যে, পৃথিবীর বিপ্লবের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ছিল সীমিত, অগভীর। আমরা এই পর্যন্ত জানতাম যে, প্রতিটি বিপ্লবের জন্য একদিকে গণ-আন্দোলন ও অন্য-দিকে সশস্ত্র গুপ্ত-বিপ্লবীদল গঠন প্রয়োজন: এবং প্রথমত ব্যাক্তিগতভাবে এবং দলগতভাবে কিছু কিছু বিপ্লবী-কার্যকলাপ না হলে গণ-অভ্যুত্থান হতে পারে না, যেমন আয়ার্ল্যান্ডে 'সীন ফীন' এবং রাশিয়ায় 'নিহিলিস্টদে'র এই জাতীয় কাজের পরই সেখানে গণ-বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল।

এই সহজ ও সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য, বিশেষত চোখের সামনে বৃটিশের অত্যাচার দেখে তার প্রতিশোধ নেবার জন্য একটা প্রবল আগ্রহ থাকায় আমরা, চট্টগ্রামের একটি বিশেষ বিপ্লবী গ্রুপ, সূর্য সেনের নেতৃত্বে অস্ত্রশস্ত্র বোমা-বারুদ সংগ্রহ করতে শুরু করলাম।

এই সময়ে আমাদের মানসিক স্থৈর্য নানাভাবে ব্যাহত হয়েছিল। এক-দিকে বিরাট রেলওয়ে ধর্মঘট এবং অভূতপূর্ব গণ-আন্দোলন বৃটিশ শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে,—অন্যদিকে আমাদের নিজেদের দলে ভাঙন দেখা দিয়ে একই জেলায় দু'টো পৃথক সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছে। তার ওপর কংগ্রেস ভলান্টিয়ার বাহিনী এবং কংগ্রেস কমিটিগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করে গভর্ণমেন্ট সমানে কর্মীদের গ্রেপ্তার করে চলেছে এবং আমরা গণ-আন্দোলন থেকে সরে আসায় সকলের কাছে অপমান, বিদ্রূপ আর তিক্ত সমালোচনার পাত্র হয়ে উঠেছি। এক কথায় আমাদের জীবন এতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

আমাদের দলের নির্দেশ অনুযায়ী সেই সময়ে আমি গোপনে অস্ত্র-সংগ্রহের কাজে বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করেছি—না হলে এই সব অপমান বিদ্রূপ সহ্য করা কোনমতেই হয়ত সম্ভব হত না।

আমরা বিপ্লবীরা যখন বৃটিশসৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের সুযোগ গ্রহণ করার কথা চিন্তা করছি—অহিংস সংগ্রামে রত দেশ-বাসীও তখন বৃটিশ বাহিনীর নির্দয় অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে অন্য পথের কথা চিন্তা করতে শুরু করছে। বৃটিশ অত্যাচারের ক্রমবৃদ্ধিতে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করেছে তাতে অহিংস আন্দোলনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে অবচেতন মনে তাদের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তাই গোরখপুর জেলার চৌরিচৌরায় এই অহিংসবাদী সৈনিকরাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল পাল্টা আক্রমণের

মাধ্যমে। দিনের পর দিন মুখ বুজে নিরস্ত্র দেশবাসীর ওপর সশস্ত্র পুলিশের উন্মত্ত তাণ্ডব দেখে দেখে একদিন অহিংসার বর্ম ঝেড়ে ফেলে তারা এদের উপযুক্ত শাস্তি দিল। একুশজন পুলিশ এবং সাব-ইনস্পেক্টরকে আগুন জ্বালিয়ে দগ্ধ করে। বৃটিশ অত্যাচারের নিপীড়িত ভারতবাসী গান্ধীবাদকে সাময়িক-ভাবে অস্বীকার করেও চৌরীচৌরার বিক্ষুব্ধ প্রতিহিংসার প্রতি শ্রদ্ধা জানাল।

কিন্তু অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান সেনাপতি—গান্ধীজীর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিতে এই ঘটনা শুভ ব'লে মনে হল না। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হলেন এবং বিরক্তি প্রকাশ করে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। কিন্তু দেশভক্ত কর্মীরা এ ভাবে পিছিয়ে আসবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তারা তাদের সমস্ত সুখ-ঐশ্বর্য জীবন-যৌবন-ধন-মান বিসর্জন দিয়ে স্বাধীনতার জন্য আমরণ সংগ্রামে ব্রতী হয়ে এসেছিল। মাঝপথে আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ায় মানসিক প্রতিক্রিয়া তাদের বিহ্বল ও দুর্বল করে দিল।

গান্ধীজী স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা, জাতীয় কংগ্রেসের নিয়ামক। তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে তিনি হয়ত বুঝেছিলেন যে, আন্দোলন যতই তীব্র হোক, জীবনদানের প্রতিজ্ঞা যতই প্রবল হোক, মাত্র এক বছরের মধ্যে গণ-জাগরণের ওপর ভরসা করে আন্দোলনকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নেওয়া যায় না। সেজন্য চাই সুশৃঙ্খল সংগঠন,—আরও মানসিক সংহতি।

চৌরিচৌরার ঘটনাতে গান্ধীজী হয়ত বুঝেছিলেন যে, এই পর্যায়ে এভাবে স্থানে স্থানে বিক্ষোভ দেখা দিলে গভর্নমেণ্ট আরো ব্যাপকভাবে তাব দমননীতি প্রয়োগ করবে এবং তার ফল আন্দোলনের ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গল-দায়ক হবে না। ধীর মস্তিষ্কে এইরূপ বিশ্লেষণ করে দেখার মত মানসিক অবস্থা আমাদের ছিল না। মনে কঠিন প্রশ্ন জেগেছিল—সমগ্র দেশের ঐ বিরাট আন্দোলন শুধুমাত্র একটি ছোট্ট সহরের ঘটনায় বন্ধ করে দেওয়া হবে? গান্ধীজীর ঐরূপ সিদ্ধান্ত অনেকেই মন থেকে মেনে নিতে পারলেন না—আমরাও না।

গান্ধীজী যেভাবে চিন্তা করেছিলেন, বিপ্লবীদের চিন্তা ছিল তার বিপরীত। আমরা দেখলাম, কখন আন্দোলন প্রত্যাহার করা হল? না, যখন গভর্নমেণ্ট চরম দমননীতি চালিয়েছে দেশের ওপর, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ওপর। কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা ক'রে কংগ্রেস অফিসগুলি বন্ধ করে, স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনী ভেঙে দিয়ে, কর্মীদের কারারুদ্ধ করে যখন গভর্নমেণ্ট দেশবাসীর মনোবল ভেঙে দেবার পথে অনেকখানি এগিয়েছে; এবং যখন দেশভক্ত কর্মীরা উপায়ান্তর না দেখে অহিংস ধর্ম পরিত্যাগ করে পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে,—ঠিক এই সময়ে আন্দোলনের স্রোতের মুখে বাঁধ দেওয়া হল। এখন আমরা কি করব? আর সময় নেই, এখনি এগিয়ে যেতে হবে। এখনি অস্ত্র হাতে নিয়ে ব্যক্তিগত আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে হবে যে, সামান্য অস্ত্র হাতে নিয়েও যদি যে ভাবে পারি রুখে দাঁড়াই, তাহলে বৃটিশ দস্যুর সাধ্য নেই চিরকাল আমাদের শৃঙ্খলিত করে রাখে।

ইতিমধ্যে মাস্টারদার পরিচালনায় আমাদের নেতৃবৃন্দ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে শুরু করেছেন। এজন্য সামান্য কিছু অর্থের ব্যবস্থা হয়েছে,

বে-আইনীভাবে কিছু অস্ত্রও কেনা হয়েছে। এ'দের মধ্যে জুলুদার আর্থিক স্বাচ্ছল্য বেশি—তিনিই সবচেয়ে বেশি টাকা দিয়েছেন; কিন্তু তাও প্রয়োজন অনুযায়ী অতিসামান্য। ইতিমধ্যে অল্প কয়েকটা রিভলভার আর পিস্তল মাত্র কেনা হয়েছে।

কলকাতা সহরে সন্তোষদার (সন্তোষ মিত্র) নেতৃত্বে গঠিত দলটির সঙ্গে আমাদের গ্রুপের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল; সংগঠনের দিক থেকেও যোগাযোগ ছিল এ'দের সঙ্গেই বেশি। সন্তোষদারাও কিছুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করে-ছিলেন। আমাদের এই দু'টো গ্রুপের সঙ্গে আবার বিপিনদা (বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী), অনুকূলদা (অনুকূল মুখার্জী) এবং জ্যোতিষদার (জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ) বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সন্তোষদা, জুলুদা, মাস্টারদা, অম্বিকাদা এবং অনুরূপদার সমান বয়সী আর একজন নেতার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল —তিনি হরিনারায়ণ চন্দ্র।

হরিদা ছিলেন নীরব কর্মী—তাঁর সম্বন্ধে আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। একদল খাঁটি বিপ্লবী কর্মী তিনি তৈরি করেছিলেন, গোপন আশ্রয়ের ব্যবস্থা এবং লুকিয়ে জিনিসপত্র রাখবার স্থান ছিল তাঁর অজস্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী একজন উঁচুদরের কেমিস্ট ছিলেন তিনি; বোমা-বারুদ তৈরির কাজে এবং নানারকমের বিষের ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা পেতাম। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৪ সালের অক্টোবরে গভর্নর লর্ড লিটনের বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারী হওয়া পর্যন্ত এবং তার পরেও এ'দের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা দেয় নি। মত ও পথ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল বলে আমার জানা নেই। কিন্তু মত, পথ ও সংগঠনের ধারা এক থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার (egoism) হাত হ'তে মুক্ত হতে পারেন নি।

হরিদা, সন্তোষদা এবং আমাদের (মাস্টারদা, জুলুদা প্রভৃতি) সঙ্গে বিপিনদা, জ্যোতিষদা আর অনুকূলদার যোগাযোগ থাকলেও প্রত্যেক দলের নেতারাই তাঁদের দলভুক্ত বিপ্লবী কর্মীদের নিজেদের আয়ত্তে রাখতেন— বিপিনদা, জ্যোতিষদা বা অনুকূলদার মত শীর্ষস্থানীয় নেতাদের প্রাধান্য মানলেও কার্যত তাঁদের হাতে আমাদের নেতারা কখন অস্ত্রশস্ত্র বা বিশিষ্ট কর্মীদের পরিচালনার দায়িত্ব দিতেন না। এই শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে আবার বাংলা দেশের বিখ্যাত বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। এ'রা সকলে বাংলার সুবিখ্যাত গুপ্ত-বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান—'যুগান্তর পার্টির' নামে কাজ করে গর্ব অনুভব করতেন। তবুও আজ স্বীকার করতে বাধা নেই যে, এ'রা কখনও ঐক্যবদ্ধভাবে কোন কাজ করেন নি। কংগ্রেসেও যেমন যুগান্তর পার্টিতেও তেমন, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল।

সুপ্ত অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা মানুষকে তার নিজ প্রাধান্যের জন্য কোথায় ও কতদূরে, তথাকথিত বিপ্লবী পথ হ'তে, সরিয়ে নিয়ে যায় তার কোন ঠিক-ঠিকানা থাকে না। এর ব্যতিক্রম বাংলার বিপ্লবী পার্টিতেও ঘটে নি। সেইজন্য বাংলা দেশে অনেকগুলি ব্যক্তি-কেন্দ্রিক দল গড়ে উঠেছিল।

সেই সময় সারা দেশ জুড়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন তীব্রভাবে চলেছে। তখন আমার সব সময় মনে হয়েছে গান্ধীজী যেমন তাঁর

বিরাট ব্যক্তিত্ব নিয়ে কংগ্রেসের হাল ধরেছেন, ঠিক তেমনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কোন বিপ্লবী-প্রতিভার আবির্ভাব ভারতবর্ষে হয় নি কেন? বিপ্লবী দাদাদের মধ্যে কেউ যদি যতীন মুখার্জীর মত ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিপ্লবের দায়িত্ব গ্রহণ করে উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তুলতে পারতেন তবে হয়ত ভারতের ইতিহাস আর এক-ভাবে লেখা হত। ভিন্ন ভিন্ন উপদলের নেতাদের মধ্যে একজনও যদি এরকম একটা প্রোগ্রাম নিতেন—এক হাজার নির্ভীক বিপ্লবী যোদ্ধা, এক হাজার হাল্কা অস্ত্র এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ,—তারপর সেই প্রোগ্রাম কার্যে পরিণত করে সংগঠন গড়ে তুলতে পারতেন তবে উপদলের অস্তিত্ব থাকত কোথায়? তা' হলে কংগ্রেসের দেশ জোড়া অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে যখন 'বুলক্ ব্রাদার্স স্ট্রাইক্', 'আসাম-বেঙ্গল রেল স্ট্রাইক্', 'ঝরিয়া কয়লা-খনির স্ট্রাইক্' প্রভৃতি চরম পর্যায়ে উঠল তখন এইরূপ একটি বিপ্লবী নেতৃত্ব বাংলায় অন্তত বৃটিশ সরকারকে পরাস্ত করতে পারত। আজ স্বীকার করতে হবে বিপ্লবীদের মধ্যে কেউ সেই সাংগঠনিক নেতৃত্ব দিতে পারেন নি। তার অন্যতম কারণ দাদারা যতই বিপ্লবের কথা মুখে বলুন না কেন তাঁদের অবচেতন মনে বা চেতন মনেও বটে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব পুরা মাত্রায় ছিল।

দুঃখের বিষয় ১৯২১-২৪ বা তৎপরবর্তী কালে বাঙলা দেশের বা ভারতেব প্রাক্তন বা নূতন বিপ্লবী নেতাদের মধ্য থেকে তেমন কোন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটেনি। তখন তাঁদের বুর্জোয়া ডেমোক্রেটিক বা প্রোলেটারিয়েট রিভলিউশানের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না, সেই যুগে তা থাকা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদের জন্য জাতীয় সংগ্রাম বা সারা ভারতের সংগ্রাম যে অপ্রতিহত গতি ধারণ করেছিল তা বোঝা তাঁদের পক্ষে নিশ্চয়ই শক্ত ছিল না।

গান্ধীবাদকে মুখে অন্তত আমাদের প্রাক্তন নেতারা সমর্থন করতেন না। যুবকেরা তাঁদের বিপ্লবী ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ছুটে গেছে—চেয়েছে নির্দেশ—জানতে চেয়েছে সশস্ত্র বিপ্লবের নীতি (ষ্ট্রাটেজী) ও কৌশল। বিপ্লবী প্রবীণ নেতারা বই পড়েছিলেন প্রচুর—জ্ঞানও ছিল যথেষ্ট, তবু যুবকদের সামনে কোন সশস্ত্র বিপ্লবের সামগ্রিক প্রোগ্রাম তাঁরা রাখেন নি কেন? বৃটিশকে পরাস্ত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার কোন সক্রিয় পরিকল্পনা তাঁদের কারও ছিল না কেন? বিরাট, ব্যাপক ও প্রবল অহিংস গণ-জাগরণকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করলে হয়ত বিপ্লবী নেতাদের আজ স্বাধীন ভারতের পরিবর্তে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান সৃষ্টির কলঙ্ক বহন করতে হত না। জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সেইরূপ নেতৃত্ব কেন বিপ্লবী নেতারা কেউ দিলেন না? আয়ারল্যান্ড বা ইতালীতে সশস্ত্র বিপ্লবের যে সুযোগ ম্যাৎসিনী, গ্যারিবল্ডী বা ডি ভ্যালেরা পান নি তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি সুযোগ ভারতের বিপ্লবী নেতারা অহিংস আন্দোলনের মধ্যে পেয়েছিলেন! তবু তাঁরা সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন নি। এই ব্যর্থতার একমাত্র কারণ, বিপ্লব বা সশস্ত্র বিপ্লব তাঁরা মুখে বললেও অন্তর থেকে তা গ্রহণ করেন নি। গান্ধীজী অহিংস আন্দোলন নীতি (creed) হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে ও সাহসের সঙ্গে তা তিনি সর্বদা অনুসরণ করেছেন।

কিন্তু সে যুগের বিপ্লবী নেতারা অহিংস অসহযোগে বিশ্বাসী ছিলেন না, অন্তত মুখে ত তাঁরা সর্বদাই "বোমা, পিস্তল, রিভলভারের" কথা বলতেন। আজ তাঁদের স্বীকার করা উচিত যে শুধুমাত্র দল রাখার জন্যই উৎসাহী যুবকদের কাছে তাঁদের তখন মুখেই বিপ্লব বলতে হয়েছে—"বোমা, রিভলভার, পিস্তল" প্রভৃতির গান যুবকদের কানে কানেই গাইতে হয়েছে। তার বেশী আর কিছু নয়। বিপ্লবী নেতাদের এই অক্ষমতা অস্বীকারের চেষ্টা আজ ইতিহাসকে বিকৃত করবে। ইতিহাসে এই সত্যটি লেখা থাকা প্রয়োজন যে, প্রাক্তন প্রবীণ বিপ্লবী নেতারা যাঁদের ঐতিহ্যের উপর বাঙ্গলার বিপ্লবী যুব-সমাজ ভরসা করেছিল যে অহিংস আন্দোলনের পরিবর্তে তাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করবেন এবং নেতৃত্ব দেবেন—তা তাঁরা দিতে পারেন নি! এই অক্ষমতার জন্য তাঁরা ১৯৪২ সালের QUIT INDIA (ভারত ছাড়) সংগ্রামের তীব্র হিংসাত্মক পরিস্থিতির সুযোগও নিতে পারলেন না। তাই স্বাধীন ভারতের পরিবর্তে আজ দ্বিধা বিভক্ত হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের অভিশাপ ভারতের কষ্ঠলব্ধ স্বাধীনতাকেও অভিশপ্ত করে তুলেছে, আর বিপ্লবী নেতাদের ললাটে এ'কে দিয়েছে কলঙ্কের কালিমা। যদি গান্ধীবাদকে সরাসরি অন্তর থেকে মেনে নিয়েছেন বলে তাঁরা ঘোষণা করতেন তবে ইতিহাস তাঁদের ক্ষমা করত। কিন্তু বিপ্লববাদ প্রচারের অন্তরালে অহিংস নীতির গোপন উপাসনার ইতিহাস তাঁদের গান্ধীবাদের গৌরব হতেও বঞ্চিত করবে!

এই ঐতিহাসিক তথ্যটি আমার একটি অভিনব আবিষ্কার নয়। আমার মত খোলা মন ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যিনিই সে যুগ ও যুগ-নেতাদের বিচার ও বিশ্লেষণ করবেন, তাঁর কাছেই এই সত্য দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমার ধারণা—দুর্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার করলে মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয় না বরং তাতে ভবিষ্যৎ আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণের পক্ষে সাহায্য হয়।

এই সত্যটি স্বীকার করে নিয়ে বলি যে বাংলার বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও একত্রে এরকম একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কল্পনা তাঁরা করেন নি। এ'দের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতার প্রভাব পড়েছিল উপদলের নেতাদের ওপর। নিজস্ব দল নিয়ে কোন্ বিশেষ নেতার অধীনে গেলে প্রকৃত নির্দেশ ও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাবে তা' স্থির করবার ভার এ'রা প্রত্যেকে নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, মূলে ছিল ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার ও অহঙ্কারের প্রভাব।

আমাদের চট্টগ্রামের বিপ্লবী-শাখার সঙ্গে বিপিনদার ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও জ্যোতিষদার প্রতিই আমরা বেশি অনুরক্ত ছিলাম। তার একটা কারণ, আমি যতদূর জানি, বোধহয় জ্যোতিষদা গ্রুপ-নেতাদের মনস্তত্ত্ব বুঝে তরুণ কর্মীদের বিপ্লবী-আগ্রহে হস্তক্ষেপ বা বাধা দেওয়াটা সমীচীন মনে করতেন না। কিন্তু এই গুণের অভাবে বিপিনদা চাইতেন আমাদের তাঁর নিজের আয়ত্তে রাখতে। তার ফলে বিপিনদাকে অনেক ক্ষেত্রেই নিরাশ হতে হয়েছে। একদিন আমার এবং দেবেন দে'র কাছে সে কথা তিনি বলেও ফেললেন। স্পষ্ট ভাষায় চাইলেন যেন আমরা তাঁকেই আনুগত্য দিই। কিন্তু আমাদের পক্ষে তা' তখন সম্ভব হয় নি।

২

প্রথম সক্রিয় পদক্ষেপ ও পরবর্তী ঘটনাচক্র

"'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?'

এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, 'তোমার পণ কি?'

প্রত্যুত্তরে বলিল, 'পণ আমার জীবনসর্বস্ব।'

প্রতিশব্দ হইল, 'জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।'

'আর কি আছে? আর কি দিব?'

তখন উত্তর হইল, 'ভক্তি'।"

আনন্দমঠঃ বঙ্কিমচন্দ্র

বিপিনদার অজ্ঞাতে, কিন্তু জ্যোতিষদার পরোক্ষ সমর্থনে আমরা অস্ত্র সংগ্রহের জন্য একটি ডাকাতি—তখনকার দিনে যাকে বলা হত স্বদেশী ডাকাতি,—তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। চৌরিচৌরার ঘটনার পর গান্ধীজী যখন আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন তখন থেকে আমাদের দলে একটা সাড়া পড়ে গেল। জলুদা জানালেন গোপনে বে-আইনীভাবে প্রচুর অস্ত্র কেনা যেতে পারে যদি টাকা থাকে।

একদিন এক শীতের প্রত্যুষে ভূতপূর্ব জেলা-জজ টুইডেল সাহেবের পরিত্যক্ত বাংলোতে আমাদের এক সভা বসল। টুইডেল সাহেবের উইল অনুযায়ী তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে হিন্দুর মত তাঁর মৃতদেহকে লালদীঘির (চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি বড় দীঘি) পাড়ে দাহ করা হয়েছিল। প্রায় দশ বছর আগে সেই চিরাচরিত ঘটনার ব্যতিক্রম দেখার পর থেকে লোকের মনে ধারণা জন্মেছিল, টুইডেল সাহেবের প্রেতাত্মা এখনো শহরের উত্তরপ্রান্তে ঐ নির্জন পাহাড়টির নিভৃত বাংলোয় ঘুরে বেড়ায়। সেই থেকে ঐ পাহাড়ের ওপর কেউ ওঠে না।

আমাদের মিটিং-এর পক্ষে এই ধরনের ভূতুড়ে বাড়ীগুলি আদর্শস্থানীয়। তাই সেদিন পুলিশের সতর্ক চক্ষুর অন্তরালে আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে টুইডেল সাহেবের বাংলোর কথা মনে পড়ল।

পাহাড়ের ওপর উঠে বাংলোর যা চেহারা দেখলাম তাতে মনে হল মানুষ ত দূরের কথা কোন সাহসী ভূতেরও ইচ্ছা হবে না এই পরিবেশে থাকতে। রাজ্যের কাক, চিল, শকুনের বাসা। চারিদিক তারা যথেচ্ছ নোংরা করে রেখেছে। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে কুকুর, শেয়াল, গরু, ঘোড়া—সবাই। মোট কথা পাহাড়ের ওপরের সমতল জায়গাটিতে ভাঙা বাড়ীটির কোন অংশে, ছাদের কোন কোণে, একটুখানি পরিষ্কার জায়গা নেই যে, আমরা দশ-বারোজন বসতে পারি। তার ওপর দুর্গন্ধ। সেই বিকট গন্ধের চোটেই ভূত পালাবে, মানুষ তো কোন ছার। নিতান্ত আমরা পুলিশের দৃষ্টির বাইরে মিটিং করতে বদ্ধপরিকর তাই কোনমতে নাকে-মুখে রুমাল চেপে বসে পড়লাম। বড় বড় গাছের পাতা, ডাল, ভাঁজ করা র‍্যাপার, জামা ইত্যাদি নানারকমের আসন সংগ্রহ করে আমরা ক'জন গোল হয়ে বসলাম।

এর আগেও আমরা ফুটবল মাঠে বা স্কুলের কম্পাউণ্ডে একত্রে বসে আমাদের দলের নীতি বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেছি। কিন্তু আজ হঠাৎ মাস্টারদা, জলুদা আর নির্মলদা আমাদের ছ'জনের সঙ্গে এতটা গোপনে মিলিত হতে চাইলেন কেন?

তার কারণ, আজ শুধু মৌখিক বাক্-বিতণ্ডা নয়—হাতে-কলমে চলবে কাজ। প্রায় আধ-ডজন নতুন পিস্তল, রিভলভার আনা হয়েছে, জলুদা সবাইকে অস্ত্র ব্যবহারের প্রাথমিক কৌশল শেখাবেন।

প্রথম মহাযুদ্ধে বাংলা দেশ থেকে ৪৯নং বেঙ্গল রেজিমেন্ট যায় বৃটিশ

গভর্ণমেন্টকে সাহায্য করতে—জুলুদা ছিলেন সেই রেজিমেন্টে একজন সিনিয়র নন্-কমিশনড্ অফিসার। হোম রুল পাবার প্রতিশ্রুতিতে ভারতবাসীরা সেই যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল—কিন্তু যুদ্ধজয়ের শেষে 'ভার্সাই'-এর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হয়ে যাওয়ার পর বৃটিশ সরকার সেই প্রতিশ্রুতিকে হাস্যকর প্রহসনে পরিণত করল। ফলস্বরূপ এল 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্ম'—ছেলে ভুলান চুষিকাঠির মত এই রিফর্ম সামনে রেখে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করবার জন্য এল শক্তিশালী যন্ত্র 'রাউলাট অ্যাক্ট'। ভারতবাসী বৃটিশের এই চালাকিতে ভুলল না। অদূরভবিষ্যতে শুরু হল একদিকে অসহযোগ আন্দোলন, অন্যদিকে হিংসাত্মক বিপ্লবী কার্যকলাপ।

আমরা ছিলাম দ্বিতীয় মতে বিশ্বাসী—অস্ত্র দিয়ে বৃটিশ ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে হবে। এই উদ্দেশ্য কিভাবে অবিলম্বে কার্যে পরিণত করব সেই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যই আজকের মিটিং। দিনের পর দিন গোল হয়ে বসে আলোচনা করে তার বিবরণ কাগজে লেখা হলেই সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী হয় না। তাই এই নির্জন পোড়ো বাংলোয় অস্ত্রচালনার প্রাথমিক শিক্ষালাভ করা আমাদের সভার কার্যসূচীর অন্যতম অংশ ব'লে ঠিক করা হয়েছে।

সকলে বসবার পর জুলুদা অস্ত্রগুলি বার করলেন। একেবারে ঝক্‌ঝকে পালিশ করা বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি পিস্তল দেখেই মন আনন্দে নেচে উঠল। কী খুশি হয়ে যে সকলে সেগুলি নাড়াচাড়া করতে লাগলাম!

মাত্র আধঘন্টা সময় ঠিক করা ছিল। এরই মধ্যে অস্ত্রগুলির ব্যবহার ও ক্রিয়া-কৌশল সম্বন্ধে খুব সামান্য কিছু আমরা জানলাম। তারপর শান্ত হয়ে বসে সকলে পরবর্তী আলোচনার জন্য প্রস্তুত হলাম। এই কর্মসূচীর সিদ্ধান্তে পৌঁছতেও আধ ঘন্টার বেশি সময় লাগল না। কারণ নীতি-নির্ধারণ বা মতভেদ সম্বন্ধে আলোচনার কিছু ছিল না,—সে সব অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। তা' ছাড়া অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করবার আছেই বা কি? আমাদের কর্মপদ্ধতি সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট। অস্ত্র জোগাড় কর—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিদের হত্যা কর—তারপর গুলীতে কিম্বা ফাঁসি-কাষ্ঠে মৃত্যুবরণ কর— ব্যস্। চরম স্বার্থত্যাগ ও মৃত্যুবরণ করে দেশকে মরণপণ সংগ্রামের জন্য জাগিয়ে তুলব—এই ছিল সে দিনের প্রতিজ্ঞা!

আজ অস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করবার পর আমাদের আলোচ্য বিষয় আরও সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। বিশদভাবে অস্ত্র শিক্ষাটাই এখন থেকে আমাদের প্রোগ্রাম—আর সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র সংগ্রহ করবার ব্যবস্থাও আমাদের আশু প্রয়োজন।

এ ছাড়া আজকের এই বিশেষ সভায় আমাদের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল। আমার জীবনে এই আলোচনার সার বস্তুটি যে রেখাপাত করেছিল তা' আমি কোন দিনও ভুলতে পারি নি। সে দিনই হয়ত সব চেয়ে সুস্পষ্টভাবে বুঝেছিলাম কতখানি অন্তরের গভীরতা থাকলে বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলা যায়।

জুলুদা কাজের প্রসঙ্গ তুললেন। অবশ্য প্রসঙ্গটা অস্ত্র সম্বন্ধেই। সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন—তার সুস্পষ্ট উত্তর।

জলুদা আমাদের প্রত্যেকের কাছে তাঁর একটা প্রশ্নের উত্তর চাইলেন,—

"দেখ, বহু বছর ধরে আমরা এই সংগঠনে রয়েছি। এতদিন পরে আমাদের হাতে এসেছে মাত্র এই কয়টি অস্ত্র। কিন্তু সত্যি বলতে কি, বহু অস্ত্র আছে যা' গোপনে জোগাড় করা সম্ভব। ভেবে দেখ, আমরা যে এখন পর্যন্ত মাত্র এই কয়টি অস্ত্রের বেশি সংগ্রহ করতে পারি নি এর কারণ কি? কী সেই বাধা যা' আমরা অতিক্রম করতে পারছি না?"

জলুদা নীরব হলেন। আমরা সকলেই চিন্তা করছি। এবার জলুদা জনে জনে জিজ্ঞাসা করলেন এ বিষয়ে আমাদের ধারণা কি? কিসের জন্য বা কিসের অভাবে আমাদের চোখের সামনে গোপনে অস্ত্র জোগাড়ের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা' এতদিন করতে পারি নি?

প্রথম একজন বললেন—"যথেষ্ট টাকা আমাদের নেই, তাই অস্ত্র কিনতে পারছি না।" পর পর তিনজনই একই উত্তর দিলেন। এবার আমার পালা। জলুদা প্রশ্ন করলেন, "তোমার কি মনে হয়? তুমিও কি ওদের মত মনে কর যে টাকার অভাবই আমাদের অস্ত্র না পাবার প্রধান কারণ?"

আমি কিন্তু সত্যিই টাকা না থাকাকে খুব বড় করে দেখছিলাম না। টাকা দিলে যদি অস্ত্র পাই তবে সে টাকা যেন-তেন-প্রকারেণ জোগাড় করবই। তাই আমি বললাম, "আমার মনে হয় আমাদের ইচ্ছাশক্তির অভাবই এর প্রকৃত কারণ। প্রবল ইচ্ছা থাকলে আমাদের প্রয়োজন মত অস্ত্র সংগ্রহ নিশ্চয়ই আমরা করতে পারতাম।"

আমার এই উক্তি অনেকের কাছেই সত্য বলে মনে হল। পরবর্তী সাথীরা আমার মতই সমর্থন করলেন। নির্মলদাও বললেন, "উপযুক্ত ইচ্ছা-শক্তির অভাবেই যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্র সংগ্রহ করে আমরা আমাদের প্রোগ্রাম কাজে পরিণত করতে পারছি না।"

আমাদের দলের রোগের কারণ নির্ণয় হয়ে গেল। সবাই নিশ্চিন্ত। প্রয়োজনীয় টাকা যে কোন উপায়ে পাওয়া চাই।

কিন্তু একজন এ পর্যন্ত কোন কথা বলেন নি। আমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনছিলেন তিনি। বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যেকের মনের অন্তস্তল পর্যন্ত যাচাই করে দেখছিলেন।

আমরা সকলেই এবার তাঁর মুখের দিকে চাইলাম। উদ্দেশ্য—তিনি আমাদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করুন। জলুদাও চাইছিলেন তাঁর মত জানতে। কিন্তু প্রশ্ন করে তাঁর শান্ত গাম্ভীর্য ব্যাহত করতে দ্বিধা বোধ করছিলেন।

মাস্টারদা বোধহয় বুঝলেন আমাদের মনের কথা—জলুদার নীরব চোখের প্রশ্নের ভাষাও উপলব্ধি করলেন। মুখে মৃদু হাসির রেশ টেনে শান্ত সংযত গলায় প্রতিটি কথায় জোর দিয়ে বললেন—

"আমার মনে হয় প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধির অভাবেই আমরা পিছিয়ে আছি।"

ঠিক এই ক'টি কথা ইংরেজীতে বলেছিলেন মাস্টারদা—"Want of realisation of our GOAL"। এই একটি মাত্র কথায় তাঁর যা বলার ছিল সব বলা হয়ে গেল। আর ঐ একটি কথার মৃদু কম্পন আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের দরজায় আঘাত দিয়ে নয়জন বিপ্লবীর মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। প্রত্যেকে

নিজের মন হাতড়াতে শুরু করলাম। নিজের উপলব্ধির পরিধি যাচাই করে আমার নিজের মনে সঙ্কোচ এল—লজ্জিত হলাম। মাস্টারদার কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম কিনা জানি না, তবে আমি বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম সেই কথাটি যে—অন্তরের অন্তস্তল থেকে যদি উপলব্ধি না আসে তবে আমাদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।

সেদিন মাস্টারদার এই একটি কথা আমার প্রতিদিনের অবসর সময়ে বার বার আমাকে সচেতন করে তুলেছে। নিজের মনে নিজেকে প্রশ্ন করেছি—"আমাদের চরম লক্ষ্য কি আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি ?"

চরম লক্ষ্যে পেঁাছাতে হলে তার উপায় খুঁজে বার করতে হবে। যত মত, তত পথ। আমাদের পথে এখন অবিলম্বে প্রয়োজন অস্ত্র এবং তার আগে চাই অস্ত্র কিনবার টাকা। অর্থাৎ এখন সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হবে অর্থ সংগ্রহের কাজে।

তখনকার দিনে বিপ্লবীদের মধ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য ধনীগৃহে ডাকাতি করার প্রথা প্রচলিত ছিল। আমাদের দলেও এরকম মনোভাবের অভাব ছিল না। কিন্তু প্রতিটি মিটিং-এ আমি বারবার প্রস্তাব করেছি যে এই টাকা যতটা সম্ভব প্রথমে আমাদের নিজেদের বাড়ী থেকে জোগাড় করব। আমার মত ছিল,—

"রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যের বাড়ী থেকে টাকা ছিনিয়ে আনবার অধিকার তখনই হবে যখন আমরা ত্যাগস্বীকার করে আমাদের নিজ নিজ বাড়ী থেকে টাকা এনে দিতে পারব।"

নির্মলদা আমার এই মত পুরোপুরি সমর্থন করতেন। রাজনৈতিক ডাকাতি এড়াবার পক্ষে আমার আরও একটা যুক্তি ছিল। ১৯২২ সালে যখন পুলিশ আমাদের গতিবিধি সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন নয় তখন হঠাৎ এরকম কোন ডাকাতি হলে সরকার পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যাবে যে আবার "সন্ত্রাসবাদীরা" দেশে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে। তখন তাদের দমন করবার জন্য পুলিশ উঠে পড়ে লাগলে আমাদের প্রস্তুতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে।

প্রথম দিকে নেতারা আমার প্রস্তাবের যৌক্তিকতা স্বীকার করেছিলেন। প্রস্তাব মত হিসেব করে দেখা গেল আমরা অল্প কয়েকজন বাড়ী থেকে গৃহকর্তার অগোচরে মোট পাঁচ থেকে ছয় হাজার পর্যন্ত টাকা এনে দিতে পারি।

শেষ পর্যন্ত আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হল এই যুক্তিতে যে, অনেকে মনে করলেন স্বদেশী ডাকাতির ঝুঁকি নিতে অবচেতন মনে ভীত হচ্ছি বলেই এমন প্রস্তাব আসছে। আমি আমার নিজের মনকে বারবার যাচাই করে দেখেছি, সেখানে ভীরুতার কোন চিহ্ন নেই, কিন্তু কাকে আমি মনের ভেতরটা খুলে দেখিয়ে বলতে পারি যে, "না, বিন্দুমাত্র ভীরুতা আমার নেই।"

১৯২৮-৩০ সালে দ্বিতীয়বার যখন নতুন প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা বিপ্লবীদল গঠন করি, তখন আমরা কখন কোথাও ডাকাতি করে অর্থসংগ্রহ করি নি। তখন আমার সাথীরা আমার গত কয়েক বৎসরের রাজনৈতিক কার্যকলাপ দেখে এবিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে ডাকাতিতে আমার অনিচ্ছা ভীরুতাপ্রসূত নয়। কিন্তু এখন এই ১৯২২ সালে আমি আমার দলের সদস্যদের কাছে

এমন কোন বীরত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজের নিদর্শন দেখাতে পারি নি যার ফলে তাঁরা বিশ্বাস করবেন যে আমার অবচেতন মনেও কোনদিন এ ধরনের ভীরুতা স্থান পায় নি। অথচ চিন্তা করে দেখতে গেলে আমার প্রস্তাব কাজে পরিণত করার পথেই দ্বিধা আসে বেশি। নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে মাথা হেঁট হবে, নিজের বাড়ীতে অর্থাভাব হবে,—এর জন্য মনকে প্রস্তুত করতে অনেকখানি সময় এবং অনেক মানসিক দ্বন্দ্ব পার হতে হয়। সকলে মিলে বন্দুক-পিস্তল নিয়ে ছদ্মবেশে রাজনৈতিক ডাকাতি করবার কর্মসূচী আমাদের কাছে বরং এর চেয়ে সহজ ছিল।

যাহা হউক, যখন দলের সকলে অর্থসংগ্রহের জন্য রাজনৈতিক ডাকাতি করাই স্থির করলেন তখন আমিও কম খুশি হলাম না। তার কারণ, ভেবে দেখলাম অগ্নিযুগের বিপ্লবী কর্মধারার বহুদিনের বিরতির পর আবার আমরা তাকে প্রথম জাগিয়ে তুলব বাংলাদেশে,—আর এই হবে আমার প্রথম বিপ্লবী অভিযানের হাতে খড়ি।

যখন আমরা সর্বশেষ প্রস্তাব নিলাম যে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য আমাদের রাজনৈতিক ডাকাতি করতে হবে, সেই সময়ে গত যুগের বিপ্লবী দাদারা একে একে মুক্তি পাচ্ছেন। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে তাঁরা দলে দলে যোগ দিচ্ছেন। পুলিশ সতর্ক দৃষ্টি রাখছে এঁদের ওপর, আন্দোলনের গতির ওপর। ঠিক এই সময়ে এই ধরনের একটি ডাকাতি হলে স্বভাবতই পুলিশের সন্দেহ গিয়ে পড়বে প্রাক্তন রাজবন্দীদের ওপর। হয়ত তাঁরাও কারারুদ্ধ হবেন আমাদের এই অসময়োচিত বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য।

এই অবস্থায় অর্থের প্রয়োজনে আমরা রাজনৈতিক ডাকাতি করতে এইরূপ নীতি অনুসরণ করি,—

(১) আমরা প্রথমেই সরকারী বা রেলওয়ের বা ব্যাঙ্কের টাকা লুঠ করে আমাদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের সন্ধান পুলিশকে দেব না।

(২) সুতরাং এমন একজন ধনীব্যক্তির বাড়ী ঠিক করতে হবে যেখান থেকে আমরা অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা পেতে পারি, যা দিয়ে প্রাথমিক স্তরে অস্ত্রশস্ত্র কেনা চলবে।

(৩) যত দূর সম্ভব ব্রীচলোডার বন্দুক ব্যবহার করব, যাতে পুলিশ মনে করে এটা সাধারণ ডাকাতি। যদি ঘটনাচক্রে পিস্তল বা রিভলভার ব্যবহার করতেই হয়, তবে কার্তুজের শূন্য খাপগুলি কুড়িয়ে রাখব, যাতে পুলিশ নিশ্চিত বুঝতে না পারে যে 'ডাকাতেরা' পিস্তল বা রিভলভার ব্যবহার করেছে।

(৪) তা' ছাড়া পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য দাড়ি গোঁফ পরে ও মুসলমান সেজে যাব এবং এমন সব কদর্য ভাষা ব্যবহার করব যাতে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে না পারে যে, আমরা শিক্ষিত ভদ্র হিন্দু যুবক—স্বদেশী ডাকাত।

আমাদের দায়িত্ব তখন খুবই বেশি। সামান্য অবিমৃষ্যকারিতার ফলে গভর্ণমেন্টকে আবার 'অর্ডিন্যান্স' জারী করবার সুযোগ কোনমতেই দেওয়া চলবে না। আর বিপ্লবীদের প্রস্তুতির পূর্বে কোন বাধা আসুক—তাও আমরা চাই না। সেই উদ্দেশ্যে আমাদের লক্ষ্য স্থির করতে হল চট্টগ্রামের দূর গ্রামদেশে এক ধনী ব্যক্তির বাড়ী।

এই বাড়ীটি নির্বাচন করাও খুব সহজ হয় নি। মাস্টারদা, অম্বিকাদা এবং জুলুদা—এ'রা নিজেরা অথবা চর পাঠিয়ে বিভিন্ন গ্রামের ধনী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করছিলেন। এই সমস্ত সংবাদ থেকে সুবিধেমত একটা বাড়ী বেছে নিতে হবে। সেটাও সহজ কাজ নয়। উপরন্তু নেতাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। সুতরাং একটা দায়িত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ সফল করবার পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা তাঁদের পক্ষে তখন সম্ভব হয় নি।

নেতারা যখন অর্থ সংগ্রহের আশায় বিভিন্ন গ্রামের ধনীগৃহ সম্বন্ধে সংবাদ আহরণ করছিলেন, ঠিক সেই সময় আমি আবার একটু অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। সেদিনকার মিটিং-এ চকচকে আগ্নেয়াস্ত্রগুলির প্রতিচ্ছবি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। তা ছাড়া মাস্টারদার কথাগুলি মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। ভাবছিলাম, যেমন করে হউক নিজের চেষ্টায় অস্ত্র যোগাড় করতেই হবে। জুলুদার কাছে শুনেছিলাম টাকা থাকলে 'স্মাগলার'দের কাছে অস্ত্র পাওয়া যায়। 'স্মাগলার' কথাটি আমার কাছে যেন রূপকথার একটি নাম বলে মনে হয়েছিল। জানতাম না তারা কি রকম দেখতে,—আমাদের মতই সাধারণ মানুষ না অন্য কোন দানবাকৃতি জীব। যদি তারা মানুষই হয়, তবে, কি তাদের জাত, কি ধর্ম, কি পেশা— কিছুই জানি না। আর, সবচেয়ে কঠিন কথা, কি করে তাদের কাছে পেঁাছব?

'স্মাগলার' কথাটি জুলুদার কাছে শোনা। আবার দলের গোপনীয়তা সংক্রান্ত আইন অনুসারে এ সম্বন্ধে জুলুদাকে কোন প্রশ্ন করবার অধিকারও আমার নেই। তবে কে আমাকে বলে দেবে কি রকম তাদের চেহারা, কোথায় তাদের সন্ধান পাওয়া যায়! তখন থেকে আমার ধ্যানজ্ঞান হল কোনমতে একজন 'স্মাগলারকে' খুঁজে বার করে তার কাছ থেকে একটা পিস্তল কেনা।

"Necessity is the mother of invention"—স্মাগলারদের খুঁজে না পেয়ে অন্য পথের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। আমার বাবার বন্ধু, একজন বিশিষ্ট জমিদার ও উকিল, রৈজুদ্দিন মিঞার একটি রিভলভার ছিল— ভাবলাম সেইটিই কোন মতে সরিয়ে ফেলব।

শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনাও বাতিল করে দিতে হল। কারণ মাস্টারদা বুঝিয়ে দিলেন যে, সামান্য হিসাবের ভুলে এই ঘটনা আমার এবং আমাদের দলের প্রতি অযাচিত বিপদ ডেকে আনতে পারে।

তাহলে এখন কি করি? কোন উপায়ই কি নেই? কোনমতে কিছু অস্ত্রশস্ত্র গোলা-বারুদ জোগাড় করা কি একেবারেই অসম্ভব?

ভাবতে ভাবতে চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি অস্ত্রাগারের দৃশ্য। সেই একটি অস্ত্রাগারের অস্ত্র যদি কোনমতে সরাতে পারি তাহলে আমাদের প্রয়োজনমত অস্ত্রশস্ত্র পাব। আর এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে হবে না।

বিরাট এক রাজপ্রাসাদ—প্রাসাদের সীমানার মধ্যে মিলিটারী ব্যারাক, অস্ত্রাগার, ম্যাগাজিন,—আর প্রাসাদের ভিতরেও মহারাজার নিজস্ব ছোট একটি আর্মারি। কতবার ওখানে বেড়াতে গিয়েছি, কতবার দেখেছি আর্মারি ও ম্যাগাজিন কক্ষের সামনে পাহারা দিচ্ছে মহারাজার নিজস্ব সান্ত্রী।

আগরতলার মহারাজার বিরাট প্রাসাদ। রাজ-দরবারে চাকরী করেন

আমার বড়মামা,—আমার মামাতো ভাই উমেশ সিং (বর্তমানে বোধ হয় ত্রিপুরা রাজ্যপরিষদের স্পীকার) তদানীন্তন যুবরাজের বন্ধু। আমার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট ছিল সে। উমেশের সঙ্গে বহুবার প্রাসাদ প্রাঙ্গণে বেড়াতে গিয়েছি। সমস্ত দৃশ্যটি আমার চোখে যেন দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠল। ঐ তো, প্রধান গেট দিয়ে ঢুকে একপাশে ব্যারাক, তারপর অস্ত্রাগার ও ম্যাগাজিন,—কয়েক মিনিটের কাজ মাত্র, যদি ঠিক মত ব্যবস্থা করা যায়। অন্তত কয়েকটা ছোট ছোট পিস্তল ও রিভলভার নিশ্চয়ই সরান যাবে। তা না পারলেও বেশ কিছু টোটা তো নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে!

অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র লুঠ করতে হলে আরও অনেক খবর জানা দরকার; তা ছাড়া জায়গাটি সম্বন্ধেও খুঁটিনাটি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমার নিজের মামার কথা তো আগেই বলেছি। তিনি ছাড়াও আমার দূর সম্পর্কের কয়েক-জন মামা মহারাজের সৈন্যবিভাগে কাজ করেন। কাজেই ওখানে একবার গেলে সব রকম তথ্যই জোগাড় করতে পারব। মনে মনে প্ল্যানটা এ'টে ফেললাম। আর দেরি নয়, এক মুহূর্তও দেরি নয়। এখনি গিয়ে সব খবর আনতে হবে। এখানে বসে বসে চিন্তা করে সময় নষ্ট করবার কোন প্রয়োজন নেই।

'ভবিষ্যৎ যত মধুরই হউক, তার আশায় বসে থাকব না—মন তাজা থাকতে থাকতে এখনি কাজে হাত দেব'—এই ছিল আমার জীবনের মন্ত্র। সুতরাং ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে সোজা চলে গেলাম মাস্টারদার কাছে—জানালাম তাঁকে আমার মনের বাসনা। আগরতলায় যাবার জন্য অনুমতি চাই। সব কিছু সরেজমিনে তদন্ত করে ফিরে এসে রিপোর্ট দেব।

অধীনস্থ কোন শিষ্য নিজে বিপজ্জনক কোন পরিকল্পনা করে স্বেচ্ছায় সে সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করতে যেতে চাইছে—এরকম একটা ঘটনায় তখনকার দিনের কোন কোন দীক্ষাগুরুর আত্মসম্মান আহত হত—এটাকে তাঁরা শিষ্যের ঔদ্ধত্য বলে মনে করতেন। কিন্তু মাস্টারদা সঙ্কীর্ণচেতা আত্মসর্বস্ব নেতা ছিলেন না। প্রত্যেকের মনস্তত্ত্ব অনুশীলন করে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করে তিনি অবস্থা অনুযায়ী নির্দেশ দিতেন। আমার আগ্রহ এবং আত্মনির্ভরতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। আবার আমার একগুঁয়েমির কথাও তাঁর অবিদিত ছিল না। আমি প্রস্তাবটি পেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুমোদন করলেন; তবে আমাকে বিশেষভাবে সাবধান করে দিলেন যেন উৎসাহের আধিক্যে খবর সংগ্রহ করার চাইতে বেশি কিছু করতে না যাই।

পরদিন আগরতলায় মামারবাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। হঠাৎ আমাকে দেখে সবাই ভারি খুশি। ওঁরা বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমি কোনদিন যাই নি, এবার না বলতেই এসে হাজির! মামা-মামীমার আদর আপ্যায়ন প্রায় মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। সব রকম আরাম, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার ওপরেও আবার আমার আমোদের জন্য শিকার-পার্টির আয়োজন করা হল।

আমার মন পড়ে আছে আর্মারি আর ম্যাগাজিনের দিকে। তবু তাঁদের আদর যত্নে যেন খুব খুশি হয়েছি এমন ভাব দেখাতে লাগলাম এবং আরও ঘনিষ্ঠভাবে গল্প করে, বেড়িয়ে, আমার আসল উদ্দেশ্য সফল করবার পথ খুঁজে বেড়াতে লাগলাম।

সুযোগের অভাব ছিল না। আগেই বলেছি আমার মামারা মহারাজার

সৈন্য বিভাগে কাজ করতেন। তাঁদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে প্রয়োজনীয় সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করলাম। এরপর দেখতে হবে প্রাসাদের ভিতরকার মহারাজার নিজস্ব অস্ত্রাগারটি। সেখানে চট করে ঢোকা যায় না।

তারও ব্যবস্থা হল। অনেক চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত আমার মামাতো ভাই উমেশকে সব কথা খুলে বললাম। কি উদ্দেশ্যে এসেছি তাও বললাম। তার বয়স তখনো চৌদ্দ পেরোয় নি—আমার কথায় সে নেচে উঠল। আমার প্রস্তাবে আগ্রহভরে সায় দিল—আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিল। তার উৎসাহের সুযোগ নিয়ে আমি আমার উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হলাম।

শীতের প্রভাত। শীতবস্ত্রে সর্বাঙ্গ আবৃত করে আমি আর উমেশ চলেছি রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে। উমেশকে সকলে চেনে। প্রশ্ন না করে দ্বারী দ্বার ছেড়ে দিল। আমার মামার সঙ্গে আগে থেকেই ব্যবস্থা ছিল। তিনি আমাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রাসাদ দেখাতে লাগলেন। উমেশের অবশ্য সবই দেখা। কিন্তু আমার কাছে সবই নতুন। নতুন হলেও সেদিকে মন ছিল না; ভাবছিলাম কতক্ষণে সেই বিশেষ ঘরটি দেখতে পাব!

একটু পরেই মহারাজার অস্ত্রাগারে পেঁৗছলাম। ভারি সুন্দর করে সাজানো ঘরটি। দেয়ালের গায়ে কাঁচের দরজা দেওয়া আলমারী—তাতে নানা-রকমের অন্তত শ'খানেক বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল, রিভলভার সাজান রয়েছে।

এই অস্ত্রাগারটি আমার মামার তত্ত্বাবধানে রয়েছে—চাবীও তাঁর কাছে থাকে। আমি শিশু-সুলভ কৌতূহল দেখালাম। মামা আমাকে বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন অস্ত্রের ব্যবহার বুঝিয়ে দিলেন। এত অস্ত্র, এত রকমের অস্ত্র এক সাথে কখনো দেখি নি,—তার ওপর ইচ্ছা মত যে কোন অস্ত্র হাতে নিয়ে দেখছি! আমার যেন আর মাথার ঠিক ছিল না। উমেশ কিন্তু আমার মত উত্তেজিত হয় নি,—ওর কাছে এসব পুরান হয়ে গেছে।

এর আগে একদিন মামা আমাদের মহারাজের 'কুঞ্জবন' দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কি সুন্দর! মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়,—তার চারপাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আগরতলার মহা-রাজার 'কুঞ্জবন'। মহারাজার পশুশালাও এখানে,—কত রকমের পশু, পাখী, সাপ, মাছ সংগ্রহ করে প্রাকৃতিক পরিবেশে রাখা হয়েছে তাদের! আগরতলায় যারা আসে 'কুঞ্জবন' দেখা তাদের প্রোগ্রামের একটি বিশেষ অঙ্গ।

সেদিন কী দেখেছিলাম কুঞ্জবনে আজ আমার ভাল করে মনে নেই। কিন্তু এতদিন পর লিখতে বসে এখনো যেন আমার চোখের ওপর ভাসছে কাঁচের দরজার ফাঁকে ফাঁকে সেই অমূল্য সামগ্রী। আচ্ছা, যদি দেখার নাম করে কোন ফাঁকে একটা সরিয়ে ফেলি—তাহলে কি হয়?

আমার নিজস্ব একটি আগ্নেয়াস্ত্র—ভাবতেও রোমাঞ্চ অনুভব করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে মাস্টারদার সতর্কবাণী। সামান্য লোভের বশে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিতে পারি না,·দলের স্বার্থ ব্যক্তিগত রোমান্টি-সিজম-এর ঊর্ধ্বে। তা ছাড়া আরও একটি কথা আছে,—এখান থেকে একটি অস্ত্রও যদি চুরি যায়, তবে মামাকে তার দায়িত্ব বহন করতে হবে।

পিস্তল-রিভলভার না নিলেও কয়টা কার্তুজ নিতে দোষ কি? ওগুলির তো আর হিসেব থাকে না—অজস্র রয়েছে। মামাকে বললাম কথাটা। মামা আমার কৌতূহল দেখে মনে মনে হাসলেন। আমার আসল উদ্দেশ্য জানতে পারলে প্রাসাদের দরজা আমার মুখের ওপর তখনি বন্ধ করে দিতেন। মামার অনুমতি পেয়ে আমি পকেট ভর্তি করে কার্তুজ নিলাম—প্রায় শ'খানেক "মশার" পিস্তলের কার্তুজ।

ঐ অস্ত্রাগারটি ছোট, বেশি কার্তুজ ছিল না। তাই মামা আমাকে বেশি নিতে বারণ করলেন; বললেন নিচে আর একটা ম্যাগাজিন কক্ষ আছে সেখান থেকে আমাকে দেবেন।

প্রাসাদের একতলায় ম্যাগাজিন কক্ষে গিয়ে মামা দরজায় দাঁড়ালেন। তাঁর প্রহরায় নিশ্চিন্ত হয়ে আমি আর উমেশ যত পারি রিভলভার-পিস্তল-রাইফেলেব তাজা কার্তুজ নিয়ে পকেট ভর্তি করতে লাগলাম। কত বোর, কত সাইজ, কোন্ কোম্পানীর তৈরি—কিছুই দেখবার সময় নেই। নিমেষের মধ্যে প্রায় হাজারখানেক কার্তুজ সংগ্রহ করলাম দুজনে মিলে। শীতবস্ত্রের আড়াল এদের লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করল।

ম্যাগাজিন থেকে পকেট ভর্তি করে কার্তুজ ত নেওয়া হল, এখন প্রাসাদ থেকে বেরব কি করে? দরজায় সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়ান। নিয়ম আছে বেরবার সময় পরিচিত কি অপরিচিত সবাইকে সার্চ করতে হবে। আর ঢুকবার সময় পাশ দেখালেই চলবে। পাশ দেখিয়ে ঢুকেছি, এখন তল্লাসী না করিয়ে বেরব কি করে? আর, সার্চ করবার সময় যদি ধরা পড়ি, তবে —মনে পড়ল মাস্টারদার কথা। আমাকে ভাল করে জানতেন বলেই বার বার সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এখন কি করি?

একমাত্র ভরসা আমার সঙ্গী দু'জন। মামা এখানকার অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী; আর উমেশ—একে মামার ছেলে তায় যুবরাজের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের কথা সকলেই জানে। যুবরাজ উমেশের বাড়ীতে বেড়াতে যান, উমেশের ঘোড়া নিয়ে কতদিন বেড়িয়ে এসেছেন। উমেশের প্রাসাদে যেতে আসতে কোন বাধা নেই—নিয়ম থাকলেও সার্চ করে না। কিন্তু আমি অপরিচিত বিদেশী,—আমাকেও সার্চ করবে না সে ভরসা কোথায়?

কিন্তু 'No risk, no gain' সুতরাং অনেকখানি লাভের জন্য একটু ঝুঁকি না হয় নিলামই। বিশেষতঃ সার্চ করবেই এমন কোন কথা নেই। কাজেই এমন একটা সুযোগ হারান অন্যায় বলে মনে হল। কার্তুজ-ভরা পকেটের ওপর শীতবস্ত্র জড়িয়ে বুক টান করে উমেশের পাশে পাশে গেট ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। প্রহরী একবার উদাসীন দৃষ্টি আমার দেহের উপর বুলিয়ে নিল। সার্চ করবার কোন ইচ্ছা দেখা গেল না।

বাড়ী এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে দুজনে পকেট উজাড় করে দেখি· ·৩২০, ·৩৮০, ·২২০ বোরের পিস্তল আর রিভলভারের গুলীই বেশি। তাছাড়া আছে জার্মান 'মজার', পিস্তলের কার্তুজ। ১৯১১ সালে রডা কোম্পানীর বন্দুকের দোকান থেকে বিপ্লবীরা সরিয়েছিল এই ধরনের পিস্তল যা' থেকে এক নিমেষে দশটি গুলী ছুটত হাজার গজ পাল্লায়। এতগুলি

কার্তুজ যে সরিয়েছি তা' আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ জানত না। আমার চামড়ার সুটকেশে কার্তুজগুলি ভরে ফেললাম।

এ তো গেল সামান্য একটা কাজ—আসল পরিকল্পনাটাই এখনো বাকী। এবার আমার একজন দূর সম্পর্কীয় মামাকে দলে টানলাম। বিপ্লবীদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করে তুললাম। মহারাজার সেনা-বাহিনীতে সামান্য পদে কাজ করতেন তিনি। দু'জনে মিলে প্ল্যান করলাম, তিনি যখন আর্মারী এবং ম্যাগাজিন কক্ষের প্রহরী নিযুক্ত থাকবেন তখন আমরা সে সব ঘরে ঢুকে কুড়ি-পঁচিশটা রাইফেল এবং গুলী সরিয়ে ফেলব। পাটের বস্তায় প্যাক করে নদীপথে সেগুলি চট্টগ্রামে যাবে। এই উদ্দেশ্যে আমার মামাকে (উমেশের বাবা) রাজী করালাম যে আমার এক বন্ধুকে তিনি আগর-তলার সৈন্যবাহিনীতে চাকরী জোগাড় করে দেবেন।

সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে যখন চট্টগ্রামে ফিরে গেলাম তখন আমার কাজের বিবরণ শুনে, অতগুলি কার্তুজ দেখে, উপরন্তু এতগুলি আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের আশু সম্ভাবনায় মাস্টারদা আর জুলুদা খুব খুশি হলেন। আমার সাফল্যের জন্য কত রকমে যে প্রশংসা করতে লাগলেন তার ইয়ত্তা নেই।

আমার পরিকল্পনা মত সেনাবাহিনীতে চাকরী নেবার জন্য আমাদের একজন বন্ধু, রাখাল দেকে, মাস্টারদার অনুমতি নিয়ে আগরতলায় পাঠালাম। রাখাল মাস্টারদার ছাত্র। সুন্দর বলিষ্ঠ তার দেহ। সে দলিল রহমান, সুকুমার বিশ্বাস প্রভৃতির বিশিষ্ট বাল্যবন্ধু। আর্থিক অবস্থা তার খুব ভাল ছিল না। অর্থনৈতিক চাপে সে বিপ্লবের পথ ছাড়ে নি। রাখাল দে ১৯২৬ সালে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই মামলার পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৯২১ সালে গুরু দায়িত্ব নিয়ে সে গেল আগর-তলায়। তার সেই দিনের মিশন—আগরতলা মহারাজার সৈনিক বিভাগে সাধারণ সৈন্য হিসাবে ভর্তি হওয়া। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে সে প্রায় মাস দুয়েক উমেশদের বাড়ীতে ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত হল না। নেতারা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, কারণ তাঁদের মতে রাইফেলের মত বড় অস্ত্র কাজে লাগান, ঠিক সেই সময়, আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

ইতিমধ্যে নেতারা ডাকাতি করবার পক্ষে উপযুক্ত বাড়ীগুলি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়েছেন। বাড়ীগুলির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে। বেছে নেবার আগে এই কয়েকটি বিষয় ভালভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে—বাড়ীটির অবস্থান, পুলিশ থানা বা পুলিশ ফাঁড়ি থেকে দূরত্ব, পথ-ঘাট ও আশ-পাশের লোকজন, কাছে-পিঠে কারো বন্দুক আছে কিনা এবং ওখান থেকে কতটা দূরে গিয়ে আমরা টাকা-পয়সা ও জিনিসপত্রগুলি নিরাপদ স্থানে সরাবার ব্যবস্থা করে ফেলতে পারি!

এত সব খবর খুঁটিয়ে নেবার কারণ ওঁরা চাইছিলেন ডাকাতি করে যেন ধরা না পড়ি বা কোন চিহ্ন রেখে না যাই! কাজেই লক্ষ্য স্থির করতে সময় লাগছিল। আমাদের দ্রুত কাজ করতে হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু অবিবেচকের মত তাড়াতাড়িতে যেন কাজটা নষ্ট করে না ফেলি!

দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। মাসের পর মাস চলে গেল। তবু আমাদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় না।

সেদিন কালীপূজার রাত্রি। সে সময়ে আমরা সকলেই মা-কালীর ভক্ত ছিলাম। আমাদের প্রথম বৈপ্লবিক অভিযানের প্রারম্ভে এল কালীপূজাব বিশেষ দিনটি—স্থির করলাম বিশেষভাবে দিনটি উদ্‌যাপন করব।

আমরা প্রায় পনেরজন একটা বড় দেশী নৌকায় করে শহর থেকে প্রায় পনের মাইল দূরে নদীতীরে এক নির্জন স্থানে পৌঁছলাম। সন্ধ্যা সাতটা হবে তখন। সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ, চারিদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে নামছে। অমাবস্যার রাত বলে চাঁদেরও দেখা নেই। তারাগুলি শুধু মিটমিট করে আমাদের দেখছে আর অবাক হয়ে ভাবছে রাত করে এই নির্জনে এরা চলেছে কোথায় ?

আমরা চলেছি সামনের পাহাড়ের সারি লক্ষ্য করে। ক্ষেতের পাশ দিয়ে উঁচু-নীচু মাঠের মধ্য দিয়ে সোজা পথ আমাদের। প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল চলার পর গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছলাম।

চারিদিকে পাহাড় ঘেরা খানিকটা খোলা জমি—জনমানবহীন এই জায়গাটির চারিদিকে কোথাও ঘন ঝোপ, কোথাও জঙ্গল; আর পাহাড়ের গায়ে ঝোপ-জঙ্গলের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নানা আকৃতির বড় বড় গাছ। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই মাটিতে ভেজা ভেজা গন্ধ।

শুকনো জায়গা দেখে বসার ব্যবস্থা করা গেল। আমাদের সঙ্গে ছিল কাঁচের ফ্রেমের মধ্যে একটি বড় সাইজের কালীমূর্তি। একটি উঁচু জায়গা বেছে নিয়ে মূর্তিটিকে বসানো হল। আমাদের সঙ্গে সমস্ত আয়োজনই ছিল ; ফুল-পাতা দিয়ে সাজিয়ে মূর্তিটির সামনে প্রদীপের মালা আর ধূপকাঠি বসিয়ে দিলাম।

শহরে বা গ্রামে গভীর রাত্রিতে অনেকবার কালীপূজা দেখেছি—কিন্তু আজকের এই পূজার গাম্ভীর্য সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। বেদীর সামনে রাখা হয়েছে আধ-ডজন নতুন পিস্তল ও রিভলভার, ডজনখানেক শাণিত ইস্পাতের ছোরা এবং গুর্খা ভোজালি। এই সব অস্ত্রশস্ত্র সামনে রেখে মায়ের পূজা করে আমরা নতুন করে শপথ গ্রহণ করব যেন এইসব মারণাস্ত্র শত্রুর প্রতি প্রয়োগ করতে মনে কোন দ্বিধা না করি।

মায়ের রণরঙ্গিণী মূর্তি চোখের সামনে—তাকে ঘিরে প্রদীপের মালা— সেই আলোতে ঝল্‌মল্‌ করে জ্বলে উঠছে ইস্পাতের অস্ত্র ! কারো মুখে কোন কথা নেই। রাত্রির নিস্তব্ধতা ছিন্ন করে চারিদিকের মৌনী পাহাড়ের ধ্যান ভঙ্গ করে এখন কি কোন কথা বলা যায় ? ভাব-গম্ভীর সেই পরিবেশে অনুরূপদার কণ্ঠস্বরে মায়ের আবাহন ধ্বনিত হল,

"এসো মা এসো! এই নিশীথ রাত্রির নীরব অন্ধকারে মৃন্ময়ীমূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার কর। ভক্তদের আশীর্বাদ কর যেন তোমার বিপ্লবী পুত্ররা যুদ্ধে শত্রু জয় করতে পারে—পৃথিবী থেকে অন্যায়কে বিতাড়িত করতে পারে!"

বিপ্লবীরা প্রত্যেকে আপন মনে নিজেদের শপথবাণী উচ্চারণ করল, মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করল। সেই বিভীষিকাময়ী রজনীতে আমিও মনে মনে মায়ের চরণস্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলাম।

কে কি ভাবে মাকে পূজো করবে, কি নিবেদন জানাবে, কি শপথ নেবে তা একেবারেই নিজস্ব ব্যাপার। যতদূর মনে আছে অম্বিকাদা ও অনুরূপদা শাণিত ছোরা দিয়ে বুকের উপর "ওঁ" চিহ্ন আঁকলেন। তারপর বেলপাতায় নিজ রক্তে ডালি সাজিয়ে মায়ের চরণে নিবেদন করে শপথ গ্রহণ করলেন।

আমরা আর কেউ এ'দের অনুকরণ করলাম না। মাস্টারদাও এরকম কিছু করলেন না। এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার—যাঁরা করতেন তাঁদের প্রতি মাস্টারদার শ্রদ্ধা ছিল; কিন্তু নিজে তিনি কোনরকম আবেগের বহিঃপ্রকাশ পছন্দ করতেন না—সব সময় শান্ত সমাহিত নিরুত্তেজ ভাবভঙ্গী ছিল তাঁর। আজও যখন এই ভীষণ রাত্রিতে কালীমূর্তির সামনে তিনি আজীবন সংগ্রামের কঠোর শপথ গ্রহণ করলেন—কেউ জানতে পারল না, কেউ বুঝতে পারল না তাঁর অন্তরের গভীরতা—কিন্তু তাঁর নীরব গাম্ভীর্য এবং বাণীহীন মনের ভাষাতে যা' বলার ছিল সবই বলা হয়ে গেল।

আমাদের দলের ইতিহাসে এই প্রকার তাৎপর্যপূর্ণ পূজার আয়োজন আর কখন হয় নি। দলের প্রথম বৈপ্লবিক অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি হয়। এই অভিনব পূজা যখন হল তখন রাত একটা। ঘন্টা দুয়েক লেগেছিল অনুষ্ঠানটি শেষ হতে। তারপর আবার ফেরার পথ—নদী-ঘাট। নৌকায় করে যখন শহরে ফিরলাম তখন ভোর হয়ে গেছে।

প্রথম সক্রিয় পদক্ষেপের আগে নিভৃত নিশীথে মা কালীর পূজা করলাম, মনের সকল সংশয় দ্বিধা কাটিয়ে শক্তি অর্জন করব—মায়ের চরণে এই শপথ গ্রহণ করলাম। তবু প্রায় এক মাস কেটে গেল। আমাদের প্রস্তুতি শেষ হল না। শেষ পর্যন্ত আমাদের মনে হল যে সতর্কতার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না হওয়া এই বিলম্বের প্রকৃত কারণ নয়। আসল কারণ রয়েছে আমাদের মনের গভীরে—কোনো অজানিত ভয় বার বার এসে বাধা দিচ্ছে। এখন বুঝতে পারি নেতারা তাদের কার্যকরী অভিজ্ঞতার অভাববশতই এরকম একটা ঝুঁকি নিতে দ্বিধা বোধ করছিলেন। প্রথম একটা কিছু করতে গেলে মনে ভয় আসবেই। কিন্তু আমার তখন অত চিন্তা করে দেখবার বয়স নয়—আমি চাই কাজ ! নেতা-দের কাছে বার বার তাই আর্জি পেশ করছি যাতে আর দেরি না করে কাজে নেমে পড়া যায়।

কাজে নামবার চেষ্টাও কয়েকবার হল। কিন্তু হয় বেরোবার মুখেই দেখা যায় কোন একটা গলদ রয়ে গেছে, অথবা বেরিয়ে নির্দিষ্ট বাড়ীটির আশে-পাশে ঘুরে আসা হয়। অস্ত্র হাতে থাকা সত্ত্বেও ভেতরে ঢোকা আর হয়ে ওঠে না।

এই ধরনের দ্বিধা-সংশয় এবং ভীতির ফলে একেবারে শেষ সময়ে কাজটি পণ্ড হয়ে যেতে লাগল। আর আমরা এতদিন ধরে যে বিপ্লবী মনোভাব পোষণ করে এসেছি তাতে ভাঙন ধরবার উপক্রম দেখা গেল।

প্রথম বিপজ্জনক কাজে নামতে গেলে মনকে কিভাবে প্রস্তুত করে নিতে হয়, পলায়নী-মনোবৃত্তি কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে—এসব সম্বন্ধে আমাদের এ সময়কার অভিজ্ঞতা কাজে লাগে ১৯৩০ সালে—যখন দলের নতুন সদস্যদের শত্রুব্যূহ আক্রমণের কাজে ব্রতী হবার জন্য সচেতন ও সক্রিয় করে তুলি। ১৯২২—২৪ সালে, যখন দলের শৈশব ও কৈশোর কাল, তখন নানা-

বিধ কার্যকলাপ এবং বিভিন্ন কর্মীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করবার, বিপ্লবী আক্রমণ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করবার সুযোগ হয় নি আমাদের। ১৯৩০ সালে আমাদের প্রতিটি প্রোগ্রাম পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী একেবারে নির্দিষ্ট পথে যে চলেছিল—পূর্বঅভিজ্ঞতাই এর প্রধান কারণ।

১৯২২ সালে আমাদের নেতাদের হাতেকলমে কাজ করবার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। ডাকাতি না হয় করলাম, কিন্তু তারপর কি হবে, কি করে নিজেদের নিরাপদে রাখব, কি করে পুলিশের অজ্ঞাতে টাকা-পয়সা, গহনা ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত করব? আর যদি পুলিশ জানতে পেরে দলকে দল গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় তাহলেই বা কি হবে?—এ নিয়ে তাঁরা খুব বেশি চিন্তা করতে শুরু করে দিলেন। ফলে আমরা আশা-নিরাশার মাঝে দুলতে লাগলাম। এই শুনি সব ঠিক হয়ে গেছে, অমুক সময়ে অমুক স্থানে ডাকাতি করা হবে,—আবার ঠিক সময়টি এলে সব ভেস্তে যায়।

এভাবে তো তখনকার দিনের একটা গুপ্ত বিপ্লবী দল টিকে থাকতে পারে না! হয় তাকে কোনো প্রত্যক্ষ কাজ করতে হবে, নয়ত বিপ্লবের বুলি মুখে আউড়ে কিছুদিন একটু জ্বল্ জ্বল্ করে আবার নিভে যেতে হবে।

আমরা, যাদের বয়স কম—কিশোরই বলা যায়, তা'রা প্রায়ই এই নিষ্ক্রিয়-তাকে কঠোরভাবে আঘাত করবার চেষ্টা করতাম। মাস্টারদা, জুলুদা, অম্বিকাদা আমার এই ধরনের প্রচেষ্টায় মনে মনে খুব খুশি হতেন। তাঁরা বোধহয় আমাদের কাছ থেকে একটা প্রেরণা চাইতেন নিশ্চিত নির্ভয়ে বিপদের মুখে এগিয়ে যাবার—যেমন ১৯৩০ সালে আমাদের মনে শক্তি-সঞ্চার করেছে তরুণ কর্মীরা—টেগরা, রজত, মনা, মাখন, দেবু এবং আরো কয়েকজন।

সকল বন্দোবস্ত ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার পরও সক্রিয় পদক্ষেপের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই ধরনের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব ও নিষ্ক্রয়তা কাটিয়ে উঠতে আরও দুই মাস লাগল। শেষপর্যন্ত তারিখ আর সময় ঠিক হল। এবার আর নড়চড় হবে না। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার পরোইকোরা গ্রামে শ্রীসরসী মহাজনের বাড়ী আমাদের লক্ষ্যস্থল। চার মাইলের মধ্যে কোনো থানা নেই---আনোয়ারা, পটিয়া এবং বোয়ালখালি থানা, সবগুলিই দূরে দূরে। আমরা বাড়ীতে ঢোকার পর যদি দু'ঘন্টা ধরে টাকাপয়সা জিনিসপত্র খুঁজে খুঁজে নিই, তবু থানা থেকে সাহায্য এসে পৌঁছতে পারবে না।

অসুবিধের দিকটাও ভেবে দেখা গেল। প্রধান অসুবিধা সেই বাড়ীর পাশেই শ্রীযোগেশ চৌধুরী নামে এক বড় জমিদারের পাকা বাড়ী, তাঁর কাছে সাতটি বন্দুক এবং একটি রিভলভার আছে। তবে যা খবর পেয়েছি তাতে আশার কথা এই যে, যোগেশবাবুর বাড়ীর সকলেই অত্যন্ত ভীতু প্রকৃতির, ভয়ের চোটে কোনদিন তারা বন্দুকে হাত দেয় না।

যোগেশবাবুর বাড়ীটাকে আমরা লক্ষ্যস্থল করি নি এইজন্য যে, খবর পেলাম তাঁরা তাঁদের মূল্যবান জিনিসপত্র ও টাকাপয়সা ব্যাঙ্কে রাখেন। কাজেই আর্থিক অবস্থায় জমিদারের চাইতে হীন হলেও বেচারী 'মহাজনই' আমাদের বিশেষ মনোযোগের পাত্র হলেন।

আরও একটা বিপদের আশঙ্কা ছিল—আশেপাশে অনেকগুলি বাড়ী রয়েছে, তাদের পারস্পরিক দূরত্ব খুব বেশি নয়। রাতের প্রহরীর আসার সম্ভাবনাও যে একেবারে নেই তা' নয়। উপরন্তু বাড়ীর কর্তা এবং অন্য পুরুষদের কাছ থেকে নিশ্চয়ই বাধা পেতে হবে।

সরসীবাবু নিজে খুব শক্তসমর্থ লোক। বাড়ীর লোকদের প্রকৃতি, বিশেষ করে বিপদের সময় কিরকম ব্যবহার করবে,—প্রাণপণে রুখে দাঁড়াবে, নাকি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে যথাসর্বস্ব দিয়ে দেবে, তা' আগে থেকে অনুমান করা শক্ত।

শুভ অশুভ নানারকম সম্ভাব্য চিন্তা করার প্রয়োজন আমাদের এতটা হত না যদি আমাদের এই আকস্মিক কাজের প্রোগ্রামে সদ্যমুক্ত বিপ্লবীদের কোন ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা না থাকত। আমরা প্রাণপণে চাইছিলাম এটাকে সাধারণ ডাকাতির মত সাজিয়ে পুলিশকে ভাঁওতা দিতে—সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতিও যেন আমাদের ভবিষ্যতের বিপ্লবী প্রয়াসকে বিফল করতে না পারে।

ঠিক ছিল আন্তিমামুদের ঘাট থেকে নৌকো নিয়ে নদী পার হব। তারপর বারো মাইল হেঁটে রাত্রে গিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পেঁছাব। শহর থেকে যাত্রা করবার জন্য একত্রে মিলিত হবার স্থান ঠিক হল নির্মলদার বাড়ী। ফিরিঙ্গিবাজারে একটি দোতলা বাড়ীর একান্তে নির্মলদার নিজস্ব ঘরখানি—তার প্রবেশপথও আলাদা। সেখানে সব আগ্নেয়াস্ত্রগুলি রাখা হল তিনটে রিভলভার, চারটে পিস্তল এবং একটা ব্রীচলোডার বন্দুক। এ ছাড়া মুসলমানের ছদ্মবেশ গ্রহণ করবার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম—লুঙ্গি, টুপি, কুর্তা, দাড়ি, গোঁফ ইত্যাদি। আর আসল কাজের জন্য কামারের বড় বড় হাতুড়ি, ছেনি, লোহা কাটার করাত, কোদাল আর কুড়াল। লোহার সিন্দুক, কাঠের সিন্দুক, আলমারি ইত্যাদি ভাঙার যন্ত্র তো সঙ্গে নিয়েইছি, তা' ছাড়া মাটি খোঁড়ার জন্য কোদালও নিতে হয়েছে, কারণ খবর পেয়েছিলাম সিন্দুক এবং মূল্যবান জিনিসপত্র মাটির নিচে লুকান আছে। কাজেই আমাদের সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী একেবারে ভালভাবে তৈরি হয়ে আমরা কাজে হাত দিলাম।

সন্ধ্যে সাতটা। নির্মলদার বাড়ীতে সকলে জড় হয়েছি। এবার অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। ঠিক এমনি সময় জুলুদা হাজির এক দুঃসংবাদ নিয়ে। আমাদের দলের মধ্যে বিরাট চেহারা যে বন্ধুর, যাকে আমরা সবচেয়ে শক্তিশালী মনে করতাম, (লোকনাথ বল নয়—সে তখন প্রাপ্তবয়স্ক নয়, তার সঙ্গে সে সময় আমাদের পরিচয় হওয়ার সুযোগও হয় নি),—সে সময় মত এসে পেঁছয় নি। আমার সঙ্গে এই সবল সুস্থ অতিকায় যুবক সদস্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাকে সামনাসামনি দেখলে সাধারণ লোক ভয় পেত। সে বক্সিং জানত—বলত এ্যাংলো সাহেবদের কাছ থেকেই তার শিক্ষা। তবে যাঁরা বক্সিং সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তাঁরা বুঝবেন কেবল মাত্র বিশাল একটি শরীর থাকলেই যে সাহস ও ক্ষিপ্রতা থাকবেই তার কোন মানে নেই। জীবনে আমার সঙ্গে যারই মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার সুযোগ হয়েছে, সে যতই দীর্ঘকায় বা বলিষ্ঠ হউক না কেন, আমি সাহস ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তারে আক্রমণ করেছি এবং প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই সফলতা লাভ করেছি। এই বলিষ্ঠ এ্যাংলো

সাহেবের দ্বারা বক্সিং শিক্ষিত যুবকটিও আমার মুষ্টিযুদ্ধের পরিচয় পূর্বে পেয়েছে।

কী সাংঘাতিক কথা! সে সঙ্গে না থাকলে দলের শক্তিক্ষয় হবে ঠিকই. কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। সে হয়ত সবকিছুই জানে! যদি পুলিশের লোক হয়, পুলিশকে পূর্বাহ্ণে যদি সতর্ক করে দিয়ে থাকে!

কি করা যায় এখন? জুলুদা আর নির্মলদা খুব অস্বস্তিবোধ করছিলেন। যাত্রার প্রারম্ভে এরকম ব্যাঘাত ঘটলে চিন্তারই কথা। আমি কিন্তু প্রাণপণে চাইছিলাম যে, যা' হবার হউক, আজকের প্রোগ্রাম আর স্থগিত রাখা চলবে না।

তাই প্রশ্ন করলাম, "সে কি অসুস্থ?"

জুলুদা উত্তর দিলেন, "তা তো মনে হয় না।"

নির্মলদা বললেন, "আমার মনে হয় ভয়ের চোটে সে পালিয়েছে।"

আমি—"তাকে কি পুলিশের চর বলে মনে হয়?"

জুলুদা আর নির্মলদা—দু'জনেই জোর দিয়ে বললেন—"তা হতে পারে না।" আমারও সেই মত। তবু একেবারে নিঃসন্দেহ হবার জন্য প্রশ্ন করলাম,—

"ঠিক কোথায় আমরা যাব, তা'কি সে জানে?"

জুলুদা—"না, সে সব কিছুও জানে না। কিন্তু নদীর ঘাটে, যেখানে ওর আসবার কথা—সে জায়গাটি জানে।"

এই সব কথাবার্তার পর চিন্তা করে দেখলাম সে যখন নির্দিষ্ট জায়গাটি বা যাবার পথ জানে না তখন আমাদের ভয় করবার কিছু নেই। আমরা প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে ও পুলিশের চর নয়। যদি সে পুলিশের চর হয় তবে ধরে নেওয়া যায় যে সে যা যা জানে পুলিশ ইতিমধ্যে সবই তার কাছ থেকে জানতে পেরেছে। সেইক্ষেত্রে পুলিশ যদিও নির্দিষ্ট বাড়ীটির ও গন্তব্য পথের সন্ধান তার কাছ থেকে পায় নি—তবু আমরা যে নির্দিষ্ট সময়ে আন্তিমামুদ ঘাট থেকে রওনা হব স্থির করেছি সেই সংবাদ নিশ্চয়ই পেয়েছে। এইরূপ অবস্থায় যদি নির্দিষ্ট সময়ে ওর সঙ্গে আমাদের নদীর যে ঘাটে মিলবার কথা, সেখানে পুলিশ এসে হানা না দেয় তবে শুধুমাত্র তার অনুপস্থিতির জন্য কাজটি পণ্ড করে দিতে পারি না। সে না থাকলেও আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট অস্ত্র আছে। সংখ্যায়ও আমরা কম নই। কাজেই একজনের অভাবে কাজটা অসাধ্য হবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই।

শেষ পর্যন্ত "বীরোত্তম"টিকে বাদ দিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। নির্দিষ্ট সময়ে নির্মলদার বাড়ী থেকে আমরা রওনা হলাম। কয়েকজন বন্ধু এখানে অস্ত্রশস্ত্রগুলি নিয়ে যেতে এবং অন্য কয়েকজন নদীর ধারে আন্তিমামুদের ঘাটে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। সেখানে গিয়ে সকলে একসঙ্গে মিলিত হলাম। আমাদের মধ্যে একজন মাত্র বাইরের লোক ছিল, যে আমাদের এই বাড়ীটি সম্বন্ধে খবর দিয়েছিল। এই লোকটির উপস্থিতির জন্য নৌকার মধ্যে এবং হাঁটা পথে পরস্পরের সঙ্গে কোনরকম কথাবার্তা বলা আমাদের নিষেধ ছিল।

রাত আটটায় নদী পার হলাম। তারপর শুরু হল হাঁটাপথ—তাও প্রায়

পনের মাইলের কম নয়। এবার এসে পৌঁছেছি গন্তব্যস্থলের দু'শো গজের ভেতরে। এখানে একটি ছোট পুকুর, তার পাশ দিয়ে পায়ে-চলা পথ এগিয়ে গেছে। এখানে এসে থামলাম আমরা। মুখ-হাত ধুয়ে এবার পোশাক বদলাতে হবে—দাড়ি-গোঁফ পরে মুসলমান সাজতে হবে।

পোশাক পরে যে যার অস্ত্র সঙ্গে নিলাম। কয়েকজন নিল দরজা আর সিন্দুক ভাঙার যন্ত্রপাতি। আমাদের সঙ্গে ছিল জোরাল টর্চ ও বড় গোছের পট্‌কা, যাতে দরকার হলে ওগুলো কাজে লাগিয়ে লোকদের বিভ্রান্ত করতে পারি। রিভলভার এবং পিস্তলের আওয়াজ ঢাকবার জন্যই এই ব্যবস্থা।

সরসীবাবুর বাড়ীর এতটা কাছে এসে যখন আমরা ডাকাতের মত সাজ-সজ্জা করছি, সেই সময়ে হঠাৎ একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা আমাদের সকলকে খানিকক্ষণের জন্য স্তব্ধ করে দিল। প্রেমানন্দের পকেট থেকে একটা পট্‌কা মাটিতে পড়ে গেছে, আর পট্‌কাগুলি এতই তাজা ও শক্তিশালী যে সামান্য ওপর থেকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে উচ্চ রবে তার অস্তিত্ব জানিয়ে দিয়েছে। কী সর্বনাশ! রাত তখন একটা। চারিদিক নির্জন। সরসীবাবুর বাড়ীর একেবারে কাছেই এই বিভ্রাট! নিশীথ রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে আকস্মিক এই পটকার বিস্ফোরণে গ্রামের লোকেরা নিশ্চয়ই সচকিত হয়ে উঠেছে। এখন যদি তারা শব্দের দিকে লক্ষ্য রেখে তার সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, অথবা জেগে থেকে বাড়ী পাহারা দিতে শুরু করে?

একটিমাত্র পট্‌কার বিস্ফোরণের আওয়াজ গ্রামের সমস্ত অধিবাসীর গভীর নিদ্রা ভঙ্গ করতে পারে কিনা অথবা—একটিমাত্র অপরিচিত শব্দ শুনেই সকলে জেগে বসে থাকবে কিনা এবং আর কিছু শুনতে না পেলে ঘর থেকে বেরবে কি না—এ সব ভাববার মত মনের অবস্থা তখন আমাদের নয়। এই প্রথম আমরা গোপনে সশস্ত্র আক্রমণ করতে চলেছি, আমাদের মানসিক উত্তেজনা ও স্নায়বিক দুর্বলতা এখন স্থির বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। একটু উচ্চকণ্ঠে কথা, কিম্বা পায়ের তলার মড়্‌মড়্‌ শব্দে আমরা নিজেরাই চমকে চমকে উঠছিলাম—ভাবছিলাম এই বুঝি সবাই জেগে উঠল, এই বুঝি টের পেয়ে গেল আমাদের মতলব—এখনি বুঝি ছুটে আসবে আমাদের ধরতে!

প্রেমানন্দের হাতে-পায়ে, চোখে আঘাত লেগেছে। আঘাত খুব গুরুতর নয়, কিন্তু বিপদের কথা যে ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে; বমি করে কাপড়-চোপড় নষ্ট করে ফেলেছে। এই সব কারণে আরও মিনিট পনের গেল সব গুছিয়ে ঠিক করে নিতে।

এতদিন ধরে এত চিন্তা করে সবকিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ আহরণ করে তার পর আমরা নির্দিষ্ট কাজে হাত দিয়েছি। প্রস্তুতির দিক থেকে বিশেষ কোন ত্রুটি নেই আমাদের। তবু কতরকম বাধা-বিপত্তি যে এসে উপস্থিত হচ্ছে! অভিজ্ঞতার অভাব, আকস্মিক দুর্ঘটনা, দৈব-দুর্বিপাক—অনেক কিছুই আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের অন্তরায়। যে কোন সংগঠন প্রথম গড়ে তোলবার চেষ্টা হয় তাতে নানাপ্রকার বাধা ও জটিলতা দেখা দেয়। আর যদি ষড়যন্ত্র-মূলক গুপ্ত বিপ্লবী দল গঠন করতে হয় তবে এইরূপ বাধাবিপত্তি পদে পদেই দেখা দেয়। যদি আমরা কেউ আশা করে থাকি যে সর্বাঙ্গ সুন্দর সুগঠিত একটি বিপ্লবী সংঘ হঠাৎ রাতারাতি গড়ে উঠবে তবে সেই আকাশ-কুসুমের

স্বপ্ন ভাববিলাসী বিপ্লবীদের আত্মপ্রবঞ্চনাপূর্ণ মনকেই মাত্র সান্ত্বনা দিতে পারে। আমরা বুঝেছিলাম সমস্ত বাধা স্থির মস্তিষ্কে সাহসের সঙ্গে উপেক্ষা করেই সম্মুখপানে চলতে হবে। প্রতিটি কাজেই দেখেছি পদে পদে বাধা। আজও প্রথম সক্রিয় পদক্ষেপের শেষ মুহূর্তে অভাবিত ভাবে বিপদ এসে দাঁড়িয়েছে—প্রথমে একজন কর্মীর অনুপস্থিতি, তারপর হঠাৎ এই পটকা বিস্ফোরণ ও প্রেমানন্দের আহত হওয়া।

বাড়ীটির ফটকের কাছে আসা পর্যন্ত আর কোন দুর্ঘটনা ঘটল না। গ্রামের কোন লোক ঘুমভাঙা চোখে আমাদের অনুসন্ধানে এগিয়েও এল না! বাড়ীর ভিতর এবং বাইরে আমাদের যা'র যেখানে 'পজিসন' নেওয়ার কথা, সেই ভাবে আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। প্রতিটি প্রবেশ-পথে প্রহরী রাখা হল। জুলুদা আমাকে সঙ্গে নিলেন। আমরা দু'জনে নিঃশব্দে সন্তর্পণে ভেতরের উঠানে গিয়ে মূল বাড়ীটির সামনে দাঁড়ালাম। আরো দু'জন সাথী এল আমাদের সঙ্গে।

আমার সঙ্গে ছিল "কোল্ট, Police-Positive" রিভলভার। ডান-হাতে ·৩৮০ বোরের ছয়-শট্ রিভলভার আর বাঁ হাতে একটা গুর্খা ভোজালি—বাড়ীর পুরুষদের ভয় দেখাবার জন্য।

জুলুদার হাতে রিভলভার—আর কি কি ছিল মনে নেই। মোট কথা বিরাট দাড়ি গোঁফ আর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আমাদের নিজেদের চেহারাই তখন আয়নায় দেখলে আমরা ভয় পেতাম—অন্য লোকের কথা দূরে থাক।

গ্রীষ্মকাল তখন। বাইরের বারান্দায় মশারির ভেতর শুয়ে আছেন বাড়ীর কর্তা। উঁচু বারান্দায় ঘুমন্ত অবস্থায় আছেন সরসীবাবু। সামনে উঠানের ওপর এসে দাঁড়ালাম। লম্বা-চওড়ায় দশাসই চেহারা ভদ্রলোকের—নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছেন। তিনি কি তখন স্বপ্নেও কল্পনা করছিলেন যে চোখ খুললেই দেখবেন তাঁর চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে চারজন "ভীষণ-দর্শন ডাকাত"। বেচারী সরসীবাবু! দেশের শত্রু নন্ তিনি! তবু বিপ্লবের প্রয়োজনে তাঁকে বিপুল ক্ষতি বরণ করতে হবে আজ!

আমরা তাঁকে ডেকে তুললাম—"সরসীবাবু! উঠুন! উঠে পড়ুন!"

ভদ্রলোক উঠে বসলেন। মশারির ভিতর থেকে ঘুম-জড়ানো চোখে আমাদের দিকে তাকালেন—স্বগতোক্তি করলেন,

"এউন কোন? বহুরূপী মতএনা লাগের?" (এরা কা'রা? বহুরূপীর মত লাগছে যেন?)।

তারপরই জড়তা কেটে গেল, ভুল ভেঙে গেল—তিনি চীৎকার করে উঠলেন: "উম্মা-রে-মা—ডাকাইৎএনা?"

এবারে চীৎকার করে পালাতে চেষ্টা করলেন, "ও ভাই উজারে—উজা, ডাকাইৎ পইড়গ্যে—ভাই উজা—" (ও ভাই ছুটে আয়, ডাকাত পড়েছে, ছুটে আয়)।

সরসীবাবুকে ছুটে যেতে দেখে আমাদের খেয়াল হল। তখন আর চিন্তা করে কিছু করবার অবসর নেই, ঘটনা আমাদের আয়ত্তের বাইরে। দুটো রিভলভারের গুলী ছুটে গিয়ে সরসীবাবুর উরু ভেদ করল—তিনি পড়ে গেলেন। পড়ে গিয়েই ঐ অবস্থায় বসে রইলেন। দু' ঘণ্টা ধরে, যতক্ষণ

আমরা সব জিনিসপত্র নিয়ে তাঁর বাড়ী ত্যাগ না করলাম,—ততক্ষণ ধরে অবিশ্রান্ত চীৎকার করে প্রতিবেশীদের ডাকতে লাগলেন,—"উজা ভাই, উজা!"

সরসীবাবুর চীৎকার শুনে আর একজন ভদ্রলোক, হয়ত তাঁর ভাই হবেন, ছুটে আসছিলেন—পায়ে গুলী লাগায় তিনিও পড়ে গেলেন উঠানে।

জুলুদা চট্টগ্রামের গ্রাম্য ভাষায়, অথচ গুণ্ডাদের মত ভাণ করে কর্কশ স্বরে, সবাইকে সম্বোধন করে বললেন,

"ভয় পেও না। যেখানে আছ থাক। আমাদের বাধা দিও না। আমরা শুধু টাকাকড়ি নিয়ে চলে যাব।"

এদিকে সরসীবাবুর চীৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসেছে। আমাদের মোতায়েন করা দ্বার-রক্ষীরা বন্দুকের আওয়াজ করে, পটকা ছুঁড়ে, তাদের ভয় দেখিয়ে ঠেকিয়ে রাখছে। গুলী গোলার আওয়াজ, পটকার বিস্ফোরণ, চীৎকার, চেঁচামেচি,—সব মিলে সমস্ত ঘুমন্ত পুরী যেন নিমেষে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আশেপাশের গ্রামগুলিতেও লোকেরা জেগে উঠে সভয়ে ভাবছে কার কি সর্বনাশ হল ?

সরসীবাবুর বাড়ীর চারদিকে জায়গায় জায়গায় গ্রামের সাহসী যুবকেরা দাঁড়িয়ে কিভাবে ডাকাতদের তাড়ান যেতে পারে সেই কথা সভয়ে ও উত্তেজিত-ভাবে আলোচনা করছে। আমরা তাদের কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। পাটকাঠির গোছা জ্বালিয়ে মশাল করে নিয়েছে তারা, আর চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলবে এমন ভয় দেখাচ্ছে। আমাদের দ্বার-রক্ষী সাথীরা উল্‌টে মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ করে ওদের সাবধান করে দিচ্ছে, আর অকথ্য ভাষায় গালা-গালি দিয়ে তাদের দূরে থাকতে নির্দেশ দিচ্ছে; নতুবা তাদের জীবন বিপন্ন হবে—ইত্যাদি বলে তাদের রুখছে। বাড়ীর ভিতরে আমরাও অনুরূপ ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছি যাতে তদন্তের সময় পুলিশের মনে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ না হয় যে, এটা 'স্বদেশী' বাবুদের কাজ।

আশ্চর্যের কথা, এত চীৎকার, চেঁচামেচি সত্ত্বেও যোগেশবাবুর বাড়ী থেকে একজন লোকও বেরিয়ে আসে নি, বা একটি বন্দুকও তারা বার করে দেয় নি, যা নিয়ে অন্তত অন্যরা ডাকাত ঠেকাতে পারে! এদিকে বন্দুক না থাকলেও মশাল, লাঠি, বর্শা, খড়্গ ইত্যাদি নিয়ে গ্রামের লোকেরা আরও বেশি সংখ্যায় এসে জড় হচ্ছে। বিশেষতঃ আমাদের বন্দুকের গুলী ওদের আহত করতে চায় না দেখে ওদের সাহস আরও বেড়ে গেছে—নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে সকলে দৃশ্যটি দেখছে।

বাইরে যখন এই দৃশ্যের অভিনয় চলছে ভেতরে তখন আমরা কয়েকজন দ্রুতবেগে কাজ করে চলেছি। প্রতিটি ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখছি কোথায় কি সম্পদ আছে,—বড় বড় ভারী কাঠের সিন্দুক, আলমারী সব ভেঙে ফেলছি আর সন্দেহজনক জায়গাগুলি খুঁড়ে দেখছি কোথায় কি গুপ্তধন লুকানো আছে! বাড়ীর মেয়েরা আর শিশুরা একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে চীৎকার করছে, কাঁদছে, ভয়ে কাঁপছে। কত যে নির্দয় আমরা—কত নিষ্ঠুর! কর্তব্যের খাতিরে তাদেরও বাইরে আসতে বলে সে ঘরটাও খুঁজে দেখলাম।

সমবেত গ্রামবাসীর ভীতি-প্রদর্শন উপেক্ষা করে দু' ঘণ্টা ধরে আমরা কাজ চালালাম। মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম আমরা, অন্ততঃ হাজার পঞ্চাশেক টাকা

পেতেই হবে—নগদ বা মূল্যবান জিনিসে। তবেই পারব আমাদের আশু প্রয়োজনমত অস্ত্রশস্ত্র কিনতে, তারপরে বৃটিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে আমাদেব সশস্ত্র শক্তি কাজে লাগাব। তাই আমরা বদ্ধপরিকর, যত বিপদের সম্ভাবনাই থাকুক না কেন, সমস্ত বাড়ীটি এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত খোঁজা শেষ না করে আমরা ফিরে যাব না।

দু' ঘন্টা পর যখন নিশ্চিন্ত হলাম যে 'না, আর কোথাও কিছু নেই, সব দেখা হয়ে গেছে'—তখন বেরিয়ে এলাম আমরা। আর বেরবার সংগে সংগে যা ভয় করছিলাম তাই হল। জনতা আমাদের পিছু ধাওয়া করল।

আরও কতকগুলি ফাঁকা আওয়াজ আর অশ্লীল বুলি তাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আমরা দ্রুত এগোতে লাগলাম। মাইলখানেক রাতের অন্ধকারে হাঁটার পরে নিশ্চিন্ত হলাম—আর কেউ আমাদের পেছনে আসছে না।

আরও এক মাইল যাবার পর নির্মলদার নেতৃত্বে আমাদের দলের কয়েক-জন ডাকাতির মালপত্র নিয়ে গ্রামের ভেতরে নিরাপদ জায়গায় রাখতে চলে গেল। শেষ পর্যন্ত আমি, প্রেমানন্দ আর জুলুদা নৌকায় করে শহরে ফিরে এলাম। প্রত্যেকের সংগে রিভলভার আছে। আসতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লেগেছে, অর্থাৎ শহরে যখন এলাম তখন পূব-আকাশে একটু একটু রং-এর আভা দেখা যাচ্ছে।

বিকেল বেলা রাতের খাওয়া খেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, ফিরছি ভোরে —রাত শেষ করে। কোথায় ছিলাম এতক্ষণ? কি জবাব দেব বাড়ী গিয়ে?

সে সব ব্যবস্থাও ঠিক ছিল। আগেই বলেছি দাদা আর দিদিকে আমাদের দলে টেনেছিলাম। তারাই এমন সুন্দরভাবে ব্যবস্থা করে রেখেছিল যে, বাড়ীর অন্য কেউ বা কোন পাড়াপ্রতিবেশীও আমার অনুপস্থিতির কথা জানতে পারল না। ভোর বেলা বাড়ীর লোক ঘুম থেকে ওঠার আগে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে চুপি চুপি নিজের বিছানায় শুয়ে রইলাম। চা-খাবার ডাক যখন এল সারারাত গভীর ঘুমের পর যেন চোখ মুছতে মুছতে উঠে এলাম।

নাটকের প্রথম অঙ্কের এখানেই যবনিকা। এরপর দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় শুরু হল। পুলিশের অনুসন্ধান কার্য চলতে লাগল। আর এদিকে শহরে ছড়িয়ে পড়ল নানারকম গুজব—ঘটনা সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত সম্ভব অসম্ভব নানা কাহিনী। আমি তখন নির্দোষিতার ভাণ করে সরল মনে এসব গুজব শুনতে লাগলাম, আলোচনা করতে লাগলাম।

আমার বাবা মক্কেল-পরিবেষ্টিত হয়ে চেয়ারে বসেছিলেন। ঠিক বেলা দশটায় খবরটা শুনলেন তিনি। বিদ্যুৎ চমকের মত সারা শহরে তখন ছড়িয়ে পড়েছে এই ভয়াবহ ডাকাতির কাহিনী। বহুরূপীর মত ঘণ্টায় ঘণ্টায় তার রূপ পরিবর্তিত হচ্ছে।

প্রথম শুনলাম, "চল্লিশজন লোক চল্লিশটা সাইকেল, চল্লিশটা টর্চ আর চল্লিশটা রিভলভার নিয়ে সারা পরোইকোরা গ্রাম লুঠ করে নিয়েছে।"

তারপর, "চল্লিশজন লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সরসী মহাজনের বাড়ী লুঠ করেছে। অনেক লোক মেরে ফেলেছে,—প্রায় পঁচাত্তর হাজার টাকার জিনিস নিয়ে গেছে।"

তারপর শোনা গেল আরও বিশদ বিবরণ, "সরসীবাবু এবং আরও

কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে পাঠান হয়েছে। তাঁর বাড়ীর টাকাকড়ি মূল্যবান জিনিসপত্র সব অপহৃত হয়েছে। সব মিলে পঁচাত্তর হাজার টাকার কম নয়।"

স্থানীয় দৈনিক পাঞ্চজন্যে খবরটি বেরোল, "অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে অভিনব ডাকাতি। তাহারা সংখ্যায় ছিল চল্লিশজন, প্রত্যেকের হাতে রিভলভার। বাহিরে গ্রামবাসীদের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা দুই ঘণ্টা ধরিয়া অপহরণ কার্য চালায়। গ্রামবাসীরা কোনো বাধাই দিতে পারে নাই। ডাকাতেরা মালপত্র লইয়া পলায়ন করে, তাহার মূল্য পঁচাত্তর হাজার টাকার কম নয়। তাহারা ৭৮টি সিন্দুক ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং সরসীবাবু ও অপর একজনকে আহত করে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে এবং এ পর্যন্ত যে সকল বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে তাহারা নিশ্চিত যে ডাকাতদলকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হইবে...।"

পাঞ্চজন্যে সামান্য একটি ছাপার ভুল ছিল। "৭।৮ টি সিন্দুকের" পরিবর্তে "৭৮টি সিন্দুক" ছাপা হয়েছিল। এই ছাপার ভুলটাই আবার পরে এক সময়ে আমার কাজে লেগে গেল।

কয়েকদিন ধরে শহরে জোর আলোচনা চলল এই ডাকাতি নিয়ে—যেখানে যাই সেখানেই এক কথা। আমিও সে সব কথাবার্তায় নিরীহভাবে যোগ দিতাম এবং ডাকাতদের সাহসে বিস্ময় প্রকাশ করতাম। সবচেয়ে মজা হত বাড়ীতে।

আমার বাবা এমনিতেই একটু সাবধানী প্রকৃতির মানুষ; তারপর আবার শহরের অতি সন্নিকটে এই ডাকাতির সংবাদে তিনি খুবই বিচলিত এবং আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। বিচলিত হবার কারণও তাঁর ছিল। সবাই জানত তিনি গহনাপত্র বন্ধক রেখে মহাজনী কারবার করেন; সুতরাং আমাদের বাড়ী লুঠ করলে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা। বাড়ীতে অবশ্য সাবধানতার অভাব ছিল না। বাড়ীর দরজাগুলি লোহার, সিন্দুক এবং আলমারী যথেষ্ট বড় আর শক্ত, মাঝে মাঝেই নতুন ধরনের তালা লাগান হয় তাতে। এ ছাড়া সাত আটটি নানা-জাতের কুকুর রাত্রে বাড়ী পাহারা দেয়।

কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই জাতীয় ডাকাতদল যদি হানা দেয় তাতে কোন ব্যবস্থাই কোন কাজে লাগবে না। তাই নিয়ে বাবা প্রায়ই মা, দিদি এবং আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। বাইরে থেকে শুনে আসা নানারকম গুজব ফলাও করে বলতেন, আর কি করে বাড়ীটাকে ডাকাতদের অভেদ্য করে তোলা যায় তাই নিয়ে রাত্রিদিন চিন্তা করতেন।

ডাকাতির পর থেকে নেতাদের নির্দেশ মত আমি সব সময় সঙ্গে রিভলভার রাখতাম, যাতে পুলিশ আমাকে বন্দী করতে না পারে। খেতে বসার সময়েও রিভলভারটি আমার সঙ্গে থাকত। বাবার এই সব কাল্পনিক ভয়ের কথা শুনে, হাত দিয়ে গোপনে রাখা রিভলভারটি অনুভব করতাম আর মনে মনে হাসতাম। দিদি আবার এই ডাকাতদের জাতি, ধর্ম, বয়স ইত্যাদি সম্বন্ধে বাবাকে নানারকম প্রশ্ন করে মজা পেত। কখনো কখনো বা ডাকাতদের চেহারার কাল্পনিক বিবরণ দিয়ে বাবা-মাকে আরো ভীত করে তুলত। বাবা-মার অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে আমরা আমোদ উপভোগ করতাম।

এই আমোদ বেশিদিন আর চলল না। ঘটনার দু'তিন দিন পর, একদিন আমাদের লেডী ডাক্তার মাসীমা হঠাৎ অসময় দুপুরের দিকে এসে হাজির। কোনদিকে দৃকপাত না করে বাবা-মাকে ডেকে নিয়ে বন্ধ ঘরে কি সব আলোচনা করলেন। পনের মিনিটের মধ্যে আমার ডাক পড়ল। ঘরে ঢুকে দেখি তিনজনেরই মুখ ফ্যাকাশে, কপালে চিন্তার রেখা; তিনজনেই যেন খুব বেশি উদ্বিগ্ন। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না তাঁদের উদ্বেগের কারণ, তবু মনে মনে একটা আশঙ্কা ছিল। বিশেষতঃ আমার ডাক যখন পড়েছে তখন নিশ্চয়ই আমি এতে জড়িত।

সঙ্গের রিভলভারটি সযত্নে আড়ালে রাখলাম। আগেই বলেছি নেতাদের নির্দেশে আমি সদাসর্বদা, এমন কি বাড়ীতে ও খেলার মাঠেও, রিভলভার সঙ্গে রাখতাম। পুলিশ আমাকে সন্দেহের চোখে দেখত—যে কোন সময়ে বন্দী করতে পারে, তাই এই সতর্কতা। কাজেই মা-বাবা-মাসীমার সামনে যখন এসে দাঁড়িয়েছি তখনও সঙ্গে আছে রিভলভার।

কারো মুখে কোন কথা নেই। কিভাবে কথাটা পাড়া হবে তাই বোধ হয় চিন্তা করছিলেন সবাই। খানিকক্ষণ নীরবতার পর মাসীমা বললেন, "দেখ অনন্ত, আমি 'স্বদেশী স্টোর' থেকে সোজা এখানে আসছি। ওখানে সকলেই ডাকাতির কথা আলোচনা করছে এবং বলাবলি করছে তুমি নাকি ঐ দলের মধ্যে আছ। পুলিশ তোমাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করবে এমন কথাও তারা বলছে। এখানে তোমার মা-বাবা বসে আছেন, আমি আছি—বাইরের লোক কেউ নেই। তুমি সত্যি কথা বল। আসল ব্যাপারটা কি? এই ডাকাতির সঙ্গে তুমি কতটা জড়িত...?"

মাসীমাদের সংগৃহীত তথ্যের উৎস বুঝতে দেরি হল না। মাসীমাও গোপন করেন নি যে, "স্বদেশী স্টোর" থেকে সংবাদটি পেয়েছেন। তিনজনে উদ্‌গ্রীব হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, এখন সামান্য একটু দ্বিধার ভাব দেখালে বা একটুখানি ইতস্তত করলেই তাঁদের মনে একটা বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হবে। তাই একটুও চিন্তা না করে সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনার ভাণ করে বললাম,

"হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, এই সব কুৎসা রটনা করছে কারা তা' আমি জানি। এই সব দলাদলি, ঝগড়া, রেষারেষির ব্যাপার আপনারা বুঝবেন না। ওদের ওখানে আমার বিরুদ্ধে এই সব প্রচার করা হচ্ছে, অন্য জায়গা থেকেও আমার কানে এসেছে। আপনারা চিন্তা করবেন না। পুলিশ এত বোকা নয় যে ওদের এই সব প্রচারে ভুলে বিপথে ঘুরে বেড়াবে। আপনার 'স্বদেশী স্টোরে' বলে দেবেন যে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করলে আমি বিন্দুমাত্র ভয় পাব না। আর এ কথাও বলে দেবেন যে, পুলিশকে অত সহজে ঠকান যায় না।"

আমার কথার ভাবে ওঁরা আশ্বস্ত হলেন। বিশ্বাস করলেন যে, এটা নিতান্তই একটা তুচ্ছ গুজব; সত্যিকারের অপরাধীকে খুঁজে বার করবার মত বুদ্ধি পুলিশের আছে।

এর পর দু' দিনের মধ্যে আমাকে আর একটি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হল—সেটা আরও জটিল।

সেদিন দলের বিশেষ একটি কাজ সেরে বেলা এগারোটায় বাড়ী ফিরেছি, বাবা আমাকে ডেকে বললেন—

"আধঘণ্টা আগে তোমার চন্দ্রশেখর কাকা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তুমি এলেই তোমাকে তাঁর কমার্শিয়াল কলেজে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। চন্দ্রশেখর আমাকে বললেন যে, সত্যি কথা বললে তোমাকে উনি বাঁচিয়ে দিতে পারেন। যাকগে, তুমি এখনি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা কর।"

তখনি রওনা হলাম চন্দ্রশেখর কাকার সঙ্গে দেখা করতে। চন্দ্রশেখর দে, রাজাবাজার বোমা-মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯১১।১২ সালে তিন চার বছর জেল খেটেছেন। তাঁর বড় ভাই হৃদয়চন্দ্র দে ডাক্তার, আমার বাবার সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু। হৃদয় কাকা আর আমরা যেন একই পরিবারের লোক ছিলাম।

চন্দ্রশেখর কাকাকে আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতাম। দীর্ঘ, গৌরকায়, সবল সুন্দর দেহ ছিল তাঁর; চলাফেরায় একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। কারা-বন্ধন থেকে মুক্ত হবার পর শর্টহ্যান্ড, টাইপ এবং টেলিগ্রাফি শেখবার জন্য একটা কমার্শিয়াল কলেজ খুলে বসলেন। এই কলেজের সার্টিফিকেট নিয়ে ছাত্ররা রেলের চাকরী পেত। সময় সময় সরকারী চাকরীতেও ঢুকতে পারত। এসব তখন আমার চিন্তার বিষয়বস্তু ছিল না। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের জন্য এবং সর্বোপরি রাজাবাজার বোমা-মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত দেশভক্ত বীর হিসেবে তিনি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন।

সেদিন মনে মনে ভেবেছিলাম যে, চন্দ্রশেখর কাকার কাছে কিছুই গোপন করা চলবে না। তিনি আমার স্বীকারোক্তি শুনে অখুশি হবেন না, কারণ তিনিও যে একই পথের পথিক। কাজেই সব কথা তাঁকে খুলে বলব।

জানি না আকাশের কোনো গ্রহ সেদিন আমার প্রতি সদয় হয়েছিল কি না, নইলে পথে টেলিগ্রাফ অফিসের পাহাড়ের নীচে হঠাৎ জুলুদার সঙ্গে আমার দেখা হবে কেন? জুলুদাকে সংক্ষেপে ঘটনাটা বললাম। শুনে জুলুদা বিশেষভাবে আমাকে সাবধান করে দিলেন যেন কিছুতেই আমি তাঁর কাছে কিছু স্বীকার না করি। জুলুদার সঙ্গে দেখা না হলে সেদিন নিজের অজান্তে আমি নিজের প্রতি এবং দলের প্রতি বিশেষ বিপদ ডেকে আনতাম।

কমার্শিয়াল কলেজে গিয়ে চন্দ্রশেখর কাকার সঙ্গে দেখা করলাম। আমাকে দেখেই উনি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমাকে ভিতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে নিরিবিলিতে বেশ নাটকীয়ভাবে বললেন,

"দেখ, বাঁচবার পথ আমার হাতে। সত্যি কথা বলবে। মিথ্যা বলবে না। ঠিক করে বল ডাকাতি তুমি করেছ? আমার কাছে গোপন করো না।"

কথাগুলি বলবার সময় তাঁর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি আমার অন্তর ভেদ করে সত্য জানবার চেষ্টা করছিল। আমি সোজা তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। মনে যাই থাক, মুখের ওপর তার ছায়া যেন কিছুতেই এসে না পড়ে। মুখে প্রাণপণে সরলতার ছাপ ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করে বললাম—

"আমাকে বিশ্বাস করুন কাকাবাবু, আমি কক্ষনো ডাকাতি করি নি। যদি সত্যিই করতাম আপনার কাছে স্বীকার করতে কোন বাধা ছিল না।

আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দলেরাই আমার সম্বন্ধে এই সব গুজব রটাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে কি করতে পারি বলুন?...”

আমার অভিনয় সার্থক হল। কাকাবাবু আমার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করলেন। বোধ হয় ভাবলেন তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে এতটুকু ছেলে কখনো ধোঁকা দিতে সাহস করবে না। আমার নির্দোষিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে, আমি যেন এই সব গুজব নিয়ে চিন্তা না করি।

তারপর শুরু হল নানা কথা—তাঁর অতীত জীবনের সব রোমাঞ্চকর কাহিনী। আমি তাঁর সব কথা খুব মন দিয়ে শুনলাম; উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে তিনিও খুব খুশি হয়ে উঠলেন। কথায় কথায় পরোইকোরা ডাকাতির কথাও উঠল। আমি এবার আমার সারল্য প্রমাণের জন্য 'পাঞ্চজন্যের খবরটা ব্যবহার করলাম,

"আচ্ছা কাকা, ওরা কি করে ৭৮টা লোহার সিন্দুক ভেঙে ফেলল? এ যেন অলৌকিক কাহিনী বলে মনে হয়।"

কাকাবাবু সিন্দুক ভাঙার রহস্য জানতেন, তাই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন,

"না না, ৭৮টা নয়—ওটা ছাপার ভুল। ৭।৮টা সিন্দুক ভেঙেছে, তাও সব কাঠের।"

"তাও কম কথা নয়। সেগুলিই বা ভাঙল কি করে?"

"ও কিছু কঠিন কাজ নয়।" এবার কাকাবাবুর কণ্ঠস্বরে গর্বের আভাস—"একটা লোহার রড দিয়ে একটা মোচড় দিলে বা বড় হাতুড়ির ঘা দিলেই তালা ভেঙে যায়।...আমরা যখন এসব কাজ করতাম তখন নদীর ঘাট থেকে বাড়ী পর্যন্ত মোমবাতির আলো জ্বালতাম, তারপর কাজে লাগতাম।..."

চোখ বড় বড় করে তাঁর কাহিনী শুনলাম—কাকাবাবুও তাঁর বিপ্লবী জীবনের ইতিহাস বলে আমাকে বিস্মিত করে খুশি হলেন। বেচারী চন্দ্রকাকা! কত সহজেই ঠকানো গেল তাঁকে!

মাসীমা এবং চন্দ্রকাকা—দু'জনেই আমার নিরীহভাব দেখে বিশ্বাস করেছিলেন যে আমি নিরপরাধ। মাসীমা যে এলাকা থেকে খবরটা সংগ্রহ করেছিলেন সেখানে গিয়ে জোর গলায় আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করে এলেন। চন্দ্রকাকাও শহরের অভিজাত মহলে জানালেন, আমি এ ডাকাতির সঙ্গে বিন্দুমাত্র সংশ্লিষ্ট নই—সবই অপরপক্ষের রটনা।

এর ওপর আবার গ্রামের লোকদের কাছে বর্ণনা শুনে এবং আমাদের স্বেচ্ছায় ফেলে আসা মুসলমানী টুপি দেখে আর আমাদের মুখনিঃসৃত অপূর্ব নিম্নশ্রেণীর কদর্য ভাষার কথা শুনে পুলিশ অন্য পথে তদন্ত শুরু করল—আমাদের নিয়ে আর মাথা ঘামাল না।

প্রায় দিন পনের পর পুলিশী বিক্রম মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। প্রাথমিক তদন্তের পর সিরাজুল হক (পরে মৌলভী সিরাজুল হক), ও রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন কয়েকজন সাধারণ ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। এ'দের সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হল—চারুবিকাশ দত্ত, প্রতাপ রক্ষিত এবং চারুবাবুর দলের আরও কয়েকজন লোককে।

পুলিশ আমাদের কাউকে গ্রেপ্তার না করে চারুবাবুর দলকে কেন ধরল তার কারণ আছে। আমাদের সাবধানতা সত্ত্বেও পুলিশ বুঝতে পেরেছিল যে, এই ডাকাতিতে পিস্তল এবং রিভলভার ব্যবহার করা হয়েছে। আমার নির্দোষিতা সম্বন্ধে শহরে বেশ আলোচনা হয়েছিল। সে জন্য সন্দেহটা আমাদের দলের ওপর না পড়ে চারুবাবুর দলের ওপর পড়ল। অবশ্য এই সামান্য একটুখানি সন্দেহের বশে পুলিশ ওঁদের গ্রেপ্তার করত না। পুলিশ একটি উড়ো চিঠি পেয়েছিল যাতে আমাদের দলের লোকদের নাম এবং আমাদের বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ ছিল। এতে স্বভাবতঃই পুলিশের সন্দেহ গিয়ে পড়েছিল আমাদের বিপক্ষ দলের ওপর। এ চিঠির কথা অনেকদিন পরে আমি বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে জানতে পারি—যখন ১৯২৪ সালে ১নং বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অ্যাক্ট-এর প্রভাবে বন্দী হয়েছিলাম।

যাক পুলিশ যখন সন্দেহ করল যে এটা একেবারে সাধারণ ডাকাতি নয় এবং বিশ্বাস করল যে, আমাদের দল এতে জড়িত নেই, তখন চারুবাবুর দলকেই বন্দী করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। যাহোক শেষ পর্যন্ত মাস তিন হাজত খাটাবার পর চারুবাবুদের ছেড়ে দিতে হল।

আমাদের বিপ্লবী জীবনের বহুবিধ কীর্তিবিজড়িত স্মৃতি-কথার প্রথম কীর্তি এই ডাকাতি। এই প্রথম প্রচেষ্টায় মাস্টারদার নেতৃত্বে আমরা জয়ী হলাম। টাকা কত পেয়েছিলাম সেটা বড়ো কথা নয়, নির্বিঘ্নে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের বিপথে পরিচালিত করলাম, আমাদের চিহ্নও তারা খুঁজে পেল না—এখানেই আমাদের কৃতিত্ব।

আমাদের দলের সভায় নেতারা এবার স্থির করলেন যে, আমার আর অস্ত্র সঙ্গে রাখবার প্রয়োজন নেই, উচিতও নয়। কারণ প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ কয়েকজন সাধারণ মুসলমান এবং চারুবাবুর দলকে গ্রেপ্তার করেছে, কাজেই আমাদের খুব ভয়ের কারণ নেই এখন। যদি হঠাৎ কখনও পুলিশের হাতে আমি বন্দী হই, প্রমাণের অভাবে হয়ত ছেড়ে দেবে। কিন্তু বন্দী হবার সময় যদি আমি আত্মরক্ষার জন্য রিভলভার ব্যবহার করি, তবে অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি হবে। এই সব সাত পাঁচ ভেবে নেতারা নির্দেশ দিলেন যে, কেউ এখন চলাফেরার সময় অস্ত্র সঙ্গে রাখবে না, যতদিন পর্যন্ত না অন্যরকম নির্দেশ দেওয়া হয়।

এরকম নিখুঁতভাবে এত বড় একটা কাজ করেও শেষ পর্যন্ত কি পেলাম সেটাই এই নাটকের শেষ অঙ্কের প্রহসন। এ যেন সেই হাসপাতালের রিপোর্ট —'অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে, কিন্তু রোগীর মৃত্যু ঘটেছে।' অপরিচিত ব্যক্তি-বিশেষের বাড়ীতে ডাকাতি করে তার ফল সম্বন্ধে যে অনিশ্চয়তা দেখা যায়, সেই অভিজ্ঞতাই আমাদের পরবর্তী বিপ্লবীজীবনে, বিশেষ করে ১৯৩০ সালের ঐতিহাসিক সংগ্রামের পূর্বাহ্ণে, খুবই সাহায্য করেছে,—সে সময়কার প্রস্তুতির জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় আমরা কোথাও কোন ডাকাতি করি নি।

প্রেস রিপোর্টে ছিল—'পরোইকোরায় নগদে ও জিনিসপত্রে যাহা লুণ্ঠিত হইয়াছে তাহার পরিমাণ প্রায় পঁচাত্তর হাজার টাকা।'

শহরে যা গুজব ছড়িয়েছিল তা'তে 'অপহৃত দ্রব্যের মূল্য আশি হাজার টাকার কম নয়।'

আর পুলিশ কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুসারে, "ডাকাতরা নগদ টাকা, গহনাপত্র ও অন্যান্য জিনিসে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা লুণ্ঠন করিয়াছে।"

প্রকৃতপক্ষে দু' ঘণ্টা ধরে অত খোঁজাখুঁজি করে আমরা যা সংগ্রহ করেছিলাম তার মূল্য খুব বেশি হলেও ছয়শ' (৬০০৲) টাকার বেশি নয়। যেখানে আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম—সেখানে মাত্র ছয়শ' টাকা? ও টাকা ত আমরা নিজেদের বাড়ী থেকেই জোগাড় করতে পারতাম—তার জন্য অত সাজসজ্জা, অত সতর্কতা আর একটা বিরাট বিপদের সম্ভাবনা মাথায় নেবার কি প্রয়োজন ছিল? এ যে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া!

বিপ্লবের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত অর্থ আমাদের নেতাদের কাছে থাকত, তাঁরাই প্রয়োজনমত টাকা খরচ করতেন। কারণ, আমরা তখন ছোট ছিলাম। বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অ্যাক্টে যখন আমরা বিনা বিচারে বন্দী ছিলাম তখন পুলিশ গুপ্তচর বিভাগের অফিসাররা আমাদের সঙ্গে দেখা করে বন্ধুভাবে কথাবার্তা বলে নেতাদের বিরুদ্ধে আমাদের মন বিষিয়ে দেবার চেষ্টা করত। এই সব ডাকাতির টাকা-পয়সার অপব্যবহার হয়—এ কথাও তারা জানাতে ভুলত না। কিন্তু তাদের চালে আমরা ভুলি নি। প্রথম সারির সৈনিক হওয়ায় অপহৃত অর্থের পরিমাণ আমাদের অজানা ছিল না। তাই নেতাদের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে যা'রা অপবাদের ছাপ দেবার চেষ্টা করত তারাই আমাদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হ'ত। পরোইকোরা ডাকাতিতে কত টাকা পাওয়া গেছে তা আমি ভাল করেই জানতাম।

ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার বিপ্লবীরা তাদের প্রথম ডাকাতিতে এই করুণ অভিজ্ঞতা লাভ করে প্রতিজ্ঞা করল যে, অর্থসংগ্রহের জন্য কোনদিন ভবিষ্যতে কোন কারণেই তারা কোন গৃহস্থবাড়ীতে (যত বড়লোকই হোক না কেন) ডাকাতি করতে যাবে না। কারণ, সেখানে ভুল সংবাদ পাবার সম্ভাবনাই বেশি। এই প্রতিজ্ঞা আমরা রক্ষা করেছিলাম। এরপর আমাদের দল কখনও কোন গৃহস্থবাড়ীতে ডাকাতি করে নি।

এই ডাকাতি থেকে আমরা আরও একটি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলাম—ভাল মত ভয় দেখাতে পারলে মানুষের বিচারবুদ্ধি লোপ পায়—তারা রজ্জুকেও সর্পভ্রম করে। সেই রাত্রে সরসীবাবুর বাড়ীর ঘটনায় আমরা মাত্র সাতজন অংশ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু ভীত গ্রামবাসীরা যে বর্ণনা দিয়েছিল তা'তে শোনা যায় চল্লিশজন লোক, চল্লিশটা সাইকেল, চল্লিশটা টর্চ এবং চল্লিশটা রিভলভার নিয়ে ডাকাতি করতে এসেছিল। এই ঘটনার আট বছর পরে ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল আমরা আমাদের এই অভিজ্ঞতা সম্বল করে যখন মাত্র পঞ্চাশজন বিপ্লবী পুলিশ হেড-কোয়ার্টার অধিকার করেছিলাম, তখন আমাদের সমবেত জয়ধ্বনি আর বন্দুকের গুলীর শব্দ বিমূঢ় সিপাইদের কানে সহস্রলোকের সশস্ত্র আক্রমণ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল।

এই রাজনৈতিক ডাকাতির জন্য আমাদের দলের ওপর যাতে কোনমতেই পুলিশের কোন সন্দেহ না হয়, সেজন্য নেতারা আরও একটি উপায় অবলম্বন করলেন। যাদের ওপর পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি ছিল, যাদের গতিবিধি অনুসরণ করে পুলিশ কোন কিছু সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিল, তাদের নির্দেশ দেওয়া হল স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় মন দিতে। ফলে জুলুদা হঠাৎ ভাল

ছেলে বনে গিয়ে কলকাতায় পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনা করতে শুরু করে দিলেন। মাস্টারদা 'নর্মাল স্কুল' নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে আবার শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করলেন আর আমি ও নির্মলদা পড়াশুনায় মন দিলাম।

আমি আর স্কুলে ফিরে গেলাম না। বাড়ীতে ডেস্কের সামনে বই খুলে ব'সে থাকতাম। বাবা-মাকে বোঝাতাম যেন আমাকে তাঁরা কলকাতায় পাঠিয়ে দেন, সেখানে গিয়ে 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনে' (বর্তমানে যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ) ভর্তি হব। আমার বন্ধু গণেশ এক বছর আগে ওখানে ভর্তি হয়েছে—আমার ইচ্ছে আমিও সেখানে যাই।

গণেশের অনুপস্থিতি আমাকে পীড়া দিত। তাই ভাবলাম দলের নির্দেশে যখন স্কুলে ভর্তি হতেই হবে, তখন গণেশ যেখানে আছে সেখানে যাব। পুজার ছুটিতে গণেশ এলে তাকে বললাম সব কথা। সেও খুব খুশি। ঠিক করলাম যেমন করে পারি বাবাকে রাজী করাবই।

বাবা আমার প্রস্তাবে একেবারেই মত দিলেন না। তিনি মাকে বললেন, "ও ওখানে গিয়ে মন দিয়ে পড়াশুনা করবে ভেবেছ? কক্ষণো না। দেখবে ওখানে আরও পাঁচটা দলের সংগে মিশবে আর লেখাপড়া সব চুলোয় যাবে।"

বাবার মত না পেলে যাওয়া অসম্ভব। তাই নানাভাবে মাকে বোঝাতে লাগলাম। হাজারটা মিথ্যা কথা বলে মন ভুলিয়ে তাঁকে বিশ্বাস করালাম যে, আমি সত্যিই মন দিয়ে পড়াশুনা করতে চাইছি। মা আর দিদির অনুরোধ এড়াতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বাবা মত দিলেন। হয়ত মনে ভাবলেন, সত্যিই তো,—পড়াশুনা না করে বাড়ীতে বসে থাকলেই বা কি লাভ হবে? কিন্তু মাকে বললেন,

"এই আমি বলে দিচ্ছি মনে রেখো, ও কক্ষণো পড়াশুনা করবে না। তোমাকে ভবিষ্যতে এর জন্য অনুতাপ করতে হবে।"

আমার বাবা আমাকে ভালমতই চিনতেন, তাই সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে আমি পড়াশুনা করব না। কিন্তু আমি পড়াশুনা করি বা না করি, শেষপর্যন্ত যে বাবা-মা'র অনুতাপের কারণ ঘটাব না, এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম। এখন পর্যন্ত আমার বিশ্বাস আমি এমন কিছু করিনি যার জন্য মাকে অনুতাপ করতে হয়েছে।

বাবার অনুমতি পেয়ে আমি গণেশকে বললাম আমার জন্য একটি সীট্ যোগাড় করে দিতে। গণেশ সেকেন্ডারী কোর্স পড়ত; কিন্তু আমার পক্ষে সেই কোর্সে ভর্তি হওয়া হয়ত সম্ভব হবে না। কারণ স্কুলে পড়বার সময় গণেশের ম্যাথমেটিক্স এবং মেকানিক্স সাবজেক্ট ছিল, আমার ছিল না। তবু প্রাইমারী কোর্সেও যদি সীট পাওয়া যায় তাতেই হবে। কারণ কোন ক্লাসে ভর্তি হচ্ছি বা কি পড়ছি সেটা আমার চিন্তার বিষয় ছিল না; আসল কথা কলকাতায় যেতে হবে। কাজেই দুই বন্ধুতে মিলে পরামর্শ করে ঠিক হল আগামী সেসনে কলকাতায় গিয়ে আমি বি টি ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হব,— তখন স্কুলটা ছিল মানিকতলায়।

এই তিন মাসে আমাদের দলের কাজ একেবারে যে বন্ধ ছিল তা' নয়। নতুন নতুন সদস্য সংগ্রহ করা আর ব্যায়াম, বক্সিং, যুযুৎসু, ইত্যাদি শিক্ষা ও

অভ্যাস করা নিয়মিত চলছিল। অম্বিকাদা মাঝে মাঝে শহরে এসে থাকতেন, আবার গ্রামের ভেতর সংগঠনের কাজে চলে যেতেন। অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা বা ব্যবহার করা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। সবচেয়ে বেশি হ'ত আলোচনা—ভবিষ্যৎ সশস্ত্র আক্রমণ সম্বন্ধে আলোচনা—কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা সুস্পষ্ট কোন কাজের কথা নয়। দলের মধ্যে সাময়িক একটা নিষ্ক্রিয়তার ভাব দেখা গেল।

এ সময়ে একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। সে কথা বলছি। আমাদের একজন সাথী রাজেন দাস—বয়সে মাস্টারদা, অম্বিকাদা এঁদের সমবয়সী হবে। এই বন্ধুটি প্রায়ই বিপ্লব সম্বন্ধে আমাদের কাছে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিত এবং আমরা যে কোন কিছু না করে হাত পা গুটিয়ে বসে আছি এর জন্য আমাদের যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করত। বলাবাহুল্য, পরোইকোরা ডাকাতির বিষয় ও কিছু জানত না। আমরাও ওকে কিছু বলিনি বা দলের আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীর মধ্যে তাকে নিইনি। এর প্রধান কারণ দলের নেতারা মনে করতেন—ওপরের আড়ম্বর যতখানি দেখা যায় ভেতরে ঠিক ততটা শাঁস নেই। অবশ্য ওর আন্তরিকতা বা দেশ-প্রীতি সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। ও আমাদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য যে-ভাবে তিরস্কার করত তা'ও যে একেবারে ভিত্তিহীন তা নয়। বরঞ্চ ওর তিরস্কার আমাদের বিপ্লবের কাজে খানিকটা শক্তি সঞ্চার করত, এ কথা বলা যায়।

কিন্তু ওর কথার ভাবে আমরা বেশ কৌতুক অনুভব করতাম। হঠাৎ হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ও মাস্টারদা, অম্বিকাদা, ও নির্মলদাকে বলত "আর কত গুজ-গুজ ফুসফুস করবি? কেওল গুজগুজ অর ফুসফুস! কাম তো কিছু নাই, কেওল বাৎ। পোয়াছার মাথা খাই কি আর অইব? কেওল কথা দি ভুলাই কি অইব?......কাওজে কলমে তো বৌৎ বিবলাব কৈরগী। হারা কইল-কাতা দাদাঔলের লয় ঘুরি দেখ্যি। হককলর এক্কই কথা! কেওল বাৎ আর বাৎ, গুজ গুজ আর ফুস ফুস। বছরর পর বছর গেল গৈ। কেওল বিব্লাবের খোয়াব দেইলাম। আইজো কোন এগগুয়া অ্যাকশন ন কৈরলাম। অরগ্যা-নাইজেশন রাইএরে কি'ইব—ভাঙ্গি দে না! মিছামিছি নিজেরে ভুলাই আর কি'ইব?" (আর কত ফিস ফাস করবি? কেবল গজর গজর আর ফুস ফুস। কাজ তো কিছুই নেই, কেবল কথা। ছেলেপুলের মাথা খেয়ে কি আর হবে? কেবল কথা দিয়ে ভুলিয়ে কি হবে?......কাগজে কলমে তো অনেক বিপ্লব করেছি। সারা কলকাতা দাদাদের সঙ্গে ঘুরে দেখেছি। সবারই সেই এক কথা। কেবল কথা আর কথা! কেবল গজগজানি আর ফুসফুসানি। বছরের পর বছর পেরিয়ে গেল আজ পর্যন্ত একটা অ্যাকশনও করি নি। অরগ্যা-নিজেশন রেখে আর কি হবে—ভেঙে দে না! শুধু শুধু নিজেকে ভুলিয়ে কি হবে?)।

বন্ধু রাজেন দাসের এই সব কথা কখনও আমাদের বিরক্তি উৎপাদন করে নি, বরঞ্চ কাজে উৎসাহ দিয়েছে। কিন্তু আমরা জানতাম ও মুখে যতই আস্ফালন করুক, সত্যিকারের কাজের সময় এলে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিতে পারবে না। পর পর কতকগুলি ঘটনায় এ ধারণা আমাদের বদ্ধমূল হয়েছিল যে, খুব ভালোমত ট্রেনিং না পেলে ও 'বিপ্লবের' পথে বেশি দূর

অগ্রসর হতে পারবে না। কাজেই ওকে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য একটি প্ল্যান খাড়া করা হল।

নির্দিষ্ট দিনে আমার সাজসজ্জা আরম্ভ হল। আঁট করে পরা ধুতির ওপর একটি লুঙ্গি; সাদা সার্টের হাতা গুটিয়ে নিয়ে তার ওপর একটা কালো ওয়েস্ট কোট পরলাম, তার একটামাত্র বোতাম লাগানো, যাতে এক নিমেষে ওটা গা থেকে খুলে নিতে পারি, মুখে কালো চাপ দাড়ি, ইয়া গোঁফ। আয়নায় নিজেকে দেখে চিনতে পারি না—ঠিক যেন শহরের একজন কুখ্যাত মুসলমান গুণ্ডা।

আমাদের বাড়ীর কাছে একটা খালি পড়ো জমি ছিল, প্রায় পাঁচ বিঘা হবে। তার চারদিকে ভদ্র পাড়া; একদিকে একটি পায়ে-চলা পথ—এ পথ দিয়ে সোজা আমাদের বাড়ীতে খুব অল্প সময়ে আসা যায়।

অম্বিকাদা নির্দিষ্ট সময়ে একটা ছুতা করে রাজেন দাসকে আমার বাড়ী পাঠালেন, বললেন—ঐ সোজা পথ দিয়ে যেতে। নিজে উনি ন্যাশনাল হাই স্কুলের বারান্দায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এই পথে ন্যাশনাল হাই-স্কুল থেকে আমাদের বাড়ীতে আসতে মিনিট দশেকের বেশি সময় লাগে না। রাত তখন ন'টা, মাঠ আর পথ দুই-ই এ সময়ে নির্জন।

এক প্রকার বৈপ্লবিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে এই মাঠটি আমরা এই ধরনের সামান্য বিপজ্জনক কাজে ব্যবহার করতাম। এখানে যদি কোন গোলমাল বা অনাবশ্যক চীৎকারও হয়, আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের বুঝিয়ে সুজিয়ে মানাতে পারব—তারা অন্তত আমাদের পুলিশের হাতে দেবে না।

নির্দিষ্ট সময়ে আমি সেই মাঠে পায়ে-চলা পথের ওপর পায়চারী করতে লাগলাম। অপেক্ষা করছি রাজেন দাসের জন্য, আর ভাবছি এই অন্ধকার রাত্রে মাঠের ওপর এই ভীষণ মূর্তি দেখলে রাজেন দাসের অবস্থাটি কি হবে? কি করবে সে? আমাকে মারতে উদ্যত হবে, না চীৎকার করে আমার পেছনে পেছনে দৌড়বে, না চেঁচাতে চেঁচাতে পালিয়ে যাবে, নাকি একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়বে? সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত আছি আমি। আর অন্য কিছু হলেও তার ব্যবস্থা করব। কিন্তু মরিয়া হয়ে যদি আমায় আক্রমণ করে, তবে আহত হবার সম্ভাবনা। কারণ আমি জানি ও আমাদের বন্ধু, তাই আমি ওকে মারতে পারব না। অথচ গুণ্ডার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ও প্রাণের দায়ে প্রতি-আক্রমণ করবে।

এই সব সাত পাঁচ চিন্তা করছিলাম। এমন সময় দেখি বেশ স্ফূর্তি-মনে এগিয়ে আসছে রাজেন দাস। পায়ে-চলা পথটার ওপর দু' হাঁটু মুড়ে উঠকো হয়ে বসে রইলাম। দূর থেকে ও আমাকে দেখতে পেল। তার গতি একটু মন্দ হল, বোধ হয় ভাবল এই অসময়ে মাঠের মধ্যে আবার কে বসে?

ওর হাবভাব দেখে আমি উঠে ওর দিকে দু'পা এগিয়ে গেলাম। তার গতি এবার একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। হতভম্ব হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর একটু এগিয়ে দু' হাত তুলে আমি ওকে আস্তে একটু ধাক্কা দিলাম—অতি সামান্য এক ধাক্কাতেই কুপোকাৎ। সে যেন একেবারে স্থাণুর মত নিশ্চল। না পারছে কথা বলতে, না পারছে চলতে, না পারছে আমাকে ফিরে আক্রমণ

করতে। পালাবারও উপায় নেই, পা' দুটি যেন কে শক্ত করে পেরেক দিয়ে মাটির সঙ্গে আটকে দিয়েছে।

আর হাসি চাপতে পারছিলাম না। ওকে ছেড়ে দিয়ে একরকম প্রায় জোরে জোরেই হাসতে হাসতে পা চালালাম। অম্বিকাদা আমাদের পরীক্ষার ফল জানবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ন্যাশনাল হাই-স্কুলের বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন। কি হল না হল ভেবে উৎকণ্ঠাও বোধ করছিলেন। আমি গিয়ে সব ঘটনা বলাতে অম্বিকাদাও প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন।

একটু পরেই দেখি রাজেন দাস, আমার দাদা এবং আমাদের বাড়ীর একজন চাকরকে সঙ্গে নিয়ে এদিকে আসছে—সকলেরই হাতে লাঠি, চাকরের হাতে লণ্ঠন। মজার কথা এই যে আমার দাদা (নন্দলাল সিং) আগে থেকেই সব জানতেন। কিন্তু আমাদের কথামত এ বিষয়ে রাজেনকে কিছু না বলে লাঠি এবং লণ্ঠন দিয়ে তাকে সাহায্য করেছেন।

ওদের আসতে দেখেই অম্বিকাদা হাসতে শুরু করেছেন। কিন্তু আমি যেন খুব অবাক হয়েছি এমনি ভাব করে বললাম- "এ কি দাদা? তোমরা এ সময়ে লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে কোথায় চলেছ?" রাজেন খুব উত্তেজিতভাবে উত্তর দিল,

"জান কি সাংঘাতিক ব্যাপার! আমাকে ক'জনে মিলে আক্রমণ করে-ছিল?"

"সত্যি? কারা তারা? কোন্ দিকে গেছে? ক'জন ছিল দলে? তোমার লাগে নি ত?"—এক নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করি।

এবার রাজেন বেশ উৎসাহের সঙ্গে গল্প ফেঁদে বসল--

"ঐ খোলা জায়গাটা দিয়ে যাচ্ছি। তিনজন লোক হঠাৎ এগিয়ে এসে আমাকে আক্রমণ করল। আমি পড়ে গেলাম। বেশ ব্যথা পেয়েছি। ওরা ক'জন পূব-দিকে দৌড়ে পালিয়ে গেল।"

আমি এবার সত্যি সত্যিই অবাক! এমন আষাঢ়ে গল্প শুনতে হবে ভাবি নি। পেট ফেটে হাসি আসছে, কিন্তু হাসবার উপায় নেই, তাহলে সব ভেস্তে যাবে। আরও গম্ভীর হয়ে বললাম,

"কী আশ্চর্য! এখানে এই ভদ্রপল্লীতে এসে গুণ্ডারা আক্রমণ শুরু করেছে? এর কারণ কি? আমার মনে হয় নিশ্চয়ই তারা আমাকে মারবার জন্য এসেছিল। আমি ত রাত্রে প্রায়ই ঐ পথে বাড়ী যাই! বোধ হয় ভুল করে তোমাকে মেরেছে। আমি গুণ্ডাদের ভয় করি না। কিন্তু কত সময় মেয়েরাও ঐ পথে যাওয়া-আসা করেন। এ ধরনের ঘটনা তো চলতে দেওয়া উচিত নয়। যে করে হক এসব বন্ধ করে দিতে হবে......।"

এইভাবে আমি ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দিলাম। রাজেন দাসও আমার কথা বিশ্বাস করল। আসল ঘটনার বিন্দুবিসর্গও সে জানল না।

আর একটা অভিজ্ঞতার কথা এখানে না বলে পারছি না। ঠিক ঐ জায়গাটায় ঐভাবে আমরা আর একজন সাথীর সাহস পরীক্ষা করেছিলাম। সে আমার সমপাঠী, নাম—নবীন। আমার চেয়ে শক্তি তার কম নয়। কিন্তু যেই আমি মুসলমান গুণ্ডা সেজে আক্রমণের ভঙ্গীতে হাত তুলে ওর কাঁধে সামান্য আঘাত করেছি, অমনি সে প্রাণপণে চীৎকার করে উঠল,

"উজা—উজা—আঁরে মারি ফেলাইলো।" (আসুন—ছুটে আসুন—আমাকে মেরে ফেলল)।

আমি পড়লাম মহা বিপদে। আচমকা ও যে ঐভাবে চেঁচিয়ে উঠবে আমি তা' আশঙ্কা করি নি, ভেবেছিলাম হয়ত খানিকটা বাধা দেবার চেষ্টা করবে। যাই হোক, সব অবস্থার জন্যই প্রস্তুত ছিলাম। এই পাড়ায় এইভাবে চেঁচিয়ে উঠলে আশেপাশের বাড়ী থেকে আলো আর লাঠি নিয়ে লোক জড়ো হবে; কাজেই আমি সোজা দক্ষিণ দিকে দৌড়ে গেলাম। বাঁ হাতে দাড়ি, গোঁফ আর টুপি খুলে ফেললাম; ডান হাতে লুঙ্গি আর ওয়েস্ট কোটটা খুলে সবগুলি একত্র করে আমাদের একজন বন্ধু—সুকুমার বিশ্বাসের বাড়ীর এলাকার মধ্যে ছুঁড়ে দিলাম। এদিকে আমার আশঙ্কা মত লোক ছুটে আসছে চারদিক থেকে—পালাবার পথ নেই। সার্ট তো গায়েই ছিল, আঁট করে পরা ধুতিটা একটু আলগা করে নামিয়ে নিয়ে আমিও সামনে এগিয়ে গেলাম,—যেন চীৎকার শুনে সকলের সঙ্গে সঙ্গে আমিও যাচ্ছি।

নবীনের দিকে এগোতে এগোতে চেঁচিয়ে বললাম,

"কে ওখানে? কী ব্যাপার?"

তারপর যেন নবীনকে দেখে খুবই অবাক হয়েছি এইভাবে বললাম—

"কী আশ্চর্য! তুমি নবীন? কি ব্যাপার? কি হয়েছে তোমার?"

আমাকে দেখে নবীন আশ্বস্ত হল। ইতিমধ্যে লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে প্রায় জন পাঁচশেক ভদ্রলোক এসে হাজির। নবীন বলল—

"আমাকে হঠাৎ কতজন মিলে আক্রমণ করল। মাথায় আঘাত করেছে।"

—"তাই নাকি? ক'জন তারা? কোনদিকে গেছে?"—উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলাম।

নবীন উত্তর দিল, "তিনজন ছিল দলে। দু'জন পূর্বদিকে গেছে—একজন দক্ষিণ দিক দিয়ে পালিয়েছে।"

একই ব্যাপার! রাজেন দাসের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। কোন মতে হাসি সংবরণ করে সবাইকে বললাম—"বোধ হয় গুণ্ডারা আমার খোঁজেই এসেছিল। যাই হোক, ওদের এবার ভালমত শিক্ষা দিতে হবে।" ব্যাপারটা এখানেই মিটে গেল।

কিছুদিন বাদে হঠাৎ বিকেলবেলা রাজেন এসে হাজির আমার বাড়ীতে। তার কথাবার্তার ধরন একেবারে বদলে গেছে। লজ্জায় কুণ্ঠায় ইতস্তত করে সে আমাকে জানাল যে, মাস্টারদার কাছ থেকে সে সবই শুনেছে। সত্যিই তার শারীরিক এবং মানসিক শক্তি আরও বাড়াতে হবে।

এরপর থেকে রাজেন দাস নিয়মিত ব্যায়াম ও বক্সিং করত।

সেদিনই মাস্টারদার সঙ্গে দেখা। আমাকে ডেকে বললেন—

"অন্য সব বারের মত এবারেও রাজেন এসে আমাকে নিষ্ক্রিয়তার জন্য তিরস্কার করছিল। আমি প্রতিবাদে বললাম, 'সত্যিই আমরা চুপ করে বসে নেই।' তখন সে বার বার বলতে লাগল, 'কই? কী করেছেন—অন্তত একটা কাজের প্রমাণ দিন।' তখন আমি বাধ্য হয়ে তাকে বলি, 'মুক্তি সৈনিক যে-সে হতে পারে না। তাকে সাহস এবং শক্তির পরীক্ষা দিতে হয়; আমরা সৈনিকদের পরীক্ষা করে দলে নিচ্ছি। তারপর সেদিনকার ঘটনার উল্লেখ করি।

রাজেনের প্রশংসা করতে হয় যে, সে একটুও অসন্তুষ্ট না হয়ে বরং নিজের দুর্বলতার জন্য লজ্জিত হল এবং ভবিষ্যতে নিজেকে তৈরি করবার সংকল্প গ্রহণ করল।"

এরপর নবীনকেও প্রকৃত ঘটনা বলা হল। সে তার মানসিক দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নিজেকে ভবিষ্যতের বিপ্লবীরূপে গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। পরবর্তী পরীক্ষায় সে সসম্মানে উত্তীর্ণ হল। এক জন প্রতিবেশী গুন্ডাদের দৌরাত্ম্য সহ্য করতে না পেরে আমাদের সাহায্য চেয়েছিলেন। আমরা এক রাত্রে সেই বাড়ীর চারপাশে আমাদের পাহারাদার নিযুক্ত করি। আমরা যে লোকটিকে চাইছিলাম, সেই রাত্রির অভিযানে নবীন তাকে ধরে নিয়ে এল।

পরীক্ষা আরও চাই। এটুকুতেই দলপতিরা সন্তুষ্ট নন। এবার দিতে হবে কঠিনতর পরীক্ষা।

নবীন এবং আর একজন দলের সাথীকে (তার নাম প্রকাশ করতে চাই না) বলা হল—মুসলমান বেশে ভোজালি আর ছোরা নিয়ে শহরের উত্তর প্রান্তে একটি নির্জন পথের ধারে তারা অপেক্ষা করবে। একা কোন লোককে আসতে দেখলে দুজনে গিয়ে তাকে ভয় দেখিয়ে তার টাকার ব্যাগ অথবা অন্য কোন জিনিস ছিনিয়ে নেবে। টাকা বা জিনিস আমাদের প্রয়োজন নেই। আসল উদ্দেশ্য দলের সদস্যপদে যোগ দেবার মত সাহস এবং বিক্রমের পরীক্ষা নেওয়া।

নির্দিষ্ট দিনে তারা দু'জনে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রইল। সাবধানতার যাতে ত্রুটি না হয়, সেজন্য আমি আর নির্মলদা দুটি রিভলভার নিয়ে তাদের অগোচরে কাছেই একটি সুবিধাজনক জায়গায় লুকিয়ে রইলাম। যদি ওরা সত্যিই কোন বিপদে পড়ে, তবে যাতে সময় মত তাদের উদ্ধার করতে পারি। কারণ, ঐরকম জায়গায় ছোরা হাতে যদি ওরা কেউ ধরা পড়ে তবে অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি হবে। ভদ্রলোকের কলেজে পড়ুয়া ছেলেরা কি জবাব দেবে যদি ধরা পড়ে!

প্রথম দিন ওরা খালি হাতে ফিরে এল। অত রাত্রে সে রাস্তায় সেদিন একজন পথিকও ছিল না। তা সত্ত্বেও সেই প্রথম দিনের দাঁড়িয়ে থাকা পরীক্ষাতেই নিজের মনের জোরের ওপর আস্থা হারিয়ে অন্য বন্ধুটি নির্মলদার কাছে তার পদত্যাগের সংকল্প জানাল। বলল যে, আমাদের প্রতি বিশ্বাস ও সহানুভূতি তার চিরদিন অটুট থাকবে—কিন্তু নিজ হাতে সে কোন আক্রমণাত্মক কাজ করতে পারবে না।

এই ধরনের সব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলেই আমাদের দলের সক্রিয় সভ্য হবার অধিকার পাওয়া সম্ভব ছিল। এইটিই ছিল আমাদের সংগঠনের বিশেষত্ব।

সরসী মহাজনের বাড়ীতে ডাকাতি করতে যাবার সময় আমাদের দলের সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধুটি ভয়ে পেছিয়ে গিয়েছিল—সেই শিক্ষা আমাদের উপযুক্ত কর্মীনির্বাচনে বিশেষ ধরনের কর্ম-কৌশল গ্রহণের প্রেরণা দিয়েছিল। এইরকম দীর্ঘ-মেয়াদী শ্রমসাধ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন

বলেই চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা সাত বছর পরের সেই সশস্ত্র অভ্যুত্থানে সফলতা অর্জন করেছিলেন।

পরোইকোরা ডাকাতির পরে এবং আমার বি. টি. ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হবার আগে পর্যন্ত আর একটি স্মরণীয় ঘটনা আমার মনে আছে। সাধারণ পাঠকের কাছে হয়ত তার বিশেষ মূল্য নেই, কিন্তু আমার বিপ্লবী-জীবনে তার দাম যে কতখানি তা' বোঝান যাবে না। এই সামান্য একটা ঘটনায় মাস্টারদার বৈপ্লবিক চরিত্রের যে অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগের পরিচয় পেয়েছিলাম তাতে আজীবন অসঙ্কোচে তাঁকে নেতা বলে স্বীকার করে এসেছি। আর, কী আশ্চর্য, কখনও তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে মনে কোন প্রশ্নেরও উদয় হয় নি। এতদিন পরেও সে কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারি নি।

সেদিন কোন্ তারিখ ছিল, কি মাস—কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে পড়ন্ত বেলা তখন। আমি আমার ঘরে বসে একমনে কী কাজ করছি—মাস্টারদা এলেন।

মাস্টারদার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল বিপ্লবীদল সংক্রান্ত কোন জটিল প্রশ্ন তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। মুখে কোন ভাব-বৈলক্ষণ্য নেই, কিন্তু চোখ দু'টি যেন অশান্ত। মাস্টারদাকে এরকমভাবে মানসিক স্থৈর্য হারাতে কোনদিন দেখি নি। আমার বিস্ময়কে গভীরতর করে তুলে তিনি বললেন,

"দেখ্ অনন্ত! আমি খুব ভাল করে চিন্তা করে দেখেছি। আমার প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করবার চেষ্টা করছিলাম। তোদের মত যুবকদের নিয়ে সংগঠন তৈরি হয়েছে, তার পরিচালনার দায়িত্ব নেবার মত ক্ষমতা কি আমার আছে? জুলুর সে অধিকার আছে,—শক্তিতে, সামর্থে, মিলিটারী শিক্ষায়—বিশেষতঃ যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় সে আমাদের দলের সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। সে খাটতে পারে, হঠাৎ দরকার হলে সামান্য কিছু টাকা অন্তত জোগাড় করতে পারে; অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছে সে, তোদের অস্ত্রচালনা শেখাচ্ছে। কিন্তু আমি কি করছি? এসব কোন গুণেই আমার মধ্যে নেই। তবে আমি কেন সকলের ওপরে নেতা হয়ে বসে আছি? আমার মনে হয় জুলুর অনুপস্থিতিতে তুই কিংবা নির্মলবাবু দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলে ভাল হয়।"

আমি খুব অবাক হয়ে মাস্টারদার কথাগুলি শুনছিলাম। বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে তাঁর প্রস্তাবের সপক্ষে আরও জোরাল যুক্তির অবতারণা করলেন মাস্টারদা,—

"দেখ্, সারাদিন সাইকেলে ঘুরে ঘুরে সব সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে আমি পারি না। তাদের ব্যায়াম বা যুদ্ধরীতি শিক্ষা দেওয়া কিংবা বক্সিং যুযুৎসু শেখানো—তাও আমার ক্ষমতার বাইরে। দলের জন্য সামান্য কয়েকটা বই কিনবার টাকার দরকার হলেও আমাকে নির্ভর করতে হয় তোর কিংবা নির্মলবাবুর ওপর। এই অবস্থায় এতটা অসহায়তা নিয়ে আমার কি দলপতি সেজে বসে থাকা উচিত? এতে আমার ক্ষতি, তোদেরও ক্ষতি; আর সবচেয়ে বড় কথা দলের ক্ষতি। কারণ দলের মধ্যে যদি উপযুক্ত নেতা না থাকে, শুধু সাজিয়ে দেখাবার জন্য যদি একজন নেতার প্রয়োজন হয়, তবে সেই দলের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আর, তোরা যদি লজ্জায় আমাকে পরিষ্কার একথা বলতে না পারিস্, যদি আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে

আমাকে নেতা বলে মেনে নিস, তবে সে নেতৃত্ব আমাকে বিন্দুমাত্র আনন্দ দেবে না। এরকম সাজান নেতা হতে আমি ঘৃণা বোধ করি। তাই বলছি তুই আর নির্মলবাবু পরামর্শ করে যাই হোক একটা কিছু ঠিক কর্, আমাকে রেহাই দে। যদি বয়স কম বলে তোর নেতা হতে আপত্তি থাকে তবে চল্ দুজনে মিলে নির্মলবাবুকে বলি—সে দল পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিক।"

মাস্টারদার গম্ভীর কণ্ঠস্বর সমস্ত ঘরখানিতে একটা গভীর আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। এখনও যেন মাঝে মাঝে কানে এসে বাজে সেই অপূর্ব ধীর শান্ত কণ্ঠস্বর। ক্ষীণ চেহারার মধ্য থেকে ঐরকম গম্ভীর আওয়াজ—নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না।

খানিকক্ষণ সম্মোহিত হয়ে বসে রইলাম। ভারি অবাক লাগছিল। বিপ্লবীদলের নেতৃত্ব নিয়ে যখন প্রতি জেলায় প্রতি দলে আপ্রাণ প্রতিযোগিতা চলেছে তখন দলের সর্বজন-সমর্থিত নেতার মুখে এ কি বিস্ময়কর প্রস্তাব! বাংলার বিপ্লবের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা!

তখন যেন ঘরের দেওয়ালে বার বার প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে ফিরে আসছে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের আত্মজিজ্ঞাসা- "কী ক্ষমতা আছে আমার নেতা হবার? কী অধিকার আছে? যে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী তাকে স্বেচ্ছায় রাজ্যপাট ছেড়ে দিয়ে যাব। বিপ্লবের স্বার্থ, সমষ্টির স্বার্থ, দলের স্বার্থ সকলের ওপরে। ব্যক্তির সেখানে স্থান নেই। স্থান নেই আত্মশ্লাঘা, স্বার্থপরতার।"

কী অপূর্ব চরিত্র! এই চারিত্রিক বলের জন্যই তিনি নেতা। আমাদের দলের প্রতিটি সদস্যের চেয়ে নেতৃ-পদে তাঁর যোগ্যতা অনেক বেশি—কিন্তু সে-কথা হয়ত প্রমাণের অভাবে তখনও তিনি জানতেন না, কারো পক্ষে জানা সম্ভবও নয়। ভবিষ্যতের অপরিহার্য নেতৃত্বের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর আত্ম-বিশ্বাসের অভাব আমাকে ব্যথিত করল--কিন্তু অন্তরে আমি প্রকৃত নেতার ব্যক্তিত্বকে প্রণাম জানালাম! এইসব ছোট ছোট নানান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই মাস্টারদার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ইঙ্গিত আমরা বারবার পেয়েছি।

যে সময়কার ঘটনা বলছি, তখন আমাদের বয়স খুবই অল্প। অতটুকু বয়সে এ ধরনের কথার পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। পরে যখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা বেড়েছে, বিপ্লবীদলের মধ্যে থেকে আমাদের এবং অন্যান্য দলের নেতা ও সাধারণ সভ্যদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করেছি, আলোচনা করেছি—তখন আরও গভীরভাবে অনুভব করেছি মাস্টারদার আন্তরিকতা, তখনকার বিপ্লব সম্বন্ধে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি এবং নির্ভীক মনোভাব।

একটা হাই-স্কুলের একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক স্কুলের একটি ছাত্রকে অনুরোধ করছেন তাঁর নিজের সম্মানিত পদ গ্রহণ করতে—এটা সাধারণ বুদ্ধিতে অবাস্তব বলে মনে হয়। হয়ত মনে হতে পারে যে, তিনি আরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার জন্য সরলতার ভাণ করেছিলেন--যেমন ঔরঙ্গজীব সিংহাসন অধিকার করবার আগে কার্যসিদ্ধির উপায়স্বরূপ মোরাদকে বলেছিলেন—'তুমি সম্রাট হও—তোমাকে সিংহাসনে বসিয়ে আমি মক্কায় চলে যাব।' এই চালটুকু দিয়ে একটি স্কুলের ছাত্রকে প্রতারণা করা খুবই সহজ। কিন্তু

মাস্টারদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ত এখানেই শেষ হয়ে যায় নি। বিপ্লবী-জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মাস্টারদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। আমি তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ করে বুঝেছি সেদিন আমাকে বোকা বানাবার জন্য তিনি সেই প্রস্তাব করেন নি। নিজের মনে ভুল ভেবে নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ এসেছিল বলেই সরল বিশ্বাসে আমার কাছে তা' ব্যক্ত করেছিলেন। এখানেই তিনি সকলের থেকে স্বতন্ত্র, সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই গুণের জন্য বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে তিনি অসাধারণ। প্রকৃত বিপ্লবী যিনি তাঁর মধ্যে কৃত্রিমতা থাকতে পারে না; মিথ্যা দিয়ে কিছুদিন হয়ত ভোলান যায় লোককে, কিন্তু চিরদিন নয়।

মাস্টারদার চরিত্রের এইটিই বিশেষত্ব যে, যখন তিনি বিপ্লবের কথা চিন্তা করতেন, (বলা বাহুল্য এ ছাড়া অন্য কোন কথা চিন্তা করবার অবসর তাঁর ছিল না) তখন একেবারে নিঃস্বার্থভাবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করতেন। আত্মশ্লাঘা বা আত্মম্ভরিতা তাঁর মনে কোনদিন স্থান পায় নি।

ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার অবিসংবাদী নেতা ছিলেন মাস্টারদা—সূর্য সেন। চট্টগ্রামে যে সুষ্ঠুভাবে একটি সামগ্রিক আক্রমণের পরিকল্পনা সফল হয়েছিল, যা বাংলার আর কোথাও হয় নি, সে রহস্যের চাবি-কাঠি এইখানে—সূর্য সেন চরিত্রে। যেখানে বিপ্লবী নেতা ডিক্টেটরের মত নিজেকে বড় করে দেখতে গিয়ে অপরকে প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করেন—সেখানেই দেখা যায় দলাদলি, রেষারেষি,—নেতৃপদ নিয়ে অশোভন প্রতিযোগিতা। সেখানে কোন বৃহৎ পরিকল্পনা পূর্ণরূপ ধারণ করতে পারে না। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও আত্মদানের মধ্যে তখনকার বৈপ্লবিক কর্মধারা সীমাবদ্ধ ছিল। সূর্য সেনের নেতৃপদের যোগ্যতা নিয়ে কোনদিন দলের কোন ব্যক্তির মনে সন্দেহ জাগে নি—তাঁর বলিষ্ঠ চরিত্র সকল সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল।

মাস্টারদার প্রস্তাব শুনে খানিকক্ষণ আমি স্তব্ধ হয়ে রইলাম। আকস্মিক এই অসম্ভব প্রস্তাবের কি উত্তর দেব? সবচেয়ে অবাক লাগছিল নিজের সম্বন্ধে তাঁর এই অজ্ঞতা বা ভুল ধারণা কেন? একটু পরে বললাম,

"মাস্টারদা, নিজের সম্বন্ধে হয়ত আপনার স্পষ্ট ধারণা নেই বলেই এই-সব আজগুবি চিন্তা করছেন। আপনি আপনার সেনাপতিদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখছেন কেন? আমরা ত সকলে মিলে এক। নির্মলদা, আমি বা আপনি—আমাদের ত কোন পৃথক সত্তা নেই। তবে আপনি কেন ভাবছেন আপনার শারীরিক বা আর্থিক শক্তি যথেষ্ট নেই?

"আরও একটা কথা ভেবে দেখুন। দলের মধ্যে কারো কারো হয়ত শারীরিক শক্তি আপনার চেয়ে বেশি। আর্থিক সঙ্গতিও বেশি থাকতে পারে। কিন্তু শুধু এ দুটিই কি বিপ্লবী গুণের মাপকাঠি? শক্তি এবং অর্থ যদি সঠিক ভাবে পরিচালিত না হয়—তবে ত সবই নিরর্থক। সেইজন্যই প্রয়োজন একজন সর্বজনমান্য দৃঢ়চিত্ত নেতার—যার ইচ্ছাশক্তি দলকে পরিচালিত করবে। বলুন তো মাস্টারদা, আপনি ছাড়া আর কে আছে আমাদের মধ্যে যাকে কেন্দ্র করে আমাদের কাজের চাকা ঘুরবে? কে প্রতি নিয়ত দলে প্রাণসঞ্চার করবে, ঝিমিয়ে পড়া মনকে জাগিয়ে তুলবে? কেউ নেই মাস্টারদা, কেউ নেই। এ শুধু আমার একার কথা নয়; বিশ্বাস করুন মাস্টারদা, এ আমাদের দলের সকলের মনের

কথা। আমরা হয়ত কিছু টাকা দিয়েছি, অস্ত্র দিয়েছি, বই দিয়েছি—কিন্তু আপনি যা দিয়েছেন তা চোখে দেখা যায় না বলেই আমরা যে অনুভব করতে পারি নি এ ধারণা আপনার ভুল।"

কি ভাষায় কথাগুলি বলেছিলাম, কি ভাবে আকুলতা প্রকাশ করেছিলাম তা' আজ ভাল করে মনে নেই; কিন্তু আমার কথায় মাস্টারদা আমার মনের ভাব ধরতে পেরেছিলেন। অল্পবয়সী শিষ্যের মুখে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। তবে মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারছিলাম আমার আন্তরিকতা সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ নেই। জানি না আমার কথায় তিনি সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারছিলেন কিনা—তবে একথা আমি আজ নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে সেদিন অবিশ্বাস করলেও পরে সংগঠনের কাজ যখন দিনের পর দিন নানা ঘাত-প্রতিঘাত, অনুকূল-প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে তখন ধীরে ধীরে মাস্টারদা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন যে, সেদিন সেই সামান্য বালক একবর্ণও অসত্য বলে নি। দলের কোন সদস্য কখনও প্রকাশ্যে বা গোপনে মাস্টারদার বৈপ্লবিক চরিত্র অথবা নেতৃপদের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলে নি। আর আমার নিজের কথা আমি বলতে পারি চিরদিন তার বিশ্বস্ত সৈনিকরূপে আমি কাজ করে গেছি- কখন কোথাও ছন্দপতন ঘটে নি।

কলকাতায় আসবার আগে পর্যন্ত আমাদের দলের কাজ ঢিমেতালে চলছিল। নেতারা নিয়মিত আমাদের নিয়ে মিটিং-এ বসতেন অনির্দিষ্টভাবে কাজ-কর্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হ'ত। আমরা আবার তরুণ সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রেখে তাদের মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে বৈপ্লবিক কাজের যোগ্য করে তুলবার চেষ্টা করে চলেছিলাম। বিপ্লব এবং বিপ্লবীদের সম্বন্ধে আবেগপূর্ণ আলোচনাও চলত মাঝে মাঝে। এদিকে আবার নেতারা এবং আমরা অল্প কয়েকজন বিশেষ সতর্ক ছিলাম যাতে পুলিশ কোনমতেই আমাদের সন্দেহ না করে। পরোইকোরা ডাকাতির পর খানিকটা সময় চাই, যাতে নিরুদ্বেগে পরবর্তী কাজের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।

অস্ত্র যা যোগাড় হয়েছে তা' কিছুই নয় আরও অনেক চাই। আর অস্ত্র পেতে হলে চাই অর্থ—প্রচুর অর্থ। কিছুই আমাদের নেই। অনুন্দা ও গণেশ কলকাতায়। অম্বিকাদা গ্রামে। আরও একবার রাজনৈতিক ডাকাতি করব কিনা সে বিষয়ে মতদ্বৈধ ছিল, কোন নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করা হ'ল না। এই নিষ্ক্রিয়তার আরও একটি কারণ ছিল বোধ হয়। কলকাতায় সন্তোষদার দল অর্থ সংগ্রহ করবার জন্য রাজনৈতিক ডাকাতির ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন; তাঁদের কাজের পরিণতি দেখবার জন্য আমরা একটু সময় নিচ্ছিলাম।

আগেই বলেছি অনুশীলন ও যুগান্তর—বাংলার এই দুইটি বিশেষ বিপ্লবী পার্টিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছোট ছোট দল স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে নিজেদের প্রাধান্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল। চট্টগ্রামে আমাদের দল যেমন পূর্ণ সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও যুগান্তরের বিশেষ বিশেষ প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলত, সমকালে কলকাতায়ও ঠিক তেমনই—সন্তোষদার (মিত্র) দলের সঙ্গেও যুগান্তরের বিশিষ্ট নেতাদের সংযোগ ছিল।

সন্তোষদার দলের সঙ্গে আমাদেরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং পরস্পর নির্ভরতা ছিল। কিন্তু দলের আভ্যন্তরীণ গোপনতা সযত্নে রক্ষা করা হ'ত। গুপ্ত বিপ্লবীদের নিরাপত্তার জন্য এর বিশেষ প্রয়োজন ছিল; আবার অন্য একটা ক্ষতিকর দিকও ছিল। প্রতিটি নব-গঠিত দলের মধ্যেই এই রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল যে, রেষারেষি এবং ক্ষমতাপ্রিয়তার জন্য সুবিধাজনক সময়ে তারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করত। শেষ পর্যন্ত জুলুদা আর সন্তোষদাও একত্রে থাকতে পারলেন না; দু'টো দল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল,—এ অবশ্য অনেক পরের ঘটনা।

যাই হোক, এখন সন্তোষদা কিছু একটা করতে চাইছিলেন এবং সেটা আমাদের সকলেরই স্বার্থে। আমাদের নিষ্ক্রিয়তার এটাই বোধ হয় প্রধান কারণ, —আমরা সন্তোষদার দলের সফলতার ওপর নির্ভর করেছিলাম।

ইতিমধ্যে আমার কলকাতায় যাবার ব্যবস্থা সব হয়ে গেল। গণেশ বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনস্টিটিউশনের প্রাইমারী কোর্সে আমার জন্য একটি সীট্‌-এর ব্যবস্থা করে টেলিগ্রাম পাঠাল। দু'দিনের মধ্যেই চট্টগ্রাম ছেড়ে যেতে হবে। কলকাতায় গিয়ে ব্যাপকতর কাজের ক্ষেত্র পাব, এই আনন্দে মন নেচে উঠল। কিন্তু মাস্টারদা আর নির্মলদা অতটা খুশি নন। একে একে সবাই দূরে চলে যাচ্ছে, আমিও কলকাতায় চলে যাব! আমি তাঁদের আশ্বস্ত করে বললাম, "আমি ত আর সত্যি সত্যিই সুবোধবালকের মত পড়াশুনা করতে যাচ্ছি না। এভাবে বসে থাকতে আমার ভাল লাগছে না। জুলুদার সঙ্গে গিয়ে পরামর্শ করব অবিলম্বে আবার কি করে কাজ শুরু করা যায়। কলকাতার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই।"

মাস্টারদা আর নির্মলদা (অম্বিকাদা তখন ছিলেন না) আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন তাঁদের নিজস্ব মত, যাতে আমি আবার কলকাতায় গিয়ে জুলুদা, গণেশ এবং যশোদার কাছে তা' জানাতে পারি এবং একটা নির্দিষ্ট কিছু করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়।

এদিকে কলকাতা যাবার ব্যাপারে আমার মা-বাবাও খুব স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। মা বারবার আমাকে বোঝাচ্ছিলেন আমি যেন লক্ষ্মী ছেলে হয়ে মন দিয়ে পড়াশুনা করি, মায়ের কথার অমর্যাদা না করি। বাবা বারবার আমাকে সাবধান করে দিচ্ছিলেন যেন কলকাতায় গিয়ে "ভয়ঙ্কর সব রাজনৈতিক দলের" আওতায় না পড়ি। মা-বাবার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে রওনা হলাম। মনে মনে ভাবলাম যদি দেশের কাজের পথে লেখাপড়া অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায় তবে লেখাপড়া করে যাব—মা বাবাকে সন্তুষ্ট রাখব। তখন কি জানতাম কলকাতায় যাবার পর ঘটনাচক্র কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

কলকাতায় কলেজের পড়াশুনা আর ছাত্রাবাসের জীবনযাত্রা খুব যে ভাল লাগছিল তা' নয়। তবে গণেশ, যশোদা পাল আর জুলুদার সাহচর্যে দিনগুলি আনন্দে কাটছিল। এখানে এসে স্মাগ্‌লারদের সম্বন্ধে কিছু কিছু জানতে পারলাম গণেশ এবং যশোদার কাছে। শুনলাম তারা নাকি বেশির ভাগই জাহাজের নাবিক,—গোপনে অস্ত্র বিক্রী করে। এবার মনে মনে আশা হল হয়ত অস্ত্র যোগাড় করতে পারব। চেষ্টাও করলাম, কিন্তু সফল হলাম না। এদিকে সমানে জুলুদাকে বিরক্ত করে চলেছি কোন কিছু নির্দিষ্ট কাজের ব্যবস্থার জন্য।

শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে জুলুদা আমাকে অন্যভাবে খুশি করবার জন্য অনুকূলদার (অনুকূল মুখার্জী) সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এর আগে বিপিনদা (বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী) এবং জ্যোতিষদার (জ্যোতিষ ঘোষ) সঙ্গে আমার বেশ হৃদ্যতা ছিল। ভূপেনদাকেও (ভূপেন দত্ত) ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম। ১৯০৫ সালের বা তার আগের বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে মাত্র এই কয়জনের সঙ্গেই পরিচয় ছিল—অন্য বিখ্যাত নেতারা, যেমন সুরেন ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র দাস, যাদু-গোপাল মুখার্জী, অমর চ্যাটার্জী প্রভৃতির সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। কোন বিপ্লবী দাদার প্রতিই আমার কোন মোহ বা আকর্ষণ ছিল না যদি না তিনি আমাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য অথবা আমাদের পরিকল্পনা সমর্থন করেন।

ভূপেনদা বয়সে অন্য দাদাদের চেয়ে ছোট ছিলেন। সশস্ত্র আক্রমণের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করতেন, আমাদের চট্টগ্রাম-দলের কার্যকলাপের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল। কিন্তু তিনি সর্বদা একটু দূরত্ব এবং গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলতেন। সে জন্য ১৯২২-২৪ সালে তাঁর সঙ্গে আমাদের দলের বিশেষ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না। তবুও সশস্ত্র আক্রমণের প্রতি অনুকূল মনোভাবের জন্য আমরা তাঁকে বিশেষ পছন্দ করতাম।

জ্যোতিষদা বরাবর খোলাখুলিভাবে আমাদের নৈতিক সমর্থন জানিয়েছেন, নানাভাবে সাহায্য করেছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন। বিপিনদাও আমাদের চট্টগ্রাম-দলের সশস্ত্র আক্রমণের নীতি অনুমোদন করতেন। কাজেই আমাদের চট্টগ্রামের দল কোন বিশেষ বিপ্লবী দলের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে জ্যোতিষদা এবং বিপিনদার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলছিল।

এই সময় অনুকূলদার সঙ্গে জুলুদা আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বাংলার সে যুগের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে অনুকূলদার দান সর্বোত্তম। জুলুদা নিজের অজ্ঞাতে আমার যে উপকার করলেন, তা' ভবিষ্যতে আমার বিপ্লবী জীবন গড়ে তুলতে কতখানি সাহায্য করবে তা' হয়ত তিনি সেদিন কল্পনাও করতে পারেন নি।

অনুকূলদাকে দেখলাম। শরীর যেন লোহায় গড়া। নিয়মিত ব্যায়াম ও কুস্তি করতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মান সম্রাট কাইজারের মতো একজোড়া গোঁফ তাঁর বড় বড় উজ্জ্বল চোখের নীচে সর্বদা উদ্ধত হয়ে থাকত। কথা বলার ভঙ্গীতেও একটা বিশেষত্ব ছিল। ছোট ছোট বাক্য—জায়গায় জায়গায় ঝোঁক দিয়ে বলতেন—শুনতে বেশ লাগত।

অনুকূলদার কাছে সে যুগের সীমিত বিপ্লব সম্বন্ধে অনেক বাস্তব জ্ঞান লাভ করেছি। তিনি বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী প্রচেষ্টার গল্প আমাকে শোনাতেন। তাঁরা একবার পাঁচশ জার্মান মুশার পিস্তল আর পঞ্চাশ হাজার কার্তুজ অপহরণের জন্য যে ব্যাপক পরিকল্পনা সংগঠন করেছিলেন, কি ভাবে প্রতিটি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে হয়েছিল, তার একটি বিশদ চিত্র তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। নানারকম সূত্র ধরে নানাভাবে জাল ফেলে কয়েকজন কর্মীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কাজটি করা হয়েছিল। অনুকূলদার দান এতে সবচেয়ে বেশি। কলকাতার বিখ্যাত আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রেতা 'রডা কোম্পানী' মারফত তিব্বতের মহারাজার জন্য এগুলি আসছিল। মাঝপথে কলকাতায় এর থেকে

কতকগুলো অস্ত্র সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করা হল। শেষপর্যন্ত সফলতার সঙ্গে পঞ্চাশটি মুশার পিস্তল ও ছে'চল্লিশ হাজার গোলাগুলী নির্বিঘ্নে পাচার হয়ে গেল।

এইসব গল্প শুনতাম অনুকূলদার কাছে। আর দেখতাম, স্মাগলারদের (চোরা কারবারী) কাছ থেকে নির্বিঘ্নে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অস্ত্র জোগাড় করবার জন্য নানারকম "ষড়যন্ত্রের" প্ল্যান সফলতার সঙ্গে পরিচালনা করছে অনুকূলদার উর্বর মস্তিষ্ক। একদিন আমাকে দেখালেন এক গোছা একশ' টাকার জাল নোট। দেশের কাজের জন্য যখন টাকার দরকার, তখন নোট ছাপিয়ে নিলে দোষ কি? নোটগুলি শতকরা আশি ভাগ নির্দোষ—বাকীটার ব্যবস্থা করতে পারলেই বাজারে চালান যাবে।

তখনকার দিনে বিপ্লবীদাদারা, যাঁরা বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত ছিলেন তাঁরা অনেক অনেক বই পড়ে বই-এর কথাগুলি প্রচার করতেন। অনুকূলদার পড়াশোনা হয়ত কম ছিল, কিন্তু বিপ্লবের কাজে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর অনেক বেশি। এত পড়াশোনা করেও দাদারা শ্রেণী-সংগ্রাম সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেন নি। সর্বাত্মক ও বাস্তব কোন পরিকল্পনা তাঁদের মাথায় আসে নি; এমন কি সশস্ত্র বিপ্লব কি করে হতে পারে সে সম্বন্ধেও তাঁদের জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ। অনুকূলদারও এ বিষয়ে সমান ত্রুটি ছিল; কিন্তু অন্য দাদাদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল এই যে--অন্যরা 'ব্যাপক' জ্ঞান নিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতেন আর অনুকূলদা সেই তুলনায় সীমিত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও চেষ্টা করতেন অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের। বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী পার্টি এবং গ্রুপের জন্য তিনি প্রচুর অস্ত্র গোপনে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। আর সবচেয়ে গৌরবের কথা, যদিও পুলিশের গোপন তথ্যে ছিল যে অনুকূলদা অস্ত্র সংগ্রহ করছেন, তবু তিনি কখনও হাতে-নাতে ধরা পড়েন নি।

অনুকূলদার সঙ্গে পরিচিত হবার পর ধীরে ধীরে তাঁর বিভিন্ন গুণের জন্য তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলাম। ফলে বিপিনদা এবং জ্যোতিষদার প্রতি আমার আনুগত্যবোধ একটু কমে গেল। অনুকূলদা এ'দের দু'জনকে শ্রদ্ধা করতেন, বিপিনদাকে বলতেন "কর্তা"। অন্য সব প্রাক্তন বিপ্লবী দাদারা, যাঁরা কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পন্থা বরণ করে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বাস্তবে পরিত্যাগ করেছিলেন, তাঁদের প্রতি আমরা—চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র বিপ্লবী দল, সব সময় খুব আস্থা রাখতে পারি নি, যদিও তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করেছি সব সময়।

বয়োবৃদ্ধ অভিজ্ঞ দাদাদের মধ্যে আমি অনুকূলদাকেই সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করতাম। ১৯২১-২৪ সালে আমাদের জন্য তিনি স্মাগ্‌লারদের কাছ থেকে অস্ত্র এনে দিতেন--জুলুদা কলকাতায় ওঁর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতেন। এর সাত বছর পরে অনুকূলদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হল। তিনি আমাদের যে সাহায্য করলেন তার তুলনা নেই। সেটা অন্য গল্প। তবে, সেই প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই অনুকূলদার অন্তরের জ্বলন্ত অগ্নি-শিখা আমার মনকে স্পর্শ করেছিল।

কলকাতায় আমার কলেজ জীবনে পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের এবং অনুকুলদার সাহচর্য আমাকে যথেষ্ট আনন্দ এনে দিয়েছিল। সেই সময়ে

স্মাগ্‌লারদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সফল হতে পারি নি। যতদূর জানি অনুকূলদা অন্যদের অস্ত্র এনে দিতেন ঠিকই, কিন্তু কখনো কাউকে স্মাগ্‌লারদের কাছে নিয়ে যেতেন না। নিরাপত্তার জন্য এটার প্রয়োজন ছিল। আমাকে তিনি কি চোখে দেখেছিলেন জানি না,—কেন অতটা বিশ্বাস করেছিলেন তাও জানি না—আমাকে ১৯৩০ সালে বহু স্মাগ্‌লারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় হয়েছিল তখন কি অনুকূলদা ভেবেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত এই সব স্মাগ্‌লারদের সঙ্গে তিনি আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেবেন! আজকে লিখতে বসে মনে হচ্ছে তিনি আমাকে কত স্নেহ করতেন—কত বিশ্বাস করতেন! যদি তিনি আমাকে বিশ্বাস না করতেন তবে স্মাগ্‌লারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ থেকে আমি বঞ্চিত হয়েই থাকতাম।

অনুকূলদার দোষত্রুটি নিয়ে বিচার আমি করব না। তাঁর বিপ্লবী অবদান আমি তুলনামূলক ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেছি। সেই যুগে তথা-কথিত শিক্ষিত প্রবীণ বিপ্লবী নেতারা যাঁরা অনুকূলদাকে একটু অবজ্ঞার ও অবহেলার চোখে দেখতেন—তাঁদের সঙ্গে তুলনা করে আমি আমার অন্তরের বিপ্লবী শ্রদ্ধা অনুকূলদাকেই জানাই। সেই যুগে সন্ত্রাস সৃষ্টির সীমাবদ্ধ পরিকল্পনার বেশী কিছুই যখন কোন প্রবীণ নেতাদের কেউ ভাবতে পারেন নি তখন তাঁদের উচ্চ-শিক্ষার গর্বে অনুকূলদার অল্প-শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা কেবলমাত্র তাঁদের ব্যঙ্গই করেনি—তাঁদের আত্মপ্রবঞ্চনাকেও ধিক্কারই দিয়েছে।

আজ অনুকূলদা বেঁচে নেই। তাঁকে প্রশ্ন করে জানবার সুযোগ নেই যে কেন তিনি আমাকে অতটা পছন্দ করতেন, কেনই বা নির্ভাবনায় আমার হাতে অস্ত্র তুলে দিতে দ্বিধা করতেন না!

অনুকূলদার আন্তরিক বাসনা ছিল যে তাঁর দেওয়া অস্ত্রগুলি যেন সত্যি সত্যিই দেশের কাজে ব্যবহার করা হয়। শুধুমাত্র দল-গঠন আর একে ওকে দেখিয়ে আকৃষ্ট করবার জন্য এসব অস্ত্র তিনি দিতেন না। আমরা চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল তাঁর আশা বিফল করি নি,—প্রতিটি অস্ত্র আমরা ইংরেজ-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যবহার করেছি। অমর হয়ে থাকুন অনুকূলদা, আর অমর হয়ে থাক সেই যুগের বিপ্লবের প্রয়োজনে তাঁর অপরিহার্য সাহায্য!

আমার কলকাতা বাসের কয়েক মাসের মধ্যেই সন্তোষদার দল পর পর কয়েকটি ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করল। অবিলম্বে অস্ত্র চাই, অস্ত্রের জন্য টাকার প্রয়োজন, কাজেই বেশি ভাববার বা নিখুঁতভাবে প্রস্তুতির সময় ছিল না। একরকম মরীয়া হয়ে সন্তোষদার দল পর পর তিন-চার জায়গায় ডাকাতি করল,—কলকাতা থেকে খানিকটা দূরে শহরতলীতে 'কোনা' নামে একটা জায়গায়, উল্টাডাঙ্গা পোস্টঅফিসে, গড়পারে একটা তেলের কারখানায়, শাঁখারী-টোলা পোস্টঅফিসে এবং আরও কয়েকটি জায়গায়।

এত দ্রুত এক নাগাড়ে ডাকাতি করার স্বাভাবিক যা ফল তাই ফলল: পুলিশ মূল সূত্র পেয়ে গেল। সন্তোষদা এবং তাঁর দলের অন্যান্য সক্রিয় সদস্যারা প্রায় সকলেই বন্দী হলেন। নিত্যগোপাল হল রাজসাক্ষী।

১৯২৪ সালে আলিপুর কোর্টে মামলা উঠল। এটাই সেই বিখ্যাত দ্বিতীয় "আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা"। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

(সন্তোষদাদের পক্ষে ব্যারিস্টার) এমন জ্বালাময়ী ভাষায় যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থিত করলেন যে পুলিশের অভিযোগ, রাজসাক্ষী ও অন্যান্যদের সাক্ষ্য-প্রমাণ সবই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল। সকলেই মুক্তি পেলেন। কিন্তু বিচারে মুক্তি পেলেও বৃটিশ কারাগারে একবার প্রবেশ করলে বেরবার পথ খুঁজে পাওয়া শক্ত। ৩নং রেগুলেশন মতে সন্তোষদা এবং অন্যান্যদের বিনাবিচারে বন্দী করে রাখা হল।

ইতিমধ্যে পুলিশ মহলে দেবেন দে (খোকা) এবং গোপীনাথ সাহার নাম জানাজানি হয়ে গেছে। রাজসাক্ষীর কল্যাণে এদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্বন্ধে পুলিশের মনে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই এদের দু'জনকে আত্মগোপন করতে হল। তাদের অজ্ঞাতবাসে সাহায্য করলাম আমরা।

জুলুদার সঙ্গে এদের আগে থেকেই খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল; গণেশ, যশোদা এবং আমার সঙ্গেও এদের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। যখন শুনলাম এদের বিরুদ্ধে পুলিশ খুনের চার্জ এবং অন্যান্য চার্জ এনেছে, তখন অবিলম্বে এদের গোপন আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতে হল। কাজটা খুব কঠিন ছিল না আমাদের পক্ষে, কারণ, সৌভাগ্যবশতঃ রাজসাক্ষীটি আমাদের দলের অস্তিত্ব এবং ব্যক্তি-গতভাবে আমাদের সঙ্গে সন্তোষদাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। কাজেই পুলিশের দপ্তরে আমাদের নাম গিয়ে পৌঁছয় নি। দেবেন দে এবং গোপীনাথ দুজনেই আমাদের মত অল্পবয়সী। পুলিশ তাদের চেনে না। সুতরাং পুলিশের দৃষ্টির আড়ালে তাঁদের লুকিয়ে রাখা সহজেই সম্ভব হয়েছিল।

গোপী আর খোকার সঙ্গে আমরা প্রায়ই মিলিত হতাম। সন্তোষদার বিচার এবং আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা হত। "শাঁখারীটোলা পোস্টঅফিসে" ডাকাতির পর ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে আবার জ্যোতিষদা, অমর চ্যাটার্জী, উপেন ব্যানার্জী, যাদুগোপাল মুখার্জী প্রমুখ নেতারা বন্দী হলেন। বিপিনদা আত্মগোপন করলেন।

আমরা পরোইকোরা ডাকাতিতে পুলিশকে বিভ্রান্ত করবার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলাম, অন্যসব ডাকাতিতে তা' করা হয় নি। সেজন্য পুলিশ পরোইকোরার ডাকাতিকে 'স্বদেশী ডাকাতি' বলে মনে করে নি। কিন্তু অন্য সব ডাকাতির ঘটনায় পুলিশ নিশ্চিত বুঝতে পারল যে দেশে আবার 'সন্ত্রাসবাদের' সূত্রপাত হচ্ছে। সতর্কতাস্বরূপ তারা প্রাক্তন বিপ্লবীদের বন্দী করে ফেলল। অর্থাৎ আমরা, চট্টগ্রামের দল, প্রস্তুতির জন্য যে সময়টা চাইছিলাম—সে সময় আর পাওয়া গেল না। শুরু হল পুলিশী আক্রমণ। এখন আর সময় নেই। হঠাৎ কিছু করতে গেলে দলের মৃত্যু ডেকে আনা হবে, আবার যত দেরি করব ততই সফলতার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হবে।

মিটিং বসল কলকাতায়—জুলুদা, গণেশ, যশোদা এবং আমি। জুলুদা আমাদের কাছে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছে। বিপ্লবী আন্দোলন দমন করবার জন্য গভর্ণমেন্ট উঠে পড়ে লেগেছে। কাজেই আর দেরি না করে কিছু অস্ত্র কিনতে হবে। সেজন্য এখনি কিছু অর্থ চাই। 'অস্ত্র নিয়ে আমরা গভর্ণমেন্টের আক্রমণের প্রত্যুত্তর দেব—উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের হত্যা করে।

আমরা সকলেই জ্বলুদার প্রস্তাব মেনে নিলাম। প্রস্তাবের সপক্ষে আমরাও নিজের নিজের যুক্তি দিলাম।

এর পর সমস্ত আলোচনাটি কেন্দ্রীভূত হল মাত্র একটি প্রসঙ্গে—প্রাথমিক অর্থ কি করে সংগ্রহ করা যাবে? এখনি তা দরকার, অথচ পুলিশের দৃষ্টির বাইরে থাকতে হবে—এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নেই। কাজেই ডাকাতি করার কথা চিন্তা করা যাবে না। এখন পুলিশ এতটা সতর্ক হয়ে গেছে যে, যে কোন ডাকাতি হলেই তার পেছনে রাজনৈতিক কারণ খুঁজে বেড়াবে, বিপ্লবী দলের অনুসন্ধান করবে। আবার, কোন সূত্র না রেখে ডাকাতি করতে হলে অন্ততঃ বেশ কয়েক মাসের প্রস্তুতি চাই,—সে সময় আমাদের কোথায়?

শেষ পর্যন্ত আলোচনা করে স্থির হল—(১) পরের গাড়িতেই চট্টগ্রামে আমার বাড়ীতে আমি ফিরে যাব এবং যতটা সম্ভব কম আলোড়ন সৃষ্টি করে কয়েক হাজার টাকা বাড়ী থেকে নিয়ে আসব।

(২) টাকা নিয়ে এলেই জ্বলুদা বিভিন্ন সূত্রে কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করবার চেষ্টা করবেন।

(৩) গণেশ এবং জ্বলুদা, খোকা ও গোপীর সাহায্যে কয়েকজন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করবেন যাদের আমরা মৃত্যুবাণ প্রয়োগ করবার জন্য নির্বাচিত করব।

প্রয়োজনের সামনে কোন বাধাই দাঁড়াতে পারে না। পরের গাড়িতেই চট্টগ্রামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। কিন্তু বাড়ী গিয়ে বলব কি? এতদিন পরে আমাকে দেখে সকলেই খুশি হবেন জানি, কিন্তু যদি প্রশ্ন করেন কলেজ ছুটি না হতেই কেন চলে এসেছি, তখন তো আর সত্যি কথাটা বলা চলবে না! গণেশের বাড়ীতে গেলেও একই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

যাই হোক্, পরদিন তো গিয়ে হাজির হলাম বাড়ীতে। কয়েক মাসের অদর্শনের পর আমাকে দেখে মা-বাবা খুব খুশি। আমি যে হঠাৎ কোন খবর না দিয়ে এসে উপস্থিত হব তা কেউ ভাবতে পারে নি। আনন্দ প্রকাশ এবং আশীর্বাদের পালা শেষ হতেই এবার সেই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হল—কেন ছুটির আগেই এসেছি!

উত্তরটা তৈরি করাই ছিল। হাসতে হাসতে বললাম—"ছুটির আগে সিলেবাসের যতটা পড়াবার কথা সবটা পড়ান হয়ে গেছে। তাই আগে আগে ক্লাশ ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওখানে থাকলেই তো হোস্টেল চার্জ দিতে হবে—তাই চলে এলাম। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে গণেশও এসে পড়বে।"

মায়ের মনে আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না। ছেলের বিষয়-বুদ্ধিরও প্রশংসা করলেন মনে মনে—হোস্টেল চার্জ লাগবে বলে চলে এসেছে। বাবাকে সত্যিই বিশ্বাস করাতে পেরেছিলাম কিনা জানি না তবে মা যে ছেলের জন্য গর্ববোধ করেছিলেন তা বুঝতে পারলাম।

এক সময় সুযোগ বুঝে দাদা ও দিদিকে সব খুলে বললাম। আমাদের মিটিং-এর কথা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অবিলম্বে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা এবং শেষ পর্যন্ত আমার বাড়ী আসবার উদ্দেশ্য— সবই বললাম। ওঁরা আমার প্রস্তাবে সায় দিলেন এবং সব রকমে আমাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ঠিক হল কোন এক সুবিধাজনক মুহূর্তে বাড়ী থেকে টাকা সরাতে হবে। বাবা যদি পুলিশে খবর দেন এবং পুলিশ যদি জানতেও পারে যে আমি টাকা নিয়েছি তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই যে ওরা এটাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলে ধরবে তা' মনে হয় না। কারণ পুলিশের খাতায় নাম থাকলেও অসহযোগ আন্দোলন থেকে সরে আসায় আমার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে পুলিশ খুব সচেতন ছিল না। মনে আশা আছে পুলিশের কানে কথাটা উঠলেও 'বখে যাওয়া' ছেলের বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে পালানতে তারা খুব বেশি গুরুত্ব দেবে না।

দিদির সাহায্য ছাড়া টাকা পাবার কোন উপায় ছিল না। বাবার বন্ধকী কারবারের যত গচ্ছিত সোনা-রুপার জিনিষপত্র সব একটা আলমারীতে থাকত—তা'তে সাতটা তালা দেওয়া। দরকার হলে দিদি চাবি নিয়ে তালা খুলত, টাকাপয়সা গয়নাপত্র রাখত—বাবার কাজে সাহায্য করত। আর বাড়ীর খরচের টাকা কোথায় থাকে, কোন্ থলিতে কতটা টাকা থাকে তাও দিদি জানত। বাবা-মার অজ্ঞাতে একদিন আমাকে দিদি সব দেখিয়ে দিল। কিন্তু নেওয়া যাবে কি করে? তার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। দিদিই অবস্থা বুঝে একটা সময় ঠিক করে দিল।

দাদার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল তখন। সেই বিষয়ে কন্যাপক্ষের সঙ্গে চিঠিপত্রে কিছুদিন আলোচনার পর বাবা নিজেই পাকা কথা বলবার জন্য ভাবী বেয়াই বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। ব্যস্, এবার সুবর্ণ সুযোগ! পরদিন সকাল ন'টায় মা যখন স্নান করতে গেছেন, তখন দিদির ইঙ্গিতে ঝটিকাবেগে আলমারীর তালা খুলে দুটো টাকা ভর্তি থলি বার করলাম। গুণবার সময় নেই, জানতাম হাজার তিনেক আছে। চামড়ার একটা সুটকেশও দিদি দিয়েছিল। তার মধ্যে থলে দুটো ঢোকালাম,—বেশ ভারী হল সুটকেশটা। বাইরে সাইকেল প্রস্তুত—পি. সি. সরকারের স্টেজ থেকে অদৃশ্য হবার মত আমিও সাইকেল নিয়ে একেবারে হাওয়া!

পথে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন অম্বিকাদা। অম্বিকাদার হাতে ব্যাগটি তুলে দিয়ে আমি আবার সাইকেল চালালাম। কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেব আগেই জানা ছিল। সেখানে সারাদিন রইলাম। সন্ধ্যার পর ইউরোপীয়ান পল্টনে দাদা এবং প্রেমানন্দের সঙ্গে দেখা করব বাড়ীর অবস্থা জানবার জন্য।

সন্ধ্যাবেলা দাদার কাছে খবর শুনলাম। দাদা বলল, "পিসেমশাই ভীষণ চটে গেছেন। পুলিশে খবর দিতে চাইছেন। মা'র কিন্তু মত নেই; বাবাকে তার করে দিয়েছেন এক্ষুণি ফিরে আসবার জন্য। তবে তোর কথা কিছু জানান নি। মা'র কথায় আমি লেডী ডাক্তার মাসীমাকে সব জানাই। তিনি খবর পেয়েই ছুটে এসেছেন। তিনজনে এখন বড় ঘরের চারটে লোহার দরজা বন্ধ করে বসে আছেন আর কোন মোটর গাড়ির শব্দ পেলেই চমকে উঠছেন—ঐ বুঝি অনন্ত দলবল নিয়ে এল! এবার সব জোর করে নিয়ে যাবে!

"দিদি খুব মজা দেখছে। বার বার তোকে বকছে এরকম ঘৃণ্য কাজের জন্য। কেউ সন্দেহ করে নি যে আমি আর দিদি তোকে সাহায্য করেছি। দিদি আবার মাঝে মাঝে তোর সম্বন্ধে নানা কথা বলে ওঁদের আরো ভয় দেখাচ্ছে। এখন সকলে বাবার আসার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

দাদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার আমার আশ্রয়ে ফিরে গেলাম। পরদিন আমার কলকাতা রওনা হবার কথা; কিন্তু টাকা নিয়ে যাবে অন্য কেউ।

ভাটিয়ারি স্টেশনে হঠাৎ প্রেমানন্দকে দেখে আমি অবাক! চট্টগ্রাম থেকে সাত মাইল দূরে এই স্টেশন। প্রেমানন্দ খবর দিল আমার পিসেমশাই আর গণেশ এই ট্রেনেই আমাকে খুঁজতে চলেছেন।

এই ব্যাপারটি যখন ঘটে, তখন কলেজের ছুটি শুরু হয়ে গেছে—গণেশ চট্টগ্রামে এসে গেছে। আমি সুযোগ খুঁজছিলাম টাকাটা নেবার। বাবা বাড়ী ছেড়ে না গেলে চলবে না। সেজন্য বাবার ভাবী বৈবাহিক-বাড়ী যাবার সময় পর্যন্ত আমার অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে গণেশের কলেজ ছুটি হয়ে গেছে, সে চলে এসেছে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে দাদা, গণেশ, প্রেমানন্দ সকলেই এই 'টাকা চুরির' ব্যাপারটা আগে থেকেই জানে। কিন্তু যখন ঘটনাটি ঘটল তখন দাদাকে পাঠান হল মাসীমাকে খুঁজতে, প্রেমানন্দকে বলা হল শহরে আমাকে খুঁজে দেখতে, আর গণেশ চলল ট্রেনে পিসেমশাইর সঙ্গে শহরের বাইরে আমার খোঁজে!

যাই হোক প্রেমানন্দের কাছে খবর শুনে সে ট্রেনে আমার যাওয়ার প্ল্যান বাতিল করে দিলাম। পরের ট্রেনে নির্বিঘ্নে কলকাতা চলে এলাম। তালতলায় খোকা এবং গোপী যে বাড়ীতে আত্মগোপন করেছিল, সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হলাম। জুলুদা নিজের বাড়ীতে থাকলেও গোপনে আমাদের সঙ্গে তালতলার বাড়ীতে দেখা করতেন।

ছুটি শেষ হলে গণেশ কলকাতায় এল। তার কাছে সেদিনকার কাহিনী শুনলাম। গণেশ আর পিসেমশাই ট্রেনে করে চাঁদপুর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। এদিকে জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে বাবাও সে সময় ফিরে আসছিলেন। চাঁদপুর স্টেশনে দূর থেকে হঠাৎ গণেশকে দেখতে পেয়ে বাবা তাকে ডাকলেন, উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন,

"গণেশ, তুমি এখানে? চাটগাঁ থেকে আসছ? আমাদের বাড়ীর কথা কিছু জান তুমি? বলতে পার কেন ওরা এখনি বাড়ী ফিরে যাবার জন্য আমাকে টেলিগ্রাম করেছে?"

গণেশ বাবাকে আশ্বস্ত করবার জন্য জানাল যে, বাড়ীতে সকলেই সুস্থ আছে, ভাবনার কারণ নেই। তারপর তাঁকে শান্ত করে বসিয়ে আমার টাকা নিয়ে অন্তর্ধান হওয়ার কাহিনী বলল। আমার বাবা শুধু একবার বললেন, "আমি মনে করব সে মরে গেছে।" ব্যস্, তারপর নানা কথা তুললেন, আমার কথা আর একটিও নয়। যেন এক্ষুণি যা' শুনেছেন সব ভুলে গেছেন। সারা রাস্তাও একভাবেই এলেন। পিসেমশাই আর গণেশের সঙ্গে বাড়ী ফিরে এসেও বাবা কারও কাছে আমার কথা তুললেন না বা কোন প্রশ্ন করলেন না। শুধু একবার যখন আমার কথা উঠেছিল তখন সংক্ষেপে বললেন, "এ আমি আগে থেকেই জানতাম। আমার সমস্ত সম্পত্তি নন্দলালকে উইল করে দেব।"

গণেশের কাছে আরও শুনলাম, শহরে সর্বত্র সকলে জেনে গেছে এ কথা। ছোট শহর, আমাদের প্রায় সকলেই চেনে। একজনের কাছ থেকে অন্যে শুনেছে;

প্রয়োজন মত নানারকম রং চড়িয়েছে এবং ফলে উৎসাহী মহলে ডালপালায় পল্লবিত হয়ে ঘটনাটি পরিবেশিত হচ্ছে।

ছেলে বাড়ী থেকে টাকা চুরি করেছে! কি বিশ্রী! কি লজ্জা! এই পারিবারিক 'কলঙ্কে' বাবাকে যে কী দুঃসহ অপমানের জ্বালা সহ্য করতে হয়েছে তা' অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলাম। মায়ের কাতর ম্লান মুখখানি মনে পড়ল। তখন কত ছোট ছিলাম—কত না দুরন্ত ছিলাম! আজ বলতে লজ্জা করছে—তবু বলছি, সেই দিন চোখের জল মুছেছি। ভেবেছি বাবাকে গিয়ে বলি—"লোকে যাই বলুক তোমরা জেনে রাখ তোমাদের অনন্ত চোর নয়। সে তোমাদের মুখ হাসায় নি। যা করেছে তা' শুধু বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের প্রয়োজনে। পরের বাড়ী থেকে ডাকাতি করে টাকা না নিয়ে নিজের বাড়ী থেকে যৎসামান্য নিয়েছে—এই তার অপরাধ!"

কিছুদিন বাদেই শহরবাসী জানতে পারল কেন আমি টাকা নিয়েছিলাম। মা-বাবাও বুঝতে পারলেন কি উদ্দেশ্যে টাকা নিতে হয়েছিল।

সামান্য টাকা তো যোগাড় হল—এবার চাই বন্দুক-পিস্তল-রিভলভার, চাই বোমা-বারুদ-গুলী। এখানে যদি হরিদার কথা না বলি তবে আমার সমস্ত বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। হরিদা—হরিনারায়ণ চন্দ্র ছিলেন সে যুগে আমাদের বোমা-নির্মাণ শিল্পের গুরু। কি করে পিক্‌রিক্ অ্যাসিড, পিক্‌রিক্ পাউডার, গান কটন প্রভৃতি বানান যায়, কি করে সময় অনুযায়ী বোমায় আগুন ধরাবার জন্য কার্বন-ডাই-সালফাইড এবং ইয়েলো ফস্‌ফরাস দিয়ে একটি দ্রবণ তৈরি করা যায়,—পটাসিয়াম সায়ানাইড, প্রুসিক গ্যাস এবং প্রুসিক অ্যাসিড প্রভৃতি তীব্র বিষের প্রতিক্রিয়া এবং প্রাথমিক স্তরের ব্যবহার, সবই আমরা তাঁর কাছে শিখেছি। আমরা যখন নানারকম বিস্ফোরক তৈরির কাজে ব্যস্ত রয়েছি হরিদা তখন বৃটিশ সেনাবাহিনীর "এইচ, ই, ৩৬" এবং "এইচ, ই, ৫৬" মডেলের হাত-বোমার খোল তৈরি করার পরীক্ষা চালাচ্ছেন। ঢালাই লোহার বোমার খোল তৈরি করে তাতে স্প্লিণ্টার ছোটার ব্যবস্থা করলেন। ছোট ছোট চৌকো করে বোমার খোলটি কিছু পরিমাণে কাটা হল। ঢালাই করবার সময়েই তেমনি ছাঁচে ঢালাই হত। এসব তৈরি হত লোহা ঢালাই-এর কারখানায়।

অনুকূলদা ছিলেন গোপনে অস্ত্র সরবরাহের কাজে বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যমণি, আর রসায়নবিদ্ হরিদা শান্ত স্থির মস্তিষ্কে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উন্নততর বিস্ফোরক এবং বোমা তৈরির কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন। এ'দের দুজনের সাহায্য আমাদের কাছে অপরিহার্য ছিল। বিষ এবং বিস্ফোরক নির্মাণে হরিদা ছিলেন আমার শিক্ষাদাতা, গুরু এবং পথপ্রদর্শক। যখন বিপ্লবের কথা বলতেন, হরিদার মুখে কোন উত্তেজনার আভাস পাওয়া যেত না। বৃথা বাগাড়ম্বর এবং অন্তঃসারশূন্য উত্তেজক বক্তৃতা তিনি অপছন্দ করতেন। তিনি যা' বলতেন তা' কাজের কথা, এবং যা' করতেন তা' প্রত্যক্ষ কাজের সঙ্গে জড়িত। আমরা, ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখা, বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর অনুরূপ বোমা যে প্রস্তুত করেছিলাম তার প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছি হরিদার কাছে। তাঁর নম্র নিরহংকার চরিত্রে বিপ্লবের প্রতি গভীর আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যেত। নীরব কর্মী ছিলেন তিনি; কিন্তু

তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী তরুণ মনে অবিরত অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে রাখবার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল তাঁর।

হরিদার নেতৃত্বে একটি সুগঠিত বিপ্লবী দল ছিল। আশ্রয়দাতা এবং সমর্থকেরও অভাব ছিল না তাঁর। তাঁর সঙ্গে তাঁর গোপন আশ্রয়স্থলে একত্রে বাস করেছি আমরা। হরিদার দলের সঙ্গে আমরা গভীর সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলাম। বর্মাতে একটি গোপন বিপ্লবী দল গঠন করে আমাদের সাহায্যে একটা বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটাবার ইচ্ছা ছিল তাঁর। আমরাও জাপানে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে একটা সক্রিয় যোগাযোগ রাখবার জন্য বর্মায় দল গঠনের চেষ্টা করেছিলাম। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে এই প্রচেষ্টার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। হরিদার কনিষ্ঠ সহোদর গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র (বর্তমানে হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের আইনব্যবসায়ী-এডভোকেট) বিপ্লবী যুবকদের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে উৎসাহী ও কর্মঠ ছিলেন। হরিদার বোমা প্রস্তুতির কাজে এবং বর্মায় দলগঠনের প্রচেষ্টায় তাঁর দান অতুলনীয়।

কিছুদিন পরের কথা। বৃটিশ শাসনযন্ত্র তখন তার লৌহদণ্ডের পেষণে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে অংকুরে বিনষ্ট করবার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে। 'দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলার' বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে প্রমোদ চৌধুরী, অনন্তহরি মিত্র, সুখেন্দু দত্ত, বীরেন্দ্র ব্যানার্জী, অনন্ত চক্রবর্তী, ধ্রুব চ্যাটার্জী, রাখাল দে এবং অন্য দু'জনের সঙ্গে হরিদা জেলে গেলেন। ১৯২৬ সালে ২৮শে মে আলিপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলের মধ্যে গুপ্তচর বিভাগের স্পেশাল পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট রায়বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী নিহত হলেন। প্রমোদ এবং অনন্তহরিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে জেলের মধ্যে ফাঁসি দেওয়া হল। একজন রায়বাহাদুরের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য 'ন্যায় রক্ষক' বৃটিশ সরকার দু'জন যুবককে ফাঁসিমঞ্চে হত্যা করল। ধ্রুব এবং অনন্ত চক্রবর্তীর সঙ্গে হরিদাকে পাঠানো হল বর্মা জেলে আজীবন কারাবাসের দণ্ড গ্রহণ করতে।

যাই হোক, জেলে যাওয়ার পূর্বে, আমাদের প্রস্তুতি চলার সময় হরিদার দলের সঙ্গে আমরা ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। উদ্দেশ্য যাদের এক এবং কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্মপ্রেরণা যাদের এক ধারায় চলে একত্রে মিলতে তারা বাধ্য, যদি না অনাবশ্যক প্রভুত্বপ্রিয়তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আমাদের মধ্যে এরকম কোন বাধা ছিল না। তাই আমরা মিলতে পারলাম।

বাংলার গুপ্তচর বিভাগের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল, মিঃ ফেয়ারওয়েদার তাঁর গোপন রিপোর্টে এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন,

"১৯২৪ সালের অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার হইবার পর অনুশীলন এবং যুগান্তর পার্টির নেতারা অনুধাবন করিলেন যে একটি আন্দোলন চালাইবার মত শক্তি তাঁহাদের সংগঠনের নাই; কিন্তু তরুণ উত্তপ্ত মস্তিষ্ক যুবকেরা তাঁহাদের উপদেশ না শুনিয়া ১৯২৫ সালে একটি নতুন পার্টি গঠন করিল। ইহার নাম 'নিউ ভায়োলেন্স পার্টি'।'

"শোভাবাজার স্ট্রীটে তল্লাসী করিয়া ইহাদের নিম্নরূপ প্রোগ্রাম পাওয়া গিয়াছে,

(১) "ব্যক্তিগত বিক্ষোভ প্রদর্শন—উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হত্যা, রেল-গাড়ী ধ্বংস করা, সরকারী অস্ত্রশস্ত্র গোলা-বারুদ অধিকার।

(২) "সমবেত বিক্ষোভ প্রদর্শন।

(৩) "ক্ষমতা অধিকার।

(৪) "বিপ্লব।

"ইহার পর ১৯২৫ সালের শেষে দক্ষিণেশ্বরে একটি বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

"নদীয়ার অনন্তহরি মিত্র, চট্টগ্রামের সুখেন্দু দত্ত, ঢাকার বীরেন্দ্র চ্যাটার্জী, চট্টগ্রামের প্রমোদ চৌধুরী এবং অন্য সাতজন ধৃত হয়। উহারা ১৯২৬ সালে আই বি-র স্পেশাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট রায় ভূপেন্দ্র চ্যাটার্জী বাহাদুরকে হত্যা করে।

"১৯২৭ সালে যুগান্তর এবং অনুশীলন পার্টিকে একত্রিত করিবার একটি প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু ব্যক্তিগত রেষারেষির আঘাতে এই প্রস্তাবটির ভরাডুবি ঘটে।"

এই গোপন রিপোর্ট থেকে বোঝা যায় যে, অনুশীলন এবং যুগান্তর পার্টির প্রবীণ নেতাদের মিলনে নয়, তরুণ উত্তরাধিকারীদের আগ্রহেই সম্মিলিত 'নিউ ভায়োলেন্স পার্টি' গঠিত হয়েছিল। এই ইতিহাস নিয়ে পরে আলোচনা করব। ১৯২৪ সালে নাগরখানা পাহাড়ের লড়াই এবং রেলওয়ে অর্থ লুণ্ঠন মামলায় মুক্তি পাবার পর আমি, নির্মলদা এবং আমার বন্ধু প্রমোদ এই মিলনের গ্রন্থি রচনার সূত্রপাত করি—সে সব পরের ঘটনা।

হরিদার প্রসঙ্গে এত কথা উঠল। এবার আগের ঘটনায় ফিরে যাই। বাড়ী থেকে টাকা নেবার পর কলকাতায় এসে আবার তালতলার গোপন আশ্রয়ে ডেরা বাঁধলাম। কলকাতার বাইরে কোন আত্মীয়ের বাড়ী যাবার নাম করে জুলুদাও বাড়ী থেকে চলে এসে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আর আছে গোপী এবং খোকা (দেবেন দে)। তাদের নামে পুলিশের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। কাজেই তারা সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে আছে। এইখানে বসে আমি, জুলুদা, খোকা আর গোপী—চারজনে মিলে পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস্ টেগার্টকে হত্যা করবার একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করলাম।

অত্যাচারী টেগার্টকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য গোপীনাথ সাহাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন জ্যোতিষদা। গোপীনাথ প্রায়ই আমাদের বলত সে পৃথিবীতে এসেছে স্বাধীনতার শত্রু টেগার্টের হাত থেকে ভারতকে মুক্তি দিতে। বিপ্লবী জীবনে এই কাজটিকে সে নিজের জন্য নির্দিষ্ট বলে ধরে নিয়েছিল। সেইজন্য সে বহুদিন ধরেই গোপনে টেগার্টকে অনুসরণ করত। টেগার্টের বাংলোর পাশে নির্মীয়মাণ একটি বড় বাড়ী থেকে তাকে দেখত; রাইটার্স-বিল্ডিং-এর কাছে, লালবাজারে, আই. বি. এবং এস্. বি. অফিসের সম্মুখে ও কীড্ স্ট্রীটে—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সে টেগার্টের গতিবিধি লক্ষ্য করত। গাড়িতে করে টেগার্টকে অনুসরণ করত আবার টেগার্ট পায়ে হেঁটে গেলে সেও গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যেত।

তখনকার দিনে কোন বাঙালী যুবকের পক্ষে টেগার্টের খুব কাছে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তার ওপর 'আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার' রাজসাক্ষী—নিত্য-

গোপাল প্রলিশের কাছে গোপীনাথের চেহারার বর্ণনা দিয়েছিল; এমন কি ডান গালের দেড় ইঞ্চি লম্বা একটা কাটা দাগের কথাও বলেছিল। কাজেই টেগার্টের খ্ব কাছে গিয়ে তাকে লক্ষ্য করে দেখে চিনে রাখা গোপীনাথের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার ভাল করে না চিনলে পরে ভুল হবার সম্ভাবনা,—কারণ স্যুট্ পরলে প্রথম নজরে সব সাহেবকেই একরকম দেখায়। গ্লী করে হত্যা করতে হলে কাছে গিয়ে চিনে নেবার সময় থাকে না, দ্র থেকেই ব্ঝে নিশ্চিত হয়ে তবে যেতে হবে; নইলে টেগার্টের বদলে অন্য কারো মৃত্যু হতে পারে। তা'তে উদ্দেশ্যাসিদ্ধিও হবে না, উপরন্তু অনর্থক প্রাণ-হত্যা হবে।

গোপীনাথ কি করে টেগার্টের কাছে গিয়ে তা'কে লক্ষ্য করে চিনে রাখবে? তা হলে টেগার্টই তো তাকে চিনে ফেলে বিপদ ঘটাবে। কিন্তু গোপীনাথের সংকল্পের দৃঢ়তার কাছে কোন বাধাই টিকল না। প্রলিশের নজর থেকে আত্মগোপনকারী গোপীনাথ নানাবেশে সাধারণ নিরীহ নাগরিকের মত প্রলিশ কমিশনারের অতি সন্নিকটে গিয়ে তার মুখের চেহারা স্পষ্ট করে মনে ধরে রাখল।

কিন্তু আমরা অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। গোপীনাথ টেগার্টকে হত্যা করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল; কোন বাধাকেই সে আমল দিতে চাইছিল না। আমরা ভাবছিলাম টেগার্টকে চিনতে যদি ভুল হয়? বারবার গোপীকে আমরা টেগার্টের পোশাক, আকৃতি, মুখ-চোখের বর্ণনা, হাবভাব, চলার ভঙ্গী—ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করতাম। মনে আছে আমরা কেউ—গণেশ, খোকা, যশোদা বা আমি, যখন জিজ্ঞেস করতাম, "কি রে গোপী, ঠিক চিনতে পারবি তো?"—তখন ও চটে উঠত। টেগার্টকে চিনতে ভুল করবে ও—যে টেগার্ট এখন তার ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠেছে—এটা যেন গোপী বিশ্বাসই করতে পারত না। টেগার্টকে চেনা সম্বন্ধে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ছিল ওর।

আমাদের হাতে এখন মস্ত বড় কাজ—চার্লস টেগার্ট হত্যা। আমাদের তালতলার গোপন সভায় তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছে। তার জন্য চারিদিক চিন্তা করে নিখ্ত একটা পরিকল্পনা খাড়া করা হ'ল। জ্যোতিষদা গোপীনাথকে নির্দেশ দিয়েছিলেন অথবা গোপীনাথ নিজে থেকেই অগ্রণী হয়েছিল—যাই হোক্, আমরা চাইছিলাম কাজটা সফল হোক্। সেজন্য এরকম একটি প্ল্যান নেওয়া হল,

(১) শীতের সকাল। কীড্ স্ট্রীটে নিজের বাংলো থেকে বেরিয়ে প্রত্যহ চার্লস টেগার্ট চৌরঙ্গীতে হাওয়া খেতে যান।

(২) পায়ে হেঁটে যান তিনি, সঙ্গে থাকে ছোট্ট একটি টেরিয়র কুকুর।

(৩) আক্রমণের ক্ষেত্র হবে টেগার্টের বাড়ী থেকে চৌরঙ্গী পর্যন্ত কীড্ স্ট্রীটের মধ্যে কোন একটি জায়গা; বেড়াতে যাবার অথবা ফেরার সময়—যেমন আমাদের স্ববিধে হয়।

(৪) গোপীনাথ টেগার্টকে ভাল করে চেনে, এই নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বহুদিন ধরে তাকে লক্ষ্য করেছে।

(৫) গোপীনাথ টেগার্টকে গুলী করবে। তার একহাতে থাকবে একটি

রিভলভার, অন্য হাতে পিস্তল। টেগার্ট একেবারে মৃত বলে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত একাধিক গুলী চালিয়ে যাবে সে।

(৬) গোপীনাথের পিস্তল যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় আর টেগার্ট চৌরঙ্গী দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে তবে খোকা (দেবেন দে) তাকে গুলী করবে। এজন্য নির্দিষ্ট স্থানটি থেকে ৫০-৭০ গজ দূরে সে অপেক্ষা করবে।

(৭) যদি টেগার্ট পূর্বদিকে ফ্রীস্কুল স্ট্রীট দিয়ে পালাতে চায় তবে আমি তাকে গুলী করব। গোপীর আক্রমণের স্থান থেকে ৭০ গজ দূরে আমি অপেক্ষা করব।

(৮) খোকা ইউরোপীয়ান পোশাক পরবে। তার সঙ্গে থাকবে একটি রিভলভার এবং একটি বড় আকারের টাইম বোমা যা' লোশান দিয়ে সাত সেকেন্ডের মধ্যে ফাটান যায়।

(৯) আমার সঙ্গেও থাকবে একটি রিভলভার এবং অনুরূপ একটি বোমা, তবে আমি থাকব বাঙালী বেশে।

(১০) গোপীনাথের সাজ হবে মুসলমানের মত। মাথায় ফেজ টুপি, আর পুলিশের কাছে বর্ণিত মুখের কাটা দাগটি ঢাকবার জন্য একটা উলের স্কার্ফ থাকবে। তখন শীতকাল ছিল।

(১১) যদি গোপীনাথ সফল হয়, তবে আমরা কেউ নিজেদের প্রকাশ করব না। আর যদি গোপীনাথ সফল না হয় তবে যখন টেগার্ট যে কোন একদিকে দৌড়বে, তখন হয় খোকা নয়ত আমি—দুজনের একজন তাকে আক্রমণ করব—যার দিকে সে দৌড়বে।

(১২) একটা জার্মান মশার পিস্তল নিয়ে জুলুদা (এখনও তিনি বেঁচে আছেন) সাইকেল করে ঘুরে ঘুরে সব ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং দরকারমত সাহায্য করবেন আমাদের অথবা গোপীনাথকে।

এইভাবে টেগার্টের অভেদ্য জীবনচক্রে লক্ষ্যভেদ করবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হল। কোথাও কোন ছিদ্র নেই পালিয়ে যাবার।

মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করবার দায়িত্ব নিয়েছি আমরা তিনজন—গোপীনাথ, খোকা এবং আমি। সৈনিক নির্বাচনে এবার বোধ হয় কোন ভুল হয় নি। অতএব এবার টেগার্ট—তোমার নিশ্চিত মৃত্যু!

নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট বেশে, যার যার অস্ত্র নিয়ে প্রত্যেকে বিভিন্ন নির্দিষ্ট পথে রওনা হলাম। সময়মত আমার জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। গোপীনাথ আর খোকাও নিশ্চয়ই তাদের জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে এতক্ষণে।

এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিয়ে একটা ধরালাম। আমি সিগারেট খাই নি কখনো। সে যুগে কোন বিপ্লবী যুবক ধূম-পান করত না। কাজেই, আমি যে 'স্বদেশী' নই আই. বি. ও এস. বি. গোয়েন্দাদের কাছে এটা প্রমাণ করবার জন্য অভ্যস্ত ধূমপায়ীর মত সিগারেটটি টানতে লাগলাম। কারণ আমি জানি চার্লস টেগার্টের জীবনরক্ষায় সতর্ক পুলিশ-বিভাগ কীড্ স্ট্রীটে সর্বদা পুলিশ প্রহরী ও গোয়েন্দা রাখবার ব্যবস্থা করে।

আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে গোপীনাথকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু

খোকা আমার দৃষ্টির বাইরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিনিট গুণছি আর ভাবছি এই বুঝি গোপীনাথের পিস্তল গর্জন করে উঠল আমাদের চিরশত্রু টেগার্টের বুক লক্ষ্য করে। কিন্তু না, কোন শব্দই নেই।

একটু বাদেই সাইকেলের আওয়াজ। জুলুদা এসে হাজির ভগ্নদূতের মত,

"এক্ষুণি ডেরায় ফিরে যাও। খোকার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আগুন লেগে গেছে ওর গায়ে। প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে গেছে।"

মনটা একেবারে বসে গেল। কি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বুঝতে পেরেছি। বোমাতে অগ্নিসংযোগের জন্য আমরা পকেটে একটি লোশনের শিশি রেখেছিলাম। ইয়েলো ফস্ফরাস্ আর কার্বন-ডাইসালফাইডের মিশ্রণে প্রস্তুত এই লোশনটি খুব বিপজ্জনক। যদি লোশনটি বিন্দুমাত্রও শিশি থেকে বেরিয়ে পোশাকের কোন সামান্য অংশও ভিজিয়ে দেয় তবে কার্বন-ডাইসালফাইড দ্রুত উড়ে গিয়ে শুধু ফস্ফরাস্ পড়ে থাকবে। আর বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলে ফস্ফরাস্ জ্বলে ওঠে, এ কথা সকলেই জানেন।

সত্যিই তাই ঘটেছিল। কলকাতার রাজপথে খোকার পোশাকে আগুন জ্বলতে দেখে পথচারীরা প্রশ্ন করেছে,

"সাহেব, ক্যা হুয়া? আগ্ ক্যায়সে লাগা?"

খোকা তাড়াতাড়ি জবাব দিয়েছে—"মেরে সিগ্রেট্সে আগ্ লাগ্ গিয়া।"

এই ফস্ফরাসের আগুন এতই বিশ্বাসঘাতক যে জল দিয়েও চাপা দেওয়া যায় না। যতক্ষণ জায়গাটা জলে ভিজে থাকে, ততক্ষণ ভাল। যেই জলটা একটু শুকিয়ে যায় অমনি আবার জ্বলতে থাকে। যতক্ষণ না ফস্ফরাস্ নিঃশেষ হয়ে যাবে ততক্ষণ এ আগুন নিভবে না।

ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে নিয়ে খোকা তাড়াতাড়ি রাস্তায় জল দেওয়ার হাইড্রেন্ট থেকে জলের ধারা দিয়ে আগুন নেভাতে লাগল। কিন্তু এই সময় আরও একটি সাংঘাতিক বিপদের আশঙ্কা দেখা দিল। খোকার প্যান্টের পকেটে রয়েছে পিক্রিক্ পাউডার ভর্তি একটা তাজা বোমা—তাতে গান্ কটন ফিউজ লাগান। কোনমতে যদি এটা আগুনের সংস্পর্শে আসে অমনিই বোমার বিস্ফোরণ হবে। কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! ভাবতেও যেন গা শিউরে ওঠে! কি করে যে সেদিন খোকার প্রাণরক্ষা হয়েছিল কে জানে! বুদ্ধি করে ও তক্ষুণি বোমাটাকে ভিজিয়ে ফেলল—আর আগুন ধরবার আশঙ্কা রইল না।

তালতলার বাড়ীতে বসে খোকার কাছে সব কথা শুনছিলাম। জুলুদা ওর প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যস্ত। খোকা তার স্যুট খুলে বালতির জলে ডুবিয়ে দিয়েছে, তবু ভেতর থেকে ধোঁয়া উঠছে। গোপী মুখ ভার করে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। আমি সমানে খোকাকে বকে চলেছি,

"তুই সব সময় অসাবধান! রুমাল, সিগারেটের প্যাকেট, এই সবের চাপে বুক-পকেটে সোজা করে রেখে দিলি না কেন শিশিটা? তোর ভুলের জন্য সব প্ল্যানটা ভেস্তে গেল! এই গণ্ডগোলের মূল হলি তুই! কি বলে এখন কৈফিয়ৎ দিবি?......।"

আমি যখন প্রাণপণে খোকাকে বকে চলেছি, বোকামির জন্য, আনাড়ির

মত কাজের জন্য তার ওপর দোষারোপ করে চলেছি, তখন ভাগ্য-দেবতা আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলেন।

কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলাম সকলে—একটা কাপড়পোড়া গন্ধ আসছে না ? খোঁজ করতে দেখা গেল আমার রিভলভারের গুলী থাকে যে কাপড়ের থলিতে, সেটা জ্বলছে। এই থলেটার চাপে লোশনভরা হোমিও-প্যাথীর শিশিটাকে আমি বুক-পকেটে খাড়া করে রেখেছিলাম। ওটা উল্টে বা কাত হয়ে পড়বার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এইদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানলাম, শক্ত করে আঁটা ছিপিও খানিকটা লোশন শুষে নেয়। তার পর হাওয়ার সংস্পর্শে এসে তরল অংশ উবে যাওয়ায় যে সামান্য আগুনের সৃষ্টি হয় তা' থলেটাকে জ্বালিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। বুঝলাম আমাদের হিসেবের বাইরেও দুর্ঘটনা ঘটে, তার ওপর কারও কোন হাত নেই। মাত্র এইটুকুই বলা যায়– যে পরিমাণে টেক্‌নিকেলি সংগঠিত হব, সে হিসেবে দুর্ঘটনার মাত্রাও কমবে—এই যা।

বাংলা দেশের বিপ্লবীদের এই ধরনের কত চেষ্টাই না ব্যর্থ হয়েছে—স্যার চার্লস টেগার্ট তাঁর শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে অবাধে বিচরণ করেছেন বাংলার বুকে! এই পরাভবের অপমান সহ্য করতে হয়েছে বাংলার বিপ্লবীদের। আমি নিজেও এই অকৃতকার্যতার জন্য নিরন্তর লজ্জা ও অন্তরে জ্বালা অনুভব করেছি। শত্রুপ্রধান টেগার্ট জয়ী ও আমরা পরাজিত! মাত্র বছর তিনেক আগে এই পরাভবের সেই জ্বালা সামান্য একটু লাঘব হল আমার।

একদিন বোধহয় ছুটির দিন ছিল, একজন বন্ধুর সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম খুব উচ্চপদস্থ একজন প্রাক্তন পুলিশ অফিসারের বাড়ীতে। নিকট-আত্মীয়া শ্রীমতী নিরুপমা বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা) আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমার বন্ধু গিয়েছিলেন সেই অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের বাড়ীতে তাঁর গাড়িটি কেনবার জন্য। আমার বন্ধু আমাকে সঙ্গে নিলেন গাড়িটি পরীক্ষা করে তার অবস্থা সম্বন্ধে আমার অভিমত দেবার জন্য এবং গাড়িটি কেনা উচিত কিনা--এ বিষয়ে আমার মত জানতে।

বন্ধুটি আগেই সময় স্থির করে রেখেছিলেন। ঠিক সময়মত আমরা তিনজন—আমি, আমার বন্ধু ও শ্রীমতী নিরুপমা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাড়ী গিয়ে পৌঁছলাম। ভদ্রলোক, অর্থাৎ সেই পুলিশ অফিসার, গাড়ি দেখাবার জন্য তৈরি হয়েছিলেন।

আমার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর একজন ভৃত্য আমাদের তাঁর বসবার ঘরে নিয়ে বসাল। কিছুক্ষণের মধ্যে ভদ্রলোক নিচে নেমে এলেন। আমরা পরস্পরের মধ্যে নমস্কার বিনিময় করলাম। আমার বন্ধু তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন ও তাঁর গাড়ি কেনার উদ্দেশ্য জানালেন। তার পর বন্ধুটি শ্রীমতী নিরুপমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় দিয়ে আমার পরিচয় দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁকে সেই সুযোগ না দিয়ে প্রাক্তন পুলিশ অফিসার মহাশয় সটান আমার কাছে এগিয়ে এলেন। তার পর খুব একটা নাটকীয় ভঙ্গী করে আমার কাঁধে দুটি হাত রেখে নাটকীয় ভাষায় বলতে শুরু করলেন,

"আপনি নিশ্চয়ই অনন্ত সিং? ভুল আমি কখনই করি নি। বলুন ঠিক কিনা? এতদিন পরেও আমার চিনতে ভুল হয় নি নিশ্চয়ই।"

ঠিকই বটে। চিনতে তাঁর ভুল হয় নি। আমি স্বীকার করলাম যে আমিই অনন্ত সিং এবং সঙ্গে সঙ্গে বললাম,

"Retire করলেই বা, পুলিশের চোখ। ভুল তো হবার নয়।"

—"বলুন তো আপনার সঙ্গে আমার শেষ দেখা কখন হয়? মনে আছে কি?"

আমিই বা পুলিশের কাছে হারব কেন? আমারও বা তাঁকে চিনতে ও সর্বশেষ দেখা কখন হয়েছিল তা' বলতে ভুল হবে কেন? আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম যে, তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় ১৯৩৪ সালে—আন্দামান জেলে।

আমার বন্ধু ও নিরুদি (শ্রীমতী নিরুপমা), আমাদের এই আকস্মিক সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বেশ মন দিয়ে শুনছিলেন। একজন বৃটিশ সরকারের প্রাক্তন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী ও আর একজন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চিরশত্রু অনন্ত সিং! কি অপূর্ব সাক্ষাৎ! গাড়ি কেনা-বেচার কথাটা যেন চাপাই পড়ে গেল। চা প্রভৃতি এল। প্রাক্তন পুলিশ কর্মচারী মহাশয় বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর কর্মজীবনের নানা কাহিনী বলে আমার সঙ্গীদের আরও বিস্ময় ও কৌতূহল সৃষ্টি করলেন। তার পর বলতে বলতে একটি ঘটনা সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন। বললেন,

"একটি কথা আজ আপনাদের কাছেই বলছি। বেঁচে থাকব কিনা জানিনা, আর হয়ত বলাও হবে না। কথাটি হচ্ছে আপনাদের বন্ধু অনন্ত সিং সম্বন্ধে। তাঁরা তো চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করলেন। তার পর ফেণী স্টেশনে সশস্ত্র সংঘর্ষের পর আত্মগোপন করে কলকাতায় এলেন। কিছুদিনের মধ্যে খবর এল অনন্তবাবুর একটি আস্তানা সম্বন্ধে। রাত্রি নয়টা কি দশটা হবে, স্বয়ং টেগার্ট সাহেব হঠাৎ আমাদের বিশেষ কয়েকজনকে তলব করলেন অসময়ে। ছুটে গেলাম তাঁর কাছে।

টেগার্ট সাহেব ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহের ও তার সংলগ্ন চার পাশের একটি নক্সা আমাদের সামনে রেখে বললেন,

"এই উপাসনা গৃহের কোন একস্থানে অনন্ত সিং আশ্রয় নিয়েছে। তাকে তোমাদের ধরতেই হবে—যে কোন উপায়ে—Dead or alive (মৃত অথবা জীবিত)।"

এটা ছিল তাদের political agent এর খবর। কাজেই টেগার্ট সাহেব সাদা পোষাক পরিহিত গোয়েন্দা পুলিশ পাঠিয়েছিলেন। সুনিশ্চিত খবর পেয়েও টেগার্ট সাহেব আমাকে ধরবার জন্য সাদা পোষাকে পুলিশ মোতায়েন করলেন কেন? খাকী পোষাকে রাইফেলধারী সেপাইদের পাঠিয়ে সোজাসুজি বাড়ী তল্লাসী করে আমাকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দিলেন না কেন? অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে কোন এজেন্ট নিশ্চয়ই গোপনে খবর দিয়েছে এবং সোজাসুজি আমাকে ধরতে গেলে সেই এজেন্টের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। তাই টেগার্ট সাহেব সাদা পোষাকে আই. বি. পুলিশ পাঠালেন যেন তারা সজাগ প্রহরায় থাকে এবং ভাণ করে যে হঠাৎ যেন রাস্তায় দেখতে পেয়েই আমাকে ধরে ফেলেছে।

আমাকে মৃত অথবা জীবিত ধরার গল্প বলেই প্রাক্তন পুলিশ অফিসার মহাশয় আমার বন্ধু ও তাঁর আত্মীয়কে সম্বোধন করে বললেন—"জিজ্ঞাসা করে দেখুন সত্যি তিনি সেই ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-গৃহে একটি রাত কাটিয়েছিলেন কিনা? আরও জিজ্ঞাসা করুন তাঁদের দলের সুকুমার বিশ্বাস ও তিনি উপাসনা গৃহে পাশাপাশি দু'টি বেঞ্চে সেই রাত্রে ঘুমিয়েছিলেন কিনা? তাঁর আরও স্বীকার করতে হবে—তিনি সুকুমার বিশ্বাসের ধুতির অংশ খুব সযত্নে সারা রাত আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন কিনা? আপনাদের বন্ধু অনন্ত সিং বড় সাবধানী। কাউকে বিশ্বাস করতেন না। তিনি নিজে ধরা না দিলে আমাদের যে কত বেগ পেতে হত কে জানে!"

এত সব বিস্তারিত বিবরণ তিনি দিলেন কি করে? পুলিশ তো আর খড়ি পেতে গুণতে জানে না? তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের দলের কেউ পুলিশকে খবর দিয়েছে।

সেদিন আমার বড়ই আনন্দ হল এই ভেবে যে, আমি আমার বহুদিনের বিভিন্ন সন্দেহের কারণগুলির সমর্থন পেলাম তাঁর মুখে সেই সব তথ্য জানতে পেরে।

তিনি আমার বন্ধু ও নিরুদির কাছে গল্পটা শেষ করলেন। যখন স্যার চার্লস টেগার্ট নক্সা দেখিয়ে তাঁকে যে-কোন উপায়ে আমাকে ধরবার আদেশ দিলেন তখন তিনি টেগার্ট সাহেবকে প্রশ্ন করলেন,

"অনন্ত সিং তো fire open করতে পারে।"

টেগার্ট—"তোমরা তাকে fire open করতে দেবে কেন? তার আগেই তোমরা fire করবে।"

প্রাক্তন অফিসার—"যদি তারপর দেখি অনন্ত সিংহের কাছে কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই!"

তিনি আমার সঙ্গীদের বুঝিয়ে বললেন যে, পুলিশ অফিসারও আইনতঃ যখন তখন কাউকে গুলী করতে পারে না। আত্মরক্ষার জন্য তাঁরা গুলী করতে পারেন। তাঁর মনে প্রশ্ন উঠেছিল যদি আমাকে তাঁরা গুলী করে মেরেই ফেলেন এবং সেই অবস্থায় যদি দেখা যায় যে অনন্ত সিং নিরস্ত্র তবে যে তাঁদের নিজে-দের পক্ষে বিপদ! তাই টেগার্ট সাহেবকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—'যদি অনন্ত সিং নিরস্ত্র হয়?

উত্তরে টেগার্ট বলেছিলেন—"In that case you are to find out one". (সেই ক্ষেত্রে তোমাদের একটি অস্ত্র গুঁজে দিতে হবে)। অর্থাৎ পুলিশ আমার মৃতদেহের কোন স্থানে সযত্নে একটি রিভলভার বা পিস্তল গুঁজে দেবে এবং জগৎকে জানাবে—'অনন্ত সিংহের গুলী হতে আত্মরক্ষার জন্য তাকে গুলী করে মারতে হয়েছে!'

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ—স্যার চার্লস টেগার্টের এই ছিল বিশেষ রূপ। সেইদিন এই তথ্যটা শুনতে পেয়ে আমার মনে খুব আনন্দ হয়েছিল। টেগার্ট সাহেব তুমি বেঁচে গিয়েছিলে আমাদের তালতলার বাড়ীর সেই প্ল্যান থেকে! এতদিন তাই বড় দুঃখ ছিল—অপমানের বিষে জ্বলছিলাম! তুমি টেগার্ট সাহেব খুব নিশ্চিত স্থানে আমাকে পেয়েও—'মৃত কিংবা জীবিত', ধরতে পার নি! প্রাক্তন অফিসার বললেন সারা রাত তাঁরা সেই প্রার্থনা-গৃহ ও

পার্কটি ঘিরে বসে রইলেন—কিন্তু কি করে যে তাঁদের চোখে ধূলা দিয়ে আমি উধাও হলাম তা' তাঁরা আজও জানেন না।

এই ঘটনাটির বর্ণনা শেষ করবার পর এখন আমার মনে হচ্ছে এ যেন দুর্বল ও অক্ষমের আক্ষেপ! অক্ষমতার অপমানকে লাঘব করবার জন্য এ যেন একটি দুর্বল প্রয়াস! চার্লস টেগার্ট বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিজয় নিশান বহন করে ইংলণ্ডে ফিরে গেছে। সেদিন সে আমাকে ধরতে সক্ষম হয় নি, কিন্তু আমরাও বার বার চেষ্টা করে তাকে নিরীহ ভারতবাসীর ওপর অন্যায় অত্যাচারের শাস্তি দিতে গিয়ে বিফল হয়েছি। এখানেই সে জয়ী এবং আমরা পরাজিত।

এইভাবে আমাদের তালতলার বাড়ীতে টেগার্ট সাহেবের নিধন যজ্ঞের সমাপ্তি হল। সেই রাত্রে মিটিং বসল—অংশগ্রহণ করলাম, জুলুদা, গোপীনাথ, খোকা ও আমি। সকলেই গম্ভীর, এখন পরবর্তী প্ল্যান ঠিক করতে হবে টেগার্টকে পৃথিবী থেকে সরাবার জন্য। আশা করছি জুলুদা তাই বলবেন। জুলুদা বললেন,

"দেখ্, আমার মনে হয় শ্রীঅরবিন্দ এবং জ্যোতিষদা তাঁদের অন্তদৃষ্টি দিয়ে দেখছেন যে, মাত্র একজন লোককে মারবার জন্য আমরা এমন একটা বিরাট আয়োজন করেছি যেন 'ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ' আক্রমণ করতে চলেছি। এটা আমাদের ভীরুতার পরিচয় বলে আমার মনে হচ্ছে। হয়ত আমাদের অবচেতন মনে এই ভীরুতা আছে বলেই ভগবান আমাদের এই শাস্তি দিলেন। আমার মতে টেগার্টকে মারবার জন্য একজন লোকই যথেষ্ট। গোপী একাই এ কাজ করতে পারে। যদি আরো সাহায্যের দরকার হয় তবে আমি আছি। যাতে কাজটি একেবারে শেষ ধাপ পর্যন্ত সফল হয় তার জন্য আমি ওর সঙ্গে থাকব। কাজেই আমি প্রস্তাব করছি বাংলাদেশ থেকে চার্লস টেগার্টকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য আমি এবং গোপী কলকাতায় থাকি; কয়েকটা অস্ত্র ও বোমা নিয়ে তোমরা (অনন্ত আর খোকা) চট্টগ্রামে চলে যাও। সেখানে মাস্টারদার নির্দেশ অনুসারে তোমরা কাজ কর।

"আমাদের সংগঠনের জন্য এখন চাই প্রচুর অর্থ। অর্থের ব্যবস্থা না হলে সশস্ত্র আক্রমণের আয়োজন করতেই পারব না। দেড় বছর আগে অনন্ত সেই রেলওয়ের টাকার খবর এনেছিল, সে টাকা ছিনিয়ে নেবার জন্য প্ল্যানও করে ফেলেছিল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই টাকা পাবার চেষ্টা করা যাক্। মাস্টারদার সঙ্গে পরামর্শ করে, তাঁর নির্দেশ নিয়ে, যেমন করে হোক্ এই টাকা আনতেই হবে—এই আমার মত।"

মন দিয়ে শুনলাম জুলুদার কথা। জুলুদার কথায় আমাদের পুরুষত্বের প্রতি কটাক্ষ ছিল। সেটাই আমাদের মনকে দুর্বল করে দিল। আমরা জোর গলায় বলতে পারলাম না যে, চার্লস টেগার্টের মত ধূর্ত দুর্ধর্ষ শাসক প্রতিনিধিকে হত্যা করবার চক্রান্তে আমরা যতটা শক্তি সন্নিবেশ করতে চেয়েছিলাম তা' কোনমতেই প্রয়োজনাতিরিক্ত বলে মনে হওয়া উচিত নয়। একথা তখন বলতে গেলে জুলুদার কাছে এবং হয়ত বন্ধুদের কাছেও আমাদের ভীরুতার পরিচয় দেওয়া হ'ত। বিশেষতঃ জ্যোতিষদা এবং শ্রীঅরবিন্দের নাম উল্লেখ করায় আমরা সত্যি সত্যিই

তাঁদের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হবার আশঙ্কায় নীরবে জুলুদার প্রতি সমর্থন জানালাম। অর্থাৎ, এক-কথায় আমরা সকলেই জুলুদার প্রস্তাব মেনে নিলাম।

জুলুদার দোষ দিচ্ছি না। দৈবশক্তির প্রতি আস্থা তখনকার দিনে বিপ্লবী দলগুলিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করত। বিপ্লবী দাদারা একটা রহস্যের আবরণে নিজেদের ঢেকে রাখতেন; তার ফলেই অনুগামীরা দৈবশক্তি, অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিত প্রভৃতি থাকায় বিশ্বাস করত। ১৯২২—২৪ সালে আমাদের দলও এই আবহাওয়া থেকে মুক্তি পায় নি।

৩

অর্থ সংগ্রহ : বিনা রক্তপাতে
রেল কোম্পানীর টাকা হস্তগত

"কি ক্ষমতা আছে আমার নেতা হবার? কি অধিকার আছে? যে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী তাকে স্বেচ্ছায় রাজ্যপাট ছেড়ে দিয়ে যাবো। বিপ্লবের স্বার্থ, সমষ্টির স্বার্থ, দলের স্বার্থ সকলের ওপরে। ব্যক্তির সেখানে স্থান নেই। স্থান নেই আত্মশ্লাঘার—স্বার্থপরতার।"

সূর্য্য সেন (মাস্টার দা)

জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরীহ ভারতবাসীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের পটভূমিতে চট্টগ্রামের প্রাথমিক বিপ্লবী প্রস্তুতির কাজ অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রসর হয়। তারপর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ১৯২১-২২ সালে বৃটিশ নিষ্পেষণে জর্জরিত হয়ে হিংসার রূপ পরিগ্রহ করতে বাধ্য হল। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে আমোদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনের পর অবাধে ব্যাপক ধরপাকড়, লাঠি চার্জ ও গুলী চলল। বোম্বাই-এর জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল—দেখা গেল জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত হিংসাত্মক প্রতি-আক্রমণের তীব্র অভিব্যক্তি। গান্ধীজী ভাবতে লাগলেন Mass Civil Disobedience (জনতার অসহযোগ আন্দোলন) ভয়াবহ আকার নেবে—তাকে হয়ত অহিংসার লৌহকপাটে বেঁধে রাখা যাবে না। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী গান্ধীজীর বিভিন্ন উক্তির মাধ্যমে তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন—তাই বড়লাট ভারত-সচিবকে এই মর্মে তার পাঠালেন—"Gandhi has been deeply impressed by the rioting at Bombay—the rioting had brought home to him the danger of Mass Civil Disobedience."

তারপর ১৯২২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী গোরক্ষপুর জেলার চৌরীচৌরার নিপীড়িত ক্রুদ্ধ জনসাধারণ থানা আক্রমণ করে বৃটিশ সরকারের বেতনভুক্ ২১জন পুলিশকে হত্যা করল। অহিংস নীতির স্রষ্টা গান্ধীজী ব্যথিত হলেন—চিন্তিত হলেন। অবশেষে বৃটিশের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসহযোগ আন্দোলনও তিনি আর যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন না। আইন অমান্য বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন ও গঠনমূলক কার্যের বরদোলী প্রস্তাব অনুসরণ করতে দেশবাসীকে অনুরোধ জানালেন।

গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের এইরূপ শোচনীয় পরিণতিতে তখনকার বাঙলার, তথা ভারতের বিপ্লবী যুব-সমাজ অধীর—অস্থির হয়ে উঠল। সেই সময়ে আমাদের দ্বিতীয় পর্বের আরম্ভ।

অস্ত্র ক্রয়ের জন্য বে-আইনীভাবে অর্থ সংগ্রহ করতে প্রথম সক্রিয় পদক্ষেপ হল গ্রামের মহাজন সরসীবাবুর বাড়ীতে ডাকাতি করা। ঐ সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু ঘটনাবলীর সমাপ্তি হল আমাদের গোপন আস্তানা তালতলার বাড়ীতে। টেগার্ট সাহেবের নিধন পর্বের একটি অধ্যায়ও আমাদের অক্ষমতায় রচিত হল এই তালতলার বাড়ীতেই।

নূতন প্রোগ্রাম নেওয়া হল। তৃতীয় অধ্যায় রচনা করতে চট্টগ্রামের বিদ্রোহী বিপ্লবী যুবকদল এগিয়ে চলল। জাতীয় অসহযোগ আন্দোলনের স্তিমিত অবস্থায় বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখাই তাদের লক্ষ্য।

জুলুদা এর পর যে কর্মসূচী বেঁধে দিলেন তা' আমরা সবাই সমর্থন করলাম। একটা বড় ট্রাঙ্কে দেওয়া হল নানারকমের রাসায়নিক দ্রব্য, বিস্ফোরক, গুলী, বারুদ, একটা ব্রীচলোডার বন্দুক এবং আরও অন্যান্য জিনিস।

হোল্ড-অল-এ বিছানার সঙ্গে বাঁধা রইলো বৃটিশ সৈন্যবাহিনী থেকে সরিয়ে ফেলা একটি আর্মি রাইফেল। এই দুটো মাল নিয়ে আমি আর খোকা ইওরোপীয়ান পোশাকে সেকেণ্ড-ক্লাস টিকিট কেটে কলকাতা থেকে চট্টগ্রামের পথে যাত্রা করলাম। আমাদের দু'জনের পোশাকের মধ্যে রইলো গুলী-ভর্তি রিভলভার এবং যথেষ্ট পরিমাণ কার্তুজ। খোকার কাছে ·৩৮০ বোরের ওয়েব্‌লী প্যাটার্ন রিভলভার, আমার কাছে ·৩৮ বোরের কোল্ট রিভলভার।

গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত স্টীমার-পথে যাত্রাটি আমাদের বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। সেকেণ্ড-ক্লাস কেবিনে আমাদের সহযাত্রী ছিলেন একজন ভারতীয় পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর। ইউনিফর্ম-পরা অবস্থায় দু'জন আর্দালী সঙ্গে নিয়ে চলেছিলেন তিনি। খুব আলাপ জমিয়ে নিলাম তাঁর সঙ্গে--একসঙ্গে লাঞ্চ খেলাম, ডিনার খেলাম। বেচারী ইন্‌স্পেক্টর সাহেব ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করলেন না যে, তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার আসল উদ্দেশ্য পুলিশ এবং আবগারী বিভাগের শ্যেন-চক্ষু থেকে অব্যাহতি পাওয়া। ভদ্রলোক নানাধরনের গল্প করলেন, বেশির ভাগই তাঁর কর্ম-জীবনের। তাঁর সঙ্গে গল্প করে আমরা প্রথম এই মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম যে, কেবলমাত্র সন্দেহের বশে পুলিশ কখনো কোন গুপ্ত-চক্রান্তের বিষয় পূর্বাহ্ণে জানতে পারে না বা চক্রান্তকারী নেতাদের বন্দী করতে পারে না যদি না ভেতর থেকে দলের কোন লোক বিশ্বাসঘাতকতা করে। পুলিশরা দৈবজ্ঞ নয়, মনোবিজ্ঞানীও নয় যে, কে কোথায় বিপ্লবের জন্য তৈরি হচ্ছে তা জেনে ফেলবে! এই জ্ঞান আমার পরবর্তী জীবনের প্রতিটি কাজে সাহায্য করেছে। পুলিশ সাহেবকে ধন্যবাদ!

পরদিন সকাল সাতটা নাগাদ চট্টগ্রাম স্টেশনে পেঁছলাম আমাদের মূল্যবান মালপত্র নিয়ে। সতর্কতার সঙ্গে স্টেশনে নামলাম। রিভলভারগুলি এমনভাবে রেখেছি যেন হঠাৎ দরকার হলে কাজে লাগাতে পারি। কি জানি যদি ট্রাঙ্ক, বেডিং তল্লাস করে, অথবা আমাদেরই সার্চ করে দেখতে চায়!

যাই হোক কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে নির্বিঘ্নে স্টেশনের বাইরে এলাম। ইওরোপীয়ান পোশাক, মুখে সিগারেট, চলার গর্বিত ভঙ্গী এবং নির্লিপ্ত ভাব আমাদের সাহায্য করল। একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে রওনা হলাম দু'জনে।

প্রথমে গেলাম সতীদার ওখানে। বাড়ী থেকে যেভাবে চলে এসেছি তা'তে সেখানে ফিরে যাবার আর পথ নেই। দু' ছাড়া সঙ্গে অত বড় ট্রাঙ্ক, বেডিং। কাজেই একটা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সতীদার কাছে যেতে হল।

এখানে সতীদার একটু পরিচয় প্রয়োজন। সতীদা,—সতীভুষণ সেন এবং তাঁর কয়েক বছরের বড় এক ভাই (সহোদর নন) একসাথে 'ন্যাশনাল স্কুল' সংলগ্ন দু'টি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন। ওঁরা বরাবর চট্টগ্রামে ছিলেন না। অসহযোগ আন্দোলনের পর ঢাকা থেকে এসে আর কোথাও সুবিধেমত থাকবার জায়গা না পেয়ে এখানে 'ন্যাশনাল স্কুল' বাড়ীটার একাংশ ভাড়া নিয়েছিলেন। ন্যাশনাল স্কুলের মালিক এবং প্রধান শিক্ষক, স্বর্গতঃ হরিশ্চন্দ্র দত্ত, আমাদের বন্ধু প্রেমানন্দ দত্তর পিতা। তিনি নিজে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই স্কুলেই শিক্ষকতা করতেন মাস্টারদা। আন্দোলনের সময় তাঁর নেতৃত্বে ছাত্রদল ধর্মঘটে যোগ দেয়। এই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের মালিক,

শিক্ষক, ছাত্র—প্রত্যেকেই এসে দাঁড়ান আন্দোলনের পুরোভাগে। চট্টগ্রাম স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহ্য বহন করে এই বিদ্যালয়টি পরে তাঁতশিল্প শিক্ষাকেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে; কারণ বিশ্ববিদ্যালয় তার এই অবাধ্য সন্তানটিকে ক্ষমা করে আবার ক্রোড়ে স্থান দিতে সম্মত হয় নি।

এই ন্যাশনাল স্কুল বাড়ীটির একপাশে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন দুই তরুণ রসায়নবিদ্—সতীদা এবং তাঁর দাদা। দিনের পর দিন জীবনধারণের জন্য কি কঠোর সংগ্রাম করে গেছেন এঁরা—নিজের চোখে দেখেছি। অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন সতীদা, কখনো কোন অন্যায় বা অসংগত আচরণ দেখি নি। ঘরে বসে প্রাইমাস স্টোভের আগুনে দুজনে মিলে দেশী সাবান তৈরি করবার ফরমুলা আবিষ্কার করেছেন। তারপর ছোট কড়াইয়ে সাবান বানিয়ে সাইকেলে করে দোকানে দোকানে ঘুরে তাই বিক্রী করে বেড়িয়েছেন।

ন্যাশনাল স্কুলের খোলা চত্বরে এবং হলে আমরা ব্যায়াম, কুস্তি, যুযুৎসু ইত্যাদি অভ্যাস করতাম। সতীদা এবং তাঁর দাদাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। সতীদার উন্নত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আমাকে সহজেই আকর্ষণ করেছিল। আমার বিপ্লবী-জীবনের সঙ্গে সতীদা নানাভাবে জড়িত ছিলেন, আর গুণ্ডা-দমনের কাজে তিনি ছিলেন আমার সঙ্গী।

প্রায় এক বছর পর চট্টগ্রামে ফিরছি। চট্টগ্রামে আমার পরিচয় কি? কয়েকজন মাত্র বিপ্লবী বন্ধু ভিন্ন সকলে জানে আমি একেবারে 'বখে' গেছি। ছোটবেলায় স্কুলের পড়া ছেড়ে দিয়ে হুজুগে মেতেছি। আবার যেই অসহ-যোগ আন্দোলনের জন্য ধরপাকড় শুরু হল অমনি সরে এসেছি। তার ওপর কয়েকমাস আগে আবার বাবার বাক্স থেকে টাকা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে কলকাতায় গিয়েছি। এমন অবস্থায় আত্মীয় বন্ধু শুভাকাঙ্ক্ষী যে যেখানে আছে সকলেই আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেবে, কেউ আশ্রয় দেবে না। তবে যাব কোথায়? সতীদার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের জন্য শহরে সবাই তাঁকে সমীহ ও শ্রদ্ধা করে। সতীদার আশ্রয়ে থাকতে পারলে আমার পক্ষে সুবিধে হবে। আগে থেকে কোন খবর না দিয়ে খোকাকে নিয়ে বাক্স-পেঁটরা সমেত সোজা সতীদার আস্তানায় গিয়ে পৌঁছতে সতীদা তো অবাক। যাই হোক, তিনি সানন্দে অভ্যর্থনা করলেন আমাদের। আমরাও সুবিধেমত থাকার ব্যবস্থা পেয়ে নিশ্চিন্ত। সতীদার মত সচ্চরিত্র দেশ-হিতৈষী ব্যক্তি আমাকে আশ্রয় দেওয়ায় এবং আমার কাজের সমর্থন করায় শহরে আমার সম্বন্ধে যে নিন্দা রটেছিল তার খানিকটা প্রশমিত হল।

জিনিসপত্র সতীদার ওখানে রেখে মাস্টারদা এবং নির্মলদার সঙ্গে দেখা করবার জন্য রওনা হলাম। বোধ হয় দুঘণ্টাও হয় নি এসেছি, এর মধ্যে শহরে রটে গেছে আমার ফিরে আসবার সংবাদ। পথে একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে ডেকে বললেন যে বাবা নাকি খুব বিরক্ত হয়েছেন আমি ফিরে এসেছি শুনে। বলেছেন, "ও আবার চট্টগ্রামে এল কেন? বলেছিল তো আমেরিকায় যাবে। সেখানে গেলেই তো ভাল হ'ত। সেদেশে গিয়ে ভাগ্যপরীক্ষা করতো! আবার পোড়ামুখ দেখাতে শহরে এসেছে কেন? যদি জীবনে উন্নতি করে সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারে তবেই তার

এই কলঙ্ক ঘুচবে। আমাদের মাথা আরো হেঁট করবার জন্য ও আবার এখানে এসেছে; এর চেয়ে ওর মরে যাওয়াই ভাল ছিল।”

আমি চাইছিলাম না আমার ফিরে আসার খবর শহরের লোকে জানুক। কিন্তু আসতে না আসতেই বাবা টের পেয়ে গেছেন। স্টেশন থেকে আসবার পথে আমাদের বাড়ীর ঝাড়ুদার আমাকে দেখেছে; সেই গিয়ে বাড়ীতে খবর দিয়েছে।

মাস্টারদা এবং নির্মলদার সঙ্গে দেখা করে কলকাতায় আমাদের এই কয়মাসের কাজকর্মের বিবরণ জানালাম। খোকাকে ওঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। তার পর জুলুদার নির্দেশমত চট্টগ্রামে এসে আমাদের ভবিষ্যৎ কাজ সম্বন্ধে কি স্থির করেছি তা' বল্লাম। অল্পক্ষণ আলোচনার পর অস্ত্রশস্ত্র-গুলি নিরাপদে রাখবার জন্য নির্মলদার সঙ্গে ব্যবস্থা করা হ'ল।

খোকা আর আমি সতীদার বাড়ীতে দুপুরে খেলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর বেরুতে যাব এমন সময় আমাদের পাশের বাড়ীর দু'জন মুসলমান বৃদ্ধা মহিলা এসে হাজির। আমি ওঁদের 'দাদী' বলে ডাকতাম। ওঁরা এসে আমাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যাতে একবার মায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা করি—আমি চলে যাবার পর থেকে মা'র শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। ওঁরা বলতে লাগলেন,

“দাদা, তোঁয়ার মারে তুঁই মারি ফেলাইঅ! একবারে কেঁওন হোই গেইয়ে। চিনন্ ন যায়। হারা রাইত দিন হুতি পড়ি আছে। কেওল কান্দে আর কান্দে। ভাইরে ভাই তুঁই চল। তোঁয়ার মারে একবার চাই আইবা। তোঁয়ারে দেইলে তোঁয়ার মা বর্ খুশী হইব। আঁরা তোঁয়ারে লই জাওনের লাই আসিয্য জে। চল ভাই চল!......” (দাদা তোমার মাকে তুমি একেবারে মেরে ফেলেছ। একেবারে কেমন হয়ে গেছেন। চেনা যায় না। সারা দিনরাত শুয়েই আছেন। কেবল কাঁদেন আর কাঁদেন। ভাই—তুমি ভাই এসো, তোমার মাকে একবার দেখে আসবে। তোমার দেখা পেলে তোমার মা অত্যন্ত খুশি হবেন। আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। চল ভাই চল)।

মায়ের কথা বলবার সময় এই দুইজন ভিন্নধর্মী বৃদ্ধা দরদীর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। ওঁদের কাতর অনুরোধ ঠেলবার সাধ্য আমার নেই। বিশেষ করে মায়ের কথা মনে পড়ে আমারও অশ্রুসংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। এই দুরন্ত অবাধ্য সন্তানের জন্য মাকে আজ কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হচ্ছে। কিন্তু মা, আমি আজ নিরুপায়, আমাকে ক্ষমা কর! দেশের প্রয়োজনে আজ আমি আত্মসমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আরো কিছুদিন তোমার এই সন্তানকে গর্ভে ধারণের লজ্জায় অপরের কাছে মাথা হেঁট করে থাকতে হবে। আরো কিছুদিন অপমানের জ্বালা সহ্য করতে হবে।

মায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য মন অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এখনি একটা জরুরী কাজে বেরোচ্ছি এখন যাবার উপায় নেই। আমার দুই “দাদী”, নুরার মা আর আজিজের মাকে, এই বলে আশ্বস্ত করলাম যে আমি পরশুদিন নিশ্চয়ই মায়ের সঙ্গে দেখা করব। ওঁরাও 'আমি যেন কথার খেলাপ না করি' এ কথা বারবার বলে বিদায় নিলেন।

সেই রাত্রেই সাড়ে সাতটা নাগাদ সতীদার বাড়ী থেকে বেরোচ্ছি, এমন

সময় আমাদের একজন প্রতিবেশী, কানু উপাধ্যায় এসে আমাকে ধরলেন—মা ভীষণ কান্নাকাটি করছেন, এখনি তাঁর সঙ্গে যেতে হবে বাড়ীতে। কিছুতেই তাঁর হাত থেকে ছাড়া পাই না। অগত্যা তাঁকে নিরস্ত করবার জন্য বললাম,

"দেখুন, আমি পাশপোর্ট পেয়ে গেছি। শীগ্‌গিরই আমেরিকা রওনা হব। চট্টগ্রামে আসার একমাত্র কারণ মায়ের সঙ্গে দেখা করা, মায়ের আশীর্বাদ নেওয়া। কিন্তু আজ কাল দু'দিন পাশপোর্ট ইত্যাদির জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত থাকব। মাকে গিয়ে বলবেন পরশু আমি নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করব। আমাকে মাপ করুন,—এখনি একটা জরুরী কাজে যেতে হবে।"

সে রাত্রি এবং পরদিন সত্যিই আমরা খুব ব্যস্ত রইলাম,—দেশ ছাড়ার জন্য পাশপোর্ট ইত্যাদির কাজে নয়, দেশের মধ্যে বসে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শত্রুদের মারবার জন্য কিছু অস্ত্রশস্ত্র রাখবার ও বানাবার পক্ষে উপযুক্ত একটি আশ্রয়ের খোঁজে। অর্থাৎ একটি সুবিধেমত ভাড়াটে বাড়ী পাই কি না যেখানে অস্ত্রগুলি নিয়ে আমরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারি। অবশ্য এটা খুব নিরাপদ ব্যবস্থা নয়। কিন্তু এ ছাড়া সেই যুগে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আর উপায়ই বা কি? আমরা বয়সে তখন বালকমাত্র। শহরের মধ্যে এতটা খ্যাতি অর্জন করি নি বা সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করি নি' যাতে কোন পরিচিত পরিবারে সশস্ত্র বিপ্লবী কাজের প্রস্তুতির জন্য আশ্রয় পাব। কাজেই বাড়ী ভাড়া করা ছাড়া গতি কি? তবে একটা সুবিধে ছিল, চট্টগ্রাম জেলায় তখন পর্যন্ত তেমন কিছু প্রত্যক্ষ বিপ্লবী কাজ পুলিশের কাছে প্রকাশিত না হওয়ায় পুলিশ-বিভাগ বিপ্লবী-দল সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিল না। জেলার গুপ্তচর বিভাগও তেমন সুগঠিত হয় নি।

অবশেষে "সুবিধেমত" একটা বাড়ী পাওয়া গেল। শহরের কেন্দ্র থেকে প্রায় ৫।৬ মাইল উত্তরে শহরতলীতে "বাহাদ্দার হাট" নামে একটি বাজারের কাছে একটি পাকা বাড়ী—বাড়ীটির নাম "সুলুক বাহার"।

মুসলমান এলাকা ওটা। একটিও হিন্দু পরিবার নেই ধারে-কাছে। 'পোড়ো বাড়ী'তে ভূতের আড্ডা! সুতরাং অনেক দিন থেকে পরিত্যক্ত হয়ে আছে। বিরাট কম্পাউণ্ড পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পুরনো পাঁচিল—জায়গায় জায়গায় ফাটল, ফাটলের মধ্য দিয়ে বড় বড় গাছ উঠেছে। কোথাও বা পাঁচিল একেবারে ধ্বসে পড়ে সোজা পথ করে দিয়েছে। কম্পাউণ্ডের ভেতর একটা পুকুর—পচা পানা আর পাঁকে ভর্তি। কতদিন ধরে যে অব্যবহৃত পড়ে আছে কে জানে! বাড়ীটি দোতলা হলেও দোতলার ছাদে করোগেটেড্ টিন। দোতলায় বেশ বড় মাত্র একখানি ঘর।

এখানে এই মুসলমান পল্লীতে এক ভূতুড়ে বাড়ীতে 'আড্ডা' গাড়লো কয়েকজন হিন্দু যুবক—পরিবারে কোন মহিলা নেই। এতেও যদি পুলিশের সন্দেহ না হয় তবে পুলিশ-বিভাগের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ জাগে। আমরা তখন এসব নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাই নি; অতটা সচেতন ছিলাম না তখন। কিন্তু কী আশ্চর্য, পুলিশও কি ঘুমিয়েছিল? নইলে আমরা তিন-চার মাস ঐ বাড়ীটাতে রইলাম, কারও কোন সন্দেহই হল না? তাই মনে হয় সেই সময়ে চট্টগ্রাম জেলায় গুপ্তচর-বিভাগ সক্রিয় হয়ে ওঠে নি।

'সুলুক বাহার' বাড়ীটা হল আমাদের হেড কোয়ার্টার। বিপ্লবী দলে

যোগদানের ফলে নিজ বাড়ীতে থাকা যাদের পক্ষে অসুবিধে হচ্ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ীর ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিলাম। এই বাড়ীটি সেই প্রয়োজন মেটাল। এখানে স্থায়িভাবে থাকতাম আমরা পাঁচজন—খোকা, রাজেন দাস, উপেন ভট্টাচার্য, নির্মলদা এবং আমি।

প্রতিবেশীরা জানত কয়েকজন চাকুরে বাবু 'মেস্' করে আছে। এই মেসে বন্ধু-বান্ধবও আসে। বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে আসতেন মাস্টারদা আর অম্বিকাদা। দলের আর কেউ এ বাড়ীটির অস্তিত্ব জানত না। দলের হেড কোয়ার্টারের নিরাপত্তা বজায় রাখবার জন্য দলের অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে এটিকে গোপন রাখা হয়েছিল।

কলকাতা থেকে ফিরবার দিন দুয়েকের মধ্যেই বাড়ীর ব্যবস্থা করতে হ'ল। প্রথমে সে বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম আমি আর খোকা। পরে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলো রাজেন, উপেন আর নির্মলদা। আমাদের কারুরই সংসারের কোন অভিজ্ঞতা নাই। মা সামনে খাবারের থালা সাজিয়ে ধরে দিয়েছেন—আমরা পেট ভরে খেয়েছি—পড়াশুনা করেছি—বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। ক'দিন আগেও এই তো ছিল আমাদের জীবন!

এই বাড়ীতে আমরা একসঙ্গে থাকতাম এই যা! কে বা বাজার করে—কে বা রান্না করে—কি-ই বা খাওয়া হবে—এই নিয়ে কে মাথা ঘামায়? আমরা অস্ত্র-শস্ত্রগুলি নাড়াচাড়া করি, সাজিয়ে রাখি আর নানা আলোচনা করি। আলোচনার মধ্যে প্রধান বিষয় বস্তু—সাহেব মারব, যুদ্ধ করব—ফাঁসী যাবো—ইত্যাদি। খাওয়া দাওয়া সব কিছুরই অব্যবস্থা। মাঝে মাঝে আমরা রান্না করতাম। তালতলার বাড়ীতে গোপীনাথ জোর করে আমাকে রান্না শিখিয়েছিল। "সুলুক বাহার" বাড়ীতে দু' একদিন হয়ত আমিও রান্না করেছি। যেদিনই আমার রান্নার পালা পড়ত—সেদিনই আমার নানান ওজর আপত্তি উঠত—প্রস্তাব করতাম কিছু খাবার কিনে আনতে। যতদূর মনে পড়ে—আমাদের মধ্যে উপেনই বেশির ভাগ দিন রান্না করত। সবচেয়ে মজার কথা খাওয়া দাওয়ার পর বাসনপত্র মেজে পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখতে আমরা কেউই চাইতাম না। কাজের জন্য কোন লোক রাখাও যুক্তিযুক্ত নয়—তাই এই দুরবস্থা! কে আবার বাসন ধোবে? আমাদের এ হেন শোচনীয় অবস্থা দেখে কার না করুণা হবে! শুধু মানুষের কেন কুকুর বেড়ালেরও বোধ হয় দুঃখ হল! শেষপর্যন্ত একটি কুকুর নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের এই কষ্ট দূর করবার ভার নিল। নীচের ঘরগুলির একটিতে বসে আমরা খেতাম। সেই ঘরের একটি দরজার নীচের দিকে একটি চৌকো প্যানেল ছিল না। সেই ফুটো দিয়ে কুকুরটি বেশ আসা যাওয়া করত। খাওয়ার পর আমরা বাসনপত্র সব যেমনকার তেমন ফেলে রেখে চলে যেতাম আর কুকুরটি রোজ এসে সব চেটেপুটে সাফ্ করে রেখে দিত।

বাড়ী ঠিক করা, বাড়ী পরিষ্কার করে জিনিসপত্র নিয়ে এসে ওঠা, ইত্যাদি কাজে দু'দিন খুব ব্যস্ত ছিলাম বলে মায়ের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু প্রতিবেশীদের কাছে কথা দিয়েছি,—মা নিশ্চয়ই আমার পথ চেয়ে বসে আছেন। তৃতীয় দিনে মায়ের সঙ্গে দেখা করব ঠিক করলাম।

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর রওনা হলাম—সঙ্গে গুলীভর্তি দুটি

নতুন রিভলভার। আমাদের বাড়ীর উল্টোদিকে, গলির অন্য পাশে, পিসেমশাইর বাড়ী। সাইকেল করে পিসেমশাই-এর বাড়ী যখন পৌঁছেছি তখন বেলা একটা হবে। দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর বিছানায় কাত হয়ে আরাম করে পিসেমশাই গড়গড়ার নলে টান দিচ্ছিলেন। আমাকে বিনা নোটিশে হঠাৎ ঐভাবে দেখে হাত থেকে তাঁর নলটা পড়ে গেল। বোধহয় বায়োস্কোপের ছবির মত চোখে ভেসে উঠল সেই দৃশ্য—বাবার আলমারী খুলে টাকা নিচ্ছি আমি। উনিই তো উত্তেজনার মাথায় পুলিশে খবর দিতে বলেছিলেন,—সে কথাও আমার কানে গেছে কিনা কে জানে! পিসেমশাই বোধহয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে অত কাণ্ডের পর আমি আবার কোন আত্মীয়ের বাড়ী যাব।

বর্মায় সরকারী হাসপাতালে অ্যাসিস্ট্যান্ট সিভিল সার্জন ছিলেন পিসেমশায়। এখন পেনসন্ নিয়ে এখানে আছেন। প্রথমটা খুব চমকে উঠলেও শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললেন,

"আচ্ছা, তুমি এসেছ? কোথায় ছিলে এতদিন? কি চাও? আচ্ছা, আচ্ছা,—ভেতরে যাও আগে!"

তাড়াতাড়ি প্রণামটি সেরে ভেতরে গেলাম। পিসীমা ছিলেন ঘরে, আর ছিল আমার পিসতুত বোন দু'জন। একজন চেঁচিয়ে উঠল, আনন্দে, দুঃখে ও উৎসাহে!

"দাদা তুমি এসেছ? তুমি তো সাংঘাতিক লোক! মামীমার যে কী অবস্থা তা'তো তুমি জানই না! বোস, বোস। মামীমাকে ডেকে আনি।"

আমি হেসে বললাম, "হ্যাঁ রে হ্যাঁ, তোর দাদা বরাবরই সাংঘাতিক লোক। এখন যা—দৌড়ে গিয়ে মাকে নিয়ে আয়।"

একটু পরেই মা এলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমি। ধীরে ধীরে হাঁটছেন, গায়ে যেন একটুও বল নেই। স্নেহ-কাতর চোখ দুটিতে রাজ্যের বিষণ্নতা, মুখের ওপর দীর্ঘ দিনের ক্রন্দন এবং অনিদ্রার কালিমা। মনে হয় পৃথিবী যেন তাঁর চোখে নীরস, বিবর্ণ হয়ে গেছে।

আমার চোখ ফেটে জল এল। এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলাম মাকে। আমাকে জড়িয়ে ধরে মা অস্পষ্টস্বরে বললেন,—"তুই কি করলি বল তো? এ তুই কি করলি?"

মায়ের মুখে আহত অভিমানের ভাষা আমার বাক্‌রুদ্ধ করে দিল। আমি শুধু বললাম,—"জানতে চাও মা আমি কি করেছি? এই দেখ"—বলে দুটো ঝক্‌ঝকে নতুন রিভলভার বার করে খাটের ওপর ছুঁড়ে ফেললাম।

ঘরে তখন অবাঞ্ছনীয় লোক কেউ নেই। আমার দুই পিসতুত বোন, পিসীমা, দিদি (ইন্দুমতী), অন্য বিধবা দিদি—(মাণিক ও ফটিক উপাধ্যায়ের মা) উপস্থিত ছিলেন।

ঠিক মনে নেই কে একজন তাড়াতাড়ি বিছানার চাদর দিয়ে রিভলভার দু'টি ঢেকে দিলেন। বিস্ময়ে সকলে হতবাক। বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে কি করেছি তার জ্বলন্ত প্রমাণ সকলের চোখের সামনে।

মায়ের বুকের নিঃশ্বাস পড়ছে না। ভীত দৃষ্টিতে রিভলভার দুটোর দিকে তাকিয়ে বললেন,—"তুই তা'হলে সব টাকা নিয়ে যাবি?" মাকে আশ্বস্ত

করার জন্য বললাম,—"ভয় করো না মা। এখন আর আমি তোমাদের টাকা নেব না।"

—"তা'হলে তুই পরে নিবি?"

—"না, মা। তোমাদের টাকা আর কোনদিনই নেব না।" এবার বোধ-হয় মা কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন।

পিসীমার বাড়ীতে মা সামনে বসে খাওয়ালেন। সবাই খুব খুশি। পিসেমশাই কিন্তু একবারও এলেন না। বাবার সঙ্গে দেখা করলাম না। কারণ শুনেছি বাবা আজীবন আমার মুখদর্শন করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। মা'র পীড়াপীড়িতে কথা দিলাম যে, যে ক'দিন এখানে থাকব রোজ পিসীমার বাড়ী এসে মায়ের সামনে বসে খাব।

সুলুক বাহারের বাড়ীতে অস্ত্রশস্ত্রগুলি রাখার সময় আমার চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছিল আগরতলার মহারাজার আলমারী দিয়ে সাজান সেই অস্ত্রাগারটির ছবি। আমরাও তো অমনি সাজাতে পারি! যেই চিন্তা সেই কাজ। মহারাজার নিজস্ব আর্মারীই কত বড়, কত আলমারী তাতে! নাইবা হল অতগুলি আলমারী। একটা আলমারী অন্ততঃ সেই ধরনের চাই। বানান হ'ল অর্ডার দিয়ে সেই ধরনের একটা আলমারী। তার বিভিন্ন তাকে রাইফেল, ব্রীচলোডার গান, রিভলভার এবং মশার পিস্তল রাখবার জন্য উপযুক্ত খোপ বানান হল। আর তাতে রইল নানা আকারের ভোজালি এবং ছোরা। সবচেয়ে নিচের তাকে সাজান হল অস্ত্রে ব্যবহারের জন্য কার্তুজ, বোমা ইত্যাদি। আমাদের ছোট্ট অস্ত্রাগারটি সুসজ্জিত হয়ে 'সুলুক বাহারের' শোভাবর্ধন করতে লাগল।

একটি বিপ্লবীদলের হেড-কোয়ার্টারে একসাথে সব অস্ত্র রাখা, বিশেষতঃ এমনি করে সাজিয়ে রাখা, কোনমতেই সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। কিন্তু আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি তখন খানিকটা রোমান্টিসিজম্ ঘেঁষা ছিল। পুলিশ এসে আক্রমণ করবে,—আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব,--তারপর যতীন মুখার্জী পরিচালিত বালাসোর যুদ্ধের বীরদের মত নির্ভীকভাবে প্রাণ দেব--বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী এই সীমারেখাটুকু অতিক্রম করতে পারে নি তখন। সে-জন্য হেড-কোয়ার্টার সাজিয়ে রেখেছি অস্ত্র দিয়ে। শুধু পুলিশ আসার অপেক্ষা। যতদিন তা' না আসে ততদিন এই হেড-কোয়ার্টার থেকে অন্যান্য কাজ চালিয়ে যাব।

অন্যান্য কাজ, অর্থাৎ বিপ্লবের প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ। সেই প্রোগ্রাম অনুসরণ করতে হলে অস্ত্র চাই, অর্থ চাই। আর চাই মুক্তিযোদ্ধা। আমরা হেড-কোয়ার্টারে এই কয়েকজন মাত্র লোক। একটি ছোট আলমারী ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কি করতে পারব? অন্য কর্মী কোথায়? কর্মীদের হাতে দেবার মত যথেষ্ট অস্ত্র কই?

কর্মী আমরা কিছু যোগাড় করেছি। কিন্তু তখন তাদের যথেষ্ট শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে নেওয়া হয় নি। আর অস্ত্র? তার জন্য চাই অর্থ। সুতরাং জুলুদা, অনুরূপদা, গণেশ এবং যশোদার অনুপস্থিতিতে আমরা ছয়জন চট্টগ্রামে বসে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম।

১৯১৯ সালে চট্টগ্রামে বিপ্লবী সংগঠনের প্রথম শ্রেণীতে যোগ দিয়েছিল

যারা, ১৯২৩ সালে তারা প্রায় সকলেই হয় দলত্যাগ করেছে নয় তো নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে পড়েছে। এদিকে অসহযোগ আন্দোলনের স্রোত বন্যার মত এসে দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে আবার অন্তর্হিত হয়ে গেছে। ফলে যারা সে স্রোতে গা ভাসিয়ে লেখা-পড়া ত্যাগ করেছিল তারা এখন আবার ভাল ছেলে হয়ে ঘরে ফিরে গেছে—বিপ্লবী দল তো দূরের কথা, স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গেও তাদের বর্তমানে আর কোন যোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটি পরীক্ষার শেষে অনেকে এসে জড় হয় বিপ্লবী দলে যোগ দিতে। আবার পরীক্ষার ফল বেরুলেই যে যার পথ ধরে। দেশে কোন স্থায়ী আন্দোলন নেই, বিপ্লবী দলের কোন প্রত্যক্ষ কর্মসূচী নেই—তারা করবেই বা কি? সুতরাং আবার পড়াশুনা করাই ভাল। এইভাবে জোয়ার-ভাঁটার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছিল আমাদের সাংগঠনিক কাজ।

এদিকে পরোইকোরা ডাকাতিতে আমাদের দলের যেসব কর্মীরা অংশ-গ্রহণ করেছিল, তাদের মনেও নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সেই যুগের ও সেই সময়ের বিপ্লবী কাজের দায়িত্ব, ঝুঁকি এবং বিপদের আশংকা অনুধাবন করে তাদের মন নিরাপদ জীবনের প্রতি আসক্ত হল।

কেদারেশ্বর দাশগুপ্ত এবং সুধাংশু দাশগুপ্ত—আমাদের প্রতিবেশী ও সহপাঠী। সুধাংশু ও তার ছোট ভাই, শান্ত সুবোধ দুটি ছেলে, পরিবারের রত্নবিশেষ। মা-বাবা তাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ যত্নবান। প্রতি রাত্রে শয্যা-গ্রহণের পূর্বে মায়ের কাছে দিনের সমস্ত আচরণ ব্যক্ত করা এটা তাদের খুব ছোটবেলার শিক্ষা। এই নিয়ম চলে আসছিল—আমাদের গুপ্ত-বিপ্লবী দলে থাকা অবস্থায়ও তারা এই নিয়মের ব্যতিক্রম করে নি। আগে আমরা তা' জানতে পারি নি। তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যা হবার তাই হল।

কেদারেশ্বরের ধর্মপ্রীতি বেশি, সুধাংশুও বেশ নিরীহ। এদের দলে আনতে খুবই কষ্ট হয়েছিল। পরোইকোরা ডাকাতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করবার পর এটা আমাদের ভাগ্যই বলতে হবে যে সুধাংশু তখনই গিয়ে মা-বাবাকে বলে নি—আমরা ডাকাতি করেছি। কিছুদিন পরে তাও মাকে বলেছিল।

যাই হোক, সেই ডাকাতির পর থেকে ও একেবারে বসে গেল। কেদারেশ্বর শেষ পর্যন্ত মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে মেতে উঠল। সুধাংশু বরাবরই 'ভাল' ছেলে ছিল, সে ভাল ছেলে হয়ে মায়ের কোলে ফিরে গেল।

সুধাংশু ও কেদার বেশ সবল স্বাস্থ্যবান ছিল। শরীরে শক্তির অভাব ছিল না তাদের। অভাব ছিল মনের দৃঢ়তার—স্বদেশ-প্রেমের জন্য চরম আত্মত্যাগের মানসিক শক্তির। মনে আছে পরোইকোরা ডাকাতির পর একদিন সুধাংশু সম্বন্ধে নির্মলদা আমাকে বলেছিলেন,

"ভাই রে ভাই, কি কইয়ম্ আর? দেইর জে সুধাংশু এক হাতে পিস্তল আর এক হাতে মোমবাত্তি লইএরে বাড়ীর দরজাৎ থিয়াই রইএ। মুয়ৎ উগ্যোয়া কথা নাই। চুপচাপ দমধরি থিয়াই রইএ। যেওন এগ্‌গুয়া ভালামানুষ। তারে দেইএরে আঁর বুক যেওন মুচাড়ি উডিল। মার বুকতুন এউনরে কাড়ি আনি কিইবো?.....৷" (ভাই রে ভাই, কি আর বলব? দেখলাম সুধাংশু এক হাতে পিস্তল আর এক হাতে মোমবাতি নিয়ে বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে। মুখে একটা কথা নাই। দম ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

একেবারে যেন একটি ভালমানুষ। তেমনভাবে তাকে দেখে আমার বুকের মাঝে মোচড় দিয়ে উঠল। মায়ের বুক থেকে এদের কেড়ে এনে কি আর হবে?)। নির্মলদা সুধাংশু সম্বন্ধে এই বর্ণনা দিয়ে বলতে চাইছিলেন যে এইরূপ একটি সশস্ত্র ডাকাতির জন্য নিজেকে সে মোটেই প্রস্তুত করতে পারছিল না। তাকে সেই স্থানে দেখে নির্মলদার মনে হয়েছিল যে সে যেন একটি প্রাণহীন বীর্যহীন কাঠের পুতুল। অ্যাক্‌শনের সময় তার চোখে নেই দীপ্তি—মুখে নেই দৃঢ়তা—বুকে নেই সাহস! তাই নির্মলদা মনের আক্ষেপ জানালেন—এইসব কোমল প্রাণ সুবোধ বালকদের মায়ের অঞ্চলাশ্রয় থেকে টেনে এনে লাভ কি?

সুধাংশু সম্বন্ধে নির্মলদার উক্তি সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রমাণিত হল। সুধাংশু দল ছেড়ে চলে গেল। কেদারেশ্বরও গেল। বিপ্লবীদলে যোগ দিয়ে ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করবার পর দলত্যাগ করার শাস্তি কি? নিম্নতম শাস্তি—মৃত্যু। সে যুগে বিপ্লবীদলে এটাই ছিল আইন। আমরা কি কেদারেশ্বর আর সুধাংশুকে মৃত্যু-দণ্ড দিয়েছিলাম? না, তা' দিই নি; ওরা বাবা-মার কাছে বলে দিতে পারে এই আশংকা থাকা সত্ত্বেও দিই নি। প্রকৃত-পক্ষে চট্টগ্রামে সূর্য সেন পরিচালিত বিপ্লবীদল কোনদিন কোন দলত্যাগীকে চরম শাস্তি দেয় নি। আমরা যুক্তিবাদী ছিলাম, অনর্থক ভয় পেতাম না। আমরা তাদের দলত্যাগের কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করতাম, অনুসন্ধান করতাম এবং তাদের কাছ থেকে যেভাবে পারি, যতটা পারি ভবিষ্যতে সাহায্যলাভের ব্যবস্থা রাখতাম। নিজে প্রত্যক্ষ বিপ্লবীদলে যোগ দেবার মত সাহস সকলের থাকে না, কিন্তু মনে মনে বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি থাকে অনেকের।

কেদারেশ্বর আর সুধাংশু দল ছেড়ে চলে গিয়ে ভাল ছেলে হয়ে আত্মীয়স্বজনের আনন্দ বর্ধন করল ঠিকই, কিন্তু বিপ্লবের রক্তাক্ত পথ সযত্নে পরিহার করেও প্রকৃতির নিষ্ঠুর বিধান অতিক্রম করতে পারল না। এক বছরের মধ্যে কেদারেশ্বর মারা গেল মারাত্মক 'টিউবারকিউলোসিস' ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে। আর সুধাংশু? সে পাহাড়তলী ওয়ার্কশপে বেশ ভাল একটা চাকরীতে ঢুকল। দিল্লীর একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর কন্যাকে বিবাহ করে দামী পেন, সোনার ঘড়ি, আর বি-এস-এ সাইকেল পেল,—জীবনে পেল সুখ, প্রতিষ্ঠা ও সম্মান। কিন্তু চার বছরের মধ্যেই মৃত্যুর করাল ছায়া তাকেও গ্রাস করল—বসন্ত রোগে অকালে মারা গেল সে। পেছনে পড়ে রইল তার নব-বিবাহিতা পত্নী আর স্নেহ-পরায়ণ পিতামাতা!

প্রেমানন্দ দত্ত আমার সংস্পর্শে এসে আমার আগ্রহ এবং অনুরোধে বিপ্লবীদলে যোগ দেয়। বিপ্লব সম্বন্ধে আমারই বা তখন জ্ঞান কতটুকু? প্রেরণা দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে জানি দেশ উদ্ধার করতে হবে—আর জানি শহীদদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী। এই বলেই উৎসাহী তরুণদের দলে টানা হ'ত। প্রেমানন্দকেও তাই বলেছিলাম। আমার সঙ্গে কথা বলে, আমার সঙ্গে সদা-সর্বদা থেকে সেও খুব উৎসাহী এবং কর্মঠ হয়ে উঠেছিল। যেই আমি কলকাতা চলে গেলাম পড়াশুনার নাম করে, অমনি ওর মনেও পরিবর্তন দেখা গেল। আমার সাথে বিপ্লব সম্বন্ধে নানারকম উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা করে ও নিজেকে বিপ্লবী-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করছিল, কিন্তু হঠাৎ আমি চলে যাওয়ায় ও আবার পুরনো বন্ধুদলে গিয়ে পড়ল—সহজ সরল জীবনযাত্রার পথ আবার

ওকে হাতছানি দিল। বিপ্লবীদের মধ্যে একমাত্র রাজেন দাসের সঙ্গেই তখন ওর সংযোগ ছিল সবচেয়ে বেশি। রাজেন দাসের অতি-আধুনিক বিপ্লবী মতবাদ ও অতি-আধুনিক জীবনযাত্রা তাকে আকর্ষণ করল অনেকখানি।

প্রেমানন্দের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে আমরা ওকে সাহস করে হেড-কোয়ার্টারে আনতে পারছিলাম না। আমি মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে দেখা করে বিপ্লব সম্বন্ধে নানাপ্রকার সশস্ত্র আক্রমণাদি নিয়ে আলোচনা করতাম; কিন্তু আমাদের কাজের সঠিক প্রোগ্রাম বা হেড-কোয়ার্টারের গোপন আশ্রয়ের কথা কিছু বলতাম না।

ন্যাশনাল স্কুল ছিল আমাদের কর্মী-সংগ্রহের কেন্দ্র, আমাদের প্রকাশ্য হেডকোয়ার্টার। সেখানে রোজ যেতাম। খেলা হ'ত, ব্যায়াম হ'ত, অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় কথাবার্তা হ'ত। বিপ্লবীদলে নাম লেখাবার উপযুক্ত ছেলে খুঁজে বেড়াতাম। অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে ন্যাশনাল স্কুল আর স্কুল ছিল না। কিন্তু সতীদার ঘর দুটিতে এবং স্কুল চত্বরে আমাদের একটি ক্লাব মত গড়ে উঠেছিল। জন-সংযোগের কেন্দ্র ছিল সতীদার কুটিরটি, আর সবচেয়ে সুবিধে ছিল এই জন্য যে, পুলিশের সন্দেহের আড়ালে ছিল এইটি।

সুলুক বাহারে আমরা তিন মাসেরও বেশি সময় ছিলাম। সেখানে আমাদের বহু মিটিং হয়েছে। আমরা দু'জন থাকতাম মিটিং-এ। বৈপ্লবিক আক্রমণের ও কর্মসূচীর কথা আলোচনা হ'ত, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট পরি-কল্পনা নেওয়া হ'ত না; দিনও স্থির হ'ত না। আমাদের অর্থ প্রয়োজন, সুতরাং এ, বি, রেলওয়ের অর্থ অপহরণ করতে হবে। কিন্তু কবে সেটা হবে, কিভাবে হবে, কে কে যাবে সে বিষয়ে কোন কথা হ'ত না। একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থা যেন।

এ. বি. রেলওয়ের টাকা সম্বন্ধে যে সংবাদ আমরা সংগ্রহ করেছিলাম তা' নির্ভুল। আমার দাদা নন্দলাল সিং পাহাড়তলী ওয়ার্কশপে কাজ করতেন, তিনিই সব খবর দিয়েছিলেন। আর দিয়েছিল সুধাংশু। দলত্যাগ করার পরও আমি তার সঙ্গে সংযোগ রেখেছিলাম। প্রতি মাসে দু'বার-- ১লা এবং ২রা—আবার ১৪ই এবং ১৫ই কর্মীদের বেতন দেবার জন্য এ. বি. রেলওয়ের হেড্ অফিস থেকে ওয়ার্কশপে টাকা পাঠান হত।

সেই সময়, খুব অল্প বয়সেও, বুঝেছিলাম যে এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিশদ সংবাদ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। সেইজন্য আমার নিজেরও লক্ষ্য করে দেখতে হয়েছে কোন পথে এই টাকা যায়, ক'জন লোক থাকে, ইত্যাদি সবকিছু। একবার নয়, কয়েকবারই দেখেছি। সেই অনুসারে কোন্ নির্দিষ্ট স্থানে, কোন্ সময়ে আক্রমণ করে টাকা নেব, তারপর কোন্ পথে পালাব সে সব ছকে ফেলে ঠিক করা হয়ে গিয়েছিল। কী আশ্চর্য! এর পরেও আমরা এটা ওটা ওজর দিয়ে রোজই সময় নিচ্ছিলাম।

হাতে কাজ আছে, অথচ করা হচ্ছে না। শুধু চিন্তা আর আলোচনা! —শুধু কথা আর কথার পিঠে কথা। দিনের পর দিন একভাবে নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি আমরা। এভাবে চললে দলের সমাধি রচনায় বিলম্ব হবে না। রোজই এক প্রশ্ন--রোজই তার এক উত্তর,—

—"কেন আমরা এভাবে সময় নষ্ট করছি?"

—"এখনি একটা-কিছু করতে হবে।"

—"টাকা ছাড়া কি করে সংগঠন চলবে?"

—"অস্ত্র চাই। এখনি টাকা না পেলে কি করে অস্ত্র কিনব।"

—"রেলওয়ের টাকার সংবাদ নির্ভুল। ওটা আনতে পারলেই এখনকার মত সমস্যার সমাধান হবে"—ইত্যাদি, ইত্যাদি আর ইত্যাদি। যেখানে ছিলাম সেইখানেই যেন স্থবির ও নিশ্চল হয়ে রইলাম। এই পর্যন্ত এসে আলোচনা থেমে যেত। তারপর আবার একথা, সেকথা,—এ ওজর সে ওজর। শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট দিন আর ঠিক হ'ত না—আরো ভেবে দেখতে হবে,—ওটা বাকী. সেটা বাকী—ইত্যাদি।

এটা এক ধরনের ভীরুতা। বিপজ্জনক কাজে এগিয়ে যাবার আগে মনে হয়—'যাক না আর ক'টা দিন। বেশ তো আছি। শেষ পর্যন্ত তো করবই কাজটা। এখন ক'টা দিন একটু নিশ্চিন্তে থাকি।' এই ভাবতে ভাবতে সেই দিনটি ক্রমশ পিছিয়ে যেতে থাকে, হয়ত আর জীবনেও আসে না। আমি সভয়ে লক্ষ্য করলাম আমাদের মধ্যে এই ভীরুতার ভাবটি এসে গেছে। স্কুল-বাহারের নিশ্চিত নিরাপদ আশ্রয়ে বন্ধুদের সাহচর্যে দিন কাটছে—মনে হচ্ছে এই তো বেশ বিপ্লবী জীবন! তাই বিপজ্জনক কাজের কথা আলোচনা হলেই নানা যুক্তি দিয়ে তাকে পিছনে ঠেলে দেবার চেষ্টা চলেছে।

আমি আত্মবিশ্লেষণ করে এই নিষ্ক্রিয়তার কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হলাম। তিনটি মাস ধরে আমরা সমবেতভাবে কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করছি, কিন্তু প্রতিবারই কোন না কোন দিক থেকে বাধা আসছে। এ অবস্থায় যে কোন একজনকে অগ্রণী হয়ে 'বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধার' দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। নইলে এ স্থিতাবস্থার অবসান ঘটবে না। আমি আর কল্পনা বিলাসে দিন কাটাতে রাজী নই। তাই আমি নতুন শ্লোগান তুললাম. "ব্যক্তিগত কাজ" (Individual action)।

এখন যে বিষয়টি লিখতে যাচ্ছি তার একটু ভূমিকা প্রয়োজন। অগ্নি-যুগের যে অধ্যায়টির সঙ্গে আমি নিজে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সেই কথাটি এখানে লিখছি। আমার নিজের কথা বাদ দিয়ে এই অধ্যায়টির ইতিহাস রচনা করা কোনমতেই সম্ভব নয়। চট্টগ্রাম বিদ্রোহে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট ভূমিকার কথা আমাকে বলতে হবে। আত্মশ্লাঘা প্রকাশ আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু অন্য সমস্ত কর্মীদের ভূমিকার কথা বলে, স্বাভাবিক সংকোচ বশে আমার নিজের ভূমিকাটিকে যদি উহ্য রেখে যাই তা হলে তা আর যাই হোক চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সত্য ইতিহাস কখনই হবে না।

আরও একটি কথা এখানে আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই, আমার এই স্মৃতিচিত্রণ কেবলমাত্র অতীত ইতিহাসের "জাবর কাটা" নয়। আগামী দিনের বিপ্লবীদের জন্য আমি রেখে যেতে চাই আমাদের অভিজ্ঞতার ফসল। সেইজন্য আমাদের আশা, আনন্দ, উদ্দীপনা ও সাফল্যের পাশাপাশি রেখে দিয়ে যাব আমাদের ত্রুটি, বিচ্যুতি এবং দুর্বলতার কথা—কাউকে ছোট করা বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে নয়। আমাদের ভুল ত্রুটি থেকে শিক্ষালাভ করে ভবিষ্যৎ বিপ্লবীরা যদি আরও ঠিকভাবে তাঁদের কর্মপন্থা স্থির করতে পারেন তবেই আমার এই রচনা সার্থক হবে।

ইতিহাস আমি বিবৃত করতেই পারি। বিকৃত করবার কোন অধিকার আমার নেই। তবু যদি কোন পাঠকের মনে হয় যে, এই স্মৃতিচারণে কোথাও আমার অহমিকা প্রকাশ পেয়েছে, তবে যেন সেটাকে আমার অবিনয় বলে মনে না করে নিরুপায় সত্যভাষণ বলে মনে করেন, এই আমার বিনীত অনুরোধ।

সকল দেশের বিপ্লবীদের গতিপথে একটা মূল কেন্দ্র থাকে যার উপর পরবর্তী কার্যক্রম সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সেই মূল কেন্দ্র কোন সময়ে জড়তা, ভীরুতা, দ্বিধা ও নিষ্ক্রিয়তার জন্য আক্রান্ত হতে পারে। সেইরূপ বিশেষ অবস্থায় এর একটা আমূল পরিবর্তন আনা না গেলে বিপ্লবী সংগঠন বা যে কোন পার্টি—যত বড় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তা গড়ে উঠুক না কেন—তার সমাধি অবশ্যম্ভাবী। সেই হেতু সংগঠনের জড়তা ভাঙবার জন্য কাউকে না কাউকে বিশেষ মুহূর্তে এগিয়ে আসতে হবেই। বিশ্বের বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিপ্লবের নজীর থেকে এইরূপ দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে আমার রচনাকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। এমন সব সঙ্কট মুহূর্ত আসে—এত দ্বিধা, এত ভয়, এত আশঙ্কা—যে আর যেন এগোন যায় না! তখন প্রয়োজন, এককভাবে হলেও এগিয়ে যাওয়া। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল্ রে"— (ঘোড়ার পিঠে আনন্দমঠের জীবানন্দ—হাতে তাঁর বল্লম, কটিতে তরবারি, মুখে 'হরে মুরারে'; যদি কেউ না আসে তবে জীবানন্দ একাই যাবে। চাবুকের মুখে ধোঁয়া ছুটিয়ে জীবানন্দ একাই ইংরেজ সৈন্যকে আক্রমণ করতে চললেন। 'জীবানন্দ মরিতে পারে, আমরা পারি না?'—সন্তান-সেনাদের আত্মসম্মানে আঘাত?—সেই আঘাতের প্রয়োজন ছিল। দলে দলে সন্তানসেনা জীবানন্দকে অনুসরণ করল। ইংরেজ শক্তির পরাজয়—সন্তানদের জয়)। আমাদের সংগঠনও এইরকম একটি সংকটময় মুহূর্তে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, একে আবার সামনের দিকে চালিয়ে নিতে হলে ভিতর থেকে এর একটা আমূল পরিবর্তন সাধনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

সাতদিন ধরে আমি মিটিং-এ ক্রমাগত বললাম যে আমাদের মধ্যে কোন একজন এগিয়ে এসে কাজে হাত না দিলে এ নিষ্ক্রিয়তা ভাঙবে না। বার বার মাস্টারদাকে আমার কথাটা বোঝাতে চাইলাম—এখনই কাজে হাত দিতে হবে; আমাদের মনে নিশ্চয়ই দ্বিধা আছে, নইলে কেন এত দিন ধরে চুপচাপ বসে আছি সবাই।

আমি বুঝেছিলাম মাস্টারদার অকুণ্ঠ সমর্থন আছে আমার প্রস্তাবে। তাঁর ইঙ্গিত আমি বুঝেছিলাম। তাই ভরসা পেয়ে আমি সবার কাছে আমার প্রস্তাব উপস্থিত করলাম, "আমরা যদি প্রত্যেকে নিজের নিজের মনোভাব বিশ্লেষণ করে দেখি, তবে দেখব যে সশস্ত্র বিপ্লবের কাজে হাত দেওয়ার মত মানসিক প্রস্তুতি আমাদের নেই। ব্যক্তিগতভাবে কারও সম্বন্ধে আমি কিছু বলছি না, কিন্তু ভেবে দেখুন আমাদের সামনে নির্দিষ্ট কাজের প্রোগ্রাম কি আছে? আমাদের সশস্ত্র প্রস্তুতির জন্য অস্ত্র চাই। অন্য কেউ নেই যে অস্ত্র দিয়ে আমাদের সাহায্য করবে। আমাদের নিজেদেরই সব করতে হবে। তার জন্য টাকা চাই। টাকা কি করে যোগাড় হবে তার জন্যও চোখের সামনে সাজানো রয়েছে সব ব্যবস্থা। তবুও আমরা তা' করছি না। কেন করছি না? সকলে প্রস্তুত নয় বলে। এইরূপ অবস্থায় যদি কেউ এই নিষ্ক্রিয়তার

বন্ধন ভেঙে ফেলে এগিয়ে যেতে চায়, তবে তাকে আমাদের বাধা দেবার কি অধিকার আছে? আমি একাই এ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই—আমাকে অনুমতি দেওয়া হোক্।"

সবাই চুপ। জটিল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আমি আজ স্থির করেছি যে, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার জন্য দলের অনুমোদন আদায় করবই। যদি কেউ কিছু করতে চায় অন্যের ভীরুতার জন্য সে বাধা পাবে কেন?

মাস্টারদা কোনদিনই প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা বলতেন না। তিনি প্রত্যেকের মনোভাব উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছেন। আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে, মাস্টারদাও চাইছিলেন সেই নিষ্ক্রিয় অবস্থার অবসান। তাঁর নীরব সম্মতি ও পরোক্ষ অনুমোদন যদি আমি না পেতাম তবে নিশ্চয়ই এইরূপ একটা পন্থা নিতে সাহস করতাম না।

আমার এই "ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার" প্রতি আগ্রহের প্রকৃত অর্থ মাস্টারদা স্পষ্টই বুঝেছিলেন। মনে আশা হল মাস্টারদা নিশ্চয়ই অনুমতি দেবেন। তাই বিশেষভাবে তাঁকে উদ্দেশ করে বললাম,

"মাস্টারদা, আমাদের অনুমতি দেওয়া হোক যেন আমরা 'ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়' বিপ্লবী কাজ করতে স্বাধীনতা পাই। জোর করে কাউকে দিয়ে কাজ করান যায় না। আবার একজন যখন একটি সশস্ত্র আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়েছে, তখন তাকে নিরস্ত করবার নৈতিক অধিকারও কারও নেই। আমরা বার বার 'অবিলম্বে কাজ' করবার প্রোগ্রাম নিয়েছি, কিন্তু প্রোগ্রাম কার্যে পরিণত করি নি। সেই জন্য আমার প্রস্তাব প্রত্যেককে এবার স্বাধীনতা দেওয়া হোক তারা নিজের নিজের প্রোগ্রাম অনুযায়ী 'অবিলম্বে' কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুক। যার ইচ্ছে হবে সে কাজ করবে। যে পিছিয়ে থাকতে চায় সে পড়ে থাকবে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের কাজ পণ্ড করে দেবার কোন অধিকার তার নেই। এই হচ্ছে আমার প্রস্তাব। ব্যক্তিগতভাবে আমরা যদি সংগঠনে প্রাণ সঞ্চার করতে না পারি, তবে চিরদিনই এইভাবে জড়ভরত হয়ে থাকতে হবে। মাস্টারদা, অনুমতি দিন আমাদের। এই সঙ্কট সময়ে আমার মনে হয় আপনার নির্দেশ অত্যন্ত প্রয়োজন।"

মাস্টারদা ধীরে ধীরে বললেন,—"আমাদের মধ্যে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সামনে কাজ আছে। আমরা কেবল সময় নিচ্ছি। আমার মনে হয় আমাদের মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় নি। আমাদের কাজে এগিয়ে যেতে হবে—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এটাই আজকের শ্লোগান। অনন্ত ঠিকই বলেছে, যদি কেউ এগিয়ে যেতে চায়, তবে তাকে টেনে ধরে রাখবার অধিকার কারও নেই। তাই আমার মনে হয় এই অবস্থায় আমাদের প্রত্যেকের কাজ করবার জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকা উচিত।"

মাস্টারদা থামলেন। এবার আশ্বাস পেয়ে আমি বললাম,—

"আমি ধরে নিচ্ছি, এখনি কাজ শুরু করে দেবার অধিকার আমরা পেয়েছি এবং আমাকে আমার কাজ করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপে আমার কাজের প্রোগ্রাম জানাচ্ছি,

"(১) আগামীকাল শুক্রবার ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯২৩, রেলওয়ে হেড অফিস থেকে কর্মচারীদের বেতন দেবার টাকা যাবে ওয়ার্কশপে। যদিও

আমাদের পূর্বে দেখা তবু আমি গাড়িটার গতিপথ শেষবারের জন্য লক্ষ্য করব এবং নির্দিষ্ট স্থানটি দেখে আসব।

(২) এরপর দুপুরে কোর্টে গিয়ে ডি আই বি অফিসারকে লক্ষ্য করব;

(৩) ১৪ই ডিসেম্বর, শনিবার, আমি রেলওয়ের টাকা ছিনিয়ে নেব। আমার পরবর্তী কাজ হচ্ছে তাকে হত্যা করা।

প্রোগ্রামের এই তিন দফা বিষয়বস্তু খুব সংক্ষেপে জানালাম। তার-পর বিনীত অথচ দৃঢ়ভাবে বললাম,

"এই আমার প্রোগ্রাম—এর কোন পরিবর্তন হবে না। আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার সঙ্গে যোগ দিতে। কিন্তু কারো যদি কোন অসুবিধা থাকে তার জন্য সময় পিছিয়ে দেওয়া হবে না। যদি কেউ না আসেন আমি একাই যাব। মাস্টারদা, আমাদের মধ্যে অস্ত্র ভাগ করে দিন যাতে আমরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে কাজ করতে পারি।"

আমার প্রত্যক্ষ প্রস্তাবে মিটিং-এর আবহাওয়া আরো গুরুগম্ভীর হয়ে উঠল। আমার প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন না কেউই। সকলেই চাইছেন কাজটা হোক্, সফলতার সঙ্গেই হোক্। কিন্তু সকলে সাহায্য না করলে কাজটি পুরোপুরি সফল নাও হতে পারে। আবার দেরি করার সময় নেই, আমি ১৪ই ডিসেম্বর কাজটা করবই। কাজেই এখন প্রত্যেকেই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে আমাকে সাহায্য করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। নির্মলদা বললেন,

"বেশ তো, তুমি যখন অবিলম্বে কাজটি করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছ, তখন আমরাও তোমার সঙ্গে যোগ দেব। কিন্তু আর ক'দিন দেরি করে ভালভাবে তৈরি হয়ে নাও।"

আমি উত্তর দিলাম, "নির্মলদা, আমি যে সময় ঠিক করে দিয়েছি তার কোন পরিবর্তন হবে না। এই সময়ের মধ্যে যেভাবে যতটা তৈরি হতে বলেন হব। কিন্তু প্রস্তুতির সময় বাড়ান চলবে না। সমবেত প্রচেষ্টা সব সময়েই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে তা' যদি হয় সেও হবে ঐ ১৪ই ডিসেম্বর, তার পরে নয়।"

যে কাজ বহুদিন আগেই করবার কথা, যে কাজ করবার উদ্দেশ্যে কলকাতা ছেড়ে চট্টগ্রামে এসেছি, তার জন্য আর একদিনও বাড়তি সময় দিতে আমি রাজী নই। আমার কথায় কোন মতদ্বৈধতার অবকাশ নেই। মাস্টারদা বুঝতে পারছিলেন, আমি কোনমতেই এক ইঞ্চি সরে এসেও আপোস করতে রাজী নই—কি সময় সম্বন্ধে, কি লোকবল সম্বন্ধে। কিন্তু অম্বিকাদা আমাকে যুক্তি দেখিয়ে নিরস্ত করতে চাইছিলেন,

"দেখ অনন্ত, তোমার আগ্রহ দেখে আমরা সকলেই খুশি হয়েছি, আমাদের এই অচল অবস্থার অবসান ঘটাবার জন্য সত্যিই একটা বড় রকমের ধাক্কা দেওয়ার প্রয়োজন। তোমার বন্ধুরা সকলেই তোমার সঙ্গে যেতে উৎসুক। কাজেই আর পনের দিন অপেক্ষা কর। সামনের মাসে যখন রেলের টাকা যাবে, তখন আমরা ওটা নেব। ইতিমধ্যে প্রত্যেকে মনের দিক থেকে নিজেকে প্রস্তুত করে নেবে। আর ভাল ক'রে চিন্তা করে প্ল্যানটাও আমরা এমন-ভাবে করতে পারব যাতে নিশ্চিত সফল হই।"

অম্বিকাদার যুক্তি এবং অনুরোধে আমি মত বদলালাম না। আমার প্রস্তাব আমি দিয়েছি। তাই বললাম,

"অম্বিকাদা, অনেক পনের দিন চলে গেছে। এত দিনেও যদি আমরা প্রস্তুত না হয়ে থাকি, তবে আমার ভয় হয় কোনদিনই তা' হতে পারব না। এখন আমরা সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিয়েছি—আর ফেরা চলবে না। সময় এবং তারিখ সম্বন্ধে কোন অদল বদল করা চলবে না। সমস্ত প্ল্যানটা আমরা বহুবার ভাল করে খতিয়ে দেখেছি--নিরস্ত্র লোকদের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেওয়া একটা কিছু গুরুতর সমস্যা নয়। তাহলে আর সময়ের কি দরকার? অম্বিকাদা, আমাকে আপনারা বাধা দেবেন না। আমি যাবই- ঐ দিনে ঐ সময়েই যাব।

"আর একটা কথা ভেবে দেখুন, মুসলমান পাড়ায় ক'টি হিন্দুর ছেলে কতদিন এভাবে পুলিশের কাছ থেকে গোপনে থাকতে পারবে? যে কোন মুহূর্তে পুলিশ এ বাড়ীতে হানা দিতে পারে। তাহলে কিছু একটা করবার আগেই যে আমাদের হেড-কোয়ার্টার ধ্বংস হয়ে যাবে! এ অবস্থায় বার বার সময় পিছিয়ে দেওয়া অপরাধ নয়? না অম্বিকাদা. আর সময় নেই। পরশু দিন, ঠিক পরশু দিনই করতে হবে কাজটা। এখন আপনারা মনস্থির করুন, কে কে যোগ দেবেন।"

আর কেউ কোন কথা বললেন না।* আমাকে বাধা দেওয়া নিরর্থক ভেবে সবাই চুপ করে রইলেন। মাস্টারদাও বরাবর নীরব ছিলেন। কিন্তু তাঁর নীরব সম্মতি আমি উপলব্ধি করতে পারছিলাম। আমার প্রস্তাব ও প্রোগ্রাম যে তিনি সমর্থন করছেন এবং আমার বক্তব্য শুনতে চাইছেন তা' বুঝতে পারলাম। যখন সকলের সামনে এটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল যে, পরশুদিন আর কেউ না গেলেও আমি একাই যাব রেলের টাকা আনতে, তখন প্রত্যেকে একই সমস্যার সম্মুখীন হল—আমার সঙ্গে যাবে কি দূরে থাকবে?

বোধ হয় সবাই ভাবছিল যে, আমি আর পনেরদিন পরে কাজটা করবার কথা চিন্তা করব। কাজেই সকলে চুপ করেই রইলেন।

নীরবতা ভঙ্গ করে আমিই আবার বললাম,

"মাস্টারদা, আপনি প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে কাজ করবার অনুমতি দিয়েছেন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতেও যদি এই নিষ্ক্রিয়তার বাধা দূর হয় সেও ভাল। এখন অস্ত্রগুলি ভাগ করে দিন।"

রাত তখন দশটা। মাস্টারদা একটুক্ষণ কি ভাবলেন। তারপর বললেন,

"আমি আজ রাতটা ভাল করে ভেবে দেখি। আগামীকাল চা-খাবার আগে তোদের অস্ত্র দেব। কা'কে কি দেব তা' আমি ঠিক করে নিই। আজ রাতে শুতে যা'।"

মাস্টারদার কাছ থেকে এই আশ্বাস পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। এতক্ষণ খোকার কথা আমি কাউকে বলিনি। এবার বললাম, "খোকা (দেবেন দে) কথা দিয়েছে আমার সঙ্গে ও থাকবে। আর কেউ তো এগিয়ে আসে নি। কাজেই

এখন দেখা যাচ্ছে শুধু আমি আর খোকা যাব। আমাদের আগামীকালের প্রোগ্রাম হবে এই রকম,

"খুব ভোরবেলা দুজনে বেরুব। রাত ন'টার আগে ফিরব না। যে ঘোড়ার গাড়িটায় করে রেলের টাকা যায় সেটা ভাল করে লক্ষ্য করব। তারপর ডি-আই-বি, অফিসার মনোরঞ্জনকে দেখে আসব। থলে, টর্চ, কবচ ইত্যাদি কয়েকটা দরকারী জিনিসপত্র কিনে সন্ধ্যেবেলা মায়ের সংগে একবার দেখা করতে যাব। অন্ধকার হলে একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে কোচ্-ম্যানকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাব, খোকাকে সে যেন গাড়ী চালান অভ্যাস করতে দেয়।

"এরপর পরশুদিন রেলরক্ষীদের ভয় দেখিয়ে ওদের গাড়ীটা নিয়েই উধাও হব।"

মানসিক দুশ্চিন্তায় প্রত্যেককেই ম্লান দেখাচ্ছিল। অফিসের সময় প্রখর দিবালোকে আমরা দু'জনে কি করে টাকা ছিনিয়ে নেব—তার ফল কি হবে, এটাই সকলের চিন্তার বিষয়। আর কিছু বলার নেই, হয় আমাদের সংগে যেতে হবে, নয় তো বসে থাকতে হবে—কোন মধ্যপন্থা নেই। সকলেই বুঝতে পারছিলেন এখন আর কিছু আলোচনা করা বৃথা।

সে রাত্রি অন্যদের কিভাবে কেটেছিল জানি না। আমি তো সারা রাত ধরে প্রোগ্রামটির খুঁটিনাটি সব দিক চিন্তা করে দেখছিলাম। কবচগুলি কিনব ওতে পটাসিয়াম সায়ানাইড ভরে হাতে বা কোমরে রাখব বলে। গাড়োয়ান হয়ে গাড়ি চালাবার জন্য এক প্রস্থ মুসলমানের বেশ যোগাড় করতে হবে। এই সব ভাবছিলাম। আর ভাবছিলাম কোন্ পথে গাড়ি চালাব, কোথায় গিয়ে নেমে যাব, নিরাপদ আশ্রয়ে কি করে পৌঁছাব, ইত্যাদি নানারকম ব্যবস্থার কথা।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল। নির্মলদা আবহাওয়াটা বেশ তরল রাখবার জন্য চেষ্টা করছিলেন। বাইরে থেকে সকলেই বেশ খুশির ভাব দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু মনে একটা ভার চেপেছিল। তার কারণ, সমবেত কর্ম-সূচীর পরিবর্তে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ব্যবস্থা হয়েছে। সকলেই এটাকে ভবিতব্য বলে মেনে নিয়ে মাস্টারদার কাছ থেকে অস্ত্র নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

আমাদের সুসজ্জিত অস্ত্রাগার—সেই আলমারীটির দরজা খোলা হল। মাস্টারদা একে একে সবাইকে রিভলভার বা পিস্তল বা মশার পিস্তল দিলেন। এগুলিতে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্তুজ ছিল নীচের তাকে। আমরা যার যার অস্ত্রের উপযোগী কার্তুজ নিয়ে সব ঠিক ঠাক করে আবার আলমারীতে রেখে দিলাম। রাইফেল এবং ব্রীচ্‌লোডার বন্দুকটি আলমারীতেই রইল, —হেড-কোয়ার্টার আক্রান্ত হলে ওগুলি সকলেই ব্যবহার করতে পারবে।

আমি পেলাম একটা ·৩৮০ বোরের কোল্ট রিভলভার আর খোকা পেল ঐ বোরেরই একটি ওয়েবলি টাইপ রিভলভার—তবে তাতে পাঁচটি চেম্বার।

প্রোগ্রাম মত আমরা দুজনেই সকালবেলা বেরিয়ে পড়লাম। প্রায় বেলা দশটা নাগাদ ঘোড়ার গাড়িটি টাকা নিয়ে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যায়। জায়গাটা রেলওয়ে হেড-অফিসের খুব কাছে, সিকি মাইলের মধ্যে। পাকা রাস্তাটি পাহাড়ের ঢাল দিয়ে নেমে গেছে। ত্রিশ গজ দক্ষিণে গিয়ে একটা 'T'

আকার ধারণ করেছে। "T"-এর মাথার ডান দিক গেছে ওয়ার্কশপের দিকে, বাঁদিক গেছে শহরের দিকে। ঢাল গড়িয়ে আসতে আসতে "T"-তে গিয়ে ডান-দিকে মোড় ঘোরবার ঠিক আগে আমরা অপেক্ষা করব। ওখানে গাড়ি থামিয়ে গাড়িটা নিয়ে শহরের দিকে আসব। একটু গিয়ে ছোট-রাস্তা ও অলি-গলি দিয়ে ঢুকে পলায়ন-পথ যথাসম্ভব নিরাপদ করব।

আগে থেকে জায়গাটি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করবার জন্য ৯-৩০ নাগাদ ওখানে পৌঁছলাম। শুধু স্থানটি নয় আশে-পাশের লোকজন, গাড়ির আরোহী, গাড়ির গতি, ইত্যাদিও খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

একটা সাইকেল নিয়ে আমরা গেলাম। ঠিক ছিল পরদিন ঐ সাইকেলটি নিয়ে আমি সরু রাস্তাটির ওপর যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেব যেন হঠাৎ মাঝপথে সাইকেলটির চেন খুলে যাওয়ায় মনোযোগ দিয়ে চেন লাগাচ্ছি। আমাকে দেখে গাড়ির গতি কমে যাবে। তখন সাইকেলটা ওখানে রেখে আমি ঘোড়ার লাগাম শক্ত করে ধরে ওর গতিরোধ করব। ইতিমধ্যে খোকা রিভল-ভার দেখিয়ে আরোহীদের নেমে যেতে বাধ্য করবে। সবাই নেমে গেলে সে বসবে চালকের আসনে। আমি টাকা নিয়ে ভিতরে থাকব। তারপর আমরা নির্দিষ্ট পথে যাত্রা করব।

পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছি দু'জনে। দশটা বাজবার একটু আগেই গাড়িটা এসে আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। যা যা আমাদের জানা দরকার সব লক্ষ্য করে দেখলাম। ঠিক সেই সময়ে পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে আসছিলেন মিঃ মোক্‌লাস রহমান। রেলওয়ে হেড অফিসে চাকরী করেন তিনি—অফিসে চলেছেন।

রহমান সাহেব প্রায় বছর দশেক আগে আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন; এখন স্টেশনের কাছে থাকেন। আমাদের পরিবারের সঙ্গে ওঁদের খুব বেশি হৃদ্যতা ছিল। এখন বাবা-মার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। দশ বছর আগে আমি অনেক ছোট ছিলাম, কাজেই আমার সঙ্গে অতটা পরিচয় নেই। উনি এই অসময়ে এই পথে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হয়ত অবাক হলেন। উনিও আমাকে চিনলেন, আমিও চিনলাম। কোন কথাবার্তা হল না। এই সামান্য সাক্ষাৎটুকু ভবিষ্যতে যে ইতিহাসের একটি অধ্যায় রচনা করবে তা' সেদিন আমাদের অজ্ঞাত ছিল।

এরপর দু'জনে গেলাম সতীদার ওখানে। দুপুরে খোকার ওখানে খাবার কথা। আমি গেলাম মায়ের কাছে। আমি মাকে কথা দিয়েছিলাম বলে সময় পেলেই পিসীমার বাড়ীতে মায়ের সামনে বসে খেতাম। বাবার বিরাগের জন্য বাড়ীতে খেতাম না। এইদিন, মায়ের মন পূর্বাহ্ণে কোন বিপদ আশঙ্কা করে-ছিল কিনা জানি না, মা নিয়মের ব্যতিক্রম করে আমাকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গেলেন। বাবার অজ্ঞাতে রান্নাঘরে মায়ের সঙ্গে বসে খেলাম।

যখন বেরিয়ে আসছি, মা প্রশ্ন করলেন রাত্রে এসে খাব কিনা। আমি উত্তর দিলাম, "ঠিক করে বলতে পারছি না। তবে না খেলেও একবার এসে দেখা করব তোমার সাথে।"

এখন সারা দিনের প্রোগ্রামের শেষাংশ বাকী। কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আর মাদুলি কিনে ফেললাম। তারপর চলে গেলাম "ফেয়ারী

হিলে।" এই পাহাড়ের ওপর আদালত-গৃহ। সেখানে আছে ডি-আই-বি ইন্সপেক্টর মনোরঞ্জনবাবু,—তার গতিবিধি লক্ষ্য করব। কোন সময় কোনস্থান থেকে গুলী করলে সবচেয়ে অব্যর্থ ভাবে কাজটি হাসিল হবে, আবার আমরা নির্বিঘ্নে পালাতে পারব তা' ভাল করে দেখে ঠিক করে রাখলাম দু'জনে।

বিকেলে আবার সতীদার বাড়ী—চায়ের আড্ডা। সারাদিন খুব ঘোরা-ঘুরি পরিশ্রম গেছে, এখন চাই একটু হাল্কা কথা, একটু স্বাভাবিক আবহাওয়া। কে কে ছিল সেদিন আমাদের সঙ্গে মনে নেই. লুজু (প্রেমানন্দের ভাই সুশোভন দত্ত), সুকুমার, প্রেমানন্দ, জিতেনদা, সতীদা আরও কে কে যেন ছিলেন। নানা কথা, নানা গল্প—হাসিঠাট্টা। বাবার টাকা নিয়ে আমার পালানোর কথা, আমেরিকায় যাবার পাশপোর্ট ইত্যাদি নিয়েও কথা উঠল। মোট কথা হাসি-গল্পে বিকেলটা বেশ আনন্দে কাটল। ভেতরে ভেতরে আগামী-কালের ভয়াবহ ব্যাপারটা যে আমাদের মাথায় আছে তা' বুঝতেই দিলাম না, বরং ঘটনা ঘটবার পরও যেন এরা ভাবতে না পারে যে সেটি আমাদের কাজ, সে বিষয়ে সচেষ্ট হ'লাম। অত সাংঘাতিক ব্যাপার মাথায় থাকলে কি কেউ আগের দিন অত হাসি-গল্পে সময় কাটাতে পারে!

সন্ধ্যেবেলা গেলাম মায়ের কাছে। এরকম সময়ে কখনো যাই না। পিসীমার বাড়ীতে গিয়ে মাকে ডেকে পাঠালাম। বেশি সময় হাতে নেই। মা আসতেই বললাম,

"মা, খুব তাড়াতাড়ি। এখনি যাচ্ছি। রাত্রে খেতে আসতে পারব না। আর মা, কিছুদিনের জন্য বাইরে যাব। ফিরে এলে দেখা হবে। এখন আসি...।"

মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে এত তাড়াতাড়ি চলে এলাম যে মা আর বেশি কিছু ভাববার বা বলবার সময় পেলেন না, শুধু বললেন, "যত শীঘ্র পার ফিরে এসো। ভাল থেকো। আমার আশীর্বাদ রইল।"

মা জানতেন তাঁর এই অবাধ্য ছেলেকে বারণ করলেও সে শুনবে না। কারণ জন্মভূমি-মায়ের ডাক তার কানে পৌঁছেছে—জন্মদায়িনী মায়ের কথা শোনবার তার সময় কোথায়! কোথায় যাব সে প্রশ্নেরও জবাব মিলবে না তা' মা জানতেন। তাই নিঃশব্দে আমার দেওয়া দুঃখের ভার বুকে চেপে তিনি আমাকে আশীর্বাদ করলেন। মায়ের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম,—ব্যথায় ভরা চোখ দুটি তুলে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। দ্রুত বেরিয়ে এলাম।

চলেছি সতীদার বাড়ীর উদ্দেশ্যে। বারবার মায়ের ব্যথাতুর চোখ দুটি আমার যাত্রা-পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু যে মন্ত্রে আজ দীক্ষা নিয়েছি সেখানে মায়ের স্নেহের অঞ্চল পৌঁছয় না। তাই বারবার মন থেকে ঝেড়ে ফেলছি ভাবাবেগের দৌর্বল্য।

খোকা তৈরি হয়ে ছিল। এবার দিনের শেষ কাজ। একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে দুজনে বেড়াতে বেরুলাম। গল্প করে করে কোচোয়ানের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেললাম। তারপর যেন খেলার ছলে খোকা কোচোয়ানের পাশে বসে গাড়ি চালান শিখতে চাইল। সেও খুব মজা পেয়ে খোকার

হাতে লাগাম ছেড়ে দিয়ে শেখাতে লাগল—কোন্ মন্ত্রে ঘোড়া থামবে, কোন্ মন্ত্রে জোরে দৌড়বে, আর কিভাবে ডাইনে বা বাঁয়ে তাদের চালান যাবে!

চালাতে চালাতে সেই নির্দিষ্ট পথে গাড়িটি এল। আগামীকাল যেখান থেকে খোকা গাড়িতে উঠে গাড়িটি চালাবে—যে পথে যাবে, সবই একবার রিহার্সাল দেওয়া হ'ল। আমাকে শহরে সকলে চেনে। কাজেই গাড়ি চালাবার ভার খোকার ওপর দেওয়া হয়েছিল। সে মুসলমান সেজে ঘোড়ার গাড়ি চালালে কেউ সন্দেহ করবে না, কারণ শহরে সে নবাগত।

কোচোয়ান আমাদের ছেলেমানুষি দেখে খুব কৌতুক অনুভব করছিল। চক বাজারের কাছে প্যারেড গ্রাউন্ডে নেমে আমরা ওকে ছেড়ে দিলাম। ভাড়া এবং প্রচুর বখশিশ্ পেয়ে ও খুব খুশি হয়ে চলে গেল।

প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে সুলুকবাহার বাড়ী পর্যন্ত তিন মাইল পথ, হাঁটতে হাঁটতে যখন পেঁছিলাম রাত তখন ন'টা। দুজনেই খুব ক্লান্ত। কিন্তু সেটা শুধু দেহের ক্লান্তি—মনে দুজনেরই খুব স্ফূর্তি, কারণ আজকের যা' যা' কাজ ছিল সব ভালভাবে সম্পন্ন হয়েছে। খুশির আমেজ নিয়ে বাড়ী ঢুকলাম দুজনে।

বাড়ী ঢুকে দেখি সেখানকার আবহাওয়া কেমন যেন বিষণ্ণ। মাস্টারদা তখনও ফেরেন নি; ৯-৩০টায় ফিরবার কথা। নির্মলদা, অম্বিকাদা, রাজেন দাস আর উপেন ভট্টাচার্য—বাকি এই চারজন যেন কেমন একটা বিষাদ আর হতাশার ভাব নিয়ে বসে আছেন। কারো স্নান খাওয়া হয় নি, সকলেই কেমন চুপচাপ মন-মরা। সারাদিন ধরে তাঁরা শুধু চিন্তা করেছেন, কি করবেন এখন? দু'জন সাথী চলে যাচ্ছে সক্রিয়ভাবে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে—তাদের বিপদের মুখে পাঠিয়ে অন্যরা কি নিশ্চল হ'য়ে বসে থাকবেন?

প্রথমে অম্বিকাদার সঙ্গে দেখা। আমাকে একা ডেকে নিয়ে অম্বিকাদা বললেন,—

"দেখ উপেন খুব নির্ভরযোগ্য। ও তোমার সঙ্গে কাল যেতে চায়। ওকে ফেলে যেও না। দেখবে ও সত্যি তোমার কাজে লাগবে,......।"

বাধা দিয়ে বললাম, "অম্বিকাদা, উপেন গেলে আমি তো খুব খুশি হব। আপনি ভাবছেন কেন যে আমি কাউকে ফেলে যাব? কেউ কোন কাজ করতে চাইলে আমার 'না' বলার অধিকার নেই। আমি তো চাই আমরা সকলেই কাজে নেমে পড়ি। বসে থেকে কি হবে? তবে একটা কথা, কালকেই যেতে হবে সবার এক সঙ্গে। দেরি করতে পারব না।"

আমাদের কথার মাঝখানে নির্মলদা এসে হাজির। আমার শেষ কথাটা শুনে নির্মলদা খুব খুশি হ'য়ে বললেন,

"আই এ না বাই। অত্তরে আইস্যি অত্তরে জাইয়ম্। জাওনের লাই য'ওত্তে ঠিক কইরগা ব্যাগরে লই চল। কাইলর অ্যাক্শন্ চল অত্তরে ঠিক করি লই।..." (এই তো ভাই। এক সাথে এসেছি এক সাথে যাব। যাবেই যখন ঠিক করেছ তখন সবাইকে নিয়ে চল, কালকের কাজের প্ল্যান চল এক সাথে বসে ঠিক করে নিই)।

রাজেন দাসও হাজির, "সিংহর বার্চ্চা তুই তো যাবিই। আঁরারেও লই চল্।" (সিংহের বাচ্চা তুই তো যাবিই। আমাদেরও নিয়ে চল্।

উপেন বরাবরই কম কথা বলত। সেও এসে যোগ দিয়েছে। মুখে না বললেও তার চোখের ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছে আমাদের প্রস্তাবে তার পূর্ণ সমর্থন। সেও যেতে চায় এই বিপদের মুখে বন্ধুদের সাথে সমান গৌরবের ভাগী হ'তে।

বাড়ীর আবহাওয়া যেন নিমেষের মধ্যে বদলে গেল। একটা অন্ধকার হতাশার ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল আলোর প্রবেশপথ রুদ্ধ করে, সাথীদের মনের আলো এসে তাকে তাড়িয়ে দিল ঘর থেকে। এখন সকলেই খুশি, সকলেই প্রাণবন্ত। কাল কি হবে, কোথায় কে থাকবে, তারই ছক্ রচনায় ব্যস্ত সকলে।

মাস্টারদা এলেন। আমরা সমবেতভাবে আমাদের নতুন সিদ্ধান্ত জানালাম তাঁকে। অচল অবস্থার অবসান ঘটেছে, সবাই কাজ করতে চায়, কেউ বসে থাকবে না।

আবার মিটিং-এ বসা হল। গতকাল রাত্রের সভার সংগে এই সভার আকাশ-পাতাল তফাৎ। গতকাল ছিল ভয়-ভাবনা দ্বিধা-সংশয়। আজ সব দ্বিধা কাটিয়ে শুধু কাজের কথা, বাস্তব কাজের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা।

সকলে মিলে যখন কাজটি করতে যাব, তখন একজনকে দলপতি হতে হবে, যার নির্দেশ অনুযায়ী কাজটি পরিচালিত হবে। কাজের সময় কখন কি পরিস্থিতি হয় বলা যায় না, প্রত্যেকে যদি তখন নিজের নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করতে যায় তবে বিশৃঙ্খলা ঘটবার সম্ভাবনা। মাস্টারদাই কথাটা তুললেন,

"কার্যক্ষেত্রে যাবার জন্য একজনকে পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে। আমাদের মধ্যে একজনকে নির্বাচিত করতে হবে। এ বিষয়ে কোন লজ্জা সংকোচ বা দ্বিধা রাখলে চলবে না। আপনারা কাকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলে মনে করেন তার নাম করুন। গরিষ্ঠ ভোটে তাকে নির্বাচিত করা হবে।"

মাস্টারদা কথা শেষ করতেই আমি নির্মলদার নাম প্রস্তাব করলাম। নির্মলদা সংগে সংগে আপত্তি তুললেন। তিনি সব সময়েই অতি বিনয়ী। নিজের সম্বন্ধে কখনও তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। তাই নানারকম ওজর আপত্তি দিয়ে নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন, এবং উল্টে আমার নাম প্রস্তাব করলেন। রাজেন দাস, খোকা এবং উপেনও আমার নাম বলল। অম্বিকাদা নানা যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝালেন যে আমারই নেতৃত্ব গ্রহণ করা উচিত। সর্বশেষে মাস্টারদাও ওঁদের প্রস্তাবের স্বপক্ষে মত দিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হল আগামী কালের কাজের পরিচালনার ভার আমিই গ্রহণ করব।

আমি মনে মনে বেশ সংকোচ অনুভব করছিলাম। আমি কাজটি একা করবার অধিকার চেয়েছিলাম এই জন্য যে, না হ'লে অন্য কেউ অগ্রসর হচ্ছিলেন না। এখন যখন সবাই যেতে প্রস্তুত তখন কাজটি পরিচালনা করবার জন্য আমার কোন আগ্রহ নেই। বিশেষতঃ নির্মলদা যেখানে উপস্থিত আছেন সেখানে আমি আদেশ দেব, এতে আমার সংকোচ হচ্ছিল।

যাই হোক, কাজের দায়িত্ব যখন সকলে আমাকে দিয়েছেন তখন তাকে আমি সানন্দে গ্রহণ করলাম। দলের নামে পবিত্র শপথ গ্রহণ করলাম যে কাজটি শেষ পর্যন্ত সফল করে তুলবই। প্রত্যেকের কাজের প্রোগ্রাম এই ভাবে নির্দিষ্ট করে দিলাম,

(১) সকাল আটটায় সকলে রওনা হব।

(২) ৯-৩০টার মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানটির কাছে গিয়ে পৌঁছব।

(৩) দশটা বাজবার দশ মিনিট আগে যে যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াব, যেমন,—

(ক) খোকা এবং আমি গাড়িটি দাঁড় করাবার জন্য যেখানে গাড়িটি মোড় ঘুরে ডান দিকে পাহাড়তলী রোডের দিকে অগ্রসর হবে, তার একটু আগে দাঁড়াব।

(খ) রাজেন আর উপেন দাঁড়াবে পাহাড়তলী রোডের ওপর, মোড় থেকে কয়েক গজ এগিয়ে।

(গ) নির্মলদা এমন একটা জায়গায় দাঁড়াবেন যেখান থেকে এক নজরে সবটা দেখা যায়।

(৪) আমরা দু'জনে যেই গাড়িটা থামাব, অমনি রাজেন আর উপেন এসে ঐ নির্দিষ্ট জায়গাটির দু'পাশে দাঁড়িয়ে রাস্তার দুই প্রান্ত পাহারা দেবে।

(৫) নির্মলদা এগিয়ে এসে চারদিক লক্ষ্য রাখবেন।

(৬) আমরা রিভলভার উঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে পাঁচজন আরোহীকে (দুজন পে ক্লার্ক, দুজন পিওন, একজন কোচম্যান) গাড়ি থেকে নামতে বাধ্য করব।

(৭) তারপর ঐ গাড়িটা করে আমরা চলে যাব।

এইভাবে ছক করে সমস্ত প্ল্যানটা সবাইকে বুঝিয়ে দিলাম। আর বললাম যে মাস্টারদা ঐ সময় যথারীতি তাঁর স্কুলে (ওরিয়েণ্টাল হাই স্কুল) থাকবেন। অম্বিকাদা থাকবেন হেড কোয়ার্টারে। আমরা যদি টাকা নিয়ে নিরাপদে সরে পড়তে পারি তবে হেড কোয়ার্টারে চলে আসব। ওখান থেকে অম্বিকাদা টাকা নিয়ে গ্রামের ভেতর গিয়ে নিরাপদ জায়গায় রেখে দেবেন।

যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, যদি ঠিকমত কাজটি না হয় যদি বিপদ আসে, তবে প্রত্যেকে পালাতে চেষ্টা করব। দরকার হ'লে একাই পালাব। তারপর রাত্রে কোন এক সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে এসে মিলিত হব। এজন্য পর পর কয়েকদিন, নির্দিষ্ট স্থান এবং নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে দেওয়া হল।

এই সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে যখন ঘুমোতে গেলাম রাত তখন বারোটা বেজে গেছে। অম্বিকাদা আমার পাশে শুয়ে কানে কানে বললেন,

"আমি কালকের জন্য নির্মলবাবুর নাম প্রস্তাব না করে তোমার নাম করলাম কেন জান? কারণ, রাজেনের প্রতি নির্মলবাবুর বেশ দুর্বলতা আছে। উনি নেতা হলে রাজেনকে বাদ দিতে দ্বিধা করবেন। আমি ভেবেছিলাম তুমি কঠোর হয়ে রাজেনকে বাদ দিয়ে দেবে। রাজেনের কথা কি তুমি জান না? ওর কি যোগ্যতা আছে? সব সময়ে ইতস্তত করেছে। তুমি কি জান না, সন্তোষদার গ্রুপের সঙ্গে একটা কাজে যাবার কথা ছিল ওর,-শেষ মুহূর্তে আক্রমণের স্থান থেকে ও পিছিয়ে এসেছিল?"

অম্বিকাদা ভয় করছিলেন এবারও হয়ত রাজেন শেষ মুহূর্তে কিছু একটা বিভ্রাট ঘটাবে।

আমি বললাম, "অম্বিকাদা, রাজেনের কথা আমি সবই জানি। তবে আমার মনে হয় ও আজকাল অনেক বদলে'গেছে। আমি সব জেনে-শুনেই কয়েকটা কারণে রাজেনকে কাজে নিয়েছি, প্রথমত ও এখন আগের চেয়ে অনেক

শক্ত হয়েছে. দ্বিতীয়ত ওকে কোন একটা কাজের মধ্য দিয়ে কার্যকরী ট্রেনিং দিতে হবে। আর তৃতীয়ত আমি চাই এই ষড়যন্ত্র এবং কাজের সংগে ও নিজে জড়িত থাকুক।"

রাজেন সম্বন্ধে আমার পরিষ্কার অভিমত শুনে অম্বিকাদা নিশ্চিন্ত হ'লেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম দুজনে।

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯২৩। সকাল হয়েছে। একে একে সকলে ঘুম থেকে উঠলাম। আজকের নিশ্চিত নির্দেশ কেউ হেড কোয়ার্টার থেকে একা বেরবে না। পাঁচজন আমরা ওখানে যাব, দু'দলে ভাগ হ'য়ে এক দলে দু'জন, অন্য দলে তিনজন। মাস্টারদা আর অম্বিকাদা এর মধ্যে থাকবেন না।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই নির্মলদা এসে আমাকে বললেন. তিনি বাড়ী যেতে চান। বললেন, "তোমাদের সব জিনিসপত্র ঠিক আছে। আমার একটা থলে, টর্চ আর ঘড়ি চাই,—এ ছাড়া একজোড়া রবার সোলের জুতো আর মোজা দরকার। একবার বাড়ী গিয়ে ওগুলো কিনে নিয়ে আসি।"

অন্য কেউ একা বাইরে যাবার 'অনুমতি' চাইলে আমি তৎক্ষণাৎ 'না' বলে দিতাম। কিন্তু নির্মলদাকে 'না' বলতে আমার সঙ্কোচ হ'ল। এইরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম কখনই হওয়া উচিত নয় -কে বলতে পারে সে অনুপস্থিত থাকবে না কাজের সময় বা তার দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতার কারণ নেই ! নির্মলদা সম্বন্ধে সে প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু আর একটা ভয় আছে। সময় সম্বন্ধে নির্মলদার অনবধানতা একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। কাজেই এই ক্ষেত্রে যদি সময়মত না আসেন তবে অসুবিধে হবে। সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম,

"নির্মলদা আপনি নিশ্চয়ই যেতে পারেন। কিন্তু ঠিক ৯-৪৫-এ আপনার জায়গায় এসে পেঁছিতে পারবেন? যদি সন্দেহ থাকে তবে কিন্তু যাবেন না।"

নির্মলদা হেসে বললেন. "নারে ভাই. না। অনেক আগেই ওখানে পেঁছে যাব। ৯টা থেকে আমাকে ওখানে দেখতে পাবে।"

—"বারে. আপনি ৯টা থেকে ওখানে থাকবেন নাকি? মাপ করবেন, আপনাকে ৯টার সময় ওখানে দেখতে চাই না. ঠিক ৯-৪৫-এ দেখতে চাই।"

-"হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ৯-৪৫-এ আমি আমার পোস্টে হাজির থাকব।"

আমি নিজে পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেও নির্মলদাকে এমন একটা জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম যে সেখান থেকে তিনি সমস্ত ঘটনাটি লক্ষ্য করবার সুযোগ পাবেন এবং প্রয়োজনমত নির্দেশ দিতে পারবেন। আমরা কাজটি করে যাব, বিশৃঙখলা কিছু হলে উনি সেটার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু নির্মলদা যদি ঠিক সময়ে হাজির না হন তবে আমাদের ব্যবস্থার ত্রুটি থেকে যাবে।

সাতটার সময় নির্মলদা সুলুকবাহার থেকে বের হলেন। আমি আর খোকা এবং রাজেন ও উপেন—দু'দলে ভাগ হয়ে, আটটার মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমার সংগে একটা পুরনো সাইকেল। একটু পরে মাস্টারদাও বেরিয়ে পড়বেন স্কুলের উদ্দেশ্যে। অম্বিকাদা আর মাস্টারদা আমাদের শুভকামনা জানালেন।•

ঠিক ৯-৪৫-এ আমি আর খোকা এসে দাঁড়িয়েছি নির্দিষ্ট জায়গাটিতে।

রাজেন আর উপেনও এসে গেছে। কিন্তু নির্মলদা কোথায়? এখনো আসেন নি। ৯-৪৫ বেজে গেল, নির্মলদার দেখা নেই। এখনি শব্দ করতে করতে ঘোড়ার গাড়িটা এসে পড়বে—আর সময় নেই।

না, নির্মলদা এলেন না। নির্দিষ্ট সময়ের পর দশ মিনিট হয়ে গেল। চিরকালের 'লেট' নির্মলদা এখন এই কাজের সময়েও 'লেট'! কি করব তবে? আজ কাজটা বন্ধ থাকবে? না, তা' হতে পারে না, কোনমতেই না।

মনে পড়ল পরোইকোরা ডাকাতিতে যাবার সময়েও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। দলের মধ্যে সবচেয়ে বলশালী ও বৃহদাকৃতি যে সাথী সে শেষ পর্যন্ত আসে নি। তখনো কথা হয়েছিল কাজটা হবে কিনা। সেই সময়েও জোর দিয়ে আমাদের কাউকে না কাউকে বলতে হয়েছিল, একজনের অনুপস্থিতিতে এত বড় একটা আয়োজন ব্যর্থ করে দেওয়া হবে না। আজও নির্মলদার অভাবে কাজটা পণ্ড হ'তে দেব না। আমি আর খোকাই তো করব ঠিক করেছিলাম, এখন তো তবু সঙ্গে রাজেন আর উপেন আছে।

এই ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন শুধু মনে জাগে- যে এল না সে পুলিশে খবর দিল কি না। কিন্তু আগেই বলেছি নির্মলদা সম্বন্ধে ও প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং পাঁচজনের মধ্যে একজন না এলে যে কাজটা হবে না, এ হ'তে পারে না। ঠিক এই মনোভাব নিয়ে খোকার গায়ে আগুন লেগে যাওয়ার পরও যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী টেগার্টকে গোপীনাথ আক্রমণ করত আর আয়োজনটি বাতিল করা না হত তবে হয়ত শেষ পর্যন্ত টেগার্ট অক্ষত দেহে ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে পেন্‌সন্‌ ভোগ করতে পারত না।

অনেকের মনে প্রশ্ন উঠবে নির্মলদা সম্বন্ধে এই সামান্য বিচ্যুতির কথা উল্লেখ না করলে কি হ'ত? নির্মলদা আজ এত বড় যে এই সামান্য বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করে তাঁকে কোনমতেই ছোট করা যায় না। যে নির্মলদাকে ছোট করে দেখাতে চাইবে সে নিজেই বিপ্লবীদের কাছে অতি ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন হবে। এই সামান্য জ্ঞানটুকু থাকা সত্ত্বেও আমি এই বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করে বিপ্লবী যুবকদের বলতে চাইছি যে অত বড় বিপ্লবী নেতাও punctuality সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন না। সামান্য বিচ্যুতিও পরিকল্পনাকে নষ্ট করতে পারে। এই ছোট ছোট অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং সেই সব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছি পরবর্তী যুগে—যখন ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম শহর দখল করি।

দশটা বাজতে আর দেরি নেই। কি বিপদ! আবার সেই মক্‌লেস্‌ রহমান? তাঁর আর কি দোষ? তাঁর অফিস যাবার পথে যদি আমি দাঁড়িয়ে থাকি তবে তিনি তাকিয়ে দেখবেন না, এ তো হ'তে পারে না। আজকেও কোন কথা হ'ল না। তিনি এ. বি. রেলওয়ের হেড অফিসের দিকে এগিয়ে গেলেন।

নির্মলদার দেখা নেই, আর দেখা হ'ল কিনা রহমান সাহেবের সাথে! এই অবস্থায় দশটা বাজতেই দেখা গেল সেই ঘোড়ার গাড়িটা আসছে। পাহাড়ের ঢালু দিয়ে দ্রুত নেমে আসছে গাড়িটা। সাইকেলটা নিয়ে যে রাস্তা আগলে দাঁড়াব তার আর সময় নেই। কি করি? সাইকেলটাকে এক ধাক্কায় রাস্তায় ফেলে দিয়ে ডানহাতে রিভলভারটা চেপে ধরে এক লাফে রাস্তার মাঝখানে

দাঁড়ালাম। রিভলভারটা আছে কোটের আড়ালে কিন্তু তার ট্রিগারে আমার আঙ্‌ল স্থির হয়ে রয়েছে।

পাঁচ গজের মধ্যে গাড়িটা এসে পড়তেই এক ঝট্‌কায় রিভলভারটা টেনে এনে কোচম্যানের ব্‌ক লক্ষ্য করে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে আদেশ দিলাম—"হেই! গাড়ি থামাও! হেই মিয়া! গাড়ি থামা!"

দ্‌'ধারের পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল সেই আওয়াজ—"গাড়ি থামা! গাড়ি থামা!"

কোচম্যান আর আরোহীরা আমার হাতে উদ্যত রিভলভার দেখে বিপদের গ্‌র্‌ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে। আকস্মিক আদেশে বিহ্বল হ'য়ে সে লাগামটা টেনে ধরল। পরক্ষণেই সে সমস্ত অবস্থাটা অন্‌মান করতে পারল। তার সঙ্গে রয়েছে প্রচুর টাকা—রেলের অর্থ। সামনে ডাকাত, রিভলভার উঁচিয়ে আছে। আত্মরক্ষা না করতে পারলে সম্‌হ বিপদ।

সঙ্গে সঙ্গে কোচম্যান গায়ের জোরে চাব্‌ক বসিয়ে দিল ঘোড়ার পিঠে। লাফিয়ে উঠল ঘোড়া প্রাণপণে ছ্‌ট দিল সামনের দিকে।

এমন যে ঘটতে পারে তা' ভাবতেও পারি নি। এখন কোচম্যানকে গ্‌লী করা ছাড়া গাড়ি থামাবার কোন উপায় নেই। জানি না কেন আমি সেদিন কোচম্যানকে গ্‌লী করি নি। ঐট্‌কু সময়ের মধ্যে ভেবে-চিন্তে ব্‌দ্ধি করে কিছ্‌ করবার উপায় ছিল না। হয়ত আমার অবচেতন মনে এই দরিদ্র দেশ-বাসীর প্রতি সমবেদনা ছিল বলেই বিপদের ম্‌খেও আমার ব্‌দ্ধিভ্রংশ হল না। ঢাল্‌তে গড়িয়ে চলেছে গাড়ি। প্রাণপণ বলে লাফিয়ে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলাম। প্রচণ্ড বেগে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে লাগাম ধরে ঘোড়া দ্‌টির ঘাড় নামিয়ে দিলাম গাড়ির গতি র্‌দ্ধ হল। অত জোর কোথা থেকে এসেছিল জানি না, তবে ঐ জোরট্‌কু না দিতে পারলে কোচম্যানকে সেদিন আমাদের হাতে প্রাণ দিতে হত।

গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে খোকা এসে রিভলভার দেখিয়ে সবাইকে আদেশ দিল এক্ষ্‌ণি গাড়ি থেকে নেমে পড়তে। আমিও বজ্রগম্ভীর গলায় অন্‌র্‌প আদেশ দিলাম। ভীতি-বিহ্বল আরোহীরা একে একে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। কোচম্যানকে তার আসন থেকে টেনে নামান হল। খোকা উঠে পড়ল তার আসনে।

হেড্‌ পে-ক্লার্ক নিকুঞ্জবাব্‌ তখনো টাকার আশা ছাড়েন নি। পিওনকে বলছেন, "যা টাকাগ্‌লি নাবিয়ে নিয়ে আয়।"

পিওনও তাঁর কথা শ্‌নে এক পা এগিয়েছে। আমি তখন গাড়িতে উঠে পড়েছি, লাগাম খোকার হাতে। রিভলভারটা তাঁদের দিকে তুলে ধরে বললাম,

"যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন থাকুন। নড়বেন না। আমার আদেশ অমান্য করলে গ্‌লী করব।"

ব্যাপার ব্‌ঝে আর কেউ এগোতে সাহস করলেন না। যতক্ষণ না সামনের বাঁকে গিয়ে বাঁ-দিকে মোড় ঘ্‌রলাম ততক্ষণ আমি রিভলভারের ম্‌খ তাঁদের দিক থেকে ফেরালাম না।

সবটা ঘটনা ঘটতে ত্রিশ সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগে নি। রাজেন আর উপেন এসে পেঁছবার আগেই আমরা টাকাশ্‌দ্ধ গাড়ি নিয়ে রওনা হয়েছি।

খোকা গাড়ি চালিয়ে দিয়েছে, থামাবার উপায় নেই। চলন্ত গাড়িতেই একে একে লাফিয়ে উঠে পড়ল দুজনে। রাস্তায় লোকজন হাঁ করে তাকিয়ে রইল। এ. বি. রেলওয়ের হেড অফিসের পথে যে সব কর্মচারীরা চলেছিল তারা তখনো ভাল করে বুঝতেই পারে নি যে কি ঘটে গেল।

তখনকার দিনে চট্টগ্রাম শহরে এরকম একটা ঘটনা ঘটানো যে সম্ভব হয়েছিল তার কতকগুলি কারণ ছিল। এটা ১৯২৩ সালের কথা। শহরের প্রধান যান তখন ঘোড়ার গাড়ি। চট্টগ্রামে ঘোড়ার গাড়ি মানে সবই ফিটন্ ও পাল্কি গাড়ি। ট্যাক্সি বোধ হয় সারা শহরে ছ'খানাও ছিল না। বিভাগীয় প্রধান শহর এবং বন্দর বলে ধনী লোকের বাস। তবু প্রাইভেট গাড়ি পঞ্চাশ-খানার বেশি ছিল না। ঐ সময় ঠিক ঐ রাস্তায় আধ মিনিটের মধ্যে একটা প্রাইভেট গাড়ি এসে উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল। কাজেই অনুসরণ-কারী দলের আশঙ্কা আমাদের বিশেষ ছিল না বললেই হয়।

চট্টগ্রামের শান্ত-নিরীহ জীবনে অভ্যস্ত নাগরিকেরা কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি যে প্রকাশ্য দিবালোকে বেলা দশটার সময় যখন পথে অফিস এবং স্কুল-কলেজগামী লোকের ভিড়, তখন রেলের টাকা সমেত ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাবার সাহস কারও হতে পারে। সেজন্যই সকলে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। কেউ কিছু বুঝতে পারার আগেই আমরা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলাম।

পথের যে অংশটি আমরা বেছে নিয়েছিলাম সেখানে শহরের কেন্দ্রস্থলের মত অতটা লোক চলাচল বা গাড়ি-ঘোড়া যাতায়াত করে না। যদি কোন ট্যাক্সি বা প্রাইভেট গাড়ি ঘটনাচক্রে ঐটুকু সময়ের মধ্যে এসে পড়ত তাহলেও একথা নিশ্চিত যে তার আরোহীদের কারও কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকত না। আমাদের পিস্তল, রিভলভারের ভয় দেখিয়ে সহজেই তাদের নিরস্ত করতে পারতাম।

আমাদের এই পরিকল্পনাটির মধ্যে হয়ত অনেক দোষ-ত্রুটি ছিল, কারণ এ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা ছিল আমাদের খুবই কম। কিন্তু তখনকার দিনে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে দেখা যায় যে সে যুগে এরকম সাহসের সঙ্গে কাজ না করলে চলত না। সেদিক থেকে আমাদের ত্রুটি ছিল না। পুরো আড়াই মাইল শহরের বিভিন্ন পথ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এলাম আমরা। কেউ বাধা দিল না। তারপর শহরের উত্তর প্রান্তে সরকারী কলেজের কাছে একটা পাহাড়ের আড়ালে, যেখানে তিনটে রাস্তা এক সাথে মিশেছে সেখানে গাড়িটা ফেলে রাখলাম। খোকা কোচম্যানের আসন থেকে নেমে লাগাম ধরে ঘোড়া দুটোর মুখ এমনভাবে ঘুরিয়ে রাখল যেন আমাদের গন্তব্য দিক সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। ওখানে নির্জনে গাড়িটি মালিক-বিহীন হ'য়ে পড়ে রইল। আমরা টাকার থলেগুলো নিয়ে হেড কোয়ার্টারের দিকে রওনা হলাম।

তখনও জানি না কত টাকা আমরা পেয়েছি। চারটে থলে—দুটোতে নোট, আর দুটো কাঁচা টাকা আর খুচরাতে ভর্তি। কাঁচা টাকার থলেটা বেজায় ভারী। কিন্তু ফেলে যাওয়া চলবে না। যা' পাই তাই লাভ, তাই দিয়েই হয়ত একটা পিস্তল, কিংবা কিছু গুলী-বারুদ কিনতে পারব। যতই ভারী হোক থলে, যতই কষ্ট হোক বইতে—সুলুকবাহার পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে।

পথে কয়েকবার বাধা পেতে হল। খোকার হাতের ব্যাগটা কয়েকবার রাস্তায় পড়ে গিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একজন পথিক ঠাট্টা করে বলল,

"বাউ বউৎ টেঁয়া না? আঁরারে কিছু দি জাতক এ না।" (অনেক টাকা বাবু। আমাদের কিছু দিয়ে যান না)।

আমাদের এই রেলের টাকা অপহরণের মামলাতে এই লোকটি সাক্ষ্য দিয়েছিল। কিন্তু আমাকে সে সনাক্ত করে নি। খোকা, রাজেন আর উপেনকে বন্দী করা সম্ভব হয় নি, সুতরাং তারা এ মামলার আসামী ছিল না। এই লোকটি হয় তো খোকাকে দেখলে চিনতে পারত।

সুলুকবাহার বাড়ীতে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন অম্বিকাদা। আমাদের কাছে ঘটনাটি বিস্তারিত শুনে এবং অপহৃত টাকার থলে পেয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। বার বার আমাদের প্রশংসা করতে লাগলেন, কারণ আমরা একটাও গুলী না ছুঁড়ে, এমন কি একটা ফাঁকা আওয়াজও না করে এত বড় একটা কাজ হাসিল করেছি।

রিভলভারের গুলী খরচ না করে কেবলমাত্র ভয় দেখিয়ে কাজ আদায়ের উপায় আমি শিখেছিলাম অনুকূলদার কাছে, যখন তিনি তাঁদের সময়কার নানারকম রাজনৈতিক ডাকাতির গল্প করতেন। যদি কোন একজন বা কোন একদল লোকের দিকে রিভলভার তাক করে কঠিন স্বরে ভয় দেখান যায় তবে তারা প্রত্যেকেই নিশ্চল হয়ে যায়। প্রত্যেকেই ভাবে নড়াচড়া করলেই আমাকে গুলী করবে, তাই প্রত্যেকে শান্ত হয়ে আদেশ পালন করে। কিন্তু যদি সত্যি সত্যি গুলী ছোঁড়া হয় তখন লোকে ভয় পেয়ে ইতস্তত ছোটাছুটি করে, আবার কেউ কেউ প্রাণ বাঁচাবার জন্যে উল্টে এসে আক্রমণ করে। তখন অবস্থা জটিল হয়ে দাঁড়ায়। অস্ত্র হাতে নিয়ে কোন কাজ করতে গেলে জনসাধারণকে বশীভূত করবার এই মনস্তত্ত্বমূলক প্রক্রিয়া আমি আরও প্রয়োগ করেছিলাম। আজকে এই কাজে তা' ব্যবহার করে সুফল পেলাম। সাত বছর পরে, ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সময় এই উপায় অনুসরণ করে অম্বিকাদার নেতৃত্বে টেলিফোন অফিস ধ্বংস করা হয়েছিল। সেদিন একটি পিস্তলের একটি গুলীও খরচ করা হয় নি।

তাড়াতাড়ি টাকাগুলি গুণে ফেললাম। দশ টাকা, পাঁচ টাকা ও এক টাকার নোট বাণ্ডিল করা রয়েছে। সব মিলে পনেরো হাজার। রুপোর টাকা এবং খুচরো মিলে দু' হাজার হবে—মোট সতেরো হাজার টাকা।

নোটগুলি সব সুটকেশে ভরে ফেলা হল। অম্বিকাদা সুটকেশ নিয়ে চলে গেলেন, সঙ্গে গেল উপেন। বাকী দু' হাজার খুচরো টাকা হেড কোয়ার্টারে আমাদের কাছে রইল।

কাজটা নির্বিঘ্নে হ'লেও পুলিশ তো আর চুপ করে বসে থাকবে না! সূত্র ধরে তারা যে কোন সময়ে হেড কোয়ার্টারে এসে হাজির হতে পারে। বিশেষতঃ এখানে এই মুসলমান পল্লীতে একদল হিন্দু যুবক একটা পোড়ো বাড়ী ভাড়া করে রয়েছে, কাজেই খুঁজে পেতে তাদের দেরি হবে না।

আমরা সম্মুখ যুদ্ধের জন্য বরাবরই প্রস্তুত ছিলাম। এখন মনে হ'ল সে শুভক্ষণের আর দেরি নেই। পরিত্যক্ত ঘোড়ার গাড়িটা বার করতে বেশি

দেরি হবে না পুলিশের। তারপর কাছাকাছি লোকজন, দোকানদারদের জিজ্ঞাসা করলে সহজেই জানতে পারবে টাকা ভরা থলি হাতে চারজন যুবক কোন্ পথে গেছে। বার বার হাত থেকে ঝন্ ঝন্ শব্দ করে থলি পড়ে যাওয়ায় লোকেদের ভুল করবার সম্ভাবনাও বেশি নেই। অতএব অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এসে পড়বে এই এলাকায়। তারপর সুলুকবাহার বাড়ীটির রহস্য তাদের কাছে আর অজ্ঞাত থাকবে না।

এখন কি কর্তব্য? আবার কি দ্বিতীয় বালাসোর? আমাদের বিপ্লবী চিন্তা তো তখন তার চেয়ে বেশিদূর অগ্রসর হয় নি। যতীন মুখার্জী এবং তার সঙ্গীদের অপূর্ব বীরত্বপূর্ণ কাহিনী শুনে শুনে আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি কবে এই মহাদিন আসবে আমাদের জীবনে. কবে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব! আর আমাদের আত্মদানের ফলে কবে জেগে উঠবে সারা দেশের বিপ্লবী তরুণরা কবে তারা দেশের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে নতুন যুগের নতুন ইতিহাস রচনা করবে!

আমরা সুলুকবাহারে পেঁাছবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অম্বিকাদা আর উপেন বেরিয়ে গেল। আমরা রইলাম শুধু তিনজন,—খোকা, রাজেন আর আমি। এখন আমাদের আসন্ন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে। শত্রুর আগমন-পথ লক্ষ্য করে দূর পাল্লার অস্ত্র রাইফেল, বন্দুক নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। কাজেই একতলায় আমাদের ব্যবহৃত ঘরগুলিতে থাকা চলবে না, যেতে হবে দোতলার বড় ঘরটিতে।

দোতলার বড় ঘরটি এতদিন পরিত্যক্ত ছিল। বহুদিন এ বাড়িতে কেউ বাস করে নি। কোন্ যুগ থেকে ময়লা জমে জমে পুরু ধুলোর আস্তরণ পড়ে গেছে। তার ওপর পাখীর বাসা, তাদের দেহ-নিঃসৃত ময়লা, দুর্গন্ধে ঘরে ঢোকাই অসম্ভব। কোন দিন কল্পনাও করি নি যে এ ঘরে আমাদের আসতে হবে। পরিষ্কার করা অসম্ভব বলে সে চেষ্টাও করি নি। কিন্তু আজ আসন্ন যুদ্ধের মুখে দাঁড়িয়ে সে সব কোন কথাই আমাদের মনে রইল না। দিব্যি ওই ময়লার ওপরেই দুটো মাদুর বিছিয়ে তিনজনে বসে পড়লাম। সঙ্গে আছে রিভলভার ছাড়াও রাইফেল এবং ব্রীচলোডার বন্দুক। চোখ বাইরে পথের দিকে নিবদ্ধ। শত্রু-সৈন্য দেখতে পেলেই গুলী ছুঁড়ব।

এক ঘন্টা কেটে গেল, দু' ঘন্টা কেটে গেল—শত্রুর দেখা নেই। শুধু চোখে ভাসছে চারদিকের নোংরা মেজে, দেওয়াল ও ছাদ, আর নাকে আসছে অসহ্য দুর্গন্ধ। তখন তাড়াতাড়িতে পরিষ্কার করে নেবার সময় হয় নি। এখন তাকিয়ে দেখছি এসব পরিষ্কার করবার উপায় নেই। কিন্তু কী আশ্চর্য, এর জন্য একটুও বিরক্ত বোধ করছি না, কোন অসুবিধেই যেন হচ্ছে না! মন পড়ে আছে আসন্ন জীবন-পণ সংগ্রামের দিকে, আশায় আশঙ্কায় মন অস্থির হয়ে আছে—পার্থিব খুটিনাটির দিকে নজর দেবার সময় নেই।

তখনও খাওয়া-দাওয়া হয় নি। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যাচ্ছে। দুপুরের আলো বিকেলে গড়ালো। মাথার ওপর থেকে সূর্য নেমে গেল, পশ্চিমের জানলা দিয়ে রোদ এসে ঢুকল ঘরে। আরও খানিকক্ষণ পরে—শুধু গাছগুলির মাথায় চিকচিক করছে আলো, ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল। আমরা তিনজন বসে আছি একভাবে প্রস্তুত হ'য়ে। দূর পাল্লার মুশার

পিস্তল, রাইফেল, বন্দুক নিয়ে জানালার আড়ালে, থামের আড়ালে স্থির হ'য়ে আছি। কিন্তু পুলিশের দেখা নেই। ওরা কি এখনো আমাদের গাঁটবাঁধ জানতে পারে নি? না, চট্টগ্রামের পুলিশ-ফোর্স এতই অলস যে আমাদের অনায়াসে পালাবার সময় দিচ্ছে? খুবই আশ্চর্য লাগছে ভাবতে যে কেন পুলিশ আমাদের সন্ধান পায় নি!

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ এক পরিচিত মূর্তি এগিয়ে এল বাড়ীর দিকে··· মাস্টারদা আসছেন। সারা দিন তিনি স্কুলে ছিলেন। নানারকমে অতি-রঞ্জিত হ'য়ে ঘটনার বিবরণ ছড়িয়ে পড়েছে সারা শহরে। স্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্রদের এক একজনের কাছে এক একরকম কথা শুনেছেন মাস্টারদা। যে যা বলছে তার ভেতর থেকে তিনি শুধু জানতে চেয়েছেন কেউ আহত, নিহত বা বন্দী হয়েছে কিনা!

আসল ঘটনা কেউই জানে না। সবই শোনা কথা। পরিষ্কার দিনের আলোয় অফিসের সময় এই ঘটনা শহরে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে, নানা জনে নানা কথা বলছে। কিন্তু মাস্টারদা যা জানতে চান, যা শুনবার জন্য তাঁর সমগ্র অন্তর উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে, যা না জেনে তিনি শান্তি পাচ্ছেন না—সেই প্রশ্নের উত্তর তিনি কারও কাছ থেকে পাচ্ছেন না। অথচ এই অবান্তর প্রশ্ন বার বার করলে লোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে।

শেষ পর্যন্ত স্থির থাকতে না পেরে একজন সংবাদ-বাহক ছাত্রকে ক্লাসের মধ্যেই মাস্টারদা প্রশ্ন করলেন,

"দিনের আলোয় সকলের চোখের সামনে দিয়ে ওরা গাড়িটা নিয়ে চলে গেল? কেউ তাদের অনুসরণ করল না, কেউ তাদের একজনকেও ধরতে পারল না, এ কি হ'তে পারে? পুলিশ কি করছিল?"

—"কেউ বুঝতেই পারে নি স্যার, কি হ'য়ে গেল। কোন গুলীর আওয়াজ নয়, কিচ্ছু নয়। লোকেরা ভাবতেই পারে নি যে ঝড়ের মত এসে ডাকাতেরা গাড়ি নিয়ে একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। ঠিক যেন ম্যাজিক!"

—"কী আশ্চর্য? তখন অফিস-টাইম। এ. বি. রেলওয়ের জেনারেল অফিসের দিকে তখন কত সাহেব অফিসার নিজেদের গাড়ি করে যায়। কেউ দেখতে পেল না? ঘোড়ার গাড়ি তো ধীরে ধীরে চলে, মোটরে করে সেটাকে ধরতে পারল না?"

ক্লাসে তখন দারুণ উত্তেজনা। আর একজন ছাত্র উত্তর দিল,

"একেবারে ম্যাজিক স্যার! রিভলভার ছিল যে তাদের সঙ্গে। কি করে পেছনে যাবে? মেরে ফেলবে সবাইকে!"

এবার মাস্টারদা খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। আর বেশি আলোচনা করলে সন্দেহ হ'তে পারে ভেবে তাড়াতাড়ি বললেন,

"আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন পড়ায় মন দাও। আমাদের এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি দরকার? পুলিশই তাদের ধরবে।......হ্যাঁ, আচ্ছা, তুমি—পড়া হয়েছে?......।"

ক্লাসে পড়াতে শুরু করলেও মাস্টারদার মন পড়ে আছে অন্যত্র। ভেবেছিলেন একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবেন স্কুল থেকে। কিন্তু কোন

অস্বাভাবিক কিছু দেখালেই সন্দেহ হবার সম্ভাবনা। সারাদিন নিদারুণ অস্বস্তিতে কেটেছে তাঁর। স্কুলের ছুটির পর এখানে চলে এসেছেন।

মাস্টারদা এসে আমাদের সব খবর শুনলেন। একেবারে প্ল্যান মত সবটা ঘটেছে। কী আনন্দের বিষয়! মাস্টারদা এই 'বিরাট' সাফল্যে একেবারে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন। বিশেষতঃ কোন পক্ষে কেউ হতাহত হয় নি, রিভলভারের একটি গুলীও খরচ হয় নি এবং আমরা পেছনে কোন চিহ্ন না রেখে সমস্ত টাকা নিয়ে চলে আসতে পেরেছি—এই অভূতপূর্ব কৃতিত্বের জন্য মাস্টারদা বার বার আমাদের অভিনন্দন জানাতে লাগলেন।

কিন্তু নির্মলদার কি হ'ল? মাস্টারদাও তাঁর কোন খবর জানেন না। দশটা পর্যন্ত নির্মলদা ওখানে ছিলেন না তা আমরা লক্ষ্য করেছি। নির্মলদার সময়ানুবর্তিতার অভাবের কথা সকলেই জানতাম, তাই এ নিয়ে আমরা বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই নি। কিন্তু ওখানে সময় মত যেতে না পারলেও হেড কোয়ার্টারে এসে তো পেঁছবেন। সাতটা বেজে গেল, এখনও তাঁর দেখা নেই। আশংকা হ'ল, হয় তিনি বিশেষ কোন পারিবারিক কারণে বাড়ীতে আটকে গেছেন অথবা কোন দুর্ঘটনার ফলে নিজে এতদূর আসতে অপারগ হ'য়ে পড়েছেন। শেষের সম্ভাবনাটার জন্যই বিশেষ দুর্ভাবনা হচ্ছিল।

নির্মলদার শারীরিক এবং পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া বিশেষ দরকার। কিন্তু এত রাত্রে তাঁর বাড়ী গিয়ে খবর নেবার চেষ্টা করা খুব সমীচীন হবে বলে মনে হ'ল না। নিজেকে তিরস্কার করলাম কেন দলের একজনকে--সে যিনিই হ'ন না কেন—ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছিলাম। পরদিন সকাল না হওয়া পর্যন্ত তাঁর খবর নেওয়া উচিত হবে না। অন্য কেই বা যাবে খবর নিতে—তাঁর বাড়ীতে গিয়ে এই পরিস্থিতির পর তাঁর সম্বন্ধে খবর নিতে অন্য কোন বন্ধুকে পাঠাতে সাহস হয় না। ঠিক হ'ল মাস্টারদা পরদিন সকালে নিজেই যাবেন।

এখন দ্বিতীয় কাজ হ'ল টাকাগুলি নিরাপদে কলকাতায় জুলুদার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করা। এর জন্য অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য লোক প্রয়োজন। অন্য সকলের অগোচরে মাস্টারদা আমাকে ডেকে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। ঠিক হ'ল পনেরো হাজার টাকার কারেন্সি নোট দু'ভাগ করে কলকাতায় পাঠান হবে। পুলিশ বা এক্সাইজ বিভাগের কর্মচারীদের হাতে যদি একাংশ ধরা পড়ে, অন্য অংশ যাতে নিরাপদে পেঁছতে পারে তার জন্য এই ব্যবস্থা।

দুটি ভাগে টাকা নিয়ে কলকাতা পর্যন্ত যাবার দায়িত্ব দিতে হবে দুটি অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য সভ্যের উপর। আবার তার উপর পুলিশের নজর থাকলে চলবে না। ঠিক হ'ল এক টাকা ও পাঁচ টাকা নোটের তাড়াগুলি একটা সুটকেশে ভরে নিয়ে অম্বিকাদা যাবেন, আর দশ টাকার নোটের তাড়া যাবে দলিলর রহমান নামে দলের একজন খুব বিশ্বাসী সভ্যের সঙ্গে।

বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে পড়ে দলিলর রহমান; মাস্টারদার ছাত্র সে। আমার সঙ্গেও খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল তার। দলের মধ্যে যাঁরা ওকে চিনতেন প্রত্যেকেই ওর মধুর স্বভাবে মুগ্ধ ছিলেন। চেহারাটি সুন্দর, তার চেয়েও সুন্দর তার স্বাস্থ্য। খেলাধূলায় বেশ নাম করেছিল, বিশেষতঃ হকিতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে তার জুড়ি ছিল না। মুখে সর্বদা হাসি লেগেই

আছে। কোন কাজে পিছপাও নয়। আর বিশ্বাসের কথা? মাস্টারদা এবং আমি, দুজনে এক মত হ'য়ে এতগুলি টাকা গোপনে পাচার করে দেবার জন্য একজন স্কুলের ছাত্রকে নিযুক্ত করছি—তার বিশ্বস্ততার সপক্ষে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি দেওয়া যেতে পারে? ওর কথা মনে আসার আরও একটি কারণ আছে,—নিতান্ত নিরীহ মুখমণ্ডলের আড়ালে প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত মস্তিষ্ক ছিল ওর, তাই ও যে পুলিশের সন্দেহের বাইরে থাকবে এ বিশ্বাস আমাদের ছিল।

দশ টাকার কারেন্সি নোটগুলি নিয়ে যাবার জন্য মহাভারত বা অভিধানের মত মোটা বই নেওয়া হল। বই দুটোর ভেতরের পাতাগুলির মাঝখানের অংশ আয়তাকারে নোটের মত কেটে ভেতরের খালি জায়গাটায় নোটগুলি ভরে দেওয়া হল। দেখলে মনে হবে যেন একটা আস্ত বই-ই যাচ্ছে। দলিলুর রহমান মুসলমান বালক, সুন্দর নিষ্পাপ মুখশ্রী -বিপ্লবীদের সঙ্গে যে তার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে তা' কল্পনা করা কঠিন। তাছাড়া বইয়ের মধ্যে বন্দী রয়েছে যে মহামূল্য সম্পদ তার উপর কারও নজর না পড়াই স্বাভাবিক। সুতরাং নিশ্চিন্তে কলকাতায় নেতাদের কাছে টাকা পাঠানর ব্যবস্থা হ'য়ে গেল।

তৃতীয় দিনে অম্বিকাদা ফিরে এলেন হেড কোয়ার্টারে। তাঁর কাছে শহরের সব সংবাদ পেলাম। ডাকাতির পর তৃতীয় দিনে বাংলার আই. বি. এবং সি. আই. ডি. বিভাগের ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ব্রজবিহারী বর্মন, স্থানীয় ডি. আই. বি. অফিসার মনোরঞ্জনবাবুর সঙ্গে আমাদের বাড়ী গিয়ে আমার সম্বন্ধে বিস্তারিত খুঁটিনাটি প্রশ্ন করেছেন। বুঝতে পারলাম পুলিশ আমাকে সন্দেহ করেছে; কিন্তু আমিই যে এ কাজ করেছি সে সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত নয়। তাহলে আমাদের বাড়ী নিশ্চয়ই সার্চ করত। ১৯২৪ সালে নয় মাস ধরে যখন আমাদের বিচার চলে, সেই সময় আমরা জানতে পারি যে পুলিশের ধারণা হয়েছিল এরকম দিনে দুপুরে অভিনব পদ্ধতিতে ডাকাতি একমাত্র অভিজ্ঞ বিপ্লবী দলের দ্বারাই সম্ভব হ'তে পারে।

সরকারী উকিল রায় সতীশচন্দ্র বাহাদুর আদালতে আমার বাবার মুখে আমার সম্বন্ধে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের কথা শুনে মন্তব্য করেছিলেন,

"বুজ্যোন নি গোলাব বাউ, এই ডাকাতি আঁরার ডাইল আর হুনি খায়েন্যা পোয়া দি হৈত ন। হেই সায়োস আঁরার চাটগাঁইয়া পোয়াউনর কোঁডে? এউন ব্যাক বিদেশী পোয়া—স্বদেশী আরি। চাটগাঁইয়া পোয়া এইডুল্যা করিত পাইরলে তারারে বুগৎ লইতাম!" (বুঝেছেন গোলাববাবু এই ডাকাতি আমাদের ডাল ও সুটকি খাওয়া ছেলে দিয়ে হতে পারে না। আমাদের চট্টগ্রামের ছেলেদের সে সাহস কোথায়? এরা সবাই বিদেশী ছেলে—স্বদেশী আর কি! চট্টগ্রামের ছেলেরা এরকম করতে পারলে তাদের বুকে নিতাম)।

বৃদ্ধ সরকারী উকিল রায়বাহাদুর সতীশবাবুর চট্টগ্রাম জেলার যুবকদের সাহসের উপর আস্থা ছিল না। তিনি দেখেছেন কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, যতীন মুখার্জী, চিত্তপ্রিয় এবং অন্যান্য শহীদরা সবাই অন্য জেলার লোক। অন্যান্য যে সব বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের কাহিনী তাঁর গোচরে এসেছে,

সবই বাংলার অন্য অন্য জেলায় ঘটেছে। সে জন্যই নিজের জেলার ছেলে-দের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এতটা হতাশামিশ্রিত ছিল।

শুধু সতীশবাবু নন, সাধারণভাবে সকলের মনেই এই ধারণা হয়েছিল যে এমন প্রকাশ্যভাবে ডাকাতি, স্থানীয় কোন যুবকের কাজ হ'তে পারে না, নিশ্চয়ই বাইরে থেকে কোন দল এসে এ কাজ করেছে। এই ধারণার ফলেই পুলিশ আমার সম্বন্ধে বেশি খোঁজখবর না নিয়ে চট্টগ্রামের বাইরে অপরাধীদের সূত্র সন্ধানে ব্যস্ত ছিল।

নির্মলদা সম্বন্ধে খবর পেলাম অম্বিকাদার কাছে। অম্বিকাদার সঙ্গে দেখা হ'তে নির্মলদা তাঁর সেদিনকার গতিবিধি সম্বন্ধে এই বিবরণ দিয়েছেন,

"আমি বাড়ী গিয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হতে লাগলাম। স্নান করে যাই নি। কাজেই স্নান সারতে পুকুরে গেলাম। ফিরে এসে পোষাক পরে অস্ত্র নেবার জন্য আলমারী খুলতে যাব, দেখি চাবি নেই! সারা ঘর খুঁজলাম, পুকুরের পাড় পর্যন্ত খুঁজে এলাম—কোথাও চাবি নেই। শেষকালে আলমারী ভেঙে অস্ত্র বার করতে হ'ল। স্বভাবতই একটু দেরি হ'য়ে গেল। খুব তাড়া-তাড়ি ঘটনাস্থলে গিয়ে পেঁছলাম। পেঁছেই দেখি লোকজন ইতস্তত ছোটাছুটি করছে, তাদের কথাবার্তায় বুঝলাম কাজটি এক্ষুণি সম্পন্ন হয়েছে। কয়েকজন লোক যেদিকে গাড়িটা গেছে সেদিকে দোড়চ্ছে গাড়িটাকে ধরবার জন্য। আমিও খানিকক্ষণ 'ধর্ ধর্' বলে ওদের সঙ্গে ছুটলাম। তারপর সুযোগ বুঝে সেখান থেকে চলে এলাম।

"তারপর বাহাদ্দর হাটের ভেতর দিয়ে হেড কোয়ার্টারে আসছি, শুনি চায়ের দোকানে লোকেরা বলাবলি করছে, 'সুলুকবাহার বাড়ীটিতে কয়েকজন হিন্দুর ছেলে আছে। পুলিশ বোধ হয় এতক্ষণে তাদের গ্রেপ্তার করেছে; না করলেও শীগ্‌গিরই করবে।' এ কথা শুনে আমি মনে করলাম ওখানে আর যাওয়া উচিত নয়। তাই শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে চলে গেলাম।"

নির্মলদার গল্প অম্বিকাদার মুখে শুনে মাস্টারদা খুব খুশি হয়ে বললেন,

"সত্যি, নির্মলবাবু খুব ভাল কাজ করেছেন। কেমন সুন্দর বুদ্ধি করে ঘটনাস্থল এড়িয়ে গেছেন!"

মাস্টারদা ঐ সব কথা বিদ্রূপ কি প্রশংসা করে বলেছিলেন তা আজ আমি বলতে পারব না। তবে মাস্টারদা বিদ্রূপ বা প্রশংসা যাই করুন না কেন, আমি কিন্তু নির্মলদার এই কৈফিয়তে মনে মনে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। প্রথমত বিলম্বের কারণটা, অর্থাৎ চাবি হারানোর কথাটা, আমার মনে বিশেষ রেখাপাত করতে পারে নি। দ্বিতীয়ত আমাদের গ্রেপ্তার করা হবে শুনে নির্মলদার গ্রামে চলে যাওয়া কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। নির্মলদার কানে যখন কথাটা গেল তখন আসন্ন বিপদের জন্য আমাদের সতর্ক করে দিতে আসা তাঁর উচিত ছিল না কি? সামান্য সাবধানতা অবলম্বন করে তিনি অনায়াসেই সুলুক-বাহারে চলে আসতে পারতেন। যাই হোক, মাস্টারদার কথার পর নির্মলদা সম্বন্ধে আর কেউ কোন প্রশ্ন বা আলোচনা করলাম না।

নির্মলদা আজ নেই। ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম শহর দখল করার অভিযানে তিনিও নেতৃত্ব করেছেন। জালালাবাদ যুদ্ধেও তাঁর নেতৃত্বের

অবদান কম নয়। তারপর ধলঘাট যুদ্ধে ক্যাপটেন কেমারনকে নির্মলদার গুলীতে প্রাণ দিতে হল। আর সেই যুদ্ধেই নির্মলদা শহীদ হলেন। নিজ জীবনের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা যুবক বিপ্লবী সাথীদের তিনি বলতেন। নিজেকে তৈরি করেছিলেন ভবিষ্যতের জন্য। নির্মলদার জীবনের এই ঘটনাগুলি তাঁর দৃঢ় বিপ্লবী নিষ্ঠাকে বিকৃত করে দেখাবার জন্য আমি লিখি নি। নির্মলদা যে কারণে তরুণ বিপ্লবীদের শেখাবার জন্য নিজের কঠোর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলতেন ঠিক সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমিও আজ শহীদ নির্মলদার কথা লিখলাম।

ঠিক হ'ল অম্বিকাদা আর দলিল আগামী পরশু কলকাতার পথে রওনা হবেন। এ ত গেল টাকার কথা। এখন আমরা কি করব? অম্বিকাদা প্রস্তাব দিলেন যে এখন অন্তত কিছুদিনের জন্য আমাদের এ বাড়ী ছেড়ে যাওয়া উচিত। কারণ এখানে এখন বেশিদিন থাকলে পুলিশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সম্ভাবনা। এখন কিছুদিন সময় চাই একটু নিশ্বাস ফেলবার। পরবর্তী কাজের প্রস্তুতির জন্য খানিকটা সময় চাই। মাস্টারদারও এই মত। কিন্তু আমি বেঁকে বসলাম। আমি চাই পুলিশের সাথে সামনা-সামনি লড়াই করতে। ইতিমধ্যে যদি কোন প্রোগ্রাম আমরা গ্রহণ করি সেটা সম্পন্ন করা হবে। কিন্তু যদি সেরকম কোন প্রোগ্রাম সফল করা সম্ভব না হয় তাহলে এই বাড়ীতে চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের মূল কেন্দ্রে রচিত হবে দ্বিতীয় বালাসোর। ভারতের পূর্বপ্রান্তে ক্ষুদ্র এক পার্বত্য শহরের একাংশে দেশ-প্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা স্থাপন করে যাব—আমাদের মৃত্যুতে প্রাণ পাবে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন। আমার ধারণা ছিল এই দুর্গের মত সুরক্ষিত বাড়ীটিতে আমাদের পিস্তল, রিভলভার, রাইফেল, বন্দুক নিয়ে অন্তত কয়েক-দিন পর্যন্ত শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখতে পারব। যতীন মুখার্জী পরিচালিত বালাসোরের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী আমার মনকে এতখানি আকৃষ্ট করেছিল যে তার বেশি আমি কিছু ভাবতে পারতাম না। আমার বিপ্লবী জীবনের ওখানেই সমাপ্তি ঘটবে, বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেব—এই পরিণতিই ছিল আমার চরম কাম্য।

আমার আগ্রহ দেখে অম্বিকাদা আর মাস্টারদাও বাড়ী ছাড়বার জন্য বেশি পীড়াপীড়ি করলেন না। খোকা, রাজেন আর উপেন চুপ করেই ছিল। ওদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখবার মত বুদ্ধি সে বয়সে আমার হয় নি। নিজের মন দিয়ে ভাবতাম প্রত্যেক তরুণ বিপ্লবীই ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করবার সুযোগকে তার জীবনের পরম সার্থকতা বলে গণ্য করবে। তাই মনে করলাম ওরা নিঃসন্দেহে আমার প্রস্তাব সমর্থন করছে।

দু'দিন পরে অম্বিকাদা এবং দলিল টাকাগুলি নিয়ে কলকাতায় রওনা হ'য়ে গেল। ডাকাতির পর এক সপ্তাহ চলে গেল। শহরে কয়েক জায়গা সার্চ করা ছাড়া নতুন কোন ঘটনা ঘটে নি। আমাদের বাড়ীও সার্চ হয়েছে।

আমাদের বাড়ী সার্চ হবার কারণ জেনেছিলাম বহুদিন পরে, মামলা চল-বার সময়। আমি যে সাইকেলটা ঘটনাস্থলে ফেলে এসেছিলাম সেটার সূত্র ধরে পুলিশ এগোচ্ছিল। বিভিন্ন সাইকেলের দোকানে খোঁজ করে তারা জানতে পারে যে, এই সাইকেলটি প্রায় বছর দেড়েক আগে কোন এক নির্দিষ্ট দোকান থেকে শ্রীউপেন সেন ভাড়া করেন তাঁর ভাইঝির বিবাহের দিন। বিবাহ বাড়ীর

গোলমালের মধ্যে সাইকেলটি চুরি যায়। যে দোকানের মালিক বা কর্মচারী পুলিশকে এত সব খবর দেয় সে-ই বলেছিল যে তখন গুজব রটেছিল অনন্ত সিং সাইকেলটি চুরি করে নিয়েছে। উপেনবাবু অবশ্য সাইকেলের দাম স্বরূপ ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন। আমার নামটা এইভাবে প্রথম পুলিশের কানে যায় এবং তারা আমাদের বাড়ী সার্চ করে।

পাঠকদের মনে হবে হয়ত সত্যিই আমি সাইকেলটি চুরি করেছিলাম। কিন্তু তা' নয়। আমাদের বন্ধু সুকুমার বিশ্বাস উৎসাহের আতিশয্যে নিজের initiative-এ এক বিয়ে বাড়ী থেকে এই সাইকেলটি অপহরণ করেছিল। ভেবেছিল বিপ্লবী দলে একটা সম্পত্তি হল। রেল কোম্পানীর টাকা বহনকারী ঘোড়ার গাড়ীর গতিরোধ করার জন্য ব্যবহার করতে গিয়ে সেই সাইকেলটি শেষ পর্যন্ত সেইখানেই ফেলে আসতে হয়েছিল। এই সাইকেল চুরির আদি ইতিহাসের সূত্র থেকেই পুলিশ প্রথমে আমার নাম আবিষ্কার করে এবং এই ডাকাতির সঙ্গে আমি যে সংশ্লিষ্ট সে সম্বন্ধে প্রায় নিশ্চিত হয়।

৪

নাগাড়খানা পাহাড়ের যুদ্ধ

'A Soldier's life is the life for me,
A Soldier's death; so India's free."

JATIN DAS.

বেশ কিছুদিন হ'ল অম্বিকাদা ও দলিল কলকাতা গেছে টাকা পেঁৗছে দিতে—তারা এখনও ফিরে আসছে না। আমরা এদিকে 'সুলুকবাহার' বাড়ীতে পুলিশের সঙ্গে আসন্ন সংঘর্ষের আশঙ্কায় প্রতি মুহূর্ত গভীর উৎকণ্ঠায় কাটাচ্ছি।

দিন চলে যাচ্ছে, পুলিশ আর আসে না। দ্বিতীয় বালাসোরের দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে ততই ভাবছি সেই বিশেষ দিনটি ক্রমশ নিকট-তর হচ্ছে বোধ হয়।

দশদিনের দিন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সকাল আটটার সময় মাস্টারদা আর অম্বিকাদা এসে হাজির আমাদের হেড কোয়ার্টারে। সেদিন সকালে কলকাতা থেকে ফিরেছেন অম্বিকাদা। একতলার একটা ঘরে সবাই মিলে বসলাম। খোকা, রাজেন, উপেন এবং আমি—প্রত্যেকের কাছে নিজস্ব রিভল-ভার বা পিস্তল রয়েছে।

স্পষ্ট মনে আছে সে দিনটির কথা। আগের দিন রাত্রে কারও রান্না করবার ইচ্ছে ছিল না। দোকান থেকে বাখরখানি এনে খেয়েছিলাম। বাখর-খানি এক ধরনের পরটা জাতীয় জিনিস, খেতে খুব সুস্বাদু। কিন্তু রাত্রের বাখরখানি এখন সকালে হয়ে গেছে চামড়ার মত শক্ত। আমরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে চিবুচ্ছি,—"খাচ্ছি কিন্তু গিলছি না" কারণ বেজায় শক্ত, গলা দিয়ে যাবে না, ঠিক এমনি সময় মাস্টারদা আর অম্বিকাদা এসে হাজির। ওঁরাও আমাদের দেখাদেখি বাখরখানি চিবুতে লাগলেন। ঐ অবস্থায় আলোচনা চলল, প্রধান বক্তা কলকাতা ফেরৎ অম্বিকাদা,

"জুলুর হাতে ঠিকমত টাকাটা পেঁৗছে দিয়েছি। এখানে ডাকাতি হবার তৃতীয় দিনে পুলিশ ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে জুলুর ডাইং ক্লিনিং-এর দোকান সার্চ করে। জুলুকে গ্রেপ্তার করত, কিন্তু জুলু একজনকে ভালমত আহত করে ওদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে। এখন আত্মগোপন করে আছে। ও আর বিপিনদা এক সঙ্গে একই আশ্রয়ে আছে। ডাকাতির পর ওরা আশা করে আছে তুমি আর খোকা কলকাতা যাবে। কাজটা এত ভালভাবে হয়েছে শুনে সবাই ভীষণ খুশি। গণেশের হোস্টেল সার্চ হয়েছে, গণেশকে পুলিশ নানারকম প্রশ্ন করেছে। যশোদা আর গোপীনাথ নিরাপদে আছে। সবাই বার বার করে অনুরোধ করেছে তুমি আর খোকা যেন এখনি কলকাতায় যাও। জুলু বলে দিয়েছে সোজা পথে যেও না। স্টীমারে করে জলপথে বরিশাল, যশোর, খুলনা হয়ে কলকাতায় যেও। যদি তোমরা যেতে রাজী না হও তবে ওরা কতকগুলি প্রশ্ন আমার মারফৎ তোমাদের করতে চায়,—

'এতগুলি টাকা নিয়ে আমরা কি করব? কিভাবে এগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করব যদি তোমরা এসে সাহায্য না কর? সুতরাং তোমরা অন্য কোন কাজ করবার আগে নিশ্চয়ই কলকাতায় আসবে এবং টাকা দিয়ে দরকার মত অস্ত্রশস্ত্র কেনার ব্যবস্থা করবে'।"

অম্বিকাদা যখন এ সব কথা বলে চলেছেন তখন মাস্টারদা এমনভাবে সায় দিয়ে যাচ্ছেন যাতে বোঝা যায় যে উনিও চান আমরা এখন হেড কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়ে কলকাতা চলে যাই। আর আমার কথা? কলকাতার বন্ধুদের কাছ থেকে আমার কাজের জন্য অজস্র প্রশংসা পেয়ে, আমাকে নিয়ে যাবার জন্য তাদের আগ্রহ দেখে, আমি মনে মনে বেশ গৌরব অনুভব করছিলাম।

আমার ও খোকার সাহায্যের জন্য তারা অপেক্ষা করে আছে, তাদের বিমুখ করতে পারি কি? বালাসোরের বীরত্ব-কাহিনী যতই আকর্ষণীয় হোক্ না কেন, তার প্রথম দৃশ্যেই একেবারে যবনিকা পতন। সেই চরম আত্মত্যাগের আদর্শ সামনে রেখেও মানুষ তার নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে কামনা করে বন্ধুদের প্রশংসা-বাণী, চায় আরও ক'দিন বেঁচে থাকতে, প্রতিষ্ঠা লাভ করতে, চায় অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ বিপ্লবের জন্য আরও কিছু বিরতি—আরও কিছু আরাম। এই প্রকার দুর্বলতার প্রভাব থেকে আমি মুক্ত হতে পারলাম না।

আমি রাজী হলাম কলকাতায় যেতে, খোকাও প্রস্তুত। হেড কোয়ার্টার এবার বন্ধ করে দেওয়া হবে। রাজেন আর উপেন গ্রামে কোন এক আশ্রয়ে গিয়ে থাকবে। ওরা পুলিশের সন্দেহ-দৃষ্টিতে পড়ে নি, কাজেই নিশ্চিন্তে কোন গ্রামে থাকতে পারবে। মাস্টারদাকে সকলে নিরীহ দক্ষ শিক্ষক বলে জানে, তিনি নিরাপদে শহরে থাকবেন। অম্বিকাদারও শহরে থাকবার কোন অসুবিধে নেই। কারণ, সেই সময় তাঁর কাজের ক্ষেত্র ছিল বিভিন্ন গ্রামে, তাই শহরে তিনি তখন বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে সুলুকবাহার হেড কোয়ার্টারের নির্বাসন দণ্ড স্বাক্ষরিত হল। বিদায় সুলুকবাহার!

পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাইফেল আর ব্রীচলোডার বন্দুক বিছানার মধ্যে বেঁধে নেবার আদেশ দেওয়া হল। আমরাও যে যার কাপড়-চোপড়, জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিতে লাগলাম—ঘণ্টা দুয়েকের ভেতর বেরিয়ে পড়তে হবে। প্রথমে বেরোবেন মাস্টারদা। তারপর বেডিং বাঁধা হয়ে গেলে অম্বিকাদা, রাজেন আর উপেনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। সবশেষে যাব আমি আর খোকা।

মাস্টারদা বেরোবার জন্য তৈরি হয়েছেন। এমন সময়—ডিং ডিং ডিং—ফিটন্ গাড়ির শব্দ। অবাক হবার কিছু নেই, স্থানীয় একজন ব্যবসায়ীর ফিটন্ গাড়ি রোজ এ পথে যায়। কিন্তু আমাদের বাড়ীর সামনে তার থামবার কি প্রয়োজন হল? মুখ বাড়িয়ে দেখি ব্যবসায়ী নয়,—এযে পুলিশ! কী সর্বনাশ! পাঁচলাইশ থানার অফিসার-ইন-চার্জ আবদুল মজিদ দলবল নিয়ে নামছে গাড়ি থেকে।

অসহযোগ আন্দোলন দমনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে এই কুখ্যাত পুলিশ অফিসার আবদুল মজিদ। নিরস্ত্র অহিংস সৈনিকদের মনের সুখে পিটিয়েছে, শান্তিপ্রিয় নাগরিকদেরও রেহাই দেয় নি,—বিদেশী সরকারের কাছে বাহবা কুড়াবার জন্য নির্বিচারে দেশের লোকের উপর অত্যাচার করেছে। সেই আবদুল মজিদ এসেছে এখানে। আমাকে খুব ভাল করে চেনে সে,—আমি তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতর ওর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলাম।

বড়দিনের ছুটি ছিল সেদিন। বেলা দশটা,—অফিসের তাড়া নেই কারও। পুলিশের সংগে আশেপাশের কিছু লোকও এসে কম্পাউণ্ডে ঢুকেছে

মজা দেখতে। সকলেই চায় বাড়ীর ভেতর কি হচ্ছে দেখতে। পুলিশ অফিসার বাড়ীর লোকদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্য ডেকে পাঠাল। মাস্টারদা, অম্বিকাদা, খোকা, উপেন আর রাজেন দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সে সকলকে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল।

পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি অস্ত্র বিনিময়ের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম, এ ধরনের প্রশ্নবাণের উত্তর দেবার জন্য তো প্রস্তুত হই নি! এদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধের বাসনা ছিল না; তাদের কারও হাতে অস্ত্র নেই। ভুলিয়ে ও ধোঁকা দিয়ে সরে পড়বার ইচ্ছা ছিল। তা' ছাড়া আমরা স্থির করেছি হেড কোয়ার্টার ছেড়ে যাব। কলকাতায় পেঁাছতেই হবে। সুতরাং এখন যদি এদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কোনমতে বেরিয়ে যেতে পারি তবেই মঙ্গল। কিন্তু তাদের বোঝানো তো অত সহজ নয়! যদি আমরা আগে থেকে পুলিশের প্রশ্নের জবাব নিজেরা আলোচনা করে রিহার্সেল দিয়ে স্থির করে রাখতাম তবে এখন অসুবিধে হত না। কিন্তু এ বিষয়ে প্রথম জীবনে আমরা কোন চিন্তাই করি নি। সুতরাং জবাবগুলি হয়ে গেল এলো-মেলো, সঙ্গতিহীন। পুলিশের সন্দেহ ক্রমশ বেড়েই চলল।

পুলিশের জেরার উত্তরে মাস্টারদা বলেছিলেন পাঁচ বছর থেকে বুলক্ ব্রাদার্স কোম্পানীতে কাজ করছেন, কিন্তু সেই কোম্পানীর বড় সাহেবের নাম আর বলতে পারলেন না।

আগে থেকে সম্ভাব্য বিভিন্ন অবস্থা চিন্তা করে পুলিশের প্রশ্নের স্বাভাবিক উত্তরাদির জন্য যদি রিহার্সেল দিয়ে প্রস্তুত থাকা যায় তবেই সুফল পাওয়া যেতে পারে। প্রায় সাত বছর পরে ফেনী স্টেশনে আমরা অনেক বেশি সফলতার সঙ্গে অভিনয় করেছিলাম। 'সুলুকবাহার' বাড়ীর অভিজ্ঞতা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছিল। সেই জন্য আমরা আগে থেকে রিহার্সেল দিয়ে প্রস্তুত ছিলাম কিভাবে পুলিশের প্রশ্নের উত্তর দেব এবং প্রয়োজনে অভিনয় করব। এই ঘটনার বর্ণনা যথাস্থানে দেব। এখানে কেবল বলে রাখলাম যে, যদি রিহার্সেল দিয়ে আগে থেকে প্রস্তুত থাকা না যায় তবে মাস্টারদার মত নেতাও ভুল করে ফেলেন।

এদিকে হল আর এক বিপদ! স্থানীয় একজন অতি ধূর্ত দালাল—ঠান্ডা মিঞা, বাড়ীর পেছন দিকে গিয়ে একটা ঘরের বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখতে পেল। আমি পেছনের এই ঘরটায় লুকিয়েছিলাম। আমাকে দেখেই সে তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল,

"ওরে ডাক্কু এনা—লুয়াই রইএ।" (ওরে এরা যে ডাকাত—লুকিয়ে আছে)।

ঠান্ডা মিঞার এরকম ব্যবহারে আমাদের পাঁচজন বন্ধুই গরম হয়ে উঠলেন। তাঁরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ঠান্ডা মিঞাকে ধমকাতে লাগলেন, বিশেষতঃ 'ডাক্কু' কথাটা আপত্তিকর এবং ভদ্রতাবিরুদ্ধ বলে বিশেষ উষ্মা প্রদর্শন করলেন। এখন আবদুল মজিদের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। বুঝলো, এবার সে সত্যি-সত্যিই সাপের গর্তে পা দিয়েছে। এটা যে বিপ্লবী-দের একটা ঘাঁটি এবং এরাই যে রেলের টাকা লুঠ করেছে, এ বিষয়ে সে নিশ্চিত হল।

আবদুল মজিদ বিপ্লবীদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসে নি। সে শুধু এসেছিল কারা এখানে থাকে সে সম্বন্ধে খোঁজ নিতে। নির্ভুল সংবাদ আয়ত্ত করে সে নিজের আসন্ন বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করল। বুঝতে পারল এরা নিরস্ত্র গান্ধীবাদী নয় যে লাথি, ঘুষি, বুটের আঘাত নীরবে হজম করবে—একবারও ফণা তুলে দাঁড়াবে না! যে কোন মুহূর্তে এদের পোশাকের আড়াল থেকে রিভলভার-সমেত উদ্যত হাত বেরিয়ে এসে তার পৈত্রিক প্রাণটাকে যে যমালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারে—এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হ'ল। সুতরাং আবদুল মজিদের কথার ভঙ্গী, প্রশ্নের ভাষা, গলার স্বর সব বদলে গেল, এক নিমেষে তার স্বরগ্রাম একেবারে উদারায় নেমে এলো। সঙ্গী পুলিশ কর্মচারী, চৌকিদার, দফাদার এবং দালালদের ধমকাতে লাগল,

"তোরা ব্যাগ অশিক্ষিত মুর্খ! ন দেয়র তারা ভদ্রলোক? তারার মত ভালামানুষ চোর ডাকাইত কেয়া হইত? মাফ চা মিঞা—তারার তুন্ মাফ চা।" (তোরা সব অশিক্ষিত মুর্খ। দেখছিস্ না এরা সবাই ভদ্রলোক। এদের মত ভালমানুষ চোর-ডাকাত কেন হবে? ক্ষমা চাও মিঞা—এদের কাছ থেকে মাফ চাও)। তারপর আমার বন্ধুদের প্রতি—"না, না, আপনারা কিছু মনে করবেন না। এই বাড়ীটা অনেকদিন খালি পড়েছিল। আপনারা এসেছেন খুব ভাল হয়েছে। এই পাড়ার অনেক উন্নতি হবে। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই একবার ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাই। কিছু অপরাধ হলে মাফ করবেন। এখন আসি। মাঝে মাঝে দেখা হবে। নমস্কার।"

বেচারা আবদুল মজিদ! সে বোধ হয় ধারণাও করে নি যে তার এই চালটুকু আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে ধরা পড়ে গেছে! যাবার সময় সে যখন ভদ্রতা করে 'নমস্কার' বলে গেল, তখন আমরা তো আর অভদ্র হতে পারি না! তাই মাস্টারদা দু'হাত জড়ো করে মাথায় তুলে বললেন—"আচ্ছা, যাচ্ছেন, নমস্কার।"

দলের লোকদের গোপনে আমাদের ওপর নজর রাখবার নির্দেশ দিয়ে পুলিশ অফিসার তাড়াতাড়ি পেছু দৌড় দিল। ডিং-ডিং-ডিং—আবার ঘোড়ার গাড়ির শব্দ, এবার আবদুল মজিদকে নিয়ে ফিটনগাড়ি দ্রুত ছুটে চলেছে অন্য পথে।

সব ব্যাপারটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল। ইনস্পেক্টর গেছে সশস্ত্র পুলিশ এনে আমাদের আক্রমণ করতে। এই এলাকা ছেড়ে সে যাবে না, কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে টেলিফোন করে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে খবর দেবে। পরে এই মামলার বিচারের সময় জানতে পেরেছিলাম স্থানীয় একজন বড় জমিদার, পাঁচকড়িবাবুর বাড়ী থেকে টেলিফোন করে আবদুল মজিদ পুলিশবাহিনীকে দ্রুত নির্দিষ্ট অঞ্চলে আসবার নির্দেশ জানিয়েছিল।

আবদুল মজিদ আমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে গেল বটে, কিন্তু তার চৌকিদার, দফাদার এবং দালালদের রেখে গেল আমাদের পাহারা দেবার জন্য। ইতিমধ্যে তড়িৎবেগে আশেপাশে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে, সুতরাং স্থানীয় লোকেরাও সব মজা দেখবার জন্য বাড়ীর কম্পাউণ্ডের ভেতর ঢুকে পড়ল। ডাকাত ধরবার কাজে তারাও অংশীদার হতে চায়। সারা বাড়ীটা ঘিরে ফেলল লোকজনে, আমাদের কোন আপত্তি গ্রাহ্য না করে তারা যেন পুকুরে মাছ ধরতে

চায়—এমনিভাবে কথাবর্তা বলতে লাগল; কোথা থেকে একটা জাল যোগাড় করে এনে পুকুরের দিকে এগিয়ে গেল।

এমনভাবে তারা এখন আমাদের বেড়াজালে আটকে ফেলেছে যে পালাবার কোন উপায় নেই। যতক্ষণ না সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী আসে, ততক্ষণ এরাই আমাদের আটকে রাখবে। এখন একমাত্র পথ রয়েছে চুপ করে বসে থেকে পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যু বরণ করা। কিন্তু সেখানেও আমাদের ভাববার ছিল। মাস্টারদা আর অম্বিকাদা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে! দলের নেতাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম। দ্বিতীয় বালাসোর যুদ্ধে প্রাণ দিতে রাজী আছি, কিন্তু সেটা মাস্টারদা আর অম্বিকাদাকে যদি সম্ভব হয় ভবিষ্যতের জন্য বাঁচিয়ে রেখে। কাজেই লড়াই-এর সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখে এখন এই দালালদের কর্ডন ছেড়ে বেরোবার ব্যবস্থা করতে হবে।

অম্বিকাদা একটা সহজ পথ বার করলেন। একটা কলসী নিয়ে খাবার জল আনবার ছল করে তিনি আমাদের কম্পাউণ্ডের বাইরে একটা ভাল পুকুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। দু' মিনিট পরে মাস্টারদাও একটি ঘটি হাতে করে যেন বিশেষ কাজে যাচ্ছেন এইভাবে সেই পুকুরের দিকে গেলেন। প্রায় তক্ষুণি ফিরে এসে মাস্টারদা জানালেন দু'তিনজন লোক অম্বিকাদাকে ঘিরে রেখেছে—যেতে দিচ্ছে না।

আর এক মুহূর্ত দ্বিধা করলে চলবে না। এখনি যদি সিদ্ধান্ত না নিই তবে আর সময় পাব না। সঙ্গে সঙ্গে টোটা রাখবার থলি, অস্ত্রশস্ত্র আর গুলীবারুদ গুছিয়ে নিয়ে পোশাকের ভেতর লুকানো গুলী ভর্তি আগ্নেয়াস্ত্রের ট্রিগারে আঙুল চেপে ধরে রওনা হলাম যেন প্রয়োজন হলে গুলী-বর্ষণ করতে এক সেকেন্ডও দেরি না হয়। শীতের সকাল। সুতরাং গরম আলোয়ানের আড়ালে সবকিছু লুকিয়ে রাখতে আমাদের কোন অসুবিধে হয় নি।

সিঙ্গল ফাইলে—অর্থাৎ একজনের পেছনে একজন করে এগিয়ে চলেছি আমরা। মাস্টারদা সবার সামনে, আমি সবার পেছনে—মাঝখানে খোকা, উপেন আর রাজেন। অম্বিকাদা দুশো গজ দূরে রাস্তার ওপর লোকদের হাত থেকে কোনমতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছিলেন। বাড়ীর ভেতর লুকিয়ে ছিলাম বলে এতক্ষণ আমাকে কেউ দেখতে পায় নি। এবার আমায় আবার দেখামাত্র ঠান্ডা মিঞা চীৎকার করে উঠলো,

"অনন্ত সিং! অনন্ত সিং! গোলাব বাউর পোয়া অনন্ত সিং ধার জে।" (গোলাপবাবুর ছেলে অনন্ত সিং পালাচ্ছে!)।

ওর চীৎকার শুনে কয়েকজন লোক মাস্টারদার পথ আগলে দাঁড়ালো। আমার জীবনে সেই প্রথম দেখলাম এবং সেই শেষ দেখা যে মাস্টারদা নিজে লুকান জায়গা থেকে রিভলভার টেনে তুলে ধরেছেন।

মাস্টারদার দুর্বল নিরীহ চেহারা দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারে না, তাঁর ভেতরে কি বজ্রশক্তি লুকিয়ে আছে। পথরোধকারী লোকেরা তাঁর হাতে রিভলভার দেখবে এ আশঙ্কা করে নি। এ দৃশ্য দেখে তারা হতভম্ব হয়ে গেল। পরক্ষণেই কানে এল ঐ শীর্ণ দেহ থেকে বজ্র-গম্ভীর আদেশ,

"পথ ছেড়ে দাও এখনি! শীগ্‌গির পথ ছাড়!"

মাস্টারদার চোখ দুটি ক্ষণিকের জন্য জ্বলে উঠল। তাঁর সেই জ্বলন্ত দৃষ্টি ও গম্ভীর আদেশ অমান্য করবার শক্তি হল না তাদের; বিশেষতঃ উদ্যত রিভলভারের সামনে দাঁড়াতে তাদের সাহস হল না। পুলিশের খাতায় ডাকাত বলে বর্ণিত একদল যুবককে পরিচালনা করছেন দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শীর্ণ ও খর্বকায় ব্যক্তি! এ দৃশ্যে স্থানীয় লোকদের মানসিক প্রতিক্রিয়া কিরকম হয়েছিল জানি না, কিন্তু মাস্টারদার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, ভরাট কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য এবং তেজোদৃপ্ত ভঙ্গীর সামনে তারা এগোতে সাহস করল না। তাদের এই বিস্ময়-বিমূঢ়তার সুযোগে আমরা পথ করে নিলাম।

পরক্ষণেই ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারল সকলে। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করতে করতে আমাদের তাড়া করল। আর চিন্তা করবার সময় নেই। পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজ করা হল, কিন্তু এতে হল আরো বিপদ। কারও গায়ে গুলী লাগছে না দেখে ওদের সাহস বেড়ে গেল। একটা নিরাপদ দূরত্বে থেকে চীৎকার করতে করতে আমাদের দিকে ঢিল, ইঁটের টুক্‌রো, পাথর, ইত্যাদি ছুঁড়তে লাগল। আরও লোক জমা করবার মতলবে এরা চীৎকার করতে লাগল। কেউ কেউ আবার কাছাকাছি কোথাও ব্রীচ্‌-লোডার বা মাজ্‌ল লোডিং বন্দুক পাওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান সুরু করল।

চেঁচামেচিতে অনেক লোক জড় হয়েছিল। আমরা যার যার অস্ত্র বার করে ভয় দেখিয়ে পথ করে নিচ্ছিলাম। কিন্তু পেছনে এক বিরাট জনতা আমাদের তাড়া করে আসছে। অভিজ্ঞতার অভাবে আমরা ফাঁকা আওয়াজ করে চলেছিলাম, তাতে ক্রমশ বিপদ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। গুলী ছুঁড়ে জনতার মধ্যে কাউকে আহত করলে প্রথমটা সকলে থমকে যায়, তার পরেই মরীয়া হয়ে তাড়া করে। আর ফাঁকা আওয়াজ করলে এদের সাহস আরও বেড়ে যায়। যখন দেখে গুলী করে লোক মারবার ইচ্ছে আমাদের নেই তখন প্রাণপণে তাড়া করে ধরবার চেষ্টা করে।

ঠাণ্ডা মিঞা এবং তার মত কয়েকজন পুলিশের দালাল জনতাকে পরি-চালনা করছিল। তারা সবাইকে আমাদের পেছনে ধাওয়া করবার জন্য নানা কথা বলে উত্তেজিত করছিল,

"বারুদ, বারুদ—গুলী নাই।"

"চল্‌-চল্‌ মিঞা। তারারে ধরিৎ পাইরলে গরমেণ্ট বোৎ বখ্‌শিস দিবো।" (চল চল মিঞা। ওদের ধরতে পারলে গভর্নমেণ্ট অনেক বখশিস দেবে)।

"গোলাই ধর্‌, গোলাই ধর! হোঁগ দি আই ধর্‌।" (ঘিরে ধর্‌, ঘিরে ধর্‌। সামনের দিকে এসে ধর্‌)।

"তারার লয় বোৎ টেঁয়া আছে। ধইরলে কাড়ি লইয়ম" (এদের সঙ্গে অনেক টাকা আছে। ধরলে কেড়ে নেব)—এই সব কথা বলে জনতাকে সাহস দিচ্ছিল।

আমরা মাঝে মাঝে গুলী চালাতে লাগলাম। কিন্তু লোকেদের দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ি নি, ওপরে বা নীচের দিকে ছুঁড়েছিলাম। আমাদের গুলীর

ভয়ে ওরা বেশ অনেকটা দূরে থেকে আমাদের অনুসরণ করছিল; ওদের নিক্ষিপ্ত ইট-পাথরগুলি আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছিল না।

ইতিমধ্যে গ্রাম থেকে কয়েকটা বন্দুকও এসে গেল। আমরা ওদের বন্দুকের গুলীর আওতার বাইরে থাকবার জন্য খুব সতর্কভাবে "মশার পিস্তল" ব্যবহার করতে লাগলাম। এই পিস্তলের গুলী আধমাইল দূরে পর্যন্ত সক্রিয় থাকে—ছুটে গিয়ে গুরুতর আঘাত করতে পারে।

এক মাইল পর্যন্ত এইভাবে হেঁটে চলেছি। অনুসরণকারী দল কিন্তু নিস্তেজ হয় নি; তারা আমাদের পিছনে পিছনে সমানে এগিয়ে আসছে, আর আমাদের গায়ে লাগবে না জেনেও নিতান্ত আক্রোশবশে হাতের কাছে যা পাচ্ছে ছুঁড়ে চলেছে।

লোকালয়ের মধ্যে থাকলে বাঁচবার কোনো আশাই নেই। স্থির করলাম পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু পাহাড় ওখান থেকে অনেক দূর—চৌদ্দ মাইলের কম নয়। পেছনে ফিরবার পথ নেই, সামনে এগোতেই হবে। পুলিশবাহিনী আক্রমণ করতে আসবে পিছন থেকে: সুতরাং যতটা সামনে এগিয়ে যেতে পারি ততই ভাল। তখনকার দিনে চট্টগ্রাম শহরের পুলিশ-বাহিনীকে পায়ে হেঁটেই যেতে হত। মোটরবাহী পুলিশের ব্যবস্থা ছিল না। শহর থেকে প্রাইভেট গাড়ি সংগ্রহ করে আসতে গেলেও অনেক দেরি হয়ে যাবে। কাজেই যদি না থেমে কোনমতে পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছতে পারি তবেই নিরাপদ।

কিন্তু সামনে আবার আর এক বিপদ অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য। আমরা চলেছি সদর রাস্তা দিয়ে। রাস্তার দু'পাশে লোকের বাড়ী, সেখান দিয়ে পালাবার পথ নেই। কাজেই রাস্তা ধরে এগোতে হবে। আর কিছুদূর গেলেই রাস্তার দুধারে পড়বে "বাহাদ্দর হাট।" প্রসিদ্ধ হাট সেটা। সেদিন আবার হাটবার; তখন সেই বেলা সাড়ে দশটা এগারোটায় হাট লোকে লোকারণ্য। পেছনে এক বিরাট জনতা তাড়া করে আসছে আমাদের—সামনে আর এক জন-সমুদ্র! কোন পথ বেছে নেব এখন? দু'ধার থেকে জনতা এসে ঘিরে ধরবে আমাদের—কোন্ পথে পালাব?

হাটের লোকেরা এখনো জানে না যে পলায়মান এক সশস্ত্র ডাকাতদল এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। যদি কোনমতে তাদের স্তম্ভিত করে দিয়ে, কোন কিছু বুঝবার আগেই হাটের রাস্তাটা অতিক্রম করতে পারি তবে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব। জানি না কি করে বুদ্ধিটা মাথায় এল। রিভলভারটা বেশ উঁচু করে তুলে ধরে, হাটের জনতার কানে পৌঁছয় এমনভাবে প্রাণপণে চীৎকার করে দেশী ভাষায় বললাম—

"আমরা হাটের মধ্যে গুলী ছোঁড়া বন্ধ করব। এখানে সব নিরীহ লোকেরা রয়েছে। কিন্তু তৈরি থাকতে হবে। আমাদের কেউ আক্রমণ করলেই গুলী ছুঁড়ব।"

হাটের লোক বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। ছয়জন যুবক খোলা পিস্তল, রিভলভার হাতে নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে,—কে তারা, কেনই বা গুলী ছুঁড়তে না করল, তা' কেউ জানে না এখনও। তবে এইরূপ উচ্চকণ্ঠের নির্দেশ শুনে তারা বুঝেছে যে আক্রান্ত না হলে আমরা গুলী

ছুঁড়ব না। সুতরাং তারা আত্মরক্ষার প্রাথমিক প্রয়োজন উপলব্ধি করে আমাদের পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াচ্ছে। আমরাও হাটের ভিড়ে পথ করে নেবার জন্য ক্রমাগত বলে চলেছি,

'রাস্তা ছাড়'! 'পথ ছাড়'! 'সরে দাঁড়াও।'

পিছনের জনতা এখনও এসে পোঁছয় নি। তাই হাটের লোকেদের বিস্ময় এখনও ঘোচে নি। তাদের সেই বিস্ময়বিমূঢ় অবস্থার সুযোগ নিয়ে আমরা দ্রুতগতিতে জনারণ্য হাটের পথ নিরাপদে অতিক্রম করে লোকালয় ছেড়ে নির্জন পথে পোঁছলাম।

এখন দু'ধারে খোলা মাঠ, ধানের ক্ষেত, উঁচুনিচু মেঠো পথ। এই বিস্তীর্ণ প্রান্তর গিয়ে মিশেছে শহরের উত্তর-পশ্চিম পাহাড়ের সারির কোলে—এখান থেকে প্রায় দশ মাইল হবে তার দূরত্ব। ওই পাহাড়ে পোঁছতে হবে আমাদের।

সদর রাস্তা থেকে নেমে শুকনো ক্ষেতের কঠিন মাটি মাড়িয়ে চলেছি এবার। আমাদের পেছনের জনতা এতক্ষণে হাটে এসে পোঁছেছে। হাটের লোকেদের উত্তেজনা ও কৌতূহল জাগ্রত করে চলে এসেছি আমরা—এবার তারাও এসে যোগ দিয়েছে অনুসরণকারীদের সঙ্গে। ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসছে সকলে। বন্দুকধারীরা অনেকটা পেছনে, কারণ জানে যে আমরা যদি গুলী ছুঁড়ি তবে তাদের দিকেই আগে লক্ষ্য করব।

যে সব পুলিশের দালাল দলের মধ্যে ছিল, তারা ডাকাত ধরবার প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ লোকদের উত্তেজিত করেছে—এখন আর তাদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার উপায় নেই। আমরা এবার ওদের ভয় দেখাবার জন্য আমাদের তৈরি বোমা হাতে তুলে নিয়ে দেখালাম। বললাম—"এই দেখ। বোমা রয়েছে আমাদের সঙ্গে। এটা এখানে রেখে আগুন ধরাব। সরে যাও, না হলে এটা ফেটে গেলে সবাই মারা পড়বে।"

সবাইকে দেখিয়ে বোমাটা মাটিতে রাখলাম। আমার সঙ্গীরা খানিকটা দূরে নিরাপদ স্থানে দাঁড়াল। জনতাও বোমা দেখবার জন্য অর্ধচন্দ্রাকারে বেশ দূরে সরে গিয়ে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। বোমার ফিউজে লোশন ঢেলে দিয়ে অতি দ্রুত পেছনে সঙ্কট স্থান থেকে সরে গেলাম। সাত সেকেণ্ডের মধ্যে বোমা ফাটলেই চারধারে লোহার টুকরো ছড়িয়ে পড়বে। আবার চীৎকার করে সকলকে দূরে সরে যেতে নির্দেশ দিলাম। আমার লাফিয়ে সরে যাওয়া দেখে ওরা বিপদটা অনুধাবন করল—ছুটোছুটি করে সবাই এদিক-ওদিক সরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ আওয়াজ করে বিস্ফোরণ হল। চারদিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বিচারের সময় সাক্ষীরা এই গাঢ় ধোঁয়ার জালের কথা উল্লেখ করে বলেছিল যে ওটা 'ধূম্র-বোমা'। কিন্তু আসলে তা নয়—ওটা সাধারণ বিস্ফোরক বোমাই ছিল।

বোমা বিস্ফোরণের ফলে একটুক্ষণ মাত্র জনতা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার অনুসরণ করতে লাগল। চারিদিকে খোলা মাঠ,—চীৎকার চেঁচামেচিতে আরো লোক ছুটে আসতে লাগল। এবার দাঁড়িয়ে পড়ে জনতাকে সম্বোধন করে বললাম,

"ভাই সব, বন্ধু সব, আমরা স্বদেশী। আমরা কংগ্রেসের লোক।

আমরা ইংরেজের সঙ্গে, গভর্নমেন্টের সঙ্গে লড়াই করতে চাই। দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, আমরা জীবন উৎসর্গ করব। আমরা তোমাদেরই দেশের লোক। আমরা পরস্পর ভাই-ভাই। আমরা ভাই-এ ভাই-এ কেন লড়াই করব? তোমরা আমাদের পেছনে এস না।......"

আমাদের এই আবেদনে হয়তো সাড়া মিলত। জনতার মধ্যে মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি শোনা গেল। কিন্তু চৌকিদার, দফাদার, দালাল আর সর্দার গোছের লোকেরা এই বক্তৃতায় একটুও টলল না। তারা স্বদেশীর ধার ধারে না, পুলিশকে সাহায্য করলে বখশিস পাবে—এই তাদের আশা। তাই যাতে জনতা আমাদের এই অনুরোধে কর্ণপাত না করে সেজন্য তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগল,

"তোরা বড় স্বদেশী! তোরা দেশর কন্ ভালা কারিবি? তোরা বিধবার পোয়া মারি ফেলাইয়স্। কিয়রলাই মারলি? পোয়া কিয়া মারলি?" (তোরা আবার স্বদেশী! তোরা দেশের কি ভালো করবি? তোরা বিধবার ছেলে মেরে ফেলেছিস্। কেন মারলি? ছেলে কেন মারলি)?

আমরা জানতাম না কাউকে মেরেছি কিনা—মারবার জন্য তো গুলী ছুঁড়ি নি। আহত করবার জন্যও নয়। হয়তো বোমার বিস্ফোরণে লোহার টুকরোর আঘাতেই কোনো ছোট ছেলের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বিধবার ছেলের মৃত্যুর কথা শুনে আমাদের মন ব্যথিত হল। নিরুপায় হয়ে যা করে ফেলেছি তার আর ক্ষতিপূরণ দেব কি করে? বললাম—"তাই নাকি? আমরা তো ইচ্ছে করে মারি নি। আমাদের ক্ষমা কর। এই সামান্য টাকা নাও, সেই গরীব বিধবাকে আপাতত এই দিয়েই সাহায্য কর।"

বিচারের সময় জেনেছিলাম যে সেরূপ কেউই বোমার স্প্লিণ্টার বা গুলীতে মারা যায় নি। তখন তো তা' জানা সম্ভব হয় নি। দালালদের কথা বিশ্বাস করেই বিধবার সন্তানের মৃত্যু সংবাদে বিচলিত ও ব্যথিত হয়ে টাকা দেওয়ার কথা বলেছিলাম। বলবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দেড়শ টাকার মত খুচরো কাঁচা টাকা আমরা ছুঁড়ে দিলাম। এই সামান্য টাকা দিয়ে যদি দরিদ্র পুত্রশোকাতুরা বিধবাকে সাময়িক আর্থিক সাহায্য করা হয় তবু কিছু ভাল। তাই আমরা ভাল মনে টাকাগুলি দিলাম, ভাবলাম এবার ওরা আমাদের ছেড়ে দেবে।

কিন্তু জনতার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। এতে আমাদের প্রতি ওদের মনোভাব একেবারে বদলে গেল। আমাদের সঙ্গে টাকা আছে জেনে সকলে যেন মরীয়া হয়ে চেঁচাতে লাগল,

"আরো দে! আরো দে!"

তাদের ধারণা হল আমরা সেই রেলের লুঠ করা টাকা নিয়ে যাচ্ছি। কত টাকা পেয়েছি তাতো সাধারণ লোকে জানে না। শহরে রটে গিয়েছিল যে রেলের ট্রেজারী লুঠ হয়ে গেছে। সেই ট্রেজারীর প্রচুর টাকা নিয়ে পালাচ্ছি আমরা! সবাই চীৎকার করে উঠল, "আরো টাকা দে! আমাদের টাকা দিয়ে যা!"

আমরা এবার কাকুতিমিনতি করে বললাম, "বিশ্বাস কর, আমাদের কাছে আর কিছু নেই! তোমরা চলে যাও পিছু নিও না আর।"

কে পথ ছেড়ে দেবে? ওরা আরো এগিয়ে আসছে টাকার লোভে, একজন দালাল আমাদের কাঁধে ঝোলানো থলির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল,

"ওই তো তোরা বেগত্ করি টেঁয়া লই জাওর। ওই তো বেগ্ ভরা টেঁয়া! মিছা কথা কওর জে না!" (ঐ তো তোরা ব্যাগে করে টাকা নিয়ে যাচ্ছিস! ঐ তো ব্যাগ ভর্তি টাকা! মিথ্যা কথা বলছিস যে না!)।

এবার সবাই এগিয়ে আসছে থলেগুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। থলে ভর্তি টাকা—যদি ছিনিয়ে নিতে পারে তবে ওদেরই হবে সব। অদম্য অর্থ-লিপ্সা এখন বিবেক ও ভাবাবেগকে ছাপিয়ে উঠেছে। ওদের বাধা দেবার শক্তি আর আমাদের নেই। তাই আমরা থলের মুখ খুলে খুলে দূর থেকে দেখালাম— "ভাল করে দেখ ভাই, টাকা নেই। কোনো টাকা আমরা নিই নি। ব্যাগ ভরা সব পিস্তলের কার্তুজ। টাকা নিয়ে পালাচ্ছি না। আমরা স্বদেশী, ইংরেজ সরকারের পুলিশের তাড়া খেয়ে চলেছি অজানা পথের উদ্দেশে।" থলে থেকে কার্তুজ বার করে মুঠোয় ভরে দেখালাম।

তবু তাদের থামান গেল না। ওরা যেন টাকার লোভে পাগল হয়ে উঠেছে,

"আছে আছে, লুয়াই এরগ্যস্। ঐ তো, ঐ তো, উইবাৎ আছে।" (আছে আছে, লুকিয়ে রেখেছিস। ঐ তো, ঐ তো ঐটাতে আছে)।

কী যন্ত্রণা! কিছুতেই বুঝবে না এরা! ওদের পরিচালনা করছে যারা তাদেরই এই সব দুষ্ট অভিসন্ধি। সবগুলি থলের মুখ খুলে দেখিয়েছি; তবু থামে না এরা,—"আছে, আছে, অন্য কোথাও আছে, দিয়ে যা', আমাদেব টাকা দিয়ে যা।"

কোন অনুনয়, অনুরোধ, কাকুতি-মিনতিতে যখন ফল হল না তখন আমাদের অন্য পথ অবলম্বন করতে হল। যা' আমরা এতক্ষণ প্রাণপণে এড়িয়ে চলতে চাইছিলাম এখন তা' অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। চকিতে আমাদের ভাবভঙ্গী বদলে গেল। কঠোর স্বরে বললাম, "আর এক পা এগোলে গুলী করব। সরে যাও।"

একটু থমকে দাঁড়াল জনতা। কিন্তু দালালরা রয়েছে পেছনে। তা' ছাড়া এতক্ষণ আমরা ওদের দিকে গুলী ছুঁড়ি নি বলে সাহসও বেড়ে গিয়েছিল সকলের। আমাদের নিষেধ না শুনে এগোতে চাইল তারা। আমরা তাদের পায়ের দিক লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লাম। কয়েকজন আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

কয়েকজন আহত হওয়ায় এবার তারা একটু দমে গেল। আমরা খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে পথ করে নিলাম। জনতা বহুদূর থেকে অনুসরণ করতে লাগল।

বেলা তখন সাড়ে এগারটা। অদূরে পুলিশ লাইনে বিপদ-সঙ্কেত বেজে চলেছে অবিশ্রান্তভাবে। শহরের পুলিশ হেড কোয়ার্টার এই পুলিশ লাইন—এখান থেকে যদিও অনেক দূর, তবু দেখা যাচ্ছে।

মাঠে জনতার সঙ্গে কথায় বার্তায় বেশ খানিকটা সময় আমাদের নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে সার্জেণ্ট বেলচার, ডি. আই. বি. অফিসার মনোরঞ্জনবাবু এবং বাঙলার আই. বি. ও সি. আই. ডি. বিভাগের ডি. এস. পি. ব্রজবিহারী

বর্মণ, একটি ছোট পুলিশ-বাহিনী সহ ঘটনাস্থলে এসে পেঁাছেছেন। বিচারের সময় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে শেষোক্ত দুজনেই বলেন যে তাঁরা উপস্থিত হয়ে দেখেন দুজন আহত লোককে স্থানীয় লোকেরা বহন করে নিয়ে আসছে। কেন তখন তাঁরা আমাদের অনুসরণ করেন নি—এ প্রশ্নের উত্তরে জানান তাঁরা দুটো সাইকেলই তখন খারাপ হওয়ায় ডাকাতদলকে অনুসরণ করা সম্ভব হয় নি। আসল কারণ হয়ত ছোট একটি দল নিয়ে আমাদের সম্মুখীন হবার সাহস তাঁদের ছিল না।

আমাদের পক্ষে সওয়াল করবার সময় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন এই ঘটনা সম্বন্ধে বিদ্রুপোক্তি করেছিলেন -

"Just at the psychological moment the two cycles of the two C. I. D. officers went out of order ! A funny thing no doubt." (ঠিক সেই বিশেষ মুহূর্তটিতে দুজন সি. আই. ডি. অফিসারের দু'টি সাইকেলই বিকল হয়ে গেল! খুব মজার ব্যাপার, সন্দেহ নেই)।

সার্জেন্ট বেলচার তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, কয়েকজন আহত লোককে তিনি দেখেছিলেন। সুতরাং প্রধান পুলিশ বাহিনী আসা পর্যন্ত আমাদের পিস্তল রিভলভারের গুলীর আওতার ভেতর না যাওয়াই তিনি শ্রেয় মনে করেন।

উঁচুনিচু মাঠের মধ্যে দিয়ে তিন মাইল পথ যেতে আমরা কোন জলাশয় পেলাম না। এর আগে অনেক স্থানে নালা, ডোবা ও পুকুর মাঝে মাঝে দেখেছি। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-পথশ্রম এবং মনের উৎকণ্ঠায় বার বার বুক শুকিয়ে এসেছে, যেখানে একটুও জলের সন্ধান পেয়েছি সেখানেই জল খেয়ে নিয়েছি। কিন্তু এখন এই তিন মাইল পথে একেবারেই জলের সন্ধান মিললো না। ক্লান্তিতে অঙ্গ অবশ, তৃষ্ণায় প্রাণ অস্থির। সকলেই কাতর হয়ে পড়েছি। তার মধ্যে মাস্টারদা আর অম্বিকাদার অবস্থা অবর্ণনীয়। মাস্টারদা বার বার বলছেন, "আর ত ভাই পারছি না!"

সকলেই ক্লান্ত তবু যেতে হবে। যদি এক ফোঁটা জলও না পাই, তবু এগিয়ে যেতে হবে। এখন থেমে পড়া মানে শত্রুকে সুবিধা দেওয়া। পুলিশের হাতে ধরা পড়তে আমরা রাজী নই, লড়াই করে মরতে রাজী আছি যদি বর্তমান কর্মসূচী সফল না হয়। জনতা ও পুলিশবেষ্টনী ভেদ করে আমাদের পেঁাছতে হবে কলকাতায়।

তিন মাইল পথ কোনমতে দেহটাকে টেনে টেনে চলবার পর দেখা গেল সূর্যের আলোয় চিক্‌চিক করছে স্থির জলের রেখা। একটা স্কুলের সামনে এসে পড়েছি। বিরাট দীঘিতে শান্ত সুশীতল জল।

কিন্তু এখনও বেশ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে এগিয়ে আসছে একদল লোক। আমাদের রেহাই দেবে না কোনমতে। তাদের দিকে পিস্তল তাক করে তুলে ধরে আমরা মাস্টারদাকে বললাম আগে জল খেয়ে নিতে। তারপর একে একে আমরা সবাই প্রাণভরে জল খেয়ে নিলাম। দু' মিনিটের ভেতর আবার যাত্রা শুরু হল।

তারপর আবার মাঠ, ছোট ছোট পাড়া, মাঝে মাঝে সরু খাল বা নালা। খালের ওপর তক্তা ফেলে অথবা একটা কি দুটো বাঁশ দিয়ে পোলের ব্যবস্থা

হয়েছে। পার হবার পর প্রতিটি গ্রাম্য সেতু ভেঙে রেখে গেলাম যাতে অনুসরণ-কারীদের আসতে দেরি হয়ে যায়।

সুলুকবাহার বাড়ী থেকে বার মাইল পথ এসেছি। এবার সামনে সেই পাহাড়ের সারি, জঙ্গলে ঢাকা উঁচু টিলা সব। আর ভয় নেই। একবার জঙ্গলে ঢুকে পড়তে পারলে হয়ত এদের এড়ান যাবে। জঙ্গলে ঢুকবার আগে যাতে সবাই শুনতে পায় এমনি চীৎকার করে বললাম -

"নাও এবার এগিয়ে এস এখানে। এটা আমাদের এলাকা। এখানে যে ঢুকবে তাকেই মেরে ফেলা হবে।"

এইবার অনুসরণকারী দলটির গতি স্তব্ধ হল। ওরা আর সাহস পাচ্ছে না এগোতে। কে জানে কোন্ গাছের ওপরে বা আড়ালে লুকিয়ে থাকবে ডাকাতরা--দেখলেই গুলী করবে!

জঙ্গলের ভেতর কয়েক গজ এগোতেই দেখি ছোট একটি খাল, ঝোপে-ভরা পাহাড়ের গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে। বালির পাড় ভেঙে নেমে এলাম জলের কাছে। পরিষ্কার নির্মল জল। তলার বালি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। খালের পাড়ে বসে পড়লাম সবাই-- একটু বিশ্রাম করে নেব।

এখন আমাদের কেউ অনুসরণ করছে না। দেখতেও পাচ্ছে না কেউ। কিন্তু আর একটুক্ষণ বাদেই যখন শহর থেকে প্রধান পুলিশবাহিনী এসে পড়বে তখন অনুসরণকারী দলের কাছে তারা জানতে পারবে যে আমরা এই জঙ্গলে ঢুকেছি। তারপর চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে অনায়াসেই আমাদের আটকে ফেলবে। আমাদের দেখতে পেলে দূর থেকে রাইফেল ছুঁড়ে লক্ষ্য ভেদ করতে পারবে। কাজেই এখন এখানে বসে পড়া চলবে না। আরও এগোতে হবে, আরও অনেকটা পথ। অম্বিকাদা বললেন -"এই জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা যাক"-- কিন্তু আমার মন তাতে সায় দিল না। আমার কথা—"যতক্ষণ রাত্রি না হয় আমরা হেঁটে যাব। যতটা দূরে সরে যেতে পারি ততই ভাল। এখন থেমে গেলে পুলিশবাহিনী এসে আমাদের ঘেরাও করবার সুযোগ পাবে।"

আবার শুরু হল পথ। এবার উঁচু-নিচু বা সমতল মাঠ নয়। এখন পথ খাড়াই-এর দিকে। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পাহাড়ী-পথে ওঠা যে কি কষ্টকর তা' যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানেন। তার ওপর বার মাইল পথ তাড়া খেয়ে ছুটে পালাচ্ছি, শারীরিক এবং মানসিক ক্লান্তি অবর্ণনীয়। আমাদের পোষাক ছিঁড়ে গেছে, টুকরো টুকরো হয়ে ঝুলছে। চুল উস্কোখুস্কো। ডিসেম্বর মাসের দারুণ শীতেও গায়ে ঘাম। থলেগুলির মুখ হাঁ করা, তার ভেতর রয়েছে পিস্তল ডানহাতটায় পিস্তল ধরা। আমার এক পায়ে জুতো আছে, অন্য পা খালি। তবু উলের মোজা পরা রয়েছে বলে কাঁটা, পাথরের টুকরো আর এবড়োখেবড়ো মাটির আঘাত থেকে কিছুটা রক্ষা পাচ্ছে পা দুটি। পথশ্রমে, অবসাদে সকলের চোখ কোটরে বসে গেছে, মুখ ঝুলে পড়ছে। এই অবস্থায় পাহাড়ের ঢালু দিয়ে নেমে এই জঙ্গল এলাকার অপরপ্রান্তে উপস্থিত হলাম।

এখানে এই বনভূমির পশ্চিম দিকে, উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি পাকা রাস্তা চলে গেছে। এটি বাজেদবস্তান রোড—মুসলমানদের প্রসিদ্ধ দরগা এবং বিরাট বিরাট কচ্ছপ অধ্যুষিত একটি দীঘি আছে বাজেদবস্তানে। এই বাজেদ-

বস্তান মুসলমানদের তীর্থস্থান। হিন্দুরাও একে সমান পবিত্র স্থান বলেই মনে করে—ফকির সাহেবের দরগায় তারাও আসে ভেট নিয়ে; আসে নিজের নিজের প্রার্থনা জানাতে।

এখন আর পাহাড়ের শোভা বা চা-বাগানের দৃশ্য দেখে সময় নষ্ট করবার উপায় নেই। রাস্তাটি পার হয়ে ঐসব পাহাড়ের পেছন দিকে চলে যেতে হবে। কয়েকজন লোক কথা বলতে বলতে উত্তর দিক থেকে আসছে। তারা চলে গেলে পাহাড়ের ঢালু গা দিয়ে নেমে রাস্তা পার হতে গেলাম। সামনের ঐ পাহাড়টির ওপর উঠতে হবে এবার। পরে আমাদের বিচারের সময় শুনেছি ঐ পাহাড়ের নাম—'নাগারখানা।'

রাস্তা পার হচ্ছি যখন, তখন এক বন্দুকধারী চৌকিদার আমাদের দেখতে পেল। এই চৌকিদার থানার অন্তর্ভুক্ত। থানা থেকে সব চৌকিদার, দফাদারকে চারদিকে পাঠান হয়েছে নির্দেশ দিয়ে। মামলার সময় এ সব জানতে পারি। যদি কোন নির্দেশ এই চৌকিদার নাও জেনে থাকে তবু আমাদের চেহারা ও বেশভূষা দেখে আমরা যে সাধারণ শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসী নই, সে কথা বুঝতে তার দেরি হয় নি। সুতরাং সে হাঁক দিল -

"তোঁরা কন্ ?" (তোমরা কে ?)।

আমি উত্তর দিলাম, "আঁরা পথিক" (আমরা পথিক)।

—"কোডেত্তুন আস্তন জে ?" (কোত্থেকে আসছেন ?)।

—"ওই তো, ওই যে গ্রাম দেয়া জার্ ওভেত্তুন আইর্জে।"

—(ঐ যে গ্রাম দেখা যাচ্ছে—সেখান থেকে আসছি)।

—"হ, হ, কোডে জাতন জে ?" (হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোথায় যাচ্ছেন ?)।

—"ঐ পাহাড়ৎ বেড়ানর লাই জাইর জে"। (ঐ পাহাড়ে বেড়াতে যাচ্ছি)।

আমি কথা বলে চৌকিদারকে ব্যস্ত রাখছি। এদিকে এই সুযোগে মাস্টারদা, অম্বিকাদা, রাজেন আর উপেন ঐ পাহাড়ের ওপর উঠতে শুরু করে দিয়েছেন। খোকা আমার কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে। চৌকিদার আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমি এক পা এক পা করে তার দিকে এগোচ্ছি। আমার দৃষ্টি তার চোখের প্রতি নিবদ্ধ। তার হাতে বন্দুকটির অবস্থান আমার চোখ এড়ায় নি। তাকে কোনমতে গুলী ছুঁড়বার সুযোগ দিতে আমি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলাম।

চৌকিদার যদিও নানারকম প্রশ্ন করছিল, কিন্তু তার কাছে আমাদের প্রকৃত পরিচয় গোপন ছিল না। আমার ডান হাত যেভাবে থলের ভিতর রয়েছে তা' সে লক্ষ্য করেছে এবং সেখানে নিশ্চয়ই কোন আগ্নেয়াস্ত্র আছে এটাও সে বুঝতে পেরেছে। সেজন্য অত্যন্ত সন্তর্পণে আমি তার দিকে এগোচ্ছি। মাস্টারদারা পাহাড়ের অর্ধেকটা উঠে গেছেন। আমরা যদি এই পাহাড় থেকে গুলী ছুঁড়ি তবে হয়ত পিস্তলের গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে—এই ছিল আমাদের ভয়। তাই আমি ঠিক করেছি, কাছে গিয়ে ওর বন্দুকটা কেড়ে নেব।

কয়েকটা সেকেন্ড যেন একযুগ বলে মনে হ'ল। আগাগোড়া চৌকিদার তার বন্দুকটাকে 'ট্রেইল অর্ম' ভাবে, অর্থাৎ, মাটির সাথে সমান্তরাল করে ধরেছিল। আমাকে গুলী করতে হলে তাকে বন্দুকটি আরো তুলে লক্ষ্য করতে হবে।

এই মুখোমুখি বোঝাপড়া করবার অবস্থাতেও কিন্তু আমাদের প্রশ্নোত্তর ঠিক চলেছে। আমরা ঐ পাহাড়ে বেড়াতে যাব শুনে চৌকিদার মাথা নেড়ে বলছে—"হ! হ!" অর্থাৎ, ভাবে মনে হ'ল আমাদের কথা সে মেনে নিচ্ছে না। আমাদের রুক্ষ আকৃতি, ছিন্ন বাস এবং থলেতে হাত রাখার ভঙ্গী দেখে কোন অবোধ শিশুও এই ভ্রমণকাহিনী বিশ্বাস করবে না। আমি এবার চৌকিদারকে প্রশ্ন করলাম, "ইবা চা বাগিচা না?" (এটা চা বাগান না?)

—"হ, হ," (হ্যাঁ, হ্যাঁ)।

—"ইবা কার চা বাগিচা?" (এটা কার চা-বাগান?)।

এবার চৌকিদারের মুখে আর কথা সরছে না। তার চোখ দুটি বিস্ফারিত, মুখ ফ্যাকাসে. এখন আর বন্দুক তুলবার সময় নেই। আমি ঠিক দু' গজের মধ্যে এসে গেছি। উঁকি মেরে সে বোধহয় আমার থলেটার খোলামুখের ভেতরটা দেখতে চাইছিল। এক ঝটকায় ডানহাতে রিভলভারটা বার করে তার দিকে তাক্ করলাম. বাঁ হাতে চৌকিদারের বন্দুকটা ছিনিয়ে নেবার জন্য, সজোরে ধরলাম। চৌকিদার ঐ অবস্থাতেই ট্রিগারটি চেপে দিল। সোঁ করে ছুটে গেল গুলী। আমার রিভলভার থেকেও সঙ্গে সঙ্গে গুলীর শব্দ হ'ল। গোলমালে ও ঝটকাঝটকির মধ্যে ভাগ্যক্রমে চৌকিদারের গায়ে গুলী লাগে নি। সে বন্দুকটা ফেলে দিয়ে প্রাণভয়ে ছুটে পালাল। আমি তাকে আর গুলী না করে তার বন্দুকটা দু' টুকরো করে ভেঙে ফেললাম।

ইতিমধ্যে মাস্টারদা, অম্বিকাদা, উপেন আর রাজেন প্রায় পাহাড়টির ওপরে পৌঁছে গেছেন। এখন আমিও উঠতে লাগলাম। তখন বেলা প্রায় একটা। গত তিন ঘন্টা ধরে যে অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম গেছে তার ফলস্বরূপ শরীর ও মন দুইই অবসাদ গ্রস্ত। মনে হচ্ছে এই পাহাড়ের কোলেই বসে পড়ি. আর উঠে কাজ নেই। কিন্তু তার উপায় নেই। সঙ্গীরা এগিয়ে গেছে. আমাকেও যেতে হবে। এখানে বসে থাকার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। আমার মনে জোর এনে শরীরটাকে কোনমতে টেনে হিঁচড়ে পাহাড়ের পথে উঠতে লাগলাম। মৃত প্রাণে শক্তি সঞ্চার করবার জন্য মৃদু-স্বরে উচ্চারণ করতে লাগলাম. "নেপোলিয়ান!" "যতীন মুখার্জী!" আর ইংরেজীতে বলছিলাম There shall be no Alps! (কোন আল্পসই আমাকে আটকাতে পারবে না)।

এইসব বেশ জোরে জোরে বলছি আর এক পা এক পা করে উঠছি। প্রায় অর্ধেকটা পাহাড়ে উঠে গেছি এমন সময় নিচ থেকে খোকা চীৎকার করে উঠল -

"অনন্ত, অনন্ত! আমার পায়ে গুলী লেগেছে! হাঁটতে পারছি না। নেমে এস তাড়াতাড়ি। আমাকে নিয়ে যাও. আমি যেতে পারছি না!"

মনে হ'ল আর এগিয়ে কাজ নেই। আমি যে তখন আর পারছি না। মাস্টারদারা তো নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেছেন, আমি আর খোকা পড়ে থাকি এখানে। নিজের শরীরের ভারই অসহ্য মনে হচ্ছে, তবু কোনমতে এতদূর উঠে এসেছি। এরপর নিচে নেমে আবার খোকাকে নিয়ে পাহাড়ে ওঠা! কল্পনাও করা যায় না।

আজ বলতে পারব না কি করে তা' সম্ভব হয়েছিল--সেই দিন সেই সময়ে। কোথা থেকে শক্তি পেলাম জানি না। আমি নিচে নেমে এলাম।

খোকার কাছে গিয়ে দেখি সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে, খুব হাঁপিয়ে গেছে আর কেবল বলছে,—

"আমার গুলী লেগেছে! গুলী লেগেছে।"

'কোথায় গুলী লেগেছে' প্রশ্ন করতে সে আমাকে তার লুংগি খুলে ফেলতে বলল, শুধু আণ্ডারওয়ার পরে থাকতে চায় ও। লুঙ্গি খুলবার ক্ষমতাও তখন ওর আর নেই। লুংগিটা বর্জন করে ভার লাঘব করতে চাইছিল।

যাঁরা এইরূপ অবস্থায় পড়েছেন তাঁরা, আর সৈন্যরা যখন লড়াই করতে করতে অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখনকার অভিজ্ঞতা দিয়ে তাঁরাই কেবল বুঝতে পারবেন এই অবসন্নতা কি সাংঘাতিক--কতখানি স্নায়বিক দুর্বলতা এনে দেয়!

আমি কাছে গিয়ে ভাল করে তার শরীরের সব জায়গা লক্ষ্য করে দেখলাম—গুলীর আঘাতের চিহ্ন কোথাও নেই। গুলীর টুক্‌রো ছুটে এসে কোথাও আঘাত করতে পারে- সে রকমও কিছু নেই। এখন ও বলল যে ও ভেবেছে চৌকিদারের বন্দুকের গুলী বুঝি ওর গায়ে লেগেছে। আঘাত লাগুক আর না লাগুক তার আর হাঁটবার শক্তি নেই।

এখন কি করি? চৌকিদার পালিয়ে খুব বেশি দূর যায় নি। নিরাপদ দূরত্বে থেকে চেঁচামেচি করে লোকজন জড় করতে চেষ্টা করছে। রাস্তাটি নির্জন, লোকালয় থেকে একটু দূরে, কাজেই এখনো বেশি লোক জমা হয় নি। এখানে দেরি করলে চৌকিদার দলবল জুটিয়ে তাড়া করতে পারে। তা' ছাড়া পেছনে আসছে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। অপেক্ষা করবার সময় নেই। ঐ পাহাড়ের ওপরে উঠতে হবে। তারপর যা হয় হবে।

সেদিন কোথা থেকে শক্তি সংগ্রহ করেছিলাম জানি না। শুনেছি নিমজ্জমান ব্যক্তি একটি তৃণখণ্ড পেলেও আঁকড়ে ধরে। আমি বোধহয় জীবন ধারনের প্রয়াসে আমার শরীরের যেখানে যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল সব একত্র জড় করেছিলাম। আমি মৃতপ্রায় ছিলাম বটে, তবে একেবারে ত মৃত নই! বোধহয় "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ" এই কথাটা মেনে নিয়ে খোকাকে পিঠে করেই ওপরে ওঠা স্থির করলাম।

কাঁধের ওপর দিয়ে খোকার একটি হাত বুকের ওপর এনে বাঁ হাত দিয়ে সেটি চেপে ধরলাম, তার দেহটি তুলে সোজা আমার পিঠের ওপর রাখলাম। ডান হাতে রিভলভার ধরা। প্রথমটা মনে হল এখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে যাব, আর উঠতে পারব না। আবার পরক্ষণেই সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা চোখের ওপর ভেসে উঠল। পেছনে আসছে শত্রু-বাহিনী। যেতেই হবে, উঠতেই হবে ঐ পাহাড়ে। নেপোলিয়ান দুর্লঙ্ঘ্য আল্পস লঙ্ঘন করেছিলেন, আর এ তো তুচ্ছ একটা টিলামাত্র!

খোকাকে পিঠে নিয়ে সেদিন কি করে পাহাড়ের ওপরে গিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম মনে নেই। কখন এক পা এক পা করে এগিয়ে,

কোথাও শরীরটাকে ঝাঁকি দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে চলেছিলাম—মাঝে মাঝে একটু করে থামছিলাম নিঃশ্বাস নেবার জন্য।

পাহাড়ের ওপরে পৌঁছনর সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারদা ঠিক এই ক'টি কথা ঠিক এই ভাবায় বললেন যা আমার আজও সুস্পষ্ট মনে আছে—"অনন্ত! আর হাঁটতে পারছি না। এখানেই শিবির করা হোক্।"

সকলেরই একই অবস্থা "আর হাঁটতে পারছি না।" কিন্তু এই পাহাড়ের নিচেই চৌকিদারের সঙ্গে গুলী বিনিময় হয়েছে। ওরা দেখেছে আমরা এই পাহাড়ে উঠেছি। এখন এখানে থাকা মানে নিঃসন্দেহে শত্রুকে নিজেদের অবস্থানের সন্ধান দেওয়া। আর খানিকটা এগিয়ে না গেলে আমরা অনুসরণকারী সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর দৃষ্টি এড়াতে পারব না। সুতরাং আমার মত ছিল শত কষ্ট হলেও আরও এগিয়ে যাওয়া। তা' আর সম্ভব হ'ল না।

আমার প্রস্তাবে এবার কেউই সায় দিল না। সকলেই একেবারে ক্লান্ত ও অক্ষম হয়ে পড়েছে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ান যাবে বলে মনে হচ্ছে না। তবে এখানেই হোক সেই যুদ্ধক্ষেত্র। আমরা এই পাহাড়ের ওপর খুব সুবিধেজনক জায়গায় ছিলাম না। এখান থেকে লড়াই অবশ্যই করব কিন্তু পুর্ণ সুযোগ নিয়ে যুদ্ধ করা যাবে না। তা' ছাড়া মাস্টারদার আর হাঁটবার ক্ষমতা সত্যিই নেই। মাস্টারদাকে ফেলে এগিয়ে যাবার কথা কল্পনাতেও কারো মনে স্থান পায় নি। হয় মাস্টারদা আমাদের সঙ্গে যাবেন, নয়ত এখানেই একত্রে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে প্রাণ দেব।

সুতরাং সেখানে সেই নাগারখানা পাহাড়ের ওপরে অপ্রশস্ত জায়গায়, ঝোপের মধ্যে আমাদের শিবির স্থাপিত হ'ল। আর কয়েক গজ এগোলে একটা ঘন জঙ্গলের বড় গাছের আড়াল থেকে যুদ্ধ করবার সুবিধে হত, কিন্তু সেটুকু হেঁটে যাবার ইচ্ছেও কারো নেই, এমনি দুর্ভাগ্য! সুতরাং চৌকিদারের সঙ্গে লড়াই-এর পর যে পথ দিয়ে আমরা পাহাড়ে উঠেছি ঠিক সেই পথের ওপর আমরা পিস্তল হাতে করে অপেক্ষা করছি শত্রু-সৈন্যের।

শত্রুরা এই পথেই উঠে আসবে জানি। ঠিক সামনে আমি একটা ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে পিস্তল হাতে প্রস্তুত রয়েছি। আমার পরে উপেন তারপর মাস্টারদা, অম্বিকাদা, রাজেন এবং একেবারে শেষপ্রান্তে রয়েছে খোকা। চার ঘণ্টা ধরে অনাহার, অশান্তি ও উদ্বেগে দীর্ঘ চোদ্দ মাইল পথ অতিক্রম করবার পর প্রত্যেকেরই এখন প্রয়োজন বিশ্রামের। এভাবে বসে থাকায় সে প্রয়োজন হয়ত মিটল, কিন্তু তার বিনিময়ে যা দাম দিতে হ'ল, এই বিশ্রামের তুলনায় সে ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত বেশি।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট একভাবে বসে আছি। পাহাড়ের নিচে যেখানে চৌকিদারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল, সেখানে ইতিমধ্যেই বহু লোক জড় হয়েছে। তাদের কথাবার্তার মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি কানে আসছে। মাঝে মাঝে পুলিশের বাঁশীর শব্দ শুনে বুঝতে পারছি পুলিশও এসে গেছে। পাহাড়ের চারিপাশ থেকেই শব্দটা আসছে, সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ওরা পাহাড়টাকে চারিদিক থেকেই ঘিরে ফেলেছে।

একভাবে বসে আছি প্রস্তুত হয়ে। হঠাৎ মনে হ'ল কথাবার্তার শব্দ,

হুইসেলের শব্দ যেন আরও একটু স্পষ্ট হয়ে উঠল। একদল সশস্ত্র পুলিশ ওপরে উঠে আসছে। তাদেরই কথাবার্তা আমরা শুনতে পাচ্ছি।

পুলিশরা হয়ত ভাবছিল আমরা খুব সম্ভব এই পাহাড়ের ওপরে নেই। কারণ, প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে এই পাহাড়ের ওপর বসে থাকা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য—এটা মনে করাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। আবার যদি কোথাও লুকিয়ে বসে থাকি তবে ওরা উঠতে চেষ্টা করলেই আমরা যে প্রথম আক্রমণ করব এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই তাদের মনে। তাই ওরা দল বেঁধে উঠছে আর স্কাউট হিসেবে পুরোভাগে দু-একজনকে রেখেছে। স্কাউটরা মনে সাহস আনবার জন্য মুখে বলছে "জানের কি পরোয়া! জানের কি পরোয়া!"

ওদের জানের পরোয়া থাকার কথা নয়। যদি বৃটিশের পক্ষে যুদ্ধে ওরা প্রাণ দেয়, বীরত্বের জন্য পুরস্কার পাবে—আজীবন ভরণপোষণ পাবে ওদের পরিবার। মৃত বিপ্লবীদের পরিবারের মত অনাহারে প্রাণ যাবে না তাদের। তাই ওরা বন্দুক হাতে ওপরে উঠে আসছে আর মুখে বলছে

"জানের কি পরোয়া! জানের কি পরোয়া! জানের" ব্যাস্, মুখে আটকে গেল কথাটা। ওরা আমাকে দেখতে পেয়েছে এতক্ষণে। আমি কিন্তু ঝোপের আড়াল থেকে অনেক আগেই ওদের দেখতে পেয়ে আমার কোল্ট রিভলভারটি ওদের দিকে মুখ করে স্থির লক্ষ্য রেখে ট্রিগারে আঙ্গুল স্পর্শ করে আছি কেবল টিপে দেওয়া বাকি।

অবস্থাটা বেশ বুঝতে পেরেছে ওরা তাই কথাটা মুখে আটকে গেছে। আমি বসে আছি ঠিক অস্ত্রচালনার ভঙ্গীতে - বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপর রিভলভারটা রেখে একেবারে ওদের দিকে তাগ করে। ওদের অস্ত্র হাতে ঝোলান, তুলে আমার দিকে তাগ করবার সময় নেই। তবু ওরা যুদ্ধের রীতি অনুসারে শত্রুর অজ্ঞাতে খুব ধীরে ধীরে বন্দুক তুলতে গেল। ওদের মতলব বুঝতে আমার দেরি হল না। তৎক্ষণাৎ পর পর দু' রাউন্ড গুলী ছুঁড়লাম। বীরমোহন বড়ুয়ার উরুতে এবং আলি হোসেনের কণ্ঠ-অস্থিতে গুলী লাগল, সিপাই দু'জন পাহাড়ের নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ল। পড়ে যাওয়ার আগে ওরা দুজনেও 'ট্রেল' অবস্থাতেই গুলী ছুঁড়ল। কিন্তু লক্ষ্য স্থির না থাকায় একটি গুলীও আমাদের ছ'জনের কারো গায়ে লাগল না। এই সিপাইদের নাম ও তাদের গুলী ছোড়ার বিবরণ তারা আমাদের মামলার সময় বলেছিল।

সিপাই দুজনকে গুলী খেয়ে গড়াতে দেখে আর কোন সিপাই তক্ষুণি উঠতে সাহস করল না। যুদ্ধের কায়দায় এগোবার জন্য তারা প্রথমে পাহাড়টিকে ঘিরে ফেলল। এই সময় আমরা নিজেরা এক কাণ্ড করে বসলাম। মাস্টারদা, অম্বিকাদা আর রাজেন দাস পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে ফেলেছে আত্মহত্যা করার উদ্দেশ্যে। ক্লান্তি এবং অবসাদে ওঁদের শারীরিক শক্তি একেবারে শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিল। পুলিশের হাতে যাতে ধরা পড়তে না হয় সেজন্য তাঁরা নিজেদের সংগে বিষ খেয়ে ফেললেন। আমাদের সকলের সংগেই প্রয়োজন হলে ব্যবহারের জন্য পটাসিয়াম সায়ানাইড ছিল। তাড়াতাড়িতে সেদিন কাগজের পুরিয়াতেই বিষ রেখেছিলাম।

এক মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাটি ঘটে গেল। মাস্টারদা যখন বললেন যে, ওঁরা বিষ খেয়েছেন, খোকা ঐ প্রান্ত থেকে ডেকে আমাকে প্রশ্ন করল আমি কি

করতে চাই। আমি উত্তর দিলাম যে, কোন মতেই আমি ধরা দেব না, এখান থেকে আরো পেছিয়ে যাব, শেষ পর্যন্ত লড়াই করব। খোকারও তাই মত। উপেন আমার পাশে ছিল, সে বিষ খায় নি। আমরা তিনজন এখান থেকে চলে যাব ঠিক করলাম।

মাস্টারদা আর অম্বিকাদার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আমাদের ভাগ্যে এখন কি লেখা আছে কে জানে? শেষ পর্যন্ত যদি পালাতে না পারি তবে শত্রুপক্ষের গুলীতে প্রাণ যাবে। আর যদি পারি, তাহলে এই শেষ দেখা। পরস্পর বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে যাত্রা করব, এমন সময় রাজেন উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। ওর মনে আফশোস হয়েছে, বলছে, "ভাই আমি যে বিষ খেয়ে ফেলেছি!"

সে যুগের বিশ্বাস অনুযায়ী আমি বললাম,—"ভগবানকে ডাক—হয়ত বিষও হজম হয়ে যাবে!"

কয়েক পা আমাদের সঙ্গে গেল রাজেন। তার পা কাঁপছিল। ওর মুসার পিস্তলটি আমাদের কাউকে দিতে বললাম। বিপদের সঙ্গী পিস্তলটি দিয়ে দিতে সে ইতস্তত করছে! বললাম, "তোমার বইতে কষ্ট হচ্ছে, কাওকে দাও। দরকার হলে আবার তুমি নিয়ে গুলী ছুঁড়বে।"

রাজেন পিস্তলটি দিয়ে দিল, কিন্তু আর হাঁটতে পারল না। কাঁপতে কাঁপতে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই বসে পড়ল। একবার গড়িয়ে তার দেহটা স্থির হয়ে গেল।

পটাসিয়াম সায়ানাইড বিষের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তখন আমাদের কোন ধারণা ছিল না। ঐ বিষ খেলে এক সেকেণ্ডে মানুষ মরে যায়, তাই জানতাম। কিন্তু রাজেন কি করে আমাদের সঙ্গে হেঁটে এল এই বিষয়ে বিশ্লেষণ করবার সময় বা মনের অবস্থা তখন আমাদের ছিল না। এই প্রথম কাওকে আমরা বিষ খেতে দেখলাম। ভাবলাম, এইভাবেই বোধ হয় পটাসিয়াম সায়ানাইডের ক্রিয়া হয়-যা' শুনেছি এত দিন- এক সেকেণ্ডে মরে যায়, তা' ঠিক নয়।

আমাদের তিনজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমাদের সুখ-দুঃখের সাথী, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে এই ভাবে নাগারখানা পাহাড়ে প্রাণ দিলেন! চিরদিনের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন! তবু শোক করবার সময় নেই, থামবার উপায় নেই! এখন শুধু এগিয়ে যাওয়া, শুধু এই শত্রু-ব্যূহ থেকে বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজে বেড়ান।

ভারাক্রান্ত মনে তিনজন এগিয়ে চললাম। পাহাড়ের পূর্বদিক থেকে এসেছি আমরা। সেখানে লোকজন সব জড় হয়ে আছে, ওদিক দিয়ে নামবার উপায় নেই। এই একক বিচ্ছিন্ন পাহাড়টি থেকে নেমে যদি পশ্চিমে বা দক্ষিণে যেতে পারি তবেই একটানা পাহাড়ের সারি পেয়ে যাব। সেখানে একবার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে পারলে আর পুলিশ আমাদের খুঁজে পাবে না। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। থানা অফিসার আব্দুল মজিদ, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেণ্ট মিঃ শ্যালোকে সংবাদ দেবার পর পাঁচ ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন পুলিশ লাইনের সমস্ত পুলিশ, আশেপাশের সব চৌকিদার, দফাদার আর স্থানীয় উৎসাহী লোক এসে এই নাগারখানা পাহাড়টিকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে, কোনদিকে পালাবার পথ নেই।

পাহাড়ের ওপরটায় অনেকখানি জায়গা সমতল। এই সমতলের পূর্ব-প্রান্তে আমরা পুলিশের সঙ্গে গুলী বিনিময় করেছি। এখন ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে পশ্চিম দিকে যেতে চেষ্টা করলাম। পাহাড়ের গা দিয়ে নেমে একবার পশ্চিম দিকের শ্রেণীবদ্ধ পাহাড়ের মধ্যে যেতে পারলে আর আমাদের ভয় নেই। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। নাগারখানা পাহাড়ের পশ্চিমে আরো উঁচু একটি পাহাড়ের মাথায় শত্রুরা ওৎ পেতে বসে আছে। আমাদের পশ্চিম দিকে আসতে দেখে ওরা কয়েক রাউণ্ড গুলী ছুঁড়ল।

আকস্মিক গুলী-বৃষ্টিতে আমরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। পরস্পর প্রশ্ন করলাম কারো আঘাত লেগেছে কি না। না, কারো লাগে নি। গুড়িমেরে বড় গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে আমরাও এবার ওদের লক্ষ্য করে গুলী চালালাম। প্রায় পনের মিনিট ধরে গুলী বিনিময় চলল। গাছের আড়ালে থাকায় আমাদের কারো গায়ে গুলী লাগে নি। এখান থেকে গুলী চালিয়ে ওদের বোঝাতে চাইলাম যে, আমরা পশ্চিমদিকেই আছি। তারপর গুলী চালান বন্ধ করে অতি সন্তর্পণে খুব ধীরে ধীরে উত্তরদিকে চললাম। উত্তর-দিকে লুকোবার মত পাহাড়ের সারি নেই, তবু মনে হল হয়ত এদিক দিয়ে পালাবার পথ খোলা আছে।

উত্তরদিকে নামবার চেষ্টা করতেই পাহাড়ের নিচ থেকে গুলী ছুটে এল আমাদের লক্ষ্য করে। আমরা খুব সন্তর্পণে ঝোপ বা গাছের আড়ালে এগোচ্ছিলাম, তাই তাদের গুলী আমাদের গায়ে লাগল না। তবে বুঝলাম যে, এদিকে পাহাড়ের নিচে বড় বড় গাছের আড়ালে ওরা লুকিয়ে আছে। আমরাও গাছের আড়াল থেকে ওদের দিকে গুলী চালাতে লাগলাম। আড়ালে থাকার জন্য এবং পরস্পরের দূরত্ব খুব বেশি ছিল বলেই কারো গুলীতেই কেউ আহত হলাম না। এখানেও প্রায় দশ-বার মিনিট যুদ্ধ চলল।

এবার কোন দিকে যাই? পূর্ব-দিক তো আগে থেকেই বন্ধ। পশ্চিম দিকে উঁচু পাহাড়ে শত্রুসৈন্য রয়েছে, দক্ষিণ দিকে গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে তারা। বাকী রইল একমাত্র উত্তর দিক। এদিক দিয়ে যদি কোন মতে পুলিশ-বেষ্টনী ভেঙে বেরতে পারি, তবে খুব সুবিধে হয়। কারণ, এদিকে খুব ঘন-জঙ্গল আর গায়ে গায়ে লাগা পহাড়ের সারি। কিন্তু একটা বিপদ আছে; এদিক দিয়ে নামতে গেলে পূর্ব-দিকে যেখানে আমরা চৌকিদারের বন্দুক কেড়ে নিয়েছি তার খুব কাছ দিয়ে যেতে হবে। এইখানটাতেই জনতার ভিড় বেশি। যাই হোক্, একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?

উত্তর দিক দিয়ে নামবার পথটা মোটেই সুবিধের নয়। অত্যন্ত ঘন ঝোপ, কাঁটাগাছ আর লতায় জড়ান পথে বারে বারে বাধা পাচ্ছিলাম। কোন মতে পথ করে নিচ্ছি, না হলে নিরুপায়। উত্তর দিকে পাহাড়ের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছেছি, এমন সময় বিপরীত দিকের পাহাড় থেকে এক ঝাঁক গুলী এসে আমাদের আশেপাশে পড়ল। পুলিশ মাস্কেট্রির আওতার ভেতর রয়েছি আমরা। লক্ষ্য স্থির করে গুলী চালাতে ওদের কোন অসুবিধে হচ্ছে না। আমরাও আমাদের দূর-পাল্লার রিভলভার আর মুসার পিস্তল দিয়ে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিচ্ছি। এইভাবে চলল প্রায় পাঁচ মিনিট।

এখন উপায় কি? চারদিকে শত্রুবেষ্টিত ব্যূহের মধ্যে পড়ে গিয়েছি

আমরা। বার বার গুলী চালানতে আমাদের অবস্থান এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও ওদের একটা ধারণা হয়ে গেছে। পাঁচ মিনিট গুলী চালাবার পর তাই সঙ্গীদের কানে কানে বললাম--

"আর গুলী চালাব না। ওরা মনে করুক আমরা মরে গেছি।"

আমরা গুলী চালান বন্ধ করলাম। এখন পুলিশের শ্যেন চক্ষু উপেক্ষা করে কোন মতে যদি নিচে নামতে পারি, তবে হয়ত একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব যে বেষ্টনী অতিক্রম করে অন্য পাহাড়ে আশ্রয় নিতে পারি কি না। এই আশায় বুক বেঁধে অতি ধীরে ধীরে সাবধানতার সঙ্গে এমনভাবে নিচে নামতে লাগলাম যাতে পুলিশ আমাদের দেখতে পাওয়া তো দূরের কথা, ঝোপঝাড় নড়তেও দেখতে না পায়। একরকম পেটের ওপর ভর দিয়ে দিয়ে শামুকের মত চলেছি। ঝোপের আড়াল থেকে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে নামছি।

আমরা গুলী চালান বন্ধ করলেও ওরা মাঝে মাঝেই এদিকে গুলী ছুঁড়ছিল। প্রায় পনের মিনিট পরে ওরা চুপ করলে। হয়ত ভাবল আমরা মরে গেছি বা অন্য কোথাও চলে গেছি।

অন্য দিক থেকেও মাঝে মাঝে গুলীর শব্দ আসছে। ওরা গুলী ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমাদের প্রকৃত অবস্থান বুঝবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমরা আর তাদের সেই সুযোগ দিতে রাজী নই। ওরা এবার সত্যিই স্তব্দ হয়েছে, ঠিক বুঝতে পারছে না আমরা বেঁচে আছি কিনা বা কোন দিকে আছি।

পাহাড়ের গা দিয়ে শামুকের মত পিছলে পিছলে নামতে প্রায় চল্লিশ মিনিট সময় লাগল। এদিকটায় পাহাড়ের গায়ে ঝোপ-জঙ্গল আর বড় বড় গাছ বেশি থাকায় তার আড়ালে আড়ালে আমরা শেষ পর্যন্ত শত্রুপক্ষের অগোচরে নিচে নামলাম। যেখানটায় আমরা এসে নামলাম ঠিক সেখানে একটা বিরাট বটগাছ। বটগাছের আড়ালে এমনভাবে তিনজন বসলাম যেন সামনে থেকে কেউ এলে আমাদের দেখতে না পায়। পিছনটা কিন্তু আমাদের অরক্ষিত। শত্রুসৈন্য যদি ওদিক থেকে এসে গুলী করে, তবে আর বাঁচবার বা পালাবার কোন রাস্তা নেই।

বটগাছটার দক্ষিণ দিয়ে একটি সরু পায়েচলা-পথ চলে গেছে পূব থেকে পশ্চিমে। এই পথটির ওপারে আর একটি পাহাড়। অর্থাৎ, আমাদের পিছনের নাগারখানা পাহাড় আর সামনের এই পাহাড়টির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে এই পথ।

এই পথের দুপাশে, পাহাড়ের কোলে, খানিকটা করে সমান জায়গা। সেখানে বড় বড় ঘন ঘাসের বন। আমাদের থেকে প্রায় একশ গজ দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, পথটির অপর পারে একটি বিরাট গাছ, খুব সম্ভবত বটগাছ। এই গাছটা আমাদের লুকোন জায়গা থেকে ঝোপের আড়াল দিয়ে দেখা যাচ্ছে। দেখছি ওখানে কারা মাঝে মাঝে বিড়ি ধরাচ্ছে, আর খাকী পোষাকে লোকেরা নড়াচড়া করছে। মাঝে মাঝে কানে আসছে অস্ফুট একটা গুঞ্জন-ধ্বনি—যেন কয়েকজন লোক কথা বলছে।

অন্য দিকে দক্ষিণ-পূর্ব থেকেও অনুরূপ ধ্বনি কানে আসছিল। তবে এই স্থানটি আগেকার চেয়ে আর কিছুটা দূরে বলে শব্দ স্পষ্ট বোঝা

যাচ্ছিল না। এখন আমরা যদি রাস্তা পার হয়ে দক্ষিণে যেতে চাই তাহলে দু' দলই আমাদের দেখতে পাবে। কাজেই সে চেষ্টা না করে পিস্তল তৈরি রেখে সবাই গাছের আড়ালে বসে রইলাম। এখন আমাদের সামনে দু'রকম বিপদের আশঙ্কা। এক পেছন থেকে শত্রুর আক্রমণ, যার বিরুদ্ধে কিছুই করবার নেই; আর দ্বিতীয়—যদি এখানে টহলদারী পুলিশ আমাদের দেখতে পায়, তবে সামনাসামনি যুদ্ধ করে মরতে হবে।

আরও উত্তর দিকে, যে পাহাড়টি থেকে এই কিছুক্ষণ আগেও আমাদের ওপর গুলী-বর্ষণ করা হচ্ছিল, সেখানে কিন্তু এখন আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমরা। দুই দল রক্ষীর মাঝখান দিয়ে রাস্তা পার হয়ে ওধারে পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেলে হয়ত বিপদ কাটতে পারে। এখন বেলা ঠিক চারটা। ডিসেম্বরের বিকেল বলে সূর্য এখনি অনেকটা হেলে পড়েছে পশ্চিমে। কাজেই, যদি আর দু' ঘন্টা এখানে নিরাপদে বসে থাকতে পারি তবে সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার যখন এই পাহাড় জঙ্গল সব ঢেকে ফেলবে, তখন হয়ত পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে জঙ্গলের ভেতর চলে যেতে পারব। জানি না এখন উত্তরের পাহাড়টির মাথায় শত্রুসৈন্য ঘাঁটি আগলে বসে আছে কি না। কিন্তু এ ছাড়া আর পথই বা কোথায়?

মোটা গাছটার আড়ালে তিনজনে স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। কোন কথা বলছি না, নড়াচড়া করছি না; নিতান্ত প্রয়োজন হলে পরস্পরের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছি। আর, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছি পশ্চিম প্রান্তে অস্তগামী সূর্যের দিকে। কিন্তু সূর্য আজ আমাদের প্রতি অত্যন্ত অকরুণ; তার যাওয়ার কোন তাড়া নেই। ধীরে-সুস্থে এক-পা এক-পা করে চলেছে সে, থেকে থেকে মনে হচ্ছে যেন থেমেই রয়েছে।

পুলিশের সাথে বার বার গুলী বিনিময় করে শ্রান্ত হয়ে এই নাগার-খানা পাহাড়ের পাদদেশে বসে আমরা তিনজন আসন্ন সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করছি। এই পাহাড়ের শিখরে রয়েছে আমাদের বাকী তিনজন সঙ্গী—অন্ধকারের জন্য প্রতীক্ষা করার দায় তাদের ঘুচে গেছে, দিনের আলো চিরদিনের জন্য তাদের জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে!

আজ, এই ডিসেম্বর মাসের স্বল্পায়ু দিনেও, কেন সূর্যের আলো আমাদের আশেপাশের এই পাহাড়, এই বনভূমির মায়া কাটাতে পারছে না? হে দিবাকর, ওপারে যে পৃথিবী তোমার ভাস্বর রূপ দেখবার প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে আছে তাদের প্রতি সদয় হও—আমাদের প্রতি সদয় হও! লজ্জাবনতা সন্ধ্যা-বধূর অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আমাদের অস্তিত্ব লুপ্ত করে দাও!

আবার এ কী বিপদ! একটা রাখাল দক্ষিণ-পশ্চিমের পুলিশ-পোস্ট থেকে এদিকে এগিয়ে আসছে! তার মুখে একটানা দেশীয় সুরে "ঘি-ঘি" আওয়াজ শুনে বোঝা যাচ্ছে ও তার গরুগুলিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এদিকে একটিও গরুর চিহ্ন নেই। বুঝলাম পুলিশই ওকে আমাদের অনু-সন্ধানে পাঠিয়েছে। গরু তাড়ানর ছল করে তাই ও এদিক-ওদিক ঘুরছে, যদি আমাদের কারো সন্ধান পায়। আমাদের বটগাছটা পার হয়ে সে পূব দিকে চলে গেল। মুখে "ঘি! ঘি!" আওয়াজ আরও বেড়ে চলেছে; কিন্তু চোখ

রয়েছে তার পাহাড়ের ওপর, যেখান থেকে আমরা শেষবার গুলী ছুঁড়েছিলাম —সেখানে।

আমরা যে পাহাড়ের নিচে নেমে এসেছি তা' ও বেচারা ধারণা করতে পারে নি। আমাদের থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে ও মুখ তুলে পাহাড়ের ওপরে 'গরু' খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমরা ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

হঠাৎ ও আমাদের দেখতে পেল। দেখল তিনটি রিভলভার ওর দিকে উঁচু হয়ে স্থির হয়ে আছে, তিনটি 'ডাকাত' ওর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। মুহূর্তের মধ্যে ওর মুখ একেবারে রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা আঙ্গুলে ঠোঁট চেপে ওকে শব্দ না করতে ইঙ্গিত করলাম। তারপর মুখে দৃঢ়তার ছাপ এনে ভুরু কুঁচকে বাঁ হাত নেড়ে ওকে আমাদের দিকে আসতে বললাম।

এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এল রাখাল আমাদের দিকে। তখনো মুখ থেকে ভয়ের ভাব যায় নি। কিন্তু আমার আদেশ অমান্য করবার সাহসও তার নেই।

কাছে আসতেই পুলিশের দৃষ্টিপথের আড়ালে গাছের পেছনে তাকে বসিয়ে, তার কানে কানে বললাম "হুন ভাই, তোঁয়ার লয় এগ্গুয়া কথা কইয়্ যে। আঁরা বোৎ বিপদৎ আছি। পুলিশ হওলে আঁরার দোস্তউনোরে মারি ফেলাইয়ে। আঁরা স্বদেশী মানুষ। খিলাফৎ আর কংগ্রেসর লাই আঁরা গরমেন্টর লয় যুদ্ধ কইরগাম। তোঁয়ার কাছে ভাই আঁরা এই বিপদৎ সাইয্য চাই! আঁরা তোঁয়ারে খুব খুশি কইরগাম্। টেঁয়া দিয়ম্। এক হাজার টেঁয়া দিয়ম। রাতুয়া আঁরারে এডত্তুন লই যাইবা। তোঁয়ার বাড়ীৎ যাইএরে আঁরা খাইয়ম্ আর আঁরারে লুঙ্গি আর টুপি দিও। হেই রাইতই আঁরা যাইয়ম গৈ ......।" (শোন ভাই, তোমার সঙ্গে একটা কথা বলছি। আমরা খুব বিপদে আছি। পুলিশরা আমাদের বন্ধুদের মেরে ফেলেছে। আমরা স্বদেশী। কংগ্রেস ও খিলাফতের জন্য আমরা গভর্ণমেন্টের সঙ্গে যুদ্ধ করব। তোমার কাছে ভাই এই বিপদে আমরা সাহায্য চাই। আমরা তোমাকে খুব খুশি করব। টাকা দেব। এক হাজার টাকা দেব। রাত্রে আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবে। তোমার বাড়ী গিয়ে আমরা খাব, আর আমাদের লুঙ্গি ও টুপি দেবে। সেই রাত্রেই আমরা চলে যাব)।

রাখালের মনোভাব এক নিমেষেই উল্টে গেল। আমাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে সে নিজের কথা শুরু করল

"বাউ আঁই বড়্ গরীব—বড়্ গরীব বাউ। কোন ডর নাই বাউ। আঁওনারা এড়ে চুপ করি বই থাকতক্। আঁই আঁওনরারে লই জাইয়ম্।" (বাবু, আমি বড় গরীব—বড় গরীব বাবু। কোন ভয় নেই বাবু। আপনারা এখানে চুপ করে বসে থাকুন। আমি আপনাদের নিয়ে যাব)।

আমি তখন ওকে ক'টা দশ টাকার নোট দিয়ে দিলাম, সব মিলে পঞ্চাশ টাকার বেশি নয়। রাখাল টাকাটা নিল। টাকা নিয়ে যখন সে চলে যাবে ঠিক তখনি আমার মনে হল, "কাজটা ঠিক করলাম ত?" "যদি ও বিশ্বাসঘাতকতা করে!" "ওকে ধরে রেখে দিলেই ভাল হত"...ইত্যাদি। তবে নেপোলিয়ানের

"No risk, no gain" এই কথাটা সে যুগে আমি খুব মানতাম। অনেক বেশি লাভের আশায় আমি সেদিন এই ঝুঁকিটা নিলাম।

কয়েক মিনিট সময় মাত্র—মনে হচ্ছে যেন কয়েকটি যুগ। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে রিভলভার শক্ত করে ধরে বসে আছি, আর সামনে পিছনে, আশেপাশে তাকিয়ে বুঝলাম চেষ্টা করছি কোন্ দিক থেকে প্রথম আক্রমণ শুরু হবে। ঐ চাষী রাখালটি যদি তার কথা না রাখে, যদি সে তার পুলিশ প্রভুদের কাছে আমাদের অবস্থান সম্বন্ধে নির্দিষ্ট সংবাদ জানায়, তবে তারা কি করবে? কোন একদিক থেকে আক্রমণ না চালিয়ে নিশ্চয়ই তিনদিক হতে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করবে। একদল আসবে নাগরখানা পাহাড়ের ওপর থেকে আর দুদল দুপাশের রাস্তা দিয়ে। কলে-পড়া ইঁদুরের মত নিষ্ফল গুলীবর্ষণ করে আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে।

আর, যদি সেই গরীব চাষীটি আমাদের বন্ধু হয়? ও যখন চলে যায় ভাল করে লক্ষ্য করলাম ওর গতিবিধি। মুখে সেই একটানা একঘেয়ে সুরে 'ঘি! ঘি!' শব্দ করতে করতে উত্তর পশ্চিমের পুলিশ-পোস্টের দিকে গেল। ঠিক বোঝা গেল না কি আছে ওর মনে!

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বসে প্রহর গুণছি তিনজনে। এক এক মিনিটই যেন এক এক প্রহর! প্রায় দশ মিনিট পরে আবার কানে এল সেই 'ঘি! ঘি!' শব্দ রাখালটি আবার যাচ্ছে পায়ে-চলা পথ ধরে পূর্বদিকে। এখনো এখনো তো কোন দিক থেকে আক্রান্ত হই নি আমরা! তবে? ও আমাদের বন্ধুই হবে নিশ্চয়। আশায় দুলে উঠল মন।

বটগাছটির কাছাকাছি এসে রাখাল সেই একঘেয়ে সুরেই একটু জোরে বলতে লাগল—

"ঘি! ঘি!...কোন ডর্ নাই, চুপ মারি বই থাকতক।...ঘি! ঘি!...কোন ডর্ নাই।...ঘি! ঘি!" (ঘি! ঘি!... কোন ভয় নেই, চুপ করে বসে থাকুন। ...ঘি! ঘি!...কোন ভয় নেই।...ঘি! ঘি!)।

আমরা ওকে আমাদের কাছে আসতে বারণ করেছিলাম। একবার যদি পুলিশের মনে সন্দেহ জাগে, তবে তারা সন্দেহ ভঞ্জন করতে এগিয়ে আসবে, তাহলেই অবস্থা সঙ্গীন!

রাখালটি যেন আমাদের খোঁজেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমনিভাবে পূর্বদিকে চলে গেল। আবার উত্তর-পূর্ব কোণের পুলিশ-পোস্ট থেকে সে ফিরছিল। হঠাৎ রাস্তা থেকে সোজা বটগাছটার আড়ালে আমাদের কাছে এল। ভান করেই এল যেন আরো বন-জঙ্গল খুঁজে দেখছে। কাছে আসতেই তার কানে কানে বললাম—

"কি করছ তুমি? বললাম—রাত না হলে আমাদের কাছে আসবে না। সব মাটি করে দেবে দেখছি। দোহাই তোমার, এখানে বার বার এসে আমাদের বিপদে ফেল না!"

চাষীটি বোধহয় ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছে না। আমার বকুনিতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে সে বলতে লাগল, "বাবু, আমি বড় গরীব। আমায় মনে রাখবেন। ভুলে যাবেন না বাবু! আমি আপনাদের যতদূর পারি সাহায্য করব...।"

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, "হ্যাঁ বাপু, আমরা তোমাকে নিশ্চয়ই মনে রাখব। তোমার দয়া আমরা কখনো ভুলব না। আমাদের উপকার করলে তোমাকেও আমরা সাহায্য করব। রাত্রি বেলা দেখা হবে। তার আগে দয়া করে আর এদিকে এস না। এবার চলে যাও।"

চাষীটি আবার সেই 'ঘি! ঘি!' শব্দ করতে করতে চলে গেল। মনটা অনেকখানি হাল্কা হ'ল। এখন তো মনে হচ্ছে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তবু মনে সন্দেহ আসে- শেষ পর্যন্ত কি হয় কে জানে?

সাড়ে পাঁচটা বেজেছে তখন। জঙ্গলের বড় বড় গাছের মাথায় শেষ বেলার যে আলো চিক্‌চিক্ করছিল, তাও মিলিয়ে গেছে এখন। তবু অন্ধকার ঘন হয় নি। কয়েক গজ দূরের জিনিষও দেখা যাচ্ছে। এমন সময় আবার সেই রাখালের অকস্মাৎ আবির্ভাব। এবার আমি একরকম কঠোর স্বরেই তাকে বললাম

"আবার কেন এসেছ এখানে? এত করে বলছি তোমাকে......"

আমার কথা শেষ না হতেই একনিঃশ্বাসে রাখালটি বলে চলল— "বাবু, উঠুন উঠুন! আপনাদের বন্ধুরা পাহাড়ের অপর দিকে ধরা পড়েছে। 'কালেক্টর' 'মালেক্টর' সব বড় বড় সাহেবরা চলে এসেছে। আহা! আপনাদের বন্ধুরা পালাতে পারল না! সব পুলিশ ঐ ধারে চলে গেছে, এদিকে কেউ নেই। দেরি করবেন না। কিছু ভাববেন না, তাড়াতাড়ি উঠে আপনাদের উত্তরের এই পাহাড়টায় চলে যান। আসুন আসুন, এই এদিক দিয়ে যান।"

সত্যিই কি পাহারাদার পুলিশদল চলে গেছে এই পথের দুই প্রান্ত থেকে? না, কিছুতেই যাতে আমরা পালাতে না পারি সেজন্য নতুন এক ফাঁদ পেতেছে বৃটিশ অফিসার তার চরটিকে দিয়ে! কিন্তু এখন আর ভাববার সময় নেই। হয়ত ওর কথাই ঠিক,—এমন সুযোগ হারালে আর পাব না। আবার হয়ত বা ওর ভুলান কথায় আমরা গিয়ে পড়ব সোজা শত্রু ব্যূহের মাঝখানে! কিন্তু "No risk, no gain." সুতরাং আবার ঝুঁকি নিতে হল।

সিদ্ধান্ত নিতে এক সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগে নি। লাফিয়ে উঠে সামনের পাহাড়ের দিকে রওনা হলাম তিনজনে। চাষীটিকে বলে গেলাম আমরা রাত দশটা পর্যন্ত ঐ পাহাড়ে অপেক্ষা করব। এর মধ্যে ও যেন এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে।

পায়ে-চলা পথটি একলাফে পেরিয়ে সামনের বড় বড় ঘাসে ভরা মাঠের মধ্যে দিয়ে ছোট ছোট গাছের আড়ালে কখনো দৌড়ে, কখনো লাফিয়ে সামনের পাহাড়ের দিকে চলেছি। হঠাৎ দেখি চাষীটি বসে পড়ল মাটিতে, যেন কোন লোকের দৃষ্টি-পথ থেকে সে নিজেকে আড়াল করতে চায়! কিন্তু কোন লোক তো নেই কোথাও! কেন ও অমন অদ্ভুত ব্যবহার করল? তবে কি সামনের যে পাহাড়ের দিকে আশ্রয়ের আশায় ছুটে চলেছি তার ওপর সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য? ঐ পাহাড় থেকেই বিকেল বেলা শত্রুসৈন্য গুলী চালিয়েছে! ওরা যে এখনো ওখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে নেই তাই বা কে বলতে পারে!

যাই হোক্ না কেন, এখন ঐ পাহাড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। কি আর হবে? একবার পুলিশ হয়ত বন্দুক উঁচিয়ে বলবে "Hands up."

তারপর? আমরা যখন তাদের কথা না শুনে নিজের নিজের রিভলভার উঁচু করে ধরব, তখন তিনটি শব্দ হবে গুলীর—তিনটি প্রাণ খতম্! বাস্! এর জন্য তো প্রস্তুত হয়েই আছি বহুদিন থেকে! তবে আর কিসের ভাবনা!

চলার পথে বার বার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছিলাম, কিন্তু সত্যিই কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই। কোন লোক বা কোন দল আমাদের অনুসরণ করছে না।

জঙ্গলা জায়গায় পথ খুঁজে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পাহাড়টির মাথায় উঠলাম। না, কেউ নেই এখানে। যারা ছিল তারা নিশ্চয়ই এখান থেকে চলে গেছে পেছনে ফেলে আসা পাহাড়টিতে আমাদের সন্ধানে—যে পাহাড় থেকে অনেকক্ষণ আগে নেমে এসে আমরা নিচে বসেছিলাম।

খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলাম তিনজনে সেই অজানা পাহাড়ের শিখরে অপরিচিত বন্ধুর আগমন প্রতীক্ষায়। কিন্তু সে এল না। ঠিক এমনি সময় আমাদের খুব কাছে একটা বড় সাপ একটা ব্যাঙ ধরল। ব্যাঙটার কাতর আর্তনাদ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল সেই শব্দহীন মহাশূন্যতার মাঝে। এত কাছে এই ভয়াবহ ঘটনায় সকলেরই মনে কেমন অস্বস্তি দিল। আমার মনে হ'ল এ যেন মায়েরই ইঙ্গিত। তিনি (মা কালী) বোধহয় চান না আমরা এখানে থাকি। তখনকার দিনে দৈবশক্তিতে বিশ্বাস ছিল অটুট, তাই দ্বিধা না করে বন্ধুদের কাছে নিজের মনের কথা জানালাম। ভয় ওদেরও হয়েছিল কাজেই ঐ জায়গা ত্যাগ করাই সকলে ভাল মনে করল।

নাগারখানা পাহাড়ের ঠিক উত্তরে যে পাহাড়টি ছিল, তার ওপর আমরা বসেছিলাম। এবার সেই পাহাড় থেকে নেমে আরো উত্তরে যেটি, তার ওপর গিয়ে উঠলাম। গিয়ে কিন্তু ভালই হ'ল। এই পাহাড়ের ওপর শত শত বড় বড় গাছ আমাদের লুকোবার সুবিধে দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। এদের আড়ালে থেকে নির্ভয়ে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব। পাহাড়টির চূড়ায় আবার দুটি বড় বড় গর্ত। হয়ত কোন উৎসাহী তরুণদল এখানে পিক্‌নিক্ করতে এসেছিল। গর্ত দুটি তাদের ফেলে-যাওয়া চুল্লীর ভগ্নাবশেষ। যাই হোক্ না কেন সেই গর্ত দুটি এখন আমাদের ট্রেঞ্চ-এর কাজ করবে। ইতস্তত দগ্ধ, অর্ধ-দগ্ধ কাঠের টুক্‌রো ছড়ানো তারও অতীত সাক্ষ্য বহন করছে।

এই পাহাড়টায় উঠে একটা নিরাপদ জায়গায় বসে আমাদের বন্ধুটির জন্য অপেক্ষা করছি। প্রায় মিনিট পনের পরে অনতিদূরে পাহাড়ের নিচে ইউরোপীয় কন্ঠে বিকৃত ভঙ্গীতে হিন্দি কথা শুনলাম

"এই রাস্তা কিদ্দার গয়া? আউর কোই রাস্তা হ্যায়? চলো চলো, আগে বাঢ়ো......"।

ইউরোপীয় অফিসারটির সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় ছিল। তারা যে কি উত্তর দিল শুনতে পেলাম না। বোঝা গেল পরস্পর কিছু কথাবার্তা হচ্ছে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে যে রাস্তাটি গেছে, সেই পথে ওরা চলেছে,—দলে দশ-বারোজন লোক হবে। ভাবলাম হয়ত বা ওপরে উঠে আসবে ওরা! নিঃশ্বাস রোধ করে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত ওরা অন্য পথে চলে গেল, পাহাড়ে আর উঠল না।

আরো প্রায় কুড়ি মিনিট, আধ ঘন্টা সময় চলে গেল। তিনজনে সেই

অন্ধকারে ভূতের মত বসে আছি। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘরমুখী পাখীর দল নিজের নিজের বাসা খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর ভাবছে—এই নির্জন পাহাড়ে কা'রা এই শ্রান্তক্লান্ত পিপাসিত ঘর ছাড়া মানুষ?

হঠাৎ মনে হ'ল যেন কোন লোক মুখে আঙ্গুল দিয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে। অনুরূপ ধ্বনি করবার রহস্য আমার অজ্ঞাত, বন্ধুদের অবস্থাও তাই। তবু চেষ্টা করে দুটো হাত বন্ধ করে তার মধ্যে ফাঁকা জায়গায় ফুঁ দিয়ে বাঁশীর মত আওয়াজ করতে লাগলাম। ভাবলাম আমাদের বন্ধু হয়ত শুনতে পেয়েছে তার বাঁশীর প্রত্যুত্তর। আবার কয়েকবার তার বাঁশী বেজে উঠল। প্রতি বারই আমি ঐ অভিনব উপায়ে বাঁশী বাজিয়ে সাড়া দিলাম। খানিক বাদে কিন্তু আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আমাদের রাখাল বন্ধুর দেখা আর পেলাম না। শেষ অবধি তার সংগে আর দেখা হয়নি। দশটা পর্যন্ত আমরা এখানে থাকব ও জানত। এ অঞ্চলের পথ-ঘাট ওর নখদর্পণে। সুতরাং ও আমাদের খুঁজে বার করবে এই আশাই করেছিলাম।

রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমরা সেই পাহাড়ের ওপর। কিন্তু আর কোন সাড়া বা ইংগিত পেলাম না। তখন সন্দেহ হতে লাগল হয়ত ঐ বাঁশীর শব্দ সে করে নি। আমরা জঙ্গলের মধ্যে অন্য কোন আওয়াজকে মানুষ মুখে শিস্ দিচ্ছে বলে ভুল করেছি।

এখন তবে কি করব আমরা? কত আশা করেছিলাম সেই চাষীর বাড়ীতে যাব—সে আমাদের দুটি খেতে দেবে, লুঙ্গি আর টুপি দেবে! তারপর একটু বিশ্রাম করেই ভোর না হতে আবার বেরিয়ে পড়ব পথে! সকাল বেলার সেই শুকনো বাখরখানি বোধহয় এক ঘন্টার মধ্যেই হজম হয়ে গেছে। তারপর থেকে পুকুরের জল ছাড়া আর কিছুই পেটে পড়েনি। তার ওপর এই অমানুষিক পরিশ্রম ও উৎকন্ঠার ফলে শরীর যেন অবসাদে ভেঙে পড়ছে! এমন সময় চেয়েছিলাম একটু খাদ্য, একটু আশ্রয়। তাও জুটল না কপালে!

কিন্তু কে এই চাষী? পুলিশের গুলীতে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পাবার পথ দেখিয়ে দিয়ে আবার কোথায় সে অদৃশ্য হয়ে গেল? সে তো বলেছিল আবার আসবে, আবার দেখা হবে,—তবে এল না কেন? মনের ভেতর নানা প্রশ্ন, বুদ্ধির অতীত নানা ব্যাখ্যার উদয় হতে লাগল। সত্য জবাবটা কি তা' আর তখন পাইনি।

সেই যুগে আমার ভগবান বিশ্বাস একেবারে অগাধ—তার যেন তুলনাই মেলে না। তখন আমার দলের সাথীরা জানত আমি কিভাবে এই রাখাল বন্ধুকে অন্তরে পূজা করেছি! ভাবে গদগদ হয়ে অন্তরঙ্গ অনেকের কাছে বলেছি যে—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাখাল বেশে এসে আমাদের শত্রুব্যূহ হতে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন! সত্যি, এমন একটা ঔপন্যাশিক ঘটনা অতি বিরল, তার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া তখন সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। তাই ভক্তিপ্লুত মন নিয়ে অন্য কোন অর্থই তখন করতে পারি নি।

এই অবস্থায় অনাহারে, অনিদ্রায়, পাহাড়ে-জঙ্গলে কতদিন ঘুরতে পারব? লোকালয়ে যাবার উপায় নেই। ছিন্ন বিস্রস্ত বেশবাস আর সঙ্গের অস্ত্রশস্ত্র আমাদের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের অবকাশ রাখে না। খোকার পরনে শুধু অন্তর্বাস আর একটা সার্ট। আমার ধুতিটা অর্ধেক করে তাকে

পরতে দিলাম। আমার ধুতি সার্ট জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গা থেকে খসে পড়েছে। পোশাকের স্বল্পতা আগ্নেয়াস্ত্র আর গোলাগুলী গোপন করে রাখতে অক্ষম। কারো পায়েই জুতো-মোজা—পুরো সেট নেই। কারো জুতো নেই মোজা আছে আবার কারো এক পায়ে হয়ত জুতো-মোজা কিছুই নেই। একজনের এক পায়ে শুধু একটা মোজা, অন্য পা একেবারে খালি। এই সময়ে একটি করে লুঙ্গি আর টুপি আমাদের আত্মগোপনে সহায়তা করত!

ঠিক দশটার সময় আবার যাত্রা সুরু হ'ল। পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলের মধ্যে যখন রাত্রি ঘনায়, তখন সে যে কী নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার তা' ভাষায় বোঝান যায় না। শীতের রাত্রিতে, অপরিচিত পরিবেশে, কাঁটা-ঝোপ আর ক্ষয়ে যাওয়া ছুঁচলো পাথরের ওপর দিয়ে কখনো খাড়াই-এ উঠছি, কখনো বা ঢাল দিয়ে নামছি। এমনি অন্ধের মত আর কত চলব? কয়েক হাত রাস্তা চলতে মনে হচ্ছে যেন কয়েক ঘন্টা কেটে গেল। অবশেষে দুই পাহাড়ের মধ্য-বর্তী সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে যাওয়াই স্থির করলাম।

এ পথেও বিপদ কম নয়। কাঁটা-ঝোপ আর পাথর তো আছেই, তা ছাড়াও মধ্যে মধ্যে কাদা– কোথাও বা শীর্ণ জলস্রোত। মানুষের অগম্য স্থান বলেই কীট-পতঙ্গ, সাপ, ব্যাঙ, মাছ—কোন কিছুরই অপ্রাচুর্য নেই সেখানে। কি করে যে সে রাতে সাপের হাত থেকে বেঁচেছিলাম তা জানি না! রাজধানী-বাসী খোকার এরকম জংলা পথে চলার অভ্যাস একেবারেই নেই। অন্যদেরও প্রায় তাই। আমি আগরতলার জংগলে শিকার করতে গিয়েছি- পথের কষ্ট খানিকটা জানি। কিন্তু এই পথের সংগে তার তুলনা হয় না।

একটা উঁচু গাছ দেখে উপেনকে বললাম উঠে পড়তে কোন্ দিকে এসেছি দেখা যাক্। আমার কাঁধে পা দিয়ে উঠে পড়ল উপেন। সে বলল অনেকটা দূরে জোর ইলেকট্রিক আলো দেখা যাচ্ছে, তবে ওটা যে কোথাকার আলো তা' বুঝতে পারছে না। তখনকার দিনে শহরের বাইরে ইলেকট্রিক আলোর ছড়াছড়ি ছিল না। কেবলমাত্র ডবলমুরিং জেটি আর পাহাড়তলী স্টেশন ও ওয়ার্কশপে আলো দেখা যেত। উপেনকে নামতে বলে আমি গাছে উঠলাম। মোটামুটি দিক্-নির্ণয় করে বোঝা গেল যে ওটা পাহাড়তলীরই আলো। ঐ আলো লক্ষ্য করে গেলে স্টেশনের কাছাকাছি রেল লাইনে অথবা ট্রাঙ্ক রোডে গিয়ে পড়তে পারি। এই আশায় বুক বেঁধে চললাম সেই আলোর দিকে।

পথের বর্ণনা দিয়ে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, যতটা পথ এসেছি তার চেয়েও দুর্গম, তার চেয়েও বিপদসঙ্কুল পথ পার হয়ে শেষ পর্যন্ত আশার আলো দেখা গেল। পাহাড়ের কোল দিয়ে একটা বিরাট সমতল-ভূমিতে গিয়ে পৌঁছলাম। সমতল হলেও তাকে ক্ষুদ্র মালভূমিই বলা যায়, কারণ জায়গাটা বেশ উঁচু। ওখান থেকে দূরে পাহাড়তলী স্টেশন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। নীচে লোকালয়ও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে যাবার সাহস আমাদের নেই। সুতরাং রেল লাইনের খোলা জমিতে না গিয়ে তার সমান্তরাল জংলা পথে হাঁটতে শুরু করলাম। রাত তখন ঠিক একটা।

এই বিরাট প্রান্তরটি শণগাছে ভরা। অতি কষ্টে তারই মধ্যে পথ করে চলেছি। কিছুদূর গিয়েই হঠাৎ মনে হ'ল পেছনে 'খর্ খর্' করে একটা

আওয়াজ হচ্ছে। কারা যেন রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে শুকনো পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে এই শণগাছের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ করে আসছে—তাই আওয়াজ হচ্ছে শন্ শন্ কর্ কর্—খর্ খর্।

দাঁড়িয়ে পড়লাম সকলে। কী আশ্চর্য! শব্দটাও বন্ধ হয়ে গেল! আবার চলছি—আবার সেই শব্দ। এবার আর সন্দেহ রইল না—পেছনে কারা যেন আমাদের অনুসরণ করে আসছে। হয়ত পুলিশ, হয়ত বা কোন ডাকাতদল। কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রে এই শণের জঙ্গলে ডাকাতেরা কি কোন পথিকের সন্ধানে আসতে পারে? পুলিশ ছাড়া আর কেউ নয়।

প্রত্যেকেই শুনতে পেয়েছি শব্দটা, কাজেই মনের ভুল বলে উড়িয়ে দিই কি করে? আবার থামলাম আমরা। দুইমানুষ সমান শণগাছের মধ্যে লুকিয়ে রইলাম। শব্দটাও থামল। কি করা যায় এখন? 'যা' থাকে কপালে বলে পেছু হেঁটে শব্দটা লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলাম। মনে হল, একটু দূরে কি একটা জানোয়ার যেন দৌড়ে পালিয়ে গেল। কি ওটা? শেয়াল—না হরিণ, না-কি নেকড়ে? আমার মনে হল যেন হরিণ। কিন্তু হরিণ কি মানুষের পায়ের শব্দ অনুসরণ করে চলে? হয়ত কোন হিংস্র জন্তু—মানুষের গায়ের গন্ধ পেয়ে আসছিল; আমরা অনেকে একসঙ্গে থাকায় আক্রমণ করতে সাহস করে নি কিম্বা সবটাই হয়ত আমাদের মনের ভুল, চোখের ভুল!

এই রকম বিপজ্জনক অবস্থায় পড়লে মনের ভুল সত্যিই হয়। নাগার থানা পাহাড় এলাকা থেকে রাত্রে এতটা পথ আসবার সময় আমরা বার বার নানারকম শব্দ শুনেছি—ঐ বুঝি পুলিশ গুলী চালাচ্ছে, ঐ বুঝি একদল লোক বুট পায়ে মার্চ করতে করতে চলছে! কতবার মানুষের ছায়া দেখে চমকে চমকে উঠেছি—ঐ যেন কারা আমাদের অনুসরণ করছে! কিন্তু সবই উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা, সবই দৃষ্টিভ্রম!

১৯২৩ সালের এই অভিজ্ঞতা ১৯৩০ সালে আমাদের দল গঠনের কাজে বিশেষ সাহায্য করেছিল। পূর্ব-অভিজ্ঞতা না থাকলে বোঝা যায় না যে একটা সঙ্ঘর্ষের সময় এবং তার পরে অতি সাহসী কমরেডদের মনেও কতটা স্নায়বিক দুর্বলতা আসতে পারে। আমরা আমাদের তরুণ কমরেডদের ট্রেনিং দেবার সময় এই বিষয়ে বার বার সচেতন করে দিতাম। তা সত্ত্বেও দেখা গেছে অনভিজ্ঞ বন্ধুদের মনে সাময়িকভাবে কাল্পনিক ভীতির সঞ্চার হয়েছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে এরকম বিপদের মুখে মাথা স্থির রেখে কাজ করা সত্যিই কঠিন।

সেদিন সেই শণগাছের জঙ্গলের মধ্যে আমরা যে পদধ্বনি শুনেছিলাম তা' একটিমাত্র জন্তুর সতর্ক পদক্ষেপ হতে পারে না। হয়ত আমাদেরই পায়ের শব্দ পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এসেছে; কিন্তু আজও আমার বিশ্বাস তা প্রতিধ্বনি নয়। খুব সম্ভব আমাদেরই মনের বিকার। আশ্চর্য! প্রত্যেকেই তাহলে এই শব্দ শুনতে পেলাম কেন? এ রহস্যের সমাধান আজও হয়নি।

যাই হোক্, ঐ হরিণ না কি অন্য কোন জন্তু দেখে, এই দ্বিতীয়বার মনে হ'ল এও বোধহয় মায়ের ইঙ্গিত। সঙ্গীদের বললাম—

"দেখ, আমার মনে হচ্ছে মা বোধ হয় চান না আমরা এ পথে আর যাই। এস, খোলা জায়গা দিয়েই চলি—রেলপথ ধরে কিম্বা ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে।"

নেমে এলাম জঙ্গল ছেড়ে পরিষ্কার পথে। এখন আর প্রতি পদে হোঁচট খাবার ভয় নেই, অনবরত কাঁটা এসে বিঁধবে না গায়ে। কিন্তু এখানে আর এক ভয়। "ঐ শোন পুলিশ গুলী চালাচ্ছে," "ঐ কে যেন পেছন পেছন আসছে"—এরকম কাল্পনিক শব্দ আর মাঝে মাঝে সামনে আশেপাশে মানুষের ছায়া—এরা যেন একেবারে পথের সঙ্গী হয়ে রইল। রেলপথ ধরে খানিকটা গিয়ে ট্রাঙ্ক রোডে এসে পড়লাম। রাত তখন দুটো।

এখন কোন্ পথ ধরব? রেলপথ দিয়ে সোজা গেলে ভাটিয়ারী স্টেশন ছাড়িয়ে আরও দুটো স্টেশন পরে সীতাকুণ্ডে পৌঁছব। সেখানে আশ্রয়ের আশা আছে। কিন্তু অতদূর পৌঁছতে বেলা হয়ে যাবে, লোকজনেরা আমাদের দেখে ফেলবে। তারপর স্থানীয় থানায় খবর দিতে আর কতক্ষণ? আবার সেই তাড়া খেয়ে ছুটতে হবে।

তার চেয়ে এখান থেকে ভাটিয়ারীর সমুদ্রতীরে চলে যাই, সেখানে গিয়ে যা হোক্ করা যাবে। দু' ঘন্টার মধ্যে সমুদ্রের ধারে গিয়ে পৌঁছলাম। কী শীত! ডিসেম্বর মাসের শেষ রাত, দেহের বেশীর ভাগই অনাবৃত। হিম-ঠাণ্ডা বাতাস যেন কেটে কেটে গায়ে বসে যেতে লাগল। মনে হ'ল এখানেই শীতে জমে যাব সবাই।

আমাদের দুঃখের ভরা পূর্ণ করতে এর ওপর এল এক পশলা বৃষ্টি। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাড়াতাড়ি একটা গাছের তলায় দাঁড়ালাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই থেমে গেল বৃষ্টি; কিন্তু ঐ টুকুতেই আমাদের সর্বাঙ্গ ভিজে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল, গাছের আড়ালও কোন কাজ দিল না।

ভোর হয়ে আসছে। এভাবে এখানে বসে থাকলে আবার ধরা পড়তে হবে। হঠাৎ মনে হল জেলেদের মধ্যে কাউকে বিশ্বাস করে দলে টানলে কেমন হয়? কোনমতে একটা নৌকোয় যদি আশ্রয় পাই!

সমুদ্রের মধ্যে কতকগুলি জেলে-নৌকো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। উপেন চিৎকার করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করল, "ও ভাই মাঝি—ও ভাই মাঝি!"

উপেনের ডাকে কোন মাঝিই সাড়া দিল না। আমার খুব অবাক লেগেছিল। মনে আছে উপেনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"কি আশ্চর্য! ওরা কেউ জবাব দিচ্ছে না কেন?" মাঝিদের জবাব না দেওয়ার গূঢ় তথ্য উপেনের কাছেই সেইদিন জানলাম। উপেন পাড়াগাঁয়ের ছেলে। সে মাঝিদের নির্বাক থাকার কারণটি বলল। রাত্রে এ ডাকে কে সাড়া দেবে? মাঝিরা কি জানে না রাত্রির অন্ধকারে সমুদ্র-তীরে আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় অদেহী আত্মা—মানুষের অনিষ্ট কামনায় নাম ধরে ডাকে বারবার! মাঝিরা তাই ভয় করে যে সে ডাকে সাড়া দিলেই তার নিশ্চিত মৃত্যু।

কোন সাড়াই পেলাম না আমরা মাঝিদের কাছ থেকে। অনেকদূরে কোথায় হরি-সংকীর্তন হচ্ছে। খোল-করতালের শব্দ ভেসে আসছে বাতাসে—মনে হ'ল অন্তত মাইল দুয়েক দূরে হবে। ওখানে হয়ত আছে কোন কোমলহৃদয় দরদী বৈষ্ণব—আশ্রয় মিলতে পারে তার কাছে। কিন্তু

আমাদের ক্ষতবিক্ষত পদযুগল শ্রান্ত অবসন্ন দেহের ভার আর বইতে পারছে না। এই দু' মাইল পথ যেতে যেতে আকাশও পরিষ্কার হয়ে যাবে যে!

পূব-অকাশের গাঢ় অন্ধকার ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসছে। আর দেরি নেই, এখনি সকাল হবে। যদি আরো দুঘন্টা সূর্যদেব অপেক্ষা করতেন, যদি কালো মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন থাকত, তবে হয়ত আশ্রয় পাওয়া সহজ হ'ত! অদূরে কুটিরের সারি। একটি দু'টি করে লোক ঘুম থেকে উঠছে—তাদের চলাফেরা, কথাবার্তার শব্দ কানে আসছে। দু'একটি প্রদীপ জ্বলতে দেখা গেল, ঢেঁকির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সুপ্ত গ্রাম জেগে উঠেছে। এখনি কিছু একটা করতে হবে। ঠিক করলাম, আর চুপ করে বসে থাকব না। প্রথম যে মানুষটির দেখা পাব তার কাছেই আশ্রয় চাইব।

এগিয়ে গেলাম বাড়ীগুলির দিকে। একটি বাড়ীর বাইরের আঙ্গিনায় এক বৃদ্ধ এবং একজন বৃদ্ধা ঘোরাঘুরি করছে। সাহসে ভর করে তাদের দু'জনের উদ্দেশ্যেই ডেকে বললাম

"ওবা, এক্কিনি হুনুতক্এনা! আঁরা কন এগগুয়া নুকা পাইয়্যুম্ নি ভাড়া কইরত্যাম্? আঁরার বাড়ীর মাইয়া-অল্ নুকাত্ করি সীতাকুণ্ড যাইত চার জে! সমুদ্র-সেয়ান করিবানি আর সীতাকুণ্ডর শিবমন্দির দেই আইব......।" (ওগো মশাই একটু শুনবেন? আমরা একটা ভাড়া করবার জন্য নৌকো পাব? আমাদের বাড়ীর মেয়েরা নৌকো করে সীতাকুণ্ড যেতে চাইছে। সমুদ্র-স্নান করবে আর সীতাকুণ্ডের শিবমন্দির দেখে আসবে...)।

কথাটা শেষ হবার আগেই বুড়ী ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল—

"ফাট্টুয়া কোত্তুন! ক্যা, রেইল নাই? নুকাত করি এরে মাইয়া-অল্ যাইব? ফাট্টুয়ামি করনর আর জাগা ন পাস?...।" (যত সব শয়তান। কেন রেল নেই? নৌকো করে মেয়েরা যাবে? শয়তানী করবার আর জায়গা পাস্ নি?)।

বৃদ্ধ লোকটি বাধা দিল তাকে, "মা তুঁই তারারে গাইল ক্যা দেওর? ভালা মাইনষর পোয়া তারা, তোঁয়ারে এগগুয়া কথা জিগ্গাইয়ে—হিতাল্লাই তারারে তুঁই গাইল দিবা না?" (মা, তুমি ওদের গাল দিচ্ছ কেন? ভাল মানুষের ছেলেরা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছে—সেজন্য কি তুমি তাদের গাল দেবে)?

বৃদ্ধা মা নিজ মনে বিড়বিড় করতে লাগল। চাষীটি আমাদের দিকে এগিয়ে এল। তার বয়স প্রায় পঞ্চাশের উর্ধ্বে হবে। তার সহানুভূতিপূর্ণ কথায় আশ্বাস পেয়ে বললাম—

"বাবা আমাদের একটা কথা শুনবেন?"

—"ঠিক আছে, বল কি বলবে?"

—"আপনি একটু এদিকে আসবেন? কথাটা একটু গোপনে বলতে চাই।"

বৃদ্ধ মাকে ওখান থেকে সরিয়ে দিল। তারপর আমাদের দিকে আরো খানিকটা সরে এসে বলল—"এবার বল কি বলবে!"

এ সুযোগ হারালে চলবে না। বৃদ্ধের মন ভেজাবার জন্য আবেগ দিয়ে অনুনয় করে বললাম—

"দেখুন, আমরা স্বদেশী। আমরা গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে লড়াই করে এসেছি। ওরা আমাদের বন্ধুদের মেরে ফেলেছে, আমরাও কিছু পুলিশ মেরেছি। এখন বড় বিপদে পড়েছি—আপনি আমাদের সাহায্য করুন। দয়া করে একটু আশ্রয় দিন, না হলে আমাদের বিপদের সীমা থাকবে না।"

নিজে থেকে যেটুকু বললাম তার চেয়ে বেশি আর কোন প্রশ্ন চাষীটি আমাদের করলেন না। দেখে মনে হ'ল না তিনি বিব্রত বা বিরক্ত হয়েছেন, ভয়ের চিহ্নও দেখলাম না মুখে। যেন চিন্তা করবার মত গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুই ঘটে নি—এমনি সহজভাবে তিনি বললেন—

"আইও—আঁর লয় আইও।" (এস আমার সঙ্গে এস)।

অবাক হয়ে আমরা এ ওর মুখের দিকে চাইলাম। তবে কি আমাদের ফাঁদে ফেলবার জন্য এই ব্যবস্থা? নিশ্চিন্ত মনে 'খুনীদের' আশ্রয় দিচ্ছে যে লোক, সে যে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবার চিন্তা করছে না, সে নিশ্চয়তা কোথায়? বৃদ্ধ চাষী আবার ফিরে তাকালেন—আমরা ইতস্ততঃ করছি দেখে ইঙ্গিতে নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করতে অনুরোধ করলেন। আমরা আর বেশী কিছু ভাববার অবসর পেলাম না, যন্ত্রের মত পেছনে পেছনে চললাম।

চাষীটি বাড়ীর পেছন দিকে ঘুরে গিয়ে দাঁড়ালেন, যাতে বাড়ীর অন্যান্য লোকেরা কিছু জানতে না পারে। আমাদের সেখানে অপেক্ষা করতে বলে তিনি কোথায় যেন চলে গেলেন। একটুক্ষণ পরেই ক্ষেত সমান করবার একটা মই নিয়ে দেওয়ালের গায়ে পেতে আমাদের সেটা বেয়ে উঠতে বললেন। মাটির দেওয়ালের ঘর, ছাদে টিন দেওয়া। মই দিয়ে মাটির ছাদের ওপর, টিনের ছাদের তলায় ফাঁকা জায়গাটিতে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে মইটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

শীতের কাঁপুনি তো অনেকক্ষণ সুরু হয়ে গেছে—এবার কাঁপুনি আরো বেড়ে গেল, বোধ হয় ভয়ে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কোন প্রশ্ন না করে আশ্রয় দেওয়ার অর্থ শত্রুর হাতে যথাসময়ে আমাদের ধরিয়ে দিয়ে পুরস্কার লাভ করা। কিন্তু বৃদ্ধ চাষীর মুখের সরলতার ছাপ মনের কুটিলতার পরিচয় দেয় না। এখন আর ও কথা ভেবে কোন লাভ নেই। এখন চিন্তা, কি করে শীতের হাত থেকে রক্ষা পাব!

শীতে যে আমরা থর থর কাঁপছিলাম তা' সহৃদয় চাষীর চোখ এড়ায় নি। পাঁচ মিনিট পরেই কি একটা জিনিস থপ্ করে এসে পড়ল আমাদের ওপরে। চমকে উঠলাম। দেখি একটা লেপ। মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ জানালাম তাঁকে। কিন্তু একটা মাত্র লেপ—আমরা তিনজন কি করে তা' দিয়ে শীত নিবারণ করি? গুড়িসুড়ি মেরে তার তলায় তিনজন শুতে পারি, কিন্তু মাটির মেঝে—ঠাণ্ডায় জমে যাবার অবস্থা! অগত্যা লেপটাকে মাটিতে পেতে, তার ওপরেই শুয়ে রইলাম—গায়ে আর কোন ঢাকা রইল না।

ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম আশ্রয়স্থলটি। মনে হচ্ছে কোন সম্পন্ন চাষী গৃহস্থের বাড়ী। মাঝখানে বড় উঠোন, চারপাশে অনেকগুলি বাড়ী,

বোধ হয় বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার। উত্তর দিকের বাড়ীটির ছাদের ওপর আমরা আশ্রয় পেয়েছি। আমাদের মাথার ওপর আবার টিনের ছাদ। ছাদের এই স্বল্প পরিসর ফাঁকা জায়গাটি মাটির হাঁড়িকুড়ি, অব্যবহৃত নানা জিনিসপত্রে ভরা। তারই মধ্যে আমরা তিনজন ভবঘুরে স্থান পেয়েছি।

এতক্ষণে ভোর হয়ে গেছে। এ বাড়ীর লোকেরা জেগে উঠেছে। তাদের চলাফেরা কথাবার্তার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। বাড়ীটির বারান্দায়, আমাদের ঠিক কয়েক ফুট নিচে, কয়েকজন লোক আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে শীতের সকালে শরীর গরম করছে। সঙ্গে চলেছে বিড়ি আর হুঁকা। আমরা এদের দেখতে পাচ্ছি না, তবে পরস্পর বিড়ির আদানপ্রদান এবং হুঁকার হাত-বদলের কথা শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে বেশ কয়েকজন পাড়াপ্রতিবেশী এসে জড় হয়েছে এখানে, নানারকম গল্পগুজব সুরু হয়েছে। বেশীর ভাগ কথাই হচ্ছে গতকাল শহরে যে উত্তেজক ঘটনা ঘটে গেছে সেই সম্বন্ধে নানারকম অতি-রঞ্জিত কাহিনী। সে কাহিনীর নায়করা যে অদূরে বসে কান পেতে তাদের কথাবার্তা শুনছে তা' কি তা'রা সেদিন কল্পনায়ও অনুমান করতে পেরেছিল।

টুক্‌রো টুক্‌রো কথাবার্তা থেকে শহরের সংবাদ শুনছি উদ্‌গ্রীব হয়ে—"ডাকাতরা গরীব লোকদের প্রচুর টাকা দিয়েছে", "কত শ' পুলিশ যে মারা পড়েছে তার ঠিক নেই", "এখনো পাহাড়ে পাহাড়ে যুদ্ধ করে বেড়াচ্ছে তারা", "অদ্ভুত যোদ্ধা সব"...তারপর, "দু'জন ডাকাত ধরা পড়েছে"... "তাদের মেরে ভুলোধুনো করে দিয়েছে"...ইত্যাদি।

বারবারই শুনছি ওরা বলছে দু'জন ডাকাত ধরা পড়েছে। অত্যন্ত চাপা স্বরে বন্ধুদের বললাম—

"ওরা বলছে দু'জন ধরা পড়েছে—এ কেমন করে হ'ল? রাজেন কোথায় গেল তবে? সে কি ধরা পড়ে নি? ওরা কিন্তু একবারও বলছে না যে দু'টি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। কী আশ্চর্য! তবে কি মাস্টারদা অম্বিকাদা বেঁচে আছেন?...না, তা হতে পারে না। হয়ত শহর থেকে এত দূরে সঠিক খবর এসে পৌঁছয় নি!"

আমরা জানতাম পটাসিয়াম সায়ানাইড বিষে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এও শুনেছিলাম যে, এই তীব্র বিষ এক সেকেণ্ডের মধ্যে জীবনের অবসান ঘটায়! তাহলে রাজেন কি করে আমাদের সঙ্গে কয়েক পা এগোল? এ কথাটা তো আগে মনে হয় নি! আমরা তখন শুধু দেখেছি রাজেন মাটিতে পড়ে মাত্র একবার গড়াল। সত্যিই ও তারপর মারা গেছে কি না তা' দেখবার আমাদের সময় ছিল না। তবে কি আমরা পটাসিয়াম সায়ানাইড বলে যে জিনিসটা এনেছি, তা' আসল জিনিস নয়? তাই বা কি করে হবে? আমি আমার পিসেমশাই-এর (অবসরপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন) মারফৎ এক বোতল সীল করা পটাসিয়াম সায়ানাইড কিনেছিলাম। তাড়াতাড়িতে এটা আর খোলার সময় হয় নি। অম্বিকাদা কলকাতার স্টক থেকে যে বিষটা এনেছিলেন, পরিষ্কার করা জেলীর শিশিতে ছিল, সেটা থেকে ছোট ছোট প্যাকেটে আমরা তা' ভরে নিয়েছি। ছুটে পালাবার সময় সেই প্যাকেটগুলো খুলে গিয়ে ভেতরের রাসায়নিক দ্রব্যটি বেরিয়ে পকেটে রাখা কার্তুজের ওপর পড়েছে। নাগারখানার পাশের পাহাড়ে অপেক্ষা করবার সময় আমরা পকেট ঝেড়ে কার্তুজ-

গ্‌লি পরিষ্কার করে ফেলি। তখন দেখেছি কার্তুজের পেতলের খাপগ্‌লি বিবর্ণ হয়ে গেছে ঐ রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে এসে। তা হলে ওটা যে পটাসিয়াম সায়ানাইড বিষ সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। তবে? এই বিষ এক প্যাকেট করে যারা গলাধঃকরণ করেছে তাদের প্রাণের আশা কি করে করব?

বেলা দ্‌টোর সময় বৃদ্ধ আবার এলেন একটা বেতের ঝ্‌ড়ি নিয়ে। নিচু গলায় আমাদের ডেকে তিনি ঝ্‌ড়িটি তুলে ধরলেন, আমরা হাত বাড়িয়ে টেনে নিলাম ওপরে। ঝ্‌ড়ির মধ্যে ভাত, ডাল আর স্‌ট্‌কি মাছের তরকারি, একটা পাত্রে জল।

আগের দিন সকালবেলার সেই শ্‌কনো বাখরখানির পর প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা পরে আবার মিলল আহার্য—এই ভাত-ডাল আর মাছ, পোলাও-মাংসের চেয়ে উপাদেয়। লোভীর মত ম্‌খে তুললাম এক গ্রাস। একি ম্‌খের ভেতরটা যেন প্‌ড়ে যাচ্ছে! বারো ঘণ্টারও বেশি সময় জল পাই নি খেতে, জিভ একেবারে শ্‌কনো, ম্‌খ-গলা সব জ্‌বালা করছে—তাই হঠাৎ শক্ত খাবার ম্‌খে যেতে সমস্ত পেশীগ্‌লি বিদ্রোহ করে উঠেছে। খ্‌ব ধীরে ধীরে গলা ভিজিয়ে একট্‌ একট্‌ করে গ্রাসটা গিললাম। তারপর থেকে খাওয়া সহজ হয়ে এল। প্রাণ ভরে খেলাম তিনজনে। জল মাত্র এক পাত্র—তাতেই তৃষ্ণা নিবারণ করতে হল।

রাত্রি প্রায় বারোটার সময় আবার এলেন বৃদ্ধ, মইটা লাগিয়ে দিয়ে আমাদের নামতে বললেন। আমরা নেমে হাত-ম্‌খ ধ্‌লাম, প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিলাম। ওপরে ওঠবার পর আবার ঝ্‌ড়িতে করে খাবার এল।

পরদিনও দ্‌প্‌রে খাবার পেলাম দ্‌টোর সময়। রাত বারোটায় বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হ'ল। ইতিমধ্যে আমরা তিনজনে একটা প্ল্যানের খসড়া করে ফেলেছি। এখান থেকে একটা জেলেনৌকোয় করে সন্দ্বীপে যাব। সন্দ্বীপ চট্টগ্রাম উপক্‌লের কাছে বঙ্গোপসাগরের একটি দ্বীপ। ভাটিয়ারী থেকে বিশেষ এক ধরনের জেলেনৌকো সম্‌দ্র পাড়ি দিয়ে ঐ দ্বীপে যাতায়াত করে। সন্দ্বীপে গেলে ওখানকার স্টীমার ঘাট থেকে বরিশালগামী স্টীমার পাব। বরিশাল থেকে আবার নদীপথে যাব খ্‌লনায়। বরিশাল থেকে বড় বড় মালবাহী জাহাজ খ্‌লনায় যায়, যাত্রীও নেয় তারা। কাজেই এ পথটা নির্বিঘ্নে যেতে পারব। তারপর খ্‌লনা থেকে ট্রেনে করে কলকাতা। কোনমতে কলকাতা পেঁছতে পারলে পাব বন্ধ্‌দের সঙ্গ, নিশ্চিত আশ্রয় আর পরবর্তী কাজের প্রোগ্রাম।

আমরা বৃদ্ধকে ভাল করে ব্‌ঝিয়ে দিলাম কি কি সাহায্য আমরা চাই—

(১) এখান থেকে সন্দ্বীপে যাওয়ার জন্য একটা নৌকো ভাড়া করে দিতে হবে। (২) আমাদের জন্য ধ্‌তি, সার্ট, ছাতা, ঘটি, হারিকেন এবং দ্‌টি বিছানা কিনতে হবে। (৩) ঐ নতুন কেনা জিনিসগ্‌লি বাড়ীতে রেখে তার বদলে বাড়ীর ব্যবহৃত জিনিস আমাদের দিতে হবে।

বৃদ্ধ বিনা দ্বিধায় বিনা প্রশ্নে আমাদের কথা বিশ্বাস করে, বিপদ মাথায় নিয়ে তাঁর গৃহে আশ্রয় দিয়েছেন; এখন আমাদের এই শেষ সাহায্য করতেও তিনি পিছ-পা হলেন না। বললেন, আগামী পরশ্‌ শহরে গিয়ে

প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি তিনি কিনে আনবেন এবং ইতিমধ্যে নৌকো ভাড়া করবার চেষ্টা করবেন। আমরা তাঁকে জিনিস কেনবার জন্য কিছু টাকা দিলাম।

দ্বিতীয় রাত্রিও একইভাবে কাটল আমাদের। তৃতীয় দিনে ঐ আশ্রয়ে থাকা কষ্টকর মনে হতে লাগল। যতক্ষণ শরীর মন ক্লান্ত ছিল, এই বিপজ্জনক আশ্রয়ে নিজেদের সমর্পণ করে দিয়েছিলাম। এখন পালাবার পথ স্থির করেছি, ব্যবস্থাও হয়ে যাবে মনে হচ্ছে. এখন যেন প্রতিটি মুহূর্ত অসহ্য মনে হচ্ছে। এখানে এইভাবে বসে থাকা কোনমতেই নিরাপদ নয়। বৃদ্ধ তো আর নিচে বসে আমাদের পাহারা দিচ্ছেন না! বাড়ীর কোন লোক কোন জিনিসের প্রয়োজনে মই বেয়ে এখানে উঠে আসতে পারে। এসে যদি তিনজন ডাকাতকে লুকিয়ে থাকতে দেখে তবে চিৎকার চেঁচামেচি করে লোক জড় করে ফেলবে—তারপর সোজা থানায় চালান দেবে। তা' ছাড়া আমরাও অতর্কিতে কোন আওয়াজ করে ফেলতে পারি। সামান্য নড়াচড়া. কথাবার্তা, হাঁচি-কাশি-- কোনরকমে যদি একটু শব্দ হয় তবেই বিপদ!

তারপর. বৃদ্ধ আমাদের যতই আদর যত্ন করুন যতই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন না কেন. আমাদের মন একেবারে সন্দেহমুক্ত হতে পারছে না।

তৃতীয় রাত্রিতে আমরা যখন হাতমুখ ধোবার জন্য নেমে এলাম তখন বৃদ্ধ জানালেন যে সন্দ্বীপ যাওয়ার জন্য নৌকো ভাড়া করে ফেলেছেন। তিনি বারবার আমাদের সাবধান করে দিলেন যে. ভাড়ার আগাম টাকা তিনি দিয়েছেন. আমরা যেন আবার অতিরিক্ত ভাড়া বা পুরস্কার দিতে না যাই, তাহলে মাঝির মনে সন্দেহ হবে। আমরা একজন সাধারণ লোকের ঐরকম তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে অবাক হলাম, বারবার তাঁর বুদ্ধির প্রশংসা করলাম।

তৃতীয় রাত্রিও নির্বিঘ্নে কাটল। চতুর্থ দিন বৃদ্ধ যাবেন শহরে আমাদেরই জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে। এই দিন আমাদের মন আরো বিচলিত হয়ে পড়ল। যদি বৃদ্ধ শহরে গিয়ে তাঁর মত পরিবর্তন করেন! হয়ত আমাদের ধরিয়ে দেবার জন্য পুরস্কারের ঘোষণা শুনতে পাবেন, শহরের কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিপরীত মন্ত্রণা দিতে পারেন. কিংবা...আরও কত কিছু ঘটতে পারে! প্রতিক্ষণেই মনে হতে লাগল এই বুঝি পুলিশ ফোর্স আসছে! অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সর্বদা সতর্ক হয়ে রইলাম: থামগুলির আড়াল থেকে যতক্ষণ পারি লড়াই করব।

বেলা দুটো বেজে গেল। আজ আর কোন ঝুড়ি এল না ওপরে খাদ্য-সম্ভার বহন করে। এত দেরি হচ্ছে কেন বৃদ্ধের? শহর তো দূরে নয়! তবে কি...! সর্বদাই সন্দেহ আমাদের মনে। তিনটে বাজল. চারটে বেজে গেল। না, এখনো দেখা নেই আমাদের আশ্রয়দাতার। এখনি বাড়ীর লোক জেগে উঠবে দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা-শেষে। আর খাবার পাবার উপায় নেই। এক বেলা না খাওয়াটা কিছু নয়. কিন্তু বৃদ্ধের কি হল?

রাত বারোটায় আবার একটা মই এসে লাগল আমাদের ছাদের গায়ে। শুনলাম বৃদ্ধের মৃদু কণ্ঠস্বর। ধড়ে প্রাণ এল। বৃদ্ধ জানালেন তালিকা মত সব জিনিস কেনা হয়েছে। বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন দেরির জন্যে; আমরা সারাদিন অনাহারে আছি—কি লজ্জার কথা! আমরা তাঁকে আশ্বস্ত করলাম—এইরকম অবস্থায় আশ্রয় দেওয়াটাই তাঁর মহত্ত্বের

পরিচয় দিচ্ছে। এমন দুর্বিপাকে পড়লে আমাদের বাবা-মাও প্রত্যহ নিয়মিত খাদ্য দিতে পারতেন না!

যাই হোক্, ঠিক হল পঞ্চম দিন রাত একটার সময় জোয়ার এলে নৌকো ছাড়বে। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ আমাদের জন্য পুরাণো জিনিসপত্র ঠিক করে রাখবেন।

চতুর্থ রাত্রি এবং পঞ্চম দিন গেল দারুণ উৎকণ্ঠায়। এখনি এই আশ্রয় ছেড়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু উপায় নেই। পঞ্চম দিত রাত বারোটায় যথারীতি নেমে এলাম। আর উঠতে হ'ল না মাচার ওপর, ঝুড়িতে করা খাবার আর খেতে হ'ল না। এই রাত্রে আমাদের খাবার ব্যবস্থা হয়েছে গোপনে রান্নাঘরের ভিতর।

সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন মমতাময়ী মাতৃমূর্তি--সরলা গ্রাম্য নারী, বৃদ্ধের স্ত্রী। তিনি জেগে বসে আছেন নিজের হাতে আমাদের খাওয়াবেন বলে। চকচকে কাঁসার থালায় বাটি ভরে নানা তরকারী সাজানো —আদর করে ডেকে বসালেন।

কতদিন এমন খাদ্য পাই নি, নিশ্চিন্তে বসে খাওয়ার সুযোগ মেলে নি, সামনে বসে যত্ন করে খাওয়াবার লোক দেখি নি! তৃপ্তি করে খেলাম তিনজনে।

খাওয়ার সময় বৃদ্ধ কত কথা বললেন আমাদের--

"এই বাড়ীতে অনেক বেটাছেলে আছে। আমাদের বহু আত্মীয় চৌকিদার, দফাদারের কাজ করে। তারা প্রায়ই এই বাড়ীতে আসে। সেইজন্য তোমাদের এতটা লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল। আমার স্ত্রী ছাড়া কাউকে বলি নি এ কথা। আমরা দুজনে সর্বদা সতর্ক ছিলাম যাতে তোমাদের কোন ক্ষতি না হয়। আমি যেদিন শহরে গেলাম সেদিন ওঁকে বলে গিয়েছিলাম সতর্ক থাকতে। কোন বিপদ হলে উনি তোমাদের রক্ষা করতেন।...তোমরা আমার ছেলের মত। কাঁচা বয়স, সরল মুখ—তোমরা কেন এ পথে এলে বাবা? যাও, যাও, মায়ের কোলে ফিরে যাও। আহা, তোমাদের মা-বাবা না জানি কত কাঁদছেন। দেরি কর না বাবা, এখান থেকে গিয়েই যত তাড়াতাড়ি পার মায়ের কাছে চলে যাও, তাঁর শূন্য বুক ভরিয়ে দাও...।"

এদিকে বৃদ্ধার চোখেও স্নেহের ধারা ঝরে পড়ছিল! হায়, এঁদেরই আমরা সন্দেহ করেছি! ধরা পড়বার ভয়ে সর্বদা সতর্ক থেকেছি! বৃদ্ধের আবেগপূর্ণ কথার কোন উত্তর দিতে পারি নি, কণ্ঠ আমাদের রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে বাংলার নিভৃত কোণে এমনি কত দেশভক্ত পরিবার আছে কে জানে! পুরস্কারের লোভ তুচ্ছ করে, বিপদের সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করে কত শান্তিপূর্ণ সুখী পরিবার এইভাবে অপরিচিত বিপ্লবী যুবকদের আশ্রয় দিয়েছেন! এই বৃদ্ধ দম্পতির আতিথেয়তা, দয়া, আন্তরিকতা ও দেশ প্রেমের তুলনা নেই। তবু এঁদের নাম কেউ কোন দিন জানবে না!

এই সহৃদয় আশ্রয়দাতা বৃদ্ধের নাম আজও আমাদের অজ্ঞাত। ইচ্ছে করেই প্রশ্ন করি নি সেদিন আমরা। নামধাম জানা বা জানবার চেষ্টা করাটাই ছিল আমাদের গুপ্ত বিপ্লবী দলের নিয়মবিরুদ্ধ।

তিনজন বিপ্লবী—কখন কিভাবে দিন কাটবে আমাদের কে জানে? যে কোনদিন যে কেউ পুলিশের হাতে ধরা পড়তে পারি। তারপর যদি পুলিশের

অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শপথ ভঙ্গ করে একজনও বিশ্বাসঘাতকতা করি—যদি পুলিশের চাবুকের ভয়ে নাম প্রকাশ করে ফেলি—তবে কী অপূর্ব প্রতিদান দেওয়া হবে ঐ অপরিসীম করুণার! যিনি বিনা স্বার্থে চরম আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁকে পুলিশী আক্রোশের বধ্য-ভূমিতে ঠেলে ফেলে দিয়ে আমরা জাতির নামে কলঙ্ক লেপন করব?

তার চেয়ে এই ভাল, অজ্ঞাত থাক আমাদের ক্ষণিকের বন্ধুর নামধাম। তাঁর মহানুভবতার পরিচয়টুকুই থাক আমাদের মনে, অন্য পরিচয়ে কাজ নেই। ...এই বৃদ্ধের বাড়ী ভাটিয়ারী সমুদ্র উপকূলের কোন একটি ছোট পল্লীতে। বৃদ্ধের নাম বা তাঁর ঠিকানা এর বেশি আমরা বলতে পারব না আজও।

এই সহৃদয় অনামী স্বদেশপ্রেমিক বৃদ্ধ দম্পতিকে গভীরতম অন্তরের মহার্ঘ অর্পণ করে ধন্য হয়েছে আমাদের জীবন। হে আমাদের অজানা অনামী স্বদেশপ্রেমী সুহৃদ আশ্রয়দাতা, ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে তোমাদের অবদান কারো থেকে কম নয়! তোমাদের আদর্শ ভারতের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকুক! তোমরা আমাদের প্রণাম নাও।

বাড়ী থেকে বিদায় নেবার সময় বৃদ্ধ আমাদের প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। আমরা প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলাম তাঁদের। বৃদ্ধ চট্টগ্রামের টান সহ শুদ্ধ ভাষায় বললেন,—"তোমরা মায়ের বীর সন্তান। তোমরা মায়ের মুখ রেখেছ। ঘরে যাও এখন।"

আবার সমুদ্র-তীর। বৃদ্ধ চলেছেন আমাদের সঙ্গে। খানিকটা দূরে গিয়ে আমরা বেশ পরিবর্তন করলাম। উঁচু করে ধুতি পরা, গায়ে সার্ট, হাতে ঘটি, লণ্ঠন ও পুরাণো ছাতা। সঙ্গে দুটো বিছানা বাঁধা—ঠিক যেন ভ্রাম্যমাণ পথিক। চুলে ঘষে ঘষে সরষের তেল মাখলাম। ধুলোয় জটায় তেল পড়ে চুলগুলি খাড়া হয়ে উঠল। চুলে জল দিয়ে আঁচড়ে পাট করে রাখবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সমুদ্রের লবণ-জলে চুল যেন আঠা হয়ে গেছে। যাই হোক, অতি কষ্টে কোনমতে ভদ্রলোক সেজে লোক-সমক্ষে বেরোবার ব্যবস্থা করা গেল।

এখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে নৌকো তৈরি রয়েছে। বৃদ্ধ চললেন আমাদের সঙ্গে। আবার সাবধান করে দিলেন ভাড়ার কথা যেন কিছু না বলি: আর, কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল, উনিই সবটা সামাল দেবেন।

সমুদ্রতীর ধরে চলেছি তিনজনে, কি তিথি জানি না সেদিন, তবে পশ্চিম দিকে হেলে আছে চাঁদ। চাঁদের আলো এসে পড়েছে সমুদ্রের জলে, বালির ওপরে। সমস্ত প্রকৃতিতে যেন আলোর ছড়াছড়ি, আঁধারের যুগ কেটে গেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করবার সময় নয় তখন, সামনে অনির্দিষ্ট যাত্রাপথ। শুধু মনে হল ছ'দিন আগে এত চাঁদের আলো কোথায় ছিল? চাঁদ কি সেদিন সম্পূর্ণ মেঘে ঢাকা পড়েছিল, না রাহু এসে গ্রাস করেছিল তাকে?

মাঝির বাড়ীতে এসে পেঁৗছলাম। আধঘণ্টার মধ্যেই নৌকো ছাড়বে। বৃদ্ধ আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইলেন। মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। অজানা সঙ্গীর সঙ্গে অজানা দেশে গিয়ে আবার কি বিপদে পড়ব কে জানে? শুনলাম সন্দ্বীপে বৃদ্ধের কয়েকজন আত্মীয় থাকেন। কিন্তু নৌকো করে সমুদ্রপথে যান নি কোনদিন তাই তিনি যেতে ভয় পাচ্ছেন। আমরা বার বার

অনুরোধ করলাম তাঁকে আমাদের সঙ্গে যেতে। একমাত্র তিনিই আমাদের পরিচয় জানেন, মাঝির সঙ্গেও তাঁর পরিচয় আছে, কাজেই সন্দ্বীপে গেলে পথের নিশানা দিতে পারবেন।

আমাদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে বৃদ্ধ আমাদের সঙ্গে চললেন। নৌকো ভাসল সমুদ্রবক্ষে।

ডিসেম্বর মাসে সমুদ্র সাধারণতঃ শান্ত থাকে। চট্টগ্রামের উপকূল দিয়ে খানিকটা গিয়ে বারসমুদ্রে চলল নৌকো। জোয়ারের জন্য কিনা জানি না, সমুদ্রের শান্ত ভাব আর নেই। ঢেউ-এ দুলতে লাগল নৌকো। বৃদ্ধ বমি করতে সুরু করলেন। খোকা আর উপেনও সামলাতে পারল না। আমি প্রাণপণে সংযত করে রাখলাম নিজেকে। যদি আমার বমি আরম্ভ হত একবার তবেই হয়েছিল আর কি! আমার বন্ধুরা সবাই জানে এই বমি আমাকে কতখানি অসুস্থ করে দেয়! ইতিমধ্যে আর এক বিপদ! আমাদের ইচ্ছে ছিল সন্দ্বীপে স্টীমার ঘাটে গিয়ে উঠব। কিন্তু কয়েক ঘন্টা পরে ভাটার টান সুরু হল। নৌকো আর এগোয় না। অগত্যা নির্দিষ্ট স্থান থেকে অনেক দূরে "মাইট ভান্ডার" নামে একটি জায়গায় এসে নৌকো ভিড়ল।

এখানে সমুদ্রের ধারে বালি নেই। এক হাঁটু জল আর কাদা। সেই জল-কাদার মধ্যে চার মাইল পথ হেঁটে শুক্‌নো জায়গায় এসে পৌঁছলাম। এখান থেকে আরো এক মাইল গেলে বৃদ্ধের এক আত্মীয়ের বাড়ী মিলবে। এই আত্মীয়টির নাম মনে নেই, পদবী 'শীল', জাতে নাপিত। ইনি আমাদের দেখে কলকন্ঠে অভ্যর্থনা করলেন; কয়েকদিন থেকে যেতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু "নাই, নাই, নাই যে সময়"। আমাদের আর এক মিনিট সময়ও নষ্ট করতে ইচ্ছে করছে না। ওখান থেকে স্টীমার ঘাট বারো মাইল। এখন বেলা দশটা—একটার সময় স্টীমার ছাড়বে। তিন ঘন্টায় স্টীমার ঘাটে পৌঁছতে হলে ঘন্টায় চার মাইল হাঁটতে হবে। তাই না হয় হাঁটব, কিন্তু আর এখানে কোথাও অপেক্ষা করতে ইচ্ছে করছে না।

বৃদ্ধ এখান থেকেই ফিরে যাবেন। নির্জনে দেখা করলাম তাঁর সঙ্গে। প্রণাম করলাম তাঁকে। বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করলেন তিনি আমাদের। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বিদায় গ্রহণ করলাম। চোখের জল বাধা মানছে না,—শেষ কথাটি তিনি বললেন—

"মা-বাবার বুকে ফিরে যাও।"

সন্তানস্নেহে বৃদ্ধের হৃদয় বিগলিত হয়েছিল; আমাদের মা-বাবার দুঃখ তিনি নিজের অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন। তাই বার বার বলেছেন—'এই বিপদসঙ্কুল পথ ছেড়ে মায়ের বুকের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ফিরে যাও তোমরা।'

স্টীমার যদি সেই দিনই ধরতে হয় তবে ঘন্টায় অন্তত চার মাইল করে হাঁটতে হবে। ক'দিন বিশ্রাম করে বল পেয়েছি। জোরে পা চালালাম তিনজনে। কিন্তু শুধু চললেই তো হবে না, কোন্ পথে চলব? বার বার পথের নিশানা জিজ্ঞাসা করবার জন্য থামতে হচ্ছে। যখন স্টীমার ঘাটে পৌঁছেছি তখন ঠিক একটা। শেষ পথটুকু দৌড়চ্ছিলাম। কিন্তু স্টীমার পর্যন্ত আর

পেঁছন গেল না। আমাদের চোখের সামনে দিয়ে স্টীমারটি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বরিশালের পথে রওনা হয়ে গেল।

একেই বলে দুর্ভাগ্য। বন্ধুর আত্মীয়ের বাড়ীতে আরামে একদিন কাটিয়ে আগামীকাল নিশ্চিন্তে স্টীমার ধরতে পারতাম। গোঁয়ার্তুমি করে চলে এলাম, এখন এই অপরিচিত জায়গায় কি করে রাত কাটাব! এখানে থানা আছে, পুলিশ আছে, আদালত—এমন কি সাব-জেলও আছে। আর আছে হাসপাতাল, স্কুল। কলেজ সম্ভবত ছিল না। জায়গাটা শহরের মতই, নাম "বাণী মোক্তারের বাজার।" এটা সন্দ্বীপের সবচেয়ে বড় শহর।

একটা হোটেলে গিয়ে খাবার ব্যবস্থা করলাম। এখানে একটা মজার ব্যাপার হ'ল। যেমনি আমরা তিনজন মেঝেতে পাতা পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছি তখনই কানে এল বুটের আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি আকৃষ্ট হল উঠোনের ওপর। দু'জন লাল পাগড়ী সেপাই। এ আবার কি বিভ্রাট! বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তিনজনের হাতই অন্যের অগোচরে গুপ্তস্থানে—পিস্তলের হাতলের ওপর গিয়ে নিবদ্ধ হল। পর মুহূর্তে আবার আমাদের হাত যথাস্থানে ফিরে এল যখন বুঝলাম আমাদের আশঙ্কার কোন কারণ নেই। পুলিশ সঙ্গে করে দু'জন থানা-হাজতের কয়েদীকে খাওয়াবার জন্য এনেছে। দুই বেচারা হাজতী—হাতে হাতকড়া ও কোমরে দড়ি। হাতকড়া খুলে দিল, কোমরে দড়ি বাঁধা রইল। সেই অবস্থায় আরো দুটো পিঁড়িতে তারা আমাদের পাশে খেতে বসলো। দু'জন লাল পাগড়ী পেছনে দাঁড়ানো। অপূর্ব একটি দৃশ্য! খাওয়া তো হ'ল এখন রাত্রে থাকার ব্যবস্থা। স্কুল বন্ধ ছিল। স্কুল-বাড়ীর রক্ষকের অনুমতি নিয়ে একটা ঘরে থাকবার ব্যবস্থা হ'ল। একটা রাত কোনমতে কেটে গেল।

পরদিন বেলা একটায় সন্দ্বীপ ত্যাগ করলাম। বঙ্গোপসাগরের উপকূল ধরে স্টীমার চলল বরিশালের দিকে। রাত্রে চলে না স্টীমার। পরদিন বিকেল-বেলা বরিশাল পেঁছলাম। বরিশাল বাংলা দেশের একমাত্র জেলা শহর এবং বন্দর যেখানে রেলপথ নেই। গঙ্গার শাখানদীগুলি এদিকটায় জালের মত ছড়িয়ে পড়েছে, তাই রেলপথ বসাবার সুবিধে নেই। জলপথে যেতে হবে খুলনা।

রাত নয়টায় স্টীমার ছাড়ল। পরদিন প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরে খুলনায় পেঁছলাম। সেই রাত্রেই কলকাতার টিকেট কেটে ট্রেনে চড়লাম। আমাদের নিয়ে ট্রেনটি যখন শিয়ালদহ স্টেশনে প্রবেশ করল, তখনো শহরের ঘুম ভাঙে নি। রাস্তায় আলো জ্বলছে, স্টেশনেও ইলেক্ট্রিক্ আলো। পুলিশ আছে স্টেশনে, তবে খুলনা মেল বা বরিশাল মেল দেখবার জন্য তাদের আগ্রহ নেই। আমাদের গ্রেপ্তার করবার জন্য যারা অপেক্ষা করছে তারা চিটাগং মেলের প্রত্যেকটি যাত্রীকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে। নিশ্চিন্তে শিয়ালদহ স্টেশনের এলাকা ছাড়িয়ে শহরের জনারণ্যে মিশে গেলাম।

প্রথমে মাণিকতলা। বলদেও পাড়ায় বি. টি. ইনস্টিটিউশনের হোস্টেলে আগে আমি আর গণেশ থাকতাম। আমি আর খোকা নিচে দাঁড়িয়ে রইলাম। উপেনকে এখানে কেউ চেনে না বলে তাকেই পাঠালাম গণেশকে চুপি চুপি ডেকে আনতে। গণেশ সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল। আমাদের দেখে সে মহা খুশি।

এবার সকলে গেলাম ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন স্ট্রীটে যশোদা পালের বাড়ীতে। কলকাতা পোর্টে কাজ করত যশোদা। ওখানে সম্পূর্ণ একটি ঘর নিয়ে একা থাকত সে।

যশোদার ঘরে বসে সব খবর শুনলাম। খবরের কাগজ পড়বার সুযোগ মেলে নি এতদিন। কাগজে বেরিয়েছে মাস্টারদা আর অম্বিকাদা বন্দী হয়েছেন —পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে, আশা করা যায় বাকী চারজনও শীঘ্রই ধরা পড়বে...... ইত্যাদি। রেলের ডাকাতির পর জুলুদার দোকানে পুলিশ এসেছিল তাঁকে গ্রেপ্তার করতে; জুলুদা পালিয়ে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে আছেন। গণেশকে আই. বি. অফিসে নিয়ে গিয়ে নানারকম প্রশ্ন করা হয়েছে। গণেশ টেক্নিক্যাল ইনস্টিটিউশনের মেধাবী ছাত্র। অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকেরা তার চরিত্র সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তাই এখনো তাকে গ্রেপ্তার করা হয় নি।

আমাদের কাছে ওরা যখন শুনল মাস্টারদা, অম্বিকাদা আর রাজেন পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়েছে, তখন ওরা তো একেবারে হতভম্ব! এও কি সম্ভব? পটাসিয়াম সায়ানাইড মুখে দিলে তো তৎক্ষণাৎ মৃত্যু? তারপর আবার কেউ বলতে পারে যে 'আমি খেয়েছি' বা কয়েক পা চলতে পারে?

হাওড়াতে একটা আশ্রয়ে গোপীনাথ, জুলুদা আর বিপিনদা থাকতেন। সেখানে গেলাম যশোদার সঙ্গে। ওঁরা মন দিয়ে আমাদের সমস্ত বিবরণ শুনলেন—সেই রাখাল, উপকারী বৃদ্ধ, সাপ, হরিণ, ইত্যাদি সব কিছু। আর শুনলেন মাস্টারদাদের পটাসিয়াম সায়নাইড খাবার কথা। জুলুদা বললেন—

"দেখ, এসব অলৌকিক কান্ড, আমাদের পার্থিব শক্তিতে এসব হতে পারে না। নিশ্চয়ই কোন দৈব-শক্তি আমাদের পেছনে কাজ করছে। জ্যোতিষদার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই এগুলি সম্ভব। তিনি নিজে জেলে থাকলেও তাঁর আত্মা সর্বদা আমাদের সঙ্গে রয়েছে। তা'ছাড়া আমার আরও বিশ্বাস শ্রীঅরবিন্দের গভীর সাধনার ফল আমাদের ওপর কাজ করছে। নাহলে এই সব দৈব অনুগ্রহ আমরা পেতাম না।......আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি রাজেনও নিরাপদে আছে, সে শীঘ্রই আমাদের কাছে আসবে। ......আমি শ্রীঅরবিন্দের কাছে যেতে চাই। অনন্তও চলুক আমার সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে দেখা করে সমস্ত কথা বলি। আমার বিশ্বাস তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার ভার গ্রহণ করবেন।"

আমরা সকলেই এই প্রস্তাব সমর্থন করলাম। এইভাবে পুলিশ বেষ্টনী ও তাদের গুলীর মুখ থেকে উদ্ধার পেয়ে সত্যিই আমাদের উচিত শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করা। এই ঋষি বিপ্লবী নেতার প্রতি আমার তখন শ্রদ্ধাভক্তির সীমা ছিল না। ভাবলাম, এই সুযোগে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

আমাদের এই সভা বসেছিল বিপিনদার অগোচরে। পরদিন শুনলাম, রাজেন কলকাতায় এসে পৌঁছেছে। সে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। কি করে সে বেঁচে রইল? কি করে সে পালিয়ে এল? সবই রহস্য! শ্রীঅরবিন্দের দৈব-শক্তি ছাড়া এ হতে পারে না।

রাজেনের সঙ্গে দেখা হলে সব কথা শুনলাম। ও বেশ খানিকক্ষণ

ধরে ওখানে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। এক পশলা বৃষ্টি এল। ভোর হয়ে আসছে—চোখ মেলে খানিকক্ষণ ভাববার চেষ্টা করল এখানে এই নির্জন পাহাড়ে ঝোপের মধ্যে কেন সে শুয়ে আছে? যখন সব মনে পড়ল, তখন ধীরে ধীরে নেমে এল পাহাড় থেকে। পাহাড়টি ঘেরাও করে পাহাড়ের তলায় প্রায় একশ গজ দূরে পুলিশ পোস্ট ছিল। কিন্তু কেউ তাকে কোন প্রশ্ন করল না। একা খাকী সার্ট পরে ওকে পাহাড়ের দিক থেকে আসতে দেখে হয়ত পুলিশদল ভেবেছিল তাদেরই কোন একজন প্রাতঃকৃত্য সারবার জন্য ওদিকে গিয়েছে।

পুলিশের খাতায় রাজেনের নাম লেখা নেই। আই. বি. পুলিশরা ওকে চেনে না। সুতরাং নিশ্চিন্তে কলকাতার টিকিট কেটে চট্টগ্রাম স্টেশনে ট্রেনে উঠে বসেছে। কলকাতায় এসেও কোন বিপদে পড়তে হয় নি তাকে।

আর কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে? এ সবই শ্রীঅরবিন্দের যোগ-সাধনার ফল। সুতরাং তাঁর কাছে যেতে আর দেরি করা উচিত নয়। গেলেই তিনি চিনতে পারবেন আমাদের, বুঝতে পারবেন আমাদের উদ্দেশ্য। তাঁর আশীর্বাদ ও নির্দেশ নিয়ে নতুন উৎসাহে আবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

পরদিন জুলুদার সঙ্গে পণ্ডিচেরী রওনা হ'লাম। ভারতবর্ষের উপকূলে ফরাসী অধিকৃত এলাকা পণ্ডিচেরী। বৃটিশ সীমানা পার হতেই ফরাসী পুলিশ প্রহরীর প্রশ্নবাণের সম্মুখীন হতে হ'ল। টাঙায় করে 'আম্ নিবাসন' নামে একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে রওনা হলাম শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রম উদ্দেশে—বেলা তখন আটটা।

ওখানকার সাধারণ লোকেরা হিন্দী বোঝে না। দু' একজন তাদের নিজেদের ভাষা ছাড়া কিছু কিছু ইংরেজী জানে। তাদেরই সাহায্যে আশ্রমের ঠিকানা খুঁজে খুঁজে যেতে লাগলাম। একটা রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে একজন ভদ্রলোক হঠাৎ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। একটা বাড়ীর কম্পাউন্ডের মধ্যে তিনি অলস পায়ে পায়চারী করছিলেন। বয়স প্রায় চল্লিশ হবে, হাতে অর্ধদগ্ধ বর্মা চুরুট। বাড়ীটির কম্পাউন্ড উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, কাঠের গেটের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ তাঁকে দেখতে পেলাম আমরা। তাঁর বাঙালীর মত বেশভূষা দেখে আমাদের মনে আর কোন সন্দেহই রইল না। এই নিশ্চয় শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম—এত পরিষ্কার, সুন্দর, শান্ত পরিবেশ. আশ্রম ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। তবে আধুনিক আশ্রম।

দারোয়ানের অনুমতি নিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ভদ্রলোক আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন.

—"আপনারা কি কোকোনদ কংগ্রেস থেকে আসছেন?" (১৯২৩ সালে ডিসেম্বর মাসে কোকোনদ জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন কিছুদিন হল শেষ হয়েছে)।

—"আজ্ঞে না।"

—"তাহলে আপনারা সোজা কলকাতা থেকে আসছেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"আপনারা বিপ্লবী?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।" স্পষ্ট স্বীকার করতে একটুও দ্বিধা হল না। তাঁর কাছে স্বীকারোক্তিতে আশঙ্কার তো কোন কারণ নেই!"

—"কেন এসেছেন? কি চান?"

—"আমরা শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

—"না, না, সে তো হবে না। তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না। তিনি এখন সাধনার শেষ মার্গে আছেন। যারা দীক্ষা নিতে চায় শুধু তাদের সঙ্গেই তিনি দেখা করেন।" একটু ভেবে নিয়ে পরে আবার বললেন—"আচ্ছা আসুন। বারীনদার কাছে নিয়ে যাই আপনাদের।"

তাঁর পেছন পেছন গেলাম। কাছেই আর একটা বাংলো। এরও চারপাশে অনেকটা ফাঁকা জায়গা, সুন্দর বাগান উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, কাঠের গেট।

ভেতরে ঢুকে বড় একটা বারান্দায় গিয়ে বসলাম। বারান্দাটার চারদিক খোলা, তবে মাথায় ছাদ আছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই 'বারীনদা' (বারীন ঘোষ) এলেন। আমাদের দেখেই তিনি বলে উঠলেন—

"ও আচ্ছা, তোমাকে (জুলুদা) তো চিনি। কী ব্যাপার, কী হয়েছে? আর তুমি (আমি)? কি চাও তোমরা? এ জায়গা তোমাদের জন্য নয়। এই তুমি (আমি), তোমার চোখ দেখে মনে হয় তুমি একজন কর্মযোগী। তোমাকে 'জাগ্রত কর্মযোগের' মধ্যে থাকতে হবে। যারা দীক্ষা নেয় না তাদের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ দেখা করতে চান না। ভগবান অরবিন্দ তাঁর সাধনার শেষ মার্গে আছেন। দাদা—ভগবান অরবিন্দ: চান না সাধনার মধ্যে কেউ এসে বিঘ্ন ঘটাক......।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে গেলেন তিনি। আমরা চুপ করে রইলাম। তাঁর কথা শেষ হতে জুলুদা অনুরোধ করলেন—

"আপনার সঙ্গে একটু গোপনীয় কথা বলতে চাই আমরা।"

তিনি আমাদের এই সুযোগ দিতে রাজী হলেন। তাঁর প্রাইভেট চেম্বারে গিয়ে বসলাম তিনজনে। জুলুদা এবার ধীরে-সুস্থে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আমাদের সঙ্গীরা বেঁচে রইলেন, শ্রীকৃষ্ণ রাখাল-বেশে এসে আমাদের পথ দেখিয়ে দিলেন, বৃদ্ধ-ভদ্রলোকের রূপ ধরে স্বয়ং ভগবানের দূত আমাদের উদ্ধার করলেন—ইত্যাদি, ইত্যাদি। জুলুদা তাঁর বিশ্বাসভরা মন নিয়ে বললেন—"এ সবই সম্ভব হয়েছে একমাত্র শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-সাধনার ফলে এবং জ্যোতিষদার ইচ্ছাশক্তির জোরে।"

সব শুনে বারীনদা বললেন—"ভগবানের খেলা তোমরা এ কী দেখছ? ভগবানের নিত্য নূতন খেলা আমরা যা দেখছি তা' তোমরা ভাবতেও পারবে না। তাঁর ইচ্ছায় কী না হয়!......।"

তারপর আবার বলতে লাগলেন—"ঠিক আছে। আমি দাদার সঙ্গে কথা বলে দেখি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ আজ আমার সঙ্গে দেখা করবেন না। রুটিন অনুসারে আমরা পর পর দেখা করি। পাঁচদিন পরে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করার পালা আসবে আমার। এর মধ্যে যদি আমি দেখা করি তাহলে অন্যরা অসন্তুষ্ট হবেন। কাজেই আরও পাঁচদিন অপেক্ষা কর। ছ'দিনের দিন তোমরা এসো। আমি তাঁর কাছে তোমাদের কথা সব বলব। তোমরা তাঁর বাণী পাবে।"

এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আশ্রমের এই নিয়ম। রুটিন অনুযায়ীই সকলকে চলতে হয়। বারীনদা যদি কোন সুযোগ গ্রহণ করেন তবে অন্য ভক্তরা অসন্তোষ প্রকাশ করবেন। এখানেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রেষারেষি!

আশ্রম থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে দু'জন রাইফেলধারী পুলিশ তাদের অনুসরণ করতে আমাদের আদেশ দিল। পুলিশ হেড কোয়ার্টারে যেতে হবে। সেখানে প্রায় এক ঘন্টা নানারকম প্রশ্ন করা হ'ল। তারপর ফিরে এলাম হোটেলে। কিছুই ভাল লাগছে না তখন। আরও ছ'দিন এখানে থাকতে হবে? এই পরিবেশে? মন খারাপ হয়ে গেল।

দুপুরে খাবার পর ঘরে শুয়ে একটা ঘুম দিয়ে নেব ভাবলাম। ঘুম এল না। দু'জনেই বেরিয়ে এলাম হোটেল থেকে। কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যবিহীন পণ্ডিচেরী শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ালাম। তারপর গেলাম সমুদ্রের ধারে। তখন বেলা প্রায় দুটো। বালির ওপর একটা গাছের তলায় বসলাম দু'জনে। নানা কথা বলে সময় কাটাতে লাগলাম,—আসন্ন সমস্যা, পরিকল্পনা, ভবিষ্যৎ কাজের প্রোগ্রাম, ইত্যাদি বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা হ'ল। তারপর এক সময় কথা ফুরিয়ে গেল। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম দু'জনে। মন তখন অসীম সাগরের সীমানা ছাড়িয়ে আরও দূরে কোথায় হারিয়ে গেছে, সমুদ্রের অতলে ডুবে মুক্তার সন্ধানে ফিরছে—কত আশা করে এসেছি এখানে পথ খুঁজে পাব বলে, কি নিয়ে ঘরে ফিরব কে জানে?

ধীরে ধীরে সূর্য অস্ত গেল। সমুদ্রের ধারে বাঁধানো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম দু'জনে। এই রাস্তা থেকে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গিয়েছে জেটি—পরিষ্কার ঝকঝকে পথ ইলেকট্রিক আলোয় ঝলমল করছে। সারা পণ্ডিচেরীর শোভা এই সমুদ্রধারের জেটি। সন্ধ্যেবেলায় শহর থেকে শত শত লোক আসে এখানে সমুদ্রের হাওয়া খেতে। আমরাও তাদেরই একজন হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু মনে আমাদের শান্তি নেই, মুখে কথা নেই কারও। ঘুরতে ঘুরতে একটা খালি বেঞ্চ দেখে তাতে বসলাম।

হঠাৎ দেখি আশ্রমের সেই ভদ্রলোক, যিনি আমাদের বারীনদার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের দেখেই তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন। এক-ধারে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি বললেন—

"বারীনদা আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাদের একটা খবর দিতে। ভালই হ'ল, এখানে দেখা হয়ে গেল। আমি দুপুরবেলা আপনাদের হোটেলে গিয়েছিলাম। আপনারা বোধ হয় ভেতরে ঘুমোচ্ছিলেন। ঐ হোটেল আমনিবাসন ফরাসী সি. আই. ডি. পুলিশের আড্ডা। দেখি, দু'জন লোক আপনাদের ওপর নজর রাখছে। তাই তখন আর দেখা করলাম না। আবার যেতাম হোটেলে, তা' এখানেই দেখা হয়ে গেল। বারীনদা আপনাদের বলেছেন আজ রাত সাড়ে আটটায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।"

খবরটা শুনে মনের অবসাদ কেটে গেল। ছ'দিন পরে দেখা করবার কথা, তার বদলে আজ রাতেই ডেকে পাঠিয়েছেন কেন? নিশ্চয়ই গুরুতর কোন কারণ আছে। মনে মনে নানারকম চিন্তা করতে করতে ঠিক সাড়ে আটটায় বারীনদার সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন—

"দেখ, তোমরা চলে যাবার পর দাদা আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

তোমরা যে এসেছ তা' দাদা জানতে পেরেছেন। তিনি তোমাদের বাণী দিয়েছেন—আমি লিখে এনেছি। তোমাদের কাছে পড়ে দিচ্ছি সবটা। কিন্তু তিনি বলেছেন যত তাড়াতাড়ি পার পণ্ডিচেরী ত্যাগ করে চলে যাও—আজ রাত্রেই যদি যেতে পার কাল সকালের জন্য আর অপেক্ষা কোরো না।"

তারপর তিনি ইংরেজীতে লেখা আমাদের জন্য শ্রীঅরবিন্দের বাণী পড়ে শোনালেন। আমি মুখস্থ করে নিলাম। প্রায় আড়াইশ শব্দ সম্বলিত বাণীটি আমার বহুদিন পর্যন্ত মনে ছিল। এখন সবটা মনে নেই; সামান্য দু' একটা লাইন যা' মনে আছে লিখছি—

"বর্তমানে বিপ্লবী সংগঠন বা যে কোন সংগঠনের মধ্যেই এককভাবে অথবা সমবেতভাবে যে সব কাজ হচ্ছে তা' সবই 'অবিদ্যা শক্তির' (অহংকার) প্রভাবে সংঘটিত হচ্ছে। যদি সংগঠনের ব্যক্তিরা নিষ্কলুষ ও সম্পূর্ণ অহংকার মুক্ত না হন, তবে তোমরা লক্ষ্যে পৌঁছবে না। 'অবিদ্যা শক্তির' অন্ধ প্রভাব শুধু যে বিপ্লবী সংগঠনের ভিতরেই সংক্রামিত হয়েছে তা' নয়, ধর্মীয় সংগঠন এবং তার ব্যক্তিদের ওপরেও এই প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে। নিজেকে না জানলে কোন নিঃস্বার্থ কাজ করা সম্ভব নয়।......ধর্মের ক্ষেত্রে ভান করা সবচেয়ে বড় অপরাধ। ধর্মের ভান করার চেয়ে তোমরা বরং কর্মযোগী হও, সেও ভাল।......নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা অপেক্ষা কর্ম করা সর্বদাই শ্রেয়ঃ। নিঃস্বার্থ ভক্তির চেয়ে নিঃস্বার্থ কর্ম কোন অংশে কম নয়।......নিঃস্বার্থ কর্ম অবিদ্যা শক্তিকেও অতিক্রম করতে পারে......" ইত্যাদি।

মাঝে মাঝে কোন কোন জায়গা ভুলে গেছি। কিন্তু মোট সারমর্ম এই। যখন চলে আসি বারীনদা আর একটা কথা বলে দিলেন—

"শ্রীঅরবিন্দ বিশেষভাবে আমাকে বলে দিয়েছেন তোমাদের এই কথাটা জানাতে যে তিনি তাঁর দৈব-শক্তি প্রয়োগ করে তোমাদের বিপ্লবী কাজে সাহায্য করেন নি। যদি তোমাদের এই কাজের পেছনে কোন শক্তি কাজ করে থাকে তবে তা' তোমরা জ্যোতিষের কাছ থেকে পেয়েছ।"

শ্রীঅরবিন্দ এবং বারীন ঘোষের সঙ্গে আমাদের এই আলাপ-আলোচনার অধ্যায় সম্বন্ধে পরে চিন্তা করে আমি তার কারণ বিশ্লেষণ করেছি। কিন্তু সেই সময় দৈব-শক্তির প্রতি বিশ্বাস এবং শ্রীঅরবিন্দের প্রতি ভক্তি এত প্রবল ছিল যে, তখন সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে কিছুই দেখতে চাই নি। যাই হোক্, সে সব অন্য কথা, আমার এই কাহিনীর সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। তখন শ্রী-অরবিন্দের বাণী নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না। কাজেই পণ্ডিচেরী পর্বের এখানেই ইতি।

বারীনদা, শ্রীঅরবিন্দের নামে আমাদের আর একটা নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমরা যেন সোজা কলকাতায় না গিয়ে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি দর্শন করে তারপর যাই। এ আদেশ শিরোধার্য করে আমরা পাঁচদিন ঘুরে বেড়ালাম। রামেশ্বর, ত্রিচিনাপল্লী, মাদুরার অপূর্ব কারুকার্যময় মন্দির দেখলাম—ধনুষ্কোটিতে গিয়ে তিন সমুদ্রের পবিত্র জলে স্নান করলাম।

মাদ্রাজ স্টেশন থেকে পুরী পর্যন্ত টিকিট করে কলকাতা-মাদ্রাজ মেলের থার্ড ক্লাস গাড়িতে উঠেছি দু'জনে। রাত তখন ন'টা। একটা বাঙ্কের ওপর

উঠে শোবার আয়োজন করছি, পাশের বাঙ্কে জুলুদা। হঠাৎ তিনি একটা খবরের কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। খবরের কাগজটার প্রথম পৃষ্ঠায় হেড লাইনে বড় বড় ছাপা কয়েকটি অক্ষর দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল, শরীরে যেন একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। খবরটা এই—

"দৈবক্রমে স্যার চার্লস টেগার্টের জীবনরক্ষা। চৌরঙ্গীর উপর মিঃ আর্নেস্ট ডে নৃশংসভাবে নিহত। গোপীনাথ সাহা নামে একজন যুবক ঘটনাস্থলে ধৃত...।"

সব খবরটা পড়লাম খুঁটিয়ে—"সকাল আটটার সময় গোপীনাথ চার্লস টেগার্ট বলিয়া ভুল করিয়া আর্নেস্ট ডে-কে হত্যা করিয়াছে। সে মিঃ ডের বুকের ওপর বসিয়া পর পর আটটি গুলী খরচ করে যাতে ঘটনাস্থলেই তাহার মৃত্যু হয়। তারপর মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া সে পালাইবার চেষ্টা করে। একটি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে আদেশ দেয় তাহাকে লইয়া যাইতে। ড্রাইভারটি অস্বীকার করায় তাহাকে গুলী করিয়া আহত করে। তারপর আর একটি ট্যাক্সি করিয়া সে পালাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই ড্রাইভারটিও অস্বীকার করায় আহত হয়। ইতিমধ্যে চারিপাশে লোকের ভিড় হইয়া যায়। দুইজন সার্জেন্টও ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়ে। এক হাতে পিস্তল অন্য হাতে রিভলভার—এই অবস্থায় গোপীনাথ বন্দী হয়। সে জেল-হাজতে আছে। শীঘ্রই বিচার সুরু হইবে এবং পুলিশ আশা করে যে সহসা এই নিষ্ঠুর জঘন্য হত্যাকান্ডের পিছনে যে ষড়যন্ত্র রহিয়াছে তাহা উদ্ঘাটিত হইবে।"

খবরটা পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। গোপীনাথ ধরা পড়েছে! বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রকৃতির কি নির্মম পরিহাস! চার্লস টেগার্টকে হত্যা করবার জন্য গোপীনাথ জীবন উৎসর্গ করেছিল। যাতে কোনোমতেই ভুল না হয় সে জন্য দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছে টেগার্টকে। আমরা যখন প্রশ্ন করতাম ওকে, "কি রে গুপী, ঠিক চিনতে পারবি তো"—তখন ও চটে যেত, এতই নিশ্চিত ছিল সে এই সম্বন্ধে। সেই গোপীনাথ আজ জীবন দান করতে চলেছে, কিন্তু একজন অবাঞ্ছিতকে হত্যা করে! টেগার্টকে নিঃসন্দেহে হত্যা করবার জন্য সে পালাবার পথ পর্যন্ত রাখে নি, সর্ব সমক্ষে বুকের ওপর বসে পর পর গুলী চালিয়েছে। ভেবেছিল জীবন যায় যাক্ তবু টেগার্টকে সরাতে হবে বাংলার বুক থেকে! কে জানত, সেদিন গোপীনাথের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাবার জন্য টেগার্টের অনুরূপ চেহারা বিশিষ্ট 'ডে' ঠিক সকালবেলাই চৌরঙ্গীর পথ দিয়ে হাঁটবে? মানুষ ভাবে এক, ঘটে অন্যরকম। মনের ওপর আসে দারুণ প্রতিক্রিয়া, ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর নির্ভরতা জন্মে।

মাদ্রাজ মেলের একটি থার্ড ক্লাস কামরায় বসে যে নিদারুণ দুঃসংবাদ পেলাম তারপর আর পুরী যেতে ইচ্ছে করছিল না। মনে হ'ল তখনি কলকাতায় চলে যাই, শুনি গিয়ে সব ঘটনা। কেন গোপী এ ভুল করল? জুলুদার কিন্তু প্রোগ্রাম পরিবর্তনের ইচ্ছে নেই। অগত্যা পরদিন ভোর বেলায় পুরীতে গিয়েই হাজির হলাম।

বহু পান্ডার সম্মিলিত আক্রমণের মধ্যে থেকে ব্যূহ ভেদ করে যে পান্ডাটি আমাদের কুক্ষিগত করে বেরিয়ে এল তার নামটি আমার আজও

মনে আছে। জ্বলুদাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সে বলেছিল—"আপনাদের কাছ থেকে কোন টাকা পয়সা চাই না আমি। আমার কোন চার্জ নেই। শুধু দয়া করে আমার নামটি স্মরণ করলেই খুশি হব—আমার নাম চিন্তামণি।"

কালো লম্বা দাড়ি আর ভারিক্কি চেহারার চিন্তামণিকে দেখে একটা ভীতিকর চিন্তাই মনে আসে। তবে লোকটি আর সব দিকে অন্যান্য পাণ্ডাদের মতই, অর্থাৎ তাদের চাইতে বেশি ভীতিপ্রদ নয়। সে আমাদের নিয়ে গেল চন্দনপুকুরে। এখানে একবার স্নান করলে নাকি সর্বরোগমুক্ত হয় লোকে। তাকিয়ে দেখলাম বহু সংক্রামক ব্যাধিদুষ্ট লোক, এমন কি কুষ্ঠরোগীরাও সব ভিড় করে স্নান করছে জলে। জানি না তারা আরোগ্য লাভ করেছে কি না, কিন্তু তাদের পাশাপাশি গা ঘেঁষে স্নান করতে আমার প্রবৃত্তি হ'ল না। জ্বলুদা কিন্তু দিব্যি স্নান সেরে নিলেন।

তারপর গেলাম জগন্নাথ দর্শন করতে। ঠাকুরের মন্দিরে যাবার আগে আর একটা বিরাট বাড়ীতে গেলাম আমরা। সেখানে পাণ্ডারা যজমানদের কল্যাণে নানারকম যজ্ঞ-পূজা ইত্যাদি করছে। লোকের ভিড়ে চলাচল করা দুষ্কর। বড় বড় খাতায় তীর্থযাত্রীদের নাম ঠিকানা আর দক্ষিণার পরিমাণ লেখা হচ্ছে। এঁরা সব ঠাকুরের ভোগ দিতে এসেছেন নিজেদের এবং বংশধরদের কল্যাণ কামনায়। আর একটা নিয়ম আছে এখানে। এই বাড়ীটার চারপাশে কয়েকবার, বোধ হয় সাতবার, ঘুরে আসছে সবাই আর প্রতিবার পাণ্ডার হাতে বা বাক্সে পয়সা দিচ্ছে। এটাও কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হবে। আমি ভোগও দিলাম না, বাড়ীর চারপাশেও ঘুরলাম না। ধর্মের নামে এই সব বাহ্য আড়ম্বর আমার কোনো দিনই ভাল লাগত না।

এরপর পাণ্ডা আমাদের নিয়ে গেল 'মহাপ্রভু' দর্শন করাতে। একটা বড় দরজা দিয়ে জনস্রোত ঢুকছে, পেছনে ঠেলা খেয়ে খেয়ে সেই স্রোত আবার বেরিয়ে যাচ্ছে অন্য দরজা দিয়ে। এর ফাঁকে যে যা পার দেখে নাও। এর মধ্যে আরও আছে—যদি সুফল পেতে চাও তবে পাণ্ডা-ঠাকুরকে কিছু দক্ষিণা দিতে হবে! দক্ষিণার বিনিময়ে তিনি বাঁশের আগায় একটা ঝাঁটা বেঁধে মাথায় আঘাত করবেন, তবেই 'দর্শনের' 'সুফল' পাওয়া যাবে, নচেৎ নয়। একজন পাণ্ডা আমার মাথায় বাড়ি দিয়ে 'সুফল' দেবার চেষ্টায় ছিল, আমি নিষেধ করলাম।

তারপর গেলাম যেখানে ভোগ রান্না হয় সেখানে। সে এক বিরাট ব্যাপার। হাঁড়ির পর হাঁড়ি চড়িয়ে থাক করা। একটা ঘরে এরকম অজস্র থাক সাজান। এই ঘরে তাপ দেওয়া হচ্ছে সাধারণ জ্বালানী কাঠ দিয়ে—এক সাথেই সব হাঁড়ির ভোগ সিদ্ধ হচ্ছে। রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। আমাদের পাণ্ডা এক হাঁড়ি সিদ্ধ করা ভোগ নিয়ে এল আমাদের জন্য,—চালে-ডালে খিচুড়ি। এই হচ্ছে জগন্নাথের ভোগ। এখানে, শ্রীক্ষেত্রে উচ্চ-নীচ ভেদ নেই —সবাই সমান। ব্রাহ্মণ-শূদ্র এক সাথে, এমন কি এক পাত্র থেকে ভোগ খেতে পারে, কোন বাধা নেই। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ-প্রথা দূর করবার জন্যই এই নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন। কিন্তু ধর্মশালায় গিয়ে খেতে বসে ব্রাহ্মণ চিন্তামণি যখন আমার পাতা থেকে খানিকটা ভোগ তুলে নিয়ে খেল আর তার নিজের উচ্ছিষ্ট খানিকটা ভোগ আমার পাতে তুলে দিল, তখন তার এই

উদারতা দেখেও পাতে হাত দিতে আর আমার প্রবৃত্তি হ'ল না। অর্ধভুক্ত অবস্থাতেই উঠে পড়লাম। চিন্তামণি বুঝল আমাকে নোয়ানো শক্ত হবে।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে, দেশে তখন কমিউনিজমের হাওয়া আসে নি, কমিউনিস্ট দেশের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। কাজেই কোন বাস্তববাদী নীতি আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল অটুট, আর সামনে ছিল আদর্শবাদ। মা কালীকে ভক্তি করতাম অন্ধের মত। শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতাকে একমাত্র দর্শন বলে জানতাম। সেই যুগেও এই সব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, বিশেষতঃ ধর্মের নামে মিথ্যা ভড়ংকে মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণা করতাম। আমার অনমনীয়তা দেখে নিরাশ হয়ে চিন্তামণি জুলুদাকে পেয়ে বসল।

মধ্যাহ্ন আহারের পর চিন্তামণির মুখে পুরী-মাহাত্ম্য শুনতে লাগলাম। জুলুদা এতই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে এক সময়ে পান্ডাঠাকুরকে জানালেন তার কাছে দীক্ষা নিয়ে এখানেই পড়ে থাকতে চান তিনি। আমি তো অবাক! জুলুদার আবার এ কি রূপ! তারপর মনে হ'ল কলকাতায় এখন যাওয়া নিরাপদ নয় ভেবেই জুলুদা হয়ত এখানে একটা আশ্রয় খুঁজছেন। কিন্তু আমার সঙ্গে তো এ বিষয়ে কোন আলোচনা করেন নি আগে! যাই হোক্, আমি জুলুদার কথায় রাজী হলাম না।

বেলা প্রায় দুটো নাগাদ চিন্তামণি আমাদের রেহাই দিল। সে চলে যেতেই আমি জুলুদাকে বললাম যে করেই হোক্ আজ রাত্রেই কলকাতা রওনা হতে হবে। এখানে বসে দেরি করা চলবে না। জুলুদা এত তাড়াতাড়ি যেতে রাজী নন। সবে তো আজই, এই সকালবেলা এসেছি এখানে, এর মধ্যেই চলে যাব? কিন্তু আমি শেষবারের মত বললাম—

"আপনার যতদিন ইচ্ছে আপনি থাকুন। আমি আজ রাত্রের গাড়িতেই কলকাতা রওনা হব—আমায় ভাড়ার টাকা দিয়ে দিন।"

আমার কথার দৃঢ়তায় জুলুদা বুঝলেন, আমাকে নিরস্ত করা যাবে না। তিনি বললেন—

"ঠিক আছে, তুমি যাও। তোমার আর কিসের দায়িত্ব? ষড়যন্ত্রের নেতা বলে আমারই ফাঁসি হবে, তোমার নয়।"

কেন যে জুলুদা এ কথা বললেন, তার কারণ অনুসন্ধান করবার মত বুদ্ধি বা বয়স আমার ছিল না। স্টেশনে আমার সঙ্গে এলেন জুলুদা। আমি টিকিট কেটে গাড়িতে উঠলাম। তিনি আমার কামরার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর কি ভেবে ফিরে গিয়ে নিজের জন্য আবার একটা টিকিট কিনে আমার কাছে এসে বললেন—

"তোমার সঙ্গে আমায় যেতেই হবে। তুমি আমার সঙ্গে এসেছ, তোমার নিরাপত্তার ভার আমার ওপর। নিরাপদে আশ্রয়ে না পৌঁছন পর্যন্ত আমি তোমায় একা ছাড়তে পারি না।...হয়ত হাওড়া স্টেশনেই আমাকে গ্রেপ্তার করা হবে। কলকাতার পুলিশ আমাকে চেনে, তোমাকে চেনে না।"

জুলুদার কথায় বিশেষ গুরুত্ব দিলাম না আমি। তবে এই সঙ্কট

সময়ে, যখন গোপীনাথ জেলে রয়েছে, তার ফাঁসি হবে,—তখন জ্বলুদা আমার সঙ্গে কলকাতায় যাওয়ায় খুব খুশি হলাম।

ভোর বেলায় হাওড়ায় পৌঁছে নিরাপদ আশ্রয়ে গেলাম। এটি আমাদের নতুন আশ্রয়। এখানে জ্বলুদা, খোকা, গোপী আর আমি থাকতাম। বিপিনদা আমাদের সঙ্গে থাকতেন না, কারণ তিনি থাকলে জায়গাটার কথা বেশি জানাজানি হয়ে যাবে। এটি আসলে হরিদার একটি আশ্রয়। তিনি তখন আমাদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ রাখতেন। আমি আর জ্বলুদা চলে যাওয়ায় খোকা আর গোপী শুধু থাকত এখানে। হরিদা ওদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতেন।

খোকার কাছে সব ঘটনা বিস্তারিত জানতে পারলাম। সেদিনটি ছিল ১২ই জানুয়ারী ১৯২৪। গোপী ভোরবেলা উঠেই বেরিয়ে গেল। যাবার সময় খোকাকে বলে গেল—

"দেখ, আমি এখন বেরুচ্ছি। সারা দিন-রাত যতক্ষণ পর্যন্ত পারি চার্লস টেগার্টকে ছায়ার মত অনুসরণ করব। যে করে হোক্ ওর গতিবিধি বুঝে ঠিক করতে হবে কখন কোন্ জায়গা থেকে ওকে গুলী করব।"

গোপী খোকাকে বলে নি যে, সে দিনই সে টেগার্টকে গুলী করবার চেষ্টা করবে। খোকা কিছুই জানত না, পরদিন সকালে হরিদার কাছে ঘটনাটা শুনতে পায়। হরিদাও আগে কোন খবর পান নি, সকালের কাগজ দেখে ছুটে এসেছেন খোকার কাছে।

১৪ই জানুয়ারী গোপীনাথকে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হ'ল। আদালতে এসে সে প্রথম জানতে পারল চার্লস টেগার্ট নিহত হয় নি। টেগার্ট বলে ভুল করে যাকে সে হত্যা করেছে সে ঠিক টেগার্টের মত দেখতে একজন ইউরোপীয়ান, নাম আর্নেস্ট ডে।

যে টেগার্টকে হত্যা করার জন্য গোপীনাথ হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি বরণ করতে এগিয়ে এসেছে, সেই টেগার্ট এখনো জীবিত? খবরটা শুনে গোপীনাথের সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে গেল। সে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, এমন সময় আদালত কক্ষে প্রবেশ করল বাংলার বিপ্লবীদের চিরশত্রু চার্লস টেগার্ট। মুহূর্তে জ্বলে উঠল ক্ষীয়মাণ বহ্নিশিখা—গোপীনাথ বলে উঠল—

"এই কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে ভাল করে চিনতাম আমি। আমার দুর্ভাগ্য, উত্তেজনাবশে আমি একজন নির্দোষীকে হত্যা করেছি। কী আশ্চর্য মিল দুজনের চেহারায়! আমি কী করলাম, দুঃখে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় দুঃখ আমার দেশের এই প্রবল শত্রুকে আমি আমার জীবনে হত্যা করতে পারলাম না। তবে এই আশা নিয়ে আমি মৃত্যু বরণ করব যে আমার এই সামান্য অসমাপ্ত কাজটি অন্য কোন দেশ-ভক্ত বীর নিজের দায়িত্ব বলে গ্রহণ করে সমাধা করবে।"

সেসন কোর্টে মামলা স্থানান্তরিত হ'ল। সেসন জজ মিঃ পিয়ার্সনের আদালতে ১৯২৪ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী গোপীনাথের মৃত্যু-দণ্ড ঘোষিত হ'ল। মার্চের প্রথম দিনে বাংলার আকাশ বাতাস ঘিরে নেমে এল ঘন কুজ্ঝটিকা, বাংলার বিপ্লবীদের নীরব হাহাকার প্রতিটি দেশভক্ত বাঙালীর বুকে শেল হয়ে বিঁধল—প্রতিহিংসায় উন্মত্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য-

বাদ বীর গোপীনাথকে ফাঁসিমঞ্চে তুলে নিজেদের ক্ষমতার গর্বে অট্টহাসি হাসল।

গোপীনাথের বিদ্রূপ ভরা হাসি তাদের ফাঁসির দড়ির বিভীষিকাকে ম্লান করে দিল—শহীদের মৃত্যু বরণ করল গোপীনাথ।

ফাঁসিমঞ্চে ওঠবার আগে গোপীনাথ রেখে গেল বাংলার যুবকদের কাছে তার শেষ বাণী—

"আমার প্রতি বিন্দু রক্ত ভারতের প্রতিটি ঘরে আমার মত একনিষ্ঠ বিপ্লবী গড়ে তুলুক।"

গোপীনাথের আত্মদানে বাংলার তথা ভারতের সুপ্ত দেশপ্রেম নতুন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠ্‌ল। সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গোপীনাথের দেশপ্রেমকে প্রশংসিত করে একটি প্রস্তাব আনেন। কংগ্রেস, দেশের অন্যান্য প্রগতিবাদী দল এবং সমগ্রভাবে বাঙালী জাতি গোপীনাথের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের আদর্শ থেকে প্রেরণা লাভ করে যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি সংহত করে মাথা তুলে দাঁড়াল—তখন বৃটিশ কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গণলেন। বাংলার আই· বি· বিভাগের মুদ্রিত গোপন রিপোর্ট "Brief note on the Alliance of Congress with terrorism in Bengal—" এ নিচের কথাগুলি লেখা হ'ল—

"4. 1924. গোপী সাহা প্রস্তাব পাস। কংগ্রেসের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী প্রভাব বৃদ্ধি।

"১৯২৪ সালে স্বরাজ্য পার্টির সন্ত্রাসবাদী সভ্যরা কর্পোরেশনের চীফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসাররূপে সুভাষচন্দ্র বসুর মনোনয়ন সমর্থন করে এবং লক্ষ্য করবার বিষয় যে তাঁহার এই পদে নিয়োগের পর কর্পোরেশনের বহু চাকুরি সন্ত্রাসবাদীদের দেওয়া হইতেছে।

"সিরাজগঞ্জ কংগ্রেস কনফারেন্সে শ্রী সি· আর· দাশ তাঁহার সন্ত্রাসবাদী সমর্থকদের সাহায্যে তাঁহার হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট প্রস্তাব এবং তাহাদের এই সমর্থনের বিনিময়ে তিনি মিঃ ডের আততায়ী গোপীনাথ সাহার প্রশংসা সম্বলিত ঘৃণ্য প্রস্তাব পাস করাইয়াছেন; যাহার অর্থ বাংলার যুবকদের সেই আততায়ীর উদাহরণ অনুসরণ করিতে উত্তেজিত করা। এই বৎসর সন্ত্রাসবাদীরা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র চালাইতে থাকে এবং বিপদের সম্ভাবনা এত বেশি দেখা যায় যে, গভর্ণমেন্ট ১৯২৪-এর অর্ডিন্যান্স জারী করা প্রয়োজন মনে করেন......।"

জুলুদা কলকাতায় আসার এক সপ্তাহ পরে উত্তরপ্রদেশে চলে যান, যদিও উত্তরপ্রদেশে তখন তাঁর কোন কাজের প্রোগ্রাম ছিল না। হরিদার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রেখে চলতে লাগলাম। গোপীনাথের ফাঁসির দিন ঘনিয়ে এল। কোর্টে গোপীনাথ যে সব স্টেটমেণ্ট এবং বাণী দিয়েছে সে সব গোপনে মুদ্রিত করে হরিদা প্রচারপত্র আকারে প্রকাশ করেছিলেন। গোপীনাথের ফাঁসির দিন সেগুলি স্কুলে কলেজে ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল। আমি আর খোকা তখন কলকাতায়। হরিদার সাথে পরামর্শ করে আমরা সেদিন খেলার মাঠে গেলাম ডেপুটি পুলিশ কমিশনার মিঃ কীড্‌কে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে।

কলকাতা ময়দানের পুলিশ গ্রাউণ্ডে প্রত্যহ মিঃ কীড্ আসেন হকি

খেলায় অংশ গ্রহণ করতে। সন্ধ্যাবেলা তাঁর "100 নম্বরের" গাড়ীটিতে করে বাড়ী ফিরে যান। গোপীনাথের অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে মিঃ কীডের প্রাণ নিতে হবে, এই ছিল আমাদের সঙ্কল্প। দুটো সাইকেলে করে রিভলভার নিয়ে আমরা দু'জন ময়দানে গেলাম। "100 নম্বরের" গাড়ীটির ওপর নজর রাখতে লাগলাম দু'জনে। হরিদা বারবার করে বলে দিয়েছিলেন—তাড়াতাড়িতে যেন কিছু না করি; মিঃ কীড্ সম্বন্ধে নিঃসংশয় না হলে যেন গুলী না চালাই, ভুল লোককে হত্যা করে যেন ধরা না পড়ি।

খেলা শেষ হয়ে গেল। দলে দলে লোক ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু 100 নং গাড়ির কাছে কেউ আসছে না। শেষে দেখি ড্রাইভার এসে গাড়িটি নিয়ে চলে গেল। মিঃ কীড্ হয়ত আজ মাঠে আসেন নি, অথবা অন্য কারো গাড়িতে চলে গিয়েছেন।

ভগ্নহৃদয়ে ফিরে গেলাম দু'জনে—গোপীনাথের ফাঁসি হয়ে গেল। জুলুদাও নেই এখানে। দিনগুলি যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হতে লাগল। জুলুদারই বা এত দেরি হচ্ছে কেন? আমরা একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

শেষ পর্যন্ত জুলুদা এলেন। কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের জন্য। এসে বললেন, "উত্তর ভারতে ঘুরে বেড়াতে হবে কিছুদিন. খোকাও সঙ্গে চলুক।" খোকা রাজী হ'ল। দু'জনে চলে গেলেন, আমি রইলাম একা।

"বাঁধাঘাট শালকিয়া" থেকে প্রায় চার মাইল দূরে বুন কোম্পানীর ইঁটখোলার কাছে একটা একতলা বাড়ী ভাড়া করা হয়েছিল। বাড়ীটি ভাঙা-চোরা, বহুদিনের পরিত্যক্ত। বিরাট কম্পাউণ্ডের ভেতরে সামনের দিকে মাত্র চারখানা ঘর। তার মধ্যেই খান দুয়েক একটু বাসোপযোগী করে নিয়ে আমি রইলাম। একেবারে একা থাকতাম, নিজে রান্না করে খেতাম। আমার সঙ্গী ছিল একটি রিভলভার এবং দেয়ালের গায়ে বড় দেখে একটি কালীমূর্তি। আমার প্রার্থনা শেষ হলে লাল পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখতাম।

রোজ ভোরে উঠে গীতা পড়তাম, আর মা-কালীর কাছে প্রার্থনা জানাতাম। এভাবে একেবারে একা থাকা এবং একা একা মায়ের পুজো করা আমার কাছে নতুন। কিন্তু বেশ ভাল লাগত তখন। আমি তো কোনো পরমার্থের জন্য প্রার্থনা জানাতাম না, আমি বলতাম, "মা, আমায় শক্তি দাও, সাহস দাও, যেন প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে বিপদসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। ক্ষুদিরাম-কানাইলাল-গোপীনাথকে যারা ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়েছে সেই দেশের শত্রু ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করবার ক্ষমতা দাও!"

সারাদিন কাজও কম করতে হোত না। অন্যদের অনুপস্থিতিতে আমি একা কাজ করবার মত ছোট একটি কারখানা বানিয়ে ফেললাম—যেমন নাকি ইছাপুর গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরীর একটি অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ। আমার কারখানায় ছিল ড্রিলিং যন্ত্র, লোহা কাটার করাত...ইত্যাদি। বোমার স্ট্রাইকার বানাবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলত এখানে। হরিদা আমার কাজে সাহায্য করতেন। তাঁর কাছ থেকে ঢালাই লোহার ছাঁচ এনে, সাইকেলের ঘণ্টার স্প্রিং এবং সরু লোহার শিক কিনে স্ট্রাইকার বানাবার চেষ্টা করছিলাম। অনেকবার পরীক্ষা করবার পর বোমার খোলের ওপরে কাগজের পার্কাশন ক্যাপ এঁটে রাখবার উপযোগী এক ধরনের ক্লিপ তৈরি করি। এমন ধরনের স্ট্রাইকার

আবিষ্কার করা হ'ল ক্যাপে যার আঘাতে স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং তার সাহায্যে বোমা ফাটানো যায়।

ইতিমধ্যে আমরা কয়েকজন—আমি, গণেশ, প্রেমানন্দ আর যশোদা পাল একসাথে মিলে আমাদের বিপ্লবী প্রোগ্রাম রচনায় মন দিলাম। আমাদের এই কয়জনের গোপন বৈঠকের কথা জ্ঞানদা, হরিদা এবং বিপিনদা জানতেন না। তখন বিপ্লবীদের মধ্যে এরকম গোপনীয়তা চলত, হয়ত প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু পরে আমি চিন্তা করে দেখেছি এ সবের কারণ কি। আমরা সবাই একই দলের—জ্ঞানদা, বিপিনদা, সন্তোষদা,—আমাদের সকলের উদ্দেশ্য এক, মোটামুটি প্রোগ্রামও এক। তবু কেন এ'রা নিজের নিজের দলটুকু নিয়ে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে চান? আবার, আমি আর গণেশ যে এ'দের অগোচরে নিজেরাই প্রোগ্রাম স্থির করবার চেষ্টা করছি, নানারকমের বিস্ফোরক বস্তু তৈরি করবার চেষ্টা করছি—এরই বা কারণ কি?

আমার মনে হয় এর একটিমাত্র কারণ আপন প্রভুত্ব বজায় রাখা। প্রত্যেকেই চাইতেন তাঁর নিজস্ব কয়েকজন অনুগত শিষ্য থাকবে যারা তাঁদের আদেশকে বেদবাক্য মনে করবে, তাঁদের পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করবে না। আমরা আবার চাইতাম কাজের দিক থেকে নেতাদের ছাড়িয়ে যাব। এইভাবে প্রত্যেকের মধ্যেই নেতৃত্ব করবার স্পৃহা থাকায় বাংলার বিপ্লবীরা একটি বৃহৎ দল হয়ে যুগ্মভাবে কোন কাজ করতে পারেন নি। আমরা যে হরিদার অগোচরে নানারকম পরীক্ষা চালিয়ে উন্নততর বোমা এবং বিস্ফোরক তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলাম এর পেছনেও সেই একই মনস্তত্ত্ব। এ বিষয়ে দলের মধ্যে আমিই ছিলাম অগ্রণী।

এবার প্রেমানন্দের কথা একটু বলে নিই। বহুদিন পর্যন্ত তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে আমাদের সজীব সাহচর্য না পাওয়ায় সাময়িকভাবে বিপ্লবীজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে সে কলকাতায় আসে। খবর পেয়ে আমি তার সঙ্গে দেখা করে তাকে দলের কাজে টেনে আনি। আমাদের ছোট দলটি আবার তাকে উৎসাহ দেয়, অনুপ্রেরণা দেয়। গণেশ বোমার জন্য ঢালাই লোহার খোল বানাবার চেষ্টা করছিল। তার চেষ্টাও সার্থক হ'ল। এবার চাই বারুদ। প্রেমানন্দকে চট্টগ্রামে পাঠানো হ'ল। আমার দাদা নন্দলাল সিং-এর সহায়তায় সে এক মণ বারুদ যোগাড় করল। সেই বারুদ কলকাতায় এল রেলওয়ে পার্শেলে এবং প্রেমানন্দ সেই বারুদ এনে দিল আমাদের।

আমি মাঝে মাঝে প্রেমানন্দকে আমার গোপন বাসস্থানে নিয়ে আসতাম। বাড়ীটি এত গলি-ঘুঁজির মধ্যে যে সে নিজে পথ চিনে আসতে পারত না। সাধারণতঃ রাত্রে বাঁধাঘাটে দু'জনের দেখা হোত। প্রয়োজন হলে সেখান থেকে ওকে আমি আমার গোপন আশ্রয়ে নিয়ে আসতাম। এখানে বসে মন খুলে কথাবার্তা বলে ভবিষ্যৎ কাজের প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা চল্‌ত। গণেশ আর যশোদার সঙ্গেও নিয়মিত দেখা হোত আমার। আমরা চারজনেই যেন একটা গ্রুপ তৈরি করে আমাদের নিজস্ব প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ চালাতে লাগলাম।

৫

বন্দীত্ব—বিচার—বিনা বিচারে ডেটিনিউ

"Is life so dear, or peace so sweet, as to be purchased at the cost of chains and slavery?—Forbid it, Almighty God!—I know not what course others may take, but, as for me, GIVE ME LIBERTY OR GIVE ME DEATH."

—Patrik Henry

বনু কোম্পানীর ইট খোলার কাছে আমার গোপন বাসা। বোমার স্ট্রাইকার তৈরি করা, প্রেমানন্দ, গণেশ ও যশোদার সঙ্গে সংযোগ রেখে ভবিষ্যতের প্রস্তুতি অব্যাহত রাখার চেষ্টা—এইভাবে বেশ কিছুদিন সময় গেল। একদিন সকাল আটটার সময় রওনা হয়েছি বাড়ী থেকে। বড়বাজারে যেতে হবে হরিদার সঙ্গে দেখা করতে। ভেবেছি "শালকিয়া বাঁধাঘাট" থেকে ফেরী স্টীমারে নদী পার হয়ে বড়বাজার যাব। সেদিন মুসলমানের বেশ আমার,—লুঙির ওপর একটা খাকী সার্ট তার ওপর একটা খাকী কোট; পায়ে জুতো, তবে মাথায় কোন টুপি ছিল না। সাধারণ চলাফেরা করা কালে সব সময় রিভলভার সঙ্গে থাকত না, সেদিনও ছিল না।

স্টীমার ছাড়তে আর দেরি নেই। টিকিট ঘর থেকে বেরুতেই স্টীমারের বাঁশী বেজে উঠল। তবু দৌড়লাম যদি ধরতে পারি স্টীমারটা। দৌড়তেই মনে হ'ল পেছনে কে যেন তেড়ে আসছে—খট্ খট্ করে জুতোর শব্দ। হয়ত আমারই মত কেউ স্টীমার ধরতে চেষ্টা করছে! তবু মনে খট্‌কা লাগায় ঘুরে তাকালাম। তখন আর সন্দেহ রইল না, আই, বি, সাব-ইন্সপেক্টর প্রফুল্ল রায় আসছে আমার পেছন পেছন।

এখন কি করি? সরু ব্রীজ ধরে দৌড়চ্ছি সামনের দিকে। ঘাট থেকে জলের ভেতর নোঙর করা ফ্ল্যাট পর্যন্ত এই ব্রীজ চলে গেছে,—যাতায়াতের একমাত্র পথ। পেছনে যাবার উপায় নেই—সাব-ইন্সপেক্টর তেড়ে আসছে। সামনে ফ্ল্যাটে পেঁৗছে যদি কোনরকমে স্টীমারটা ধরতে পারি, তাই মরিয়া হয়ে দৌড়লাম। কিন্তু আমি ফ্ল্যাটে পেঁৗছতে না পেঁৗছতেই স্টীমারটা সরে যেতে লাগল। লাফিয়ে যে স্টীমারে উঠব তারও উপায় নেই। তখন ফ্ল্যাটের উত্তর সীমায় গিয়ে একটা নৌকোকে কাছে আসতে বললাম। নৌকোটা এগিয়ে আসতেই লাফ দিয়ে উঠলাম তাতে। দু'জন মাঝি ছিল। বললাম, "তাড়াতাড়ি ওপারে চল, অনেক টাকা পুরস্কার দেব।"

এদিকে আমাকে ধরতে না পেরে প্রফুল্ল রায় অন্য উপায় অবলম্বন করেছে। কর্তব্যরত পোর্ট পুলিশকে অবস্থাটা জানিয়ে তার সাহায্য নিয়েছে। নৌকোটা ছাড়বার পরেই আমি তাকিয়ে দেখি প্রফুল্ল রায়ের সঙ্গে পুলিশ প্রহরী ফ্ল্যাটে দাঁড়িয়ে—নৌকোটাকে থামতে আদেশ করছে। পোর্ট পুলিশের আদেশ অমান্য করবার সাহস কোন মাঝিরই নেই। মাঝিরা আর ওপারে যেতে রাজী নয়। বাঁধাঘাটের পুলিশ ফাঁড়িতে ইতিমধ্যে খবর দিয়েছে প্রফুল্ল রায়—কয়েকজন জল-পুলিশ এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। পালাবার আর কোনো উপায় নেই। মাঝিরা নৌকোটি ফ্ল্যাটে ভেড়াবার উপক্রম করছে। নিরুপায় হয়ে আমি অন্য একটি নৌকোয় লাফিয়ে পড়ে মাঝিকে অনেক পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনুরোধ করলাম আমাকে নিয়ে যেতে। কিন্তু পোর্ট পুলিশের নাকের ওপর দিয়ে আমাকে নিয়ে যাবার সাহস কারোর নেই। তৃতীয় নৌকোর মাঝিও অস্বীকার করল। পর পর নৌকোগুলি

খেয়া পার করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে ঘাটে। আমি সেগুলির ওপর দিয়ে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মাঝিদের অনুনয়-বিনয় করতে লাগলাম। কিন্তু পোর্ট পুলিশ তাদের সতর্ক করে দিয়েছে—কেউ আমাকে নিয়ে যাবে না।

আমাকে এই পথে পালাবার চেষ্টা করতে দেখে প্রফুল্ল রায়ও কনেস্টবলদের নিয়ে নৌকোর ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত তারা আমায় ধরে ফেলল। তখন আমি পালাবার জন্য অন্য পথ ধরলাম। প্রফুল্ল রায়কে নৌকোর ছই-এর মধ্যে ডেকে নিয়ে গোপনে বললাম—

"দেখুন, দয়া করে আমাকে গ্রেপ্তার করবেন না। কী লাভ হবে তাতে? ছেড়ে দিন। প্রতিজ্ঞা করছি আপনাকে এক হাজার টাকা দেব।"

—"এটা আমার কর্তব্য! আমি নিরুপায়।"

"কার জন্য কর্তব্য? বৃটিশ-প্রভুর জন্য? এই কর্তব্য আপনি করতে চলেছেন দেশের বিরুদ্ধে। দয়া করে আমায় ছেড়ে দিন, যুক্তি শুনুন। আচ্ছা, দু' হাজার টাকা নিন—তাও নয়? তবে তিন হাজার। আমাকে ছেড়ে দিলে তিন হাজার টাকা পাবেন।"

আমাকে ধরতে পারলে কিন্তু প্রফুল্ল রায়ের পাদোন্নতি হবে। উপরন্তু চারদিকে পুলিশ—এ অবস্থায় তো আর ঘুষ নিয়ে আসামী ছাড়া যায় না। উচ্চাভিলাষী তরুণ সাব-ইন্সপেক্টর আমার কোন যুক্তিই শুনলো না, কঠিন কর্তব্যের নামে বার বার নিজের অক্ষমতা জানালো। তখন শেষ উপায় স্বরূপ ছই-থেকে এক লাফে বেরিয়ে এসে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলাম। নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লে বিপদের সম্ভাবনা, তবুও এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। কিন্তু ছই-এর দু' পাশেই প্রহরী ছিল। আমার উদ্দেশ্য বুঝে প্রফুল্ল চীৎকার করে উঠল—"পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো।" সঙ্গে সঙ্গে একজন কনেস্টবল পথ আটকে দাঁড়াল। এক ঘুষিতে তাকে কাৎ করে ফেলে লাফ দিতে যাব—দু'জন কনেস্টবল দু'পাশ থেকে আমাকে জাপ্টে ধরে ফেলল। অগত্যা হার মানতে হ'ল। এই কনেস্টবলরা প্রত্যেকেই রীতিমত বলবান, বিরাট চেহারার। আমার ঘুষি খেয়ে যে নৌকোর ভেতর গড়াচ্ছিল, সে এবার উঠে এল এবং আর একজন সঙ্গী নিয়ে আমাকে প্রাণপণে মারতে সুরু করল। আমার দু'হাত আটকা, তবু যথাসাধ্য প্রতিরোধ করতে লাগলাম। প্রফুল্ল চেঁচিয়ে উঠল—

"মারো মৎ, মারো মৎ। ইস্‌কো লে চল।"

প্রায় জন ছয়েক পুলিশ কনস্টেবল এসে আমাকে একরকম পাঁজাকোলা করে নিয়ে চলল সেখান থেকে একশ গজ দূরে, বাঁধাঘাট ফাঁড়িতে।

ফাঁড়ির অফিস ঘরে একটি চেয়ার, একটি লম্বা বেঞ্চ আর কয়েকটা টুল ছিল। আমি এসে সোজা গিয়ে চেয়ারে বসলাম। দু'জন কনেস্টবল আমার দু'হাত ধরে চেয়ার ছাড়তে আদেশ দিল। প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তাদের বাধা দিল; বলল আমার গায়ে যেন কেউ হাত না দেয়। সে নিজে সঙ্গের [illegible] নিয়ে আমার চারদিক ঘিরে পাহারা দিতে লাগল। প্রফুল্ল কয়েকটা জায়গায় ফোন করল। কয়েকজন সশস্ত্র কনেস্টবল এল থানা থেকে—প্রফুল্লর সঙ্গে থাকবে তারা আমাকে নিয়ে যাবার সময়। ইতিমধ্যে পুলিশ ফাঁড়ির অফিসারও এসে হাজির। তার চেয়ারে আমি বসে আছি। অন্য কোথাও

থেকে আর একটা চেয়ার তাকে এনে দিল। অফিসারটি চেয়ারে বসে ভাল করে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে প্রশ্ন করল—

—"আপনার নাম কি?"

—"বলব না।"

—"আপনি চট্টগ্রাম থেকে এসেছেন?"

—"উত্তর দেব না।"

—"আপনি অনন্ত সিং?"

—"বলি নি যে আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দেব না?"

অফিসার চুপ করলেন। প্রফুল্লর দিকে তাকালেন তিনি। প্রফুল্ল আমাকে শুনিয়ে আমার নাম, বাবার নাম, ঠিকানা সব বলল তাঁকে। তারপর সশস্ত্র প্রহরীদের অধীনে সে আমাকে নিয়ে চলল।

মাইল তিনেক দূরে একটি থানা। এটাই বোধ হয় ঐ এলাকার প্রধান পুলিশ স্টেশন। অনেক কনেস্টবল, সাব-ইন্সপেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর ছিল এখানে। দেয়াল ঘেঁষে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম আমি। ঘরে আরো অনেক চেয়ার ছিল। কয়েক মিনিট পরে থানা-অফিসার এলেন। বেশ ভারী বলিষ্ঠ লোক। প্রফুল্ল তাঁর কানে কানে কি বলল। অন্য দিকের দেয়াল ঘেঁষে আর একটি চেয়ারে বসেছিলেন অফিসারটি সেখান হতে চেঁচিয়ে বললেন আমাকে সম্বোধন করে—

"আসুন—এদিকে আসুন। আমি ডাকছি—উঠে আসুন।"

আমিও সমানভাবেই উত্তর দিলাম—"প্রয়োজন থাকে আপনি আমার কাছে আসতে পারেন।"

অফিসার চটে গিয়ে গর্জন করে উঠলেন, "আপনার নাম কি?"

—"বলব না।"

অফিসারটি এবার তেড়ে এলেন আমার দিকে, ধমকে বললেন—

"এখানে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে আপনাকে।"

আমিও সমান উঁচু গলায় জবাব দিলাম—"কোনোমতেই দেব না।"

অফিসার নিরাশ হয়ে চুপ করে গেলেন। প্রফুল্ল তোতাপাখীর মত এক নিঃশ্বাসে আমার নাম-ঠিকানা ইত্যাদি সব বলে গেল। থানায় আবার সে সব লেখা হ'ল। তারপর সশস্ত্র পুলিশ প্রাহারায় চললাম কলকাতার এস, বি, অফিসে।

গাড়ি থেকে নেমে এস, বি, অফিসের বারান্দায় সবে পা দিয়েছি এমন সময় মিঃ কীড্ ঘর থেকে লাফ দিয়ে বাইরে এলেন—রাগে তাঁর দু' চোখ জ্বলছে, মাটিতে পা ঠুকে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করলেন। চীৎকার করে বললেন—

"কী নাম তোমার? নাম বলছ না কেন? বলতেই হবে নাম।"

তাঁর এই আস্ফালনে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হয়ে মাথা উঁচু করে আমি জবাব দিলাম—

"আমিও বলছি কিছুতেই আমি তোমাকে আমার নাম বলব না।"

ক্রুদ্ধ পশুর মত আমার চারদিকে লাফাতে লাফাতে কীড্ বলতে লাগলেন—

"কেন? ...কেন? ...কেন? ...কেন তুমি তোমার নাম বলবে না?"

আমিও ছাড়বার পাত্র নই। খাঁচায় আবদ্ধ সিংহের মত গর্জন করে বললাম,—

"যাও, তোমার সাব-ইন্সপেক্টরকে জিজ্ঞাসা কর গে, সে তার ঝুলি ভর্তি মিথ্যা বলে তোমাকে সন্তুষ্ট করবে। তোমার মেজাজকে আমি গ্রাহ্য করি না। মনে রেখো, আমি তোমার কর্মচারী নই,......।"

—"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি দেখছি।...তুমি কথা শুনবে না? ...যে জায়গায় এসেছ সেখানে তোমাকে কথার জবাব দিতেই হবে...।"

নিরুপায় হয়ে রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে চলে গেলেন ডেপুটি কমিশনার মিঃ কীড্‌। এ ছাড়া আর আত্মসম্মান রক্ষার কোন পথ নেই। আমি পড়ে রইলাম একদল উচ্চপদস্থ আই, বি এবং এস, বি অফিসারের মধ্যে। কয়েকজনকে আমি চিনতাম--ব্রজবিহারী বর্মণ, ভূপেন চ্যাটার্জি, বনবিহারী, প্রমুখ। এঁরা হঠাৎ আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় ভাব দেখাতে লাগলেন। ভদ্র, বিনীতভাবে আমাকে ঘরের ভেতর ডাকলেন, ঢোকা মাত্র একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলেন। আমি বসলাম। তাঁরা সব চারপাশে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। তারপর চলল নানারকম কথাবার্তা, মাঝে মাঝে প্রশ্নবান।

ভূপেনবাবু—"প্রফুল্লর কাছ থেকে একটা ফোন পেলাম আমরা। আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।"

আমি এমন ভাব দেখিয়ে চুপ করে রইলাম যেন ওদের কথা শুনবার কোন আগ্রহই নেই।

ব্রজবিহারীবাবু—"আপনি তো চেনেন প্রফুল্লকে। আপনাদের জেলা শহর থেকেই আসছে ও।"

চুপ করেই রইলাম আমি। এবার কথা বললেন বনবিহারী—

"দেখুন ,যদি কিছু মনে না করেন, আমি বলব আপনার এরকম ব্যবহার করাটা ঠিক যুক্তিসঙ্গত হচ্ছে না। আমরা তো আপনার সঙ্গে কোন অভদ্রতা করছি না। সাধারণ ভদ্র ব্যবহার নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে আশা করতে পারি।"

এবার মুখ খুললাম আমি,—

"—আমার বাড়ীতে গেলে নিশ্চয়ই আপনারা ভদ্র ব্যবহার পাবেন। আপনারা আমাকে বন্দী করেছেন। আমার সম্মানহানি করেছেন। অকারণ নির্যাতনের পর একজন নিরপরাধ নাগরিক আপনাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করবে, এরকম আশা করবার পেছনে কোন যুক্তি নেই।"

আর কথাবার্তা বলতে চাইলেন না তাঁরা। আমার খুব কাছে এসে আমার সারা দেহ খুঁজে দেখতে লাগলেন কোথাও গুলীর আঘাতের চিহ্ন আছে কিনা। তারপর আমাকে অনুরোধ করলেন আমার সার্ট এবং কোট খুলতে যাতে গায়ে কোনরকম গুলীর ক্ষতচিহ্ন থাকলে দেখা যায়।
আমি বললাম,—

"ও, আপনারা সন্দেহ করছেন আমাকে? দেখতে চান আমার গায়ে পুলিশের গুলীর চিহ্ন আছে কিনা? বেশ, দেখুন! এবার বুঝতে পারবেন

যে আপনারা ভুল করেছেন। একজন নিরীহ লোককে ধরে এনে অনর্থক যন্ত্রণা দিচ্ছেন।"

আমার সার্ট আর কোট খুলে ফেললাম। অনেক জোড়া চোখ আমার দেহের ওপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি বোলাতে লাগল। [illegible] বললেন, "খুব বলবান লোক তো! গায়ে খুব জোর আছে!"

আর একজন আমার পেশীগুলি হাত দিয়ে দেখতে লাগলেন। ওঁরা ভেবেছিলেন পুলিশের সঙ্গে লড়াইয়ে এতবার গুলী ছোঁড়া হয়েছে—দু'-একটি চিহ্নও কি পাবেন না? কিন্তু দুঃখের বিষয় হতাশ হলেন তাঁরা।

এরপর কয়েকজন সাধারণ পুলিশ কনেস্টবল এল, প্রত্যেকেরই বেশ পালোয়ানের মত চেহারা। তারা এসে আমাকে হাতকড়া লাগিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে একটা গাড়িতে তুলল। আমার আগে এবং পেছনে আর দুটি গাড়িতে সশস্ত্র পুলিশ। নদীর ধারে বাঁধাঘাট স্টেশনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে আমাকে পোর্ট পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ডেপুটি কমিশনারের কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

একটা ঘরে প্রহরীদের মাঝে বসে আছি। এক-একজন করে ইউরোপীয়ান বা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অফিসার উঁকি মেরে দেখে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো প্রশ্ন,—

"নাম বলেছ?" "নাম কি আপনার?" "নাম বলছেন না কেন?" "কী বলছে এ?"...ইত্যাদি।

আমি মাঝে মাঝে কথার জবাব দিচ্ছি, কখনো বা রূক্ষ স্বরে বলছি,—

—"কী চান আপনারা?"

"আমাকে উত্যক্ত করছেন কেন?"

"বলছি আমাকে বিরক্ত করবেন না।"

এখানেও আমি নাম বললাম না। ওরা কি লিখে নিল; কে ওদের নাম-ঠিকানা বলল জানি না। প্রফুল্ল রায় আমার সঙ্গে আর আসে নি।

পোর্ট পুলিশের দপ্তর শেষ হয়ে যাবার পর আবার চললাম কলকাতায় এস, বি, অফিসের পাশেই আই, বি, অফিসে।

এখানে উচ্চপদস্থ আই, বি, এবং এস, বি, অফিসারেরা আবার ভিন্ন পথে তাঁদের আক্রমণ সুরু করলেন।

গাড়ি থেকে নেমে বারান্দায় উঠতেই বাংলার আই, বি,—সি, আই, ডি, বিভাগের স্পেশাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, ভূপেনবাবু নিম্নপদস্থ কয়েকজন কর্ম-চারীকে চীৎকার করে বললেন,—

"যাও, যাও, ঘর ছেড়ে দাও। এক্ষুণি চলে যাও।"

এঁরা সব একটা ঘরে বসেছিলেন। আদেশ পাওয়া মাত্র ভাল ছেলের মত সবাই বেরিয়ে গেলেন। এবার ভূপেনবাবু গলায় মধু ঢেলে বললেন আমাকে—

"আসুন, ঘরে আসুন!"

ঘরে যেতেই একটা ভাল দেখে চেয়ার এগিয়ে দিলেন। তারপর খুব হৃদ্যতার সঙ্গে আমার সাথে নানা কথা বলতে লাগলেন। কথার মাঝে মাঝে গীতা উপনিষদ্ থেকে কয়েকটি জায়গা মুখস্থ বলছিলেন। শ্রীশ্রীরাম-

বুদ্ধ এবং বিবেকানন্দের বাণী বলে অনেক কথা চালালেন। তর্কশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা করলেন। সব কিছুর মূল কথা যদি আমার নামটা আমি নিজ মুখে বলি। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলেন ভদ্রলোক। আমার একগুঁয়েমিতে বিরক্ত হয়ে বাঁকা পথ ছেড়ে এবার সোজা পথ ধরলেন, যাতে আমার মন গলে যায়,—

"দেখুন, আপনার সবকিছু আমরা জানি। আপনার পরিচয় সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আমাদের নেই। তবু আপনার মুখ থেকে আমরা শুনতে চাই। এতে আমরা তৃপ্ত হব—আর কিছু নয়। আপনি বার বার বলছেন যে, আমরা ভুল লোককে ধরেছি। তাহলে আপনি কে? আপনি যদি আপনার প্রকৃত পরিচয় বলেন এবং আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে তা' ঠিক, তাহলে তক্ষুণি আপনাকে ছেড়ে দেব। সে ক্ষেত্রে আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাইব। এইভাবে অসুবিধায় ফেলার জন্য ক্ষতিপূরণ দেব। তবে আপনার প্রকৃত পরিচয় বলতে ক্ষতি কি?"

আমি উত্তর দিলাম—"আমি আপনাদের রূঢ় ব্যবহারে আহত হয়েছি, অপমানিত বোধ করছি। আমার সম্বন্ধে আমি কিছুই বলব না। আগে হোক্ পর হোক্ আপনারা জানতে পারবেন যে ভুল লোককে ধরেছেন। কোনরকম অপরাধের সঙ্গে আমি জড়িত নই। আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব যতদিন না জনসাধারণের চোখে আপনাদের অক্ষমতা ধরা পড়ে। এই পর্যন্ত বলতে পারি যে আমি অনন্ত সিং নই। আমি তাকে দেখি নি, তার কথাও শুনি নি।"

ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকেছেন বৃদ্ধ অফিসার ব্রজবিহারী বর্মণ। ইনি বোধ হয় রেলওয়ে ডাকাতির পর আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভূপেন বাবুকে বলতে লাগলেন,—

—"ওর বাবা গোলাববাবু সত্যিকারের ভদ্রলোক। দু' ভাই-এর চেহারায় শতকরা প্রায় আশি ভাগ মিল—অনন্ত আর নন্দ! দু'জনকে প্রায় একই রকম দেখতে দেখছি, ...নাম বলে নি এখনো? ও, তাহলে গোলাব-বাবুকে একটা তার করে দিই? তখন কি করে নিজের বাবাকে অস্বীকার করবে?...ঠিক আছে, এক কাজ করা যাক্—ওর বন্ধু গণেশকে ডেকে পাঠাই। সে ওর পরিচয় দিতে আপত্তি করবে না...।"

নানাভাবে মিঃ বর্মণ আমার প্রতিরোধ শক্তি ভেঙে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু আমার সেই অনমনীয় মনোভাব—কিছুতেই নাম বলব না। মনে ভাবলাম, আমার বাবা, দাদা, গণেশ কিংবা যে কেউ আমাকে চিনিয়ে দিক না কেন, আমি আমার জেদ ছাড়ব না। বাবাও যদি আমাকে ছেলে বলে পরিচয় দেন, তখনো আমি বলব, "আমি নিজের পরিচয় দেব না। আমি অনন্ত সিং নই এই পর্যন্ত বলতে পারি।"

বাবা যে আমার গ্রেপ্তারের কথা শুনে আমাকে চিনিয়ে দিতে আসবেন, এ ভয় আমার নেই। আদালতে মামলা উঠলেও বাবা আমাকে রক্ষা করতে আসবেন না—এই আমার ধারণা। বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে আসবার পর হতে বাবা প্রতিজ্ঞা করেছেন আমার মুখ আর দেখবেন না। কাজেই বিচারের সময় আমার পক্ষ সমর্থন করবার ব্যবস্থা হবে না এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং ঠিক

করলাম বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলেই যদি আমাকে আদালতে অনন্ত সিং বলে সনাক্ত করে, আমার বিরুদ্ধে হাজারটা প্রমাণও যদি উপস্থিত হয়, তবুও আমি নাটকীয়ভাবে আমার ভূমিকা বজায় রাখব। বলব—

"সবাই তোমরা ভুল করছ। আমি অনন্ত সিং নই। প্রকৃত অনন্ত সিং একদিন না একদিন আত্মপ্রকাশ করবেই। তখন তোমরা তোমাদের ভুল বুঝতে পারবে। এখন আমি আমার পরিচয় দেব না। যতদিন পর্যন্ত অনন্ত সিং না আসে ততদিন আমি অপেক্ষা করব।"

এটা সত্যই আত্মরক্ষার কোন উপায় কিনা তা' আমার জানা ছিল না। তবু ভাবলাম, আমি যদি এইভাবে ক্রমাগত অস্বীকার করে যাই তবে যারা আমাকে চেনে না তাদের মনে একটা সন্দেহ থেকেই যাবে—'যদি এ অনন্ত সিং না হয়!'

ভূপেনবাবু আর ব্রজবিহারীবাবু হার মেনে চলে গেলেন। হঠাৎ নাটকীয় ভাবে বনবিহারীবাবুর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ—

"হ্যালো অনন্ত! তুমি কি ভীতু, এ্যাঁ? একটা ভেড়ার বাচ্চার মত ভয় পেয়ে গেছ? ভাব দেখি একবার ভূপেন দত্তর কথা—দানবের মত শক্তি—দুটো মুসার পিস্তল হাতে নিয়ে ট্রাম লাইনের ওপর দু' ঘন্টারও বেশী মল্ল-যুদ্ধ করে তবে সে ধরা পড়ে। অনন্ত, এ'র সঙ্গে তুলনায় তুমি তো দেখছি নিতান্ত শিশু! কী লজ্জার কথা! এত ভীরু, এত কাপুরুষ তুমি!"

—"দেখুন মশায়! আপনি আমাকে অনন্ত সিং ভেবে বার বার ভুল করছেন। বিপথে চলেছেন আপনারা, ভগবান আপনাদের সুবুদ্ধি দিন।"

প্রথম থেকেই ভাবছিলাম ওরা আমার সঙ্গে ভাল কথায় না পেরে যন্ত্রণা দিয়ে কথা আদায় করবার চেষ্টা করবে। যন্ত্রণার বিভীষিকাকে যে আমি গ্রাহ্য করি না, তাদের দেওয়া কোনরকম অত্যাচারেই যে কোন ফল হবে না তা' ভাল করে বোঝাবার জন্য আগে থেকেই আমি বললাম—

"দেখুন মশায়রা! আপনাদের ঠাট্টাবিদ্রূপে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পুলিশেরা তো আর তামাসা করবার লোক নয়, তাদের কাজ দায়িত্বপূর্ণ। এখন দয়া করে সময় নষ্ট না করে আপনাদের যন্ত্রণা দেবার পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করুন।"

আমার কথা শুনে তাঁরা একবার ভ্রূকুটি কুটিল দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর বললেন,—

"অনেক আগেই মারের ব্যবস্থা করা হোত।" ওঁদের মধ্যে আবার একজন বললেন, "কিন্তু সব রুগীর জন্যই এক ওষুধ ব্যবহার করি না। যেমন রুগীর যেমন ব্যারাম, তার তেমন ওষুধ, বুঝলে হে!"

বনবিহারীবাবু সারাক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। এবার বিদ্রূপ করে বললেন—

"দেখছি, আপনার আর গোপীনাথের মত কয়েকজন আমাদের দেশ স্বাধীন করে দিতে পারে! বাঃ, বেশ, বেশ! কিন্তু মশাই, গোপীনাথ তো আপনার মত ব্যবহার করে নি! সে বন্দী হবার পরেই নিজের নাম বলে-ছিল। আপনি কি নাম চান না? যশ চান না? খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে নিজের নাম দেখতে আগ্রহ হয় না?"

আমি উত্তর দিলাম—

—"আমি আপনার জন্য বিশেষ দুঃখিত। আপনার অদ্ভুত বুদ্ধি! ভগবান দয়া করে আপনাকে আর একটু সুবুদ্ধি দিয়ে ঠিক পথে চালান! আপনারা গোপীনাথের সঙ্গে এই অধমের তুলনা করে গোড়াতেই ভুল করেছেন।"

এইভাবে আই, বি, অফিসে ক্রমাগত একই নাটকের দৃশ্য বারবার অভিনীত হতে লাগল, তবে আঙ্গিক বিভিন্ন। নানা রীতিতে, ভাল ভাল কথা বলে নতুন ভঙ্গীতে অগ্রসর হয়ে—কখনো আবেগপূর্ণ কখনো তেজপূর্ণ ব্যবহারে সকলে মিলে চেষ্টা করতে লাগলেন আমার নিজের মুখে নিজের নাম শুনতে। সকাল এগারোটা থেকে সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত এই একঘেয়েমি চলল। আমিও শেষ পর্যন্ত আমার জেদ বজায় রাখলাম—

"আমি অনন্ত সিং নই। আপনারা একজন নিরপরাধ লোককে নির্যাতন করছেন। একদিন আপনারা প্রকৃত অনন্ত সিংকে খুঁজে পাবেন।"

সন্ধ্যা ছ'টার সময় লালবাজার লক্-আপে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হ'ল আমাকে। সেখানে এল চার্লস টেগার্ট। আমার কাছে এসে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল আমাকে। আগে থেকেই শুনেছে যে কোনমতেই কারো কাছে আমি নাম বলি নি; তাই তার "টেগার্টীয় সম্মান" রক্ষার জন্য আমাকে আর নাম জিজ্ঞাসা করল না।

লক্‌আপের দরজায় ইউরোপীয়ান সার্জেন্ট আবার নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করল। কারণ তাদের খাতায় লিখে রাখতে হবে। আমি নাম বললাম না। আমাকে শুনিয়ে সঙ্গী অফিসারটি আমার নাম-ঠিকানা দিল। আমি এমন ভাব দেখালাম যেন ওর বক্তব্য-বিষয়ের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

দোতলায় একটা বড় ঘরে আমাকে থাকতে দেওয়া হ'ল। একজোড়া কম্বলও দিল শোবার জন্য। একজন প্রহরী রইল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। কর্তব্যরত সার্জেন্টটি আমার কাছে এসে বললেন—"ডিনার, ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চ-এ কি কি খেতে চান অর্ডার দিন।"

আমি তো অবাক। বলে কি এ? কথাটা পরিষ্কার করে নেবার জন্য প্রশ্ন করলাম—"কী বলছেন আপনি? মাংস, ডিম, কাটলেট, সুপ, মাখন, জ্যাম,... যা চাইব সব দেবেন নাকি আপনারা?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনার যা' খুশি খেতে পারেন।"

বেশ ভাল মত একটা ডিনারের অর্ডার দিলাম। ব্রেকফাস্ট আর সকালের চায়ের জন্যও বলে দিলাম। পরে প্রহরীর কাছে শুনলাম এটা ইউরোপীয়ান সেল। এই ঘরে সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন। গোপীনাথও এই ঘরেই ছিল।

এই ঘরে এই কয়েকমাস আগেও গোপী ছিল! আমার সমস্ত দেহে শিহরণ জাগল। গোপী, আমার বিপ্লবীজীবনের সঙ্গী গোপী এই ঘরে ছিল—এখান থেকেই গেছে সে জেলহাজতে, তারপর ফাঁসিমঞ্চে! আমিও অনুসরণ করব তাকে। গোপী—গোপী! চার দেওয়ালের পাশে ঘুরে ঘুরে আমি জোরে জোরে ডাকতে লাগলাম, "গোপী—গোপী!" যেন গোপীর আত্মা রয়ে গেছে এই দেওয়ালের মধ্যে, এই ঘরে রয়েছে তার শেষ নিঃশ্বাসের

ছায়া! মনে মনে বললাম,—"গোপী গোপী! অপেক্ষা কর বন্ধু! আমিও চলেছি তোমার কাছে!"

খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম। এবার প্রহরীকে নানাভাবে দলে টানবার চেষ্টা করতে লাগলাম। দু'হাজার টাকা দেব বলা হ'ল তাকে যদি সে আমাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। সে সব কথা বিস্তারিত লিখছি না এখানে।

দু' রাত কাটল লালবাজার লক্-আপ-এ। তৃতীয় দিন ভোরে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী বেষ্টিত হয়ে চললাম আমি চট্টগ্রামের পথে। শিয়ালদহ থেকে "কলকাতা-চট্টগ্রাম মেলে" উঠলাম। সঙ্গে রইল সশস্ত্র রক্ষী সহ একজন হাবিলদার! আর সাধারণ বেশে কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী।

গোয়লন্দ থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত স্টীমারে যেতে হয় পদ্মার ওপর দিয়ে। চট্টগ্রাম-মেলে ওঠার পর থেকেই আমার একমাত্র চিন্তা হ'ল চব্বিশ ঘণ্টার এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করার সময় পালাবার জন্য আমাকে কোন না কোন সুযোগ নিতেই হবে। রাত প্রায় সাতটা আটটার সময় গোয়ালন্দ থেকে স্টীমারটি চাঁদপুরের কাছাকাছি গিয়ে পোঁছবে। সেই সময়টা বেশ অন্ধকার—চতুর্দিকে ভালো দেখা যায় না। আমি স্থির করলাম সেই সুযোগে স্টীমারের একেবারে পেছন দিকে, নীচের ডেক থেকে নদীতে ঝাঁপ দেবো। স্টীমার চলবে সামনের দিকে—আমি ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমুখ গতিতে স্টীমারটি মুহূর্তে অনেকখানি এগিয়ে যাবে আর পেছন দিকে প্রবাহিত স্টীমারের জল-কাটা তীব্র স্রোত অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে অনেক দূরে ভাসিয়ে নেবে। অন্ধকারে নদীর ঢেউয়ের ওঠা নামার মধ্যে সহজেই পুলিশের দৃষ্টির বাইরে চলে যাব। মরিয়া হয়ে এইরূপ চেষ্টা যদি চাঁদপুরের কাছাকাছি করা যায় তবেই সুবিধে। তীরে উঠে একবার গোপনে আত্মরক্ষার সুযোগ করে নিতে পারলে সময় মত ট্রেনে বা পায়ে হেঁটে চট্টগ্রাম পোঁছতে পারব।

এইরূপ একটা পরিকল্পনাকে হয়ত হাস্যকর মনে হবে—মনে হবে পাগলামি। কিন্তু এইরূপ পাগলামিই আমি জীবনের মহামন্ত্র করে নিয়েছিলাম। জীবন-প্রভাতে যা নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলাম তা' আমার জেল-জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পালন করেছি।

অনেক আগে—আমরা তখন সবেমাত্র বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দিয়েছি—জুলুদা মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে এসে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি জ্যোতিষদার নাম করে একদিন আমাদের বলেছিলেন যে বিপ্লবীরা অনেকে জেল থেকে মুক্তি পাবার পর আর সেই পথে থাকে না। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করে তার কারণ হিসেবে জ্যোতিষদা বলেছিলেন, যুবক বিপ্লবীরা নানারকম সক্রিয় বৈপ্লবিক কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকার পর যখন জেলে বন্দী হয়, তখন তারা আর সক্রিয়-ভাবে করণীয় কিছু খুঁজে পায় না। সেই জন্যই জ্যোতিষদার উপদেশ ছিল সেইরূপ স্থিতিশীল অবস্থায়ও আমাদের মানসিক ক্রিয়া সক্রিয় রাখতে হবে। আমরা যেন জেলে আটক থাকাকালীনও সরকারের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকি। এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠার সঙ্গে যদি বৈপ্লবিক অভ্যাস

সামান্য গণ্ডীতেও বজায় রাখা যায়, তবে অন্তরের বিপ্লবী সত্তার মৃত্যু অসম্ভব।

কি মন নিয়ে জ্যোতিষদার উপদেশগুলি জুলুদা আমাদের বলেছিলেন সেটি তিনিই জানেন। একসঙ্গে বসে তাঁর কাছ থেকে এই তত্ত্বমূলক কথা শোনার পর আমার বন্ধুদের কার মনের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা তাঁরাই বলতে পারেন। আমি কিন্তু তখন এই সত্যটিকে জীবনের মূলমন্ত্র করে নিয়েছিলাম। যদি বিপ্লবী মন একবার অবসর গ্রহণ করে তবে ছুটির শেষে সেই অলস মন কর্মক্ষেত্র থেকে চিরতরে বিদায় নেবে।

আজ আমি যে ইতিবৃত্ত লিখতে বসেছি তা' আমার তরুণ জীবনের ঘটনা, সেই জীবনপ্রভাত—১৯২৪ সালের কথা। তখন মন একেবারে তাজা সবুজ! তারপর ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামের যুব-অভ্যুত্থান এবং আমার বন্দীত্ব বরণ। ১৯৪৬ সালে মুক্তি পাওয়ার আগে পর্যন্ত আমার বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের কথা জেল-বন্ধুদের অবিদিত নয়! মাঝে মাঝে ভাবি এ কি করে সম্ভব হ'ল? ছোটবেলায় যা শিখেছিলাম তা কি করে এমন ভাবে মজ্জায় মজ্জায় গেঁথে গিয়েছিল? অনেকের হয়ত হাসি পাবে। তবে লিখতে গিয়ে আজ আমার হাসিও পাচ্ছে না লজ্জাও অনুভব করছি না। কারণ, জেলে বসে Marx, Engles, Lenin মুখস্থ করা সত্ত্বেও সেই সব তথাকথিত জেল-বিপ্লবীদের মধ্যে বেশীর ভাগই আজ আর কোন পাত্তা নেই।

কাজেই প্রশ্ন থেকে যায়। এইসব বিপ্লববাদের গ্রন্থগুলি যে পড়েছে সে কে? সে কি মনে প্রাণে প্রকৃত বিপ্লবী? Lenin-এর কথায় বলতে হয়—যে পড়েছে সে কি 'Bolshevik at heart' না 'menshevik' at heart'? —সে কি শুধু তোতাপাখীর মত মুখস্থই করছে না সেগুলি বাস্তবে কার্যে পরিণত করারও চিন্তা করছে? জ্যোতিষদার বক্তব্যও বোধ হয় এই ছিল যে সারাক্ষণ জেলে বন্দী অবস্থায় বিপ্লবী মনকে তাজা রাখতে হ'লে কেবল চিন্তা ও বই পড়ার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত থাকা দরকার।

এই মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে চাঁদপুর স্টীমার স্টেশনে পোঁছবার কিছু আগে সন্ধ্যার অন্ধকারে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করব স্থির করলাম। প্ল্যান কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে আমি গোয়ালন্দ স্টীমারে এসে বসার পর হাবিলদার সাহেবকে বললাম, "দেখিয়ে জী, মুঝে খানে-ওনেকে লিয়ে কুছ পরওয়া নেহি। মুঝে সিরফ্ দো ওয়াক্ত আস্নানকে লিয়ে মেহরবানি কর্ না। মেরা দোপার আউর সাম কো আস্নানকে বহুৎ আদাৎ হ্যায়। অগর এক ওয়াক্ত ভি আস্নান না হুয়া তব্ তো মেরা শির দুকনে লগ্‌তা। আপসে ইয়েহী মেরা অর্জ হ্যায়—মেহেরবানি কর্‌না জী............।"

খুব বিনয়ের সঙ্গে হাবিলদার সাহেবকে আমার স্নানের অভ্যাস সম্বন্ধে জানালাম এবং বললাম—খাওয়া না হলেও আমার কিছু যায় আসে না কিন্তু দুপুরে ও সন্ধ্যায় দু'বার স্নান না হলেই আমার ভীষণ মাথা ধরে। তাই তিনি যেন অনুগ্রহ করে সেই ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য সারা রাস্তায়

যতদূর সম্ভব তাদের সঙ্গে আমি ভাব জমালাম আর প্রাণপণে অভিনয় করে যেতে লাগলাম যেন আমার পালাবার কোন ইচ্ছাই থাকতে পারে না। সারাক্ষণ কেবল ঘুমিয়েই কাটাচ্ছি। পার্থিব কোন কিছুর সঙ্গেই আমার যেন কোন সম্বন্ধ নেই। নিরীহ নিগৃহীত একজন বন্দী আমি—শত অভিযোগ বুকে নিয়ে অদৃষ্টের কাছেই যেন আমার সব নালিশ জানাচ্ছি!

আমার ওপর সদয় হয়ে হাবিলদার সাহেব অনেক আগেই আমার হাতকড়া খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু কোমরে বাঁধা দড়িটা খোলেননি। দড়ির অন্য দিক্‌টা সব সময়ে একজন না একজন সিপাইর হাতে ধরা ছিল। স্টীমার ছাড়ার কিছুক্ষণ পরে আমার অনুরোধে দু'জন সিপাই আমাকে স্নান করাতে নীচে পেছনের দিকে নিয়ে গেল। আমার উদ্দেশ্য জায়গাটা ভাল করে দেখে নেওয়া তারপর সন্ধ্যার সময় যখন আবার স্নান করতে আসব তখন নির্দিষ্ট স্থানটি থেকে নদীতে ঝাঁপ দেওয়া। আমার প্রাথমিক পরিদর্শন কাজ ভালভাবে সারা হ'ল। যার ওপর থেকে আমি নদীতে লাফিয়ে পড়ব ঠিক করেছি সেটি ঠিক একটি লোহার টুলের মত—যাতে ঘাটে জাহাজ ভেড়াবার সময় দড়ি বাঁধা হয়।

আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসেছি। খাওয়া দাওয়া শেষ হ'ল। সিপাইদের আমি আমার খাবারের বেশীর ভাগটাই দিয়ে দিলাম। যতদূর সম্ভব খুশী রাখবার চেষ্টা করছি। তারপর আবার ঘুমের ভাণ করে পড়ে রইলাম। ঘুম কি আসে? গায়ে যেন জ্বর এসে গেছে! প্রথম প্রথম ষ্টেজে নামবার সময় বা বক্তৃতা দেওয়ার সময়, অথবা কোন অ্যাক্‌শন করবার আগে যেমনটি হয় আমার অবস্থাও সেইরূপ! একটা অজানা ভয়, একটা অনিশ্চয়তা! কখনও ভেবেছি পারব তো? কখনও মনে হচ্ছে ধরে ফেলবে—কখনও চিন্তা হচ্ছে স্রোতের টানে নিমেষে আমাকে কোথায় নিয়ে ফেলবে! কখনও ভাবছি—অন্ধকারে নদীর ঢেউএর আড়ালে থাকা যাবে কি? পুলিশ কি গুলী করবে? আবার সঙ্গে সঙ্গে অনবরত জপ করছি, "no risk, no gain!"

সন্ধ্যা হ'ল—আরও কিছু সময় কাট্‌ল। স্টীমার চাঁদপুরের কাছাকাছি এসে গেছে। আর তো দেরি করা যায় না। হাবিলদারকে আবার অনুরোধ জানালাম আমার স্নানের ব্যবস্থা করতে। "লে যাও" বলে সিপাইদের অর্ডার দিয়ে হাবিলদার কাৎ হয়ে শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। দু'জন সিপাই আমাকে নীচে নিয়ে গেল। আমি স্নানের ভাণ করছি আর মনে ভাবছি এক্ষুণি ঝাঁপ দেব—এমন সময় দু'জন লোক এসে সংলগ্ন দুটি লোহার টুলের ওপর হাওয়া খেতে বস্‌ল। এই টুলের ওপর থেকেই ঝাঁপ দেব বলে আমি স্থির করেছিলাম—টুলের উপর থেকে লাফ দেওয়া না গেলে রেলিং-এ বাধা পাব। সিপাইরা আর দেরী করতে রাজী নয়—তারা আমাকে আবার উপরের ডেকে নিয়ে এল। এই যাত্রা আমার চেষ্টা নিষ্ফল হ'ল—পদ্মানদী আমাকে বুকে নিতে অস্বীকার করলেন।

লাক্‌সাম জংশন থেকে ট্রেন ছাড়বে দশটা এগারোটার সময় এবং তার পর দিন সকালে চট্টগ্রাম পৌঁছবে। চিন্তা করতে লাগলাম এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে পালাবার কি কোন সুযোগ পাওয়া যাবে না!

বন্দুকধারী সিপাই পাঁচজন ও হাবিলদার সাহেব আমাকে নিয়ে চাঁদপুরে চট্টগ্রামগামী ট্রেনে উঠল। থার্ডক্লাস ছোট একটি কম্পার্টমেন্ট, আমরা সাতজন ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সেটি রিজার্ভ হয়ে গেল। লোকজন যেন দেখতে না পায় সেইভাবে সেপাইরা আমায় আড়াল করে আছে—তবু মনে হ'ল কানাঘুষা চলছে। আমাকে দেখবার জন্য ভীড় জমতে সুরু করেছে। আমার রক্ষীবাহিনী জানালাগুলি সব বন্ধ করে দিল—কাওকে কাওকে চেঁচিয়ে বল্‌ল, 'ভাগ্‌, ক্যা দেখতা ?'

ট্রেন ছাড়ল। সিপাইরা যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। আমরা সবাই এক একটি বেঞ্চে শুয়ে পড়লাম। আমার হাতকড়া খোলা হয়নি—কোমরে বাঁধা দড়ির আর একটা মুখ সিপাইর হাতে। সেই সিপাইটি আমার সিট্‌ সংলগ্ন অন্য একটি বেঞ্চে বসে বা শুয়ে রইল। যখন দেখলাম তা'রা পালা করে জেগে পাহারার ব্যবস্থা করছে—তখন খুব বিনীতভাবে হাবিলদারকে অনুরোধ করলাম আমার হাতকড়া খুলে দিতে—আমিও ঘুমোব। একটু ভেবে সে একটি সিপাইকে আমার হাতকড়া খুলে দিতে অর্ডার দিল—আমি তাকে অজস্র ধন্যবাদ জানালাম।

আমি "ঘুমিয়ে" পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার নাক ডাকা সুরু হ'ল। ক'জন সিপাই ও হাবিলদার ঘুমোচ্ছে—একসঙ্গে সবারই নাক ডাকছে, ঠিক যেন নাক ডাকার ড্রিল চলেছে! কিন্তু যে পালা করে জেগে পাহারা দিচ্ছে—সে বেশ সোজা হয়ে বসে আছে। আমি নড়ি না চড়ি না, নাক ডেকে ঘুমোচ্ছি আর ভাবছি কতক্ষণে পাহারারত সিপাইটিও ঘুমোবে। প্রথম সিপাইটি বদলী হ'ল। দ্বিতীয় সিপাইর বদলীর পর তৃতীয়জন পাহারার ভার নিল।

প্রায় ভোর হতে চলেছে। আমার পাহারাদারটি বেশ ঘুমিয়ে পড়েছে। মনে হল এই বুঝি মায়ের ইঙ্গিত—মায়ের আশীর্বাদ! নইলে সীতাকুণ্ডের কাছাকাছি, চট্টগ্রামের পনের ষোল মাইলের মধ্যে এসে সারারাত্রি শেষে সিপাইটি ঘুমিয়ে পড়ে আমার পালাবার সুযোগ করে দিল কেন?

আর সময় নষ্ট করা যায় না। অতি সন্তর্পণে অতি কষ্টে একটু একটু করে কোমরে বাঁধা দড়িটা খুললাম। যাদের কোমরে দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশতঃ পুলিসের দড়ি পড়েছে তারা হয়ত জানেন কোমরের দিকের গিঁট এক বিশেষ পদ্ধতিতে দেওয়া হয়ে থাকে। এই গিঁট খোলা খুব শক্ত। তাই কোমরে বাঁধা দড়ির গিঁটটি খুলতে আমার অনেক সময় লেগে গেল—প্রায় আধঘণ্টারও বেশী। পাহারায় নিযুক্ত সিপাইটিকে একদৃষ্টে লক্ষ্য করছি আর মাঝে মাঝে অন্য সকলের ঘুমন্ত অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করছি—পাছে তারা কেউ জেগে ওঠে।

দড়ির গিঁট খুলে ফেল্‌লাম। খুব আস্তে আস্তে কনুইতে ভর করে উঠে আমার দিকের জানালাটা খুলে দিলাম। বুকটা ধক্‌ধক্‌ করছে—ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে—আরও একটু উঠলাম—আরো একটু—তারপর প্রায় শেষ চেষ্টার মুখে—এক্ষুণি জানালার ফাঁকে পা বাড়াব আর কি! এমন সময় প্রহরী নড়েচড়ে উঠল। আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি। আধা ঘুমের ভাণ করে এক আধটু হাত পা নেড়ে এবং শরীরটা ঘষে ঘষে একটু নীচের দিকে

সরে পূর্বের শোওয়া অবস্থায় ফিরে এলাম। কোমরের দড়ি খোলা যদি তারা দেখতে পায় তবে আর উপায় থাকবে না। ইতিমধ্যে সিপাইরা একে একে ঘুম থেকে উঠতে সুরু করেছে। প্রহরী সোজা বসে আছে—বুঝলাম এই চেষ্টাও ব্যর্থ হ'ল। অভিমান ভরে মায়ের চরণে অভিযোগ জানালাম "মা তোর যদি ইচ্ছা নাই ছিল তবে আমাকে লোভ দেখালি কেন?"

এখন সমস্যা সিপাইরা বোঝবার আগেই কোমরের দড়িতে কোন-মতে গিঁট দিতে হবে। তাই আমার আরও কতক্ষণ ঘুমের ভাণ করা প্রয়োজন হল। সেইভাবেই কোনরকমে গিঁট দেওয়া শেষ করলাম। চব্বিশ ঘন্টার যাত্রা শেষে ভোরবেলা চট্টগ্রাম স্টেশনে এসে পেঁছলাম।

স্টেশন থেকে পুলিশ দিয়ে ঘিরে নিয়ে চলল পুলিশ হেডকোয়ার্টার—কোতয়ালীতে। কোতয়ালীর ভারপ্রাপ্ত অফিসার—বেণী দারোগা বলে জানে সবাই, অসহযোগ আন্দোলন দমনে কৃতিত্ব দেখিয়ে প্রভুর কাছে সুনাম এবং দেশবাসীর কাছে দুর্নাম কিনেছেন। তিনি আর আই. বি. অফিসার মনোরঞ্জনবাবু, একটা ঘরে বসেছিলেন। হাতকড়া ও কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় নিয়ে গেল আমাকে সেখানে। আমাকে বসতে বলে বেণী দারোগা প্রশ্ন করল—"গত ১৪ই ডিসেম্বর আপনি কোথায় ছিলেন?"

—"বলব না।"

আর কোন প্রশ্ন না করে বেণীবাবু বললেন, "চলুন আমরা যাই।" আমাকে সঙ্গে করে সকলে চললেন এস-ডি-ও শ্রীমজুমদারের বাংলোয়। ইউরোপীয়ান স্টাইলে থাকতেন তিনি একটা পাহাড়ের উপরকার বাংলোয়। বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, তিনি এলেন। আমার দিকে একদৃষ্টি তাকিয়ে ইংরেজীতে বললেন, "You Anantalal?" "তুমিই অনন্তলাল?"

সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীতে উত্তর দিলাম—"কে বলেছে আমি অনন্তলাল?"

এস-ডি-ও চলে গেলেন। একটা আদেশপত্র লিখে আমাকে জেলহাজতে পাঠিয়ে দিলেন।

এলাম চট্টগ্রাম জেলে। জেলার এবং ডেপুটি জেলার আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, বললাম না। বেণী দারোগা তাঁদের হাতে কাগজপত্রগুলি দিয়ে যেন কানে কানে কি জানালেন। এবার জেলের ভেতরে ঢুকতে হবে। এক বিহারী সিপাই—গেটের চার্জে-ঢুকবার সময় নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করল। বললাম, "বলব না।" সে আমার ঔদ্ধত্য দেখে চটে গেল, রং চং-এ লুঙির ওপর খাকী সার্ট—মুসলমানের বেশ দেখে সে ভেবেছে গুন্ডা-টুন্ডা হবে। বলে উঠল, "শালা দুকে গা," অর্থাৎ মারবে। ডেপুটি জেলার তাড়াতাড়ি এসে তাকে থামালেন।

পর পর ছ'টি সেল : এক একটি ব্লকে তিনটি করে সেল, মাঝখানে দেওয়াল দেওয়া। প্রতি সেলের সামনে একটি করে অ্যান্টি সেল, অর্থাৎ, চারিদিকে উঁচু দেওয়াল দেওয়া জমি, কিন্তু ছাদ নেই। অ্যান্টি সেলের দরজা কাঠের দু' ইঞ্চি ব্যাসের দুটি ফুটো তার কপাটে। ছয় ফুট চওড়া একটা বারান্দা ছয়টি সেলের সামনে দিয়ে গেছে। বারান্দাটিও উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, দুটি ব্লকের মাঝে পার্টিশান দেওয়া। পার্টিশানেও কাঠের গেট ও তাতে দুটি অনুরূপ ছিদ্র।

আমাকে সেলে বন্ধ করে গেল। অন্যান্য সেলের সবাইকে চীৎকার করে বলতে লাগলাম, "আমি এখানে।" "অন্য সেলে কারা আছেন?" "সূর্য সেন আছেন কি?" "অম্বিকাবাবু আছেন কি?" তারপর কোনো সাড়া না পেয়ে "মাভৈ মাভৈ..." গান করলাম। 'আনন্দমঠ' থেকেও কিছু বল্‌লাম এবং স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজীতে লেখা "Kali, the mother!" কবিতাটি আবৃত্তি করতে লাগলাম। এই কবিতাটি আমার বিশেষ প্রিয়, মাস্টারদাও জানেন তা'। আমার উদ্দেশ্য অন্যান্য সেলে যদি মাস্টারদারা থাকেন তবে বুঝতে পারবেন যে আমি এসেছি এখানে এবং তাঁরাও প্রত্যুত্তর দেবেন। মনে করেছিলাম ওঁরা নিশ্চয়ই আছেন এখানে। কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। কর্তব্যরত প্রহরী বার বার এসে আমাকে বলতে লাগল—

"বাবু, কে'ও চিল্‌হাতে'? চিল্লাহানেকে লিয়ে মনা হ্যায়।"

—"কিসকা মনা! কিসকা হুকুম? হাম্ জরুর গানা গায়েংগে।"

এর মধ্যে শুনলাম জেল গেটে একটা বড় ঘণ্টা বাজল। তখন জানতাম না তার অর্থ, মাত্র এক ঘন্টা হ'ল জেলে এসেছি, পরে জানলাম কোন দর্শক এসেছেন। সেলে বসেই শুনছি কে যেন ড্রিলের আদেশ দেবার মত একবার বলছে, "সরকার সেলাম", তারপর বলছে, "অ্যাজ্‌বর।" বহুদিন পর্যন্ত "অ্যাজ্‌বর" কথাটির অর্থ বুঝি নি। পরে জেনেছি ওটার অর্থ "অ্যাজ বিফোর" —অর্থাৎ, আগের মত হও। প্রতিটি সেলের সামনে আসবার আগে বড় জমাদার আদেশ দিচ্ছে, "সরকার, সেলাম," অমনি প্রহরী সোজা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বুট ঠুকে সেলাম জানাচ্ছে। তারপর পরিদর্শক চলে গেলে "অ্যাজবর"— —অর্থাৎ, আগের মত নিশ্চিন্তে থাক।

তিন মিনিট অন্তর পাঁচবার এই অপূর্ব আদেশবাণী শুনলাম। এবার আমার সেলের সামনে। জেলার, ডেপুটি জেলার এবং কয়েকজন ওয়ার্ডারকে সংগে নিয়ে এস-ডি-ও ঢুকলেন আমার সেলে। আমি বসেছিলাম, উঠে দাঁড়াই নি। এস-ডি-ও প্রশ্ন করলেন ইংরেজীতে ইউরোপীয়ান কায়দায়—

"কোনো অভিযোগ আছে কি?" ইংরেজীতে বললাম, "এইমাত্র তো এসেছি সেলে। এখনো জানতে পারি নি অভিযাগ জানাবার মত কিছু আছে কিনা।"

একটা হাত কোমরে রেখে যেভাবে বসেছিলাম সেভাবেই কথা হচ্ছিল। এস-ডি-ও বেরিয়ে গেলেন দলবল নিয়ে। আমি ছিলাম তৃতীয় সেলে। সেখান থেকে বেরিয়ে ওঁরা গেলেন ষষ্ঠ সেলে। তিন চার মিনিট পরে আবার ফিরে এসে যখন আমার সেলের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন, তখন চেঁচিয়ে ডাকলাম—

"এই যে, এক মিনিট শুনুন!"

এস-ডি-ও এক পা বাড়ালেন অ্যাণ্টি সেলের দিকে। এমন সময় জেলার কঠোর স্বরে চেঁচিয়ে বললেন, "দাঁড়িয়ে উঠে কথা বলুন।" অনুরূপ স্বরে আমি বলে উঠলাম, "কেন? কোন নিয়ম আছে?"

—"হ্যাঁ, জেলের এই নিয়ম!"

—"দুঃখিত। আমি মানতে পারলাম না......"।

আমার কথা শেষ না হতেই রাগে গর্‌গর্ করতে করতে সবাই বেরিয়ে

গেলেন। তারপর আবার আমি আমার কাজে মন দিলাম। পাশের দেওয়ালে টোকা মেরে অনুচ্চ স্বরে বলতে লাগলাম—

"মাস্টারদা, অম্বিকাদা, আপনারা আছেন এখানে? আমি! আমি রয়েছি এখানে।"

অন্য পাশের দেওয়ালে গিয়েও ঠিক একইভাবে প্রশ্ন করলাম, সাড়া মিলল না।

বেলা এগারোটার সময় একটা লোহার টবে করে জল এল। সেলের দরজা খুলে ওয়ার্ডার বলল, "বাবু আস্নান কিজিয়ে।"

—"বহুৎ আচ্ছা" বলে অ্যাণ্টি সেলের দুই দিকের দরজা বন্ধ করতে যাব এমন সময় মাস্টারদা আর অম্বিকাদা এসে হাজির।

কী আনন্দ! আবার আমরা একত্র হয়েছি! সেই নাগারখানা পাহাড়ে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেলেন মাস্টারদা আর অম্বিকাদা—আমি অন্যদের সঙ্গে পালিয়ে গেলাম পুলিশবেষ্টনী ভেদ করে—তারপর দীর্ঘদিনের অদর্শন, কেউ কারো খবর জানি না। এতদিন পর আবার দেখা! যাঁদের চিরদিনের জন্য হারিয়েছি বলে জানতাম, তাঁরা সত্যিই বেঁচে আছেন! প্রথম দর্শনেই বললাম আমি—

"কী বলব আপনাদের মাস্টারদা—নীলকন্ঠ?"

দু'জনেই হাসলেন। বললেন—

"তোর দুষ্টুমি আর গেল না।"

ওয়ার্ডার এখন পাহারা দিচ্ছে বটে, কিন্তু আমাদের নয়; বাইরে থেকে কর্তৃপক্ষের কেউ আসছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখছে।

আমি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছি, মন আর মানছিলনা। অনুরোধ করতে লাগলাম—

"বলুন, বলুন, কী হল তারপর আপনাদের? বিষের প্রতিক্রিয়া কি হ'ল? বন্দুকের গুলী লাগল কেমন করে? আপনাদের নিয়ে ওরা কি করল? বিষের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছেন তো?"

আমার জিজ্ঞাসা আর বাধা মানছে না। মাস্টারদা বললেন—

"ওসব কথা পরে বলব। সময় বেশি নেই; যদি কেউ এসে পড়ে ওয়ার্ডার বেচারা বিপদে পড়বে। এখন শোন্। জেলে এসে এত হৈ-চৈ করছিস্ কেন? ওয়ার্ডার আর জেলের অফিসারদের অসন্তুষ্ট করিস না। ওদের সাথে আমরা সদ্ভাব রেখে চলি। ওরা পুলিশদের থেকে আলাদা। ওদের কাছ থেকে আমরা সাহায্য পাবার আশা রাখি।"

অম্বিকাদা বললেন—"জেলার, ডেপুটি জেলার, চীফ ওয়ার্ডার, ওয়ার্ডার—এদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করবে। আমরা ওদের সঙ্গে ভদ্রভাবে, নম্রভাবে কথা বলি। ওরাও আমাদের খুব সম্মান করে।"

ব্যাস, জেল-জীবনের মূল মন্ত্রটি শেখা হয়ে গেল। এক মুহূর্তে আমি একেবারে ভিন্ন মানুষ হয়ে গেলাম। বিকেল বেলা জেলার এসেছেন ঘুরে ঘুরে দেখতে। আমার অ্যান্টি সেলের মধ্যে যেই ঢুকেছেন, আমি বন্ধ সেলের ভেতর থেকেই একেবারে দুই হাত জোড় করে ভদ্রতায় গলে গেলাম—

"নমস্কার, নমস্কার জেলারবাবু! আসুন জেলারবাবু, আসুন!"

জেলারবাবু তো আকাশ থেকে পড়লেন। এই কি সেই লোক! ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেন মানুষ বদল হয়েছে কিনা। তারপর নিঃসন্দেহ হয়ে আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে জুড়ে দিলেন। খুব হেসে হেসে হৃদ্যতার সঙ্গে গল্প করলাম। এই প্রথম নিজ মুখে স্বীকার করলাম যে আমিই অনন্ত সিং। অস্বীকার করবার আর কোনও পথ ছিল না। কারণ, বেলা একটা নাগাদ আমার বাড়ী থেকে এক টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি খাবার আর আমার জন্য জামা-কাপড়, বিছানা, ইত্যাদি এসে গেল। পিতার কাছ থেকে পুত্র স্বীকৃতি পেয়েছে, আর পরিচয় গোপন করবার প্রয়োজন কি? আমার কথামত প্রকৃত অনন্ত সিং বেরিয়ে এল ঠিক সময়ে।

বিচার সুরু হ'ল। মাস্টারদা আর অম্বিকাদা অনেকদিন আগেই ধরা পড়েছেন। ওঁদের প্রথমে এস-ডি-ও'র কোর্টে প্রাথমিক ব্যবস্থার জন্য নিয়ে গেল, পরে সেসন কোর্টে মামলা স্থানান্তরিত করা হয়। আমাকেও এস-ডি-ও'র কোর্টে হাজির হতে হ'ল। প্রথম দিন এস-ডি-ও যখন কোর্টে প্রবেশ করলেন, উপস্থিত উকিল এবং কর্মচারীরা সকলেই উঠে দাঁড়ালেন—মাত্র একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে এস-ডি-ও'কে সম্মান জানাল না—আমি আসামীর কাঠগড়ায় বসে রইলাম।

আমার উকিল এস-ডি-ও'কে অনুরোধ করলেন তাঁর কাছে আমার বসবার স্থান করে দিতে। এস-ডি-ও রেগে বললেন-

"আমি যখন কোর্টে আসি ও তখন উঠে দাঁড়ায় নি।"

আমার উকিল আমার তরফ থেকে কৈফিয়ৎ দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বিশ্রামের সময় আমার দু'জন আত্মীয় এবং এ্যাড-ভোকেট শ্রীরজনী বিশ্বাস আমার বাবার অনুরোধে আমার কাছে এলেন। তাঁরা বললেন, আমার বাবা আমাকে জানাতে বলেছেন যে, আদালতের নিয়ম-কানুন মেনে চললে তিনি খুশি হবেন। তারপর থেকে আমি যথাসম্ভব আদালতের রীতি মেনে চলবার চেষ্টা করেছি।

এরপর সেসন কোর্টে মামলা এল। তিনটি বিভিন্ন কেস্ তৈরি করা হয়েছিল আমাদের বিরুদ্ধে। প্রথমটি—নাগারখানা পাহাড়ে লড়াই, দ্বিতীয়—সুলুকবাহার হাউসে সশস্ত্র আক্রমণের ষড়যন্ত্র, তৃতীয়টি—একা আমার বিরুদ্ধে—রেলওয়ের অর্থ অপহরণ।

ডিস্ট্রিক্ট জজ্ মিঃ স্টর্কের কোর্টে স্পেশ্যাল জুরীর সাহায্যে আমাদের বিচার চলল। আমাদের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য এগিয়ে এলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, রজনী বিশ্বাস এবং অন্য কয়েকজন জুনিয়র ব্যারিস্টার। এ ছাড়াও চট্টগ্রামের একজন প্রসিদ্ধ এ্যাডভোকেট কামিনী দাস, আমার বাবার বন্ধু—তিনি আমার পক্ষে ছিলেন। ন' মাস ধরে চলল সেই মামলা।

এই কয়েক মাস আমরা চুপ করে জেলে বসেছিলাম না। নানা রকম ব্যবস্থা চলছিল পালাবার জন্য। প্রথম কাজ হ'ল, আমাদের সেলের চাবি তৈরি করা। মাস্টারদা এবং অম্বিকাদার অনুমতি নিয়ে কাজে হাত দিলাম। সাবান দিয়ে চাবির ছাঁচ তুলে পাঠিয়ে দিলাম আমার দাদা নন্দ সিং-এর কাছে। তিনি রেলওয়ে ওয়ার্কশপের একজন মেকানিক্। ঐ ছাঁচ থেকে তিনি চাবি তৈরি করে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করলাম

সেলের ভিতরে থেকে দরজার বাইরের তালা খুলবার। আমি নিজে একজন "ম্যাজিসিয়ান।" সখ করে ম্যাজিক শিখেছিলাম। চট্টগ্রামের প্রধান পাব্লিক হলে টিকিট করে খেলা দেখিয়েছি। আমার ওয়ার্ডারটি আমার ম্যাজিকের খেলা দেখেছে হলে। তার ওপর আবার একদিন কৌশলে তার কাছ থেকে চাবি সরিয়ে ফেলে তাকে অবাক করে দিলাম। আমার যাদুশক্তির ওপর তার অটুট বিশ্বাস জন্মাল। এইভাবে তাকে বশ করলাম।

চাবির ব্যবস্থা হবার পর জেলের ভেতরে আনলাম একটা হাত-বোমা, একটা ম্যাগাজিন সহ পিস্তল ·৩২ বোরের আর ১০০ রাউণ্ড কার্তুজ। তিনজন ওয়ার্ডার—একে অন্যের অগোচরে, আমাদের কাজে সাহায্য করত। তাদের সঙ্গে মিষ্টি কথা বলে তাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছিলাম, ঘুষও কিছু দিতে হয়েছিল। চীফ্ ওয়ার্ডার এবং ডেপুটি চীফ্ ওয়ার্ডারকে অন্য রকম সাহায্যের জন্য ঘুষ দিলাম। আমাদের সেলের ঝাড়ুদার ছিল একজন নাম করা কয়েদী, তাকেও দলে টানলাম। সে ঘাগী লোক, কেমন করে অস্ত্রশস্ত্র এবং বোমা সেলের মধ্যেই লুকিয়ে রাখা যায় তার কৌশল সে আমাকে বলে দিল। সেলের ছাদটা অনেক উঁচু—প্রায় আঠারো ফুট হবে। মই ছাড়া সে ছাদে উঠবার কোন পথ নেই। কয়েদীটি আমাকে এক অপূর্ব কৌশল শিখিয়ে দিল কি করে মই ছাড়াই সেই ছাদ স্পর্শ করে দুটো সেলের মাঝখানে চার ইঞ্চি চওড়া জায়গাতে জিনিস লুকিয়ে রাখা যায়। আমার অস্ত্রগুলি ওখানেই থাকত।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন অসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে আমাদের পক্ষে মামলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এর আগে ১৯২৩ সালে "দ্বিতীয় আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায়" সন্তোষদা সহ সাতজন আসামীর বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযোগ আনে। যতীন্দ্রমোহনের প্রতিরক্ষা শক্তির কাছে সমস্ত অভিযোগের প্রাকার ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সাতজনেই সসম্মানে মুক্তি পেয়েছিলেন। এই অভিনব সাফল্যের পর চট্টগ্রামে আমাদের তিনজনের ক্ষেত্রেও যতীন্দ্রমোহন সেইভাবে মামলা পরিচালনা করতে লাগলেন।

যতীন্দ্রমোহন যখন সাক্ষীদের জেরা করতেন, তখন তা' একটা দেখবার মত ব্যাপার হোত। সাক্ষীদের মনস্তত্ত্ব বুঝে নাটকীয় ভঙ্গীতে তাদের অভিভূত করে এমনভাবে প্রশ্ন করে যেতেন যে, তারা ধরতেই পারত না কি বলছে—কোন পথে চলছে। এইভাবে সাক্ষীদের সাক্ষ্যের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত করে তিনি অভিযোগের দুর্বলতা দেখাবার চেষ্টা করতেন। দু' একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

বিষ খাওয়ার পর অম্বিকাদা আর মাস্টারদা যখন নাগারখানা পাহাড়ে পড়েছিলেন, তখন দু'জন কনেস্টবল দেখতে পেয়ে, তাঁদের দিকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়ে। বন্দুকের ছর্‌রায় তাঁরা আহত হন। কনেস্টবল দু'জন ছুটে গিয়ে আহত অবস্থায় ওখানেই তাঁদের বন্দী করে। এইটিই হ'ল সত্য ঘটনা। কিন্তু মামলায় আত্মরক্ষার জন্য এই সত্যটিকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করতেই হবে। যতীন্দ্রমোহন তাই তাদের জেরা করলেন। তীক্ষ্ণ জেরায় টিকতে না পেরে তারা নিম্নরূপ উত্তর দিয়েছিল—

—"আচ্ছা, কী দেখলে তুমি?"

—"দু'জন লোক চাদরে ঢাকা অবস্থায় শুয়ে আছে।"
—"তোমরা তখন কি করলে? বন্দুক তুলে ধরলে?"
—"হ্যাঁ।"
—লক্ষ্য ঠিক করলে?
—হ্যাঁ।
—"গুলী ছুঁড়লে?"
—"হ্যাঁ।"
—"লোক দুটির গায়ে লাগল গুলী?"
—"হ্যাঁ।"
—"রক্ত বেরিয়ে চাদর ভেসে গেল?"
—"হ্যাঁ।"
—"ওরা পাহাড় থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিল?"
—"হ্যাঁ।"
—"তুমি তখন দৌড়ে গেলে?"
—"হ্যাঁ।"
—"তোমরা তাদের সেই চাদর সমেত জাপটে ধরলে?"
—"হ্যাঁ।"

যতীন্দ্রমোহন এমন ভংগীতে পর পর প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন যে, সাক্ষীদের 'হ্যাঁ' বলা ছাড়া গতি ছিল না। এই পর্যন্ত জেরা করবার পর যতীন্দ্র-মোহন অভিযোগকারী পক্ষকে সেই চাদর আদালতে দেখাতে বললেন। সাক্ষীরা সনাক্ত করল—এই সেই চাদর। কিন্তু সেই চাদরে গুলীর একটি ফুটো অথবা রক্তের চিহ্ন—কিছুই নেই। কনেস্টবল দুজন হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

সিভিল সার্জন সাক্ষ্য দিলেন অম্বিকাদার পিঠে এবং মাস্টারদার মাথায় বন্দুকের ছর্‌রার আঘাতে ক্ষত হয়েছে। প্রশ্ন হল, তিনি কেন ক্ষত-স্থান থেকে ছর্‌রা বার করেন নি? সিভিল সার্জন বললেন যে ছোট ছর্‌রা মাংসপেশীর ভেতরে থাকলেও ক্ষতি হয় না জেনেই তিনি বার করেন নি। পরে আবার জেরাতে বলে ফেললেন যে বাঁশের সরু আগার খোঁচাতেও ওরকম ক্ষত হতে পারে। একজন সাক্ষী বলেছিল, মাস্টারদার সংগে তিনটি কার্তুজ ছিল। কিন্তু সেই তিনটি কার্তুজ আদালতে প্রদর্শন করা সম্ভব হ'ল না।

যে দালালটি সুলুকবাহার হাউসের ঘটনায় সাক্ষ্য দিচ্ছিল, সে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে সকলের কাছে বারবার হাস্যাস্পদ হচ্ছিল। সে বলেছিল, অম্বিকাদা একটি মাটির কলসী হাতে নিয়ে লম্বা কোট পরে, চশমা চোখে পুকুরের দিকে যাচ্ছিলেন জল আনতে। কিন্তু সেই কলসীটি কোর্টে উপস্থিত করতে পারে নি।

যতীন্দ্রমোহন যখন আসামী পক্ষে সওয়াল করতে ওঠেন, তখন সাক্ষীদের পরস্পর কথার অসংগতি এবং মিথ্যা সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেন। সওয়ালের প্রথমেই তিনি উঠে মাননীয় জজসাহেবকে সম্বোধন করে বলেন—

"ইওর অনার, আসামীদের বিরুদ্ধে ১৯ এফ (19F) ধারা প্রযুক্ত হতে পারে না।"

ডিস্ট্রিক্ট জজ মিঃ স্টর্ক আর সরকার পক্ষের ব্যারিস্টার শ্রী জে, কে, ঘোষাল তো একেবারে থ'। এ আবার কি কথা? যতীন্দ্রমোহন ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন আইনের ব্যাখ্যা। ১৯এফ্ ধারা প্রয়োগ করা যায় সেই ক্ষেত্রে, যদি কেউ সরকারের অস্ত্রশস্ত্র চুরি করে এবং নিজের আয়ত্তে রাখে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ ধারায় এ কথাও পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে, এরকম ক্ষেত্রে বৃটিশ ইন্ডিয়ার কোন্ অংশ থেকে সরকারী অস্ত্রশস্ত্র চুরি গেছে এবং কার হেফাজত থেকে গেছে তাও কর্তৃপক্ষকে কাগজে-কলমে জানাতে হবে। অভিযোগে এই প্রাথমিক সর্ত পূরণ করা হয় নি। সুতরাং, আসামীদের বিরুদ্ধে ১৯এফ্ ধারা চলতে পারে না। আইনের ব্যাখ্যা অনুসারে তখনি ঐ ধারা প্রত্যাহার করা হ'ল।

সওয়ালের শেষ অংশে তিনি বললেন—"অম্বিকা এবং সূর্যের ক্ষত থেকে প্যালেট পাওয়া যায় নি; রক্ত মাখা চাদর দেখা যায় নি; সূর্যের সঙ্গে তথাকথিত যে তিনটি কার্তুজ ছিল সেগুলিরও হদিস মেলে নি; অম্বিকা যে কলসীটি বহন করেছিল তাও দেখান হয় নি। এই সব কারণেই সাক্ষ্যের সততা সম্বন্ধে যে অত্যন্ত সন্দেহের সৃষ্টি হয়, এ বিষয়ে ভুল নেই।......এই সাথে আরো মজার বিষয় লক্ষ্য করুন—এই মামলায় পুলিশ বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট থেকে আরম্ভ করে সাধারণ কনেস্টবল পর্যন্ত, প্রত্যেকেই নিজের বাহাদুরি প্রকাশ করতে ব্যস্ত যে সেই এদের বন্দী করেছে।"

পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ শ্যালো বললেন, তিনি অম্বিকা এবং সূর্যকে গ্রেপ্তার করেছেন; ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ব্রাউন তারপর এগিয়ে এসে এ দুই হতভাগ্য আসামীকে বন্দী করবার বাহাদুরি নিলেন; এবারে এলেন ইন্সপেক্টর মিঃ সেয়ার, তিনিই বা এই কৃতিত্বের অংশ ছাড়বেন কেন? তাঁর মতে, তিনিই সূর্য এবং অম্বিকাকে গ্রেপ্তার করেছেন। এখন পালা দু'জন কনেস্টবলের। তারা জোর গলায় বলছে তারাই ওদের দিকে গুলী ছুঁড়েছে এবং ঘটনাস্থলেই ওদের বন্দী করেছে।......আমি শেষবার বলছি, আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির সত্যতা একেবারেই প্রমাণিত হয় নি। সাক্ষ্য এবং বিবরণী সবই সামঞ্জস্যবিহীন—এগুলিকে মিথ্যা বলে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমার মনে হয়, আসামীরা নিজেদের নিরপরাধ বলে প্রমাণ করতে পেরেছেন এবং কোন সংগত কারণেই এ'দের মুক্তি না দেওয়া চলতে পারে না......।"

জুরীরা আলোচনা করতে ঘরে চলে গেলেন। ফিরে আসার পর ফোরম্যান ঘোষণা করলেন, তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে মনে করেন যে অভিযোগগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট "সন্দেহের" কারণ আছে এবং এই "সন্দেহের" সুফলের অধিকারী আসামীরা।" মিঃ স্টর্ক সঙ্গে সঙ্গে দেড় পাতার মত রায় লিখে ফেললেন—

"........যেভাবে বাদীপক্ষ মামলাটি সাজিয়েছেন এবং পরিচালনা করেছেন, তাতে যুক্তিবাদী মনে সন্দেহ জাগবেই। ......আমি জুরীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আসামীদের মুক্তি দিচ্ছি........।" রায়ের শেষের ক'-লাইন এইরূপ ছিল—"In which way the prosecution case is handled and manipulated is bound to raise suspicion in

reasonable mind. So I accept the verdict of the Jury and acquit the accused.

জেলাশাসক মিঃ শ্যাশ্‌বি তাঁর অফিসকক্ষে বসেছিলেন। জেলা-বিচারকের রায় শুনে তিনি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সিগারেট টানছিলেন, খবর শুনে অবাক হয়ে বললেন—

"Oh what ? Acquitted !—Acquitted !—Acquitted ! !"

—ব্যাস্‌ হাত থেকে সিগারেট পড়ে গেল। সরকারী উকিল রায় সতীশচন্দ্র বাহাদুর নিজে উপস্থিত ছিলেন সেখানে—তাঁর কাছ থেকেই আমরা শুনেছি।

একটা মামলায় খালাস পেলেও আরো দুটো মামলা ঝুলছে আমাদের মাথায়। যতীন্দ্রমোহন আমাদের আত্মীয়দের বলেছেন, "সুলুকবাহার হাউস ষড়যন্ত্র মামলা" আমাদের বিরুদ্ধে চলতেই পারে না।

আদালত থেকে জেলে ফিরে এলাম আবার। ভাবলাম আমাদের মুক্তির খবর শুনে জেলকর্মচারীরা সকলেই নিশ্চয় খুশি হবে। কিন্তু কী আশ্চর্য ! জেলার, ডেপুটি জেলার, প্রধান ওয়ার্ডার, কেউ আমাদের সঙ্গে একটি কথাও বললেন না। অথচ এমনিতে ওঁদের সঙ্গে কত গল্প হয় আমাদের ! জেলের আবহাওয়া যেন ভারাক্রান্ত, সর্বত্র একটা থমথমে ভাব। কী ব্যাপার ? হয়েছে কী ? চীফ্‌ ওয়ার্ডার যখন জেল-গেট থেকে আমাদের সেলে নিয়ে যাচ্ছে, তখন তাকে গোপনে প্রশ্ন করলাম, "কী ব্যাপার ?"

খুব নিচু গলায় ফিস ফিস করে বলল সে—"অপ্‌সর্‌ লোগোকা পতা মিলা জেল কা অন্দর বহুৎসে গোলিগাট্‌ঠা আগয়া। বাহারকা খুপিয়া পুলিশ ঔর পুলিশ সাহব খুদ জেল মে আ গয়া। হামলোগকা সাহব ভি সাথ থে'। সমুচা জেল সার্চ হুয়া। কৈদী লোগোঁকাভি ঝাড়া হুয়া। 'বাঙ্গি' সাবকা গুম্‌তি ভি পুরা দেখা গয়া। বাবু বহুৎ পরেশন মে' হ্যায়। অ্যায়সে বাৎ আগর কুছ হো জায় তো সাব্‌কা নোক্‌রি জায়গা......"।

আমি শুনে তখনি বললাম—এ সব বাজে কথা। আই-বি পুলিশই সব গোলমালের মূল। সেলে ফিরে এলাম। আজকের পাহারায় নিযুক্ত ওয়ার্ডারটি আমাদের দলের। সে সব কথা খুলে বলল। জেলের ভেতরে যে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র আসছে তা' জানাজানি হয়ে গেছে। কি করে প্রকাশ পেল এ কথা ? নিশ্চয়ই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কে হতে পারে ? আমার তখন বয়স অল্প, অভিজ্ঞতা একেবারেই নেই; আমি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম ঐ তিনজন ওয়ার্ডারের মধ্যে কে বিশ্বাসঘাতক হতে পারে ?

একটা মামলায় তো ছাড়া পেলাম। এবার বাকীগুলির কি হবে ? আমাদের তিনজনের নামে ষড়যন্ত্র মামলা, আর আমার একার বিরুদ্ধে রেলওয়ে ডাকাতির মামলা।

পুলিশ তারিখের পর তারিখ নিতে লাগল। মামলা আর সুরু হয় না। ইতিমধ্যে সন্তোষদা এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা অভিযুক্ত হয়েছিলেন সকলেই মুক্তি পেলেন। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সন্তোষদাকে ৩নং রেগু-লেশন অনুসারে রাজবন্দী করে রাখল। তখন আমরা ঠিক করলাম এইসব অস্ত্রশস্ত্র, হাতবোমা বাইরে পাঠিয়ে দেব। কারণ, আমাদেরও মনে হয়েছিল যে এইবারে আমাদের ছেড়ে দেবে।

সেলে বসে বসে ভাবতে লাগলাম কোন্ সিপাইটিকে বিশ্বাস করা যায়? জেল সার্চ করা সুরু হয়েছে, এখন মালপত্রগুলি সরাই কি করে? যে সিপাইটির ওপর বেশি সন্দেহ হচ্ছিল—সেই সেদিন ডিউটিতে আছে। মুসলমান সিপাই, ওর কাছ থেকে চাবি নিয়েই আমি সাবান দিয়ে ছাঁচ তৈরি করেছিলাম। তারপর অনেকদিন সে অন্য ওয়ার্ডে ছিল, সম্প্রতি এসেছে। মাস্টারদা আর অম্বিকাদার সাথে পরামর্শ করলাম—তাঁরাও বারণ করলেন, বললেন—যখন সন্দেহ হচ্ছে তখন ওকে দিয়ে কাজ নেই।

দুপুরে খাওয়ার পর শুয়ে ভাবছি কি করি? হঠাৎ একটা পথ খুঁজে পেলাম। মা-ই তো আছেন আমার সহায়। আমার সব কিছুই তো তাঁর ইঙ্গিতে হচ্ছে, এই উভয় সঙ্কটে তিনিই আমাকে পথ বলে দেবেন। একটা কাগজে '×' চিহ্ন দিয়ে লটারী করব ঠিক করলাম। মা কালীর কাছে মনে মনে প্রার্থনা করে বললাম—"মা, তুমি জান আমার মনের কথা। তোমার নাম নিয়ে লটারী করছি—যদি কাগজটির '×' চিহ্ন উপরের দিকে মুখ করে মাটিতে পড়ে তবে এই মুসলমান সিপাইকেই পিস্তল-বোমা-কার্তুজ সব দিয়ে দেব নিরাপদে বাইরে পাঠাতে। আর তার ফলে যদি বিপদ হয় তাহলে বুঝব সে-ও তোমার ইচ্ছা।"

মায়ের নাম স্মরণ করে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম। '×' চিহ্ন কাগজটি পড়ল আমার দিকে তাকিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই কোন চিন্তা না করে, সিপাইটিকে ডেকে সব বুঝিয়ে দিলাম। সে রাজী হ'ল, আর তক্ষুণি অস্ত্রশস্ত্র সব তার পোষাকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিলাম। ডিউটির শেষে সে চলে গেল। যাওয়ার আগেই মাস্টারদার কাছে ব্যাপারটা বললাম। বিকেল বেলা, রাত্রের খাওয়ার কিছু আগে, সেল থেকে আমাদের বার করত হাত-মুখ ধোওয়া ও একটু বেড়াবার জন্যে। সেই সময় মাস্টারদার সঙ্গে দেখা হতেই জানালাম যে, ঐ সিপাইকেই সব অস্ত্র দিয়ে দিয়েছি বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মাস্টারদা চটে আগুন, "কেন ওকে দিলি? তোর মনে সন্দেহ রয়েছে, তবু ওকে দিলি কেন? এখন কি বিপদেই না পড়তে হবে!"

আমার মুখে বিন্দুমাত্র চিন্তার রেশ ছিল না। মাস্টারদার বকুনী খেয়েও কোন পরিবর্তন হ'ল না। মুখে এক গাল হাসি নিয়ে তখন আমি ভাগ্য পরীক্ষার কাহিনী বললাম। শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন মাস্টারদা। বললেন, "তোর এই লটারী করার ঝোঁকই একদিন তোর বিপদ ঘটাবে। তুই জীবন-মরণ নিয়ে লটারী করিস?"

মা কালীর প্রতি মাস্টারদারও ভক্তি এবং বিশ্বাস ছিল, কিন্তু সেটা আমার মত অন্ধ-ভক্তি নয়। মাস্টারদার মন যুক্তিবাদী, প্রতিটি কাজ তিনি হিসেব করে, চিন্তা করে করেন—হৃদয়াবেগে ভেসে যেতে তাঁকে কেও কোনদিন দেখে নি'। তিনি শুধু জানতেন দেশকে স্বাধীন করতে হবে, দেশের শত্রু নিপাত করতে হবে—তার জন্য স্থির বুদ্ধির প্রয়োজন—প্রয়োজন বাস্তব অবস্থানুযায়ী নির্ভুল সুচিন্তিত পথনির্দেশ।

এইভাবে গোপনে বাইরে প্রেমানন্দর কাছে সব অস্ত্র পাঠিয়ে দিলাম। প্রেমানন্দ দিল আমার দাদাকে, দাদা নিরাপদ জায়গায় রেখে দেবার ব্যবস্থা

করলেন। জেলের ভিতর অস্ত্র আনবার সময়েও এই ব্যবস্থাই ছিল—দাদা দিতেন প্রেমানন্দকে, প্রেমানন্দ দিত ওয়ার্ডারকে।

জেলে আর অস্ত্র রইল না। মাস্টারদা আর অম্বিকাদা শীঘ্রই মুক্তি পাবেন মনে হচ্ছে। কারণ, পুলিশ ঐ মামলার জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করতে পারছে না। আমাকে অন্য মামলাটির জন্য থাকতে হবে। রেলওয়ে ডাকাতির মামলা পুলিশ কিছুতেই প্রত্যাহার করবে না। এই সব তথ্য আমাদের উকিলের কাছ থেকে জানা গেল।

ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম শহরে আরো একটি ঘটনায় চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। সাব্-ইনস্পেক্টর প্রফুল্ল রায়, যে আমাকে বন্দী করেছিল, সে নিহত হ'ল। প্রেমানন্দকে তার আততায়ী বলে গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে এল। তাকেও একটা সেলে রাখল। আমাদের পরস্পরের মধ্যে কথা বলা বা সংযোগ রাখা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সে নিষেধ আমরা মানতাম না। উপায়ান্তর না দেখে, প্রেমানন্দ জেলে আসবার দ্বিতীয় দিনে, জেলকর্তৃপক্ষ হঠাৎ আমাদের তিন-জনকে অন্যত্র সরিয়ে দিলেন। জেলের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে প্রধান প্রাচীরে ঘেরা কম্পাউন্ড সহ 'সেগ্রিগেশন ওয়ার্ড' নামে একটি ওয়ার্ডে তিনজন একত্রে রইলাম। প্রেমানন্দকে আগেকার সেলেই রাখা হ'ল।

আমরা একটি আলাদা রান্নাঘরও এই ওয়ার্ডের মধ্যেই পেয়েছিলাম। আমাদের নির্দেশ মত সাধারণ কয়েদীরা রান্না করে দিত। তখন পর্যন্ত জেলে বন্দীদের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ প্রথার প্রচলন হয় নি। সেটা হয় ছ' বছর পরে ১৯৩০ সালে—অনশনে যতীন দাসের মৃত্যুর ফলে। জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের আদেশক্রমে কেবলমাত্র আমাদের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছিল ছয় বছর পূর্বেও।

সেল থেকে হঠাৎ স্থানান্তরিত করায় চলে আসবার মুহূর্তে প্রেমানন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার ব্যবস্থা করে আসতে পারি নি। নতুন ওয়ার্ডে এসে আমরা প্রেমানন্দকে চিঠি লেখবার জন্য আমাদের ব্যবহৃত সাংকেতিক অক্ষর, "সাইফার", জানিয়ে দিলাম।

জেলের এক ঘাগী কয়েদী মেথরের কাজ করত। কোথায় আমি গোপনে অস্ত্রগুলি রাখতে পারি সেই আমাকে শিখিয়েছিল। তাকে আমি বিশ্বাস করতাম। "সাইফার" গুলি ছোট্ট এক টুকরো কাগজে লিখে এই কয়েদীর মারফৎ প্রেমানন্দের কাছে পাঠালাম। যারা মেথরের কাজ করত তাদের সংখ্যা কম হওয়ার দরুন তাদের দিয়ে জেলের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও সেলের কাজও করান হোত। জেলের ওয়ার্ডার নিজে তাদের সঙ্গে করে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যেত—যেন তারা কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বা বিড়ি তামাক যোগাড় করতে না পারে। আমার বন্ধু এই মেথরটি অত্যন্ত ধূর্ত। সে আমাদের কাছে জেল ওয়ার্ডারের পাহারায় আসত বটে, কিন্তু তার পক্ষে ওয়ার্ডারের চোখে ধুলো দিয়ে চিঠি পত্র আনা-নেওয়া একটুও শক্ত ছিল না। এরই মাধ্যমে সাইফারে লেখা চিঠির মারফৎ পরস্পরের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন রইল।

আমাদের এই নতুন ওয়ার্ডটি প্রধান দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো ছিল বলেই পালাবার পক্ষে খুব সুবিধের। মাস্টারদা ও অম্বিকাদা ইতিমধ্যে মুক্তি পাবেন আশা ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কেবলই সময় নিচ্ছে। মামলাও সুরু করে না,

ছাড়া পাবার কোন লক্ষণও দেখি না। সুতরাং আবার পালাবার ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করলাম। একটা বাঁশ যোগাড় করে আটটা নতুন ধুতি এনে দড়ি বানিয়ে ফেলা হ'ল। এছাড়া চাই একটা বাঁকানো লোহা, যেটা জেলের প্রাচীরের ওপর বসান যাবে। এই বাঁকানো লোহার নিচের দিকে একটা দড়ি বাঁধার হুক থাকা চাই। এইরূপ ডিজাইনের বাঁকান লোহার ব্যবস্থা গণেশ, আমার দাদা ও রঞ্জিৎ বাইরে থেকে করল। দেওয়াল টপকাবার এইসব বাঁশ, দড়ি, ও বাঁকান লোহার ব্যবস্থা হ'ল বটে, কিন্তু অন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না—সব যে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ছাড়া পাবার আশায়! এখন পালাবার সময় প্রয়োজন হবে মনে করে আবার একটা পিস্তল ও একশটা কার্তুজ আনালাম জেলের মধ্যে। এটা এল প্রধান দেওয়ালের নর্দমার সরু ফাঁকটি দিয়ে—নির্দিষ্ট সময়ে একটি সিপাই দিয়ে গেল।

সব আয়োজন সম্পূর্ণ। এখন শুধু একটি কাজ বাকি—আমাদের ওয়ার্ডের পূর্বদিকের দেওয়ালে হুক সমেত বাঁকান লোহাটি বাইরে থেকে ছুঁড়ে দেওয়া।

ইতিমধ্যে জেলের অভ্যন্তরে আর একটি নাটকের অভিনয় চলেছে। প্রেমানন্দ চিঠি লেখবার সংকেত শিখে আমাকে একটা চিঠি লিখল -

"প্রিয় ভাই,

আমাকে 'পটাসিয়াম সায়ানাইড' পাঠিয়ে দিতে পার? আমি আত্মহত্যা করতে চাই। আমি আর এ প্রাণ রাখতে চাই না, কারণ, তুমি আমাকে সন্দেহ কর। দয়া করে বিষ পাঠিয়ে দিও।"

এ আবার কী আশ্চর্য কাণ্ড! আমি কখন ওকে সন্দেহ করলাম? আর সন্দেহ করবই বা কিসের জন্য? প্রফুল্ল রায় মৃত্যুর পূর্বে শেষ জবানবন্দীতে বলে গেছে যে, প্রেমানন্দই তাকে খুন করেছে। প্রেমানন্দ আজ সেলে বসে ফাঁসির প্রতীক্ষা করছে। আমার বন্ধু এই প্রেমানন্দের প্রতি আমার মনে ভালবাসা আর সহানুভূতি ছাড়া কোন বিরূপ ভাব নেই। তবে কেন ও এ কথা লিখল? মনে মনে ভীষণ আহত হলাম। সেদিন অল্প বয়সে পৃথিবীর সৌন্দর্যের দিকটাই চোখে পড়ত। সন্দেহ, অবিশ্বাস, আমার অজ্ঞানতার বর্ম ভেদ করে অন্তরে প্রবেশ করতে পারে নি।

মাস্টারদাকে দেখালাম চিঠিটা। বার বার ভাল করে পড়ে অতি সংক্ষেপে তিনি একটা মন্তব্য করলেন—"কী আশ্চর্য!" মাস্টারদা চিঠিটার কি অর্থ করে কথাটা বললেন বুঝলাম না। প্রশ্নও করি নি তখন।

আমি প্রেমানন্দকে লিখলাম—

"দাদা,

আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছি। কোথা থেকে তোমার এ ধারণা হ'ল যে আমি তোমাকে সন্দেহ করি? দয়া করে এ কথাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেল।......ঢাকা পরিভ্রমণ সেরে গভর্নর লর্ড লিটন চট্টগ্রামে আসবেন। তিনি দার্জিলিং জেলে সন্তোষদার সঙ্গে দেখা করেছেন। হয়ত তিনি এখানে এসে আমাদের সঙ্গেও দেখা করতে পারেন। বাংলার নারীদের সম্বন্ধে অশোভন মন্তব্য করে লর্ড লিটন বর্তমানে লোকচক্ষে অত্যন্ত হেয় হয়েছেন। সমস্ত জাতীয়তাবাদী কাগজগুলি তাঁর মন্তব্যের তীক্ষ্ম সমালোচনা করেছে।

কাজেই এই সময় তাঁকে হত্যা করলে জনগণের ইচ্ছাই পূরণ হবে। আমি জেলের ভিতর একটা পিস্তল এনেছি। যদি তুমি চাও, সেটা পাঠাতে পারি। কিন্তু দোহাই তোমার, দয়া করে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করতে চেও না।.........তোমার ভাই।"

মাস্টারদা আর অম্বিকাদা চিঠিটা পড়ে খুশি হলেন। চিঠিটা পাঠান হ'ল, জবাবও এল—

"......অনন্তলাল, তুমি দেখছি খুব বেশি চালাক হয়ে গেছ। তোমার চিঠির ভিতরকার অর্থ আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য চিঠিটা পাঠিয়েছ। তুমি দেখতে চাও আমাকে এই চিঠি পাঠানর পর কর্তৃপক্ষের ওপর তার কি প্রতিক্রিয়া হয়, তারা জেলে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালায় কিনা। মনে কর না আমি বোকা। আমি জানি জেলের ভিতর এখন তোমার কাছে কোন পিস্তল নেই। বেশি চালাক হয়ো না অনন্তলাল!...।"

হ'ল কি প্রেমানন্দের? আমাকে এইভাবে চিঠি লেখার অর্থ কি? আমার মন যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠল। কেন ও আমাকে এমন অবিশ্বাস করছে? যদি উপায় থাকত এখনি ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলতাম তাকে আমি এক বিন্দুও অবিশ্বাস করি নি। ও কথা কখন মনেও আসে নি আমার।

চিঠিখানা পড়ে মাস্টারদা কিন্তু ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর মুখে গভীর চিন্তার ভাব ফুটে উঠল। নিজের মনেই প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন—

"কেন ও এরকম ভাবছে? আমরা একটা পিস্তল এনে রেখেছি এ কথা ওকে লিখলে জেলকর্তৃপক্ষ জেল তল্লাস করে কিনা এটা পরীক্ষা করবার জন্যই ওকে চিঠি লিখেছি আমরা, এ কথা কেন ওর মনে আসছে?......প্রফুল্ল কেন দিনের পর দিন প্রেমানন্দের সংগে দেখা করত? অতক্ষণ ধরে ওরা কি আলোচনা করত? একজন আই-বি অফিসারের কি লাভ হোত অতক্ষণ সময় নষ্ট করে?"

মাস্টারদার চিন্তাধারার সংগে আমার যোগ ছিল না। এ সব প্রশ্ন করে মাস্টারদা তার কোন্ সমাধান পেতে চাইছেন তা জিজ্ঞাসা করবার কথাও তখন মনে হয় নি। আমি শুধু ভাবছিলাম কি করে ওর মন থেকে আমার সম্বন্ধে এই বিশ্রী ধারণা দূর করব! এর পরের চিঠিগুলিতে আমি বার বার শুধু এ কথাই ওকে বোঝাতে চাইলাম যে, আমার সম্বন্ধে ওর ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

রান্নাঘরে আমরা আমাদের পিস্তলটি লুকিয়ে রাখতাম, রোজ সন্ধ্যে-বেলা 'লক-আপ'-এর সময় ঘরে নিয়ে আসতাম। জেলের নিয়ম 'লক-আপ'-এর আগে প্রত্যেককে সার্চ করা হবে। কিন্তু সে নিয়ম সব সময় পালন করা হোত না। তবু সাবধানতার জন্য ঘরে আসবার সময় আমাদের কাউকে না দিয়ে পিস্তলটি মাস্টারদাই নিজের পোষাকের মধ্যে রাখতেন। কারণ মাস্টারদার গাম্ভীর্য ও ধীর শান্ত ব্যবহারে জেলের কর্মচারীরা সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত।

সেদিন কুমিল্লা জেল থেকে বদলি হয়ে এসেছে নতুন সিনিয়র ওয়ার্ডার। 'লক-আপ'-এর সময় হেড জমাদারকে উপস্থিত থাকতে হবেই। নতুন

সেপাইটি হেড জমাদারকে কাজ দেখাবার জন্য 'লক-আপ'-এর আগে নিয়ম অনুযায়ী আমাদের সার্চ করতে এল। হেড জমাদারকেও আমরা টাকা পয়সা দিয়ে বশ করেছিলাম। টুকিটাকি জিনিষ সেও জেলের মধ্যে এনে দিত। কিন্তু পিস্তলের কথা সে জানত না। অতএব অধস্তন কর্মচারীর কর্তব্য প্রিয়তায় সে কোন দোষ দেখল না। এদিকে আমাদের তো বুক শুকিয়ে গেছে। মাস্টারদার কোমরে গোঁজা কাপড়ের মধ্যে লুকান আছে পিস্তলটি। আমাকে প্রথমে সার্চ করে তারপর অম্বিকাদাকে করল। এবার যাচ্ছে মাস্টারদার দিকে। সর্বনাশ! তিনজনেরই মুখ কাগজের মত সাদা! হঠাৎ কি মনে হ'ল, কে আমাকে বুদ্ধি দিল জানি না, দুই হাতে ওয়ার্ডারটিকে জড়িয়ে ধরে আবদারের ভঙ্গীতে বললাম—

"আরে সিপাইজী, ক্যা করতে হ্যায়? মাস্টারজী হামলোগ সবকা বড়া। উনকো সবকোই পূজা করতে। চলিয়ে চলিয়ে, হো গয়া—মাস্টার সাবকা কভী ঝাড়া হোতা নহী......।"

এক নিঃশ্বাসে এই সব বলে তাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই, "চলুন চলুন, আমরা ঘরে যাই"—বলে ঘরে চলে এলাম। ওয়ার্ডারটিও আর কোন আপত্তি করল না। সার্চ করাটা রুটিন মাফিক কাজ, সব সময় হয় না—এ কথা সেও জানে। মাস্টারদার শান্ত নিরীহ চেহারা দেখে আর এ নিয়ে কোন পীড়াপীড়ি করবার প্রয়োজন সে অনুভব করল না। হেড জমাদারের মুখেও সম্মতিসূচক চিহ্ন ছিল - মাস্টারজীর সার্চ না হওয়াই ভাল। আজও মনে আছে ঘরে আসার পর মুখে আর কথা সরছে না, কি যে ভয়ানক কাণ্ড ঘটতে চলেছিল আর কি যে হয়ে গেল তা' যেন এখনো নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারছি না। অস্বাভাবিক কিছু দেখলে ওয়ার্ডারের সন্দেহ হতে পারে। মাস্টারদা স্বাভাবিক হবার জন্য গান গাইবার চেষ্টা করছেন, অম্বিকাদা উচ্চস্বরে আমার সঙ্গে আজেবাজে কথা বলছেন। আমি দ্রুত পায়চারি করছি আর বিড়বিড় ক'রে বলছি,- "মা আমাদের রক্ষা করেছেন।"

এই ওয়ার্ড থেকেই আমরা পালাবার ব্যবস্থা করছিলাম। তবে মাস্টারদা আর অম্বিকাদার মুক্তি পাবার সম্ভাবনা থাকায় একটু অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। এমনিতেই হয়ত ওঁরা মুক্তি পাবেন, অনর্থক ঝুঁকি নিয়ে লাভ কি? সুতরাং কথা হ'ল আমি একাই পালাব। এই বিষয়টির নিষ্পত্তি করবার জন্য মা-কালীর নামে লটারী করব প্রস্তাব করলাম। মাস্টারদা বললেন, "আচ্ছা, একবার করেই দেখা যাক্ না কি ফল হয়!" আমি বললাম, "না, তা' হবে না। যদি ভাগ্য পরীক্ষা করতেই হয় তবে মা যা নির্দেশ দেন তা' মানতেই হবে!" মাস্টারদা অতটা বেহিসেবী নন, সুতরাং লটারী করা আর হ'ল না।

হঠাৎ একদিন মাস্টারদা আর অম্বিকাদার মুক্তির আদেশ এল। আমাকে একা ফেলে যাবার সময় মাস্টারদা বলে গেলেন যে, তাঁরা কয়েক মিনিট পরেই ফিরে আসবেন। কারণ, বৃটিশ সরকারের রীতি অনুযায়ী হয়ত জেল গেটের সামনেই তাঁদের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে বন্দী করা হবে। আশ্চর্যের বিষয় ওঁরা আর বন্দী হলেন না। সোজা বাড়ী চলে গেলেন।

আমার পালাবার ব্যবস্থা প্রায় হয়ে গিয়েছিল। পিস্তলটি নিজের

ব্যবহারের জন্য জেলের মধ্যেই আমার হেপাজতে রইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঁকানো লোহার শিকটা দেওয়ালের বাইরে থেকে ছুঁড়ে ফেলবে বলে কথা ছিল যাদের, তারা জায়গা ভুল করে ফেলল। গভীর রাত্রে অন্য একটি ওয়ার্ডের কম্পাউণ্ডে পায়খানার টিনের ছাদে গিয়ে ঘটাং করে পড়ল সেটা। জেলের মধ্যে হৈ চৈ সুরু হয়ে গেল। ভয় হল, এখনি হয়ত ধরা পড়ে যাব আমি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেল কর্তৃপক্ষ আসামী ধরতে পারলেন না। যে ওয়ার্ডে পড়েছিল সেই ওয়ার্ডের বন্দীদের প্রতি সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। আমি বেঁচে গেলাম।

রেলওয়ে ডাকাতি মামলা সুরু হ'ল। নিম্ন আদালতে আনুষ্ঠানিক-ভাবে মামলা উঠবার পর মামলার গুরুত্ব বিচার করে সেসন কোর্টে সাধারণ জুরীদের দ্বারা বিচার হ'ল। এই মামলার ধারা অনুযায়ী স্পেশাল জুরী নিযুক্ত হল না। আমার পক্ষে ব্যারিস্টার ছিলেন এস. এল. খাস্তগীর এবং এ্যাডভোকেট রজনী বিশ্বাস।

রেলওয়ে ডাকাতির দিন এবং তার আগের দিন ঠিক ঘটনাস্থলেই আমাদের পূর্ব-প্রতিবেশী—মকলস রহমান আমাকে দেখেছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। তিনি এ বিষয় পুলিশের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। মামলা চলার সময়ে অভিভাবকেরা তাঁকে আমার প্রতি সহানুভূতিশীল করে নিলেন। অবশ্য পুলিশের কাছে স্টেটমেন্টে তিনি বলেছিলেন যে ঘটনাস্থলে অনন্ত সিংকে দেখেছেন। সরকারী পক্ষ জেলের মধ্যে "টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন" করবার জন্য আমার কাছে তাঁকে কখনও আনবার প্রয়োজন মনে করেন নি। অভিভাবকেরা যখন মক্‌লস রহমান সাহেবকে আমার পক্ষ সমর্থন করবার জন্য রাজী করালেন, তখন আমার ব্যারিস্টার তার সুযোগ নিলেন। মামলা চলা-কালে কোর্টের রীতি অনুযায়ী সরকারী উকিল যখন মক্‌লস রহমান সাহেবকে কাঠগড়ায় আমাকে সনাক্ত করতে বললেন, তখন তিনি আমাদের শেখান মত, আদালতে বললেন, 'না এ অনন্ত সিং নয়" অর্থাৎ যাকে তিনি অনন্ত সিং বলে জানেন, সে এ নয়। এই অবস্থাতে এর একমাত্র অর্থ হ'ল অন্য কোন লোককে তিনি সেইদিন ঘটনাস্থলে দেখেছিলেন কাজেই আদালত কক্ষের কাঠগড়ায় যে আছে সে অনন্ত সিং নয়। পুলিশ তো অবাক! জজ সাহেব বিভ্রান্ত! আমার পক্ষের উকিল বুঝিয়ে দিলেন যে সাক্ষী অনন্ত সিংকে শৈশবে দেখেছেন, সুতরাং ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তা ছাড়া অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণ অত্যন্ত দুর্বল ছিল। প্রত্যক্ষদর্শী একমাত্র হেড ক্লার্ক নিকুঞ্জবাবু ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাও জেরায় তিনি সব ভুল করে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত আমি আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তি পেলাম।

যে সময়ে আমাদের মামলা চলছিল, সেই সময় চট্টগ্রামে তারাচরণ সাধু নামে একজন সাধুর আবির্ভাব হয়। তিনি নাকি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। বিশিষ্ট অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা এবং উচ্চপদস্থ অফিসাররা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। আমার বাবা, দিদি, দাদা সকলেই তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতেন। যখন তাঁকে আমাদের মামলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হ'ল, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন, "খালাস, খালাস।" সকলে তো অবাক! তিন তিনটে মামলার আসামী—সাধুবাবা বলছেন 'খালাস'! তারপর যখন

তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল করে আমরা তিনজনেই 'খালাস' হয়ে গেলাম, তখন চট্টগ্রামবাসী তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতায় হতভম্ব হয়ে গেল। তারাচরণ সাধু আমাদের পরিবারের অনেকের সঙ্গে মাঝে মাঝে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন আদালত থেকে আমাদের জেলে নিয়ে যাওয়ার সময় দেখা করবার জন্য। কয়েকবার এই অবস্থায় তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। তাঁর দৈব-শক্তির প্রভাব দেখে আমি চমৎকৃত হয়ে গেলাম। তাঁকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে সুরু করলাম। জেলে বসেই মনে মনে স্থির করলাম এঁর কাছে গোপন অভিলাষ ব্যক্ত করে সাহায্য প্রার্থনা করব।

আমি মুক্তি পাবার পর বাড়ী আসতেই 'সাধুজী' এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। সদরঘাট কালীবাড়ীতে পূজার সময় শতশত লোক সাধুকে ঘিরে থাকত, সকলের মধ্যে আমার প্রতি সাধু বিশেষ মনোযোগ দিতেন। সাধুবাবার এই কৃপা দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়তাম। প্রেমানন্দের মামলা সম্বন্ধেও সাধুজীর ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হয়েছিল। অবশ্য তার আগেই আমি তাঁর একজন প্রধান ভক্ত হয়ে পড়েছি।

একদিন নিরালয় 'বাবাজীর' সঙ্গে দেখা করলাম। আমার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি—

"কি রে? কি হয়েছে? কি চাস্ তুই?"

—"বহুদিন ধরে ভাবছি আপনাকে একটা কথা জানাব। আপনি তো সর্বজ্ঞ—আমার মনের কথা বুঝতেই পারছেন। এখন আমার অভিলাষ পূর্ণ হবে কি করে, সে বিষয়ে আপনি নির্দেশ দিন।"

—"কি রে? তুই কি আমাকে পরীক্ষা করতে চাস্?"

তাঁর কথায় কুন্ঠিত হয়ে বললাম, —"না, না, আপনি ওকথা ভাবছেন কেন? আমি অন্য কিছু জানতে চাইছি না। যে বিষয়ে আমি আপনার সাহায্য চাইছি শুধু সেই বিষয়টি বলুন।"

—"কি বলব তোকে?......তুই......তুই নিশ্চয় কোথাও যেতে চাস!"

সাধুজী মনস্তত্ত্ব বুঝবার জন্য অন্ধকারে ঢিল মারবার চেষ্টা করছেন। আমি সেখানে সাধুজীকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে যাই নি, আমি চাই আমার গোপন অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য তাঁর সাহায্য। তাই বললাম—

"আমাদের সশস্ত্র প্রস্তুতির জন্য অনেক টাকা চাই। আমি ডাকাতি করতে চাই না। আপনার তো অনেক ধনী ভক্ত আছে, তাদের বলুন আমাকে মোট দশ হাজার টাকা দিতে। কি উদ্দেশ্যে চাই তা কিন্তু বলে দেবেন না। শুধু আমাকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করছেন—এটুকু বলবেন।"

সাধুজী ইতস্ততঃ করে বললেন—

"টাকা আমি কোথায় পাব? টাকা দেবে কে? এমন লোক কে আছে?"

সাধুজীর কাছ থেকে সাহায্য পেলাম না। তার চেয়েও বড় দুঃখ, সাধুজী আমার মনের কথাটা বলতে পারলেন না? মনটা দমে গেল।

আর এক দিনের ঘটনা। সতীদা একদিন ছুটে এসেছেন সাধুজীর কাছে। আমাকে সেখানে দেখতে পেয়ে খুব খুশি হলেন। সতীদা আমাকে

বললেন, "একটা কাজ কর অনন্ত—তুমি সাধুজীর থেকে একটা খবর জেনে দাও।"

সতীদা এই সময় কামিনীদাস ও অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি পরিচালিত হিন্দু মহাসভায় যোগ দিয়েছেন। মুসলমান গুণ্ডরা একটি হিন্দু মেয়েকে চুরি করে নিয়ে কোথায় যে আটকে রেখেছে তার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। সতীদা এসেছিলেন সাধুজী যদি দয়া করে সন্ধানটা বলে দেন, তিনি তো ধ্যানে বসলেই সব জানতে পারবেন! পাথরঘাটায় না আলকরণে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে মেয়েটাকে? দুর্ভাগ্যবশতঃ সর্বজ্ঞ সাধুজী যে জায়গার কথা বলে দিলেন, সেখানে মেয়েটি কোন সময়েই ছিল না।

আমার খুব রাগ হল। পরদিন তারাচরণ সাধুর কাছে গিয়ে বললাম—

"দেখুন, আমাকে ক্ষমা করবেন,—আমার মনে হয় নিজের গ্রামে—যেখানে বসে আপনি সাধনা করতেন, সেখানে ফিরে যাওয়াই আপনার ভাল। শহরের হীন প্রভাব আপনার সাধনার শক্তি নষ্ট করে দিচ্ছে, মন বিক্ষিপ্ত করে তুলছে। নিজের গ্রামে বসে সাধনা করলে পূর্ব শক্তি ফিরে পাবেন।" আশ্চর্যের বিষয়, আমার সঙ্গে কথা হওয়ার পর মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই সাধুজী হঠাৎ শহর ছেড়ে চলে গেলেন।

আবার আগের কথায় ফিরে আসি। আমি মুক্তি পেলাম, কিন্তু প্রেমানন্দ এখনও বন্দী। সাব-ইনস্পেক্টর প্রফুল্ল রায় হত্যার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। তাকে বাঁচাতেই হবে। ভয় দেখিয়ে, ঘুষ দিয়ে জুরী এবং সাক্ষীদের বশে আনতে হ'ল।

শ্যামাচরণ নামে একজন আই. বি. কনেস্টবল নিম্ন আদালতে তার সাক্ষ্যে বলেছিল যে, প্রেমানন্দ প্রফুল্লকে খবর পাঠিয়েছিল তার সঙ্গে দেখা করতে। শ্যামাচরণকে সাবধান করে দেওয়া হ'ল। সেসন কোর্টে বিচারের সময় সে সাক্ষ্য দিল যে প্রফুল্ল শ্যামাচরণ মারফৎ প্রেমানন্দকে খবর দিয়েছিল দেখা করতে, এবং সেটা হত্যার দিন নয়, আগের দিন।

আর একজন মারাত্মক সাক্ষী, সরকারী উকিল রায় সতীশচন্দ্র বাহাদুর। প্রফুল্লর মৃত্যুকালে তিনি কাছে ছিলেন। তাঁর স্টেটমেণ্টে বলা হয়েছিল যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রফুল্ল তাঁকে বলেছে—হরিশবাবুর ছেলে প্রেমানন্দ তাকে হত্যা করেছে। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর স্টেটমেন্ট যখন লেখা হয়েছে তাতে প্রেমানন্দ নামটির বানান রয়েছে 'PRAMANANDA'—বাংলায় উচ্চারণ হচ্ছে 'প্রমানন্দ'। রায়বাহাদুর আমাকে চেনেন। সুতরাং, ছদ্মবেশে ভয় দেখিয়ে তাঁকে আদেশ দেওয়া হ'ল সেসন কোর্টে তিনি যেন বলেন প্রফুল্ল শুধু 'প্রমানন্দ' নামটা বলেছে, তার বাবার নাম কিছু বলে নি।

আমার বাবাকে গোপনে সতীশবাবু বললেন—

"গোলাববাবু, কী সর্বনাশ! এত্তোর এগগুয়া রিভলভার আঁর বুকর উয়র। তারা দুইজন হইবো মনৎ লর্। আঁরে কইয়ে জে, 'হরিশ দত্তর পোয়ার নাম প্রেমানন্দ'—সাক্ষীৎ এ কথা ন কওনের লাই। আঁরে ডরাই গেইয়ে। কথা ন হুইনলে না কি চন্দ্রশেখররে গুলী করিব......।" (গোলাববাবু, কী সর্বনাশ! এত বড় একটা রিভলভার আমার বুকের ওপর! মনে হয় তারা দু'জন হবে। আমাকে বলেছে 'হরিশ দত্তের ছেলের নাম যে প্রেমানন্দ'—

সাক্ষী দেবার সময় এ কথা না বলতে। আমাকে তারা ভয় দেখিয়ে গেছে। কথা না শুনলে তারা নাকি চন্দ্রশেখরকে গুলী করবে......)।

চন্দ্রশেখরবাবু সতীশবাবুর কৃতী পুত্র- কলকাতায় থাকেন—হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। "চন্দ্রশেখরকে গুলী করা হবে" এ যেন বৃদ্ধের পক্ষে অসহনীয়! ওষুধ কাজে লাগল। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি আমাদের কথা অনুযায়ী প্রেমানন্দকে বাঁচিয়ে সাক্ষ্য দিলেন।

সরকারী উকিল রায় শশাঙ্ক বাহাদুর সরকার পক্ষ সমর্থন করলেন। প্রেমানন্দের পক্ষে দাঁড়ালেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযোগ প্রমাণে যে সব ত্রুটি ছিল, সেগুলিকে যথাসম্ভব ব্যবহার করে যতীন্দ্রমোহন তাঁর মনোগ্রাহী সওয়াল জবাবে যুক্তি দিয়ে দিয়ে প্রতিপক্ষের সমস্ত প্রমাণ ধূলিসাৎ করে দিলেন। তার সারমর্ম এই

(১) গুলীবিদ্ধ হবার পর পুরো ছত্রিশ ঘন্টা প্রফুল্লর জ্ঞান ছিল। ও যদি প্রেমানন্দের নাম বলে থাকে, তবে প্রেমানন্দকে ওর সামনে দাঁড় করিয়ে সনাক্ত করা হ'ল না কেন?

(২) সতীশবাবুর স্টেটমেন্টে বলা হয়েছে আততায়ীর নাম 'প্রমানন্দ'।

(৩) গুলীবিদ্ধ হবার পর প্রফুল্ল বলেছে, "প্রেমানন্দ হরিশবাবুর ছেলে"—এই অংশ সতীশবাবু কোর্টে অস্বীকার করেছেন।

(৪) শ্যামাচরণ বলেছে প্রফুল্ল প্রেমানন্দকে একদিন আগে ডেকে পাঠিয়েছিল। হত্যার দিন প্রেমানন্দ প্রফুল্লকে ডেকে পাঠিয়েছে, একথা সে বলে নি।

(৫) প্রফুল্ল যদি নাম বলেই থাকে তবে তার পরের দিন সকাল সাতটায় পুলিশ প্রেমানন্দের বাড়িতে arrest করতে গেল কেন? সত্যিই যদি নাম বলে থাকত তাহলে পুলিশ তক্ষুণি তাকে arrest করতে যেত।

জুরীরা বন্ধ ঘরে আলোচনা করতে গেলেন। পরে শুনেছিলাম আলোচনার সময় জুরীদের মধ্যে একজন খুব বুদ্ধির সঙ্গে একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন—

"একটা পিস্তল সাধারণতঃ ছয় সাত ইঞ্চি লম্বা হয়। প্রফুল্ল নিহত হয়েছে অটোমেটিক পিস্তলের গুলীতে। অটোমেটিক পিস্তল যখন, তখন সেটা নিশ্চয়ই বার ইঞ্চির কম হবে না লম্বায়! প্রফুল্ল একজন আই, বি, অফিসার, সব সময়ে সে সতর্ক থাকে। একজন লোক অত বড় একটা অস্ত্র নিজের কাছে রেখেছে—এটা নিশ্চয়ই তার নজরে পড়ত। সুতরাং, মনে হয় অন্য কেউ এসে তাকে হত্যা করে পালিয়ে গেছে।"

বলা বাহুল্য জুরী মহোদয়ের পিস্তল বা অটোমেটিক পিস্তল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই তাঁর মনে হয়েছিল অটোমেটিক যখন, তখন পিস্তলটি অন্তত বারো ইঞ্চি লম্বা হবে। পিস্তল বা অটোমেটিক পিস্তলও খুব ছোট হয়। পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ছয় সটের পিস্তল প্রফুল্লকে হত্যা করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।

আলোচনার শেষে জুরীদের ফোরম্যান তাঁদের মতামত জানাবেন। জীবন না মৃত্যু? ফাঁসির দড়ি না প্রিয়জনের স্নেহশীতল সাহচর্য? উৎকণ্ঠিত

হুদয়ের মুহূর্ত গণনা শেষ হল। জুরীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত—"NOT GUILTY."

"Not guilty ?" "নিরাপরাধ ?"

বৃটিশ কর্তাদের বিস্ময়ের শেষ নেই। এইভাবে একের পর এক বিপ্লবী মুক্তি পেয়ে যাবে? হাইকোর্টে চলে গেল কেস্। সেখানেও নিরপরাধ প্রমাণিত হল প্রেমানন্দ। তবু হার মানতে চায় না। ১নং বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অ্যাক্ট অনুসারে জেলে পাঠান হ'ল প্রেমানন্দকে।

প্রেমানন্দের মামলা নিয়ে ব্যস্ত আছি একদিকে—অন্য দিকে চলছে আমাদের পরবর্তী সক্রিয় প্রোগ্রামের বিষয়ে আলোচনা। আমার মুক্তির পর নির্মলদা এলেন দেখা করতে। রেলওয়ে ডাকাতির দিন সময় মত এসে পেঁছিতে পারেন নি বলে বার বার ত্রুটি স্বীকার করতে লাগলেন ছেলে-মানুষের মত। আমি তাঁকে যতই বোঝাই যে আমরা কিছু মাত্র অসন্তুষ্ট হই নি, কারণ, কাজের কোন ক্ষতি হয় নি—তবুও তাঁর নিজের মনে শান্তি নেই। যাই হোক্, আমার আন্তরিকতাপূর্ণ কথায় শেষ পর্যন্ত নির্মলদা আশ্বস্ত হলেন। আমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ক্রমশঃ নিবিড় হয়ে উঠল।

আমার বন্ধু প্রমোদ চৌধুরী আমাদের দল ছেড়ে চারুবাবুর সঙ্গে অনুশীলন পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। আমার মুক্তির এক সপ্তাহের মধ্যেই চট্টগ্রামের একটি গ্রামে একজন ধনী ব্যক্তির গৃহে ডাকাতি হয়। সেই ডাকাতিতে রিভলভার ব্যবহৃত হয়েছিল। কাজেই বুঝলাম আমরা যখন এই ডাকাতি করি নি, তখন নিশ্চয়ই এটা প্রমোদদের কাজ। প্রায়ই প্রমোদ এবং তার দলের অন্যান্যদের সঙ্গে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হোত। এই ঘটনার পর একদিন নির্মলদা এবং আমি, প্রমোদের সঙ্গে দেখা করে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করলাম। বিষয়টি হ'ল—একই জেলায় একই উদ্দেশ্যে কাজ করছি আমরা, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। প্রবল শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হলে যতদূর সম্ভব শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। একতাই শক্তি। সুতরাং, আমরা আমাদের নিজের নিজের দলের সদস্যদের বোঝাবার চেষ্টা করব যাতে চট্টগ্রামের দুটি দল এক হয়ে কাজ করে। পাথর-ঘাটায় পুরোণো "কলেজিয়েট স্কুলের" দোতলার বারান্দায় এক ছুটির দিনে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে এই মিটিং চলল। বিদায় নেবার সময় তিনজন আবার প্রতিজ্ঞা করলাম, দুটি দলকে আমরা মিলিত করবই।

আমাদের শুভেচ্ছা শেষ পর্যন্ত সার্থক হ'ল। তার বিস্তারিত বিবরণ পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবে। মোট কথা, দুই দলের নেতারা এক বৈঠকে মিলিত হলেন—চারুবাবুও উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকে স্থির হ'ল এবার থেকে চট্টগ্রামে সমস্ত বিপ্লবীদের নিয়ে মাত্র একটি পার্টি গঠিত হবে।

এই ঐতিহাসিক মিলন চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের পরবর্তী পদক্ষেপে সার্থকতার সূচনা করল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মিটিং-এর পর, এক সপ্তাহের মধ্যেই ১৯২৪-এর ১লা অক্টোবর, ১নং বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অ্যাক্ট জারী হ'ল—বেছে বেছে চুয়াত্তর জনকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। মাস্টারদা, চারু-বাবু, প্রমোদ এবং অন্য কয়েকজন গ্রেপ্তার এড়িয়ে গোপনে লুকিয়ে রইলেন।

অম্বিকাদা এবং আমি বন্দী হলাম। ৩নং রেগুলেশন অনুযায়ী গণেশ ঘোষও বন্দী হ'ল একই দিনে।

ডেটিনিউ ও স্টেট প্রিজনার হিসেবে আমাদের দুটি দলের অনেককে জেলে আটক করা সত্ত্বেও যাঁরা বাইরে রইলেন গা ঢাকা দিয়ে ও যাঁদের অস্তিত্ব পুলিশ জানত না, তাঁরা এক সঙ্গে একটিদল হিসেবে চট্টগ্রামে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন।

১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্বেই সবাই জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ছিলেন। প্রধানতঃ অনুশীলন ও যুগান্তরের নেতৃস্থানীয় দাদারা জেল থেকে ঠিক করেই বার হলেন যে. বাংলা দেশে একটি বিপ্লবী দল উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দের দ্বারা সংযুক্তভাবে পরিচালিত হবে। প্রথম কয়েক মাস তাঁরা খুব চেষ্টা করে সেই সংযুক্ত নেতৃত্বে একটি প্রধান বিপ্লবী পার্টি বাংলা দেশে গড়ে তুললেন। কয়েকটি মাসই মাত্র! তারপর আবার আত্ম-কেন্দ্রিক প্রভাব নেতাদের ও দলের অনেককে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এরই স্বাভাবিক পরিণতি—আবার যে যার গণ্ডিতে ফিরে গেলেন। চট্টগ্রামে আমরাও এই ধাক্কায় ১৯২৯ সালের প্রথমে. আবার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম।

১৯২৪ সাল, ১লা অক্টোবর—ভোর রাত্রি। বাংলার লাট বাহাদুর লর্ড লিটন্ যে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অ্যাক্ট ঘোষণা করেছেন, দৈনিক সংবাদপত্র মারফৎ দেশবাসীর তখনও তা' জানবার সুযোগ হয়নি। সেই দিনই শেষ রাতে পুলিশ অতর্কিতে আমার বাড়ীতে হানা দিল। কেন পুলিশের এই অপ্রত্যাশিত শুভাগমন তা' তখনও আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। প্রথমে মনে হয়েছিল ডাকাতি মামলা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পর, গ্রামে রিভলভার নিয়ে যে স্বদেশী ডাকাতি হ'ল এটা তারই জের বোধহয়। মধ্য রাত্রে পুলিশের হানা - এর আর কি অর্থ হতে পারে! আমার মাও ঐরূপ কিছু অনুমান করে নিয়ে খুব উত্তেজিত কণ্ঠে চীৎকার করে বলতে লাগলেন "না না, এ হতে পারে না। অনন্তকে বিনা দোষে ধরে নিয়ে যাবে? সে তো বাড়ী থেকে দিনে বা রাত্রে কখনও অনুপস্থিত থাকেনি! এ আমি হতে দেব না! সে সব সময় আমার চোখে চোখে আছে। কোন ডাকাতিই সে ইতিমধ্যে করতে পারে না! আমি ধরে নিয়ে যেতে দেব না!"

মা যে কি ভাবে বন্দী করতে দেবেন না তা আমি বুঝতে পারিনি—তবে তাঁর ক্ষিপ্ত উত্তেজিত অভিব্যক্তি সবাইকে সাময়িকভাবে চিন্তিত করে তুলেছিল। মা তখনও জানতেন না যে আমার কাছে ছিল দুটি রিভলভার, একটি হাতবোমা এবং কয়েকটি বোমায় আগুন ধরাবার জন্য ক্যাপ। বাড়ীর চারিদিক ঘিরে পুলিশ পাহারা। এই সব বোমা-পিস্তল বাইরে পাঠাবার কোন উপায় নেই। এইরূপ সংকটময় অবস্থার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। তাই খুব বেশি ভাবতে হ'ল না। আমার পিসতুতো বোন শকুন্তলা একটা রিভলভার আর একটা বোমা শাড়ীর আড়ালে লুকিয়ে রাখল, মা রাখলেন একটি রিভলভার। হোমিওপ্যাথী বাক্সের শিশিগুলির তলায় ক্যাপগুলিকে লুকিয়ে রাখলেন আমার দিদি ইন্দুমতী।

বাংলাদেশের মেয়েদের সম্পর্কে বৃটিশ পুলিশ ১৯২৪ সালে অতখানি

সজাগ ছিল না। তা' ছাড়া মাত্র অল্প দিন আগে জেল থেকে বেরিয়ে এসে আমি আমার নিজ বাড়ীতে পিস্তল-বোমা রাখব, পুলিশের সাধারণ অভিজ্ঞতা দিয়ে তা' তারা বুঝতে পারে নি। এটাই আমার বাল্যজীবনের বৈশিষ্ট্য—বোমা-পিস্তল আমার খেলার সাথী। সব সময় দুটো তিনটে পিস্তল বালিশের নীচে রেখে আমি ঘুমোতাম। কি যে ভাল লাগত!

পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ ল্যানার্ড নিজে এসেছিলেন। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করবার অক্ষমতার পর পুলিশ সাহেব মিঃ শ্যালো বদলী হয়ে গেছেন। আমাদের প্রতিবেশী অ্যাডভোকেট রজনী বিশ্বাসকে পুলিশ ডেকে এনেছিল সাক্ষী হিসেবে। তাঁর মারফৎ আমার বাবাকে বলা হ'ল যে শুধু বাড়ী সার্চ করেই তারা চলে যাবে; পুলিশ আমাকে ডাকছে—আমি যেন তাদের সঙ্গে দেখা করি। পুলিশের কথায় বিশ্বাস করে আমি বসবার ঘরে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করতেই মিঃ ল্যানার্ড বলে উঠলেন—

"১লা অক্টোবর, ১৯২৪ এর ১নং বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।"

পুলিশের ফাঁদে পা দিয়েছি, আর পালাবার উপায় নেই। রাগে গর্জন করে উঠলাম—

"তাহলে আপনি একজন Liar (মিথ্যেবাদী)? সার্চ করতে আসেন নি। এসেছেন আমাকে গ্রেপ্তার করতে!"

Liar কথাটা ইংরেজীতে যে মস্ত বড় একটা গালাগাল তা' আমার জানা ছিল না।

"মিথ্যেবাদী" সম্বোধনে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সাদা মুখ মুহূর্তে লাল হয়ে উঠল। একবার ঢোঁক গিলে কথাটা হজম করে নিয়ে বললেন—

"হ্যাঁ, বাড়ীও সার্চ করা হবে।"

"কিন্তু আপনি ইচ্ছে করে সত্য গোপন করেছেন। আমাকে ধোঁকা দিয়েছেন।"

এসব কথায় আর তাদের কি এসে যাবে! কোন উত্তর না দিয়ে পুলিশ সাহেব বাইরে গেলেন। বিনা কারণে, বিনা বিচারে ডেটিনিউ করে রাখবে-জেলে আটক করে রাখবে! কিন্তু পুলিশের উপর নির্দেশ ছিল যেন তারা সবার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে। মিষ্টি কথা ও ভদ্র ব্যবহার করার সূচনার অন্তরালে মনে হয় আই. বি. পুলিশের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। পুলিশ প্রহরায় আমি বাড়ীর ভেতরে গেলাম। ঘণ্টা দুয়েক পর চা খেয়ে—বাবা-মা-দাদা-দিদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার ঘরের মায়া কাটালাম।

১৯২৪-এর ১লা অক্টোবর যে অর্ডিন্যান্স জারী করা হয় তার কারণ, সারা বাংলাদেশে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ক্রমশঃ তীব্রতর হয়ে উঠছিল। পুলিশের রিপোর্টে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির উল্লেখ রয়েছে ঃ

(১) ১৯২৩ সালের প্রথমে চট্টগ্রামে পড়ুইকোরা ডাকাতি।

(২) মে, ১৯২৩—কোনো ডাকাতি এবং হত্যা।

(৩) মে, ১৯২৩—উল্টাডিঙ্গি পোস্ট অফিস ডাকাতি।

(৪) অগাস্ট, ১৯২৩—শাঁখারিটোলা পোস্ট অফিস ডাকাতি এবং হত্যা।

(৯) ডিসেম্বর, ১৯২৩—চট্টগ্রামে রেলওয়ে ডাকাতি।

(১০) ২৪-১২-২৩—চট্টগ্রামে নাগারখানা পাহাড়ে লড়াই (সুলুকবাহার হাউসের অস্ত্রাগার আবিষ্কারের পর)।

(১১) ১২-১-২৪ - সার চার্লস টেগার্ট ভ্রমে মিঃ ডে হত্যা।

(১২) ২৪-৫-২৪—চট্টগ্রামে সাবইনস্পেক্টর প্রফুল্ল রায় হত্যা।

(১৩) ২৪-৮-২৪ - মির্জাপুর স্ট্রীটে খদ্দরের দোকানে বোমা নিক্ষেপ—মালিক প্রকাশচন্দ্র বণিককে হত্যা।

[বেংগল পুলিশ ইনটেলিজেন্সের সারাংশ থেকে সংগৃহীত]

প্রকাশচন্দ্র বণিকের হত্যার মূল কারণ, তার খদ্দরের দোকানের আড়ালে গুপ্তচরদের বিপ্লব বিরোধী কার্যকলাপ। শিশির কুমার নামে একজন লোক বৃটিশ সরকারের টাকায় "স্বদেশী এজেন্সি" নামে খদ্দরের দোকান খুলল। এই লোকটি সন্তোষদার বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে অনুকূলদার সংগে টেক্কা দিতে গেল। অনুকূলদার প্রখর দৃষ্টি ও তীক্ষ্ম বুদ্ধির কাছে শিশির কুমার ধরা পড়ে গেল। পুলিশের সংগে তার ঘনিষ্ট গোপন সংযোগ-সূত্র অনুকূলদার নজর এড়ালো না। অনুকূলদা হরিদার কাছে খবর পাঠালেন—"বিশ্বাসঘাতক শিশির কুমার ও তার অনুচরদের বাঁচবার অধিকার নেই - স্বদেশী এজেন্সি বোমাতে উড়িয়ে দাও।"

হরিদার তৈরি বোমা। অব্যর্থ লক্ষ্যে শান্তি চক্রবর্তী খদ্দরের দোকানের মধ্যে বোমাটি ছুঁড়ল। টাইম বোমা - ক'এক সেকেন্ড পরেই ওটার বিস্ফোরণ হবার কথা। শিশির কুমার সেই ক'এক সেকেন্ডের সুযোগ নিয়ে এক লাফে বাইরে চলে এল—সে দরজার কাছেই বসেছিল। কিন্তু তার প্রধান সহচর—মালিক প্রকাশচন্দ্র বণিককে তাদের দুষ্কৃতির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ল।

খদ্দরের দোকান আক্রমণের উল্লেখ করে পুলিশ এমন উদ্দেশ্যমূলকভাবে রিপোর্টটি সাজিয়েছে যাতে সকলে মনে করে যে বিপ্লবীরা অহিংসাবাদী কংগ্রেস সেবককে শত্রু মনে করে হত্যা করেছে। তাই পাঠকদের মনে যাতে কোন খট্কা না থাকে সেই জন্য পুলিশের এই বিভেদ সৃষ্টির চক্রান্তকে উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন মনে করেই উপরোক্ত বিশেষ ঘটনাটির বিবরণ দিলাম

১৯২৫-২৬ সালে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের ঐক্য আরও সংহত হয়ে উঠল। "বেঙ্গল পুলিশ, অ্যাবস্ট্রাক্ট অব ইনটেলিজেন্স-এর গোপন রিপোর্ট—XXXX ভল্যুম, ১৯২৬"-এ পাওয়া যায়

"অবস্থা ক্রমশঃ গুরুতর হইতে থাকে এবং গভর্নমেণ্ট ১৯২৪-এর অক্টোবরে স্পেশ্যাল অর্ডিন্যান্স (১নং অর্ডিন্যান্স) চালু করেন।...ছিয়াত্তরজন ব্যক্তিকে অন্তরীণ করা হয়। অনন্ত সিং, অম্বিকা চক্রবর্তী এবং গণেশ ঘোষ ১৯২৪ সালে বন্দী হয়।...যুগান্তর এবং অনুশীলন—উভয় পার্টির নেতারা পার্টি পুনর্গঠনের জন্য অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ বন্ধ রাখার পক্ষপাতী হন।... অপেক্ষাকৃত তরুণ সদস্যেরা যুগান্তর এবং অনুশীলন, উভয় দলেরই স্ব স্ব নেতাদের এই নীতি অনুমোদন না করিয়া অবিলম্বে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চালাইবার জন্য "নিউ ভায়োলেন্স পার্টি" নামে একটি সংযুক্ত পার্টি গঠন করে। পরপৃষ্ঠায় গ্রুপগুলি এই এন, ভি, পি-এর কেন্দ্রীয় বোর্ডের অধীনে একত্রিত হয়—

(১) হাওড়ায়, বীরেন ব্যানার্জীর অধীনে (যুগান্তর)।
(২) হুগলী, হরিনারায়ণ চন্দ্রের অধীনে (যুগান্তর)।
(৩) নদীয়া, অনন্তহরি মিত্রের অধীনে (যুগান্তর)।
(৪) বাণীসেবক সংঘ, সুধীর বসুর অধীনে (অনুশীলন)।
(৫) শচীন সান্যালের গ্রুপ, বিনয়েন্দ রায়চৌধুরীর অধীনে (অনুশীলন)।
(৬) মাদারিপুর, পঞ্চানন চক্রবর্তীর অধীনে (যুগান্তর)।
(৭) চট্টগ্রাম, সূর্য সেনের অধীনে (যুগান্তর)।
(৮) চট্টগ্রাম, চারুবিকাশ দত্তের অধীনে (অনুশীলন)।
(৯) ঢাকা, বীরেন্দ্র ভট্টাচার্যের অধীনে (যুগান্তর)।
(১০) আসাম গ্রুপ, উপেন্দ্র ধরের অধীনে (যুগান্তর)।

"পার্টির অফিসিয়াল প্রোগ্রাম পাওয়া গিয়াছে কলিকাতায় ৪নং শোভা-বাজার স্ট্রীটে-

'Actions are the book of the masses—ideas open quickly by the blood of the martyrs'—Mazsini.

"ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত উপায়ে বিপ্লব সংঘটিত হইবে—

(ক) ব্যক্তিগত বিভীষিকা সৃষ্টি--অফিসারদের হত্যা, ট্রেন ধ্বংস, গুপ্তচর এবং গুপ্ত সংবাদদাতাদের হত্যা, সরকারী অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ অধিকার, ইত্যাদি...।

(খ) সমবেত সশস্ত্র আক্রমণ।

(গ) ক্ষমতা অধিকার।

(ঘ) বিপ্লব।"

অর্ডিন্যান্স জারী করে পুলিশের সন্দেহ মত বিপ্লবীদের বন্দী করে বৃটিশ সরকার চাইল বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করতে। কিন্তু নিউ ভায়োলেন্স পার্টি এবং অন্যান্য বিপ্লবী গ্রুপের কর্মীরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল না। বৃটিশ দমননীতি উপেক্ষা করে তারা অব্যাহত রাখল বিপ্লবী কর্মধারা। বেঙ্গল পুলিশের (ইনটেলিজেন্স) গোপন রিপোর্টের সারাংশ থেকে আরও বহু ঘটনার কথা জানা যায় --

"১৯০৮ সালে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল বেনারসে একটি অনুশীলন সমিতি গঠন করেন—পরে ইহা 'যুবক-সমিতি' নাম ধারণ করে।......দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার আত্মগোপনকারী আসামী রাসবিহারী বসু, বেনারসে আসিয়া শচীন সান্যালের গ্রুপের ভার গ্রহণ করেন। পূর্ব উল্লিখিত পিঙ্গলে এই সময় রাসবিহারী বসুর সহিত যোগদান করেন......।

"অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই গ্রুপকে বাহির হইতে নিষ্ক্রিয় মনে হইত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইহার সন্ত্রাসবাদী ধারা যে অব্যাহত ছিল তাহার প্রকাশ হয় ৯-৮-২৫ তারিখে, যখন কাকোরি রেলওয়ে স্টেশনে ৮নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেন এই গ্রুপের সদস্যদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। এই সূত্র ধরিয়া চুয়াল্লিশজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে 'কাকোরি-ষড়যন্ত্র মামলা' সুরু হয়। এই মামলায় রাজেন্দ্র লাহিড়ী, রোশন সিং, আসফকুল্লা এবং রামপ্রসাদ বিসমিলকে চরম শাস্তি ও শচীন সান্যালকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

"১৯২৫ সালের শেষের দিকে—১০-১১-২৫ তারিখে দক্ষিণেশ্বরে

সন্ত্রাসবাদীদের একটি বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে অনন্তহরি মিত্র, বীরেন্দ্রকুমার এবং প্রমোদ চৌধুরী সহ এগারজন তরুণ অভিযুক্ত হইয়া কারা-দন্ড লাভ করে।

"২৮-৫-২৬ তারিখে আই-বি-র স্পেশাল পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট রায় ভূপেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী বাহাদুর প্রেসিডেন্সি জেলের মধ্যে গেলে, এই দণ্ডিত ব্যক্তিরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া লোহার ডান্ডা দিয়া পিটাইয়া হত্যা করে। অনন্তহরি, বীরেন্দ্র এবং প্রমোদকে চরম দন্ড দেওয়া হয়। চট্টগ্রামের রাখাল দে-র যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়।

"১৯২৭ সালে দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলা সুরু হয়। অন্যান্যদের সঙ্গে চট্টগ্রামের সুখেন্দু দত্ত দণ্ডিত হয়।

"৮-১০-২৬ তারিখে সূর্য সেন বন্দী হয়।"

চট্টগ্রামে প্রথম যখন অর্ডিন্যান্স অনুসারে মাস্টারদাকে বন্দী করতে যায় পুলিশ, তখন তিনি পুলিশ বেষ্টনী হতে পালাতে সমর্থ হন। তারপর তিনি বিভিন্ন জেলায় বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন এবং বাংলার বাইরেও বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তিনি যখন ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন, তখন পুলিশবাহিনী সূর্য সেনকে গ্রেপ্তার করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

কলকাতার উপকণ্ঠে, শোভাবাজার ও দক্ষিণেশ্বরে তখন মাস্টারদাদের হেড কোয়ার্টার। দক্ষিণেশ্বরে ছোটখাট একটি বোমা তৈরি করবার কারখানা স্থাপিত হয়েছে। আর শোভাবাজারে দলের অনেকে আত্মগোপন করে আছেন। শোভাবাজারের মস্ত বড় বাড়ীর তিনতলার একটি কামরায় তাঁরা থাকতেন। নিজেরাই রান্নাবান্না করতেন। কেউ কলেজে পড়েন, কেউ বা চাকরী করছেন অথবা চাকরীর খোঁজে আছেন—এই পরিচয় দিয়ে সেখানে থাকতেন তাঁরা।

যখন খুব নিশ্চিন্ত হয়ে বিপ্লবীরা কাজ করে চলেছেন, তখন তাঁদের মধ্যে কেউ না কেউ পুলিশের অনুচর ছিলই। কিন্তু কে সে? ছিল একজন। ঠিক একই দিনে পুলিশ শোভাবাজার ও দক্ষিণেশ্বরের বাড়ী দুটির ওপর হানা দেয়।

পুলিশ খড়ি গুণতে জানে না। বিশ্বাসঘাতকতা ব্যতীত এইরূপ ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটে না। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা জানি ভেতর থেকে বিশ্বাসঘাতকতা না করলে বোমার কারখানা আবিষ্কার, বিপ্লবী দলের আস্তানার উদ্ঘাটন, বিপ্লবীদের স্বকীয় পরিকল্পনার প্রকাশ কখনই হতে পারে না। কিন্তু তবু কারো কারো সান্ত্বনা পাবার প্রয়াস দেখেছি বা ভুল বুঝিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টাও অনুভব করেছি। তাঁদের ধারণা বা তাঁদের মতে পুলিশ "হঠাৎ গন্ধ" পেয়ে গেছে অথবা কাউকে না কাউকে "হঠাৎ রাস্তা থেকে" অনুসরণ করে তাঁর আস্তানা প্রভৃতির খোঁজ পেয়ে গেছে। কি অদ্ভুত! কি চমৎকার! এইরূপ পুলিশী ভোজবাজির আসল উৎস কোথায় তা সঠিক অনুধাবন করেছিলাম বলেই ১৯৩০ সালে অস্ত্রাগার আক্রমণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একটি মীরজাফরও দলে ঢুকতে সমর্থ হয় নি।

১৯২৬ ও ১৯৩০ সাল এক নয়। এর মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি। ১৯২৬ সালে আমরা মাত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করছি। ১০ই নভেম্বর, ১৯২৫

সাল—রাত পোহায় নি। ভোর হতে তখনও অনেক বাকি। দক্ষিণেশ্বরের বাড়ী পুলিশ অতর্কিতে এসে ঘিরে ফেলল। সেই সময় শোভাবাজারের বাড়ীতে মাস্টারদা, অনন্ত চক্রবর্তী, প্রমোদ ও অন্যান্য আরো কয়েকজন ছিলেন। তাঁরা কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পেলেন যে, পুলিশ হানা দিয়েছে। ফিস্-ফিস্ আওয়াজ ও বুটের খুব হাল্কা শব্দ তাঁদের কানে এল। ক্রমেই বুটের আওয়াজ স্পষ্টতর হ'ল। মুহূর্তে তাঁরা প্ল্যান ঠিক করে ফেললেন। মাস্টারদাকে তাঁদের বাঁচাতেই হবে—যে কোন উপায়েই হোক্।

প্রমোদ, অনন্ত চক্রবর্তী ও আরও কয়েকজন, শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে দরজা চেপে ধরে রইল। জোরে জোরে দরজায় ঘা পড়তে লাগল। পুলিশ বুটের লাথি ও বন্দুকের কুঁদো দিয়ে সজোরে দরজা ঠুকতে লাগল ও তাদের শাসালো—"দরজা খোল, নইলে গুলী করব!" ভেতর থেকে প্রত্যুত্তর এল—"এত অস্থির কেন বাবু? আমরা কি কোথাও পালাচ্ছি? রাত তো এখনও শেষ হয় নি ঘুম থেকে উঠতে তো সময় দেবে! সত্যিই তো কেউ আর পালাচ্ছে না! তবে এত অস্থির হলে চলবে কেন?"......দরজা খোলা হ'ল। বীরদর্পে রিভলভার ও বন্দুক হাতে পুলিশ কর্তারা সেপাই নিয়ে ঘরে ঢুকে সবাইকে গ্রেপ্তার করল। তারপর পাগলের মত সবাই একেবারে ক্ষেপে গেল "কোথায় সূর্য সেন?" "Where is Surya Sen?" "কোথায় সে?" "কোথায় লুকিয়ে আছে?" ততক্ষণে সূর্য সেন কলকাতার রাজপথে। মাস্টারদা শীর্ণ দেহ, নিরীহ মানুষটি, মলিন তাঁর বেশ, চলেছেন রাজপথ দিয়ে। কেই বা সন্দেহ করবে- কেনই বা তাঁকে সন্দেহ করবে অকারণ! পুলিশ যখন দরজা খোলবার জন্য তর্জন গর্জন করছে ততক্ষণে মাস্টারদা বাথরুমের জানলা দিয়ে বেরিয়ে জলের পাইপ ধরে তিনতলা থেকে নিচে নেমে এলেন। তারপর নোংরা নর্দমা অতিক্রম করে খোলা রাস্তায় এসে পড়লেন। বিশ্বাসঘাতক বা পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা করেও সেই যাত্রায় মাস্টারদাকে আর বন্দী করতে পারল না।

পরে একদিন "হঠাৎ" তাঁকে কলকাতার রাস্তায় (৮-১০-২৬ তারিখে) পুলিশের হাতে বন্দী হতে হ'ল। কে সেই মীরজাফর যে খবর দিয়েছিল মাস্টারদার গতিপথের? নিশ্চয়ই সে পরবর্তীকালে একজন মহা-বিপ্লবী সেজে কত না প্রশংসা ও ফুলের মালা পেয়েছে! হাতেনাতে ধরা না পড়লে কে তাকে পুলিশের গুপ্তচর বলবে? দলের সেরা যারা তাদের মধ্যেই কেউ অতি নিকট বন্ধু সেজে—আপনজন সেজে, গোপনে শত্রুতা করেছে পুলিশের চর হিসেবে। এই গোপন শত্রুদের পূর্বাহ্নে চিনে নিতে (Spot-out) না পারলে ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহ সফল হোত না।

আমি তো বোকার মত সাহেবের কথা বিশ্বাস করে প্রথম ক্ষেপেই বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে বন্দী হলাম। চট্টগ্রাম থেকে পুলিশ প্রহরায় আমাকে পাঠাল বর্ধমান জেলে। বন্দী অবস্থায় বর্ধমান জেলে থাকাকালীন স্থির করলাম পালাবার ব্যবস্থা করতে হবে। ঠিক সেই সময়েই প্রেসিডেন্সী জেলে বসে গণেশও সেই একই ব্যবস্থায় ব্যস্ত ছিল, যদিও কেউ কারো কথা জানতাম না। গণেশ লোহাকাটা-করাত যোগাড় করেছিল এবং অন্যান্য সব প্রস্তুতিও করে ফেলেছিল। আমি একটা লম্বা লোহার শিক বাঁকিয়ে 'L' আকৃতি করে

তাই দিয়ে তালা ভাঙবো ঠিক করেছিলাম। একটা লোহার খাট ছিল, নতুন ধুতিও জোগাড় হয়েছিল। থাকতাম জেলের এক কোণে একটা পৃথক ওয়ার্ডে, জেলের প্রধান দেওয়াল আমার ওয়ার্ডের সামনে দিয়ে ঘুরে গিয়ে জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছিল। আমার সঙ্গে একজন মাত্র রাজবন্দী থাকত। রাত্রে কোন গার্ড থাকত না—জমাদার ঘুরে ঘুরে এসে দেখে যেত।

ঠিক করলাম, যিনি আমার সঙ্গে আছেন তাঁকে সরাতে হবে, আর জুলুদাকে সেই জায়গায় এনে দুজনে এক সঙ্গে পালাব। কিন্তু জুলুদাকে এখানে আমার সঙ্গে থাকতে দেবে কেন? তিনি থাকেন অন্য জেলে। অনেক ভেবে উপায় খুঁজে পেলাম। সেও এক বিস্তারিত ইতিহাস।

পুলিশের উপর আমার ছোটবেলা থেকেই একটা অদ্ভুত বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার ভাব ছিল। সেই জন্য পুলিশ দেখলেই আমার রক্ত গরম হয়ে উঠত। কড়া কড়া কথা বলে গায়ের ঝাল মেটাতাম। এমনভাবে ভ্রূকুটি করে তাকাতাম যেন পারলে ছিঁড়ে ফেলি।

একদিন বাবা আমাকে বললেন—"তুই পুলিশ দেখলেই ওরকম করিস কেন? ওদের সংগে ভদ্র ব্যবহার করলে কি ক্ষতি হয়? ভদ্রতাতে তো আর পয়সা খরচ হয় না! বরং মিষ্টি কথা বলে তাদের মন জয় করে দরকার মত কাজের সুবিধে করে নিতে পারিস। তাছাড়া যে কাজে নেমেছিস তাতে দৃঢ়তার সঙ্গে যদি ধীরভাব মিশ্রিত হয় তাহলে তোর সম্মান বাড়বে। বলছি না যে তুই তোর বিপ্লবী চরিত্রের পরিবর্তন কর্, কিন্তু সামান্য ভদ্রতায় যদি কিছু কাজ হয়, তবে সেটাকে আপত্তি কি?"

বাবার এই উপদেশ আমার ওপর ম্যাজিকের কাজ করল। ইতিপূর্বে মাস্টারদা আর অম্বিকাদার উপদেশে জেলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেছি, এবার বাবার উপদেশে পুলিশের সংগেও ভদ্র ব্যবহার সুরু করে দিলাম।

বর্ধমান জেলে বসে পালাবার সুযোগ খুঁজছি। আই, বি, অফিসারদের সঙ্গে খুব ভাব জমিয়েছি; কেউ কাকাবাবু, কেউ জ্যেঠামশাই.................. ইত্যাদি। ওদের কাছে এমন ভাব দেখালাম যেন হঠাৎ আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে—আমি দলের কথা সব বলে দিতে রাজী আছি। এর পূর্বে আমি মনে মনে এক সুন্দর কৃত্রিম গল্প ফাঁদলাম। পুলিশের কাছে বেশ গুছিয়ে স্বীকারোক্তি করলাম। তাদের বললাম দলের আসল লোকদের খবর তারা কেউ জানে না। তাঁরা অনামী পাঁচজন। আমরা তাঁদের বড়দা, সেজদা, ছোড়দা, লম্বাদা, বাঘাদা, ইত্যাদি বলে ডাকি, কিন্তু আসল নাম জানি না। জুলুদা জানেন তাঁদের নাম। এখন জুলুদাকে যদি আমার এখানে এনে রাখা হয় তবে ওঁর কাছ থেকে নামগুলি কৌশলে জেনে নিয়ে বলতে পারি। আর, আমার সঙ্গে সুরেনবাবুকে যে রাখা হয়েছে তাঁকে যেন এই জেল থেকে বদলি করা হয়। আমার কথা মত পুলিশ সেই ব্যবস্থাই করল। সুরেনবাবু আমাদের দলের সভ্য নন। তিনি মাদারীপুরের পূর্ণদার পার্টির বিশেষ কর্মী। আগে থেকে ঘনিষ্ট পরিচয় না থাকলে—জেল থেকে পালাবার ঐরূপ ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে তিনি অংশ গ্রহণ করবেন কিনা তা তাঁকে প্রশ্ন করাও ষড়যন্ত্রের প্রাথমিক নীতি বিরুদ্ধ। তাই তাঁর অনুপস্থিতি আমার কাম্য ছিল

এবং ভেবেছিলাম আমরা দু'জন ছাড়া ঐ ওয়ার্ডে যদি আর কেউ না থাকে তাহলে পালাবার বন্দোবস্ত করা সহজসাধ্য হবে।

পুলিশ আমার কথাই অনুমোদন করল। সুরেনবাবু অন্য জেলে স্থানান্তরিত হলেন আর জুলুদা এলেন বর্ধমান জেলে আমার ওয়ার্ডে। এসে বললেন যে, আই, বি, অফিসারেরা তাঁকে বলেছেন আমি ভীষণ বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে ওঁদের উত্যক্ত করে তুলেছি—তাই জুলুদাকে তাঁরা পাঠাচ্ছেন আমাকে একটু শান্ত রাখতে। আমি খুব হাসলাম। জুলুদাকে আসল কারণ খুলে বললাম—ওই পাঁচজন ছদ্মনামের নেতাদের প্রকৃত পরিচয় জানবার উদ্দেশ্যেই তাঁকে ওঁরা আমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমাকে প্রায় পাঁচশ' ফটো দেখিয়ে পুলিশ প্রশ্ন করেছে যে ওর মধ্যে সেই পাঁচজনের কারো ফটো আছে কি না! আমি বলেছি না, এরা কেউ নয়। ঐ নেতাদের পুলিশ চেনে না—ওঁরাই সব কিছু করাচ্ছেন।

এরপর জুলুদাকে মনের কথা খুলে বললাম। জুলুদা রাজী নন একেবারেই। আমার অভিমানে আঘাত দিয়ে তিনি বললেন—

"কি মনে কর তুমি নিজেকে? তোমাকে ছাড়া বাইরে বিপ্লবের কাজ চলবে না? নিজের সম্বন্ধে অত উঁচু ধারণা কর না। চুপ করে জেলে বসে থাক। সাধনা অভ্যাস কর......।"

গণেশও প্রেসিডেন্সী জেল থেকে পালাবার কাজে জুলুদার সাহায্য চেয়েছিল। জুলুদা তাকেও নিরস্ত করেছেন।

পালাবার ব্যবস্থা আর করা গেল না। কিন্তু পুলিশের সঙ্গে সদ্ভাব রাখলাম। চিরদিন তো আর মিথ্যে দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যায় না। কাজেই অন্য নানারকম পথ বার করতে হ'ল। সে সব আরও পরের ঘটনা—পরের জন্যই তোলা রইল। মোট কথা আমি যেন পুলিশের পক্ষেই কাজ করে যাচ্ছি—এই ভাবটা বজায় রাখতে হ'ল। পুলিশের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা হওয়ার ফলে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে, তাদের নাকের ডগায় বসে আমরা সাত বছর পরে ১৯৩০ সালে সশস্ত্র আক্রমণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলাম। এ সময় জেলের মধ্যে বিপ্লবী-জীবনের এই অধ্যায়ের অভিজ্ঞতাগুলি যদি না হোত তবে জানি না চট্টগ্রামে সশস্ত্র আক্রমণ চালাবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের দল মুক্ত ও অক্ষত থাকতে পারত কি না!

জেলে বিভিন্ন পার্টির সদস্যদের মধ্যে একদিকে তরুণদের নিয়ে এবং অন্যদিকে অভিজ্ঞ নেতাদের নিয়ে সংযুক্ত দল গঠনের প্রচেষ্টা চলতে লাগল। জেলে এই মিলনের বীজ রোপণ করা হয়েছিল—জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তা' অঙ্কুরিত হল। একদিকে নবগঠিত সংযুক্ত তরুণ দল—অন্যদিকে বিজ্ঞ নেতাদের সম্মিলিত দল—দুই-ই আত্মপ্রকাশ করল।

জেলে আমাকে বহুসংখ্যক রাজবন্দীর সঙ্গে একত্রে থাকবার সুযোগ দেওয়া হোত না। এতে সুবিধে এই হ'ল যে, এই সময় আমি নির্জনে পড়াশুনা ও বিপ্লবী-জীবন সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করবার অবকাশ পেলাম।

'পড়াশুনা' বা 'গভীর চিন্তা' করবার কথা উল্লেখ করে আমি পাঠকবর্গকে আমার জ্ঞানের সীমিত গণ্ডী সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে চাই না।

প্রথমবার জেলে আমি লেখাপড়া করেছি খুবই সামান্য। যেটুকু পড়েছি বা চিন্তা করেছি, তা' আমার আশু বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যকে সফল করবার চেষ্টাতেই নিবন্ধ ছিল। জেলে আসবার আগে Rowlet Committee-র Report পড়েছি বা চোখ বুলিয়ে দেখেছি। তখন পড়েছিলাম বীরত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি জানতে ও অন্তরে বিপ্লবী প্রেরণা জাগাতে, কিন্তু জেলে বসে যখন Rowlet Committee-র Report কোনমতে যোগাড় করে পড়লাম, তখন তা' পড়েছি একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। স্বদেশপ্রেম ও বিক্রমই শুধু জানবার বস্তু নয়। যদি বিপ্লবী পরিকল্পনাকে জয়যুক্ত করতে হয়, তবে আমায় জানতে হবে বিশ্বাসঘাতকতা, পরাজয় ও বিফলতার ইতিহাস, এবং সেই সব অক্ষমতাব মূল কারণ কোথায়?

আজ পর্যন্ত বহু বন্ধু-বান্ধব অতি আগ্রহের সঙ্গে আমাকে বলেছেন যে, তাঁরা আমাদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে চান কি বিশেষ পদ্ধতিতে আমরা সংগঠন করেছিলাম যাতে অন্তত প্রথম পর্যায়ে, পূর্ণ সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। অগ্নিযুগের যে অধ্যায়ের সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম তার কথাই লিখে যাব বলে স্থির করেছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমি নিষ্ঠার সঙ্গে কেবলমাত্র আমার পরিচিত অংশটুকুই লেখার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে বাঙ্গলার ও ভারতের অতীত বিপ্লবী কার্যকলাপ সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা আমার পক্ষে অহেতুক হস্তক্ষেপ। কিন্তু অতীত বিপ্লবী কার্যকলাপ আমি কি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখেছিলাম—সেই সব বিশ্লেষণ করে দেখার পর আমার নিজ চিন্তাধারার মধ্যে যে আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল, সেই মূল প্রতিপাদ্য বিষয় একেবারে আমার নিজস্ব। সেইহেতু, যদিও সেইসব তথ্য আমার প্রত্যক্ষভাবে জানবার কথা নয়, তবু প্রাসঙ্গিকভাবে ঘটনাগুলির উল্লেখ করতে হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য ঘটনাগুলির উল্লেখ বা পুনরাবৃত্তি করা নয়। প্রধান বক্তব্য, সেই সব ঘটনার মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতার যে নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস রয়েছে তার মূল সূত্র উদ্ধার করা। গুপ্তচরদের প্রবেশপথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দুর্ভেদ্য ও শক্তিশালী বৈপ্লবিক সংগঠন গড়বার শিক্ষা যদি গ্রহণ করতে না পারি তবে বিপ্লবের সাধু ইচ্ছা স্বপ্নই থাকবে—বাস্তবে পরিণত হবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বাঙ্গলার ও ভারতের বিভিন্ন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার শোচনীয় পরিণতির মূলে বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্ত কি ভাবে কাজ করেছে এবং ভবিষ্যতে আমরা কি ভাবে গুপ্তচর ও দলের বিভীষণদের হাত থেকে রক্ষা পাব সেই বিষয়ে আমি রীতিমত research (গবেষণা) করেছি। সেই গবেষণার ফল ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে, আমাদের যুব-বিদ্রোহকে সফল করতে সাহায্য করেছে। এই ঐতিহাসিক গবেষণা ও শিক্ষার back ground (পটভূমি) যদি আমি বাদ দিয়ে যাই তবে আমার সীমিত ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণ হবে না বলেই খুব সংক্ষেপে, প্রাসঙ্গিক ভাবে এইসব বৈপ্লবিক ঘটনার তথ্য লিখলাম।

যে অধ্যায়টির সঙ্গে আমি যুক্ত, সেই অধ্যায়ের রচনা সম্ভব হওয়ার মূল কারণ—আমরা কেবল অতীত বিপ্লবী যুগের সফলতা নিয়েই গর্ব করিনি। বিপ্লবী পরিকল্পনা সফল করবার জন্য অতীত নিষ্ফলতার মূল

কারণগুলিও বিশ্লেষণ করে বুঝতে চেষ্টা করেছি। বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতকার্যতার চিত্রটি বিশেষ করে পরবর্তী কয়েকটি পাতায় পাওয়া যাবে।

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস, বিভিন্ন আয়োজন ও প্রস্তুতি, অন্তর্দলীয় দ্বন্দ্ব এবং বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পুলিশের কাছে তা' প্রকাশ হয়ে পড়া—এইগুলিই আমার চিন্তা ও পাঠ্য বিষয় ছিল। আমি এই সময় ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি বিপ্লবী প্রচেষ্টা সম্বন্ধে চিন্তা করেছি এবং বিশেষ মনোযোগ সহকারে গবেষণা করেছি। নিম্নে যে সব ঘটনার উল্লেখ করছি তা সরকার-পক্ষীয় রিপোর্ট থেকে সংগৃহীত। তথ্যাদি দু'ভাগে লিপিবদ্ধ করা আছে। প্রথম ভাগে কেবল বাঙ্গলা দেশের ঘটনাগুলির ধারাবাহিক বিবরণ; দ্বিতীয় ভাগে—বাঙ্গলার বাইরে, সারা ভারত জুড়ে প্রায় একই সময়ে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল সংক্ষেপে তারই বর্ণনা। প্রথম ভাগে বাঙ্গলার রিপোর্ট শেষ করে আবার ভারতের রিপোর্ট আরম্ভ করা হয়েছে বলে সন ও তারিখ গোলমেলে মনে হয়। বাঙ্গলা ও ভারতের দু'টি রিপোর্টই আলাদা—এইটুকু লক্ষ্য রাখলে কোন ভ্রান্ত ধারণা হবে না।

তথ্যগুলি মোটামুটি এইরূপ—

(১) ১৯০৭—৮ সালে কংগ্রেসের চরমপন্থীরা পুরোভাগে এসে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে সরকার-বিরোধী কর্মপন্থা সমর্থন করলেন। পুলিশ সন্ত্রাস সৃষ্টির গোপন প্রস্তুতি অনুমান করে পূর্বাহ্ণেই সতর্কতা অবলম্বনের জন্য শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, পুলিন দাস এবং অন্যান্য কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে ১৯০৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুযায়ী আটক করে রাখে।

আমার মনে এই প্রশ্নের উদয় হল যে বাইরে যার কোন প্রকাশ দেখা গেল না, সেই অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বিদ্রোহের আয়োজন সম্বন্ধে এত বিস্তারিত এবং নির্ভরযোগ্য সংবাদ কি করে পুলিশের কাছে পৌঁছল?

(২) ৬-১২-১৯০৭ মেদিনীপুর যাবার পথে নারায়ণগড়ে বাংলার গভর্নরের স্পেশাল ট্রেন ধ্বংস করবার নিষ্ফল প্রচেষ্টা হয়।

(৩) ২৩-১২-১৯০৭ গোয়ালন্দে ঢাকার জেলা-শাসক বি, সি, অ্যালেনকে গুলী করা হয়।

(৪) এর অব্যবহিত পরেই মিঃ হিকেন নামে কুষ্ঠিয়ার এক খৃষ্টান যাজককে গুলী করা হয়।

(৫) ১১-৪-১৯০৮ চন্দননগরের মেয়রের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যের জন্য তাঁর বাড়ীতে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

(৬) কলকাতার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ড, সুশীল সেন নামে একজন ছাত্রকে বেত্রাঘাত করেন। তাঁকে মজঃফরপুরে বদলী করা হয়। ৩০-৪-১৯০৮ তারিখে ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্ল চাকী তাঁর গাড়িতে বোমা ছোঁড়ে। দুজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা কিংসফোর্ডের পরিবর্তে সেই গাড়িতে যাচ্ছিলেন—তাঁরা নিহত হন। বন্দী হবার আগেই প্রফুল্ল আত্মহত্যা করে—ক্ষুদিরামের মৃত্যুদণ্ড হয়।

(৭) ২-৫-১৯০৮ মাণিকতলায় একটি বোমা-কারখানা আবিষ্কৃত হয়। প্রচুর বোমা, রাইফেল ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলা-বারুদ পাওয়া যায়

সেখানে। শ্রীঅরবিন্দ, বারীন ঘোষ এবং অন্যান্য কয়েকজনকে জড়িয়ে প্রথম আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। পরে অরবিন্দ মুক্তি পেলেন।

পুলিশ কেমন করে এই বোমা-কারখানার সংবাদ জানতে পেল? এ বিষয়েও গভীর চিন্তা করলাম।

(৮) ২-৬-১৯০৮ ঢাকায় 'বরা' নামক গ্রামে এক রাজনৈতিক ডাকাতিতে বিপ্লবীদের হাতে চারজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়।

(৯) ৩০-১০-১৯০৮ নড়িয়াতে অনুরূপ ডাকাতি হয়। পুলিশ রিপোর্টে দেখা যায় যে, এ দুটোই ঢাকা অনুশীলন পার্টির কাজ।

(১০) ৬-১০-১৯০৮ কলকাতায় ওভারটুন হলের সভায় গভর্নর স্যার অ্যানড্রু ফ্রেজারকে বিপ্লবী যুবক যতীন্দ্র হত্যা করবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

(১১) অক্টোবর, ১৯০৮ জেলের মধ্যে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে কানাইলাল ও সত্যেন বসু হত্যা করেন। এ'রা তিনজনেই আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন।

(১২) ৯-১১-১৯০৮ প্রফুল্ল চাকীকে বন্দী করতে সাহায্য করেছিল যে নন্দলাল বসু—তাকে কলকাতায় সার্পেন্টাইন লেনে হত্যা করা হয়।

(১৩) ২৪-১-১৯১০ হাইকোর্টের কাছে ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সামসুল আলামকে গুলী করে হত্যা করে বীরেন গুপ্ত; সামসুল আলিপুরে ষড়যন্ত্র মামলার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিল।

(১৪) জানুয়ারী, ১৯০৯, গভর্নমেন্ট বিপ্লবীদের নিম্নলিখিত সংগঠনগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করে—

(ক) অনুশীলন সমিতি, ঢাকা।

(খ) বান্ধব সমিতি, বরিশাল।

(গ) ব্রতী সমিতি, ফরিদপুর।

(ঘ) সাধনা সমিতি, ময়মনসিং।

(ঙ) সুহৃদ সমিতি, ময়মনসিং।

এই সমিতিগুলি বে-আইনী ঘোষিত হবার পরেই ফরিদপুরের প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় নিহত হ'ল।

(১৫) ১০-১২-১৯০৯ পাব্লিক প্রোসিকিউটর, আশুতোষ বিশ্বাস, গুলীর আঘাতে নিহত হন। তিনি অরবিন্দ, বারীন ঘোষ, কানাইলাল প্রমুখের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করছিলেন।

(১৬) গভর্নমেন্ট তিনটি ষড়যন্ত্র মামলা চালাতে সুরু করল—

(ক) হলুদবাড়ীতে (খ) হাওড়ায় (গ) ঢাকায়।

১৯১০ সালে সরকার "প্রেস-আইন" চালু করল। এরপর সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্রিয় হয়ে উঠল বিপ্লবীরা। দেশ-বিরোধী কাজের জন্য পর পর কয়েকজন নিহত হ'ল—

(১) শ্রীশ চক্রবর্তী, কলকাতা—একজন বিশ্বাসঘাতক।

(২) মোহন দে, রাউথভোগ-ঢাকা—একজন বিশ্বাসঘাতক।

(৩) রাজকুমার, ময়মনসিং—সাব-ইনস্পেক্টর।

(৪) মনোমোহন ঘোষ, বরিশাল—ইনস্পেক্টর।

(৫) সোমারগঞ্জ, ঢাকাতে আরও তিনজন বিশ্বাসঘাতক।

(৬) সারদাচরণ চক্রবর্তী, নোয়াখালি—দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতক।

এখানে দেখা যাচ্ছে সরকার তিনটি ষড়যন্ত্রের মামলা সুরু করল ও "প্রেস-আইন" চালু করল। এর বিরুদ্ধে বাঙ্গলার বিপ্লবী সমিতিগুলি বিশ্বাসঘাতকদের হত্যা করার জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম নিল। যেরূপ ব্যাপকভাবে বিশ্বাসঘাতকদের হত্যা করা হ'ল তাতে ধরে নেওয়া যায় ভবিষ্যৎ বিভীষণদের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। তবু আমার মনে হ'ল—এই উপায়েই কি ভবিষ্যৎ বিশ্বাসহন্তাদের দেশদ্রোহিতা হতে নিবৃত্ত করা যাবে? বিভীষণদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন প্রাণের ভয়ে ঐরূপ জঘন্য কাজ থেকে বিরত হবে—তেমনি আবার আরো অনেকে কি অতিরিক্ত সতর্কতা ও তীক্ষ্ন বুদ্ধি নিয়ে সাবধানতা ও ধূর্ততার সঙ্গে প্রতারণা করার পদ্ধতি অনুসরণ করবে না? এই সব চিন্তায় আমার মন গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছিল। মনে হচ্ছিল বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারকদের জন্য মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র উপযুক্ত প্রতিশোধক নয়। দলের সক্রিয় বৈপ্লবিক পরিকল্পনার মৃত্যু ঘটাবার পর বিশ্বাসঘাতকদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থাই করতে হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই—কিন্তু তাতে তাদের নির্মূল করে সাফল্যের সঙ্গে বৈপ্লবিক কার্য ও সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ চালাবার প্রয়োজন মিটছে কি?

অনেক বিচার বিশ্লেষণের পর আমি এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, কাজ পণ্ড হওয়ার পর বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি চরম শাস্তি প্রয়োগ করা ভবিষ্যৎ বিশ্বাসঘাতকতা প্রতিরোধের পক্ষে যথেষ্ট নয়। 'আমাদের পরিকল্পনা আগে পণ্ড হোক্ তারপর বিশ্বাসঘাতকদের হত্যা করব'—বিপ্লবী সঙ্ঘে এই প্রোগ্রামের যদি পুনরাবৃত্তি হতে থাকে তাহলে 'কাজ একটা হয় বটে' কিন্তু বিপ্লবের পথে সত্যিকারের জয়যাত্রা কখনও অব্যাহত থাকতে পারে না। সেইজন্য যদি "সফলতা অর্জন" আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে সভ্য গ্রহণ করার সময়েই কঠোর নীতি অনুসরণ করতে হবে, গুপ্তচরদের অস্তিত্ব আগে থেকেই খুঁজে পেতে হবে: বিশ্বাসঘাতকদের পরিচয় পেয়ে তাদের বিপথে পরিচালিত করে পুলিশের চক্রান্তকে ব্যর্থ করতে হবে—তারপর সর্বশেষে অপরাধীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড!

এখন পর পর ঘটনাগুলির বর্ণনা আরম্ভ করি—

(১৭) মেদিনীপুরে বোমা-মামলার সময় পুলিশের একজন সক্রিয় গুপ্তচরকে হত্যা করার চেষ্টা হয়, কিন্তু সে কোনমতে রক্ষা পায়।

(১৮) ২৪-৯-১১ ঢাকায় হেড কনেস্টবল মতিলাল রায়কে গুলী করে হত্যা করা হয়।

(১৯) ২৯-৯-১৩ কলকাতায় কলেজ-স্কোয়ারে প্রহরারত অবস্থায় হেড কনেস্টবল হরিপদ দেব নিহত হয়।

(২০) ৩০-৯-১৩ ময়মনসিংহের ইনস্পেক্টর বঙ্কিম চৌধুরী গুলীর আঘাতে নিহত হয়।

(২১) বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় বারজন আসামী স্টেটমেন্ট দেয় ও স্বীকারোক্তি করে।

এই শেষোক্ত বিষয়টি আমার বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। কিভাবে

এই সমস্ত সম্ভাবিত স্বীকারোক্তির প্রতিকার করা যায়? আগে থেকে কি কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়?

(২২) কলকাতায় রাজাবাজারে একটি বোমা-কারখানা আবিষ্কৃত হয়। ঢাকার অমৃতলাল হাজরা দণ্ডিত হন। আমার চন্দ্রশেখর কাকা এই মামলার একজন আসামী ছিলেন।

(২৩) ১৯-৬-১৪ পুলিশের গুপ্তচর সত্যেন সেন নিহত হয়।

(২৪) ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হয়। যুদ্ধের পর গভর্নমেন্ট "হোমরুল" দান করবে—এই আশায় কংগ্রেস সমস্ত সরকার-বিরোধী কর্মসূচী বন্ধ করে দিল। কিন্তু বিপ্লবীরা এই সুযোগ গ্রহণ করল।

২৬-৮-১৯১৪ কলকাতায় রডা এণ্ড কোম্পানী নামক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পঞ্চাশটি মসার পিস্তল এবং ৪৬,০০০ রাউণ্ড কার্তুজ সরিয়ে ফেলা হ'ল।

(২৫) ২৫-১১-১৪ বসন্ত চ্যাটার্জীকে দ্বিতীয়বার হত্যা করবার চেষ্টার ফলে সুরু হল মুসলমানপাড়া বোমা-মামলা।

(২৬) ১৯১৪ সালে কলকাতায় শোভাবাজার স্ট্রীটে ইনস্পেক্টর নৃপেন্দ্র ঘোষকে গুলী করে হত্যা করা হয়।

(২৭) ১৯১৫ সালে নির্দয় হস্তে, বিপ্লবী কার্যকলাপ দমন করবার জন্য গভর্নমেন্ট 'ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' পাশ করে। বিপ্লবীরাও সরকারের এই দমননীতির সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রত হয়। নতুন শক্তি নিয়ে তারা আবার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। ১২-৫-১৫ তারিখে বার্ড কোম্পানী থেকে ২০,০০০ টাকা লুণ্ঠিত হয়। গার্ডেনরীচে কোম্পানীর ট্যাক্সি থামিয়ে লুণ্ঠনকারীরা টাকা নিয়ে সরে পড়ে।

(২৮) ২২-২-১৫ কলকাতা বেলেঘাটায় একজন চাল ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

(২৯) ২৪-২-১৫ কলকাতা পাথুরেঘাটায় নীরদ হালদার নিহত হয়।

(৩০) ২৮-২-১৫ কলকাতায় কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে চিত্তপ্রিয়কে বন্দী করতে উদ্যত ইনস্পেক্টর সুরেশচন্দ্র মুখার্জী গুলীর আঘাতে নিহত হয়।

(৩১) ২৫-৮-১৫—২৪ পরগনার একজন পুলিশের দালাল—মুরারি-মোহন মিত্র নিহত হয়।

(৩২) ৩-৩-১৫—কুমিল্লা জেলা-স্কুলের হেডমাস্টার শরৎকুমার বসু তাঁর গুপ্তচরবৃত্তির জন্য নিহত হন।

(৩৩) ২১-১০-১৫ কলকাতায় মসজিদবাড়ী স্ট্রীটের একটি বাড়ীতে রায় সতীশচন্দ্র ব্যানার্জী বাহাদুর ও-বি-ই, এস-পি-কে হত্যা করবার চেষ্টা হয়। তিনি কোনমতে পালিয়ে যান, কিন্তু তাঁর একজন সঙ্গী নিহত ও অপরজন আহত হয়।

(৩৪) ৩০-১১-১৫—কলিকাতার ৭৭, সার্পেণ্টাইন লেনে একজন কনেস্টবল নিহত হয়।

(৩৫) ১০-১০-১৫ ময়মনসিংহে ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট যতীন্দ্র-মোহন ঘোষ নিহত হন।

(৩৬) ১৯-১২-১৫—ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস নামক একজন পুলিশ গুপ্তচর নিহত হয়।

(৩৭) ১৯১৫ সালে বাংলায় কয়েকজন বিপ্লবী নেতার প্রচেষ্টায় একটি ইন্দো-জার্মান প্ল্যান করা হয়। এ'দের মধ্যে ছিলেন যতীন মুখার্জী, এম, এন, রায়, যাদুগোপাল মুখার্জী, হেরম্বলাল গুপ্ত, অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, অবনী মুখার্জী, হরিকুমার চক্রবর্তী এবং যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী ও অন্যান্য কয়েকজন।

জার্মানদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে একটা ব্যবস্থা করে ইউরোপ থেকে ফিরে এলেন যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী। আরও কিছু ব্যবস্থার জন্য এম, এন, রায় গেলেন বাটাভিয়াতে। সেখানে তিনি ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন—মিঃ মার্টিন। একই উদ্দেশ্যে অবনী মুখার্জী গেলেন জাপানে। বাটাভিয়াতে মিঃ থিয়োডোর হেল্‌ফেরিক্‌ নামে একজন জার্মান অফিসারের সঙ্গে দেখা করলেন এম, এন, রায়। সেই জার্মানটি তাঁকে বললেন যে, ৩০,০০০ রাইফেল এবং প্রতিটি রাইফেলের জন্য ৪০০ রাউন্ড কার্তুজ নিয়ে 'মেভারিক্‌' জাহাজ রওনা হয়ে গেছে। সেই জাহাজটির করাচীতে পৌঁছবার কথা। এম, এন, রায় তাঁকে অনুরোধ করলেন জাহাজটিকে যেন নির্দেশ দেওয়া হয় বাংলার উপকূলে বালাসোরের দিকে যেতে। জার্মান অফিসার রাজী হলেন।

জুন মাসে এম, এন, রায় দেশে এলেন যতীন মুখার্জীর সঙ্গে সর্বশেষ ব্যবস্থা করতে। স্থির হল সুন্দরবনে রায়মঙ্গল নামক জায়গায় জাহাজ থেকে অস্ত্রগুলি নামিয়ে নেওয়া হবে। অন্যান্য নেতারা যতীন মুখার্জীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে, নিম্নলিখিত বিভিন্ন জায়গাগুলিতে জাহাজ থেকে অস্ত্র বিলি করা হবে—

(১) হাতিয়া—পূর্ববঙ্গের জন্য।

(২) রায়মঙ্গল—পশ্চিমবঙ্গের জন্য।

(৩) বালাসোর।

রায়মঙ্গলে জাহাজটি ভিড়বার কথা ১৯১৫ সালের ১লা জুলাই। বালাসোরের জঙ্গলে চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন এবং জ্যোতিষ—এই চারজন সেনাপতি সহ বীর সেনাধ্যক্ষ যতীন মুখার্জী পনেরো দিন ধরে অপেক্ষা করলেন। কিন্তু 'মেভারিক' কোনদিনই বালাসোরের উপকূল স্পর্শ করল না।

ভারতের বিপ্লবীদের সাহায্য করবার জন্য জার্মান-অস্ত্র জলপথে বালাসোরের জঙ্গলে পৌঁছল না; কিন্তু বৃটিশ পুলিশ অফিসার চার্লস টেগার্ট স্থলপথে সেখানে হাজির হলেন তাঁর মিলিটারী এবং পুলিশবাহিনী নিয়ে। মুখোমুখি যুদ্ধ করলেন বীর বিপ্লবী বাঘা যতীন এবং তাঁর যোগ্য সহকর্মীরা। যতীন মুখার্জী ও চিত্তপ্রিয় যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। নীরেন এবং মনোরঞ্জনকে ফাঁসি দেওয়া হ'ল। জ্যোতিষের হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

এত বড় একটা আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা কত সহজেই না দমন করা হ'ল! এই ঘটনা আমাদের ভবিষ্যৎ বিপ্লবী কর্মসূচী নির্ধারণে বিশেষ আলোকপাত করেছিল।

পুলিশের গোপন রিপোর্টে লেখা আছে—

"......বাংলার বিপ্লবের ইতিহাসে পরবর্তী প্রধান ঘটনা হইল ১৯১৫ সালে ভারতবর্ষে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করিবার জন্য ইন্দো-জার্মান চক্রান্ত। এই চক্রান্তটি সাফল্যের সঙ্গে ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হয়.........।"

এই চক্রান্ত ব্যর্থ করতে বৃটিশ শক্তিকে সাহায্য করল কে বা কারা? এই প্রশ্নটি আমার বিশেষ চিন্তার বিষয় ছিল। আমি বুঝেছিলাম সূচনাতেই যদি চিন্তা ভুল পথে পরিচালিত হয় তবে সিদ্ধান্তও ভুলই হবে। তাই আরম্ভেই ভুল পথে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ চালিয়ে যেতে আমি আমার মনকে বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দিই নি। দলের নিম্নস্তরের কারো সম্বন্ধে অনুসন্ধানের আগ্রহ আমার একটুও ছিল না—কারণ তার প্রয়োজন অতি সামান্যই। এতবড় বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র—যা সমস্ত নেতৃস্থানীয় দলপতি-দের প্রত্যক্ষ তদারকে ও নির্দেশে পরিচালিত হওয়ার কথা, তাদের মধ্যে যদি কেউ বা ক'একজন প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা না করে তবে এইরূপ শোচনীয় পরিণতি হতে পারে না। কানাইলাল, ক্ষুদি-রামের মত যুবকদের হাতে যদি এই ভার থাকত তবে হয়ত বিপ্লবীদের এতবড় সর্বনাশ হত না। বয়স্ক নেতাদের পক্ষে সংসারের প্রলোভনে আসক্ত হওয়া যতখানি সহজ—তরুণ বিপ্লবীদের পক্ষে সংসারের প্রতি ততখানি আসক্তি কখনই সম্ভব নয়। প্রবীণ ও প্রধান নেতাদের সম্বন্ধেই বেশী সজাগ থাকা প্রয়োজন, কারণ, তাঁদের হাতেই দলের সর্বস্ব ন্যস্ত—তাঁরা ইচ্ছে করলেই সহজে সমূহ সর্বনাশ ঘটাতে পারেন। কোন একজন লোক কোনকালে বিপ্লবী ছিল বলেই সে যে আবহমান কাল বিপ্লবী থাকবেই এই convention মন থেকে বাদ দিতে হবে। কঠোর পরীক্ষা করে, নেতা বেছে নিতে হবে। তাঁর দায়িত্বের ওপরেই সংগঠনের অস্তিত্ব সবচেয়ে বেশী নির্ভর করে। তাই নামে তিনি যত বড় নেতাই হোন না কেন—তাঁকে বিশ্বাস করে নেতৃত্বপদে বরণ করবার আগে কঠিনভাবে পরীক্ষা করতে হবে; এই ব্যাপারে কোন compromise বা আপোষ চলবে না।

১৯১৬-১৭ সালে গভর্নমেন্ট বিপ্লবীদের দমন করার জন্য 'ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের' যথেচ্ছ প্রয়োগ সুরু করল। তা সত্ত্বেও আন্দোলনের মূল উৎপাটন করতে সক্ষম হ'ল না। পূর্ব-বর্ণিত ঘটনার অনুরূপ বিপ্লবী কার্যকলাপ ঘটেই চলল—

(৩৮) ১৬-১-১৬—কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সামনে সাব-ইন্‌-স্পেক্টর মধুসূদন ভট্টাচার্য নিহত হয়।

(৩৯) ৩০-৬-১৬—ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (আই-বি) বসন্তকুমার চ্যাটার্জীকে অফিস থেকে ফিরবার পথে গুলী করে হত্যা করা হয়।

একমাত্র বাংলাদেশে ১৯০৬—১৬ সালে, দশ বছরের মধ্যে ২১টি ঘটনা ঘটল। ১০১টি প্রচেষ্টা পুলিশ পূর্বাহ্ণে খবর পেয়ে প্রতিরোধ করে—পুলিশের রিপোর্টে এই কথা লেখা আছে। আরও লেখা আছে যে এইসব কাজের সঙ্গে ১,৩০৮ জন লোক জড়িত ছিল। কিন্তু ৩০টি মামলায় মাত্র ৮৪ জন দণ্ডিত হয়। দশটি ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯২ ব্যক্তিকে জড়িত করা হয়, তাদের মধ্যে ৬৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ৮২ জন

লোককে 'ক্রিমিন্যাল ল অ্যামেণ্ডমেন্ট' অনুসারে এবং ৫৮ জনকে 'আর্মস্ অ্যাক্ট' এবং 'এক্সপ্লোসিভ সাবস্ট্যান্স অ্যাক্ট' অনুসারে দণ্ড দেওয়া হয়। বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়—পুলিশ দশ বৎসরের বিবরণ দিয়ে গর্ব করে বলছে যে তারা পূর্বাহ্ণে খবর পেয়ে ১০১টি বিপ্লবী প্রচেষ্টা প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছে। বিপ্লবীরা মাত্র ২১টি ঘটনায় সাফল্যের কৃতিত্বের ভাগী। এই ১০১টি ঘটনায় বিশ্বাসঘাতকদের অস্তিত্ব কোথায়? তারাই তো বাংলা-দেশের সব বিপ্লবী সংগঠনে ছড়িয়ে আছে! কাকে সন্দেহ করব? কাকে বাদ দেব? এই বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করে ভাবী বিপ্লবী সংগঠন তৈরী করা চলে না। এই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে যে আদর্শ সংগঠন আমাদের গড়ে তুলতে হবে তার এক সুসম্পূর্ণ চিত্র আমার মনে ভেসে উঠ্‌ল।

বাংলা এবং ভারতের বিপ্লবী শক্তিকে দমন করবার জন্য গভর্নমেন্ট যে সব উপায় অবলম্বন করে তা সংক্ষেপে এই—

(১) ১৯০৭ সালে সরকার-বিরোধী সভা নিবারণ আইন (৬নং আইন) পাশ করে পত্রিকাগুলিতে এই সব সভার বিবরণ প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হ'ল।

(২) ১৯০৮-'বিস্ফোরক দ্রব্য আইন'।

(৩) ১৯০৮—'সংবাদপত্রে অপরাধ প্রেরণা দেওয়া আইন'।

(৪) ১৯০৮—'ভারতীয় অপরাধ বিধি সংশোধন আইন' (১৪নং আইন) —এই আইনে জুরী ব্যতীত তিনজন বিচারক দ্বারা হাইকোর্টের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়।

(৫) ১৯১০—'ভারতীয় প্রেস আইন'—সংবাদপত্রকে আয়ত্তে রাখার জন্য।

(৬) ১৯১১-'সরকার-বিরোধী সভা নিবারণ আইন'।

(৭) ১৯১৩ 'ভারতীয় অপরাধ বিধি সংশোধন আইন'।

১৯১২ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জের জীবনের উপর আক্রমণের পর এই আইন পাশ করা হয়। এই আইন অনুসারে অপরাধ সংঘটিত না হলেও অপরাধের প্রচেষ্টাই দণ্ডনীয় বলে গণ্য হবে।

(৮) ১৯১৫—'ভারতরক্ষা আইন' পাশ হয় স্যার রেজিন্যাল্ড ক্র্যাডকের চেষ্টায়। এই আইন অনুসারে অপরাধে দণ্ডদান এবং অপরাধ নিবারণ—দুই-ই সম্ভব।

এইসব দমনমূলক আইন জারী করে সরকার তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে রাজদ্রোহীদের সমূলে বিনাশ করতে চাইল। কিন্তু শত ভ্রূকুটিতেও ব্যাহত হল না দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ বিপ্লবীদের কর্মধারা।

(৪০) ৯-১-১৭—পুলিশ 'গোপনে সংবাদ পেয়ে' আসামে গৌহাটিতে একটি বাড়ী ঘিরে ফেলে বিপ্লবী নলিনী বাগচীকে বন্দী করবার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ ধরে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার হয় দু'পক্ষেই। কয়েকজন আহত ও বন্দী হয়। অল্প কয়েকজন সহ নলিনী বাগচী পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে পলায়নে সক্ষম হন।

(৪১) ১৯১৭—পার্টি পরিত্যাগ করায় সিরাজগঞ্জে রেবতী নাগ নিহত

হয়। পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, "নীতিভ্রষ্ট হওয়ায় রেবতী তার সহকর্মীদের দ্বারা নিহত হয়।"

(৪২) আবার 'গোপনে সংবাদ পেয়ে' পুলিশ ঢাকায় ফালতাবাজারে একটি বাড়ীতে হানা দিয়ে নলিনী বাগচী এবং তারিণী মজুমদারকে বন্দী করতে যায়। এ'রা দুজন আত্মসমর্পণ করতে রাজী হন নি।......লড়াই-এ গুরুতর আহত হয়ে মারা যান তারিণী।

বাংলায় এই বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অন্যত্রও অনুরূপ ঘটনা ঘটতে থাকে। বাংলাদেশের বৈপ্লবিক ঘটনার বিবরণ আগেই ধারাবাহিক ভাবে দেওয়া হয়েছে। সেগুলির সঙ্গে ভারতের অন্যান্য ঘটনাবলী একত্রিত না করে এখানে পৃথক ভাবে দেওয়া গেল। কাজেই এখানে বাঙলার ১৯১৭ সালের ঘটনাবলীর উল্লেখের পর আবার ১৯০৯ সাল থেকে বাঙলার বাইরে, সমগ্র ভারতের ঘটনার বিবরণী থেকে রিপোর্টটি সুরু হল।

(৪৩) ১-৭-১৯০৯- মদনলাল ধিঙরা নামে লন্ডনে ইন্ডিয়া হাউসের একজন সভ্য ঐ অফিসের রাজনৈতিক এ. ডি. সি. কর্নেল স্যার উইলিয়াম কার্জন উইলিকে হত্যা করে।

(৪৪) ১৯০৯—আমেদাবাদ সফরের সময় ভারতের ভাইসরয় লর্ড মিন্টো এবং তাঁর পত্নীর প্রতি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু বোমাটি না ফাটায় তাঁরা বেঁচে যান।

(৪৫) ২১-১২-১৯০৯– নাসিকের জেলা-শাসক মিঃ জ্যাকসন তাঁর বিদায়সম্বর্ধনা সভায় গুলীর আঘাতে নিহত হন। ভারত থেকে বিদায় নিতে গিয়ে তিনি জগৎ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন। নাসিক-ষড়যন্ত্র মামলা সুরু হয়। সাতাশজন দণ্ড লাভ করে, তিনজনের মৃত্যুদন্ড হয়।

(৪৬) ডিসেম্বর, ১৯১২- দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। তিনি বেঁচে যান, তাঁর আর্দালি মারা যায়।

(৪৭) ১৯১২—লাহোর লরেন্স পার্কে একটি বোমা-বিস্ফোরণে একজন পুলিশ গুপ্তচর মারা যায়। দিল্লী-ষড়যন্ত্র মামলা সুরু হয়। বিচার শেষে আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ এবং বসন্তকুমার বিশ্বাসের ফাঁসি হয়।

(৪৮) চন্দননগরের রাসবিহারী বসু এবং তাঁর সুযোগ্য সহকর্মী, মারাঠা যুবক বিষ্ণুগণেশ পিংলে, ভারতীয় সিপাইদের সাহায্যে বিদ্রোহ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। বিদ্রোহী শিখ সৈন্যরা আমেরিকা থেকে ফিরছিল 'কোমা-গাতামারু' জাহাজে করে। তারা রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগ দিল। পিংলে এবং রাসবিহারী বসু পরামর্শ করে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলে যুগপৎ আক্রমণের দিন স্থির করলেন ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫।

পুলিশ রিপোর্টে আছে ঃ

".........স্থির হয় যে, যখন ভারতের সর্বত্র সিপাহীরা বিদ্রোহ আরম্ভ করিবে তখন বাংলার সন্ত্রাসবাদীরা ট্রেজারী আক্রমণ করিবে—অর্থ এবং রাইফেল একসঙ্গে অপহরণ করিবে। কিন্তু পুলিশ ইহাদের সহিত সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিল। ষড়যন্ত্রের কথা পূর্বাহ্নে উদ্ঘাটিত হইল। মীরাটে বোমার বাক্স-সহ পিংলে বন্দী হয়। তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইল।"

এই ঘটনাটিও ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং চিন্তনীয় বিষয়। বিপ্লবীদের এই সামগ্রিক প্রচেষ্টার গোপনীয়তা রক্ষা না হওয়ার কারণ ষড়যন্ত্র-কেন্দ্রের প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে কারও বিশ্বাসঘাতকতা। জেলে বসে এইসব বিষয় চিন্তা করে স্থির করলাম পরবর্তী প্রোগ্রাম যাই নিই না কেন তার সামান্যতম অংশকেও সফল করতে হলে সংগঠন থেকে বিশ্বাসভঙ্গের সম্ভাবনা সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। সংগঠনে পুলিশের গুপ্তচরের অনুপ্রবেশ যাতে কোনমতেই না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

(৪৯) ১৯০৮ সালে বেনারসে শচীন সান্যাল 'অনুশীলন সমিতি' গঠন করলেন। পরে এর নাম হয় 'যুবক-সমিতি'। ১৯০৮—১৯১৩ পর্যন্ত এদের কাজ ভালভাবেই চলে। ১৯১৪ সাল থেকে এরা কলকাতার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করতে থাকে। ১৯১৪ সালে দিল্লী-ষড়যন্ত্র মামলার আত্মগোপনকারী বিপ্লবী—রাসবিহারী বসু, বেনারসে এসে এই দলের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। শচীন সান্যাল এবং পিঙলে পাঞ্জাবে গিয়ে পাঞ্জাব গদর পার্টির সঙ্গে যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। রাসবিহারী বসু জাপানে চলে যান। শচীন এবং নগেন্দ্র বেনারসেই কাজ করতে থাকে। কোন একটা ষড়যন্ত্র মামলায় তারাও দণ্ডিত হয়। নগেন জেলেই মারা যায়। মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্মের সময় রাজবন্দীদের দণ্ডকাল হ্রাস করায় শচীন জেল থেকে মুক্তি পায়।

(৫০) ১৭-৬-১১—মাদ্রাজে তিন্নাভ্যালির জেলা-শাসককে বৈঁটে এবং শঙ্করকৃষ্ণ হত্যা করে। 'তিন্নাভ্যালি ষড়যন্ত্র মামলায়' নীলকান্ত ব্রহ্মচারী এবং অন্য অনেককে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

(৫১) ১৯২০ সালে নেপালের বাঙালী বিপ্লবীদের কাছ থেকে শিক্ষা পায় মাদ্রাজের শ্রীরাম রাজু। তার কাজ ছিল গভর্নমেন্টের কাজের জন্য কুলি সংগ্রহ করা। গোপনে সে এদের সঙ্ঘবদ্ধ করে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে এবং নিজে পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। গোপন আশ্রয় থেকে কয়েকটি রাইফেল সংগ্রহ করে সে আবার জঙ্গলে ফিরে যায়। ১৯২৪ সালের মে মাসে শ্রীরাম রাজু পুলিশ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যুদ্ধ করতে করতে মারা যায়।

(৫২) পাঞ্জাবের হরদয়াল সরকারী বৃত্তি পেয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য অক্সফোর্ডে যান। ফিরে এসে তিনি একটি সঙ্ঘ স্থাপিত করেন। আমীরচাঁদ এবং দীননাথ তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। পরে রাসবিহারী বসু এই দলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সঙ্ঘের সদস্যরাই হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপ করেন। ১৯০৮ সালে হরদয়াল আবার আমেরিকায় চলে যান। ১৯১১ সালে সানফ্রান্সিস্কোতে 'গদর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। রামচন্দ্রও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। হরদয়াল আমেরিকায় অবস্থানকারী শিখদের উত্তেজিত করেন। ১৬-৩-১৪ তারিখে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। জামিনে মুক্তি পাবার পর তিনি চলে যান সুইজারল্যান্ডে। রামচন্দ্র তাঁর কাজ চালাতে থাকেন।

এই সময় কানাডা সরকার ভারতীয় শ্রমিকদের কানাডা আগমন নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন পাশ করেন। কানাডার শিখরা প্রবলভাবে এর বিরোধিতা করে। তাদের দাবির সমর্থনে ভারতের জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তারা কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠায় দেশে। হংকং থেকে গুরুদিৎ সিং 'কামাগাতামারু' নামে একটি জাহাজ ভাড়া করে। এই জাহাজে ৩৫১ জন শিখ এবং ২১ জন মুসলমান কানাডার পথে যাত্রা করে। ২৩-৫-১৪ তারিখে তারা ভাঙ্কুবরে পৌঁছয়। কানাডা আগমন আইন মানতে অস্বীকার করায় তাদের জাহাজ থেকে ডাঙায় নামতে দেওয়া হ'ল না। পুলিশের সঙ্গে বাধল সংঘর্ষ, শেষ পর্যন্ত তারা জাহাজ সমেত ফিরে চলে এল। যখন তারা ভারতের পথে আসছে তখন বাধল প্রথম মহাযুদ্ধ। আইন অগ্রাহ্য করে তারা স্থানে স্থানে নামবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু জোর করে কোথাও নামতে পারল না। শেষ পর্যন্ত ফিরে এসে জাহাজ ভিড়ল বজবজে। সেখানে একটি স্পেশাল ট্রেন তাদের পাঞ্জাবে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু তারা দেশে ফিরে যেতে অস্বীকার করল। বেশির ভাগ শিখের সঙ্গে ছিল গুলীভরা রিভলভার। তারা লড়াই সুরু করল বৃটিশ পুলিশের সঙ্গে। ১৮ জন মারা গেল লড়াই-এ। ২৮ জন সঙ্গীসহ গুরুদিৎ সিং পালিয়ে গেলেন।

এই শিখেরা আমেরিকার গদর পার্টি এবং বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলেন। পিঙলে এবং রাসবিহারী বসু এঁদের সঙ্গে ছিলেন। এঁরা অস্ত্র সংগ্রহ এবং বোমা প্রস্তুত করছিলেন। ১৬-১০-১৪ তারিখে চৌকিমারা রেলওয়ে স্টেশনে এঁরা কিছু অস্ত্র পাবেন বলে আশা করেছিলেন। পুলিশ রিপোর্টে লেখা আছে, "তারা রেলওয়ে স্টেশন আক্রমণ করে লুঠ করে, কিন্তু কোন অস্ত্র পায় নি।"

২৯-১০-১৪ তারিখে 'জশামারু' নামে আর একটি জাহাজে আমেরিকা থেকে ১৭৩ জন শিখ সৈন্যের আসবার কথা ছিল। পুলিশের গোপন রিপোর্টে জানা যায় যে গভর্নমেণ্ট পূর্বাহ্নে সংবাদ পেয়ে ১০০ জনকে বন্দী করে—বাকীরা পালিয়ে যায়।

(৫৩) ২৭-১১-১৪—পনেরো জন লোক ফিরোজপুর ট্রেজারি আক্রমণ করে। সাব-ইনস্পেক্টর এবং পঞ্চায়েতের সভ্যরা গ্রামবাসীদের নিয়ে এদের আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করে। সাবইনস্পেক্টর এবং পঞ্চায়েত নেতা নিহত হয়। এদিকে দুইজন বিপ্লবীর মৃত্যু এবং সাতজন বন্দী হয়।

(৫৪) ২১-২-১৫ তারিখে একটা সামগ্রিক অভ্যুত্থানের জন্য রাস-বিহারী বসু ও তাঁর সহকর্মীরা প্রস্তুত হতে থাকেন। কিন্তু পুলিশ সময়মত সব খবর পেয়ে রাসবিহারী বসুর বাড়ী তল্লাসী করে বোমা ও অস্ত্রশস্ত্র সহ সাতজনকে বন্দী করে। রাসবিহারীকে পাওয়া যায় নি। গুপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে আরও বহু জায়গা তল্লাসী হয় এবং আরও চারজন বোমা ও রিভলভার সহ বন্দী হয়। এইসব বোমা বিপ্লবীদের নিজেদের হাতের তৈরি বলে মনে হয়—পুলিশ রিপোর্টে এ-কথার উল্লেখ আছে।

(৫৫) ২০-২-১৫ তারিখে লাহোরে একজন হেড কনস্টেবল এবং সাব ইনস্পেক্টর গুলীর আঘাতে নিহত হয়। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা সুরু হয়। এই মামলাকে তিনটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়—

(ক) প্রথমটিতে নেতাদের বিচার হয়।

(খ) দ্বিতীয়টিতে নেতাদের পরবর্তী সহকর্মীদের বিচার হয়।

(গ) তৃতীয়টিতে অন্য বহুলোক, যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে ষড়যন্ত্রে সাহায্য করেছে, তাদের বিচার হয়।

প্রথমটিতে ৬১ জন, দ্বিতীয়টিতে ৭৪ জন এবং তৃতীয়টিতে ১২ জনের বিচার হয়। বিচারের প্রহসন করে বৃটিশ ন্যায়পরায়ণতা নির্লজ্জভাবে বিপ্লবীদের হত্যা করার ব্যবস্থা করল। কোন কিছু ঘটনা না ঘটা সত্ত্বেও ২৮ জনের ফাঁসি এবং ২৯ জন বাদে আর সকলের কারাদণ্ড হ'ল।

জেলে বসে আমি রাউলাট কমিটির রিপোর্ট থেকে এই সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করে বিপ্লবী পার্টি সংগঠনের দিক এবং পাশাপাশি পুলিশ সংগঠনের বৈশিষ্ট্য খুব ভাল করে লক্ষ্য করেছিলাম। আমার এই গবেষণার ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে পার্টির সংগঠন পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী কিরকম হবে সে বিষয়ে জেলে বসেই স্পষ্ট একটি ছক তৈরী করলাম। সংক্ষেপে আমার গবেষণার ধারা জানাচ্ছি—

(১) প্রথম এবং প্রধান চিন্তার বিষয় হ'ল বিপ্লবী সংগঠনে গুপ্তচরদের প্রবেশ বন্ধ করতে হবে। সাধারণভাবে দেখতে গেলে যে সকল অভিজ্ঞ বিপ্লবীরা আটক অবস্থায় পুলিশের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তাঁদের কোন পরিকল্পনার মধ্যেই ঢুকতে দেওয়া হবে না। কিভাবে কতটা প্রস্তুতি চলছে আর কোন্ তারিখে কিভাবে আক্রমণ হবে, এ বিষয়ে তাঁদের মন্ত্রগুপ্তির ভাগ দেওয়া হবে না। কেবলমাত্র বিশেষভাবে পরীক্ষিত হবার পর এঁদের প্রতি বিশ্বাস রাখা চলতে পারে।

(২) জেল-ফেরত বিপ্লবীদের চরিত্র এবং বিশ্বস্ততা বিচার করতে বা খুঁটিয়ে জানতে গেলে পুলিশের গুপ্তচর বিভাগ ঠিক কি উপায়ে সংবাদ সংগ্রহে সমর্থ হয় সেই গুপ্ত কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পুলিশের সংগঠনের মধ্যে প্রবেশ করে এদের গুপ্ত তথ্য জানার চেষ্টা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজ। সংগঠনকে গুপ্তচর-প্রভাব মুক্ত রাখবার জন্য এই দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম, কারণ, অটল আত্মবিশ্বাস না থাকলে কোন বিপ্লবীর পক্ষে এ ধরনের কাজে নিরত থাকা সম্ভব নয়।

(৩) বিপ্লবের পূর্বে বিশেষ বিশেষ আক্রমণ সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে. নির্দিষ্ট কর্মসূচী জেনে প্রস্তুত হতে হবে এবং গুপ্তবাহিনীতে অংশ গ্রহণের জন্য বিশ্বাস করে যে সদস্যদের নির্বাচন করা হবে তাদের বয়স সাধারণভাবে কুড়ির বেশি হওয়া চলবে না। পার্থিব বস্তুর আকর্ষণ এবং সুখময় সংসারের বন্ধন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে কোন্ বয়সে? সাধারণতঃ কুড়ির উপরে। এর চেয়ে কম বয়সী ছেলেদের মনে আদর্শবাদ হয় প্রবল—আদর্শের জন্য তারা যে কোন সুখ-ঐশ্বর্য মায়া-মমতার বন্ধন অনায়াসে কাটিয়ে আসতে পারে। এ ছাড়া যাদের চোখের সামনে রয়েছে উচ্চপদে চাকুরি এবং জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনা —প্রথম সারির গুপ্ত বিপ্লবী সৈনিকের দল থেকে তাদেরও বাদ দিতে হবে।

(৪) এই কঠোর নির্বাচন ব্যবস্থা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রথম দলের জন্য। এই দলের পাশে জড়ো করতে হবে বহুসংখ্যক সহানুভূতিসম্পন্ন

সাহায্যকারীকে। প্রয়োজনমত তাঁদের সাহায্য নেওয়া হবে, কিন্তু গুপ্তকথা জেনে পুলিশকে জানাবার সুযোগ এঁদের কাউকে দেওয়া হবে না।

(৫) আমাদের কর্মসূচীতে অর্থ সংগ্রহের জন্য ডাকাতির ব্যবস্থা রাখা হবে না। ধনী-ব্যক্তির বাড়ীতে ডাকাতি করাটা সব সময়ে ফলপ্রসূ হয় না। কারণ, কখন কার বাড়ীতে কত টাকা থাকে, সে সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ব্যাঙ্ক বা সরকারী অর্থ লুঠ করলে পুলিশ সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আসামী ধরবার চেষ্টা করে। ফলে, হয় সর্বদা আত্মগোপন করে থাকা, নয়তো ষড়যন্ত্র মামলা বা ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে সেই অভিযোগ থেকে মুক্ত হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। বিপ্লবের জন্য যে শক্তি আমরা সঞ্চয় করবার চেষ্টা করছি, সে শক্তির অপব্যবহার হয় আত্মরক্ষার কাজে—অর্থসংগ্রহের আসল উদ্দেশ্য হারিয়ে যায়, তখন সব অর্থ যায় উকিল-ব্যারিস্টার আর সাক্ষী হাত করবার পেছনে।

অর্থ-সঙ্কট সমাধানের জন্য আমি স্থির করলাম, প্রত্যেক সদস্য নিজের বাড়ী ও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করবে। এজন্য প্রথম সারিতে কয়েকজন বিত্তবান পরিবারের ছেলেকে নিতে হবে। তবে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরাও সাধ্যমত অর্থ এনে দেবে। প্রতিটি বিপজ্জনক কাজ, তা যত সামান্যই হোক্ না কেন, আগে থেকে প্ল্যান করে করা হবে যাতে কার্যকালে ছেলেটি পরিবারের লোকদের কাছে হাতে-নাতে ধরা না পড়ে।

(৬) বিপ্লবী পার্টি, সঙ্ঘ এবং গ্রুপের সদস্যদের দ্বারা ইতিপূর্বে বহু ব্যক্তিগত হত্যা সাধিত হয়েছে। দেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপীয়ান অফিসাররা সর্বদা সতর্ক থেকে ভারতীয় প্রহরীবেষ্টিত হয়ে চলতেন। সেজন্য অতর্কিতে তাঁদের খুব কাছে গিয়ে গুলী করে হত্যা করা সম্ভব হ'ত না। যে সব নির্ভীক বিপ্লবী জীবন তুচ্ছ করে ইউরোপীয়ান হত্যা করতে গিয়েছেন তাঁদের প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। বেশির ভাগ হত্যা সফল হয়েছে আমাদের দেশবাসীর ক্ষেত্রে। বহুসংখ্যক দেশীয় পুলিশ অফিসার, পুলিশ কর্মচারী, গুপ্তচর এবং দালাল-দের হত্যা করা হয়েছে। এতে ইউরোপীয়দের কোন ক্ষতিই হয় নি। মীর-জাফরের জায়গায় মীরকাশিমকে তারা বসিয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কোন বাধাই আসে নি। আমাদের মত দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন দেশে, যেখানে রায়বাহাদুর, খানবাহাদুর, রায়সাহেব, খানসাহেব আর নাইট-লর্ড উপাধি পেলে শিক্ষিত ব্যক্তিরাও ইংরেজের একান্ত অনুগত হয়ে পড়েন, সেখানে আমাদেরই দেশ থেকে শোষণ করা অর্থে ইচ্ছামত দেশীয় কর্মচারী পোষণ করা সুচতুর বৃটিশ সরকারের পক্ষে মোটেই কঠিন হয় নি। আমার মনে হ'ল দরিদ্র এবং অর্থ ও খেতাব লোভাতুর দেশবাসীর রক্ত ঝরিয়ে কী লাভ আমাদের? বৃটিশ সরকারেরই বা তাতে কী ক্ষতি? সুতরাং আমাদের কর্মসূচীতে আমরা সর্বদাই ইউরোপীয়ান হত্যার পরিকল্পনা রাখব। যদি কোন দেশীয় কর্মচারীর কোন কাজের ফলে আমাদের দেশের ক্ষতি হয় তবে সেই কর্মচারীর বিভাগীয় উপরওয়ালা শ্বেতাঙ্গ অফিসারকেই আমরা সে জন্য দায়ী করব এবং আমাদের দণ্ডবিধান হবে নিম্নপদস্থ অশ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর উপর নয় —সেই শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরই উপর, যে এরকম দেশদ্রোহিতার কাজে প্ররোচিত

করেছে যে নিম্নপদস্থ দেশীয় লোকদের। বৃটিশ সরকারের ধ্বজাধারী ইউরোপীয় অফিসার এবং জেলা ও প্রদেশের অধিকর্তা ইউরোপীয়দের হত্যা করে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা জানিয়ে দেব যে অধস্তন কর্মচারীর কাজের দায়িত্ব বহন করেই তাঁকে মৃত্যুদণ্ড বরণ করতে হয়েছে।

ভারতের বিপ্লবী কার্যকলাপের ধারা লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, নিতান্ত বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণভাবে কখনো আমরা কোন দেশবাসীর বিরুদ্ধে একটি বুলেটও খরচ করব না। কারণ, দেশের শত্রু হত্যা যখন প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত, তখন শ্বেতাঙ্গ হত্যা অপেক্ষা অশ্বেতাঙ্গ হত্যা সুবিধাজনক বলে ঐ দিকেই মন নিবিষ্ট হবে। প্রকৃত অপরাধীরা অবিরাম অপরাধ করে যায় ও কার্যকাল শেষে 'হোমে' গিয়ে আমাদেরই টাকায় নিশ্চিন্ত সুখী-জীবন যাপন করে।

(৭) কোন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সার্থক করে তুলতে হলে চাই প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, যা' গোপনে একটি-দুটি করে সংগ্রহ করা দুরূহ। সেজন্য ইতিপূর্বে বিপ্লবী নেতারা একাধিকবার বিদেশীদের সাহায্যে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই তাঁদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই আমরা আর এইভাবে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করব না স্থির করলাম। কারণ, প্রথমত, এতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন এবং দ্বিতীয়ত, অর্থ দিয়ে বিশ্বাস করে যাকে সব ব্যবস্থা করবার জন্য বিদেশে পাঠানো হয় শেষ পর্যন্ত সব সময়ে তার মতি স্থির থাকে না—এটা বহুবার দেখা গেছে। টাকা নিয়ে বিদেশে গিয়ে বিদেশের আনন্দ উৎসবে গা ঢেলে দিয়ে কেউ কেউ বিদেশিনী নিয়ে ঘর বেঁধেছে—এমন নজীরও আছে। তৃতীয়ত, সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এত বিরাট একটি আয়োজন সম্পূর্ণ করতে হলে এত ছড়িয়ে ফেলতে হয় সংগঠনকে যে, কোন না কোন পথ দিয়ে পুলিশ সংবাদ সংগ্রহ করতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত সমস্ত পরিকল্পনাটি আসে পুলিশের হাতের মুঠোয়। ফলস্বরূপ, বিচ্ছিন্নভাবে পুলিশের সঙ্গে লড়াই, ফাঁসি ও কারাদণ্ডে সমগ্র প্রচেষ্টাটির পরিসমাপ্তি। চতুর্থ কথা হ'ল, বিদেশের আমদানী অস্ত্রের উপর নির্ভর করে সরকারী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করবার মত স্থায়ী সৈন্যদল পোষণের চেষ্টা অর্থহীন।

(৮) একটি দেশের সঙ্গে যখন অন্য দেশের যুদ্ধ বাধে তখন দেশের যুবকদের দলবদ্ধভাবে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষা দিয়ে নিয়মিত সৈন্যবাহিনী তৈরী করা যায়। কিন্তু বিপ্লবীদের এইভাবে প্রকাশ্যে রাইফেল চালনা শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়—সৈন্যদল তৈরী করতে হবে অতি গোপনে। কাজেই আমাদের সংগঠনে প্রথমে আমরা কয়েকজন মাত্র বিপ্লবীকে পিস্তল, রিভলভার, বোমা প্রভৃতির ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে, অতি ক্ষুদ্র গুপ্ত সৈন্যদল তৈরী করব। অন্যদের কৃত্রিম রাইফেল অথবা খুব সতর্কতার সঙ্গে একটি দুটি রাইফেল দিয়েও শিক্ষা দেওয়া যায়। তারপর সুসজ্জিত ক্ষুদ্র সৈন্যদল নিয়ে অতর্কিতে শত্রুঘাঁটি আক্রমণ করে অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেব। দেশেই তো ইংরেজ সরকারের অস্ত্রাগার রয়েছে, তা' থেকে এইভাবে অস্ত্র নিয়ে সমস্ত বিপ্লবীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেব। প্রথমেই একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী তৈরী করে দুর্গ আক্রমণ করার শক্তি আমরা অর্জন করতে পারব না, বরং

একজন সাধারণ লোক দুর্গের কাছে গিয়ে সহজেই বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে। সেই সংবাদের উপর ভিত্তি করে আকস্মিক আক্রমণ করলে সুফল পাওয়া যাবে। পূর্ববর্তী যুগের ইন্দো-জার্মান চক্রান্তের বিবরণ পাঠ করে এই পথই সবচেয়ে কার্যকরী হবে বলে মনে করলাম।

(৯) ইতিপূর্বে সারা ভারতবর্ষে বহু ব্যক্তিগত হত্যার মাধ্যমে সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা হয়েছে। এই সব আত্ম-ত্যাগের নিদর্শন ভারতীয় তরুণদের মনে দেশভক্তির অনির্বাণ শিখা জ্বালিয়ে রেখেছে। আমরা এবার ব্যাপক অথচ সংগঠিতভাবে আক্রমণ করে দেশের বিভিন্ন অংশে সরকারের শাসনক্ষমতাকে পঙ্গু করে দেব। যে সব জায়গায় আমরা বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করতে পারব, সেই সেই স্থানে একসঙ্গে আক্রমণ চালাব। যদি বিভিন্ন প্রদেশে না পারি তবে কয়েকটি জেলায়, যদি কয়েকটি জেলায় না পারি তবে অন্তত একটি জেলায়ও আমরা এই সামগ্রিক আক্রমণের উদাহরণ তুলে ধরব যাতে দেশের অন্যান্য অংশে বিপ্লবী যুবকেরা সংগঠিত হয়ে বৃটিশ সরকারের শাসনব্যবস্থার উপর আঘাত হানতে পারে।

১৯২৪-২৬ পর্যন্ত জেলে বসে গবেষণার পর আমি ভবিষ্যৎ কর্ম-সূচী সম্বন্ধে নিজের মনে যে বাস্তব পরিকল্পনা খাড়া করেছিলাম তারই সারাংশ বলা হ'ল এতক্ষণ। আমি যে সময় এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা কর-ছিলাম, অন্য তরুণ বিপ্লবীরাও নিশ্চয়ই তখন কোন না কোন নতুন পথ আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছিলেন; অতীতের বিপ্লবী প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে উন্নততর কোন ব্যবস্থার কথা সবাই ভাবছিলেন। এ'দের বিশ্লেষণপদ্ধতি এবং গবেষণার ফল সম্বন্ধে কোন আভাস পাবার সুযোগ ঘটে নি। কিন্তু মুক্তি পেয়ে যখন আমার বন্ধু গণেশের সঙ্গে দেখা হ'ল, তখন জানলাম সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে গণেশও ঠিক আমার মত একই সিদ্ধান্তে পেঁছেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তার অভিমত আমার চাইতে অনেক বেশি বাস্তব-পন্থী। সে সব কথা পরে আলোচনা করা হবে।

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে কে কি ভাবছিলেন জানি না তবে একটি বিষয়ে প্রবীণ এবং নবীন দুই পক্ষই একমত ছিলেন যে, বিপ্লবী পার্টিগুলিকে সম্মিলিত করতে হবে। বিশেষত অনুশীলন এবং যুগান্তর—এই দুটি বড় দলকে ভারতে বিপ্লবের প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে—এ বিষয়ে নেতাদের কোন দ্বিমত ছিল না। আজ অবশ্য বলা যায় এইরূপ চিন্তার বিলাস জেলের পরিবেশে বিপ্লবীদের সাময়িক উদার মনোভাবের পরিচয় মাত্র। বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য অনুসারে—'বিপ্লবীরা অবিদ্যাশক্তি বা অহঙ্কারের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি।' আজ অন্তত এ কথাটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, দেশ বা বিপ্লবের চাইতেও তখন আমরা অহং ভাবেরই সেবা করেছি অনেক বেশি।

বাংলার গুপ্তচর বিভাগের রিপোর্টে এ বিষয়ে বাংলার বিপ্লবীদের সম্বন্ধে লেখা আছে ঃ—

"মুক্তিলাভের পর যুগান্তর এবং অনুশীলন নেতারা হরিকুমার চক্রবর্তীকে সভাপতি মনোনীত করে দশজনের একটি কাউন্সিল গঠন করে, তার অধীনে সম্মিলিত হলেন। এ'দের উদ্দেশ্য হল 'কংগ্রেস' অধিকার করা।

এই ঐক্য বেশিদিন টিকল না। বিপিন গাঙ্গুলী এবং অনিল রায় এতে যোগ দিলেন না। ব্যক্তিগত ঈর্ষার আঘাতে পরিকল্পনাটি ধূলিসাৎ হল।"

কেউ কেউ এই যুক্ত কাউন্সিলের আহ্বানে বাংলার নব-গঠিত বিপ্লবী পার্টিতে যোগ না দিলেও বিভিন্ন ছোট ছোট দলগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এই ঐক্যবদ্ধ পার্টি চট্টগ্রামের গ্রুপকে আমন্ত্রণ জানাল। আগেই উল্লেখ করেছি চট্টগ্রামের দু'টি দলের মধ্যে প্রমোদ চৌধুরী, নির্মলদা ও আমার চেষ্টায় ইতিপূর্বেই ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। সমগ্র বাংলার এই ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী পার্টির সঙ্গে যোগ দিতে চারুবাবু প্রথম থেকেই সবার চাইতে বেশি ইচ্ছুক ছিলেন। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সময় চট্টগ্রামের ঐক্যবদ্ধ পার্টি বাংলার অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে মিলিত হ'ল। তাঁরা চট্টগ্রামের ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী দলের নেতা হিসেবে মাস্টারদাকে মনোনীত করলেন। চারুবাবুর এটা পছন্দ হ'ল না। তিনি ছিলেন অনুশীলন দলের সমর্থক, সুতরাং কাউন্সিলের অনুশীলন পার্টির নেতাদের কাছেও এটা ভাল মনে হ'ল না। এই অবস্থায় পার্টিগতভাবে পর্দার অন্তরালে রাজনীতি চলতে লাগলো। সুতরাং, তাঁরা চাইলেন সূর্য সেন এবং চারুবিকাশ দত্ত—উভয়েই সমান নেতৃত্বের অধিকারী হন। কাউন্সিলে যুগান্তর পার্টির সভ্য সুরেন ঘোষ, অম্বিকাদার সঙ্গে পরামর্শ করে অন্য একটি প্রস্তাব দিলেন যে, এ ক্ষেত্রে চট্টগ্রামে আর একটি কাউন্সিল গঠিত হোক্ তিনজন নেতাকে নিয়ে —সূর্য সেন, চারু দত্ত এবং অম্বিকা চক্রবর্তী। এতেও অনুশীলন নেতারা রাজী নন, কারণ, এটা অতি সুস্পষ্ট যে দু'জনের সংখ্যাগুরু অংশ বলে কাউন্সিলে যুগান্তরেরই প্রভাবে থাকবে। এমনই ছিল সে সময়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষা ও ক্ষমতার মোহ। সুতরাং কোন ঐক্যই স্থাপিত হ'ল না।

সম্মিলিত পার্টির প্রধান নেতারা চাইছিলেন কংগ্রেস অধিকার করে কংগ্রেসের নামে কাজ চালাতে, কিন্তু নবীনতর সভ্যরা চায় বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালাতে। সুতরাং তারা এই যুগ্ম পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে এসে নতুন এক সম্মিলিত পার্টি গঠন করল, তার নাম—'নিউ ভায়োলেন্স পার্টি'। এ বিষয়েও পুলিশের গোপন রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"যুগান্তর এবং অনুশীলন দলের নেতারা তাঁদের শিষ্যদের সামনে অবিলম্বে হিংসাত্মক কার্যের কোন পরিকল্পনা দিতে পারলেন না। সেজন্য অসন্তুষ্ট সদস্যরা 'নিউ ভায়োলেন্স পার্টি' নামে একটি সম্মিলিত পার্টি গঠন করে। এই নব-গঠিত পার্টিতে নিচের গ্রুপগুলি যোগ দেয়—

(১) বরিশাল—সুধীর আইচের অধীনে (যুগান্তর)।

(২) বরিশাল—জগদীশ চ্যাটার্জীর অধীনে (অনুশীলন)।

(৩) কালীঘাট তরুণ সংঘ—বিনয়েন্দ্র রায়চৌধুরীর অধীনে (অনুশীলন)।

(৪) শচীন সান্যালের দল।

(৫) ঢাকা বাণী-সেবক সঙ্ঘ—সুধীর বোসের অধীনে (এ, আর, জি,)।

(৬) ঢাকা অনুশীলন—সতীশ পাকড়াশী।

(৭) মুর্শিদাবাদ—তারাপদ গুপ্ত (অনুশীলন)।

(৮) ময়মনসিংহ—প্রতুল ভট্টাচার্য (অনুশীলন)।

(৯) রাজসাহী—অনিল বটব্যাল (অনুশীলন)।
(১০) পাবনা—সুধীর মজুমদার (অনুশীলন)।
(১১) যশোর-খুলনা—নির্মল দাস (যুগান্তর)।
(১২) মাদারিপুর—পঞ্চানন চক্রবর্তী (যুগান্তর)।
(১৩) ফরিদপুর—বিজয় ব্যানার্জী (অনুশীলন)।"

এই সংযুক্ত গ্রুপের পাশাপাশি আবার স্বতন্ত্রভাবে আর একটা দল গড়ে উঠল। পুলিশ রিপোর্ট অনুসারে—

"সত্য গুপ্ত, ভূপেন্দ্র রক্ষিতরায় এবং মণীন্দ্র রায়ের পরিচালনায় বি, ভি, (বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স) গ্রুপ গঠন।

"অনিল রায়ের স্বেচ্ছাচারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শ্রীসঙ্ঘ গ্রুপের যুদ্ধপ্রিয় সদস্যরা, যারা সুভাষবাবুর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল বি, ভি, গ্রুপ গঠন করল (১৯২৯ সালে নিরঞ্জন সেনগুপ্তের সঙ্গে সংযোগ রেখে)। ......এই গ্রুপ ১৯৩০ সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সুরু করল।

"এই সমস্ত গ্রুপ ছাড়া বাংলা দেশে তখন আরো কতকগুলি সমিতি গড়ে উঠেছিল, আর গড়ে উঠেছিল সুভাষ বসুর নেতৃত্বে বাংলার 'ইন্‌ডিপেন্ডেন্স লীগ'।

"সুভাষ বসু বাংলার ইন্‌ডিপেন্ডেন্স লীগ গঠন করেন, যার বিশেষত্ব হ'ল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা। ১৯২৮ সালে কলকাতায় শ্রমিক-কনভেন্‌সন আহ্বান করা হ'ল। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও যুব-আন্দোলনের মধ্য থেকে সন্তোষ মিত্র গড়ে তুললেন 'সোস্যালিস্ট পিপ্‌লস্ লীগ'।

"ছাত্র এবং যুব-সংগঠনগুলির মাধ্যমে প্রকাশ্যভাবে হিংসাত্মক নীতির প্রচার হতে লাগল। গঠিত হ'ল—

"অনুশীলন দলের এ, বি, এস, এফ, (অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন) (জে, এম, সেনগুপ্ত)।

"যুগান্তর দলের বি, পি, এস্, এ, (বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন) (সুভাষ বসু)।"

প্রধান নেতাদের যুগ্মদলে ভাঙন ধরল। সেই ভাঙন ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত সংগঠনে—কংগ্রেসে, যুব ও ছাত্র সংগঠনে। দু'টি পৃথক ছাত্র-সংগঠন গঠিত হ'ল—একটি যতীন্দ্রমোহনের উদ্যোগে অনুশীলন দলের ছাত্রদেব নিয়ে, অপরটি সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে যুগান্তর দলের।

আমার সম্বন্ধে বলতে পারি, যদি নেতাদের কথা ধরা হয় তবে এই দুই দলের অথবা সংযুক্তদলের নেতাদের প্রভাব থেকে আমি বহুদূরে ছিলাম। তবে প্রকাশ্যভাবে গণ-সংযোগের ক্ষেত্রে আমি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যোগ দিতাম।

আমার তখন নিজস্ব শক্তি যতটুকু ছিল তা' চট্টগ্রামে সশস্ত্র আক্রমণের প্রাথমিক ব্যবস্থা—গুপ্তচর প্রভাবমুক্ত সংগঠন গড়ে তোলবার কাজে নিয়োগ করলাম। আমি আমার কথা বলছি মানে এ নয় যে অন্য নেতারা চুপ করে বসেছিলেন। প্রত্যেকেই নিজস্ব চিন্তা ও ধারণা অনুযায়ী প্রকাশ্য অথবা গুপ্ত সংগঠনে কাজ করে চলেছিলেন।

এ সব তো বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হবার পরের সাধারণ ঘটনাবলী। কিন্তু বন্দী অবস্থায় কী বিশেষ চিন্তাধারা অনুসরণ করেছিলাম, অতখানি সময় ও সুযোগ পেয়ে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন সম্বন্ধে বিশ্লেষণ ও গবেষণার পর কী বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম এবং মুক্ত হবার পর কোন্ পথ ও কী সীমাবদ্ধ প্রোগ্রাম গ্রহণ করেছিলাম, সে কথা বলবার পূর্বে জেল-জীবনের আরো দু'একটি খুঁটিনাটি ঘটনা না বললে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

বর্ধমান জেল থেকে আমি গেলাম যশোর জেলে। প্রেমানন্দ কিছুদিন আগেও সেখানে ছিল। আমি গিয়ে আর ওর দেখা পেলাম না। কয়েক দিন আগে মুক্তি পেয়ে ও চলে গেছে চট্টগ্রামে—সেখানে নিজের বাড়ীতে অন্তরীণ হয়ে আছে। যশোর জেলে এসে দেখা হ'ল অন্য তিনজন বন্দীর সঙ্গে—চারুবাবু (দত্ত), পৃথ্বীশবাবু ও মণীন্দ্রবাবু।

চট্টগ্রামে দুটো দলের মিলনের পর আমরা বন্দী হই, কিন্তু মাস্টারদা, চারুবাবু এবং আরো কয়েকজন গোপনে পালিয়ে যান, পুলিশ এঁদের ধরতে পারে নি। এখানে এসে চারুবাবুর কাছে আমাদের দলের কর্মীদের কার্য-কলাপের কথা সব শুনলাম। শুনলাম বন্দী হবার কয়েকদিন আগে থেকে চারুবাবু এবং মাস্টারদা একই আশ্রয়ে ছিলেন। সেই ক'টা দিনে, চারু-বাবুর মতে, মাস্টারদার সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। চারু-বাবু বলেন যে এ কয়টা দিন তাঁর কাছে খুবই মূল্যবান বলে মনে হয়েছে, খুবই উৎসাহ বোধ করেছেন তিনি। চারুবাবু বললেন যে শচীন সান্যালকে সভাপতি করে তাঁরা একটি সম্মিলিত কাউন্সিল গঠন করেছিলেন। কাউন্সিলে ছিলেন—রাজেন লাহিড়ী, সূর্য সেন, চারু দত্ত, নগেন সেন, হরিনারায়ণ চন্দ, অনন্তহরি মিত্র, অনন্ত চক্রবর্তী এবং অনুরূপ সেন (অনুরূপদা কিছুদিন পরেই কঠিন রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান)। এঁরা খুব বিরাট একটা পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

চারুবাবু তাঁর লেখা "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের" ১৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

"চট্টগ্রামকে লইয়া বাংলা ও আসামের দশটি জেলায় একসঙ্গে ইংরাজের অস্ত্রাগার আক্রমণ, তাহার শক্তিকেন্দ্রগুলিকে করায়ত্ত করা, ইত্যাদি অনেক চমকপ্রদ কার্যসূচী সম্মুখে রাখিয়া এই দল কাজ করিয়া যাইতেছিল।"

কিন্তু আমাদের দেশে সব বিরাট পরিকল্পনার যেভাবে সমাপ্তি ঘটেছে এর বেলায়ও তার অন্যথা হ'ল না—পুলিশের গোয়েন্দাদের হাত থেকে কাউন্সিলের অস্তিত্ব রক্ষা করা গেল না। শচীন সান্যাল বন্দী হলেন। কলকাতায় আসবার পথে বন্দী হলেন যোগেশ চ্যাটার্জী। 'কাকোরি-ষড়যন্ত্র মামলা'র গোপন সূত্র উদ্‌ঘাটিত হ'ল পুলিশের কাছে। বন্দী হলেন জুলুদা ও চারুবাবু। কিন্তু মাস্টারদাকে বন্দী করা অত সহজ হ'ল না। তিনি অবশিষ্ট কর্মীদের নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় শেষ আঘাত হানল পুলিশ দক্ষিণেশ্বরের বোমা কারখানা এবং শোভাবাজারের বিপ্লবীকেন্দ্র আবিষ্কার করে। চিন্তা করে দেখলাম কেবলমাত্র বাইরে থেকে লক্ষ্য করে

পুলিশের সাধ্য ছিল না সদাসতর্ক বিপ্লবীদের কর্মকেন্দ্র খুঁজে পায়—আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া এসব বিষয় প্রকাশ হতে পারে না।

যশোর জেলে বসে গল্পের মত সব শুনছিলাম চারুবাবুর কাছে। আর চিন্তা করে দেখছিলাম কিভাবে এই বন্ধুবেশী গুপ্তচরদের হাত থেকে দলকে রক্ষা করা যায়। এখন আমি আর আগের মত বোকা বা ভালমানুষ নই। চট্টগ্রাম জেলের মধ্যে অস্ত্র নেওয়ার কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে আমি সিপাইদেরই সন্দেহ করেছিলাম। ভাবতেও পারি নি যে দলের বিশেষ কর্মঠ সদস্য বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে! ইতিমধ্যে পুলিশের 'বন্ধু' সেজে ভাণ করে পুলিশের গুপ্তচর সংগঠনের মধ্যে আমিও খানিকটা ঢুকতে পেরেছি—পাল্টা গোয়েন্দাগিরির সুযোগ মিলেছে। তাই আমি জানি, কি উপায়ে পুলিশ নিজের গুপ্তচরদের বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, অথবা কিভাবে কোন কোন বিপ্লবীকে ভবিষ্যতের আশা দেখিয়ে বশ করে গুপ্তকথা জেনে নেয়। কাজেই চারুবাবুর সব কথা আমি খুব বোকা সেজে শুনেছিলাম আর বিশ্লেষণ করে বুঝতে পেরেছিলাম—শোভাবাজার ও দক্ষিণেশ্বরের বাড়ীর সন্ধান, শচীন সান্যালের নেতৃত্বে দশটি জেলার অভ্যুত্থানের সংবাদ, মাস্টারদার গতিপথের খবর, ইত্যাদি পুলিশ পূর্বাহ্নে কিভাবে পেল? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ অনুসরণ করে সব ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করছিলাম এবং যশোর জেলে বসে ভাবছিলাম এবার আমি সবই জেনে গেছি। এখন অনায়াসে পরীক্ষা ও যাচাই করে দেখতে পারব কে খাঁটি আর কার মধ্যে কতখানি ভেজাল। কিন্তু হায়, জানতাম না কী দারুণ বিস্ময় তখনো আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে! মানুষের চরিত্র কত বৈচিত্র্যের সমষ্টি! নিজের মনকেই কি স্পষ্ট করে জানতে পেরেছে কেউ কোনদিন যে পরের মনকে জানবার স্পর্ধা রাখবে? সবই জেনেছিলাম, জানি নি শুধু মানব-চরিত্রের অতল গভীরতা—তার অন্তর্নিহিত অনুদ্ঘাটিত রহস্য!

এখন যে বিষয়টি লিখতে যাচ্ছি তা' লেখার আগে আমি খুব ভেবেছি যে এই সম্বন্ধে আদৌ লেখা উচিত হবে, না কি তা' জীবনে অনুক্ত রেখে দেব? আমার মনে হচ্ছে, যে রূঢ় সত্য নিদারুণ অভিজ্ঞতার মধ্যে লাভ করেছি তার অংশ থেকে ভবিষ্যতের বিপ্লবী যুব-সমাজকে বঞ্চিত করার অধিকার আমার নেই। অগ্নিযুগের যে অধ্যায়টি লিখছি তা' সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বিপ্লবী জীবনের ও বিপ্লবী সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তনের মূল কারণ বা ঘটনাটি অনুদ্ঘাটিত রেখে দিই। খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি, যদি জীবনে এই নিদারুণ ঘটনাটি না ঘটত, তবে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের গুপ্তচর-মুক্ত প্রস্তুতি ও সংগঠন হয়ত কোনমতেই সম্ভব হ'ত না। চট্টগ্রামে সফল যুব-বিদ্রোহের চাবিকাঠি রয়েছে অতীতের এই মূল্যবান অভিজ্ঞতার মধ্যে।

যুব-বিদ্রোহের প্রস্তুতি ও সুদৃঢ় সংগঠনের জন্য যে অব্যর্থ চাবিকাঠি লাভের সুযোগ পেলাম সে কথাটি এখন বলি। আমার বন্ধু, আমার সর্বকাজের সঙ্গী, আমার একান্ত বিশ্বাসভাজন প্রেমানন্দ—জেলের মধ্যে যার ব্যবহারে আমি আন্তরিক ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম, তার সেই অবোধ্য চিঠির ভাষা, মাস্টারদার মৃদু স্বগত মন্তব্য—সব যেন ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে এল আমার কাছে

এখন শুনলাম চারুবাবু এবং জেলের অন্যান্য বন্ধুদের কাছে প্রেমানন্দের বিচিত্র কাহিনী।

রাজবন্দীদের কাছে প্রেমানন্দের কথা শুনে বিশ্বাস করতে মন চায় নি। তিনজন ডেপুটি জেলারকে পৃথক পৃথক ডেকে একই প্রশ্ন করলাম। তাঁরাও আমার বন্ধুদের কথাই সমর্থন করলেন। কিন্তু সব শুনেও বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হইনি সেদিন প্রেমানন্দের ওপর, বরং তার প্রতি সমবেদনায় মন ভরে গেছে।

যশোর জেলে আসবার পর প্রেমানন্দের ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছেন সবাই। কী যেন ভাবে ও সারাক্ষণ, চিন্তা করে আর পায়চারী করে। সব সময় ভাবে তার জেলের বন্ধু তিনটি তাকে সন্দেহ করছে। কিছু-দিন পরে হঠাৎ একদিন তাদের ডেকে সে বলল—

"আমি কোন কিছুই গোপন করতে চাই না। সব বলে দিচ্ছি। আমিই প্রফুল্লকে বলে দিয়েছিলাম কোথায় অনন্তকে পাবে। আমিই ওকে ধরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার পক্ষে ভাল হোক্ চাই মন্দ হোক্, আমিই বলে দিয়ে-ছিলাম প্রফুল্লকে। কিন্তু আমি দেশের এই উপকারটি করেছি যে পুলিশ তার দালালদের আর কখনো বিশ্বাস করবে না। আমি প্রফুল্লকে বলে অনন্তকে ধরিয়ে দিয়েছি, আবার তার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আমিই প্রফুল্লকে হত্যা করে ফাঁসি যেতে চেয়েছি। কিন্তু এতেও আমার মনে শান্তি নেই। ভয় হচ্ছে এখনো আমার বন্ধুরা আমাকে সন্দেহ করে।"

সব শুনে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম। ধীরে ধীরে চোখের ওপর থেকে একটা পর্দা সরে গেল। এই জন্যই, হ্যাঁ- এই জন্যই প্রেমানন্দ আমার কাছে বিষ চেয়েছিল আত্মহত্যা করবে বলে। ভেবেছিল আমি ওকে সন্দেহ করছি। কিন্তু সত্যি সত্যি আমি তো তাকে ঘুণাক্ষরেও কোনদিন সন্দেহ করি নি! সন্দেহ করবার মত মনোবৃত্তিই আমার ছিল না তখন। বিশেষতঃ সে আমার গ্রেপ্তারের জন্য দায়ী সাব-ইন্‌স্পেক্টর প্রফুল্ল রায়কে হত্যা করে বিচারের প্রতীক্ষা করছে, সুনিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড বরণ করতে হবে তাকে—সন্দেহ বা অবিশ্বাসের কথা এ ক্ষেত্রে আসতেই পারে না! বুঝলাম এই জন্যই আমি যখন তাকে লিখলাম—'আত্মহত্যা না করে বরং লর্ড লিটনকে হত্যা করবার চেষ্টা কর, আমার কাছে পিস্তল আছে, আমি তোমাকে দেব'—তখন সে এর সরল অর্থ না করে মনে করল আমি তাকে পরীক্ষা করে দেখছি; দেখছি জেলে অস্ত্র রাখবার কথা সে প্রকাশ করে দেয় কি না পুলিশের কাছে। এই জন্যই মাস্টারদা তার চিঠি পড়ে মনে মনে প্রশ্ন করেছিলেন, "কেন? কেন সে প্রফুল্লর সঙ্গে অতক্ষণ ধরে কথা বলত? প্রফুল্ল কী পেত একজন বিপ্লবীর কাছ থেকে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করত তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে?"

জীবনে কত বড় একটা অভিজ্ঞতা হ'ল! কাল যে ছিল খাঁটি বিপ্লবী, অকৃত্রিম বন্ধু—আজই হয়ত সে হয়ে দাঁড়াবে দলত্যাগী বিভীষণ! সুতরাং আমার নতুন নীতি হ'ল—কোন মানুষকে বিচার করতে হলে প্রথমেই তাকে অবিশ্বাসের চোখে দেখব। তারপর নানা ধরনের পরীক্ষা করে যাচাই করে দেখে নেব সে সত্যিই সন্দেহের অতীত কি না—তারপর তাকে বিশ্বাস করব বা ত্যাগ করব, অথবা অবিশ্বাসী জেনেও আমাদের কাজের সুবিধার

জন্য বিশ্বাসের ভাণ করব। কাজেই পুলিশের সঙ্গে বন্ধুত্বের ছল করে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবার পর যখন দেখলাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অম্বিকাদা এবং নির্মলদাও মুক্তি পেয়েছেন, তখন ওঁদের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে কোন দ্বিধা বোধ করি নি। কারণ, প্রথমে তো ওঁদের অবিশ্বাসই করব—তারপর আসবে বিশ্বাসের প্রশ্ন। সেই বিশ্বাস ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত খোলা মন নিয়ে ওঁদের কাছেও যেতে পারি নি। কী কঠোর নীতি—কী আপোষহীন মনোভাব! এককালে বিপ্লবী ছিলাম বলে জেল থেকে মুক্তি পাবার পরও সেই আগের মতই বিপ্লবী থাকব তারই বা কি স্থিরতা আছে? পরীক্ষা হওয়া চাই—প্রমাণ পাওয়া চাই। আমি যেমন অন্যদের পরীক্ষা করেছি তেমনি আমাকেও পরীক্ষা করে দেখবার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছি তাঁদের।

প্রেমানন্দ যা করেছে বা যা বলেছে তার জন্য কিন্তু আমি তাকে কোনদিন দোষ দিই নি বা অবিশ্বাসী বলে ঘৃণা করি নি। একদল লোক থাকে বিশ্বাসহীনতা যাদের মজ্জাগত। আজীবন তারা দেশের শত্রুতা করে, বন্ধুত্বের মুখোস পরে শত্রুর কাজ করে এবং তারজন্য অনুতপ্ত হয় না কোনদিনই। প্রেমানন্দ তাদের দলে নয়। জানি না প্রফুল্ল রায় তাকে কি আশা দিয়েছিল, কোন্ ছলনায় ভুলিয়ে দুর্বল মুহূর্তে তাকে দারুণ পাপে লিপ্ত করেছিল। কিন্তু এটুকু জানি, কোন মানুষই সর্বাংশে দেবতা নয়। কে আছে রক্তমাংসের মানুষ নিজের বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে যে, কোনদিন কোন দুর্বলতাই ক্ষণিকের জন্যও তার চরিত্রবল হ্রাস করতে পারবে না? অত্যন্ত দুর্বল মুহূর্তে সে যা করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত কি সে তার নিজের জীবন দিয়ে করে যায় নি? অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে তার সমস্ত কলঙ্ক কি সোনা হয়ে ওঠে নি? রাঁচির মানসিক চিকিৎসালয়ে সে তার লুপ্তজ্ঞান নিয়ে চরম পরিণতির জন্য অপেক্ষা করে কি দিন কাটায় নি? তবে কেন সে বিধাতার ক্ষমা পেল না? যখন অগ্নিযুগের বিশ্বাসঘাতকের দল এই স্বাধীন ভারতে দেশহিতৈষী সেজে ধন-মান-প্রতিষ্ঠা নিয়ে সমাজে বাস করছে, তখন মহৎ প্রাণের অধিকারী প্রেমানন্দকে কেন আমরা সুস্থ শরীরে অক্ষত চেতনায় আর ফিরে পেলাম না আমাদের মধ্যে? আমার এই লেখা পড়বার সুযোগ সে পায় নি। যদি প্রেমানন্দ একবার আমার লেখাটি পড়তে পারত তবে সে বুঝতো যে, তার চরম কলঙ্কের স্বীকৃতির পরেও তার একান্ত সুহৃদ অনন্ত সিং অথবা অন্য কোন সহকর্মী কোনদিন তার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে নি। সন্দেহ, অবিশ্বাসের পরিবর্তে তার প্রতি সমবেদনা-সহানুভূতিই ছিল তাদের মনে। মুক্তকণ্ঠে দেশবাসীকে জানাতে পারি প্রেমানন্দ ছিল সাচ্চা বিপ্লবী। দুর্বলতা স্বীকার করবার সৎসাহস ছিল তার, ছিল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার মত মহৎ প্রাণ। জেলে থাকতেই নিজের অপরাধবোধের জন্য প্রেমানন্দের মধ্যে মানসিক বিপর্যয়ের লক্ষণ দেখা দেয়। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর ক্রমে ক্রমে সে ঘোর উন্মাদ হয়ে যায়, অবশেষে তার আত্মীয়েরা তাকে রাঁচির মানসিক হাসপাতালে পাঠাতে বাধ্য হন। প্রায় এক বছর আগে প্রেমানন্দ রাঁচির হাসপাতালে দেহ ত্যাগ করেছে। বাংলার বিপ্লবী ইতিহাসে প্রেমানন্দ নিশ্চয়ই অমর হয়ে থাকবে।

আগেই লিখেছি অম্বিকাদা ও নির্মলদা প্রায় আমার সঙ্গে সঙ্গেই

জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। আমরা তিনজন জেল থেকে মুক্তি পাবার পর গ্রামে অন্তরীণ ছিলাম। কিন্তু মাস্টারদা ও গণেশকে গ্রামে অন্তরীণ করা হয় নি। তাঁরা দুজন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সোজা চলে এসেছিলেন। আমাদের মুক্তি দেওয়ার সময় কর্তৃপক্ষ এইরূপ তারতম্য কেন করলেন? রাজনৈতিক মহলে বন্দীদের মুক্তি ব্যাপারে পুলিশের এইরূপ পক্ষপাতিত্বকে নানাজনে নানা উদ্দেশ্যে বিচার করেন ও নিজ সমর্থনে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা বা অপচেষ্টায় ব্রতী হন। এ ক্ষেত্রে আমি নিজেই জানতাম—পুলিশের বন্ধু সেজে আমার অভিনয় যদি সফল না হোত তবে অত আগে আমার মুক্তি পাওয়া কোন কারণেই ঘটে উঠতো না। পুলিশ কেন আমাদের মুক্তি ব্যাপারে এই তারতম্য করল—তা' আমার অভিনয় ক্ষমতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে বোঝা গিয়েছিল। অনেকে বলে থাকেন এবং যাঁরা সরল প্রকৃতির তাঁরা বিশ্বাসও করেন যে পুলিশ একজনকে অন্যের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বা পরস্পরের মধ্যে বিভেদ ও সন্দেহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি ব্যাপারে এইরূপ ইচ্ছাকৃত ব্যতিক্রম করে থাকে। এত সহজ ও সোজা পথে বিচার বিশ্লেষণ করা মারাত্মক ভুল। প্রতিটি বিশেষ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মুক্তি পাওয়ার সময়ের ব্যবধান লক্ষ্য করে কোন ধারণা করা উচিত নয়। অনুসন্ধানের সূত্র ধরে এগোতে এইরূপ ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই সাহায্য করে, তবে সমর্থনে বা বিপক্ষে আরও অনেক প্রামাণ্য তথ্য আবিষ্কার হবার পরই প্রকৃত সত্য প্রকাশ পায়।

যশোর জেল থেকে আমাকে অন্তরীণ করা হল চব্বিশ পরগনার আমডাঙা গ্রামে। সরকার থানার কাছে দুটি ঘর আমার জন্য ব্যবস্থা করল। একটি শোবার ঘর অপরটি রান্নাঘর। রান্নাঘরটিকে ঘর বললে অত্যুক্তি করা হয়। ৬ ফুট × ৬ ফুট × ৫ ফুট ঘর, সোজা হয়ে দাঁড়ান যায় না। শোবার ঘরে একটি খাট, একটি টেবিল ও একটি চেয়ার। ঘরটিতে দরজা বলে কিছু নেই, বাঁশের কঞ্চির ওপর খড় সাজানো একটি ঝাঁপ দরজার কাজ করে।

সন্ধ্যে থেকে সকাল পর্যন্ত আমাকে এই ঘরটিতে বন্ধ থাকতে হবে; একশ' গজের মধ্যে থানা—দুবার করে সেখানে গিয়ে হাজিরা দেওয়া চাই। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার এবং অন্য কর্মচারীদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললাম। এ'রা আই. বি. পুলিশ নন, কাজেই ভাব জমানো সোজা। নানাভাবে ঘুষ দেওয়াও চলে এ'দের, এ'রা ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে কথা বলাও নিষেধ। এই অফিসার ও কর্মচারীরা কিন্তু আমার প্রতি খুব সহানুভূতিশীল ছিলেন—অর্থাৎ সহানুভূতিশীল করে নিয়েছিলাম। বড় মাছ, তরিতরকারী, পাঁঠা প্রভৃতির ভেট ম্যাজিক করতে পারে। গ্রামের মধ্যে থানা, সুতরাং দারোগাবাবুর অখণ্ড ক্ষমতা। ওপরওয়ালার অজ্ঞাতে তিনি আমাকে অনেক সুবিধে করে দিতে পারেন—দিতেনও। থানার দারোগার কাজ চোর-ডাকাত ধরা, স্বদেশীদের ধরা নয়। তাই তাঁর সহানুভূতি পাওয়া সহজ হয়েছিল এবং আমি সুযোগ করে নিয়েছিলাম অনেক দূর দূর গ্রামে বেড়াবার ও প্রয়োজনে সান্ধ্য-আইন অমান্য করবার। সরকারের বরাদ্দ মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাতা। তার ওপর বাড়ী থেকেও কিছু কিছু টাকা আনাতাম। আমার মা, দাদা ও বৌদি একবার এসে কাছেই একটা ডাক-বাংলোয় রইলেন তিন দিন—অবশ্য এটা

সরকারের অনুমতি নিয়ে। তারপর কয়েক মাস পরে আমার বাবাও এসে ক'দিন রইলেন। দারোগাবাবুকে উপহার পাঠানো কখনও বন্ধ করি নি। আমার বাবা-মাও তাঁর সঙ্গে ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেন নি।

এক বছর ছিলাম আমডাঙা গ্রামে। গ্রামের মধ্যে মাইল দুয়েক পর্যন্ত বেড়াবার অনুমতি ছিল। এই গ্রামে বেশিরভাগই দরিদ্র সাধারণ লোকের বাস —ক্যাওরা, মুচি, কৈবর্ত এবং কয়েক ঘর মুসলমান। 'স্বদেশী বাবু' নামে আমি এদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলাম।

এই দরিদ্র গ্রামবাসীদের সঙ্গে অল্প দিনেই আমি একাত্ম হয়ে গেলাম। অনুমোদিত দুই মাইল দূরত্ব ছেড়েও গোপনে বৃহত্তর এলাকা পরিক্রমা করতাম। প্রথমে সুরু হল যুবকদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা। গ্রামের সাব-পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার, মিঃ সারওয়ারের সহায়তায় একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল। গ্রামের নিজস্ব কীর্তনদল হ'ল একটি। নিয়মিত ভাবে এদের অর্থ সাহায্য করতাম। তারপর হ'ল ব্যায়ামকেন্দ্র ও ফুটবল ক্লাব এবং শেষ পর্যায়ে গ্রামরক্ষী বাহিনী। এসবই হ'ত সরকারের অগোচরে। দারোগাবাবু না দেখার ভাণ করতেন, আর তাঁর অধীনস্থ তরুণ এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সাব-ইন্‌স্পেক্টর—যিনি গ্রামে জমাদারবাবু বলে পরিচিত—তিনি নিজেই যোগ দিতেন গ্রামের যুবকসঙ্ঘে। তখনকার দিনে জেলাবোর্ডের ডাক্তারের মাইনে ছিল মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা। কাজেই আমার মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাতা বেশ বেশি বলেই মনে হোত। উপরন্তু বাড়ী থেকে টাকা আসত। কাজেই গ্রামের এই সামান্য সংগঠনগুলিকে চালাবার জন্য খুব একটা অর্থাভাবের সম্মুখীন হতে হয় নি।

আজ থেকে প্রায় আটত্রিশ বা চল্লিশ বৎসর আগেকার বিবরণ শুনে আজকের দিনের তরুণেরা ভাববেন—মাসিক মোট ৬০/৭০ টাকার মধ্যে নিজের খাওয়া পরার সব ব্যবস্থা সেরে তিনি আবার গ্রামের চাষীদের নৈশ-বিদ্যালয়, কীর্তন পার্টি, ফুটবল ক্লাব প্রভৃতি চালাতেন, এও কি সম্ভব? বর্তমানের তরুণরা জানেন যে একমণ চালের দামই ৫০ টাকার উপরে। তাই এই বিবরণ অবিশ্বাস্য মনে হলে তাঁদের কোন দোষ দেওয়া যায় না। আমার তরুণ বন্ধুদের অবগতির জন্য প্রাসঙ্গিক ভাবে এখানে বলে রাখি—সেই সময়ে ৩/৪ টাকায় চালের মণ, দুই পয়সায় ১ সের বেগুন, চার আনায় এক কুড়ি ডিম, ৪/৫ পয়সায় ১ সের দুধ পাওয়া যেত। জামা, কাপড়, জুতো প্রভৃতির অনুরূপ নিম্ন মূল্য ছিল। বর্তমানে ডি ভ্যালুয়েশন যুগের তরুণ পাঠকবর্গ সেই সময়কার খাদ্যদ্রব্য ও বসবাসের পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত থাকলে আমার তখনকার দিনের বিবরণে কোন অসামঞ্জস্য পাবেন না।

একেবারে সম্পূর্ণ মুক্তি পাবার আগে আমাকে নিজের বাড়ীতে কিছুদিন অন্তরীণ করে রাখা হ'ল। আমার ওপর আদেশ ছিল সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি বাড়ীতে থাকার এবং মিউনিসিপ্যাল এলাকা ছেড়ে কখনো যেতে পারব না, সপ্তাহে দুবার কোতোয়ালিতে (সদর থানা) নিজের উপস্থিতি জানিয়ে আসব আর যুবক, ছাত্র, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারব না।

আমার ছাড়া পাওয়ার প্রায় এক বা দেড় বৎসর পর মাস্টারদা জেল থেকে মুক্তি পান। জেল ও গ্রামের অন্তরীণ থেকে মুক্তি পেলেও আমাকে নিজ

বাড়ীতে প্রায় এক বছর নজর-বন্দী হয়ে থাকতে হয়েছিল। যে সব বিধি-নিষেধের উল্লেখ পূর্বে করেছি—সে সব উপেক্ষা করে—ফাঁকি দিয়ে অনেক কিছু করা যেত। আমার স্বগৃহে নজর-বন্দী হয়ে থাকার সময় মাস্টারদা জেল থেকে এক মাসের ছুটি পেলেন, মৃত্যুশয্যায় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। বৌদি মারা গেলেন। তারপর শ্রাদ্ধ পর্যন্ত গ্রামেই ছিলেন মাস্টারদা। মাস্টারদাদের গ্রাম শহর থেকে প্রায় পনেরো কুড়ি মাইল দূরে। শহর থেকে সোজা নৌকোয় অথবা নৌকো করে নদী পার হয়ে হাঁটা পথে ওঁদের গ্রামে যাওয়া যায়। ঠিক করলাম একদিন মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করব। রাত্রিবেলা খাওয়াদাওয়ার পর লুকিয়ে বাড়ী থেকে বেরুলাম। অর্ধেন্দু দস্ত নামে একজন খুব বিশ্বাসী যুবকের সাহায্যে গ্রামে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম।

কতদিন পরে মাস্টারদার সঙ্গে দেখা! তার ওপর আবার এমন অস্বাভাবিক পরিবেশে—সবেমাত্র বৌদি মারা গেছেন! কিন্তু তার জন্য আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ নেই। সাংসারিক ব্যাপারে এতই নির্বোধ ছিলাম তখন, সংসার সম্বন্ধে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্বন্ধে এত অনভিজ্ঞ ছিলাম যে একথা ভাবতেও এখন লজ্জা হয়—প্রথম সাক্ষাতেই আমি মাস্টারদাকে অভিনন্দন জানালাম তাঁর পত্নী-বিয়োগের জন্য—

"বেশ ভাল হয়েছে, খুব ভাল হ'ল। এবার আপনি একেবারে স্বাধীন হয়ে গেলেন, আর কোন পিছটান রইল না। বৌদি পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়ে আপনার সুবিধে করে দিলেন, বেশ হ'ল!"

আমি নিজের আনন্দে নিজেই মশগুল। একে এতদিন পরে মাস্টারদার দেখা পেয়েছি কত কষ্টে, তারপর আবার একেবারে সব ঝঞ্ঝাট চুকে গিয়েছে—খুব খুশি আমি। চট্টগ্রামের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বহুদিন পরে জেলে বসে কি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মাস্টারদার সঙ্গে ঐ সাক্ষাৎ ও আমার আনন্দের আতিশয্যে তাঁর পত্নী-বিয়োগে ঐরূপ মন্তব্যের কথা মনে পড়ে গেল। তখন মানুষের মনের কোমল অনুভূতিগুলি সম্বন্ধে বুঝতে শিখেছি, ভাবতে শিখেছি—মানুষ যে শুধু কঠোর কর্তব্যের বেড়াজালে ঘেরা থাকতে পারে না সে জ্ঞান হয়েছে। আজও লেখার সময় আমার চোখের সামনে মাস্টারদার সেই মুখ স্পষ্ট ভেসে ওঠে। মনে পড়ে আমার ঐ নির্বোধের মত আনন্দ প্রকাশের ভঙ্গী দেখে মাস্টারদা যেন প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিমেষের জন্য খুব সামান্য একটা কালো ছায়া যেন তাঁর মুখে দেখেছিলাম! পরক্ষণেই সেটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে আবার স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে সুরু করেছিলেন তিনি।

তারপর থেকে যতবারই সেদিনের কথা মনে হয়, আমি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাই। তবে একথা ঠিক, মাস্টারদা আমাকে ভুল বোঝেন নি। এই নির্বুদ্ধিতা যে আমার অজ্ঞতা এবং অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক তা তিনি বুঝেছিলেন এবং বুঝেছিলেন বলেই পরক্ষণেই তুললেন ভবিষ্যতের কথা। দুজনেই আশা করছি সমস্ত রাজবন্দীদের শীঘ্রই মুক্তি দেওয়া হবে। মাস্টারদা খুশি হলেন আমার মনোবল অটুট আছে দেখে, আর আমি জানালাম একেবারে নতুন ধরনের পরিকল্পনা যা মনে মনে আঁচ করে রেখেছি। বিস্তারিত আলোচনার সময় ছিল না। ভোর হবার আগেই বাড়ী ফিরে এলাম।

মাস্টারদার স্ত্রী খুব সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু দেশের ডাক যার কানে এসে পৌঁছেছে অন্য কোন আহ্বান সে শুনতে পায় না। চিরদিনের অবজ্ঞাত অবহেলিত গ্রাম্যবধূ আত্মীয়-স্বজনের গঞ্জনার পাত্রী ছিলেন। স্বামীর প্রতি কোন বিরূপ মনোভাব ছিল না তাঁর, নিজের ভাগ্যকেই হয়ত ধিক্কার দিয়েছেন নিরুপায় হয়ে। শেষ পর্যন্ত দেশের প্রয়োজন মেটাবার পথে সাহায্য করলেন তিনি অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে। সামান্য যা বন্ধন ছিল বিপ্লবী সূর্য সেনের তাও ছিন্ন হ'ল। এখন আপনার বলতে রইল শুধু দেশ, রইল শুধু দেশ-জননীর শৃঙ্খল মোচনের অটল প্রতিজ্ঞা।

সমাজের নিদারুণ সংকীর্ণতা ও সংস্কার কাউকে ক্ষমা করে না। মাস্টারদার স্ত্রীও সংস্কার জর্জরিত সমাজে, বিশেষ করে গ্রাম্য পরিবেশে, দিনের পর দিন নিগৃহীতা ও লাঞ্ছিতা হয়েছেন--নানা প্রকার বিদ্রূপ ও হীন কটাক্ষ সহ্য করেছেন। তাঁর অপরাধ—তিনি অপয়া, স্বামীকে আঁচলে বেঁধে রাখতে তিনি অক্ষম! এক এক সময় আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপড়শীর গঞ্জনা ও বিদ্রূপ সহ্য করতে না পেরে তিনি আত্মহত্যা করতেও চেয়েছেন। আমার মনে আছে মাস্টারদা, তাঁর ছাত্র দলিল রহমান ও সুকুমার বিশ্বাসের হাতে স্ত্রীকে চিঠি পাঠাতেন। তাঁর স্ত্রীও তাদের মারফৎ চিঠির জবাব দিতেন।

রেল কোম্পানীর টাকা লুঠ হওয়ার পর, আমাদের বিচারের সময়, মাস্টারদার স্ত্রী আমাদের বাড়ীতে আমার মা বাবার কাছে আসতেন। বিচারের জন্য জেল থেকে গাড়ী করে আমাদের যখন কাছারীতে নিয়ে আসা হ'ত তখন মাস্টারদার স্ত্রীকেও আমার মায়ের সঙ্গে পথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল না। মাস্টারদার সঙ্গেও তাঁর স্ত্রীর প্রসঙ্গ নিয়ে কোনদিনই আমার কোন কথা হয় নি। এটা যে ব্যক্তিগত বা সামাজিক কোন সমস্যা হতে পারে, সে বিষয়ে তখন আমার কোনো জ্ঞানই ছিল না।

আজ মনে হয় মাস্টারদা তাঁর স্ত্রীর এই সুকঠিন পরীক্ষার কথা জানতেন এবং হয়ত তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য দেশের মুক্তি-যুদ্ধে সাংসারিক স্বার্থ-ত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখে যেতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের দায়িত্ব বহন করার সঙ্গে আবার ঐরূপ "গৃহ-বিপ্লবের" সমস্যার উপযুক্ত সমাধানে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়নি বলেই হয়ত মাস্টারদার স্ত্রীর অকাল মৃত্যু ঘটেছে। ভারতের বিপ্লবী ইতিহাসে মাস্টারদার স্ত্রীর স্বার্থত্যাগের সঠিক মূল্য আজও নির্ধারিত হয় নি, ভবিষ্যতে হয়ত কোন দিন তাঁর এই নীরব আত্মত্যাগের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাবার সুযোগ আমরা পাবো।

৬

মুক্তি ও যুব বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্ব

"What can I give you? I can give you hunger, thirst, sleepless nights, foot-sores in long marches—and lastly, VICTORY IN THE NOBLE CAUSE!"

—Patrick Henry.

যদিও শেষ পর্যন্ত আমরা সকলেই মুক্তি পেলাম কিন্তু আমাদের আরো —প্রায় এক বছর পরে গণেশ ও মাস্টারদা জেল থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। মুক্তি পাবার পরেই আমার প্রথম কাজ হ'ল, এতদিন কা'রা সংগঠনের প্রধান দায়িত্ব নিয়েছিল এবং কার কাছে অস্ত্রগুলি আছে, তা খুঁজে বার করা।

অস্ত্রগুলি যে সদস্যের কাছে রাখা হয়েছিল এখনো যদি তার কাছেই সেগুলি থেকে থাকে তবে নিশ্চিত বুঝতে হবে যে সে পুলিশের চর নয়, তাকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করা চলে। সেই সদস্য হ'ল অর্ধেন্দু দত্ত—চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে পড়ত। একে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলাম কিন্তু বার বার সাবধান করে দিলাম যে আমার সম্বন্ধে কোন কথা সে যেন দলের দ্বিতীয় কাউকে না বলে। দলের ভগ্নাংশ যা' পড়ে ছিল তার ভার বহন করছিল ওরা পাঁচজন। তারকেশ্বর আর রামকৃষ্ণও ছিল এদের মধ্যে। তবু আমার নিজস্ব গোপনীয়তা রক্ষা করবার নীতি অনুসারে আর কাউকে তখনি বিশ্বাস করি নি বা বিশ্বাস করা সমীচীন মনে হয় নি। অর্ধেন্দুকে বলেছিলাম—আমি যে এখনো সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত আছি এ-কথা সে ছাড়া আর কেউ যেন না জানে; তা না হ'লে আমার উদ্দেশ্য বিফল হবে। তাকে আরও সাবধান করে দিয়েছিলাম যে যদি কেউ জানতে পারে তবে বুঝব 'অর্ধেন্দুই তার জন্য দায়ী'।

এই সাবধানতা অবলম্বনের একান্ত প্রয়োজন ছিল। কারণ, পুলিশকে আমি বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলাম যে আমি আর বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতিতে লিপ্ত থাকবার বাসনা রাখি না। এইরূপ অবস্থায় যদি পুলিশ বিভিন্ন সূত্রে খবর পায় যে আমি আবার সঙ্গোপনে সশস্ত্র প্রস্তুতি চালাচ্ছি তবে পুলিশের কাছে আমার জারিজুরি সব আগেই ফাঁস হয়ে যাবে। মাস্টারদা আর গণেশ ছাড়া আমি বড়দের মধ্যেও কাউকে বলি নি যে আবার সশস্ত্র আক্রমণের প্রস্তুতি করব বা করছি। যত দিন, মাস বা বছর পর্যন্ত পরিষ্কার বুঝি নি যে, যার সাথে কথা বলছি তার সঙ্গে পুলিশের সংযোগ থাকা সম্ভব নয়, সেই সময়টুকু আমি তাকে বিভ্রান্তির মধ্যে রেখেছি। সব সময় বলেছি—"এই তো সবে মাত্র ছাড়া পেয়ে এলাম, এখনো সব দেখিও নি। মাস্টারদারা সব আসুন, তার পর ভাবা যাবে কি করব। তা'ছাড়া কংগ্রেস কি কর্মপন্থা নেয় তাও দেখা উচিত ......" ইত্যাদি। যখন সাধারণভাবে প্রায় সকলের কাছে বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি করছিলাম তখন খুব কঠোর পরীক্ষা করে দু' তিনজন খুব বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য যুবক নেতা, যারা তখনও জেলে যায় নি বা পুলিশের সঙ্গে কোন সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসে নি, তাদের তৈরি করে সশস্ত্র প্রস্তুতির কাজ সুরু করি।

অর্ধেন্দুর হেফাজতে রক্ষিত একটা রিভলভার খুব গোপনে আনালাম।

জেলে বসে রিভলভারের কার্তুজ তৈরি করবার একটা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলাম। সেই পদ্ধতিতে কার্তুজ বানাবার চেষ্টা করে পুরোপুরি সফল হ'লাম। অর্ধেন্দুকে এ কথা বলতে সেও খুব খুশি। তখন বার বার সে আমাকে অনুরোধ করল আমি যেন তারকেশ্বর দস্তিদারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করি। আমাদের অনুপস্থিতিতে তারকই এখন দলের প্রাণকেন্দ্র—সুতরাং তার মতে আমার তাকে বিশ্বাস করা উচিত। বিপ্লবীকর্মী হিসাবে তারক অর্ধেন্দুর চাইতে অনেক বেশি ক্ষমতা ও গুণের অধিকারী। বলতে গেলে তারকের সঙ্গে অর্ধেন্দুর তুলনাই চলে না। কিন্তু প্রথম অবস্থায় তখন আমার প্রয়োজন ছিল এমন একজন লোকের সাহায্য, যে পুলিশের কাছে আমার উদ্দেশ্য ফাঁস করে দেবে না বা দলের অন্যদেরও বলবে না। এই হিসেবে অর্ধেন্দুকে আমি নির্ভরযোগ্য মনে করেছিলাম; কারণ, না হলে অস্ত্রশস্ত্র-গুলি এতদিনে পুলিশের হাতে চলে যেত। তা'ছাড়া যখন একজনকে মনোনীত করেছি এবং বলেছি—আমার গোপন প্রস্তুতি বা সক্রিয় মনোভাবের কথা যদি কেউ জানতে পায় তবে তাকেই দায়ী করব, তখন নীতিগতভাবে সেই অবস্থায় অন্য কাউকে আবার গুপ্ত তথ্য জানাবার প্রয়োজন কি?

শেষে যখন আরও একটু সাংগঠনিক ও টেক্‌নিক্যাল কাজের বিস্তৃতির প্রয়োজন উপলব্ধি করি তখন ঠিক করলাম তারকের সঙ্গে দেখা করে কথা বলব।

এই সময়ে একটা মনে রাখবার মত ঘটনা ঘটে। অম্বিকাদা গ্রাম থেকে এলেন। অর্ধেন্দুর বাড়ীতে তার সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন তিনি। বল-ছিলেন—

"তুমি বলতে পার আমি কি করে জানলাম যে একটা রিভলভার গ্রাম থেকে শহরে এসেছে? সেটা এই এই তারিখে 'আস্কার খাঁ দীঘি'র পারে কোন একজন লোকের কাছে ছিল—আই. বি, ইনস্পেক্টর সারদা ভট্টাচার্য এ খবর পেয়েছে। পুলিশ কি করে জানল এ কথা?"

অর্ধেন্দু বা অম্বিকাদা ভাবতে পারেন নি যে ইতিমধ্যে আমি পুলিশ সংগঠনের মধ্যে খানিকটা অনুপ্রবেশ করেছি এবং তাদের সংবাদ সংগ্রহের ধারা সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা হয়েছে। অম্বিকাদার অভিযোগ শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে ফেললাম কে পুলিশের চর। অর্ধেন্দু নয়—তার কারণ, অর্ধেন্দুর কাছ থেকে খবর পেলে সব অস্ত্রের কথাই পুলিশ জানতে পারত, শুধু 'আস্কার খাঁ দীঘি'র কথা জানবে কেন? আর দ্বিতীয়তঃ, এতদিন ধরে সব অস্ত্র অর্ধেন্দুর কাছে আছে, কাজেই আমার মতে তার অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেছে। আস্কার খাঁ দীঘির কাছে অস্ত্রাদি রাখবার কোন গুপ্তস্থান বা সেইরূপ কোন বাড়ী আছে কিনা তা' তখনও জানি না। এই রক্ষণস্থান ও জিম্মাদার সম্বন্ধে জানত একমাত্র অর্ধেন্দু। তাহলে কে এ কথা বলল? নিশ্চয়ই যার কাছে রিভলভারটি ছিল সে নিজে। আস্কার খাঁ দীঘির কাছে যে "দায়িত্বশীল" "বিপ্লবী বন্ধু" আমাদের সাহায্য করার ভাণ করে চলেছে এতদিনে তার প্রকৃত পরিচয় জানবার জন্য গোপনে চেষ্টা করতে লাগলাম।

প্রায় দুই বছর পর, চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের মাত্র ছয় মাস পূর্বে, এই বিশেষ "বন্ধুটির" মুখোসআঁটা কার্যকলাপ ধরা পড়ল আমাদের কাছে। দেখা

গেল, সে লোক ডি, এস, পি'র সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। কিন্তু একটা কথা, আই, বি, ইনস্পেক্টর সারদা ভট্টাচার্য কি কারণে বা কিসের আশায় অম্বিকাদার কাছে রিভলভারের বৃত্তান্ত প্রকাশ করতে গেল? কেউ জানত না আমি পুলিশের এই চালের রহস্য জানি। সুতরাং সে বুঝে আরও সাবধানতা অবলম্বন করতে সুরু করলাম।

বিপ্লবী পার্টিকে অতি সযত্নে বন্ধুবেশী শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করে একটি বিপ্লবী প্রোগ্রামের জন্য সর্বাংশে তৈরি করা সে যুগে, বৃটিশের কড়া শাসনে, অত্যন্ত দুরূহ কাজ ছিল। দীর্ঘ সতর্ক পদক্ষেপে যখন এইভাবে গোপনে দল গড়ে চলেছিলাম, তখন বাইরে প্রকাশ্য ক্ষেত্রে নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও আমরা কাজ করে যাচ্ছিলাম; যেমন—

(১) কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান—সুভাষ বোসের নেতৃত্বে জেলা কংগ্রেস কমিটিতে আমরা সংখ্যাগুরুত্ব স্থাপন করবার চেষ্টা করছিলাম।

(২) যুব-সংগঠন।

(৩) ছাত্র-সমিতি।

(৪) শরীর চর্চা কেন্দ্র।

(৫) মহিলা সংগঠন—এই ক্ষেত্রে বা ফ্রণ্টে উপযুক্ত কর্মীদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

বৃটিশ সরকারের পুলিশ বিভাগ আমাদের ঐরূপ বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত কি তাৎপর্য আবিষ্কার করেছিল তার সামান্য একটি নজীর দিচ্ছি। "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" নামাকরণ করে বৃটিশ সরকার আমাদের বিরুদ্ধে যে মামলা চালিয়েছিল সেই মামলার রায় ইংরেজীতে মুদ্রিত হয়ে বৃহৎ পুস্তিকাকারে বার হয়। সেই মামলার রায় থেকে কিছু নিচে উদ্ধৃত করলাম—

"The prosecution evidence may be divided into two parts, the first relating to the period from September, 1928, to April 18th, 1930, which may be described as the period of genesis and preparation, and the second relating to the period from April 18th to September, 1930, which may be described as the period of fruition and overt acts . . ."

জজসাহেব প্রকাশ্য আক্রমণের ইতিহাসকে দুটি নির্দিষ্ট সময়ে ভাগ করেছেন। তারপর তাদের বহু সাক্ষ্য-প্রমাণের মারফৎ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন—

"Thus by the end of March these six ex-detenues (Surya Sen, Ganesh Ghosh, Ambika Chakrabarty, Ananta Singh, Nirmal Sen and Lokanath Ball) by prominently associating themselves with every movement calculated to appeal to the youth of the town, and particularly the student community, had come into close touch with them and acquired manifold facilities for securing recruits to a

secret revolutionary organisation of their own under the cloak of these ostensibly innocent activities."

ট্রাইব্যুনালের জজ্ মিঃ জে, ইউনী সাহেবের দুঃখ রাখার আর জায়গা ছিল না এই ভেবে যে, আমরা ছয়জন, আপাতদৃষ্টিতে সরল নিরীহ যুবক, বিভিন্ন জনপ্রিয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে খুব প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে পুলিশের নাকের ডগায় গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছি। কি আর করি—শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ!

আগে যে ঐক্যবদ্ধ পার্টি গড়বার প্রচেষ্টা চলেছিল সারা বাংলা জুড়ে, এই সময়ে তা' একেবারে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। চট্টগ্রাম জেলা থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য সব জেলায় এবং প্রাদেশিক কেন্দ্রে কি গুপ্ত বিপ্লবীদল, কি প্রকাশ্য সমিতি, সর্বত্রই দুটি পৃথক পার্টির অস্তিত্ব দেখা গেছে। প্রধানতঃ অনুশীলন দল প্রকাশ্য সংগঠনে যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে আর যুগান্তর দল অনুসরণ করছে সুভাষচন্দ্রকে। আমাদের চট্টগ্রাম গ্রুপের যোগাযোগ ছিল যুগান্তর দল এবং সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে। তখন সুভাষ গ্রুপই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি অধিকার করেছিল সংখ্যাগুরুত্বের জোরে।

১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে আমরা জেল-ফেরত প্রায় সকলেই চট্টগ্রাম থেকে এলাম। এখানে বসে শেষবারের মত জুলুদার সঙ্গে আমাদের ঘরোয়া বৈঠক বসল। এইবারে পরিষ্কার জানা গেল যে, জুলুদা বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেন। তিনি এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। মোটামুটি তাঁর মূল বক্তব্য বিষয় ছিল এইরূপ—

"......মাস্টারদা, বুঝতে পারছেন আমি কি বলেছি? (জুলুদার কথা বলার এইটাই ছিল বিশেষ ধরন)। গোপনে দল গড়া এখন একেবারে অসম্ভব। কিছুদিনের জন্য আমাদের গুপ্ত সশস্ত্র প্রস্তুতির কথা ভুলে যেতে হবে। আপনারা সবাই সারা বাংলার সমবেত পার্টিতে (বিভিন্ন প্রধান পার্টির সমন্বয়ে গঠিত) যোগ দিন। আপনাদের এখন কংগ্রেসে কাজ করতে হবে। আমি এখন রাজনীতি থেকে একেবারে সরে যাব। যখন পুলিশের মনে ধারণা হবে যে আমি আর কোন রকম বিপ্লবী কাজ করব না, তখন হয়ত আবার কাজে নামতে পারি। সেভাবে কোন কাজে হাত দিলে সফলও হতে পারি......।"

এর পর থেকে জুলুদার সঙ্গে বৈপ্লবিক কর্মক্ষেত্রে আর আমাদের কোন সম্পর্ক রইল না।

১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে বাংলাদেশের বিপ্লবী যুবকেরা সুভাষ-চন্দ্রের নেতৃত্বে ঠিক বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর মত সুসজ্জিত বিরাট এক স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনী গঠন করল। তাদের মধ্যে ছিল অশ্বারোহী দল, মোটর সাইকেলবাহিনী, এ্যাম্বুলেন্সবাহিনী প্রভৃতি। ভারতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে এ রকম সংগঠন এই প্রথম। এই রকম প্রকাশ্যভাবে সৈন্যবাহিনীর অনুকরণে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন প্রত্যক্ষ করে বাংলার তরুণ বিপ্লবীরা উৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

চট্টগ্রামে ফিরে এসে আমরাও শহরের তরুণ উৎসাহী যুবকদের নিয়ে মাসখানেকের মধ্যে একটি সজ্জিত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী তৈরি করে ফেললাম।

১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কংগ্রেস অধিবেশন সমাপ্ত হল। ১৯২৯-এর ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস পালন করা হবে সারা ভারতবর্ষে। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর এবার আমরা খুব জাঁকজমক করে চট্টগ্রামে স্বাধীনতা দিবস পালন করলাম। সাদা পোষাকে ভলান্টিয়ারবাহিনী জমায়েত হল। মিলিটারী ব্যাণ্ডের অনুকরণে ব্যাণ্ড বাজল, কামানের পরিবর্তে একুশটি দেশী বোমা ফাটান হল, বন্দেমাতরম ও ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনির মাঝে জাতীয় কংগ্রেস পতাকা উত্তোলিত হল। স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী পরিচালনা করল গণেশ। চট্টগ্রামে এই প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালিত হল। শাসকবর্গের কাছে এইরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৈপ্লবিক চেতনার প্রকাশ নিঃসন্দেহে খুবই চিন্তার কারণ হয়েছিল। আমরা স্থির করেছিলাম আমাদের জেহাদ ঘোষণা করতে হবে শান্তিপ্রিয় এবং আইনসম্মত জড় মনোভাবের বিরুদ্ধে। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এইরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন ও যুবকদের মধ্যে এইভাবে সাড়া জাগান সেই যুগে একান্ত প্রয়োজন ছিল। আমার মনে হয় বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের ঐরূপ বৈপ্লবিক মনোভাবের প্রকাশ বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল বিপ্লবী তরুণদের সেই সব শান্তিপ্রিয় "স্বদেশ প্রেমিকদের" বিরুদ্ধাচরণ করতে, যাঁরা চাইছিলেন "To depend permanently on legal activity" (সব সময় কার্যক্রম আইনের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখতে)।

এই অনুষ্ঠানের পর থেকে চলতে লাগল সভা-সমিতি, ব্যায়াম শিক্ষা, সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ; আর গোপনে গুপ্ত বৈপ্লবিক দলে সংগ্রহ হতে লাগল বাছাই করা যুবক।

ব্যায়ামকেন্দ্রগুলি খুব জোরের সঙ্গে চালাতে লাগলাম এবং সেই সাথে শহর ও গ্রামেও আমরা আমাদের ব্যায়ামকেন্দ্রের প্রদর্শনী দেখাতাম। প্রথম প্রথম, যখন আমাদের মধ্যে ভাঙন ধরেনি, তখন পর্যন্ত অনুশীলন পার্টির এবং আমাদের দলনিরপেক্ষ চট্টগ্রাম গ্রুপের পরিচালিত ব্যায়ামকেন্দ্রগুলি একত্রে এরকম বহু প্রদর্শনী দেখিয়েছি। এই সব প্রদর্শনী সে যুগের সাধারণ লোক এবং উৎসাহী যুবকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হত। শারীরিক ক্ষমতার নিদর্শন হিসাবে দেখান হত মোটর গাড়ির গতি-রোধ, ভার উত্তোলন, বুকের ওপর দিয়ে ভারী রোলার চালান, লোহার শিক ও পাত দুমড়ানো, ইত্যাদি। লোকনাথ বল, নরেশ, রজত, মনা, বিধু, মাখন এবং আমাদের দলের আরো অনেকে অনুশীলন পার্টির বন্ধুদের সঙ্গে মিলে অসংখ্য কসরত দেখিয়েছে। তখনও আমরা (যুগান্তর ও অনুশীলন) পৃথক হয়ে যাই নি। আমাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল মুষ্টিযুদ্ধ এবং যুযুৎসু। জিমনাস্টিক চর্চার সময় আমরা অবশ্য ব্যালেন্সের খেলার চাইতে বেশি নজর দিতাম শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির কৌশলী খেলার দিকে। অনুশীলন পার্টির বন্ধুরা ছোরা এবং লাঠি খেলায় বেশি ওস্তাদ ছিল। তাদের মধ্যে উত্তর ধর, ব্রজেন, ধীরেন দাশগুপ্ত, রবিন দত্ত, প্রমুখ বেশি অগ্রণী ছিল। এইভাবে নানা ধরনের অনুষ্ঠান দিয়ে আমরা একএকটি প্রদর্শনীকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতাম।

যখন খুব জাঁকজমক করে ব্যাণ্ড বাজিয়ে ও আলোকসজ্জার মধ্যে শারীরিক শক্তির ক্রিয়া-কৌশল প্রদর্শনীর আয়োজন করতাম তখন দর্শকবৃন্দের আনন্দের জন্য জোকারের হাস্য-কৌতুকের ব্যবস্থাও থাকত।

আগেই বলেছি, আমি Public Hall-এ টিকিট করে ম্যাজিক দেখিয়েছি। আমার একটি Illusion Box ছিল। অর্থাৎ হাতকড়ি পরিয়ে, ভাল করে বস্তাতে পুরে বস্তার মুখ বন্ধ অবস্থায় সেই Illusion Box-এ আমাকে বন্ধ করে রাখলেও নিমেষে দর্শকবৃন্দের সামনে বেরিয়ে আসতাম।

এইরূপ শারীরিক ক্রিয়া ও শক্তির প্রদর্শনীর সময় আমাদেরই এক তরুণ বন্ধু নরেশ চট্টোপাধ্যায় এই খেলাটি দেখিয়ে দর্শকবৃন্দকে অবাক করে দিত। Illusion Box-এর গুপ্ত তথ্য শেখবার জন্য নরেশ যে কী একান্তভাবে সাধনা করেছিল তা আমার আজও মনে আছে!

মজার কথা হল Illusion Box-এর খেলা দেখাত নরেশ আর সেই সময় আমি একটি ছোট বক্তৃতা দিতাম ঐ খেলাটি সম্বন্ধে; তবু নাম হত—"অনন্ত সিংহ তার অদ্ভুত শক্তির জোরে হাত পা বাঁধা, থলিতে পোরা, বাক্স বন্ধ লোককে মুক্ত করে নিয়ে এল।"

প্রথম যেবার আমরা খেলা দেখাই তখন এক বিপদে পড়ি। খেলা দেখাবার পর রাত্রে খাওয়া-দাওয়া ও তার পর এক জমিদারবাড়িতে রাত্রে থাকার ব্যবস্থা ছিল। জমিদারবাড়ির সবাই শঙ্কিত হয়ে উঠল। তাদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল—"তালা বন্ধ সিন্দুক যেমনটি আছে তেমনই থাকবে, কিন্তু সিন্দুক ফাঁকা হয়ে যাবে!"

বাড়ির টাকা অপসারণ, পরোইকোরা ডাকাতি, রেলের টাকা লুঠ, নাগারখানার খণ্ডযুদ্ধ, সবই আমার নামের সঙ্গে জড়ানো আছে। তারপর আবার শারীরিক শক্তির প্রদর্শনী—মোটরের গতিরোধ করা, রোলার বুকের ওপর নেওয়া—সর্বোপরি এই Illusion Box! কে আমাকে সাহস করে নিজের বাড়ীতে স্থান দেবে? বিশেষতঃ ধনী জমিদারের ভয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কি আর করা—খাওয়া-দাওয়ার পরে অর্ধেন্দু আমাকে অন্য বাড়ীতে নিয়ে গেল।

ব্যায়ামকেন্দ্রগুলি ও প্রকাশ্য মিলনকেন্দ্রগুলি আমাদের পরস্পর মেলামেশার সুযোগ দিত। তাই অনুশীলন ও আমাদের গ্রুপের যুবকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা থাকায় একসঙ্গে ব্যায়াম প্রদর্শনী প্রভৃতির আয়োজন করেছি। কিন্তু ব্যায়াম করি বা প্রদর্শনীর আয়োজনই করি, আমাদের দুই পক্ষেরই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবী যুবকদের দলে সংগ্রহ করা। তাই বাছা বাছা যুবকদের দলে টানবার ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে বিপক্ষ দলের রেষারেষি চলত। যদি খুব উপযুক্ত কোন যুবক আমাদের নজরে আসত, তবে তাকে কে আগে দলে টানবে তার জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ হত।

আমার মনে আছে বৃন্দাবন আখড়ায় একটি যুবক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, অত্যন্ত উৎসাহী যুবক। চলাফেরা কথাবার্তা সবই বিশেষ ধরনের—মনে ছাপ ফেলে। যেমন শরীরচর্চার দিকে তার লক্ষ্য ছিল তেমনি আবার লাঠিখেলা ছোরাখেলাতেও সে বেশ সুদক্ষ। বক্তৃতা দিত ভাল, লিখত ভাল—স্বভাবতই আমার ইচ্ছে ছিল তাকে দলে টানবার। তার নাম ধীরেন দাসগুপ্ত (আজকের হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের বার্তা সম্পাদক ও সাংবাদিক)। তার সহপাঠী ও বন্ধুরা হল—রজত, মনোরঞ্জন, সুখেন্দু, প্রমথ। তখনও ঠিক জানতাম না অনুশীলনের সঙ্গে তার কতখানি যোগ আছে। আমাদের বন্ধুদেরও

খুব ইচ্ছে ছিল ধীরেনকে দলে পাবার। তাই আমি নিজে ধীরেনের সঙ্গে বেশ মিশেছি এবং জেনেছি, সে অনুশীলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। তবু তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। এই একটি বিশেষ উদাহরণ দিলাম। এ ছাড়া প্রত্যেক কেন্দ্রে, পাড়ায়, স্কুল-কলেজে সাধারণভাবে এই প্রতিযোগিতা লেগেই ছিল।। তবে ধীরেনের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করছি এই কারণে—তখন মনে হয়েছিল তাকে দলে আনতে না পারা যেন আমারই পরাজয়।

১৯২৯ সালে, ১১ই, ১২ই ও ১৩ই মে-তে আমাদের উদ্যোগে জেলা কংগ্রেস সম্মেলনের আয়োজন হল। সেই সঙ্গে আরও তিনটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়—ছাত্র, যুবক ও মহিলা সমিতির সম্মেলন। মহা সমারোহে আমাদের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে এই সব সম্মেলনের কাজ সম্পন্ন হয়। যেহেতু নেতৃত্বের লড়াই, সেহেতু তার স্বাভাবিক পরিণতির হাত থেকে আমরা রেহাই পাইনি। অনুশীলনদল আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। আমাদের উভয় দলের মধ্যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক তফাৎ ছিল। সেই অনুসারে ও অনুপাতে সাংগঠনিক কার্যধারা এবং প্রচারের মধ্যেও মূলগত প্রভেদ ছিল। সূক্ষ্ম বিচারের মধ্যে না গিয়ে সাধারণভাবে যা প্রকাশ পেয়েছে তাতে বোঝা যায় যে, আমরা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সর্বপ্রথম ও প্রধান স্থান দিতাম।

এই সময়ে সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা তখনকার যুগের যে আদর্শ প্রচার করতে চেয়েছি তা আমাদেরই বিপক্ষ দল বুঝতে পারে নি এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের একটি প্ল্যাকার্ড তারা ছিঁড়ে ফেলে। এই নিয়ে প্রকাশ্যে আমাদের সঙ্গে তাঁদের একটু সঙ্ঘর্ষ হয়। আমাদের মামলার রায় থেকে উল্লেখ করছি :

"On 11th, 12th and 13th May, four Conferences, viz., a District Congress Conference, a Youth Conference, a Student Conference and a Ladies Conference were held in the organization of which these six detenues took a leading part. Surjya Sen and Ganesh Ghosh were secretaries of the District Congress and Youth Conference respectively. ......Immediately before the Conference posters bearing slogans such as PARADHINATAR BEDANA (Ex. CCXCIX series) were exhibited at prominent places throughout the town and leaflets of which, (Ex. CDLXXXI), is a specimen, were distributed in the streets. This, starting with the invitation "Come Young Men" and a quotation from Tagore "Shall the alter of the Goddess of Bondage remain erect for ever" goes on to state in extravagently rhetorical language that to-day all over the world the youth have awakened like a dormant Volcano to sweep away all existing evils and usher in a golden age, that the power of youth has changed the fate of China, has awakened new aspira-

tions in the hearts of the Turks and has infused new life into the weak and decaying body of Russia and concludes with the moral "Today your unhappy motherland eagerly awaits the employment of the energy slumbering in you. Join at once the Chittagong Youth Association which is the meeting place of the servants of the country."

"Inside the Conference pandel were displayed other placards bearing mottoes of a similar character and one with the inspiration 'Age desh pare nyay and dharma' (The country first and thereafter right and religion). On the 12th May, the concluding portion of this motto was torn off......"

"On the afternoon of the 12th the volunteers appeared armed with heavy cane lathis and that night some 20 or 25 of them led by Ananta Singh, Lokanath Bal, Naresh Ray and Tripura Sen trespassed into the compound of Radhika Dutta (P.W. 231) which was situated on the opposite side of the road from the Conference pandel and brutally assaulted Radhika with lathis on the pretext that brickbat had been thrown into the pandel from the direction of his compound. A case under section 147 I.P.C. was instituted in which on 23-10-29 Ananta Singh was convicted and sentenced to undergo four month's rigorous imprisonment while Lokanath Bal, Naresh Ray and Tripura Sen were fined...."

মামলার রায়ে জজসাহেব বলছেন যে,—ছয়জন প্রাক্তন ডেটিনিউ-এর নেতৃত্বাধীন সংগঠনের আওতায় (in the organisation in which these six ex-detenues took a leading part) এই চারটি কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সূর্য সেন কংগ্রেসের ও গণেশ ঘোষ যুব সমিতির সম্পাদক ছিলেন।.........কন্‌ফারেন্সের পূর্ব মুহূর্তে সারা শহরে 'পরাধীনতার বেদনা......' প্রভৃতি লেখা পোস্টার এবং বহু প্রচারপত্র বিলি করা হয়। প্রচারপত্রে যুবকদের উদাত্ত আহ্বান জানান হয় এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতা "শিকল দেবীর ঐ যে পূজাবেদী, চিরকাল কি রইবে খাড়া......" ব্যবহার করা হয়। তারপর অলঙ্কারপূর্ণ ভাষার আতিশয্যে প্রচারপত্রে বিবৃত হয়েছে যে, আজ সারা পৃথিবীর যুবশক্তি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়ে আবর্জনা দূর করবে ও এক স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করবে। জাগ্রত যুবশক্তি চীনের ভাগ্য পরিবর্তন করেছে, তুর্কী জাতির মধ্যে নব-আশার সঞ্চার করেছে এবং দুর্বল মরণাপন্ন রুশ দেশে নতুন জীবন সৃষ্টি করেছে। অবশেষে নৈতিক উপদেশ দিয়ে প্রচারপত্রটি শেষ করা হয়েছে—'আজ তোমাদের দুঃখিনী জন্মভূমি আকুল প্রতীক্ষারত, কতক্ষণে তোমরা নিজেদের অন্তর্নিহিত

সুপ্ত শক্তি দিয়ে আঘাত হানবে। কালবিলম্ব না করে দেশসেবকেরা চট্টগ্রাম যুব-সমিতিতে যোগ দাও।'

কন্‌ফারেন্স প্যাণ্ডেলের মধ্যে এই রকম আরো অনেক প্ল্যাকার্ড ছিল। বিশেষ করে একটি প্ল্যাকার্ডে ছিল—'দেশ আগে, ন্যায় ও ধর্ম অনেক পরে'। অনুশীলন দলের একজন সভ্য এর শেষের অংশটুকু (ন্যায় ও ধর্ম অনেক পরে) ছিঁড়ে ফেলে। এর কারণ, প্রথমতঃ, সম্পূর্ণ আমাদের নেতৃত্বে এই কনফারেন্স চলাটা আমাদের বিরুদ্ধ দল, বিশেষতঃ অনুশীলন দল, কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। দ্বিতীয়তঃ, অনুশীলন দলের সঙ্গে আমাদের মূলগত পার্থক্য হল, আমরা সব কিছুর, এমন কি ন্যায় ধর্মেরও, উর্ধ্বে দেশের মুক্তি সংগ্রামকে স্থান দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা সব কিছুর ওপরে দেশের মুক্তি সংগ্রামকে স্থান দেওয়া বিবেকবিরুদ্ধ বলে মনে করল এবং এর প্রতিবাদে সারাদিন, বিশেষ করে সন্ধ্যার পর থেকে কনফারেন্সে ইটপাটকেল ফেলতে লাগল। মাঝে মাঝে ছোটখাট সংঘর্ষও চলতে থাকল। শেষ পর্যন্ত আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং এইরকম গোলমালের একটা স্থায়ী প্রতিকারের জন্য বাধ্য হয়ে কিছু কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। আমরা কুড়ি পঁচিশজন এক সঙ্গে লাঠি নিয়ে ওদের আক্রমণ করি, রাধিকাবাবু (শ্রীরাধিকা দত্ত) আহত হন। পুলিশ এই রকমই একটা সুযোগ খুঁজছিল। এই ঘটনার পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং পুলিশবাহিনী নিয়ে এসে শান্তিরক্ষার নামে প্যাণ্ডেলের চারদিকে পুলিশ মোতায়েন করল। পরদিন পুলিশ কনফারেন্সে কোন রকম বাধা সৃষ্টি না করে আমাদের গ্রেপ্তার করে এবং ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি দেয়। তিন-চার মাস পরে আমাদের বিচার হয়, বিচারে আমার চার মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যদের অর্থ দণ্ড হয়।

এইভাবে জেলা কংগ্রেসের রাজনৈতিক এবং ছাত্র ও যুব সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটল। সুভাষচন্দ্র (তখনও তিনি 'নেতাজী' নামে পরিচিত হন নি) সেই রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। আমাদের সামরিক কায়দায় শিক্ষিত ও সামরিক পোষাকে সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী তাঁকে অভিবাদন জানায়। তিনি দেখে খুশি হন। তারপর দুপুর-বেলা মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের গোপন কক্ষে তিনি গণেশ, ত্রিপুরা সেন ও আমার সঙ্গে অন্যের সম্পূর্ণ অসাক্ষাতে মিলিত হয়ে ভলান্টিয়ার সংগঠন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। যতদূর সম্ভব খোলাখুলি তাঁর সঙ্গে আমরা আলাপ করলাম। তাঁকে খুব ভালভাবে বুঝতে দিয়েছিলাম যে, আমরা মিলিটারী পোষাকে সজ্জিত হয়ে কংগ্রেসের নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ভলান্টিয়ার হয়েই কংগ্রেসের শোভাবর্ধন করব না। সুভাষবাবুকে আমাদের মত জানালাম যে, কংগ্রেসের নন্-ভায়োলেন্স নীতি আমরা কখনই অন্তর দিয়ে সমর্থন করি না। আমরা মাত্র কৌশল হিসাবে নন্-ভায়োলেন্স নীতি সাময়িকভাবে মেনে চলি এবং এই নন্-ভায়োলেন্স নীতির অন্তরালে সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হতে চাই। বলা বাহুল্য, সুভাষবাবু আমাদের দৃঢ় মনোভাবের আভাস পেয়ে আমাদের যুব-বিদ্রোহের পরিকল্পনাকে তাঁর নৈতিক সমর্থন জানান। কেবল যে আমাদের কাছে তিনি অন্যের অগোচরে নৈতিক সমর্থন জানিয়ে-ছিলেন তা নয়, এ ছাড়াও যখন কন্‌ফারেন্সে ভাষণ দেন তখন তিনি যদিও

মহাত্মাজীর প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা জ্ঞাপন করলেন, তবু মহাত্মাজীর নন্-ভায়োলেন্স নীতির প্রতি আনুগত্য জানাতে পারলেন না।

আমাদের মামলার রায়ে জজসাহেব সুভাষবাবুর বক্তৃতার মর্ম থেকে লিখলেন :

"That day, (অর্থাৎ, সেই দিন—১২ই মে, যেদিন আমাদের পোস্টার—'দেশ আগে, ন্যায় ধর্ম অনেক পরে'—ছিঁড়ে ফেলা হল) **the presidential speech was delivered by Mr. Subhas Bose, its tenor being that he had faith in Mahatma Gandhi but he could not see how the Country could be saved by non-violence." (Printed Judgement of 1st Armoury Raid Case, Page—6).**

যুব সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিপ্লবী নেতা জ্যোতিষদা (প্রফেসর জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ)। তিনিও তাঁর ভাষণে যুবসমাজকে আহ্বান জানান সংগঠিত হতে। তিনি প্রশংসা করেন আমাদের সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ও যুব সমিতির। প্রচণ্ড যুব শক্তির ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন—'যুবকেরাই জাতির মেরুদণ্ড, দেশের আশা-ভরসা, স্বা[illegible] বীর সৈনিক।'

ছাত্র সম্মেলনে প্রখ্যাত নেতা প্রফেসর নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে জ্যোতিষদার অনুকরণে ছাত্র ও যুবসমাজকে স্বাধীনতা সংগ্রামে সঙ্ঘবদ্ধভাবে দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসতে বলেন।

এতক্ষণ যে সব তথ্য প্রকাশ করলাম তাতে সহজেই বোঝা যায় যে, আমরা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তখনকার দিনে আমাদের সীমিত শক্তি ও জ্ঞানের গণ্ডির মধ্যে যুব বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন, ব্যায়মকেন্দ্র স্থাপন, যুব সমিতির প্রতিষ্ঠা, যুব কন্ফারেন্স, সশস্ত্র সংগ্রামের অভিপ্রায়ে যুবকদের মানসিক প্রস্তুতির জন্য বিশেষ ধারায় শ্লোগান, পোস্টার, প্রচারপত্র, আমাদের বক্তৃতা, গান্ধীজীর নন্-ভায়োলেন্স নীতি ও বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের ভায়োলেন্সের ইঙ্গিত এবং আমাদের সঙ্গে গোপন বৈঠক ইত্যাদি সন্দেহের কোন অবকাশ রাখে না যে, আমরা সশস্ত্র যুব বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রামের এই অধ্যায়টিকে যদি আমরা "চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ" বলে অভিহিত করি তবে আশা করি ভুল হবে না।

এইবার এল কংগ্রেস নির্বাচনের সময়। আমাদের জেলা থেকে বি, পি, সি, সি'র সদস্য নির্বাচন করে পাঠাতে হবে এবং জেলা কংগ্রেস কমিটি ও কার্যকরী কমিটির সভ্যদের নির্বাচিত করা হবে। শুধু আমাদের জেলায় নয় বাংলার সব জেলায় এবং প্রদেশের কেন্দ্রস্থল কলকাতায় দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হল। দুই বিবদমান দল ঝগড়াঝাটি এমন কি মারামারিও সুরু করে দিল নিজ নিজ জেলা কংগ্রেসে ও প্রাদেশিক কংগ্রেসে স্ব-গোষ্ঠীর অধিকার বজায় রাখতে। প্রশ্ন হল কোন্ দল নির্বাচনে জয়ী হবে? —যতীন্দ্রমোহনের না কি সুভাষ বোসের সমর্থকেরা? বি, পি, সি, সি'র সভাপতিরূপে কাকে নির্বাচিত করা হবে—যতীন্দ্রমোহন না সুভাষ বোসকে?

যতীন্দ্রমোহন নিজে চট্টগ্রামের লোক—ভারতের নেতা। অসহযোগ

আন্দোলনে তাঁর অবদান [illegible] প্রত্যক্ষ করেছে। তাঁর দলে রয়েছেন চট্টগ্রামের লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাগরিক মহিম দাস, মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের ত্রিপুরাবাবু, লোন কোম্পানীর সতীশ নাগ, আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নলিনী দাস, প্রাক্তন বিপ্লবী ও কমার্শিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ চন্দ্রশেখরবাবু, স্থানীয় পত্রিকা 'পাঞ্চজন্য'র পরিচালকেরা এবং সর্বোপরি চট্টগ্রামের অনুশীলন পার্টির সমবেত শক্তি। এ'দের বিরুদ্ধে সুভাষ বোসের সমর্থনে আমরা ছয়জন—লোকনাথ, গণেশ, অম্বিকাদা, মাস্টারদা, নির্মলদা, আমি এবং আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি।

এই দুই অসম শক্তির প্রতিযোগিতা সুরু হ'ল। আমরা কিছুতেই হার মানব না। সমস্ত বুদ্ধি ও শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করব—এই ছিল আমাদের পণ। কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবে কার্যনির্বাহক সমিতি। সুতরাং প্রতিবার নির্বাচনের পূর্বে সদস্য-সংগ্রহ অভিযান সুরু হয়। আমরা চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির কুলিদের মধ্যে, বার্মা শেল কোম্পানীর শ্রমিকদের মধ্যে কাজ সুরু করলাম—তাদের কংগ্রেস-সভ্য করলাম। ছাত্রদের মধ্যেও অভিযান চালালাম। দিবারাত্রি ঘুরে ঘুরে আমাদের সমর্থকদের কংগ্রেস সদস্য করতে লাগলাম।

আমাদের এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল না। নির্বাচনে জয় হল আমাদের। আমাদের সফলতার সম্ভাবনায় বিপক্ষ দল ক্ষিপ্ত হয়ে টাউন হল প্রাঙ্গণে আমাদের নির্বাচনীসভা পণ্ড করে দিতে এল। তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে আরও এক ঘণ্টা ধরে আমাদের সভার কাজ চলল। কিন্তু এই সঙ্ঘর্ষের ফলে আমাদের অনেকে আহত হলেন। একটা চেয়ার ছুড়ে মারায় মাস্টারদা আহত হলেন; সুখেন্দুকে ছোরা মারা হয়েছে শুনে একা ছুটে যাচ্ছিলেন নির্মলদা—তিনিও আহত হলেন। কংগ্রেস অফিসে বিজয়ী স্বেচ্ছাসেবকেরা মিলিত হল। তাদের সাহস এবং দৃঢ়তাকে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে এলেন মাস্টারদা—তাঁর মাথা দিয়ে তখনো রক্ত ঝরছে!

ছোট্ট কংগ্রেস ভবন সংলগ্ন মাঠে সে এক ভয়াবহ দৃশ্য! আমাদের অর্ধসহস্র বিক্ষুব্ধ অধীর অস্থির ক্রোধান্বিত সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী মাস্টারদার সামান্য রক্তের বদলেও প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ঘন ঘন তাদের মধ্যে থেকে রব উঠছে, "প্রতিশোধ চাই" "প্রতিশোধ চাই"। বিরুদ্ধ দলের সমস্ত প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে টাউন হলে এক ঘণ্টারও ওপর আমাদের পূর্ণ অধিকার ছিল এবং কংগ্রেস মনোনয়ন সভা শেষ করবার পরেই আমাদের ভলান্টিয়ার বাহিনীর এই সমাবেশ। প্রত্যেকের হাতে লাঠি, বাখারী, চেয়ারের পায়া, রেলিংয়ের খুঁটি—যার পক্ষে এইরূপ কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি, তার হাতেও আছে থান ইট!

মাস্টারদা যখন তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং তাঁর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরার চিহ্ন দেখতে পেল সবাই, তখন তারা আরও অশান্ত ও চঞ্চল হয়ে উঠল। আমাদের সকলেরই মনে হ'ল এই বুঝি অবস্থা আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে কংগ্রেসের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই আজ বুঝি আমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়। কী ভয়াবহ ব্যাপার! কী সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা!

উত্তাল সংক্ষুব্ধ তরঙ্গরাশি যেন এক মুহূর্তে নিশ্চল, শান্ত, স্থির হয়ে

গেল যখন মাস্টারদা সবাইকে ধীর, শান্ত ও দৃঢ়কণ্ঠে সম্বোধন করে বললেন, "....কংগ্রেসের মনোনয়ন সংগ্রামে জয়ী হওয়া আমাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বে সর্বশক্তি ক্ষয় করা বিপ্লবীদের শোভা পায় না। এই সামান্য দ্বন্দ্বকে সামান্যভাবেই দেখতে হবে—উপেক্ষা করতে হবে। বিপ্লবী যুক্তির প্রভাব আশা করি আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট-বিচ্যুতি থেকে বিরত করবে। আমার অনুরোধ আপনারা সবাই খুব শান্তভাবে এক্ষুণি বাড়ী ফিরে যান..."।

নরেশ রায় আদেশ দিল—"সবাই যার যা হাতিয়ার আছে সব ফেলে দাও। লাঠিগুলি এখানে জমা দাও।" সকলেই আদেশ অনুযায়ী কাজ করল। তার পর ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যার বাড়ী রওনা হল।

তারা ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় কে যেন পেছন থেকে ছুরি দিয়ে সুখেন্দুর পিঠে আঘাত করে। সুখেন্দুর মেরুদণ্ড ভেদ করে মেরুরজ্জু দু'ভাগ হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তার পা দু'টি অবশ হয়ে পড়ে। গভর্নমেন্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল তাকে। সিভিল সার্জেন পরীক্ষা করে বললেন ওকে বাঁচানো যাবে না। মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে সুখেন্দু আক্রমণকারীদের দশজনের নাম করে। সেই দশজনকে বিচারের জন্য সেসন কোর্টে পাঠান হয়। আমাদের শেষ পর্যন্ত সময় দিয়ে কোর্টে ডেকেছে সাক্ষী দিতে, কিন্তু আমরা যাই নি। তখন ওটাকে বাজে কাজ বলে মনে হয়েছে। সাক্ষী দেওয়ার সময় বা ইচ্ছে কোনটাই আমাদের ছিল না।

চট্টগ্রাম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পর তারা সবাই খালাস হল—কারণ, আমরা কেউ সাক্ষী দিই নি। এই কংগ্রেস ইলেক্‌সন্‌ ও পূর্বোক্ত ঘটনা আমাদের সশস্ত্র আক্রমণের মাত্র ছয়-সাত মাস আগে ঘটেছিল। তাই আমাদের আরো বেশি মনে হয়েছিল যে মামলা, মোকদ্দমা, অন্তর্দ্বন্দ্ব সব বাজে কাজ।

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের দশম শ্রেণীর কৃতী ছাত্র ছিল সুখেন্দু। সরল, সপ্রতিভ চেহারা, ধীরে ধীরে কথা বলত, মনের ভাব তার মনেই চাপা থাকত, বাইরের আড়ম্বর ছিল না কিছুই। তার উজ্জ্বল চোখ দুটি ছিল সরলতার প্রতীক কিন্তু তার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল বিপ্লবী দৃঢ়তা। আমি খুব পছন্দ করতাম সুখেন্দুকে। আমাদের দলের একজন সম্ভাব্য কৃতী বিপ্লবী ছিল সে।

বিপ্লবের খাতায় রক্তাক্ষরে একবার যার নাম লেখা হয়েছে দেশের জন্য তার রক্তপাতে শোক করার কথা নয়। কিন্তু সুখেন্দুর মৃত্যু হল কোন্‌ পরমার্থ লাভের পথ পরিষ্কার করতে? সুখেন্দু তার প্রাণ দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে গেল যে, আত্ম-কলহে শক্তিক্ষয় করে আমরা সর্বনাশের পথে এগিয়ে চলেছি। যে প্রাণ উৎসর্গ করা হয়েছিল শত্রুনিধনে, সে প্রাণের এমন অযথা অপচয়! —এ রোধ করতেই হবে। সুখেন্দুর মৃত্যু আমাদের বিপ্লবী দলের গতিপথের মোড় ঘুরিয়ে দিল। কংগ্রেস অধিকার করে কি হবে? কংগ্রেসের মাধ্যমে কতটুকু শক্তি অর্জন করব আমরা? আর, কংগ্রেস অধিকার করতে গিয়ে যদি সুখেন্দুর মত অমূল্য রত্ন হারাতে হয় তবে সে তো একটা বিরাট পরাজয়! তাই আলোচনার পর স্থির হ'ল এখন থেকে আর কংগ্রেস অধিকার করার জন্য দেশের লোকের সঙ্গে বা বিরুদ্ধ পার্টির সঙ্গে লড়াই-এর প্রোগ্রাম নয়; এবার সর্বশক্তি প্রয়োগ করা হবে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে গভর্নমেন্ট

অধিকার বা তাকে বিপর্যস্ত করার উদ্দেশ্যে।) মাস্টারদা বিক্ষুব্ধ ভলান্টিয়ার বাহিনীকে সেই ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন। ওদিকে সুখেন্দু ছুরিকাহত হয়ে চট্টগ্রামে জেনারেল হাসপাতালে অন্তিমশয্যায়। সিভিল সার্জেন বলেছেন, তার বাঁচার কোন আশা নেই। তবু আমরা শেষ চেষ্টা করে দেখব বলে সুখেন্দুকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলাম।

যেদিন সুখেন্দুকে কলকাতায় আনা ঠিক হয় তার আগের দিন জেনারেল হাসপাতালে মাস্টারদার সঙ্গে নির্জনে বসে একটা গুরুতর বিষয়ে আলোচনা হল। বললাম—

"মাস্টারদা আসুন, আজ এখানে বসে আমরা ঠিক করি যে, কংগ্রেসের নেতৃত্ব পাবার জন্য আমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে আর শক্তিক্ষয় করব না। এতদিন জনসাধারণের মধ্যে কাজ করেছি—কংগ্রেস, যুব-সঙ্ঘ, ছাত্র-প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ও শক্তিসঙ্ঘ, ভলান্টিয়ার বাহিনী প্রভৃতি গড়ে তুলেছি। এটা সত্যি এবং প্রমাণিতও হয়েছে যে, আমাদের একাগ্রতা ও নিষ্ঠা দিয়ে জনসাধারণকে আমাদের প্রতি আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছি। আমাদের বিপ্লবী সংগঠনের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে আমরা যে যথেষ্ট সুনাম ও জনপ্রিয়তার অধিকারী, সে কথা আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কংগ্রেস নির্বাচনে শক্তি পরীক্ষায় জয়ী হয়েছি, চট্টগ্রামের যুব-সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করেছি। আজ সুখেন্দুর মৃত্যুশয্যায় বসে আমরা পথ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। এই মুহূর্ত থেকে আমরা সশস্ত্র প্রস্তুতি সুরু করে দেব। আর গৃহযুদ্ধ করে সুখেন্দুর মত বন্ধু হারাতে রাজী নই; এবার থেকে সর্বশক্তি ব্যয়িত হোক্ সরকারের বিরুদ্ধে। আমাকে অনুমতি দিন 'স্মাগ্‌লার'দের কাছ থেকে অস্ত্র কিনতে চলে যাই।"

মাস্টারদার অনুমতি পেলাম। হাসপাতাল থেকে সোজা চলে গেলাম সরোজ গুহের কাছে। অবিলম্বে টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। সরোজ গুহ খুব যে ধনীঘরের ছেলে তা নয়। কিন্তু আমার বক্তব্য ছিল—

"প্রত্যেক কমরেড নিজ নিজ বাড়ী থেকে নগদ টাকা অথবা জিনিস দিয়ে দলকে সাহায্য করবে। টাকাই হোক আর জিনিসই হোক, তার মূল্য একশ টাকার কম হলে চলবে না, আবার দু'শ টাকার বেশি হবারও দরকার নেই। একমাত্র সর্ত যে সে হাতেনাতে ধরা পড়বে না।"

মাখন, হরিপদ বা শ্রীপতিদের মত ধনী ও অবস্থাপান্ন ঘরের ছেলেদের বাড়ী থেকেই বেশি টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। সেজন্য ভেবে-চিন্তে প্ল্যান করা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু আমি আজ কালের মধ্যেই অস্ত্র কিনতে কলকাতায় যেতে চাই।

সুখেন্দুকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নেওয়া হচ্ছে। নির্মলদা, অম্বিকাদা, গণেশ ও আরো অন্যান্য বন্ধুরা সুখেন্দুর সঙ্গে যাচ্ছে। স্বয়ং সুভাষবাবু সুখেন্দুকে কলকাতায় আনা ও তার চিকিৎসা ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করছিলেন। পুলিশ সুখেন্দুকে নিয়ে আমাদের এই ব্যস্ততার কথা আদ্যোপান্ত খুব ভালভাবেই জানত। কাজেই আমাদের কলকাতায় আগমনের মূল উদ্দেশ্য যে অস্ত্র কেনা তা' উপস্থিত পুলিশের কাছে নিশ্চয়ই গোপন রাখা যাবে যদি দলের বিভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা না করে। এই সুযোগ কাজে

লাগালাম। দু-এক দিনের মধ্যেই আমার কলকাতায় যেতে হবে সুখেন্দুকে উপলক্ষ করে। কিন্তু টাকা ছাড়া গেলে কোন কাজই হবে না। বিনা টাকায় তো আর রিভলভার পিস্তল স্মাগ্‌লাররা আমাদের দেবে না! এই কারণেই খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কিছু অর্থ সংগ্রহের জন্য তেমন দু-একজনকে বেছে নিতে হবে যাদের কাছ থেকে সহজে সাময়িক প্রয়োজন অনুপাতে অর্থ সংগ্রহ করতে পারি। এই উদ্দেশ্যে প্রথমেই মনে পড়ল সরোজ গুহের কথা।

সরোজ গুহের বাড়ীতে একটি বিবাহ উৎসব আসন্ন। সেই দিনই দু'ঘণ্টার মধ্যে তার বাড়ীর সকলে নৌকো করে দেশের বাড়ীতে যাবে, সেখানেই বিয়ে হবে। এই সুযোগে কাজ সারা চাই। একটা থলেতে প্রায় পঞ্চাশ রকম ট্রাঙ্ক ও তালার চাবি এনে দিলাম সরোজকে; আর দিলাম কয়েকটি ছোট-খাট যন্ত্রপাতি—ফাইল, স্ক্রু-ড্রাইভার ইত্যাদি। কিভাবে কাজটি সুসম্পন্ন করা যাবে তা' নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা করলাম। কী কী বিপদের সম্ভাবনা, বিপদে পড়লে কি করতে হবে—সে সবও বুঝিয়ে দিলাম। সরোজ ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে। তার সব কথা বুঝে নিতে খুব দেরি হল না। তা' ছাড়া অর্থ সংগ্রহের বহু conspiratorial (ষড়যন্ত্রমূলক) প্ল্যান আমাদের প্রথম শ্রেণীর সভ্যদের মধ্যে সব সময়েই আলোচনা হত।

ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হল। কিন্তু সবটাই করতে হল খুব তাড়াতাড়ি। মাত্র দু'দিন সময় দেওয়া হয়েছিল সরোজকে। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সরোজ অনেকগুলি গয়না নিয়ে এল। তাকে বলেছিলাম দু'শ টাকার মত গয়না আনতে, কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে সে যা নিয়ে এল তা' বিক্রি করে প্রায় হাজার টাকা পাওয়া গেল।

কলকাতায় এলাম টাকা নিয়ে। পরদিন ভোরে চলে গেলাম অনুকূলদার কাছে, বললাম—

—"অনুকূলদা, ভীষণ দরকার—অস্ত্র চাই।"

—"ঠিক আছে। আমার কাছে একটা আছে দিচ্ছি, কিন্তু টাকা এনেছ?"

—"এনেছি।"

উপযুক্ত দাম দিয়ে পেলাম বেলজিয়ামে তৈরি সাত-শটের রিভলভার একটা। এই প্রথম আমি নিজের হাতে টাকা দিয়ে একটা রিভলভার কিনলাম। রিভলভারটা নিয়েই সোজা চলে গেলাম বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজের কেবিনে, যেখানে আমাদের প্রিয় বন্ধু সুখেন্দু বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে।

আমি কলকাতায় আসার একদিন আগে সুখেন্দুকে স্ট্রেচারে করে কলকাতায় আনা হয়েছে। যতদিন সে হাসপাতালে ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোজ দু'বেলা তাকে দেখে যেতেন।

হাসপাতালে কেবিনে নির্মলদা বসেছিলেন। সুখেন্দুর হাতে দিলাম রিভলভারটা। বিপ্লবী সুখেন্দু ইংরেজ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ভূমিকা গ্রহণ করতে চেয়েছিল; চেয়েছিল একটি রিভলভার যা দিয়ে সে দেশের শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে পারবে। তার স্বপ্নাতুর চোখ দুটির সামনে থেকে পৃথিবীর আলো ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে। আর সে পারবে না উঠে দাঁড়াতে, পারবে না বন্ধুদের পাশে দাঁড়িয়ে একত্রে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে।

পা দুটি অবশ সুখেন্দুর, কিন্তু হাতে কোনো কষ্ট নেই। দু' হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল রিভলভারটা—সারা গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখল। তরুণ বিপ্লবীর আজন্মের আশা—একটি রিভলভার হাতে পাওয়া! সেই রিভলভার হাতে পেয়েছে সুখেন্দু! কি করে গুলী ছুঁড়তে হয়, কি করে টোটার ঘর খালি করে আবার ভরতে হয়—সব দেখিয়ে দিলাম সুখেন্দুকে। তার পর বললাম—

"সুখেন্দু, প্রিয় ভাইটি আমার! এই আমাদের কেনা প্রথম রিভলভার—তোমাকে দেখাতে এনেছি। এরকম আরো অনেক কিনব আমরা। তারপর, সকলে মিলে একত্রে আক্রমণ করব ফিরিঙ্গী সরকারের ঘাঁটিগুলি। সুখেন্দু, পার্টিতে ক্ষমতা দখলের জন্য নির্বোধের মত দেশের লোকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আর আমরা তোমার মত সাথীকে হারাতে রাজী নই। এই নির্মলদা বসে আছেন, আমি আছি—আমরা তোমার বিপ্লবী বন্ধুদের তরফ থেকে তোমার কাছে শপথ করছি যে, ইংরেজ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে লড়াই আমরা করবই!"

উৎসাহে জ্বলতে লাগল সুখেন্দুর চোখ দুটি. বলল—

"আমার কোন দুঃখ নেই দাদা! আর কোন দুঃখ নেই! আমি এই আনন্দ নিয়ে যেতে পারব যে, বৃটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে যে দল, তারই সদস্য হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি সর্বদা তোমাদের সঙ্গে থাকব দাদা, আমার আত্মা তোমাদের কাছে পড়ে থাকবে। তোমাদের সবাইকে আমার বিপ্লবী অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

কয়েকদিন পরেই সুখেন্দু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। সুখেন্দুর মৃত দেহ নিজের কাঁধে বহন করে খালি পায়ে সারা পথ হেঁটে শ্মশানে গেলেন আমাদের প্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র।

কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বই যে আমাদের বিপ্লবী প্রস্তুতি থেকে বিচ্যুত করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের প্রস্তুতির পথে আমাদের আরও কয়েকবার এইরূপ মারাত্মক বিচ্যুতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। সাধারণ সদস্য ও সাধারণ ভলান্টিয়াররা যেমন আশু প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেরণায় মূল পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করতে প্রভাবান্বিত হয় তেমনি দেখেছি যাদের ওপর সংগঠনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তারাও মাঝে মাঝে ভাবপ্রবণতার জন্য মূল উদ্দেশ্য থেকে সাময়িকভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

আমার মনে হয় এইরূপ বিচ্যুতির মূল কারণ—তখনও আমাদের পরিকল্পনা কেবল মাত্র কাগজে-কলমেই নিবদ্ধ ছিল। বাস্তবে সশস্ত্র আক্রমণের পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব কি না সে সম্বন্ধে মনে দ্বিধা ছিল বলেই সাময়িকভাবে হলেও, আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছি। সক্রিয়ভাবে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, সামরিক শিক্ষা ও আক্রমণের বহুমুখী পরিকল্পনার কাজ বাস্তবে আরম্ভ হয় নি তখনও। তাই চিন্তা ও বাস্তবতার দূরত্ব অনেক বেশি ছিল বলেই হয়ত এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের মত নেতৃস্থানীয়দের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল।

পরের ঘটনা সাক্ষ্য দেবে, প্রধান সংগঠকেরা, যারা সশস্ত্র আক্রমণের

প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিল, অর্থাৎ আমরাও, সাময়িকভাবে ভাবপ্রবণতায় যেন কোথায় ভেসে যাচ্ছিলাম।

১৯২৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর এক বিরাট জনসভা আহ্বান করলাম আমরা। লাহোর সেন্ট্রাল জেলে সরকারী আইনের প্রতিবাদে ও দণ্ডিত কয়েদীদের উচ্চশ্রেণীর সুখ-সুবিধা, আইন ও বিধান অনুযায়ী প্রণয়ন করার দাবিতে, দীর্ঘদিন অনশনের পর প্রাণ দিয়েছেন যতীন দাস। এই মৃত্যুর জন্য দায়ী সরকারী নীতির প্রতিবাদেই এই সভার আয়োজন।

যতীন দাস আমাদের সকলের বন্ধু তো বটেই, তা' ছাড়া গণেশের একজন বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠতম বন্ধু তিনি। যতীন দাসের নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য একটা পাল্টা হত্যাকাণ্ডের কথা আলোচনা করলাম। কিন্তু আমাদের দল তখন একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা সামনে রেখে চলেছে। এখন একটা ব্যক্তিগত হত্যা জনসাধারণের অক্ষম আক্রোশকে রূপদান করতে পারে, দেশবাসীর প্রশংসাও অর্জন করতে পারে প্রচুর। কিন্তু তার ফলে হয়ত চট্টগ্রামে আমাদের অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়ে যাবে।

তবু আমরা ভাবপ্রবণতায় মেতে গেলাম। আমাদের বিচারের রায় থেকে উদ্ধৃত করছি—

"Then on September, 1929, a procession took place in honour of Jatin Das, who had died shortly before in Lahore Jail and in August, 1928, had been interned in P.S. Chakoria, Cox's Bazar. The procession comprised about 1,500 persons, mostly Hindu students, and was led by Ganesh Ghosh, Ambika Chakravarti, Lokanath Bal, Ananta Singh, Surjya Sen, Nirmal Sen......and others. The processionists carried banners bearing inscriptions such as "Bir Jatindra Nather maha prayan" (Death of the hero Jatindra Nath), "Du paye dale gelo marana sankare, sabare deke gelo shikala jhankare" and raised shouts of Bande Mataram, Long Live Revolution, Down with Imperialism, Up with Revolution, etc. The procession was followed by a meeting in the compound of the J. M. Sen Hall, which was addressed by several speakers including Lokanath Bal, Ananta Singh, Ganesh Ghosh who seized the opportunity to influence the minds of their youthful listeners. Lokanath Bal said that the bloody memory of Jatindra Nath had raised a fire in their hearts for the destruction of the British Government. There could never be any co-operation with them. Ananta Singh said: "Our blood boils at fever pitch—the oppressive Government has killed him", and Ganesh Ghosh's contribution was "Let the blood of Jatin Das flowing in our veins, create the

strength of hundreds and thousands Jatin Dases and strike terror in the heart of the tyrannical Government" (P. Ws., 194, 150 and 270). Two photographs of Jatin Das in uniform were found, as we shall see, at the Congress Office, one of them bearing underneath it the lines,—

"A soldier's life is the life for me!
A soldier's death ; so India is free."

—জজ সাহেব তাঁর রায়ে বলেছেন—২৯শে সেপ্টেম্বর যতীন দাসের জেলে অনশনে মৃত্যু উপলক্ষে এক মিছিল বার করা হয়। মামলা সাজাবার জন্য তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, যতীন দাস চট্টগ্রামের কক্সবাজার উপ-বিভাগের চকরীয়া থানায় ১৯২৮ সালে অন্তরীণ ছিলেন। এই প্রসেশন সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে, আমাদের নেতৃত্বে প্রায় ১৫০০ লোক, বেশির ভাগই হিন্দু ছাত্র, এই মিছিলে অংশ গ্রহণ করেছিল। জজসাহেব আরও উল্লেখ করেন যে, মিছিলে বিভিন্ন ধরনের পোস্টার ব্যবহৃত হয়েছিল। সেগুলির কোন কোনটাতে লেখা ছিল—

"বীর যতীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে।"

"দু' পায়ে দলে গেল মরণ শঙ্কারে,
সবারে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কারে।"

সঙ্গে সঙ্গে মিলিতকণ্ঠে ধ্বনি উঠল—"বন্দেমাতরম্", "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্", "সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক্", "বিপ্লব জেগে উঠুক।" তারপর মিছিল নিয়ে চট্টগ্রামের জে, এম, সেন হলের মাঠে আমরা উপস্থিত হই ও সভা করি। সেই সভার বিষয়বস্তু তিনি সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর নির্ভর করে তাঁর সুবিধে মত রায়ে লিখেছিলেন—আমাদের তিনজনের (লোকনাথ, আমার ও গণেশের) বক্তৃতা সম্বন্ধে। আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন যে, আমরা যতীন দাসের মৃত্যুর সুযোগ গ্রহণ করেছি তরুণদের মনকে বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্য। জজসাহেব কোন এক সাক্ষ্য উল্লেখ করে লিখলেন—লোকনাথ বল ছাত্র যুবকদের সম্বোধন করে বলেছে যে, যতীন দাসের মৃত্যু প্রত্যেকের অন্তরে বিপ্লবের আগুন প্রজ্বলিত করেছে এবং আমাদের বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রাম চালাতে হবে। আমার বক্তৃতার উল্লেখ করে লিখলেন—আমি বলেছি, আমাদের শিরায় শিরায় রক্ত টগবগ করে ফুটছে—নিষ্ঠুর বৃটিশ সরকার যতীন দাসকে হত্যা করেছে। তারপর মিঃ জে, ইউনী, গণেশের বক্তৃতার উল্লেখ করে লিখলেন—গণেশের বিশেষ অবদান হল, সে যুবকদের আহ্বান জানিয়ে বলেছে যতীন দাসের মৃত্যু বৃথা যাবে না—তার অমর মৃত্যু যুবকদের মধ্য থেকে শত-সহস্র যতীন দাস সৃষ্টি করে অত্যাচারী বৃটিশ সরকারের অন্তরে বিভীষিকা সৃষ্টি করবে।

মিছিল ও বক্তৃতার বিষয় এইভাবে মামলার রায়ে লিপিবদ্ধ করেই জজসাহেব ক্ষান্ত হন নি, তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, কংগ্রেস অফিসে (অর্থাৎ যেখানে মাস্টারদা থাকতেন এবং আমরা সব সময় যেতাম) সুভাষ

বোসের মিলিটারী পোষাকের অনুকরণে, ইউনিফরমে সজ্জিত যতীন দাসের ফটো রাখা ছিল, সেই ফটোর নিচে একটি ইংরেজী কবিতার দুটি লাইন লেখা ছিল; যার অর্থ বাংলায় এইরূপ—'স্বাধীনতার সৈনিকের জীবনই আমার জীবন; সৈনিকের প্রাণদানই ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করবে।'

জজসাহেবের রায়ের উদ্ধৃতি থেকে আমাদের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের বক্তব্য জানা যায় এবং ঘটনার দলিল হিসাবে তা' আমি ব্যবহার করি; কিন্তু সরকার পক্ষ তাদের সুবিধেমত অনেক কথা বাদ দেয় এবং অনেক কথাকে বিকৃত করে। আজ এই বিষয়ে লিখতে গিয়ে আর একটি বিশেষ কথা আমার মনে পড়ে গেল। চট্টগ্রামে সেই যুগের যুবকদের সামনে একটি প্রোগ্রাম রাখা একান্ত প্রয়োজন বলে আমাদের মনে হয়েছিল, তাই সেই সভায় আমি বলেছিলাম—'আজ আমাদের নিতে হবে খুব সংক্ষিপ্ত এবং খুব স্পষ্ট প্রোগ্রাম। আমাদের প্রোগ্রাম হল—Organization, Audacity and Death।' (সংগঠন, বিক্রম ও মৃত্যুপণ)।

এইরূপ বিশেষ উপলক্ষে তরুণদের উত্তেজিত করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এতে বিচ্যুতির কথা আসে না। পুলিশের চোখের অন্তরালে ও অন্যান্য পার্টি বা জনসাধারণের দৃষ্টির অগোচরে এই প্রকাশ্য সভার পরেই আমরা গোপনে মিলিত হলাম। সেই সভায় আমরা স্থির করি যে, কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের প্রতিশোধ নিতে হবে। স্থির হয় জেলাশাসক অথবা চট্টগ্রাম পুলিশের প্রধান কর্তাকে হত্যা করা হবে। সংগে সংগে লোক চলে গেল গ্রামে পিস্তল নিয়ে আসতে। অনুসন্ধান, প্ল্যান ও আক্রমণের ভার পড়ল আমার ও গণেশের ওপর।

সত্যি আজ ভাবতেও শিউরে উঠছি। যদি অসময়ে আমাদের সশস্ত্র আক্রমণের প্রস্তুতির প্রোগ্রাম স্থগিত রেখে প্রতিশোধের জন্য জেলা-প্রধান কাউকে হত্যা করা হত, তবে সরকারী প্রতি-আক্রমণ সামলে নিয়ে কি আমরা চট্টগ্রামে সশস্ত্র অভ্যুত্থানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারতাম?

সেই বিতর্ক আজ আর তুলব না। তাতে লাভ নেই। কে কি বলেছিল বা কি ভাবে শেষ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে সুবুদ্ধির সঞ্চার হয়ে সেই অসময়োচিত প্ল্যানটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল তার বিশদ ব্যাখ্যার আজ আর প্রয়োজন নেই। তবে এইটি সুখের বিষয় যে, আমরাই শেষ পর্যন্ত এই প্ল্যান বাতিল করি মূল উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে।

তারপর থেকে আমরা সশস্ত্র আক্রমণের পরিকল্পনাটিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার আয়োজন সুরু করলাম। এর আগের এক বছর আমাদের খুব সাবধানে ধীরে ধীরে এগোতে হয়েছে গুপ্তদল গঠনের কাজ সম্পূর্ণ করতে। কংগ্রেস এবং অন্যান্য সংগঠন ছিল আমাদের বাইরের কাজের ক্ষেত্র—ভেতরে ভেতরে চলেছিল সশস্ত্র প্রস্তুতির এক অন্তঃসলিলা স্রোত।

আগেই বলেছি, আমাদের অনুপস্থিতিতে পাঁচজন কর্মী দলের ভার গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে মাত্র একজনের সংগে প্রথম আমি বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপন করলাম—সে অর্ধেন্দু। তার কিছুদিন পর তারকেশ্বরকেও বিশ্বাস করে সশস্ত্র প্রস্তুতির প্রাথমিক কাজে নিলাম। পূর্ববর্তীদের মধ্যে মাত্র মাস্টারদা আর গণেশের কাছে আমি কিছু গোপন করি নি। কারণ,

আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল পুলিশের সংস্রব কোনমতেই তাঁদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে নি।

এবার নির্মলদা আর অম্বিকাদার প্রকৃত ভূমিকা জানতে হবে। চট্টগ্রামের রেলওয়ে ডাকাতি, নাগারখানা লড়াই, প্রফুল্ল রায় হত্যা, ইত্যাদি হিংসাত্মক কাজগুলিই সরকার পক্ষ থেকে ১৯২৪ সালে ১নং বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারির অন্যতম কারণ। সেই অর্ডিন্যান্স অনুসারে আমি, গণেশ, মাস্টারদা, নির্মলদা, অম্বিকাদা সকলেই বন্দী হয়েছিলাম। অথচ আমি, নির্মলদা আর অম্বিকাদা —এই তিনজন প্রায় একসঙ্গে মুক্তি পেলাম। কিন্তু গণেশ আর মাস্টারদা ছাড়া পেলেন আরও প্রায় এক বা দেড় বছর পরে। এর কারণ কি? আমি কি করে তাড়াতাড়ি মুক্তি পেয়েছি তা তো আমি জানি। নিজের মনে আমি জানি যে পুলিশের কাজে কোনদিন সাহায্য করব না, তবু সফলতার সঙ্গে তাদের আমি ধোঁকা দিতে পেরেছি। কিন্তু অম্বিকাদা আর নির্মলদার মনের কথা আমি জানব কি করে? ওঁরাও কি পুলিশের সঙ্গে ব্যবহারে আমার মত মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, না কি সত্যিসত্যিই পুলিশকে সাহায্য করে দলের কাজ পণ্ড করবেন? কি করে আমি শেষ পর্যন্ত এঁদের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত হলাম, এঁদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারলাম—সে এক বিরাট ঘটনাবহুল কাহিনী। তার খুঁটিনাটি পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবে। মোট কথা, শেষ পর্যন্ত আবার আমরা পারস্পরিক বিশ্বস্ততা ফিরে পেলাম। আমার লেখার মধ্যে খুব দৃষ্টিকটুভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে বড়দের মধ্যে মাষ্টারদা ও গণেশ ছাড়া আমার কাছে আর কেউ সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠনের কাজে সরকার বিরোধী Intelligence-এর (গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের) ভার নিজের উপর নিয়েছিলাম। সেইজন্য এই বিশেষ বিভাগের দায়িত্ব আমার উপরেই প্রত্যক্ষভাবে ন্যস্ত ছিল। এতে আমিই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম। বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের এই বিশিষ্ট অংশের বর্ণনা দিতে গিয়ে আমার একার কথাই বিশেষভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। তবে একটা কথা বলার আছে যে, আমি সবার সম্বন্ধেই সন্ধান করে বেড়িয়েছি, কিন্তু আমি তাদের সবার কাছে সব প্রশ্নের ঊর্ধ্বে ছিলাম—এ ঔদ্ধত্য আমার নেই। কোন বিপ্লবীই কোনদিন নিজ দলের মধ্যে Intelligence-এর কাজ সফলতার সঙ্গে চালাতে পারবে না যদি সে দলের সবার কাছে নিজের সততা ও বৈপ্লবিক চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে প্রমাণ না দেয়। যখনই আমি আমার বন্ধুদের যাচাই করার নৈতিক অধিকার নিলাম তখনই তাদেরও আমাকে পরখ করার নৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছি। আমাদের সংগঠনে আমি এটাকে mutual vigilence system (পরস্পরের প্রতি নজর রাখার নীতি) বলে আখ্যা দিয়েছিলাম। Taste of the pudding is in the eating! —খাওয়ার পরই পুডিং-এর স্বাদ বোঝা যায়। আমাদের সংগঠনের শেষ পরিণতিই প্রমাণ দিচ্ছে যে আমার এই সজাগ দৃষ্টিকে বড় ছোট—কোন বন্ধুই অন্যায় মনে করেন নি। কারণ, আমাকে পরখ করে নেবার জন্য নিজেকেও তাদের কাছে পুরো সমর্পণ করেছিলাম।

মুক্তি পাবার পর অন্য কোন মুক্তিপ্রাপ্ত বিপ্লবীর কাছে আমি মনের

কথা খুলে বলতাম না। প্রথম ছয় মাস নীতিগতভাবেই কাউকে বিপ্লবী দলে আনবার চেষ্টা করি নি।

যুবকদের মধ্যে বিপ্লবী হবার উপযুক্ত লোক বেছে নেওয়া একটি দুরূহ কাজ। নির্ভীক দৃঢ়চিত্ত সবল কর্মী চাই। তা' ছাড়া তাকে পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে পুলিশকে দলের গোপন তথ্য জানাবার মত তার মধ্যে কোন লক্ষণ আছে কি না এবং পুলিশের নির্যাতন সহ্য করে মুখ বুজে সে থাকতে পারবে কি না! এইরূপ একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে গেলে আমরা দেখেছি রিক্রুট সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সদস্য সংগ্রহের প্রধান নীতি ছিল এইরকম—

(১) প্রথমে নতুন যুবকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা হবে। খুব ভাল করে লক্ষ্য করা হবে তাকে।

(২) সাধারণভাবে বিপ্লবী-চেতনা এবং ধারণা দেওয়া হবে। এতে তাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা' লক্ষ্য করে ধাপে ধাপে তাদের মন তৈরি করে দেওয়া হবে।

(৩) তৃতীয় স্তরে তাকে বলা হবে যে, সে বিপ্লবীদের গুপ্তদলের সদস্য হয়েছে। কি ধরনের কাজ করতে হবে, তার একটা বাস্তব ধারণা এবং নানারকমভাবে অন্যান্য কার্যকরী শিক্ষা দেওয়া হবে। কিন্তু তখনো তাকে আগ্নেয়াস্ত্র বা বোমা দেখান হবে না।

(৪) এই তিনটি স্তর সফলতার সঙ্গে পার হয়ে এলে তখন সত্যি সত্যি তাকে গুপ্ত বিপ্লবীদলভুক্ত করা হবে এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আগে তার ক্ষমতা অনুযায়ী তাকে আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হবে।

চট্টগ্রাম শহরের বুকের ওপর বসে ভূতপূর্ব রাজবন্দী আমরা, আবার নতুন করে সশস্ত্র বিপ্লবীদল গঠন করে চললাম। পুলিশ সদাসর্বদা আমাদের অনুসরণ করত, তা সত্ত্বেও কিছু জানতে পারল না। সফলতার সঙ্গে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আজ বলা খুব সহজ যে, পুলিশ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারল না আর আমরা জয়ী হলাম। কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজে হয় নি, এর পেছনে ছিল আমাদের অভিজ্ঞতা ও সতর্কতা, যা আমরা অর্জন করেছিলাম অতীতের 'বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনাগুলি' বিশ্লেষণ ও গবেষণা করে।

প্রস্তুতির এই বিশেষ অধ্যায়টি যদি হৃদয়ঙ্গম করা না যায়, তবে যুব-বিদ্রোহের মূল বিষয়টি অনুক্ত থেকে যাবে। তাই এখন সামান্য একটু আভাস দিতে চাই—আমাদের নিজেদের কথায় নয়, সরকারী পক্ষের ভাষ্য দিয়ে—কতখানি প্রখর ও কি পরিমাণ ব্যাপক পুলিশী তৎপরতা আমাদের বিরুদ্ধে বেড়ে চলেছিল। আমাদের মামলার ইংরাজীতে মুদ্রিত রায়ের ১২, ১৩ ও ১৪ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করছি—

"We turn now to the arrangements made by the police for watching the movements and activities of the six ex-detenues and their associates and the results thereof."

ট্রাইব্যুন্যালের জজদের বক্তব্য যে তাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে পুলিশের ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, তা' নিয়ে আলোচনা করবেন। তাই লিখে চলছেন—

"As has been already started the D. I. B. staff in September 1928 consisted of one Inspector, four Sub-Inspectors and six Assistant Sub-Inspectors and uptil November 1928 four of these Assistant Sub-Inspectors were employed in watching the movements of the six ex-detenues but the watch was not systemetic or continuous.

"The D. I. B. Inspector (P. W. 70) says that from the date of their release the six ex-detenues set about forming a secret revolutionary party, recruits for which were obtained by the insidious methods already described. Ramani Mazumder S. I., D. I. B. (P. W, 149), says that his inference from the information he gathered was that the party (known to the D. I. B. as the New Violence Party) began to be formed in February 1929. Rohini Bhowmik, D. I. B., S. I. (P. W. 150), says he came to know of the existance of a secret revolutionary society with the six ex-detenues as its principal organisers after the May Conference 1929."

—(জজসাহেবরা সাক্ষীদের উক্তিতে পাচ্ছেন যে ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বরে পুলিশের ডি-আই-বি বিভাগের ভার ন্যস্ত ছিল একজন ইন্সপেক্টর, চারজন সাব-ইন্সপেক্টর ও ছয়জন সহকারী সাব-ইন্স্পেক্টারের ওপর। এ'দের কাজ ছিল আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা। কিন্তু তাঁরা বলছেন এতেও তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ, এই ব্যবস্থাতেও সারাক্ষণ নিয়মিতভাবে আমাদের ওপর দৃষ্টি রাখতে তাঁরা সক্ষম হন নি।

ইন্স্পেক্টর মহাশয়ের বিবৃতিতে পাচ্ছি যে, আমরা ছয়জন মুক্তি পাবার পর থেকেই গুপ্ত বিপ্লবীদল গঠন করতে সুরু করলাম ও নানা প্রকার ধড়িবাজ কৌশলে সদস্য সংগ্রহ করছিলাম। তারপর একজন সাব-ইন্সপেক্টর বললেন তাঁর 'অনুমান' আমাদের নতুন ভায়োলেন্স পার্টি ১৯২৯-এর ফেব্রুয়ারী থেকে গঠিত হচ্ছিল। আবার অন্য একজন সাব-ইন্সপেক্টর বলছেন যে, আমরা ছয়জন প্রধান সংগঠক হিসাবে দল গড়তে আরম্ভ করি ১৯২৯ সালের মে কন্ফারেন্সের পর থেকে)।

এই সব রিপোর্ট ও উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে যে, পুলিশ আমাদের দলের মধ্যে কাউকে তাদের চর হিসাবে সংগ্রহ করতে পারে নি। দলের মধ্যে যদি কাউকে পুলিশের গুপ্তচর হিসাবে তারা যোগাড় করতে না পারে, কেবল বাইরে থেকে অনুসন্ধান করলে ও দৃষ্টি রাখলে, তাদের "অনুমানের" ওপর চলতে হয়—সঠিক খবরের মাধ্যমে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কোন সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে তারা অপরাগ হয়।

জেলার ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ যখন মাথা খুঁড়ে মরছে আমাদের খোঁজ-

খবরের জন্য তখন কলকাতার সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স তো আর বসে থাকতে পারে না! তাদের কাছ থেকে এই ধরনের ফতোয়া এল—

"In November instructions were received from the Central Intelligence Branch, Calcutta, to keep a special watch on Surjya Sen, Ambika Chakrabarty, Ganesh Ghosh, Ananta Singh, Nirmal Sen and also ex-detenue Charu Bikash Dutta. So on 16th November, 24 constables were taken into the D. I. B. to act as watchers. A twentyfour hour watch on these six persons was instituted, four Constables being deputed to watch each. During the day time, the constables watched them singly and at night in couples......"

—(আমাদের ওপর বিশেষ পাহারা বসাতে হবে বলে কলকাতার কেন্দ্রীয় অফিস থেকে নির্দেশ এল। জেলা কর্তৃপক্ষ নির্দেশ মত চব্বিশ জন নতুন পুলিশ পাহারাওয়ালা নিযুক্ত করল আমাদের ছয়জনকে চব্বিশ ঘন্টা ধরে অনুসরণ করবার জন্য। আমাদের প্রত্যেকের পেছনে চারজন করে পাহারা-ওয়ালা নিযুক্ত হ'ল। দিনের বেলা তারা এককভাবে অনুসরণ করত কিন্তু রাত্রি বেলা দু'জন মিলে আমাদের প্রত্যেকের গতিবিধি লক্ষ্য করত)।

এইভাবে চব্বিশ ঘন্টা জোঁকের মত লেগে থেকে আমাদের ওপর প্রখর দৃষ্টি রেখেও তারা সন্তুষ্ট হতে পারল না। তাই আবার আরও উন্নত ধরনের পাহারার ব্যবস্থা করল--

"This system of watch was followed until the beginning of February 1930, when certain modifications were made, two constables being allotted to keep watch on each of the ex-detenues above-mentioned while the other twelve were posted to watch from time to time different places throughout the town as was considered necessary. This system was maintained until the end of March. In February also the watch arrangements received the personal attention of the Superintendent of Police who on 12th February issued special instructions [ex-29 and 29 (1)] to Inspectors and thana officers impressing upon them the necessity of co-operation by the officers of uniformed branch of the police with the D. I. B. staff in keeping a vigilent eye upon the movements and haunts of political suspects and their associates and of reporting all information gained in the way. Along with these instructions was supplied a list of 21 ex-detenues and 53 other persons upon whom attention was particularly to be directed (ex, 88)......"

এই নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী দু'জন করে কনস্টেবল প্রত্যেক ছয়জনকে অনুসরণ করবে। অর্থাৎ চব্বিশ জনের মধ্যে বারজন নিযুক্ত থাকবে অনুসরণ করবার কাজে আর বাকী বারজনকে নির্দেশ দেওয়া হল শহরের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় স্থানে আমাদের ওপর লক্ষ্য রাখতে। এই সময় স্বয়ং পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট আসরে নামলেন। তিনি সার্কুলার পাঠালেন ইন্‌স্পেক্টর ও থানা অফিসারদের প্রতি যেন তাঁদের খাকী পোষাক পরা সেপাইদের নিয়ে তাঁরা ডি-আই-বি-কে সাহায্য করেন। এই সার্কুলারের সঙ্গে একুশজন প্রাক্তন রাজবন্দী ও আরও সন্দেহভাজন তিপান্নজনের নাম ধাম গুপ্ত স্থান বা ডেরা প্রভৃতির বিবরণ পাঠানো হয়। বাঃ কি চমৎকার! ডি-আই-বি যখন আর পেরে উঠছে না, খাকী পোষাকধারী পুলিশও লেগে গেল আমাদের গুপ্ত তথ্যের সন্ধান পাওয়ার জন্য। কেন্দ্রীয় ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ আর স্থির থাকতে পারল না। ছুটে এলেন খোদ ডি-আই-জি সাহেব। মামলার একই রায় থেকে উদ্ধৃত করছি—

"On 24th—26th March, Mr. Colson, Deputy Inspector-General, I.B., Calcutta, visited Chittagong and under his instructions, the Superintendent of Police, Mr. Johnson (P.W. 21), took direct and complete charge of the D.I.B. which had hetherto been working under the supervision of the Deputy Superintendent. Immediate steps were taken to intensify the system of watch and make it more effective. The existing force of watcher constables was increased by 22 and in addition to the maintenance of a personal watch upon the six ex-detenues, men were posted at certain selected fixed posts throughout the town day and night for the purpose of securing additional information of all movements of suspects. Altogether 31 fixed posts were selected. These are indicated by copying ink-circles on the map of the town (Ex. 100) on which also the six fixed posts, to which watchers were deputed on the night of 18th April are shown by blue pencil circles. The Assistant Superintendent of Police, Mr. Lewis (P.W. 23), was placed in charge of these revised watch arrangements from the beginning of April.

"....Throughout, the watcher A. S. Is., were required to submit daily written reports and from the end of March the watcher constables were required to submit daily written reports as well. At the same time D. I. B. Inspector and Sub-Inspectors used to move about the town, supervising the work of the watching staff and making independent enquiries. On the 2nd April, Mr. Johnson

issued fresh detailed instructions to the D.I.B. and the S.I., Kotwali P.S. for the working of the revised watch system (Ex. 30). In these he pointed out that 'the object of the present scheme is to tabulate the movements of those persons suspected of being capable of terroristic activities on a conserted scale at any moment. Experience will show their modus operandi and as the movement progresses orders will necessarily have to be changed.' It was also emphasised that the watcher's work must be supervised by the D.I.B. officers both by day and by night; that watchers on fixed post duty should take up as inconspicuous a position as possible; that they should observe and record the passing or association of all suspects noting the direction from which and in which they came and went; that the movement of Baby Austin Car No. 24666 should always be reported and also the number of any other car in which suspects might be seen; that every effort should be made to assertain the names of all persons associating with known suspects; that at the end of a watch, a short report of the facts observed should be written out and made over to the officer detailing the watch duties. These instructions were accompanied by a list of 29 persons described as 'The more active local suspects.' [Ex. 30 (1)]

আই. বি-র ডি. আই, জি. মিঃ কোলসন সাহেবের আগমন হ'ল চট্টগ্রামে এবং তাঁর উপদেশ মত চট্টগ্রামের পুলিশ সাহেব স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে ভার নিলেন আমাদের বিপ্লব প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করবার। জনসন্ সাহেব প্রত্যক্ষভাবে ভারপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাহারার পদ্ধতি জোরদার করলেন। আরও বাইশ-জন সাদা পোষাকের পুলিশ নিযুক্ত হ'ল আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে। তা'ছাড়া দিবারাত্র পাহারা বসাবার জন্য সারা শহরে একত্রিশটি নির্দিষ্ট স্থান বাছাই করা হ'ল। এ ছাড়াও ১৮ই এপ্রিল, আমরা যেদিন যুগপৎ আক্রমণ করি, সেই দিন, ছয়টি স্থানে বিশেষ করে পাহারার ব্যবস্থা ছিল। শহরের মানচিত্রে ঐসব বিশেষ স্থান নীল পেন্সিল দিয়ে গোলাকারে চিহ্নিত করে ট্রাইব্যুন্যালের কাছে সরকারী পক্ষ উপস্থিত করে। সশস্ত্র অভ্যুত্থান এপ্রিল মাসে হয়। সেই মাসের প্রথম থেকে সহকারী পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট মিঃ লুইসকে ভার দেওয়া হ'ল এই নতুন ব্যবস্থার ওপর তদারক করবার জন্য।......পাছে পাহারায় নিযুক্ত রক্ষীরা ফাঁকি দেয় সেইজন্য A. S. Is watchersদের নিকট হতে প্রতিদিনের লিখিত রিপোর্ট তলব করা হ'ল। মার্চ মাসের শেষের দিকে watcher constables-দেরও দৈনিক লিখিত রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হ'ল। এর ওপরেও ব্যবস্থা হ'ল যে ডি, আই, বি, ইন্স্পেক্টর বা sub-Inspectors-রা ঘুরে ঘুরে প্রহরার কাজ তদারক

করবে ও স্বাধীনভাবে খোঁজ-খবর নেবে। আমাদের অভ্যুত্থানের ষোল দিন পূর্বে, অর্থাৎ, এপ্রিলের দু' তারিখে, মিঃ জনসন্ সাহেব বিশদ উপদেশ সম্বলিত আবার সদ্য একটি সার্কুলার দিলেন পুলিশের গুপ্ত বিভাগ ও কোতোয়ালির ভারপ্রাপ্ত সাব-ইন্সপেক্টরকে, প্রহরায় নতুন পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার জন্য। এই ব্যাপক উপদেশাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ ছিল যে সন্দেহভাজন লোকদের গতিবিধি তাদের নখদর্পণে রাখতে হবে, কারণ, তারা যে কোন সময়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ চালাতে পারে। এই-জন্যে সার্কুলারে উল্লেখ ছিল যে নতুন পদ্ধতিতে নজর রেখে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে এবং সেইভাবে—যেমনটি আমাদের গতিবিধি বৃদ্ধি পাবে, তেমনি-ভাবে, পুলিশের নির্দেশও পরিবর্তিত হবে। জনসন্ সাহেব বিশেষ জোর দিয়ে নির্দেশ দেন যে, অফিসারদের দিবারাত্রি প্রহরীদের (watcher) কাজ তদারক করতে হবে; প্রহরীরা যতদূর সম্ভব সাধারণ ও নিরীহ বেশে নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করবে; তারা দৃষ্টি রাখবে ও নোট করবে কে কোন্ দিক থেকে এল তারপর আবার কোন্ দিকে গেল এবং কে কোন্ নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে মিলল; ২৪৬৬৬ নম্বরের বেবী অস্টিন মোটরটির গতিবিধি সব সময় রিপোর্ট করা চাই এবং অন্যান্য গাড়ির নম্বরও সংগ্রহ করতে হবে যদি ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তিরা তা' ব্যবহার করে; নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যা'রা মেলামেশা করে তাদের নাম ধাম জানতে হবে; এই সব কাজের শেষে প্রত্যেকে কি কি লক্ষ্য করল তার একটি ছোট নোট রাখবে। এই সার্কুলারের সঙ্গে ঊনত্রিশ-জনের একটি তালিকাও পাঠালো এবং তাতে উল্লেখ ছিল যে এরাই বেশি সক্রিয় এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তি।

অবশেষে পুলিশের সাক্ষ্যাদি ও রিপোর্ট বেশ ভালভাবে বিশ্লেষণ করে জজ সাহেব খুব মজার জিনিস তাঁর রায়েতে লিপিবদ্ধ করলেন। সেটি হ'ল এই—

—"This revised watch system was followed until 23rd April, except that from 13th April to 18th April no watch was kept at any of the fixed posts between 6-30 P.M. and 10 P.M. This modification of the 24-hour watch programme was made in order that the suspects might think that the watch had been withdrawn and thus lulled into a state of fancied security might, by their movements, convey some clear inkling as to their intentions and plans."

পরিবর্তিত সতর্ক দৃষ্টি রাখবার ব্যবস্থা বহাল করা হয়েছিল এপ্রিলের ২৩ তারিখ পর্যন্ত। কিন্তু আবার অতি চালাকি করতে গিয়ে তাদের নিজেদের গলায় দড়ি পড়ল। খুব মাথা খাটিয়ে পুলিশসাহেব ১৩ তারিখ থেকে এপ্রিলের ১৮ তারিখ পর্যন্ত সন্ধ্যে ৬-৩০ মিনিট থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত নির্ধারিত জায়গাগুলি হতে পাহারা তুলে নিল। তারা ভেবেছিল পাহারা ব্যবস্থার এই শিথিলতা আমাদের উদাসীন হতে প্ররোচনা দেবে এবং আমাদের অবহেলার সুযোগ নিয়ে তারা আমাদের উদ্দেশ্য ও প্ল্যান সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা করতে পারবে। শেষ পর্যন্ত এইরূপ ভাবা ছাড়া

পুলিশের আর উপায় কি ছিল? কোন জায়গা থেকে কোন সঠিক খবর পাচ্ছে না, অথচ বুঝতে পারছিল যে আমাদের গতিবিধি অত্যন্ত সন্দেহজনক ও ভয়াবহ। তাই তাদের watch system-এর শিথিলতার ভান করে আমাদের অবহেলার সুযোগ নেওয়ার শেষ চেষ্টা করেছিল। সেই সময় আমরা যে আমাদের বিপ্লবী নিষ্ঠা ও দায়িত্ব ভুলে অসতর্ক হই নি তার জন্য এই সুদীর্ঘ দিন পরেও মনে আনন্দ পাচ্ছি। গর্বের কথা নিজমুখে না বলে জাজমেন্ট কপি থেকে উধৃত করি। ১৫৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—

"It was the duty of the D.I.B. staff to watch and report all they discovered to the Superintendent of Police and Johnson has made it clear that he was prepared to arrest suspected conspirators provided he got the opportunity. That the authorities were fully alive to the dangers of the situation is evidenced by the elaborate watch arrangements made. That the outrages were successfully carried out in spite of these precautions was due not to the negligence of police but to the abnormal cunning and craft of the conspirators."

জজসাহেব তাঁর রায়েতে বলছেন যে, সব পুলিশকর্মচারীর কাজ ছিল প্রখর দৃষ্টি রাখা ও পলিশ সাহেবের কাছে সব তথ্য রিপোর্ট করা। জনসন্ সাহেব খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন—সুযোগ পেলেই ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেপ্তার করতেন। সে সুযোগ কি তিনি পান নি? দু'পক্ষেই দাবার চাল দিয়ে চলেছিলাম। ছল-চাতুরী, নীতি-কৌশল, মিথ্যা ভান, বিভ্রান্তি, বে-আইনী সবরকম পন্থতি প্রয়োগ করতে আমরা কুণ্ঠা বোধ করি নি। জজসাহেব তাঁর সুচিন্তিত রায়ে বলেছেন—কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ সজাগ ছিল যে, তাদের একটি ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা আছে এবং সেই হেতু ব্যাপক অতন্দ্র পাহারার ব্যবস্থাও তারা করেছিল। তবু যে কর্তৃপক্ষের সমস্ত সতর্কতা ও চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে সার্থকতার সঙ্গে এই ভয়াবহ কান্ডটি (চট্টগ্রাম বিদ্রোহ) ঘটে গেল তার জন্য পুলিশের অবহেলাকে দায়ী করা যায় না এবং জজসাহেবের মতে ঐ সব দুর্ঘটনা সফলতার সঙ্গে ঘটেছে শুধুমাত্র ষড়যন্ত্রকারীরা অসাধারণ ধূর্ত ও সুচতুর ছিল বলেই।

চট্টগ্রাম যুব অভ্যুত্থানের কার্যকরী প্ল্যানটি বুঝতে গেলে পুলিশের ব্যাপক তৎপরতার অধ্যায়টি জানা একান্ত প্রয়োজন। সেইজন্যে বৃটিশের পুলিশী চক্রান্ত সম্বন্ধে একটি বাস্তব ধারণা হওয়ার উদ্দেশ্যে আমার উপরের তথ্যগুলি প্রকাশ করা। উপরের তথ্য থেকে দু'টি মূল সিন্ধান্তে পৌঁছনো যায়।

পুলিশের এত আয়োজন—প্রত্যেকের পেছনে চারজন করে পুলিশের চর নিযুক্ত করল; দিবারাত্রি চব্বিশ ঘন্টা আমাদের অনুসরণ করবার জন্য ব্যবস্থা করল; তাছাড়া সারা শহরে আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানগুলিতে

চব্বিশ ঘণ্টা লক্ষ্য রাখবার জন্য পুলিশ মোতায়েন হল; নিরীহভাবে ও সাধারণ বেশে পুলিশের লোক আমাদের গতিবিধি উদ্ঘাটনের জন্য কাজ করে গেল; আমাদের নিজের ও পরিচিত মোটর গাড়ির ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখল সারাক্ষণ, পুলিশের ওয়াচারদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল; খাকী পোষাকের পুলিশকেও ডাকা হল আই. বি. বিভাগকে সাহায্য করতে; ডি. আই. জি. সাহেব কলকাতা থেকে ছুটে এলেন; জেলা-পুলিশ সাহেব স্বয়ং গুপ্তবিভাগের ব্যাপক পরিচালনার ভার নিজ হাতে নিলেন; চালাকি করে ফাঁদ পাতলেন কিছুদিন তাঁদের পাহারার ব্যবস্থা শিথিল বা স্থগিত রেখে; আমাদের পেছনে পুলিশের অনুচর আর নেই জেনে গাফিলতি করলে আমাদের ধরবার মতলব আঁটলেন; ছয়টি স্থানে ১৮ই এপ্রিল, আক্রমণের দিন, বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি—সব ব্যর্থ করে আমরা সফল আঘাত হানতে পারলাম কি করে? এত ব্যাপক প্রহরার ব্যবস্থা করেও কেন পুলিশ আমাদের একজনকেও (সকলের নাম ধাম জানা সত্ত্বেও) গ্রেপ্তার করতে বা আমাদের প্ল্যান বানচাল করতে পারল না। পরিষ্কার বোঝা যায় তার একমাত্র কারণ, আমাদের গুপ্ত সমিতির ভিতর কোন বিশ্বাসঘাতকই স্থান করে নেওয়ার সুযোগ পায় নি এবং সেই কারণে, দলের মধ্যে পুলিশের চর যোগাড় হয় নি বলেই, তাদের অতখানি ব্যাপক অনুসন্ধান ও লক্ষ্য রাখবার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। এত কিছু করা সত্ত্বেও তারা ঘুণাক্ষরেও আমাদের প্ল্যান সম্বন্ধে আগে থেকে কিছুই জানতে পারে নি। এর দ্বারা অকাট্যভাবে এই প্রমাণ হয় যে, দলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক না থাকলে পুলিশ বাইরে থেকে যত ব্যাপক ও প্রখর অনুসন্ধান ব্যবস্থাই করুক না কেন, তবু কোনদিন বিপ্লবী ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটন ও অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কারে সমর্থ হয় না। এই বাস্তব বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমি দৃঢ়ভাবে এই কথাই ঘোষণা করতে চাই যে, আজ পর্যন্ত, যত ষড়যন্ত্র, বিপ্লবী পরিকল্পনা, বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র বা তাদের গোপন আস্তানা উদ্ঘাটিত হয়েছে, সেই সব-গুলিই হয়েছে দলের ভেতরের বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা।

আমাদের মামলা চলেছে দু' বছর ধরে। কত সাক্ষ্য-প্রমাণ, কত রিপোর্ট! তার মাঝখান থেকে আমি মাত্র তিনটি পৃষ্ঠার বিবরণ উল্লেখ করেছি। প্রায় দু' বছরের ঘটনা তিন পৃষ্ঠায় বলা হয়ে গেল, পড়তে দু-তিন মিনিটের বেশি লাগল না। দু' বছর ধরে পুলিশ নানাভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে আমাদের সম্বন্ধে সঠিক খবর জোগাড় করতে। দু' বছর ধরে তারা জোঁকের মতো লেগেছিল আমাদের পেছনে। তার মধ্যে আমরা ষড়যন্ত্র করেছি, রিভলভার, পিস্তল, বোমা, গুলী-বারুদ প্রভৃতি সংগ্রহ করেছি, গোপনে রেখেছি, অস্ত্রাদি শিক্ষা দিয়েছি, অস্ত্র নিয়ে প্রায় সময় চলফেরা করেছি। তাই জোর দিয়ে বলছি পুলিশ গুণতে জানে না—মনস্তত্ত্বও জানে না, তাদের ঐশ্বরিক শক্তি বা ভৌতিক ক্ষমতাও নেই; তাদের ক্ষমতা হচ্ছে আমাদের দুর্বলতা—আমাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকদের অস্তিত্ব!

নির্দিষ্ট প্ল্যানের ভিত্তিতে চট্টগ্রামের নির্ভীক যুবকদের সঙ্ঘবদ্ধ সশস্ত্র আক্রমণের ইতিহাসের সূচনাটি জানবার ইচ্ছে আছে অনেকের। আমি অনেকের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি—তাঁরা জানতে চান অস্ত্রাগার আক্রমণ,

দখল ও সাময়িক বিপ্লবী সরকার গঠনের প্ল্যানটি সর্বপ্রথম কিভাবে বা কার মাথা থেকে এল? সেই তথ্যটি এখন প্রকাশ করব।

খুব মজার কথা—মাঝে মাঝে খুব হাসি পায় যখন ভাবি যে কতজন, এমন কি তথাকথিত বিপ্লবী দাদারা —যাঁদের মধ্যে দু-একজন মন্ত্রীও হয়েছিলেন এক সময়, আমার কাছেও বলতে অপ্রতিভ হন না যে, এই প্ল্যানটি তাঁরাই মাস্টারদাকে দিয়েছিলেন। একদিন তাঁদেরই একজন বেশ বড় গলায় আমাকে বললেন—"......সূর্যকে (অর্থাৎ মাস্টারদাকে) সব প্ল্যান ঠিক করে দিলুম......" ইত্যাদি। আত্মপ্রসাদ লাভের সুযোগ থেকে এতদিন তাঁদের বঞ্চিত করতে চাই নি। আজও প্রয়োজন ছিল না।। কিন্তু যখন ইতিহাসটি লিখতে হচ্ছে তখন প্ল্যানের সূচনা সম্বন্ধে না বলে উপায় কি?

অনেকের ধারণা এবং আমাকে বলেওছেন তাঁরা যে, তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস চট্টগ্রামে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্ল্যানটি আমার দ্বারা তৈরি। এইরূপ প্রশংসা পাওয়া মন্দ নয়–তবে মিথ্যা প্রশংসা পাওয়ার জন্য সত্যের অপলাপ করতে হবে। তাতে মিথ্যা প্রশংসা হয়ত পাওয়া যাবে কিন্তু ইতিহাস অবিকৃত থাকবে না। আমাদের মধ্যে যার যা সঠিক ভূমিকা তা যদি আমি বলতে পারি তবেই আমার কর্তব্য করা হবে।

সরকারী ঘাঁটিগুলি দখল করে চট্টগ্রামে বিপ্লবী সরকার স্থাপন করবার সক্রিয় বাস্তব প্ল্যান প্রথম গ্রহণ করা হয় এবং তারপর সাংগঠনিক কাজ আরম্ভ হয়, তা' ঠিক নয়। আমাদের অভ্যুত্থানের মাত্র সাত-আট মাস পূর্বে আমরা এইরূপ সক্রিয় ও বাস্তব প্ল্যানটি কার্যকরী করবার জন্য গ্রহণ করি। জেল থেকে বেরিয়ে এই প্ল্যান গ্রহণ করবার আগে পর্যন্ত যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে, সেই সময় আমরা সঠিক একটি প্ল্যান ও প্রোগ্রাম অনুযায়ী না চলে নিজ নিজ ধারণা নিয়ে চলেছি, বিপ্লবী দলে সদস্য সংগ্রহ করেছি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেসের মধ্যে থেকে গুপ্ত সংগঠন এবং প্রকাশ্যে ভলান্টিয়ার দল প্রভৃতি গড়ে তুলেছি নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী।

যখন আমাদের সমষ্টিগত ক্ষমতা সম্বন্ধে বুঝতে পারলাম যে আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে অন্তত একটা জেলাতে আক্রমণ চালিয়ে সফল হতে পারি, তখন সেই স্তরে প্রয়োজন হয়ে পড়ল আমাদের সংগঠনের সঠিক বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করা। সেই সময় আমাদের কেন্দ্রীয় বিপ্লবী কাউন্সিলের একটি সভায় স্থির হ'ল আমাদের এই গ্রুপটিকে আমরা মনে করব ভবিষ্যতের ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখা। সভায় উপস্থিত ছিলাম আমরা পাঁচজন —মাস্টারদা, অম্বিকাদা, নির্মলদা, গণেশ এবং আমি। কাউন্সিলের এই মিটিং-এ সর্বসম্মতিক্রমে ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হলেন মাস্টারদা—সূর্য সেন।

এরপর সাধারণভাবে পরবর্তী প্রোগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। এ সময়েও আমাদের সামনে পরিকল্পনার কোন সঠিক ও বাস্তব রূপ ছিল না। আমাদের কাউন্সিলের সভায় আলোচনা হয়েছে সাধারণভাবে, কিন্তু সঠিক প্ল্যান ও প্রোগ্রাম নির্ধারিত হয় নি। বুঝতে পারছিলাম, আমাদের অভাব কোথায়? যদি "কংক্রিট" বিপ্লবী পরিকল্পনা সামনে না থাকে তবে আমাদের "বিপ্লবী চিন্তার" শেষ আর কোন দিনই হবে না। এই প্রশ্নটি গণেশ

ও আমাকে অধীর করে তুলল। একদিন আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য দুজনে সময় স্থির করলাম।

সকালবেলা গণেশের বাড়ীতে বসে প্রায় পাঁচ ঘন্টা আলোচনা হ'ল। দুজনেই আমরা জেলে বসে প্রায় একই ধারায় চিন্তা করেছি। অতীতের বিপ্লবী প্রচেষ্টাগুলির পরিণতি পর্যবেক্ষণ করে আমাদের এই শিক্ষা হয়েছে যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে আমাদের শক্তির সীমা অতিক্রম না করে কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে। অতিরিক্ত আশা করতে গেলে শেষ পর্যন্ত সবটা কাগজে-কলমেই আবদ্ধ থাকবে। আমরা দুজনে কয়েকটি মূল বিষয় সম্বন্ধে একমত হ'লাম: যথা—

(১) আর ডাকাতি নয়।

(২) নিজ নিজ বাড়ী থেকে অর্থ সংগ্রহ করা।

(৩) বিদেশ থেকে একসাথে বহু অস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা নয়।

(৪) সরকারী অস্ত্রাগারেই একসঙ্গে বহু অস্ত্র পাওয়া যায়। অতর্কিত আক্রমণে এগুলি অধিকার করে দলের সদস্যদের মধ্যে বিলি করা।

(৫) নির্দিষ্ট সংখ্যক সভ্যকে গোপনে একটি বা দুটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং অন্যান্যদের নকল অস্ত্র দিয়ে স্তরে স্তরে শিক্ষা দেওয়া হবে।

(৬) অল্প কয়েকটি অস্ত্র গোপনে সংগ্রহ করতে হবে যার সাহায্যে অস্ত্রাগার আক্রমণ করব। তাছাড়া শেষ সময়ে যার যার বাড়ীতে বন্দুক আছে সেগুলি আনা হবে।

(৭) অস্ত্রাগার অধিকারের জন্য যতটা দরকার বিস্ফোরক এবং বোমা তৈরি করা হবে।

(৮) গোপনে দল গঠন এবং অতর্কিত আক্রমণের ওপরেই আমাদের কার্যকারিতা নির্ভর করবে।

(৯) ভারতীয় অফিসার হত্যা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকব।

(১০) ইউরোপীয়ানদের দলে দলে হত্যা করা হবে যাতে তারা ভারতীয়দের প্রত্যক্ষ প্রতিহিংসার গুরুত্ব উপলব্ধি করে।

(১১) ব্যক্তিগত হত্যার পরিবর্তে সুসংগঠিতভাবে আক্রমণ বা অভ্যুত্থানের আয়োজন করতে হবে। আমাদের এই উদাহরণ দেখে ভারতের সর্বত্র বিপ্লবীরা সংগঠিত হয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বৃটিশ ঘাঁটির ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাবে।

এরপর হ'ল শেষ কথাটা। অর্থাৎ, ঠিক কোথায় কিভাবে আমরা কাজ করব। এ বিষয়ে আমরা চিন্তা করে যে পরিকল্পনাটি দাঁড় করিয়েছিলাম সেটা এই রকম---

(১) চট্টগ্রামের অস্ত্রাগারগুলি অতর্কিত আক্রমণে অধিকার করা হবে।

(২) বিশেষ বিশেষ জায়গা এবং রেল লাইনের কোন কোন স্থানে টিনেভরা বারুদ (অর্থাৎ বিকল্প ল্যান্ড মাইন) এবং ডিনামাইট রেখে দেব প্রয়োজন মত ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে।

(৩) অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিপ্লবী দল সহ আমরা চলে যাব পাহাড়ে জঙ্গলে। সেখানে তাদের আরো ভাল করে শিক্ষা দিয়ে গেরিলাবাহিনী তৈরি করব। তারপর শিবাজীর মত হঠাৎ হঠাৎ শহরে ঢুকে শত্রুঘাঁটি আক্রমণ করে শত্রুদের বিপর্যস্ত করে দেব।

(৪) দরকার মত ঐ ডিনামাইটে আগুন ধরিয়ে শত্রুঘাঁটি এবং শত্রু-সৈন্যবাহী রেল গাড়ি ধ্বংস করব।

(৫) এইভাবে চট্টগ্রাম জেলাব্যাপী গেরিলাযুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করে শেষ পর্যন্ত পরাক্রান্ত শত্রুবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে করতে প্রাণ দেব।

আমার পরিকল্পনাটি মন দিয়ে শুনল গণেশ। তারপর তার নিজস্ব পরিকল্পনা আমাকে বলল--

(১) অতর্কিতে অস্ত্রাগার অধিকার করা।

(২) অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সজ্জিত হওয়া।

(৩) রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করা।

(৪) আভ্যন্তরীণ টেলিফোন যোগাযোগ বন্ধ করা।

(৫) টেলিগ্রাফের তার কাটা।

(৬) বন্দুকের দোকান অধিকার।

(৭) দলে দলে ইউরোপীয়ানদের হত্যা করা।

(৮) অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠন করা।

(৯) তারপর শহর অধিকার করে নিয়ে ওখানে থেকেই যুদ্ধ করে মৃত্যু-বরণ করা।

বাঃ, কী চমৎকার প্রস্তাব! শেষ কথাটি আমাকে একেবারে অভিভূত করে দিল, "পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে আর কাউকে দলত্যাগ করে বিশ্বাস-ঘাতকতার সুযোগ দেব না। একত্রে থাকব সকলে। মুখোমুখি যুদ্ধ করব। কোন গোপনতা থাকবে না, বন্দী হবার ভয় থাকবে না। সম্মুখ যুদ্ধ করে একসঙ্গে মৃত্যুবরণ করব। একসাথে এসেছি একসাথে যাব।" আমি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে গণেশের হাত জড়িয়ে ধরলাম। সমস্ত প্রোগ্রামই খুব ভাল হয়েছে, অনেক বেশি বাস্তবপন্থী হয়েছে। আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছি ওর প্রস্তাব।

চট্টগ্রামের সশস্ত্র আক্রমণ ও জেলার ক্ষমতা দখল—এই সামগ্রিক প্ল্যানটির প্রধান ও প্রথম সৃষ্টিকারক হ'ল গণেশ ঘোষ। সামরিক শিক্ষার জ্ঞান, আইরিশ বিপ্লবী সংগঠন এবং ম্যাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডির বিপ্লবী ইতিহাস বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তার পড়া ছিল। পড়ার সুযোগ সে পেয়েছিল জেলে। অনেক প্রধান ও নেতৃস্থানীয় দাদাদের সঙ্গে থাকার সময় জেলে গণেশ পড়াশুনার যে সুযোগ পায়, সেই সুযোগ আমার হয় নি। তবে খুব আনন্দের কথা এই যে, ঐ সব বড় বড় এবং অভিজ্ঞ দাদাদের সঙ্গে একসঙ্গে থেকেও কংগ্রেসের অহিংস ভাবধারায় গা ভাসিয়ে না দিয়ে, সেই যুগোপযোগী বৈপ্লবিক সত্তা বজায় রেখে গণেশ মুক্তি পেয়ে এল কর্মক্ষেত্রে। বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পেরেছিল বলেই গণেশের পক্ষে সেই যুগে এরূপ একটি বাস্তব পরিকল্পনা দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

দুজনে মিলে এই প্ল্যানটি খাড়া করে ঠিক করলাম এবার মাস্টারদাকে বলব। পরদিন গণেশের বাড়ীতেই মিলিত হ'লাম তিনজনে। সব কথা খুলে বললাম মাস্টারদাকে। অতীতের বিপ্লবী প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কোন্ ধারায় চিন্তা করেছি, কেন আমরা মাত্র স্বল্পপরিসর এলাকার মধ্যে এই সশস্ত্র

অভ্যুত্থান সীমাবন্ধ রাখতে চাইছি, আমাদের শক্তির পরিধি কতটা এবং সেই শক্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী কী বাস্তব পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করতে চাই, তা' বিস্তারিতভাবে খুলে বলে মাস্টারদার অনুমোদন চাইলাম।

মাস্টারদা শান্ত ধীরভাবে আমাদের প্রতিটি কথা শুনলেন। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে খুঁটিনাটি বিষয়ে সন্দেহভঞ্জন করলেন। পরিকল্পনার সামগ্রিক রূপ তাঁর চোখে ধরা দিল। তাঁর চোখ দুটি জ্বলে উঠল, মুখে উত্তেজনার চিহ্ন দেখা গেল। পর মুহূর্তেই আবার সব স্থির—সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেল তাঁর মন।

দু' মিনিট কারো মুখে কোন কথা নেই। ঘরের মধ্যে একটা নির্বাক প্রতীক্ষা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সহসা উৎসাহে উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন মাস্টারদা। মাস্টারদাকে উৎসাহে অধীর হতে সেই প্রথম দেখলাম, আর সেই শেষ দেখা। মাস্টারদার মনের আগুন কোনদিন বাইরে প্রকাশ পেত না. অসাধারণ সংযমবোধ ছিল তাঁর চরিত্রে।

উঠে দাঁড়িয়েছেন মাস্টারদা। চোখ দুটি তাঁর উৎসাহে জ্বলে উঠেছে, অন্ধকারের মধ্যে আলোর সন্ধান পেয়েছেন যেন। আমাদের দিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন—

"এটাই কি কার্যকরী করতে পারব আমরা? তোরা কি মনে করিস এটা করা সম্ভব হবে? অন্তত একটা জেলায়ও আমরা কি এরকম অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার কায়েম করতে পারব? ভারতবর্ষের একটা জায়গায়ও যদি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গড়ে তুলতে পারি, তাই করব। তোদের ওপর আমার বিশ্বাস আছে, নিশ্চয়ই পারব আমরা। ঠিক আছে, তাই হোক। এটাই হোক আমাদের প্রাথমিক ক্ষুদ্রতম প্রোগ্রাম—একটা জেলায়ও অন্তত অস্থায়ী বিপ্লবী গভর্ণমেন্ট তৈরি করা। আমার খুব মত আছে। শুধু কাগজে-কলমে লিখে সারা ভারতবর্ষব্যাপী বা প্রদেশব্যাপী একটা অভ্যুত্থানের প্রোগ্রাম নিয়ে কি হবে—যদি তা' কাজে না করতে পারি? অনেকবার দেখেছি আমরা, অনেকবার চেষ্টা করেছি—হ'ল না। প্রত্যেকবারই ভেতর থেকে খবর গেছে পুলিশের কাছে—কাজে পরিণত হবার আগেই অঙ্কুরে বিনাশ হয়েছে সব পরিকল্পনা। আর বড় বড় কথা বলে কাজ নেই। ঠিক বলেছিস তোরা—যেটুকু সাধ্য আমাদের, তাই নিয়ে কাজ করব যাতে জয়ী হতে পারি, সফল হতে পারি! বড় বড় প্রোগ্রাম নিয়ে বার বার ব্যর্থ হলে শুধু মন ভেঙে পড়বে, কোন কাজ হবে না। এবার আমাদের সব বুদ্ধি, সব শক্তি, সব চেষ্টা একত্রিত করে এইটুকু প্রোগ্রাম কার্যকরী করব। শুধু দৃঢ় সংকল্প থাকলেই কাজ হয় না, যদি না বুদ্ধির জোরে পুলিশকে বোকা বানাতে পারি। একই ধারায় চিন্তা করব, একসাথে কাজ করব, সকলে এক হয়ে অকপটে একটি প্রোগ্রাম অনুসরণ করব—কেন সফল হব না? নিজের ওপর বিশ্বাস আছে আমার, তোদের ওপরেও আস্থা আছে। আমাদের সমবেত শক্তিকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। সফল হবই আমরা..............।"

১৫ই অক্টোবর ১৯২৯ সাল। পরস্পর হাতে হাত দিয়ে শপথ করলাম আমরা—এই হবে আমাদের ভবিষ্যতের প্রোগ্রাম। আর সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করে এই একটি কাজকে সফল করে তুলতে সর্বশক্তি নিয়োগ করব। আর

তারপর, —'do or die' নয়, 'do and die.' অর্থাৎ 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' নয়, 'করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গে।'

যে সময় আমরা এই প্রোগ্রামটি নিলাম, তখন আমাদের শক্তি কতখানি বা কি রকম? পুরোনো ভাণ্ডারের কয়েকটি পিস্তল-রিভলভার, বোমার জন্য সতেরোটি লোহার খোল এবং কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর কর্মী। এই কর্মীদের শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে নিতে পারব। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য তো আরও চাই। তার জন্য টাকা পাব কোথায়? ডাকাতি করা চলবে না তা' আগেই ঠিক করা ছিল। সুতরাং কয়েকটি ধনী পরিবার থেকে কয়েকজন যুবককে অনেক আগে থেকেই দলে নিয়েছিলাম। তখনও তাদের টাকার কথা বলি নি। আমাদের প্রকাশ্য সংগঠনগুলি সাহায্য করল এ কাজে। দলে যোগ দিল—মাখন ঘোষাল, শ্রীপতি চৌধুরী এবং হরিপদ মহাজন—চট্টগ্রামের তিনটি বিশিষ্ট ধনী পরিবারের ছেলে এরা।

এদের তিনজনের নাম করলাম বলে এরাই যে শুধু টাকা এনে দেবে তা' নয়। প্রত্যেকে তার সাধ্যমত টাকা বাড়ী থেকে এনে দেবে, এই ছিল উদ্দেশ্য। সেজন্য নতুন সদস্যদের পৃথকভাবে শিক্ষা দেওয়া হ'ত এবং অল্প বা বেশি টাকার ব্যবস্থা করতে হলে রীতিমত চিন্তা করে প্ল্যান করা হ'ত। একটা সামান্য ত্রুটিও যেন না থাকে এই ছিল উদ্দেশ্য। বাড়ী থেকে বেশি টাকা আনবার ব্যবস্থা যখন করেছি তখন তা' নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করে তারপর হাত দিয়েছি।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রোগ্রাম হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে আমরা একেবারে অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করতে সুরু করলাম তা' নয়। আরও কয়েক মাস প্রকাশ্য সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থেকে গুপ্তদলে সদস্য সংগ্রহ করব এবং পুলিশের দৃষ্টি অন্য পথে চালনা করব, এই ছিল আমাদের ইচ্ছা।

আমাদের অস্ত্র কেনার কাজ সুরু হ'ল। কিন্তু অস্ত্র পাওয়া তখন খুব কঠিন। বিপ্লবী নেতারা বন্দী হওয়ায় স্মাগ্লারদের অস্ত্র সরবরাহের ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়েছিল। এখন আর তারা সেটা পুনরুজ্জীবিত করতে চায় না, কারণ আফিং কোকেনের ব্যবসায়ে লাভ অনেক বেশি। অনুকূলদা নিজে চেষ্টা করলেন, আমাকেও কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওদের মনোভাব বুঝে আমি আগাম টাকা দিলাম এবং অস্ত্রের জন্য এমন মূল্য দিতে চাইলাম যা তাদের আফিং কোকেনের ব্যবসায়ের চেয়ে বেশি লাভ দেবে। আমার বক্তব্য হ'ল, 'অস্ত্র আমাদের চাই। আমরা দেশের মধ্যে থেকে টাকা জোগাড় করতে পারি, বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী কর তোমরা। তোমাদের যাতে ক্ষতি না হয়, সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখব।' অস্ত্রের 'কালোবাজার' চড়ে গেল,—আবার পেলাম পিস্তল, রিভলভার।

আমি রিভলভার ও পিস্তল কেনবার জন্য একেবারে পাগল হয়ে উঠলাম। প্রত্যেকদিন আমার কাজ হ'ল অনুকূলদার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘন্টা অতিবাহিত করা। বেড়াতে যাচ্ছি, এক সঙ্গে খাচ্ছি, মাঝে মাঝে মাঠে বা বাড়ীতে গিয়ে বসছি। জানতাম মাথা খুঁড়লেও যখন তখন বিনা-লাইসেন্সে আগ্নেয়াস্ত্র কেনা যায় না। কিন্তু আমার মন কিছুতেই মানত না। কয়েকদিন অতি-বাহিত হলেই অনুকূলদাকে বলতাম—"দাদা, কোনমতে বেশি টাকা দিলেও

কি রিভলভার পাওয়া যায় না?" আবার হয়ত ক'দিন পরে বলতাম—"দাদা, চলুন না চেষ্টা করে দেখি?" চেষ্টাতে যেন ঢিলেমি না আসে সেই জন্য অনুকূলদাকে আকুল আবেগে বলেছি—"দাদা, রাগ করবেন না, আমি সব সময় আপনাকে পীড়াপীড়ি করছি। যে কোন উপায়ে হোক্ আপনাকে যত শীঘ্র সম্ভব পিস্তল যোগাড় করতেই হবে। যেখান থেকে পারি বা যেভাবে পারি টাকা যোগাড় হবেই। টাকার জন্য ভাববেন না। আমাদের অস্ত্র দিন। সকাল থেকে সন্ধ্যে, তারপর রাত্রেও আপনি ট্যাক্সি করে সব ক'টি পরিচিত স্মাগ্‌লারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন, তাদের লোভ দেখান এবং খুব জোর দিয়ে বলুন যত শীঘ্র দিতে পারবে তত বেশি দাম দেব......।"

অনুকূলদা আমার তরুণ মনের অধৈর্য ও আকুলতা দেখে হাসতেন—কখনও রাগ করেন নি। মিষ্টি করে বলেছেন—"এরকম গরজ দেখালে স্মাগ্‌-লাররা একেবারে পেয়ে বসবে। তারপর তাদের ক্ষিদে মেটানো দায় হবে। তাই অত তাড়াহুড়ো করাটা ঠিক উচিত হবে না....।" কিন্তু তবুও কি অনুকূলদা আমার অস্থিরতা ও দুরন্তপনার কাছে টিকে থাকতে পারলেন? তিনি ইচ্ছায় হোক্ বা অনিচ্ছায় হোক্ তরুণের উন্দামতার কাছে হার মানলেন।

ডাঃ বিধান রায়ের বাড়ীর কাছে নাবিক বস্তিতে এক বৃদ্ধ মুসলমান ফকির সাহেব থাকতেন। অনুকূলদা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। অনুকূলদা তাঁকে প্রণাম করলেন। আমিও তৎক্ষণাৎ ফকির সাহেবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। আগে থেকেই কথা হয়েছিল, অনুকূলদা টাকা দিলেন। ফকির সাহেব তাঁর পাশের একটি হাঁড়ির মধ্যে থেকে দুটো রিভলভার বার করে দিলেন। প্রণাম করে চলে এলাম। আসবার সময় ফকির সাহেব বললেন —'সময় মত খবর দেবেন।'

একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাহেব—এখন তাঁর নাম বললে ক্ষতি কি? তখনই তাঁর বেশ বয়স হয়েছিল—তাঁর নাম মিঃ পিটার। তিনি ব্যবসা করতেন, একটা রাইস মিলও আছে। খুব সুন্দর সাজান বাড়ী তাঁর। সেখানে অনুকূলদা আমাকে কয়েকবার নিয়ে গেছেন। অনুকূলদার উপস্থিতিতে সাধারণতঃ আমি কথা বলতাম না। ইনি কয়েকটা অস্ত্র দিয়েছেন; তা'ছাড়া মিঃ পিটারই বিভিন্ন 'বোরের' (অর্থাৎ ব্যাসের) রিভলভার ও পিস্তলের কার্তুজ সরবরাহ করতেন। স্মাগ্‌লাররা পিস্তল ও রিভলভারের সঙ্গে ৫০।১০০ কার্তুজ এককালীন দিত—এছাড়া তারা কার্তুজ বিক্রি করত না। মিঃ পিটারের বহু সাহেব বন্ধু ছিল। তাদের licensed পিস্তল রিভলভারের কার্তুজ মিঃ পিটারই যোগাড় করে আনতেন। প্রথম কেনা Belgium make রিভল-ভারের ·৩২০ বোরের কার্তুজ ছিল না। আমি অনুকূলদাকে খুব পীড়াপীড়ি করলাম সাহেবকে বলতে যেন এই বোরের কার্তুজ অন্তত ২৫টি হলেও উপযুক্ত দামের বিনিময়ে আমাদের দেয়। অনুকূলদা সাহেবকে সেই কথা বলেন নি। যখন সাহেবের ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন কেন কার্তুজ চাইলেন না অনুকূলদাকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন যে, যখন license অনুযায়ী বৎসরের শেষে তারা কার্তুজ কেনে তখনই মাত্র কার্তুজ পাওয়া যায়। আমি এই যুক্তি মনে মনে মানলাম না। ন্যায় করি বা অন্যায় করি, আমি অনুকূলদার মত না নিয়ে তার পরদিনই সন্ধ্যায় একা সাইকেলে করে

সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। সাহেবকে আমার খুব গরজ দেখিয়ে বললাম—"দেখ মিস্টার, আমার ·৩২০ বোরের কিছু রিভলভারের কার্তুজ না হলেই নয়। রিভলভারটি পড়ে আছে—একটি কার্তুজও নেই। তুমি যেখান থেকে পার এনে দাও। যা দাম চাও তাই দেব।" তারপর সাহেবের উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বললাম—"অন্তত ২৫টি কার্তুজ দাও। আমি প্রত্যেকটি কার্তুজের জন্য দু' টাকা করে দেব। তা' ছাড়া তুমি গাড়ি বা ট্যাক্সিতে যাও, সারাদিন ঘোরো—আমি তোমার গাড়ি ভাড়া বাবদ পঁচিশ টাকা এখনি দিচ্ছি।" এ-কথা বলেই তক্ষুণি পঁচিশ টাকা দিলাম। আরও বললাম যে, কার্তুজ পেলে তাকে আরো খুশি করব। মিঃ পিটার সহাস্য বদনে বললেন—"Well babu, day after to-morrow please come. By this time I must give you cartridges." (দেখ বাবু, আগামী পরশু এই সময় এস, তোমাকে আমি নিশ্চয়ই কার্তুজ দেব)। বলা বাহুল্য, কার্তুজ ঠিকই পেলাম। অনুকূলদাকে বললাম। তিনি রাগ করেন নি। এই সাহেবকে খুব ভাল মদ কিনে উপহার দিলাম—অবশ্য টাকার বদলে নয়। আগেও কয়েকবার অনুকূলদার সঙ্গে গিয়ে তাঁকে মদ প্রেজেন্ট করেছি।

আর একজন ফ্রেণ্চ্ সাহেব। তাঁর নাম আমি ভুলে গেছি। তাঁর নতুন 'স্টুডিবেকার' গাড়ি, বড় বাড়ী--চারদিক দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। মস্ত বড সাজান ড্রইং রুম। চার-পাঁচ বার এই সাহেবের কাছে গিয়েছি অনুকূলদার সঙ্গে। সাহেবের আর কি কি কারবার ছিল তা' আমার জানা নেই। তবে তাঁর ভাবগতিক দেখে এবং দু-একটা কথা যা কানে এসেছিল তাতে আমার মনে হয় তিনি রেস্ ও জুয়া খেলতেন। তাঁর মেমসাহেবকেও দেখেছি। মনে হয়েছিল সাহেবের এইসব গুণ সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল নন। তবে এক-দিন ভুল ভাঙলো। বিকেলবেলা আমি আর অনুকূলদা তাঁর ওখানে গেলাম। খবর পেয়ে তিনি আমাদের তাঁর Bed Room-এ ডাকলেন। গিয়ে দেখি তিনি একেবারে শয্যাশায়ী—বাতে ভুগছেন। অনুকূলদা ও আমি আমাদের স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলাম। সাহেব সব কথা ভাল করে শুনলেনও না। অনুকূলদাকে আকস্মিকভাবে পেয়ে তিনি খুব খুশি হলেন এবং যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। তিনি জানালেন দুটো খুব ভাল পিস্তল, extra magazine ও প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রায় দু'শো করে কার্তুজ আছে। তাঁর কাছেই আছে—কি করে পাচার করবেন তাই নিয়ে চিন্তা করছিলেন। আমরা এসে পড়াতে তিনি তাঁর মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচলেন। এই বলে, তাঁর স্ত্রীকে ডাকলেন এবং লোহার আলমারীর চাবি চেয়ে নিলেন। আলমারী তাঁর বিছানার সঙ্গে লাগান ছিল। ঝক্ঝকে নয় শট্-ওয়ালা দুটি পিস্তল, ম্যাগাজিন ও কার্তুজ বার করে দিলেন। অনুকূলদা বললেন, সঙ্গে টাকা আনেন নি। সাহেব তাতে একটুও ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তিনি বললেন—'নিয়ে যাও, পরে এক সময় টাকা দিলেই হবে।' আমাদের তক্ষুণি চলে যেতে বললেন। পেছনের একটি ছোট্ট দরজা দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। আমি যে খুব সন্দিগ্ধ ও চিন্তিত ছিলাম না, তা' নয়। তখন খবরের কাগজে প্রায়ই পড়ি রিভলভার সমেত স্মাগ্লার বা কোন লোক ধরা পড়েছে। সাহেব যে পিস্তল দিয়েই আমাদের বেরিয়ে যেতে বললেন এবং তাঁর যে সমস্ত ভাবগতিক

লক্ষ্য করেছিলাম, তাতে সন্দেহের উদ্রেক হয় না বটে, তবু দুশ্চিন্তা না করে পারি নি। অনুকূলদা নিজে একটা পিস্তল কোমরে গুঁজে নিয়েছিলেন। কেউ আমাদের ধরে নি—অনুসরণও করে নি। ভেবে ভাল লাগে যে কত-দিনের পরিচিত এই সব লোক—অনুকূলদাকে কত বিশ্বাস করে এবং অনুকূলদাও তাদের ওপর কতখানি নির্ভর করেন! আমার সেই আগেকার ধারণা আরও বদ্ধমূল হ'ল—দলের লোক ধরিয়ে না দিলে পুলিশ কখনও ধরতে পারে না।

আর একজন জাহাজী মুসলমান বন্ধু—নাম তার ইয়াকুফ্। খুব চতুর ও স্মার্ট। চলনে বলনে পোষাকে খুব কেতা দুরস্ত। ইনিই আমাদের সবচেয়ে বেশি অস্ত্র দিয়েছেন। এক একবার এক একভাবে delivery দিয়েছেন। একবার ঠিক সময়ে একটা খুব বড় প্রাইভেট্ গাড়ি এসে নির্ধারিত স্থানে থামল। আমি ও অনুকূলদা পাঁচ মিনিট আগে থেকে দাঁড়িয়েছিলাম। গাড়িটি থামার সঙ্গে সঙ্গে ইয়াকুফ্ ও আরেকজন খুব জাঁদরেল চেহারার লোক গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। ইঙ্গিতে দেখিয়ে গেলেন পেছনের seat-এর পা রাখবার জায়গায় একটা পোঁটলা আছে। তাঁরাও চলে গেলেন আর অনুকূলদা পোঁটলাটা সরিয়ে নিলেন। গাড়ি পূর্ণ বেগে মোড় ঘুরে উধাও।

১৯৩০ সাল। আবদুল রজ্জক খাঁ-র বয়সই বা কি ছিল! তিনি কম্যুনিস্ট ছিলেন কিনা বা সাম্যবাদ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান কতখানি ছিল তা জানতাম না। আর আমি তখন কম্যুনিজমের 'ক'-ও বুঝি না—নামও শুনি নি। সেই সময় আমাদের এক বন্ধুর সঙ্গে খাঁ সাহেবের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। খাঁ সাহেবের সঙ্গে জাহাজীদের খুব পরিচয় ও জানা-শোনা। তিনি তাদের কাছ থেকে উপযুক্ত মূল্যে পিস্তল কিনে আমাদের দিয়েছেন। তিনি আমাকে চারটে পিস্তল দিয়েছিলেন। প্রথম দুটি তাঁর কাছ থেকে নিয়ে এসে বাড়ীতেই রেখেছিল আমাদের বন্ধু—শশাঙ্ক চৌধুরী। আমি আসামাত্র যখন জানলাম যে, বাড়ীতেই পিস্তল আছে, তখনই তা' সরিয়ে ফেলা সমীচীন মনে করলাম। কি জানি, যদি কোন পুলিশের ফাঁদ পাতা থাকে? তাই কখনও সোজা পথ নিতে নেই। আমি বেশ সুন্দর করে কাগজে মুড়ে দুটো পিস্তল আছে বলে মনে হয়, এই রকম একটি প্যাকেট বানালাম। তা' নিয়ে সন্তর্পণে চোরের মত যাওয়ার ভাণ করে বের হলাম। বেশ কিছুদূর হেঁটে গেলাম। কেউ আর ঝাপটে ধরল না। নিশ্চিত হলাম, পুলিশের ফাঁদ নেই। সঙ্গে সঙ্গে সেই বাড়ীতে আবার ফিরে গেলাম এবং পিস্তল দুটি সঙ্গে নিয়ে সাইকেলে চড়ে যথাস্থানে গোপনে রেখে এলাম। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের বন্ধু আবার দুটি পিস্তল খাঁ সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে এল। বন্ধুটি তার একটি পরিচিত কবিরাজের দোকানে পিস্তল দুটি রেখে দেয় এবং আমাকে সময় স্থির করে দিল যে, ঠিক রাত আটটায় তা' নিয়ে আসতে হবে। আমি এই প্রস্তাব শুনলাম বিকেলে। আমার সন্দেহে ভরা মন—কি করব? আমি বন্ধুটিকে বললাম—'চল এক্ষুণি নিয়ে আসি।' বন্ধুটি তখনি আনতে যাওয়ার অনেক অসুবিধে আছে বলল এবং আরও জানাল যে যদি অসময়ে আমরা সেখানে যাই তবে এইরূপ সুন্দর একটি custody অকেজো হয়ে যাবে। আমি মনে মনে স্থির করলাম, নির্ধারিত সময়ে কোনমতেই যাব না।

নাছোড়বান্দা হয়ে তক্ষুণি গিয়ে পিস্তল দুটি নিয়ে উধাও হ'লাম। এই সাবধানতা আমি পদে পদে অবলম্বন করেছি, ষড়যন্ত্রমূলক কাজের নীতি হিসেবে।

এইভাবে পাগলের মত অস্ত্র কিনেছি, টাকার পরিমাণের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে। একবার এমন একটি অবস্থার সম্মুখীন হলাম যে তক্ষুণি এক হাজার টাকার প্রয়োজন, নইলে স্মাগ্লার আমাদের ক্রয়ক্ষমতার ওপর আস্থা হারাবে। অনুকূলদা বললেন—"আমি কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে টাকা ধার নিতে পারি। হাজারে প্রথমেই একশ' টাকা সুদ হিসেবে কেটে নেবে। তারপর ঠিক এক মাসে টাকা ফেরত দিতে হবে।" আমি অনুকূলদাকে বললাম, "তাহলে আর দেরি করা কেন? কাবুলিওয়ালার কাছ থেকেই টাকা ধার করা হোক্।" অনুকূলদা বার বার জিজ্ঞাসা করলেন, ঠিক এক মাসে টাকা ফেরত দিতে পারব কি না। আমি তাঁকে নিশ্চিন্ত থাকতে বললাম। কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে টাকা নেওয়া হ'ল এবং অস্ত্র পেলাম।

অনুকূলদা আর একজন জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাবার আগে আমার কাছে অনেকবার এ'র সম্বন্ধে গর্বভরে বলেছেন—"তুমি দেখবে ও কি রকম। গোল মুখ, উজ্জ্বল তামাটে রং, দোহারা চেহারা—খাঁটি আইরিশ সাহেব। ও এখনও জাহাজ নিয়ে ফেরে নি। যদি সে একবার এসে যায় তবে আর ভাবনা থাকবে না, তার সঙ্গে বন্দোবস্ত করব। প্রচুর অস্ত্র আনাতে পারব......।"

সত্যিই, যখন দেখা হ'ল—ঠিক তাই, দোহারা চেহারা, তামাটে রং ক্যাপ্টেন সাহেবের। অনুকূলদার সঙ্গে ক্যাপ্টেন সাহেবের জাহাজের কেবিনে গেলাম। অনুকূলদা বেশ ইংরেজী ও হিন্দিতে তাঁর সঙ্গে কথা বলে চললেন। তাঁকে বলা হ'ল আমাদের প্রচুর অস্ত্র চাই। দাম যা লাগে তাই দেব। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কি রকম ধরনের অস্ত্র--রাইফেল চাই কি না। আমরা বললাম যে রাইফেল নয়—রিভলভার ও পিস্তল এবং প্রচুর এম্যুনিশন্। আবার বিদেশ হয়ে জাহাজ নিয়ে ফিরে এলে তিনি আমাদের জন্য অস্ত্র আনবেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন।

পাঁচ ছয় মাস অক্লান্ত চেষ্টা করে মাত্র চোদ্দটা অস্ত্র কিনতে পেরেছিলাম। ক্যাপ্টেন সাহেবের ইউরোপ ঘুরে ফিরে আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। এই বিষয়ে পরে বলা হবে যে, কি কারণে এবং কি ভাবে সামান্য অস্ত্রের সাহায্যে আমাদের প্রস্তুত হতে হয়েছিল সশস্ত্র আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে। ক্যাপটেন্ সাহেব অস্ত্র নিয়ে ফিরেছিলেন কিনা তা' আমার জানা নেই। তবে বোধ হয় ক্যাপ্টেন তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন, কারণ, আমাদের অবর্তমানেও অনেক অস্ত্র বিপ্লবীরা কিনেছে। কেবল যে সেই ক্যাপ্টেনই অস্ত্র দিয়েছিলেন, তা' আমি বলছি না—আমার বক্তব্য হচ্ছে, তিনিও খুব সম্ভব খালাসীদের মারফত বিপ্লবীদের অস্ত্র দিয়েছিলেন।

এই সময়ে, আমাদের সশস্ত্র আক্রমণের মাস ছয় আগে, গুপ্ত বিপ্লবী দলের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, ব্যায়াম-সঙ্ঘগুলিতে নিয়মিত যেতে পারতাম না। একে তো ঝামেলার অন্ত ছিল না, তার ওপরে দলাদলি, রেষারেষি ও মারামারি লেগেই ছিল। আমাদের সশস্ত্র আক্রমণের অল্প কিছুদিন

আগে অনুশীলন দলের সঙ্গে আমাদের দলের ছেলেদের একটা মারামারি হয়ে গেল। একেই তো সুখেন্দুর ব্যাপারে সবাই ক্ষেপেছিল; আমাদের গুপ্ত দলের সক্রিয় কর্মীরা এই ঘটনার প্রতিশোধ নেবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠল। সুখেন্দু মৃত্যুর আগে শেষ জবানবন্দীতে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে কয়জনের নাম বলেছিল, তাদের নামে মামলা রুজু হ'ল। এই মামলায় অপরাধ প্রমাণের জন্য অথবা অনুশীলন দলের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য সময় এবং শক্তি নষ্ট করবার ইচ্ছে আমাদের মোটেই ছিল না। আরও অনেক বড় কাজের দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছি তখন। কিন্তু তরুণ সদস্যরা তো জানে না সেই উদ্দেশ্যের কথা! প্রকাশ হয়ে পড়বার ভয়ে তাদের সব বলতেও পারি না! কাজেই, কে কার কথা শুনবে? তরুণ সদস্যরা দলের প্রাধান্য রাখতে চায়। হ'ল একটা ছোট রকমের সংঘর্ষ অনুশীলন দলের সঙ্গে। প্রাধান্যের লড়াই তো বটেই—তবে মারামারির সূত্রপাত হ'ল আমাদের দুই দলের মধ্যে তখনকার যুগের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর বৈষম্যের জন্য। আমাদের ছাপানো মামলার রায় থেকে উদ্ধৃত করছি—

"On 22nd February another incident had taken place which may be mentioned. Karunamoy Dutta (P. W. 261), a student of the Municipal School and member of the Chittagong Student's Association (there was another Student's pices of his Association on the subject "That the pen is mighter than the sword". The notice was torn down by Nripa Gopal Dastidar—another student of the school who would have torn down also the second notice put up in its place by Karunamoy if the latter had not prevented Association with Bijoy Kumar Sen—accd.,—as secretary) posted up on the school notice board a notice announcing that a debate would be held on the 23rd under the aushim. That afternoon on his way home, Karunamoy was set upon by Nripa Gopal and Krishna Kumar Choudhury and Hemendu Dastidar (both absconding accd.), but was rescued by his father who made a complaint to the Headmaster. The next afternoon (22nd) he was again set upon by the same three boys and several others but some college students interfered and he ran home. About 2 p.m. S. I. Siddik Dewan found a crowd of about 200 youths assembled on the road and maidan in front of Karunamoy's house—among them Ganesh Ghosh and Ananta Singh—while Karunamoy and some 20 other friends of his were inside the compound. As a fight seemed imminent and they paid no attention to his order to move on, he sent to Kotwali P.S. for assistance....In the course of the

investigation Azim was unable to find Harigopal Bal, Tripura Sen and Ganesh Ghosh who called them to his house and then telephoned to Azim who went there and found them on 25th February....According to the prosecution, the incident in itself is of minor importance but having regard to the origin of the brawl, is significant in as much as most of the persons implicated by Karunamoy were constant associates of Ganesh Ghosh and Ananta Lal Singh and it affords an index of their solidarity, of their proneness to violence and of Ganesh Ghosh's influence over them. A word from Ganesh Ghosh was sufficient to secure the appearance of the three for whom the police had been searching in vain."

১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ২২শে তারিখের ঘটনা। আমাদের সশস্ত্র আক্রমণের মাত্র দু'মাস আগের কথা। জজ সাহেব সেই ঘটনার উল্লেখ করলেন তাঁর রায়ে। শ্রীকরুণাময় তখন ছাত্রজীবনে অনুশীলন দলের সভ্য। স্কুলে সে বিতর্কসভার নোটিশ দিল "তরবারির চাইতে লেখনী শক্তিমান"— এই বিষয়ে বিতর্ক হবে। আমাদের দলের সভ্য নৃপগোপাল সেই নোটিশটি ছিঁড়ে ফেলল। তারপর আবার একটি অনুরূপ নোটিশ করুণাময় স্কুলের নোটিশ বোর্ডে লাগাল। জজ সাহেবের মতে নৃপগোপাল, কৃষ্ণ চৌধুরী ও হেমেন্দু বাধা পেয়ে নোটিশটা ছিঁড়তে পারল না। কিন্তু করুণাময় বাড়ী ফেরবার পথে এই তিনজনের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সময় কিছু কলেজের ছেলে এসে বাধা দেয় ও করুণাময় নিজ বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। তাদের বাড়ীর কম্পাউণ্ডে তার প্রায় কুড়িজন যুবক বন্ধু উপস্থিত ছিল—এই হচ্ছে জজ সাহেবের বক্তব্য। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা, ২০ জন বা কিছু অধিক সংখ্যায় অনুশীলন দলের যুবক বন্ধুরা, যাদের সঙ্গে আমাদের খুবই পরিচয় আছে, লাঠি হাতে বদ্ধপরিকর যে আমাদের সাথে মোকাবিলা করবেই। এদিকে জজ সাহেব লিখছেন, তাদের মুখোমুখি আমাদের প্রায় দু'শ জন যুবক সামনের মাঠে জড়ো হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করলেন যে, গণেশ ও আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সাব ইন্সপেক্টর সিদ্দিক এইরূপ একটা আসন্ন সংঘর্ষের আশঙ্কায় সাহায্যের জন্য কোতোয়ালিতে খবর পাঠালেন।

গণেশ ও আমি যে উভয় দলেই একটা রক্তারক্তির আসন্ন বিপদ উপলব্ধি করতে পারি নি তা' নয়। খুবই চিন্তিত হয়েছিলাম কি করে এই ভয়াবহ অবস্থাকে শান্ত করা যায়। আর গত্যন্তর নেই দেখে মুখে মুখে আমাদের হুকুম জানিয়ে দিলাম যে, তারা সবাই তৎক্ষণাৎ স্থান পরিত্যাগ করবে এবং বিশেষ ক'জন (যাদের নাম করে দিলাম তারা) গণেশের বাড়ীতে হাজির হবে; সেখানে আমরা এই ব্যাপারে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। সবাই চলে গেল এবং গণেশের বাড়ীতে আমরা মিলিত হলাম। অবশ্য এই ব্যাপার পুলিশ জানে না। তাই জজসাহেব তা' আর উল্লেখ করবেন কি করে?

তিনি যেটুকু সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়েছেন তা' থেকে আমাদের বিরুদ্ধে

অভিযোগ প্রমাণের জন্য উল্লেখ করলেন—সরকারপক্ষ শুধু এই ঘটনাটিকেই বড় করে দেখতে চায় নি। সরকারপক্ষ দেখাতে চেয়েছে যে কোতোয়ালি-ইন-চার্জ আজীম, ত্রিপুরা সেন, বিধু ভট্টাচার্য ও হরিগোপাল বলের খোঁজ না পেয়ে গণেশকে বলেছিল এবং গণেশ ঘোষ তাদের তিনজনকে নিজ বাড়ীতে উপস্থিত করেছিল আজীমের প্রশ্ন করবার সুবিধার জন্য। তা'ছাড়া করুণাময় যাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল তারা সবাই গণেশ ও আমার সঙ্গে মেলামেশা করত। জজ মামলার রায়ে আরও বলতে চেয়েছেন, এই ঘটনা এবং আমাদের অটুট সংগঠন ও এই ঘটনার সূত্রপাত—অর্থাৎ আমরা সে যুগে লেখনীকে তরবারির ওপরে স্থান দিতে অস্বীকার করি, যুবক বন্ধুদের ওপর গণেশ ঘোষের একান্ত প্রভাবের প্রতি বিশেষ আলোকপাত করে।

সত্যিই এই ঘটনার সূত্রপাত সেই নোটিশ নিয়ে। সেই যুগে আমাদের সঙ্গে বিরুদ্ধপক্ষ বন্ধুদের মতের অমিল ছিল—দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ ছিল। আমরা ভাবতেও পারি নি সে যুগে "তরবারির ওপরে লেখনীর প্রাধান্য" বিষয়ে বিতর্কসভার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে বা তাই নিয়ে ঝগড়া ও মারামারি হতে পারে।

মাত্র দু' মাস বাকি আমাদের সশস্ত্র আক্রমণের। এরই মধ্যে আবার এই গোলমাল! আমাদের বন্ধুদের কারো মুখেই হাসি নেই—সবাই গম্ভীর। সবাই স্থিরসংকল্প যে তারা প্রতিশোধ নেবেই। কারণ, কৃষ্ণ গোপাল ও হেমেন্দুকে অন্য পক্ষ মেরেছে। ওদের তারা শিক্ষা দেবে ও জানাবে যে, বর্তমানে তরবারির প্রয়োজন লেখনীর থেকে অনেক বেশী। আমরা সবাই অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর গণেশ ও আমি তাদের নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, এখন আমাদের কোন প্রকার বিপদে না যাওয়াই উচিত—সরকার আমাদের গ্রেপ্তার করবার কোন সুযোগই যেন না পায়। সকলে এ কথা বুঝতে চাইছিল না। তারা আমাদের দিনক্ষণ ও ব্যাপক পরিকল্পনার কথা জানত না। কাজেই তাদের পক্ষে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ক্ষেপে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু নরেশ, বিধু, ত্রিপুরা, প্রমুখ দায়িত্বশীল সভ্যরা যখন প্রতিআক্রমণের ব্যবস্থা করবার জন্য মেতে উঠেছিল, তখন খুবই খারাপ লাগছিল। শেষ পর্যন্ত গণেশ ও আমি তাদের নিরস্ত করবার জন্য এক নাটকীয় পন্থা নিলাম। বললাম—"তোমরা জান, আমাদের কি কি বা কত অস্ত্র আছে। যদিও সবটা প্ল্যান বা আমাদের পুরো শক্তি সম্বন্ধে তোমাদের জানা নেই তবু এটা তোমরা বুঝতে পারছ যে, আমরা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাব এবং সেই জন্যই প্রস্তুত হচ্ছি। তবু যদি তোমাদের ধৈর্য না থাকে, শক্তির অপচয় হবে বলে মনে না কর তবে এই নাও রিভলভার (ঝট্ ঝট্ করে আমরা দু'জন আমাদের দুটো রিভলভার বেল্ট থেকে খুলে নিয়ে তাদের সামনে ফেলে দিলাম)—যাও প্রতিশোধ নাও...।" যা হোক্ আমাদের এই নাটকের ফল শেষ পর্যন্ত ভালই হ'ল। তারা বুঝল আমরা পেছপা হতে চাই না, তবে শক্তির অপচয় করবার ইচ্ছেও আমাদের নেই। এই অবস্থায় সিদ্ধান্ত তাদেরই নিতে হবে। বিনা দ্বিধায় রিভলভার দুটো সেইজন্য তাদের কাছে দিলাম। যখন সব দায়িত্ব পড়ল তাদের ওপর, তখন তারা শান্ত হ'ল ও বুদ্ধি ফিরে পেল। এই যাত্রা এইভাবে আমরা আমাদের সংগঠনকে পুলিশী আক্রমণ থেকে বাঁচালাম।

সশস্ত্র আক্রমণের জন্য আমরা যে সামান্য পরিমাণ অস্ত্র যোগাড় করে-ছিলাম তার দাম দিতে হয়েছিল অনেক বেশি। এত টাকা পেলাম কোথায়? সেও এক বিরাট ঘটনাবহুল কাহিনী। দু-একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

আমাদের দলের মধ্যে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেই ছিল বেশি। কিন্তু নিয়ম ছিল প্রত্যেককে টাকা যোগাড় করে দিতে হবে। আগেই বলেছি, এটি দলের প্রতি আনুগত্যের একটি প্রাথমিক নমুনা। তবে আমরা এই কঠোরতার ব্যতিক্রম কোন কোন ক্ষেত্রে সমুচিত মনে করেছি। কারণ, যে যে বাড়ীতে আমাদের সব সময় গুপ্ত কাজ চলত, সেই সেই বাড়ীতে কোনরূপ আলোড়নের সৃষ্টি হোক্ বা আমাদের ওপর সন্দেহ হয় এমন কোন কাজ আমরা করতে চাই নি। আমাদের ছোট যুবক ভাইদেরও তা' করতে সম্মতি দিই নি।

তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের ছোট ভাইয়েরা তাদের বৈপ্লবিক উৎসাহের আতিশয্যে অনেক কিছু করে ফেলেছে যা আমাদের সামলাতে বেগ পেতে হয়েছে। আনন্দ ও দেবু (শহীদ দেবপ্রসাদ গুপ্ত) দুই ভাই। তাদের বাড়ীর অবস্থা ভালই বলা চলে; কিন্তু ওদের বলা আছে বাড়ী থেকে যেন কোন গয়না বা টাকা না সরায়। তার কারণ, ওদের বাড়ীর লোকদের সহানু-ভূতি হারালে আমাদের খুবই ক্ষতি। আমাদের দলের ছেলেদের ট্রেনিং-এর কাজ এবং নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে ওদের বাড়ীটা আমরা ব্যবহার করি। কিন্তু আনন্দের কিশোর প্রাণের উৎসাহ বাধা মানল না। বাথরুমে ফেলে আসা একটি সোনার হার সে গোপনে এনে দিল। ওর স্বতঃপ্রবৃত্ত স্বার্থত্যাগের নিদর্শন দেখে মনে মনে খুশি হলেও হারটা নিতে ইতস্তত করলাম। ওর বড় ভাই দেবুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম কি করব? দেবুর মত হারটা নিয়ে নেওয়া। সুতরাং হার আর ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল না।

এদিকে দেবুদের বাড়ীতে হার চুরি নিয়ে হৈ হৈ বেধে গেছে। কোন কিনারা করতে না পেরে দেবুর বাবা ঠিক করেছেন তারাচরণ সাধুকে প্রশ্ন করে হার চুরির হদিশ বার করবেন। তারাচরণ সাধুর নাম তখন চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে। দেবু খুব ঘাবড়ে গেল। এবারই তো সব প্রকাশ হয়ে যাবে! আর ওদের পরিবারের কোন সাহায্য আমরা পাব না। মাস্টারদার কাছে গিয়ে সব কথা বলতে মাস্টারদা ওকে পরামর্শ দিলেন আগেই গিয়ে সাধুকে সব খুলে বলতে এবং তাঁকে অনুরোধ করতে যাতে আনন্দের নাম না বলেন। দেবু রওনা হ'ল সাধুর উদ্দেশ্যে।

ভাগ্যক্রমে পথের মধ্যে দেখা তারকেশ্বরের (শহীদ তারকেশ্বর দস্তিদার) সঙ্গে। সাধুর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে তারকেশ্বরের বিশ্বাস কোন কারণে ইতিমধ্যে ভেঙে গেছে। সে দেবুকে নিষেধ করল আগেভাগে গিয়ে সাধুকে বলতে। দুজনে ফিরে এল মাস্টারদার কাছে। আমি আবার ঠিক তখনি গেছি সেখানে। আমি আর তারকেশ্বর দুজনে মিলে বোঝালাম, সাধুকে কিছু বলবার দরকার নেই; আগে থেকে জানতে পারলে সাধুজী নিজের শক্তি জাহির করবার সুযোগ ছাড়বেন না—নাম বলে দেবেন। সাধুজীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা জানিয়ে দেবুকে নিরস্ত করলাম। বলা বাহুল্য, সে যাত্রা আমাদের বিপদে পড়তে হয় নি। সাধুজী আনন্দ ও দেবুর

বাবাকে হার সম্বন্ধে জটিল ও অবোধ্য ভাষায় যা বললেন তা সঠিক বোধগম্য হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। আনন্দের বাবার কাছেও তা অবোধ্যই রয়ে গেল।

আর একটা ঘটনা। শ্রীপতি চৌধুরী—প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও জমিদারের ছেলে। কক্সবাজার থেকে ওদের বৃদ্ধ গোমস্তা খাজনাপত্র নিয়ে শহরে এসে জমা দেন। মাঝে মাঝে আসেন তিনি। আগে থেকে জানাও থাকে কবে আসবেন। নমুনাবাজার স্টীমার স্টেশনে জাহাজ থেকে নেমে বৃদ্ধ পুঁটলি হাতে আসছেন। হঠাৎ যেন পথে শ্রীপতির সঙ্গে দেখা। শ্রীপতি গল্প করতে করতে আসছে। তারপর বৃদ্ধের প্রতি দয়া-পরবশ হয়ে ভারী পুঁটলিটা সাইকেলের পেছনে ক্যারিয়ারে বসাল। আগে থেকেই প্ল্যান করে ক্যারিয়ার লাগানো হয়েছে সাইকেলে। অনেকটা দূরে আমি আমার বেবী অস্টিন নিয়ে ওদের ওপর নজর রাখছি। শ্রীপতি খানিকটা পথ সাইকেলে চড়ে এগিয়ে যাচ্ছে, আবার থেমে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করছে। বৃদ্ধেরও মনে কোন সংশয় নেই, মালিকের ছেলের কাছেই তো টাকা রয়েছে। হঠাৎ একবার শ্রীপতি সেই যে এগিয়ে গেল আর তার দেখা পাওয়া গেল না। খানিকটা দূরে গিয়ে টাকার থলেটা ও জমিদারীর খাতাপত্র আমার গাড়িতে নিয়ে নিলাম। শ্রীপতি একটা গোপন আশ্রয়ে লুকিয়ে রইল।

এদিকে গোমস্তার কাছে সব শুনলেন শ্রীপতির বাবা। টাকাও গেল, ছেলেও গেল, কারও কোন পাত্তা নেই। ঐ কয়টা টাকার জন্য তাঁদের দুঃখ নেই, ছেলের জন্যই ভাবনা। শ্রীপতি সদরঘাট ক্লাবে নিয়মিত আসে। সুতরাং তার বাবা ছেলের খোঁজ না পেয়ে ক'জন বন্ধুর সঙ্গে এসে হাজির আমাদের ক্লাবে। আমার সঙ্গে দেখা করে তাঁরা শ্রীপতির এই ঘটনা সম্বন্ধে জানালেন। সব কথা শুনে আমি বললাম, "তাই নাকি? আচ্ছা, দেখি খোঁজ করে।" ভাণ করলাম সদরঘাট ক্লাবে তো কত ছেলেই আসে, সবাইকে তো আর চিনি না! তাই নরেশকে ডেকে বললাম—

"দেখ নরেশ, এই ভদ্রলোক ওঁর ছেলের খোঁজ করতে এসেছেন, শ্রীপতি নাম বলছেন, এই ক্লাবের সভ্য না কি! সে কোথায় আছে বলতে পার? আর কি রকম চেহারা তার?"

নরেশ তার চেহারার বর্ণনা দিল। বলল যে দিন পনের হ'ল সে আসছে না।

আমি তখন ভদ্রলোককে বললাম—"দেখুন, আমি একটা পরামর্শ দিচ্ছি আপনাকে। তারাচরণ সাধু এখন শহরে আছেন—কাছেই সদরঘাট এলাকার মধ্যে একটা বাড়ীতে আছেন। তাঁকে প্রশ্ন করলে আপনাদের ছেলের সন্ধান পাবেন।"

সাধুজীর অলৌকিক শক্তির জোর কতখানি তা তো আমার জানা আছে। তার ওপর যখন তিনি শুনবেন যে আমিই তাঁদের বলেছি সাধুজীর কাছে যেতে, তখন সাধুজী মনস্তাত্ত্বিক কারণের জন্য আরও নিশ্চিন্ত হবেন যে শ্রীপতি আর যেখানেই থাকুক না কেন, আমার গোপন আশ্রয়ে থাকতে পারে না। অবশ্য সাধুজী কি ভাববেন বা বলবেন তার তোয়াক্কা করি নি। আমি তারাচরণ সাধুজীর কাছে যেতে বলে তাঁদের মনে অন্তত সাময়িকভাবে বিশ্বাস জন্মাতে

পেরেছিলাম যে, আমার সঙ্গে শ্রীপতির কাজের কোন যোগাযোগ নেই। যাই হোক্ না কেন—জানি না সাধুজী আমার কতখানি উপকার করেছিলেন, তবে সময় সময় তাঁর প্রতি জনসাধারণের মোহ ও দুর্বলতার সুযোগ আমি নিয়েছি।

ভদ্রতা বজায় রাখবার জন্য গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম তাঁদের। বার বার আশ্বাস দিলাম যে. আমার যতদূর সাধ্য খোঁজ করব।

এবার মাখন ঘোষালের কথা। ব্যাঙ্কে তার বাবা, যশোদা ঘোষালের অনেক টাকা। বাবার নামের সই সে হুবহু নকল করতে পারে। তার বাবা ব্যস্ত থাকলে অনেক সময় তাকে ডেকে বলেন চেকটা লিখে দিতে, এমন কি 'যশোদা ঘোষাল' নাম সই পর্যন্ত করে দেয় বাবার সামনে। সেই সময়ে কোন সুযোগে চেক বই থেকে দু'টো পাতা ছিঁড়ে নিল সে। তারপর আমার সামনে বসে পাঁচ হাজার টাকার চেকে সই করল। একটি সই-এ গোলমাল মনে হ'ল, অন্যটি ঠিক আছে। উত্তেজনায় হাত কেঁপেছে হয়ত, একটু যেন অন্য রকম হয়েছে। তাই ঠিক হ'ল অন্যকে দিয়ে কাজ নেই—সন্দেহ করতে পারে. যে চেকটার সই অনেকটা ঠিক হয়েছে বলে মনে হচ্ছে সেটা সে নিজেই ভাঙ্গাতে যাবে।

ব্যাঙ্কের সকলে চেনে মাখনকে—যশোদা ঘোষালের ছেলে বলে। ঐরকম সই-এ তারা বহুবার টাকা দিয়েছে। এক শ' টাকার নোটে ষোল শ' টাকা নিল মাখন। এমন সময় 'পাসিং অফিসার' আপত্তি জানালেন। অনেক পরের নম্বরের একটা চেক্ এসেছে কেন? সন্দেহ হওয়ায় সই মেলানো হ'ল। সই মেলে নি। কাউন্টারের ভদ্রলোক মাখনকে জানালেন। মাখন ভাণ করে চটে উঠল, "বেশ তো, বিশ্বাস না হয় বাবাকে ফোন করুন।" মাখনের বাবাকে ফোন করতে গেলেন অফিসার। ইতিমধ্যে থুথু ফেলবার নাম করে বাইরে এসে সাইকেল নিয়ে মাখন হাওয়া।

গণেশের দোকানের বন্ধ দরজার সামনে দুপুরে পর্দা খাটানো থাকে। সেই পর্দার ভাঁজের মধ্যে নোটগুলি লুকিয়ে রেখে সোজা বাড়ী চলে গেল মাখন। ইতিমধ্যে ব্যাঙ্ক থেকে খবর পেয়ে যশোদা ঘোষাল রাগে আগুন হয়েছিলেন। মাখন বাড়ী ঢুকতেই তার ঘাড় ধরে গলা টিপে বললেন—"তোকে আজ আমি মেরেই ফেলব।" ষোল শ' টাকা তো বড় কথা নয়, ছেলের এই অধঃপতনের কথা শহরে রাষ্ট্র হয়ে যাবে—মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন না তিনি লোকের সামনে।

গলায় একটু চাপ লাগতেই অজ্ঞান হবার ভাণ করে শুয়ে পড়ল মাখন। মা ছুটে এসে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। মুখেচোখে জল দেওয়া হতে লাগল, আর বাবার রাগও জল হয়ে গেল মাখনের এক চালে। পরিস্থিতি বুঝে মাখন আবার 'জ্ঞান' ফিরে পেল।

মাখনের বাবা যশোদা ঘোষাল অভিজ্ঞ লোক। ব্যাপারটা বুঝতে তাঁর বাকি রইল না। গণেশকে ডেকে পাঠিয়ে ওঁরা অনুনয়বিনয় করে মাখনকে দল থেকে বাদ দিতে অনুরোধ করলেন। প্রায় মাসখানেক পরে মাসীমা মেসোমশায় (মাখনের মা-বাবা) আমাকে একদিন বললেন—

"দেখ অনন্ত, মাখনের যখন টাইফয়েড হয়েছিল তুমি মৃত্যুশয্যা থেকে

ওর প্রাণ বাঁচিয়েছ! এবারও ওকে বাঁচাও। এত অল্প বয়সে তোমাদের দলে ওকে নিও না......।" যা হোক্ করে মিথ্যা বুঝিয়ে ওঁদের আমি শান্ত করলাম।

নিজের পরিবার থেকে টাকা নেওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। মনে আছে আমি যখন বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে পালাই তার আগে কতবার ভাবতে হয়েছে, কত রকম করে মনকে তৈরি করতে হয়েছে। এই টাকা নেওয়ার ফলে পরিবারে আর্থিক ক্ষতি তো হয়েছেই, তার চেয়েও বেশি যেটা মনে লেগেছে তা' হচ্ছে মা-বাবার অপমানাহত ম্লান মুখ।

এমন অনেক কর্মীকে দেখেছি যারা পরের বাড়ী থেকে চুরি করতে রাজী আছে, কিন্তু নিজের বাড়ী থেকে নয়। আমাদের দলের একজন সদস্য—নাম বলব না তার, ১৯২৩ সালে একদিন তাকে বলা হ'ল বাড়ী থেকে কিছু টাকা বা গয়না আনতে। তারা রেলওয়ে কোয়ার্টারে থাকত। তার বাবা রেলের বড় চাকুরে, নিজে সে খুব উৎসাহী যুবক কর্মী। সেই রাত্রেই একটা নেক্‌লেস নিয়ে এল সে। আমি আর নির্মলদা প্রশ্ন করে জানলাম, সে ওটা কোন প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে চুরি করে এনেছে। আমরা তাকে বললাম তক্ষুণি ওটা ফিরিয়ে দিতে, আর এও জানালাম যে, নিজের বাড়ী থেকে টাকা না আনলে আমরা নেব না। আশ্চর্যের বিষয় সে নিজের বাড়ী থেকে একটি পয়সাও এনে দিতে পারল না। দল থেকে বাদ দেওয়া হ'ল তাকে।

রজত সেন উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। তাকে একদিন বললাম, "এক শ' টাকার কম নয় দু শ' টাকার বেশি নয়—নগদে বা জিনিসে এনে দাও বাড়ী থেকে। দু'দিন সময় দিলাম। কিন্তু হাতে-নাতে ধরা পড়লে চলবে না।"

রজত প্রথমে বলে, ওদের সিন্দুক থেকে টাকা বা গয়না সরানো সম্ভব নয়। আমি তাকে তখন আমার বাড়ী থেকে বার বার দরকার মত টাকা সরাবার কাহিনী বললাম। দাদা-দিদিকে বুঝিয়ে দলে আনা, তাদের সাহায্যে টাকা নেওয়া, একবার এগারোটা তালা খুলে গয়না বার করে কিভাবে সব ঠিকঠাক রেখে দিলাম আবার, কেউ টের পেল না—এই সব গল্প। তারপর তার বিপ্লবী অভিমানে আঘাত দেবার জন্য বললাম—

"এখন যদি তোমাকে আমি বলি 'চল রজত, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক আক্রমণ করি গিয়ে' তখন তো তুমি বেশ রাজী হবে! ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ডাকাতি করে যে টাকা ছিনিয়ে নিতে পারে সে নিজের বাড়ী থেকে গোপনে এই সামান্য টাকা আনবার জন্য কোন প্ল্যান করতে পারে না, এটা কি বিশ্বাস করা যায়? নেপোলিয়ান কি করে অত বাধা অতিক্রম করে উদ্দেশ্য সফল করেছিলেন? নেপোলিয়ানের বাণী মনে কর রজত—

'Necessity knows no law!'

'No risk no gain!'

'There shall be no Alps!'

'Impossible is the word found in the dictionary of the fools!'

'যদি তোমার উদ্দেশ্য স্থির থাকে তবে অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারবে।'

রজত মনকে তৈরি করে ফেলল, উৎসাহ পেয়ে কাজে নেমে গেল। এর পরে আর কোন বাধা রইল না। দু' দিন সময় দিয়েছিলাম রজতকে, ছয় ঘণ্টার

মধ্যে প্রথম কিস্তি এনে দিল রজত। তারপরে বারে বারে অনেক টাকা অনেক গয়না এনে দিয়েছে সে। মায়ের কাছ থেকে সমর্থন ও সাহায্য পেল রজত। তিনি ওর ঠাকুরমার গয়নাগুলি সব দিয়ে দিলেন খুশি মনে, দেশের কাজে লাগবে বলে। ওর বোনেরা তখন খুব ছোট ছিল, তারা নিজেদের গায়ের গয়না খুলে দাদার হাতে এনে দিল বিপ্লবকে সার্থক করতে।

রজতের পরিবারের প্রত্যেকে জানল রজতের শুভ সংকল্পের কথা। গোপনে আগ্নেয়াস্ত্র দেখল তারা, দেখল বিপ্লবী যুবকেরা তাদের বাড়ীর সংলগ্ন নদীর ধারে বাগানে অস্ত্র শিক্ষা করছে। ওদের বাড়ী হয়ে উঠল বিপ্লবীদের একটি প্রধান কেন্দ্র। মাসীমা আমাদের সব রকমে সাহায্য করলেন।

শেষ দিকে এমন হ'ল যে, যার যতটা সম্ভব সবই দেওয়া হয়ে গেছে, সবই খরচ হয়ে গেছে। এখন সামান্য কয়েকটা টাকাও আমাদের অনেক কাজে লাগবে। রজত তো বাড়ী থেকে সব এনে দিয়েছে। শুধু মায়ের গলায় রয়েছে একছড়া হার। বাড়ী গিয়ে মাকে বলল রজত—

"দেখ মা, আমরা কেউ বাঁচব না। দেশের জন্য লড়াই করে সবাই মরে যাব। তোমার এই ছেলের বৌকে কিছু দেবার সুযোগ আর তোমার হবে না। তাই বলছিলাম· মা, আমাদের বড় টাকার দরকার এখন......।"

পাগল ছেলের কথা শুনে হাসলেন মা, বুঝলেন ও কি বলতে চায়, নিজের গলা থেকে হারটি খুলে নিয়ে ছেলের হাতে দিলেন। রজত হারটি এনে আমাকে দিল। আমাদের তখন টাকার ভীষণ দরকার। কিন্তু সব শুনে আমি হারটি নিতে পারলাম না। ওর হাতে ফিরিয়ে দিলাম মাকে দিয়ে দিতে। ও হার নিয়ে মাকে দিয়ে দিল; কিন্তু বলল—

"এটা এখন আমাদের সম্পত্তি। তোমার কাছে গচ্ছিত রাখলাম।"

মা-ছেলে দুজনেই হেসে উঠলেন।

যেসব প্রথম শ্রেণীর কমরেড আক্রমণের দিন অংশ গ্রহণ করবে তাদের আমরা রিভলভার, পিস্তল, ব্রীচলোডার বন্দুক এবং নকল রাইফেল ছোঁড়ার জন্য বিশেষ শিক্ষা দিতাম। নির্জন সমুদ্রতীর, পাহাড় আর জঙ্গল—যেখানে শব্দ হলে কারো কানে যাবে না, সেই সব জায়গা বেছে নেওয়া হ'ত। শহরে আমরা মাত্র কয়েকটি বাড়ী এই কাজের জন্য ব্যবহার করতাম—রজত সেন, মিহির বোস আর আমার বাড়ী।

মতি, সুখেন্দু দত্ত, সহায়রাম দাস, আনন্দ—এদের বন্ধু ছিল মিহির। সুশ্রী সবল সপ্রতিভ চেহারা, ধীর শান্ত প্রকৃতির ছেলে ছিল সে। আমাদের তিনজনের বাড়ীতে licensed (লাইসেন্সওয়ালা) বন্দুক ছিল। তাই মাঝে মাঝে বন্দুক ও পিস্তল-রিভলভারের আওয়াজ করা চল্‌ত। যখন উচ্চস্তরের শিক্ষা ও টারগেট প্র্যাক্‌টিস করবার প্রয়োজন হ'ত তখন আমাদের শহরের বাইরে পাহাড়, জঙ্গল বা সমুদ্রতীরে যেতে হ'ত। তাছাড়া ফায়ারিং না করেও রিভলভার ও পিস্তলের বিভিন্ন ধরনের প্র্যাক্‌টিস চলত গণেশ, রজত, আনন্দ ও আমার বাড়ীতে।

পুলিশের গুপ্তচরদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা এক সময় স্থির করলাম যে নতুন কোন সদস্যকে গুপ্ত দলে নেওয়া হবে না। আমাদের এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর মিহির বোস দলে এসেছিল। সুতরাং আক্রমণের দিন

সে আমাদের সঙ্গে ছিল না। কিন্তু সাধারণভাবে সব সদস্যদেরই আমরা অস্ত্র-চালনা শিক্ষা দিতাম। যাদের আমরা assault (আক্রমণকারী) পার্টিতে অংশ গ্রহণ করবার জন্য তৈরি করেছিলাম তাদের বিশেষ ধরনের শিক্ষা দিয়েছি।

বর্ধমান জেলে থাকবার সময় বম্বে কর্পোরেশনের মেয়র, মিঃ বাওলাকে হত্যা করবার সংবাদ সারা ভারতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। মেয়র ও মমতাজ বেগম মালাবার হিল থেকে মোটরে নেমে আসছিলেন। ইন্দোরের মহারাজার ভাড়াটে গুন্ডারা আর একখানা মোটর গাড়ি নিয়ে মিঃ বাওলার গাড়ির গতি রোধ করে। সেই স্থানেই ছয়জন ভাড়াটে গুন্ডা রিভলভার নিয়ে মিঃ বাওলাকে আক্রমণ করে ও তাঁকে সেই স্থলেই নিহত করে। মমতাজ বেগমকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে ও তাঁকেও আহত করে। এই ঘটনা যখন ঘটছিল তখন লেফ্‌টেনাণ্ট সেগারট্‌ ও তাঁর আর একজন ইংরেজ বন্ধু হকি-স্টীক হাতে সেই পথে যাচ্ছিলেন। এইরূপ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আক্রমণের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেঃ সেগারট্‌ ও তাঁর বন্ধু ছয়জন গুন্ডার উদ্যত রিভলভারকে উপেক্ষা করে তাদের ওপর লাফিয়ে পড়ে। হকি-স্টীক দিয়ে পিটিয়ে ছত্রভঙ্গ করলেন গুন্ডাদের এবং সেখানেই আততায়ী দুজনকে রিভল-ভার সমেত ধরে ফেললেন। ভারতবর্ষের সব বড় বড় ব্যারিস্টারদের আততায়ী-দের পক্ষ সমর্থনের জন্য নিযুক্ত করা হ'ল। ইন্দোর মহারাজার ট্রেজারী গোপনে অর্থ সরবরাহ করল। মিঃ জিন্না, যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ ব্যারিস্টাররা চেষ্টা করেও আসামীদের বাঁচাতে পারলেন না। এই ঘটনার বিবরণ যখন আমি পড়ি তখন থেকেই লেঃ সেগারট্‌-এর প্রতি আমার মন সম্পূর্ণ আকৃষ্ট হয়। তার বীরত্ব ও পরার্থপরতাকে আমি অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছি। লেঃ সেগারটের নাম আমার মুখে মন্ত্রের মত সব সময় লেগে থাকত। তার সাহস, ক্ষিপ্রতা, ধীর মস্তিষ্ক, তীক্ষ্ম দৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাখ্যা করে আমরা বিশেষ ধরনের অস্ত্র চালনা শিক্ষা দিয়েছি আমাদের assault (আক্রমণকারী) পার্টির যুবকদের। তা'ছাড়া, যুবকদের বুঝিয়েছি ও বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়েছি কিভাবে আক্রমণের সময় discipline (শৃঙ্খলা) ও co-ordination (ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ) রাখতে হয়। ছয়জন আততায়ী ছয়টি রিভলভার নিয়েও দুজন সাহেবের কাছে পরাস্ত হ'ল। এই ঘটনার দৃষ্টান্ত এবং দৃষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ প্রণালীর অস্ত্রশিক্ষা আমাদের সংগঠনের বৈশিষ্ট্য ছিল। রিভলভার, পিস্তল ও ব্রীচলোডার বন্দুক প্রভৃতি খুব সামনাসামনি কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে যুযুৎসুর প্যাঁচের দ্বারা আত্মরক্ষার পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়, কিভাবে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন করে শত্রুকে বেচাল করা সম্ভব, সেই সব শিক্ষা আমরা দিতাম।

আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের সাহায্য করেছে একটি মূল বিষয় বুঝতে যে, স্নায়ুদৌর্বল্য যাদের আছে তাদের প্রথমেই বোমা ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া অনুচিত। তাদের প্রথমে কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন, যাতে তারা স্নায়বিক দুর্বলতা থেকে মুক্তি পায়। সেইজন্য খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে যে সব সদস্য বিপদে স্থির থাকতে পারে এবং উত্তেজনায় অধীর হয় না, তাদেরই শিক্ষা দেওয়া হ'ত কি করে বোমা ও বিস্ফোরক তৈরি করতে হবে, কি করে সেগুলি ব্যবহার করতে হবে। একমাত্র আনন্দদের বাড়ী

ছিল এগুলি পরীক্ষা করবার পক্ষে উপযুক্ত স্থান। কারণ, দূর থেকে এবং দেওয়াল বা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কাছের লক্ষ্যের প্রতি বোমা নিক্ষেপ করবার শিক্ষা দিতে অনেকটা জায়গা দরকার। আনন্দের বাড়ীর পিছনের দিকটা নির্জন, পাহাড়ে ঘেরা, তাই আমাদের কাজের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল।

বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরি করতে গিয়ে তিনজন কর্মী—রামকৃষ্ণ, তারক আর অর্ধেন্দু অসাবধানে আহত হ'ল। রামকৃষ্ণের কথা পুলিশ জানত, শহরের এখানে সেখানে তারা খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল। তা সত্ত্বেও আমাদের কাজ বন্ধ হয় নি। চার্লস টেগার্টকে মারবার জন্যে গোপীনাথের সঙ্গে আমি আর খোকা (দেবেন) গিয়েছিলাম –আকস্মিক দুর্ঘটনায় খোকা আহত হ'ল। তারপর জুলুদার কথামত আমরা চলে এলাম। সেই ব্যর্থতার শিক্ষা আমি ভুলি নি। কোন কারণেই কাজ বন্ধ করব না—এই ছিল আমাদের প্রতিজ্ঞা। তিন-জন আহত হবার পর আর অনভিজ্ঞ নতুন সদস্যদের এ কাজের ভার দিতে সাহস হ'ল না। আমি আর গণেশ, দুজনে মিলে কাজে হাত দিলাম। টিনের আবরণ দিয়ে মুখোস এবং শরীরের বর্ম বানালাম। হাতে পরলাম রবারের দস্তানা। বোমার খোলে দূর থেকে, আড়ালে দাঁড়িয়ে পিক্‌রিক পাউডার ভরবার জন্যও কয়েকটি যন্ত্রপাতি এমনভাবে ব্যবহার করলাম যাতে দূরে ও আড়ালে থেকে বোমার ছিপিগুলি আঁটতে পারি। বিদেশে তৈরি 'টাইম ফিউজ' দিয়ে বোমায় আগুন ধরাবার ব্যবস্থা করে নিলাম। আমি যখন এই ফিউজে আগুন লাগিয়ে খালি খোলগুলি ছুঁড়তাম, গণেশ স্টপ্‌ওয়াচ এ সময় দেখত। সতেরটা তাজা বোমা তৈরি করেছিলাম—কোনটা পাঁচ সেকেণ্ডে, কোনটা সাত সেকেণ্ডে ফাটবে। বোমা ছুঁড়তে ও সেই বোমাটি উড়ে গিয়ে লক্ষ্যস্থলে ফাটতে ক' সেকেন্ড লাগে তার সঠিক ধারণা না থাকলেই বিভ্রাট। বাংলার অনেক তথাকথিত বিপ্লবী সংগঠকেরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন বলে অনেক যুবক উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে প্রাণ হারিয়েছে। আগুন লাগিয়েই ঘাবড়ে গিয়ে তা ছুঁড়লে হয় না; নিশানা ঠিক করতে হয়, তারপর বিভিন্নভাবে তা' ছুঁড়তে হয়। তাতে করে বিভিন্ন সময়ও লাগে। তারপর বোমাটির উড়ে গিয়ে লক্ষ্যস্থলে পেঁৗছানো সময় সাপেক্ষ। এই সমস্ত তথ্য আমাদের অঙ্ক কষে দেখতে হয়েছে। ইংরেজ শত্রুর সঙ্গে লড়াই! কাজেই অস্ত্র ও বোমার সঠিক প্রয়োগ আমাদের শেখবার ও জানবার একান্ত প্রয়োজন ছিল। সেইজন্য কোন একটি ছোট জিনিসও আমরা chance-এর ওপর ফেলে রাখি নি। সবই আগে পরীক্ষা করে তবে কাজে লাগিয়েছি। ঐ রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যতটা করা সম্ভব সবই আমরা করেছি।

জেল থেকে ছাড়া পাবার পর আমাদের নিজস্ব একটা মোটর গাড়ির প্রয়োজন অনুভব করলাম। মোটর গাড়ির প্রয়োজন ছিল তা সত্যি, তা ছাড়া যত বেশি সংখ্যায় আমাদের দলে সাইকেল রাখা যায় তার চেষ্টা করেছি প্রথম থেকেই। তবু সাইকেলে সব সময় সব কাজের সুবিধে হয় না। আমাদের আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য এবং বিশেষ করে সেই দিনের জন্য যথা সম্ভব বেশি গাড়ির দরকার হবে তা' অনেক পূর্বে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ভেবেছি। আমার একখানা বেবী অস্টিন ছাড়া আরও ক' একখানা গাড়ি যেন সময়ে অসময়ে কাজে লাগাতে পারি তার জন্য প্ল্যান করে চেষ্টা করেছি। মাখনদের

দু'খানা, হেরম্ব বলের একখানা, ডাঃ জগদা বিশ্বাসের একখানা গাড়ি আমরা কাজের জন্য বহুবার ব্যবহার করেছি। অভ্যুত্থানের দিনে এই গাড়িগুলিও ব্যবহারের প্ল্যান করে রেখেছিলাম। সেইজন্য আমাদের প্রয়োজন ছিল যত বেশি সম্ভব যুবককে মোটর ড্রাইভিং শেখানো—যেন তারা এই গাড়িগুলি নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে অ্যাক্‌শানে যেতে পারে ও প্রয়োজন অনুযায়ী ট্যাক্সি দখল করে কাজে লাগাতে পারে।

তখন চট্টগ্রাম শহরে বোধ হয় দেড়শ'টি গাড়িও ছিল না। প্রস্তুতি পর্বে আমাদের কাজের জন্য আমরা চার-পাঁচটি গাড়িই ব্যবহার করতাম। বেবী অস্টিনটি চট্টগ্রামের পাহাড়ী পথে দ্রুত চলে সর্বদা কাজের সাহায্য করত। আর দরকার হলে আমরা পেতাম বড় দুটি গাড়ি—মাখন ঘোষালের বাড়ীর এসাস্ক আর হেরম্ব বলের ডজ্‌। এই গাড়িগুলির সাহায্যে কতবার যে আমরা পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পেরেছি তার ঠিক নেই। বেবী অস্টিনটি মাঝে মাঝে রং বদলেছে, চাকা বদল করেছে, হুড পরিবর্তন করেছে আর সময়ে ও প্রয়োজনে নম্বর বদল করেও পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছে। গাড়ির চালকও বিভিন্ন পোষাকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

দলের উৎসাহী কর্মীদেরই যে শুধু আমরা গাড়ি চালান শেখাতাম তা' নয়। আমাদের বেছে নিতে হয়েছে উপযুক্ত যুবকদের। যেমন ধরনের সাধারণ ড্রাইভিং শেখানো হয় মোটর ট্রেনিং স্কুলে, আমরা ঠিক সেই শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ করতাম না। কেবল চারটি চাকা ঘুরলে ও স্টিয়ারিং ঠিক রাখতে পারলেই আমরা তাদের উপযুক্ত চালক বলে মনে করি নি। বিপদে স্থির থাকা এবং ভালভাবে চালান—এই প্রাথমিক ও নিম্নতম গুণ দুটির উপর ভিত্তি করে দলের কর্মীদের মধ্য থেকে "মোটর চালকদের" বাছা হ'ত। পঁচিশজনকে বাছাই করে বারোজনকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হ'ল আক্রমণের কাজের জন্য; আর বাকিদের সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হ'ল। বিশেষ শিক্ষার জন্য আমরা নিজেদের তৈরি একটা "Tactical Motor Training Course" অনুসরণ করতাম। যথা—

(১) আক্রমণের জন্য যখন যাবে তখন কিভাবে চালাবে?

(২) কি করে সরকারী প্রহরীর সন্দেহ উদ্রেক না করে কাছে যাবে?

(৩) নিজে আহত হলে কি করবে?

(৪) পাশের সাথী আহত বা হত হলে কি করবে?

(৫) শত্রুর গাড়ি পিছনে তাড়া করবার সময় টায়ার ফেটে গেলে কি করবে?

(৬) ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেলে কি করবে?

(৭) অনুসরণকারী গাড়ির পথ বন্ধ করবে কি করে?

(৮) শত্রুর গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগাবে কি করে?

(৯) মোটরের আড়ালে থেকে কি করে লড়াই করবে?

(১০) বিভিন্ন অবস্থায় মোটরের আলো দিয়ে কি করে সংকেত জানাবে? ইত্যাদি...ইত্যাদি।

একশ'টি উপদেশ দিয়ে আমরা একটি শিক্ষা পদ্ধতি তৈরী করেছিলাম। বারোজনকে এই বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হ'ল।

এই প্রসঙ্গে একটি সামান্য ঘটনার উল্লেখ করছি। যদিও ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ ও সামান্য, তবু আমরা এ বিষয়ে অনেক গুরুত্ব দিয়েছিলাম। একজন গ্রুপ কমাণ্ডার মাস্টারদার কাছে প্রস্তাব দিলেন যে কোন একজন বিশেষ সভ্যকে এই মোটর বাহিনীতে নেওয়া হোক, কারণ, সে গাড়ি চালাতে জানে। সেই যুবকটি দীর্ঘ, বলিষ্ঠ এবং যথেষ্ট সপ্রতিভ; সবাইকে বলেছে যে সে গাড়ি চালাতে জানে। মাস্টারদা আমাদের বললেন একে গাড়ি চালকের দলে নিতে। আমরা বললাম, ঠিক আছে, পরীক্ষা নেওয়া হোক। পর পর তিন দিন সময় ঠিক করা হ'ল পরীক্ষার, কিন্তু এক-দিনও সে এল না সময়মত। শেষ পর্যন্ত জানা গেল, সে মোটর চালাতেই জানে না, মিথ্যে বড়াই করেছে। একে প্রথম সারি থেকেই বাদ দিয়ে দেওয়া হ'ল।

আমাদের দলে সময় মেনে চলার দিকে সব চেয়ে বেশি জোর দেওয়া হ'ত। কোন কাজে কখনো দেরি করা আমরা ক্ষমা করতাম না। প্রথম সারির জন্য যাদের নাম দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে সময়ানুবর্তিতার অভাব দেখলে প্রথম প্রথম 'শাস্তি' দেওয়া হ'ত। তার পরেও না শোধরালে একে-বারে বাদ দিয়ে দেওয়া হ'ত। একজন দায়িত্বশীল সভ্য—সব দিকেই সে তার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু সে রোজ দেরি করত আর বলত—"যেদিন কোন অ্যাকশানে যাব সেদিন আমি ঠিক সময়ে আসব দেখবেন।" কিন্তু ওকে তো আমরা আলাদা করে আর বলতে পারব না যে, "এই দিন কাজ হবে, সময়মত এসো"- সুতরাং কোন আপোষ নয়, বাদ দিতে হ'ল তাকে। সময়ানুবর্তিতা লক্ষ্য করবার জন্য কাজের গুরুত্ব বুঝতে না দিয়ে দিন এবং রাত্রির যে কোন সময়ে যে কোন নির্দিষ্ট জায়গায় সভ্যদের আসতে বলা হ'ত। দেখা হ'ত তারা ঠিক সময়ে আসে কি না।

যে সব সভ্যদের প্রথম সারিতে নেওয়া হয়েছিল তাদের স্নায়ু-শক্তির পরীক্ষা হ'ত বিভিন্ন প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে। গুণ্ডা এবং বদমাইশ প্রকৃতির লোকেরা কখনো কখনো আমাদের বিরক্ত করবার চেষ্টা করত। তা'ছাড়া তাদের দৌরাত্ম্য শহরের ভদ্রপল্লীতে প্রায় লেগেই ছিল। এদের দমন করা আমাদের কাজের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিল। এই কাজের মধ্য দিয়ে আমরা এক ঢিলে দুই পাখী মারা সম্ভব বলে মনে করলাম। এক দিকে আমাদের বিপ্লবী সাথীদের স্নায়ু পরীক্ষা করা হবে আর অন্য দিকে গুণ্ডা দমন করে চট্টগ্রামের জনসমাজের সমর্থন লাভ করা যাবে।

একদিন আমরা সবাই সদরঘাট ক্লাবে বসে আছি। চন্দনপুরা ক্লাব থেকে খবর এল কয়েকজন গুণ্ডা গোছের যুবক ওদের ক্লাব দখল করে বসে আছে, কিছুতেই নড়ছে না। লোকনাথ, নরেশ, বিধু এবং আমি খবর পেয়েই মোটরে করে দ্রুত গেলাম সেখানে। গাড়ি থেকে নেমেই ভারি গলায় বললাম—

"ক্যাপ্‌টেন কোথায়?"

ক্যাপ্‌টেন এল। বললাম—

"হুইসেল দাও। সকলে এসে সারি বেঁধে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াক।"

সবাই এসে লাইন করে দাঁড়াল। "অ্যাটেনশন" হয়ে দাঁড়াবার আদেশ দিয়ে বললাম—

"যে যেখানে আছ দাঁড়িয়ে থাক। আমার আদেশ ছাড়া কেউ জায়গা

ছেড়ে নড়বে না। তারপর ক্যাপ্টেনের দিকে এক পা এগিয়ে গিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম—"ক্যাপ্টেন কী হয়েছে?"

ক্যাপ্টেন বলল—

"ঐ লোকেরা এসে প্যারালাল বারগুলি অধিকার করে আছে, কিছুতেই যাচ্ছে না।"

"এস আমার সঙ্গে"—বলে গুণ্ডাদলের কাছে এগিয়ে গেলাম। এই পাঁচ মিনিট ধরে একেবারে বৃটিশ সার্জেন্টের মত চেঁচিয়ে আদেশ দিচ্ছিলাম, এতেই ওদের মনে ভয় ঢুকে গেছে। কাছে গিয়ে তীব্র ভ্রূকুটি করে বললাম—

"কে তোমরা? কি করছ এখানে? নেমে এস, জায়গা ছেড়ে দাও, নাহলে বিপদ হবে।"

ওদের মধ্যে একজন খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করে বলল—

"কেন, আপনার হুকুম নাকি?"

—"হ্যাঁ, আমার হুকুম। আর একটি কথাও শুনতে চাই না। একটি কথা বললে মাথা ভেঙে দেব। যাও, এক্ষুণি যাও।"

সুড় সুড় করে নিরীহ ভেড়ার মত সবাই নেমে গেল। আমি এবার ফিরে দাঁড়িয়ে ক্লাবের ছেলেদের ধমক দিলাম। গায়ের জোরের চেয়ে মনের জোর, স্নায়ুর জোর অনেক বেশি কাজ করে। সেই শক্তি অর্জন করতে না পারলে শুধু প্যারালাল বার করে কি হবে? আমাদের কমরেডরা নিজেরাই এরপর থেকে গুণ্ডাদের শাসন করত, মাঝে মাঝে আমরা পরামর্শ দিতাম। কখনও কখনও নিজ হাতেও গুণ্ডাদের শায়েস্তা করতে হয়েছে।

"চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" নামে যে মামলা চলে আমাদের বিরুদ্ধে, তার "জাজমেন্ট কপি"তে এ বিষয়ে লেখা আছে

"...এই ঘটনা এবং রাধিকা দত্তর ঘটনায় মনে হয় যে একটা হিংসাত্মক মনোভাব গড়ে উঠেছিল এবং এই সমস্ত ভূতপূর্ব রাজবন্দীরা তাদের চারিদিকে এমন সব শিষ্য যোগাড় করেছিল যারা তাদের কাজে একক বা সমবেতভাবে যে কেউ বাধা দিতে যেত তাকেই হিংসার আশ্রয় নিয়ে সমূলে দমন করত। ...প্রতিবাদীপক্ষের মতে এই সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনাগুলি গণেশ, অনন্ত, সূর্য, ইত্যাদিদের মনোভাব সম্বন্ধে আলোকপাত করে এবং জানা যায় যে, যে কোন প্রতিবন্ধককে ধ্বংস করবার জন্য এরা হিংসার পথ গ্রহণ করত এবং শহরে এদের শিষ্যের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল।"

সত্যি বলতে গেলে এই সব ছোটখাট জঙ্গী ঘটনার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলছিলাম, তাদের উপযুক্ত সাহস অর্জনের শিক্ষা দিয়ে স্নায়ু-শক্তি বাড়াতে সাহায্য করছিলাম।

এখন একটি খুব গুরুতর বিষয় অবতারণার প্রয়োজন মনে করছি। প্রথমেই আমার সরল ও বিনীত অনুরোধ, এই বিষয়ে কেউ যেন আমাকে ভুল না বোঝেন। প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্বাধীন মত ব্যক্ত করার অধিকার আছে। আমার নিজস্ব বিচার বুদ্ধি বিশ্লেষণ করে ও দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যা দেখেছি বা বুঝেছি তাই মাত্র ব্যক্ত করব। কাউকে আঘাত দেওয়া বা কারো ভগবদ্ ভক্তির প্রতি কটাক্ষ করা বা আধ্যাত্মিকতাকে ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্য আমার বিন্দু-মাত্র নেই। ধর্ম, ভগবদ্ বিশ্বাস, প্রতিমা পূজা বা নিরাকার ব্রহ্মে আস্থা,

প্রভৃতি একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার—এর ওপর না চলে কোন অনধিকার চর্চা, না থাকা উচিত বৃথা অভিযোগ। আমার এ বিষয়ে কারো প্রতি কোন অভি-যোগও নেই বা এই আধ্যাত্মিক বিচার আমার আলোচনার বস্তুও নয়।

আজ ইতিহাস লিখতে গিয়ে আমায় পরিবেশন করতে হচ্ছে বাংলার বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদ অধ্যায়ের আধ্যাত্মিকতার তথ্য, যা চট্টগ্রামের সশস্ত্র যুব-অভ্যুত্থানের সময়ে নতুন ধারায় পরিচালিত হয়েছিল। সাধারণভাবে দেখতে গেলে, শ্রীঅরবিন্দের সময় হতে আরম্ভ করে আমাদের যুগে, ১৯১৮ থেকে প্রায় ১৯২৭ বা ১৯২৮ পর্যন্ত, বিপ্লবী সভ্যদের মানসিক প্রস্তুতি ও চরিত্র গঠনের প্রধান শিক্ষার ধারা ছিল—জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা, গীতা পাঠ, ব্রহ্মচর্য পালন—কৌপীন বা লেংগুট পরিধান করা ইত্যাদি......ইত্যাদি। এ বিষয়ে আমি আগে উল্লেখ করেছি।

আধ্যাত্মিকতার এই বিশেষ রূপটিকে আমরা (শুধু আমরাই, সবার কথা জোর দিয়ে বলতে পারব না) ক্রমেই সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে দেখছিলাম। আমার আগেই এবং আমার চেয়েও তীব্রভাবে এই ব্যাপারটা উপলব্ধি করেছিল আমার বন্ধু গণেশ। বাংলার যে কয়টি বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে আমরা প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ছিলাম, তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রচার ও প্রয়োগের অন্তরালে কতখানি মিথ্যা ভাণ ও আত্মপ্রতারণা বাসা বেঁধেছিল তা' বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। আমরা নিজস্ব সংগঠনের যুব-কর্মীদের কাছে খোলাখুলি ও তীব্রভাবে সমালোচনা করেছি প্রাক্তন নেতা ও বিপ্লবী কর্মীদের, যাঁরা আত্মপ্রতারণার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতেন। যে নৈতিক শক্তির ওপর নির্ভর করে অন্যদের সমালোচনা করেছি, সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের নৈতিক বা যে কোন মানসিক দুর্বলতার কথা গোপন না করে প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করতাম না। বলতে পারি আমাদের বলিষ্ঠ চিন্তা ও কর্ম পদ্ধতি সাহায্য করেছে যুবক সভ্যদের আত্মপ্রত্যয় বাড়াতে ও আমাদের প্রতি তাদের অনেক বেশি আকৃষ্ট করতে।

ব্রহ্মচর্য পালন, কৌপীন পরা, চোখ কপালে তুলে মায়ের ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া, নাক টেপা, হরীতকী চিবান ও কাছা খুলে কাপড় পরে ব্রহ্মচারী সাজা—আমাদের কাছে যুব-অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির সময় থেকে অত্যন্ত হাস্যকর বলে মনে হ'ত। ব্রহ্মচর্যের বিচ্যুতি, দুর্বলতা, স্খলন, পতন, প্রভৃতির বিভীষিকা সৃষ্টি করে একজন বিপ্লবী যুবককে সবল সুস্থ না করে দুর্বল করে ফেলা হয়। বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে অবাস্তব কল্পনাবিলাস আমাদের মনে স্থান পায় নি। আমরা চেয়েছিলাম সবল সুস্থ একদল যুবক, যারা মিথ্যাচারী হবে না—যারা আত্মপ্রতারণার ঊর্ধ্বে থাকবে। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কোন নৈতিক বল অর্জন করা যায় না, বিবেকের কাছে কিছুই গোপন থাকে না, বরং সেই মিথ্যাচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় বলেই তথাকথিত নৈতিক চরিত্রের সমাধি রচনা হয় গোপন অন্তরে।

বিপ্লবী প্রেরণা, বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আপোষহীন সংগ্রামের জন্যে মানসিক প্রস্তুতি ও বৈপ্লবিক নৈতিক চরিত্র এক আলাদা জিনিস। নাক টিপে আরাধনায় বসে ও হরীতকী চিবিয়ে, কাছা খোলা বিশেষ পরিধানে ব্রহ্মচারী সাজলে বৈপ্লবিক নৈতিক চরিত্র গঠন করা যায় বলে আমরা

মনে করি নি; তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন ছিল, নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানু-বার্তিতা, শারীরিক ও মানসিক শক্তির।

আমরা মনে করেছি, বিপ্লবী সভ্যরা একাগ্রতার সংগে শরীরচর্চা করে অসীম শক্তির অধিকারী হবে; আমরা চেয়েছি—একদল যুবকের সুদৃঢ় মাংস-পেশী আর বলিষ্ঠ বাহু; আর চেয়েছি তারা মুষ্টিযুদ্ধ, যুযুৎসু প্রভৃতিতে দক্ষতা অর্জন করবে। গীতা পাঠ, ব্রহ্মচর্যের অবাস্তব মহড়া থেকে রক্তাক্ত ভয়াবহ বৈপ্লবিক বাস্তব চিত্রের পর্যালোচনা ও অনুধাবন অনেক বেশি শ্রেয় ও একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেছিলাম। বিশেষ করে আইরিশ বিপ্লবের রক্তাক্ত ঘটনাবলী, সশস্ত্র আক্রমণ, দারুণ উত্তেজনা ও বিভীষিকাপূর্ণ মরণজয়ী যুদ্ধের বিচিত্র বাস্তব চিত্র আমাদের সাহায্য করেছিল বৈপ্লবিক subjective preparation-এর জন্য। সিনেমাতে যুদ্ধের ছবি, পাঠা বলি, হসপিটালে বড় বড় অস্ত্রোপচার দেখবার সুযোগ নিতে আমরা সভ্যদের উৎসাহিত করেছি। গীতা পাঠ ও তথাকথিত ব্রহ্মচর্য পালন প্রভৃতি যে অনেক সভ্যকেই আসন্ন সশস্ত্র আক্রমণের সম্মুখীন হওয়ার শক্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে, সেইরূপ দৃষ্টান্ত অন্তত আমাদের কাছে বিরল নয়।

শক্তিশালী বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ প্রস্তুতি ও বাস্তবে আক্রমণ চালান তখনি সম্ভব হবে বলে মনে হয়েছিল, যখন তরুণ বিপ্লবীদের মনে বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিস্ট শত্রুর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ঘৃণার সঞ্চার করতে পারব। গীতা পাঠ ও মা কালীর চরণে মাথা খুঁড়ে কখনই প্রত্যক্ষভাবে এই ক্রোধ বা ঘৃণার সঞ্চার হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই ঐভাবে শক্তি সঞ্চয় করে অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হওয়া বিপ্লবীদের পক্ষে পরোক্ষ বা খুব ঘোরানো পথ বলে আমার মনে হয়েছিল। রক্তাক্ত বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করার অদম্য সাহস ও বিক্রম অনেক বেশি সঞ্চয় করা যায় যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে 'সোজা পথে' (directly) তাদের প্রতিভূদের প্রতি তীব্র ক্রোধ ও ঘৃণা অন্তরে প্রজ্বলিত করতে পারি।

সামান্য একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। খুব সম্ভব ১৯২৭ সালে, চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বোধ হয় তাঁর নাম মিঃ ডেভিস্, একজন সাধারণ "আধা-পাগল" মুসলমানের দ্বারা ছুরিকাঘাতে নিজ বাংলোতে নিহত হন। শোক-বিহ্বল চট্টগ্রাম শহর। জেলাশাসক কত ভাল ছিলেন—কত দরদী—কত ন্যায়বান। অনেকের দুর্ভাগ্য যে, সেইদিনই সন্ধ্যায় টাউন হলে আমাদের পূর্বপ্রচারিত সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা। অনুরূপদার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এই সভার আয়োজন। অনুশীলন দল, কংগ্রেস নেতা—ত্রিপুরা চৌধুরী, মহিম দাস, প্রমুখদের সংগে মিলিতভাবে আমরাও এই সভার ব্যবস্থা করেছি।

আমরা সভায় যোগ দিলাম সময়মত। 'হল' ভরে গেল তবু সভা আরম্ভ হয় না। ত্রিপুরাবাবু, মহিম দাস, প্রমুখ চট্টগ্রামের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতারা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের শবদেহের সঙ্গে গেছেন সমাধিক্ষেত্রে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য। কাজেই অনুরূপদার মৃত্যুবার্ষিকী সভার কাজে বিলম্ব ঘটবে তাতে আর দোষের কি?

আজও আমার মনে আছে, অনুশীলন দল, এমন কি আমাদের বন্ধুদের মধ্যেও অনেকে ঐ "মর্মান্তিক ঘটনার" পরিপ্রেক্ষিতে সভা বিলম্বে সুরু করা ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করেছিলেন। আমি একেবারে একা পড়ে গেলাম, কারণ, মাস্টারদা আর গণেশ তখন জেলে, আর অম্বিকাদা ও নির্মলদা হয়ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আমি একাই সেই সভাস্থলে ঘোর প্রতিবাদ জানালাম। তার পরের ব্যাপারটিতে আমি আরও বেশি উত্তেজিত হয়েছিলাম, কারণ, নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলেই, বিশেষ করে কংগ্রেস নেতারা, এই সভাতেই ম্যাজিস্ট্রেন সাহেবের তিরোধানের জন্য এক শোক প্রস্তাব আনা উচিত বলে মনে করছিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা বা সাহেবের অকাল মৃত্যু প্রভৃতি যাঁদের শোকবিহ্বল করবে তাঁরা আলাদা সভা ডেকে তাঁর মৃত আত্মার প্রতি যত খুশি সম্মান দেখাতে পারেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাতে চাইলেও কোন বাধা নেই; তবে, আমি একাই ঘোষণা করলাম যে, এই সভায় তা' চলবে না। আমার অনমনীয় ভাবকে প্রভাবান্বিত করবার জন্য চারুবাবু (অনুশীলনের চারু দত্ত) ও অন্যান্যরাও বোঝাতে চেষ্টা করলেন, "দেখ, এ তো আর রাজনৈতিক হত্যা নয়—এর পেছনে তো কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই; তবে কেন আমরা এই হত্যাকে অন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হত্যা বলে নিন্দা-সূচক প্রস্তাব নেব না......ইত্যাদি।"

আমি আরও উত্তেজিত হলাম—ক্ষিপ্ত হলাম—ঘৃণা ও ক্রোধের তপ্ত শিখা উদ্গীরণ করে বললাম,

আশ্চর্য! আপনারা বলছেন কি? শত সহস্র নারী ও নিরীহ শিশু-হত্যায় কলঙ্কিত বৃটিশ শাসনের ইতিহাস যে আমাদের উপহাস করবে! জালীয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যালীলার করুণ চিহ্ন যদি ভারতবাসীর হৃদয় থেকে এত শীঘ্র মুছে যায় তবে কি তা' বিপ্লবী মন ও নিষ্ঠাকে ধিক্কার দেবে না? সাহেবের বুটের লাথিতে চা-বাগানে যখন-তখন গর্ভবতী মা প্রাণ হারাচ্ছে, দুধের শিশুরা অহরহ বৃটিশের বুটের তলায় নিষ্পেষিত হচ্ছে, বর্বর অত্যাচার, নিষ্ঠুর অভিযান, চির উদ্ধত বৃটিশ সঙিগন্ ভারতবাসীর রক্তে বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। তবে কেন অযথা দরদে প্রাণ উথ্‌লে উঠছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হত্যা ব্যাপারে? হোক্ না অরাজনৈতিক কারণে হত্যা। যদিও এই হত্যার পেছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই, তবু এটাতো সত্যি যে একজন ভারতবাসী তার ব্যক্তিগত কারণে হলেও ফিরিঙ্গী জেলাশাসককে নিহত করেছে। এতে আমাদের মাথা ঘামাবার কি আছে? কারণে-অকারণে যে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী দু' শ' বছর ধরে নিরীহ ভারতবাসীকে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে নি, তাদের একজনকে যদি বিনা কারণেও একজন ভারতবাসী হত্যা করে থাকে তা'তে আমরা কেন বিচলিত হব—কেন আমরা ভাববো এই হত্যা নিন্দনীয়......... ?"

সভা আরম্ভ হবার পূর্বে এইরূপ একটা পরিস্থিতির জন্য আগে থেকে কেউ প্রস্তুত ছিল না। আমার আপোষহীন মতের বিরুদ্ধে কেউ এগোতে সাহস করল না। আমার নিজ দলের বন্ধুরাও তাদের সাময়িক ভুল

চিন্তাধারার জন্য অনুতপ্ত হ'ল। সতীদার সঙ্গে আমি যখন সভার শেষে বাড়ী ফিরছিলাম—তখন বুঝেছিলাম যে তিনি আমাকে ভুল বোঝেন নি।

আজও এই বৃত্তান্তটি পড়বার সময় কারো কারো মনে হতে পারে ঐ-রকম জেদ আমার পক্ষে শোভা পায় নি। তাঁরা ভাবতে পারেন জেলাশাসকের অরাজনৈতিক হত্যা ব্যাপারে সমবেদনা প্রকাশ করলে বিপ্লবী চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করা হয় না বরং মর্যাদা দেওয়াই হ'ত। সেই যুগের বাস্তব অবস্থা থেকে দূরে সরে গিয়ে ভাবলে তাই মনে হবে। কিন্তু সেই যুগে আমরাও ছিলাম ঘরের ভাল ছেলে—চুরি-ডাকাতি, মারম্যারি আমাদের পেশা ছিল না। ঘরের শান্তিপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন আবহাওয়া ছেড়ে "ক্ষেপার দলকে" অনেক অস্বাভাবিক পথ নিতে হয়েছে। তারপর সেই যুগে যখন রক্তের বদলে রক্ত, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, হত্যার বদলে হত্যাই একমাত্র পথ বলে মনে হয়েছে, তখন কি আমাদের পক্ষে শোভা পায় প্রতিশোধ স্পৃহার সঙ্গে আপোষ করা? আমাদের সংগঠনের কর্মীরাও আর দশজনের মতই ভাল ছেলে,—বিনয়ী, নম্র ও শান্ত স্বভাবের; তাই সে যুগে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সশস্ত্র সংগ্রাম বাস্তবে পরিণত করতে হলে প্রত্যেকটি বিপ্লবী যুবককে অন্তরে যে দারুণ ক্রোধ ও ঘৃণার সঞ্চার করতে হবে তাতে কোনই সন্দেহ ছিল না। চট্টগ্রামের যুব-অভ্যুত্থানের পেছনে এইরূপ মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল।

এই প্রসঙ্গে আমার নিজের কথা আরও একটু খুলে বলতে হবে। "মা কালীর" প্রতি আমার কী অগাধ বিশ্বাস ছিল, তা আমার প্রথম দিকের লেখায় সকলেই হয়ত লক্ষ্য করেছেন।

করুণাময়ী মায়ের খেলা দেখে কত যে মুগ্ধ হয়েছি—তিনবার সামনা-সামনি গুলী ছুটেছে, তবু লাগে নি; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাখাল বালক সেজে পুলিশ বেষ্টনী থেকে আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন: হরিণ পথ দেখাল, বিষাক্ত সাপ আমাদের ইঙ্গিত দিল শত্রুর কবল থেকে বাঁচতে; মায়ের প্রেরিত বৃদ্ধ আমাদের আশ্রয় দিল: মাস্টারদা, অম্বিকাদা ও রাজেন দাস বিষ খেয়েও বেঁচে রইলেন; আমাদের কারো মামলায় সাজা হ'ল না, ইত্যাদি......ইত্যাদি। এত সব ঘটনা জীবনে ঘটেছে—তখন তো তার অন্য উত্তর পাই নি। একমাত্র উত্তর পেয়েছিলাম ভগবানের খেলা, করুণাময়ী মায়ের আশীর্বাদ—আমাদের শক্তিতে কিছুই হয় নি—আমরা নিমিত্ত মাত্র; যা হয়েছে সব শ্রীঅরবিন্দ বা জ্যোতিষদার ইচ্ছায় ঘটেছে। আমার লেখায় দেখেছেন সব সময় আমি উল্লেখ করেছি "তখনকার যুগে" "তখনকার দৃষ্টিভঙ্গীতে" তখন আমার মনোভাব তাই ছিল—ভগবান, মা কালী, শ্রীঅরবিন্দ, তারাচরণ সাধুজীর কৃপা।

মনে হবে এত গাঢ় ভক্তি—যা তখন জীবনের মর্মে মর্মে জড়িয়ে ছিল তা কি একেবারে সব ধুয়ে মুছে চলে যেতে পারে? বুদ্ধি দিয়ে বিচার না করে সমস্ত ঘটনাগুলিকে যে ভক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতাম, সেই অতিবিশ্বাসী মন কি একেবারে নাস্তিক হয়ে যেতে পারে? সত্যিই চট্টগ্রামের যুব-অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির সময় থেকেই মা কালী, ভগবান, শ্রীঅরবিন্দ কিম্বা আর কোন সাধু মহাত্মার অলৌকিক বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রভৃতির ওপর কোন

আস্থা ও নির্ভরতা আমার ছিল না। আমি আমার কথাই বললাম, কারণ, মা কালীর প্রতি আমার অন্ধ বিশ্বাস ছিল। পাগলের মত, ক্ষেপার মত বিশ্বাস করেছি এবং সেই অন্ধ বিশ্বাসের আশ্চর্য ও অসাধারণ ফল পেয়েছি জীবনের বহু ক্ষেত্রে। তবু আমার মত গোঁড়া অন্ধ বিশ্বাসী একজন লোকের মন থেকে কি করে ভগবদ্‌বিশ্বাস একেবারে নির্মূল হয়ে গেল? হয়ত অবাক বিস্ময়ে অনেকের মনে এই প্রশ্ন উঠবে এবং কেউ কেউ হয়ত এই প্রশ্নের সহজ সমাধান খুঁজে পাবেন যদি একবার আমাকে কমিউনিস্ট আখ্যা দিতে পারেন। কিন্তু এই সমস্যার এত সহজ সমাধান একেবারেই সম্ভব নয়। কারণ, যখনকার কথা বলছি (১৯২৮-৩০ সাল) তখন আমাদের কমিউনিজম সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। সেই সময় বাংলার তরুণ বিপ্লবীদের সাম্যবাদের সমাজ-বিজ্ঞান স্পর্শ করে নি। কার্ল মার্ক্স বা এঙ্গেলসের নামও শুনিনি। লেনিন ও ট্রটস্কির জীবনী—বাংলাতে ছাপানো দু'টি ছোট বই আমি দেখেছিলাম —পড়ি নি। তার আরও দু-তিন বছর পরে, দ্বীপান্তরের সাজা হয়ে যাওয়ার পরে, যখন আন্দামান জেলে ১৯৩৩ সালে মলাটের ওপর সোনালী হরফে বড় বড় লেখায় STALIN নামের একটি বই দেখি তখন আমার মনে প্রশ্ন উঠেছিল— STALIN আবার কে? LENIN তো শুনেছি। হয়ত LENIN-ই হবেন—STALIN হয়ত LENIN-এর আর কোন নাম। এই ছিল আমার ১৯৩৩ সালে কমিউনিজম সম্বন্ধে জ্ঞান। কাজেই একথা বুঝতে কোন অসুবিধে নেই যে, ১৯২৮-৩০ সালে কমিউনিজমের প্রভাব আমার ওপর একেবারেই পড়ে নি। তবু কি করে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব থেকে মুক্ত হ'লাম?

যুক্তিপূর্ণ মন ছিল আমার, ফাঁকি কখনও সহ্য করতে পারতাম না, বুজরুকি অসহ্য মনে হ'ত, আত্মপ্রতারণাকে ঘৃণার চোখে দেখতাম। অলৌকিক, ভৌতিক, ঐশ্বরিক শক্তি, প্রভৃতির মরীচিকা আমার যুক্তিপূর্ণ অনুসন্ধিৎসু মন থেকে ক্রমেই বিলীন হয়ে গেল। পুরুষকারে বিশ্বাসী হতে লাগলাম। মা কালী বা পরম ব্রহ্মের আকার বা নিরাকারের সন্ধানে জীবন-পাত অযৌক্তিক ও নিরর্থক বলে মনে হতে লাগল। প্রথম প্রথম যখন গণেশ বলত, 'ভগবান মানি না, পুরুষকারে বিশ্বাস করি,' তখনও আমার মন থেকে সংস্কার যায় নি। আমি বলতাম, "মুখে তুমি যাই বল না কেন, নিশ্চয়ই তুমি গোপনে ভগবানকে ডাক।" ভগবানকে ডাকবে না, মা কালীর আশীর্বাদ চাইবে না—তাও কি কখনও হতে পারে? কাজেই বুঝে নিন্‌ সংস্কারপূর্ণ মন একটি ইলেক্‌ট্রিক বাতি নয় যে সুইচ্‌ টিপলেই জ্বলবে আর উল্টো টিপলেই তক্ষুণি নিভে যাবে।

আমারও মা কালীর প্রতি অগাধ ও অন্ধ বিশ্বাস সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে নির্মূল হয়ে যায় নি। ভগবান বা নিরাকার ব্রহ্মের অস্তিত্ব নেই বলে যুক্তি দিয়ে বুঝলেও তক্ষুণি তক্ষুণি তা' মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা যায় না। প্রথম প্রথম অভিমানভরে আমার মনের অভিযোগ জানাতাম মা কালীর কাছে। তার একটু নমুনা দিচ্ছি, "মা, তোকে তো তোর ভক্তবৃন্দরা জানে তুই সর্বশক্তিময়ী! তোরই ইচ্ছায় নাকি সব হয়! মানুষের ক্ষমতা কিছুই নেই। যতসব বৈজ্ঞানিক উন্নতি হয়েছে—রেল, স্টীমার, মোটরগাড়ি,

আকাশচারী বিমান, বৈদ্যুতিক শক্তির বিকাশ, বেতার-বিজ্ঞানের প্রয়োগ—সবই নাকি তোরই ইচ্ছায় সংঘটিত হয়েছে; এতেও নাকি মানুষের কোন হাত নেই। তাই যদি সত্যি হয় তবে তোকে প্রাণ দিয়ে ডাকার প্রয়োজন কি—তোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে কেন? তোর ইচ্ছায় যখন সব হচ্ছে তখন তাই হোক্—আমরা ছুটি নিলাম। যখন যাকে দরকার, প্রয়োজনমত তাকে দিয়ে তো তুই সব করিয়ে নিবি! তোর গরজেই যখন তুই তা' করবি তখন তোকে বোকার মত ডাকব কেন?"

মনে কঠিন প্রশ্ন জেগেছে। অন্ধ বিশ্বাসের স্তম্ভ নড়ে উঠেছে। প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া চাই। তবু উত্তর চাইব কার কাছে? তখনও যে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি—যদি মা আমার প্রশ্নের সমাধান করে দেন! প্রশ্নের সমাধান তো পেলাম না বরং জিজ্ঞাসু মন মায়ের কাছেই আরো অভিযোগ জানাল, "মাগো! তোর ভক্তবৃন্দরা আবার বলে থাকেন মানুষ তোরই সৃষ্ট জীব। তারা কর্ম করবে—তারা ইতিহাস সৃষ্টি করবে। তাই যদি হয় তবে তোর পূজার প্রয়োজন কি? তুই হয়ত বলবি—মানুষ কাজ করে যাবে। যে যেমনটি কাজ করবে সে তদনুরূপ ফল পাবে। আমি তবে তোকে প্রশ্ন করি, আমাকে বলে দে—যে যত বেশি ভক্তিভরে সাধনা করবে বা একাগ্রতার সঙ্গে কর্মযোগী হবে, সে যখন তদনুরূপ ফল পাবে তবে কি সাধনা বা একাগ্রতার ক্ষেত্রে মানুষ তোর তথাকথিত সর্বশক্তির আওতার বাইরে? মানুষ তাহলে নিজ শক্তির ওপর নির্ভর করে সফল কর্মী হতে পারে! আবার যদি বলিস—কে কিভাবে তোকে ডাকবে, কার কত সাধনার গভীরতা তাও তোর সর্বশক্তির কৃপাদান—মানুষের সাধনাও তোর নিয়ন্ত্রণাধীনে, তবে তোকে আর তোর ভক্তবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করি, কেন তবে তোর ইচ্ছায় কেউ বা বেশি কেউ বা কম ক্ষমতার অধিকারী সাধনার ক্ষেত্রে? কেন তোর এইরূপ এক চোখো পক্ষপাতিত্ব, তুইও তবে favouritism, nepotism, corruption (পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপোষা, দুর্নীতিগ্রস্ত) ব্যাধিমুক্ত হতে পারিস নি?"

আস্থা যেন আর থাকছে না। যুক্তির কাছে ভেজাল ও মেকী জিনিস ধরা পড়ে যাচ্ছে। অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি হল। ঝড় উঠল। অন্ধ বিশ্বাস তবু আস্থা রাখবার জন্য আশ্রয় খুঁজে বেড়াতে লাগল। উৎকণ্ঠিত পিপাসু মন আবার মায়ের কাছেই অভিযোগ জানাল—

"মা! তোকে পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপোষার দুর্নীতিগ্রস্তা বলে কত কটু কথা বলেছি! তুই হয়ত রাগ করেছিস্। আমি কি করব বল্? তুই তো জবাব দিতে পারছিস্ না; কিন্তু তোর ভক্তবৃন্দরা তোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তোর সাফাই গাইবেই। যখন তাদের আর কোন যুক্তি থাকে না তখন জটিল প্রশ্নের সহজ সমাধান হিসাবে প্রচার করে—সবই তোর লীলাখেলা; আমরা সব তোর ছোট ছোট পুতুল—তোর খেলার সামগ্রী! তাই যদি হয় তবে বলে দিচ্ছি, শুনে রাখ্, তোর খেলার সামগ্রী হতে আমি পারব না। যুক্তি দিয়ে আমাকে বোঝাতে হবে তোর—কেন তোকে ডাকার মত ডাকতে একজনে পারে আর আরেকজন পারে না। গভীর ভক্তিভরা মনে যখন একজন সার্থক সাধনায় সুফল পায় কেন তবে আর একজন তা' পায় না? যখন

সাধনার ক্ষেত্রে আর একজনের মত উন্নত হতে পারলাম না, তখন তুই ও তোর ভক্তবৃন্দ বুঝিয়ে দিলি—'ডাকার মত ডাকিস্ নি তাই তোর হয় নি।' তোরই তো নাকি আমরা সৃষ্ট জীব। তবে এই তারতম্য কেন মেনে নেব? কেন আমিও অন্যের মত তোকে 'ডাকার মত ডাকতে' পারলাম না? তোকে উত্তর দিতে হবে; পাশ কাটিয়ে গেলে চলবে না।"

ক্রমেই মন শক্ত হচ্ছে। তবু সংস্কার কাটে না। বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি। মনে হচ্ছে ভগবান নেই—ঈশ্বর নেই। দুর্বলের বেঁচে থাকার সম্বল একমাত্র যুক্তিহীন অর্থহীন ভগবানে অন্ধ বিশ্বাস। দুর্বলের ভগবানকে আমি চাই না—তাকে আমি পূজা করতে অস্বীকার করি। আমার অন্তরে সংস্কার ও বাস্তবতা, যুক্তি ও ভাবপ্রবণতা, জিজ্ঞাসু মন ও অন্ধ বিশ্বাস—এই পরস্পর বিরোধী দুই শত্রুর সংঘাত বাধল—নিরন্তর দ্বন্দ্ব চল্‌ল। তবু যুক্তি দিয়ে ভগবানের অস্তিত্ব নেই বলে বুঝলেও এতদিনের অন্ধ বিশ্বাস গিয়েও যায় না। ভগবান মিথ্যা—পরম ব্রহ্ম মিথ্যা—দুর্বল মনের বিকৃত প্রলাপই হ'ল ভগবানের অস্তিত্বের স্বীকৃতি। সবই বুঝলাম, তবুও নিজের অজান্তে মা'র ওপরই নির্ভরতা—যদি কোন আলোর সন্ধান পাই—যদি উত্তর পাই কেন এরূপ তারতম্য! জিজ্ঞাসু মনে উত্তর পেলাম, "গত জন্মের কর্মফল—তাই এই তারতম্য।"

—"এই কথাও তোর খাটে না মা। একেবারে আদিকালের আদি সৃষ্টি দু'টি মানুষ যদি তোরই সৃষ্ট হয়ে থাকে তবে তারা কেন প্রথম থেকে একেবারে ভিন্ন চরিত্রের? মানুষ ও শয়তানের সৃষ্টি যদি একই সংগে হয়ে থাকে তবে শয়তানকেও কি তুই সৃষ্টি করেছিস? তা যদি হয় তবে শয়তান যা করছে বা তার ক্রিয়াকলাপের জন্য যা ঘটছে সবই তোর দায়িত্ব। তোর ভক্তরা বলছে তুই নাকি দেখতে চাস্ শয়তান ভাল হয় কি না? তোর ইচ্ছা ব্যতিরেকে শয়তান কি নিজ শক্তির জোরে ভাল হতে পারে? তা যদি হয় তবে তোকে তার প্রয়োজন কি? না কি তোর ভক্তবৃন্দ বলবে—যেটুকু মা ইচ্ছে করে আশীর্বাদ করবেন তাই শয়তানের ভাগ্যেও ঘটবে। তাহলে আবার সেই কথাই আসে যে কিছুই যখন মানুষ বা শয়তান করতে পারে না—সবই তোর ইচ্ছেতে ঘটে এবং তুই সবই আগে থেকে ঠিক করে দিয়েছিস ও নিয়ন্ত্রণ করছিস, তবে আমাদের আর করার কি রইল—তোকে ডাকলেও যা হবে না ডাকলেও তাই হবে। কে কতটুকু তোকে ডাকবে তাও যখন তোরই নিয়ন্ত্রণাধীনে, তখন রইলি তুই পড়ে—তোকে আমার ডাকার প্রয়োজন নেই, তোর যুক্তিহীন খেলার সামগ্রী আমি হব না। তোর অর্থহীন যুক্তিহীন অলৌকিক শক্তির পূজারী আর যেই হোক্ না কেন, আমি নই। মানুষের শক্তি বুঝি—পুরুষকার বুঝি। তোকে ডেকে ডেকে পুরুষকারকে বিন্দুমাত্র খর্ব করতে চাই না। পরম ব্রহ্ম বুঝি না, আত্মা বুঝি না, পরজন্ম বুঝি না। যদি বর্তমান না বুঝি, পরাধীনতার বেদনা না বুঝি—মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তির ওপর আস্থা না রাখতে পারি—বিদেশী সরকারের জোয়াল মুক্ত হওয়ার জন্য কেবল ব্যক্তিগতভাবে নয়, সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা না করি—তবে 'তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে' এই বলে চোখ বন্ধ করে পরমার্থ লাভের আশায় বসে থেকে আত্মপ্রবঞ্চনা করতে রাজী নই। যদি তুই কোন দিন তোর **favouritism,**

nepotism ছাড়তে পারিস, যদি তোর লীলা খেলার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারিস, যদি ভক্তবৃন্দের দূর্বল মনকে 'সবই তোর পুতুল খেলা'—এই মিথ্যার শেষ আশ্রয় থেকে মুক্তি দিতে পারিস, যদি গতজন্ম বা পরজন্ম দিয়ে বর্তমানকে গোঁজামিল দিয়ে মিথ্যা বোঝাবার প্রয়াস ছাড়িস, তবে আমার কাছে আসিস—আবার আমি তোর সাধক হব—আবার আমি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক হব; নইলে আজ থেকে তোর সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক শেষ হ'ল।"

করুণাময়ী মায়ের প্রতি কি অভিমান—কত অন্তরের অভিযোগ! অনুসন্ধানী মন, যুক্তি দিয়ে মায়ের অস্তিত্ব বুঝতে চায়—নিরাকার সর্বশক্তিময় ব্রহ্মের আকারে বা সাকারে তাঁর শক্তির যুক্তিপূর্ণ বাস্তব চিত্র পেতে চায়। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল—"লীলা খেলা," "সর্বশক্তিময়ের ইচ্ছা", "পরজন্ম", "গতজন্ম", "আত্মা" প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক যুক্তি মা কালী আর আমাকে দিতে পারলেন না। কাজেই ধীরে ধীরে, যা আগে অভিমান ও অভিযোগ ছিল "মায়ের" প্রতি, তার রূপ বদলাল। যুক্তির কাছে অভিমান বা অভিযোগের স্থান থাকতে পারে না। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে আশ্রয় করে যুক্তিহীন ভাববিলাসের জগৎ থেকে মুক্তি নিলাম। মানুষের কর্মশক্তির ওপর অসাধারণ বিশ্বাস জন্মাল। মানুষ ইতিহাস গড়বে। মানুষকে—অন্তত আমাদের যুবক বিপ্লবী দলকে, অলৌকিক বা ঐশ্বরিক শক্তির উপাসক তৈরি করে তাদের পুরুষকারকে দূর্বল করে দেওয়া আমরা তখন বিবেকবিরুদ্ধ মনে করলাম।

আমাদের মধ্যে কে কি ভেবেছিলেন বা এই সম্বন্ধে কার কিরূপ অভিমত তা' বিশ্লেষণ করে বলতে পারব না। কারণ, যেভাবে আমার অন্তরে আধ্যাত্মিকতার ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন হয়েছিল, যার খানিকটা ধারণা দিতে এখানে চেষ্টা করেছি, সেইরূপ কোন আলোচনাই আর কারো সঙ্গে আমার তখন হয় নি। মাস্টারদা আমার এই আধ্যাত্মিকতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানতেন। কোনদিন কোন প্রতিবাদ করেন নি। তবে তিনি কতখানি ভগবানে বিশ্বাসী ছিলেন তার ঠিক হদিস তিনি আমাদের দেন নি; ভগবানে বিশ্বাস একেবারে একান্ত নিজের ব্যাপার। ১৯২৮-৩০ সালে আমাদের সংগঠনে সভ্যদের জন্য ১৯১৮-২৪ সালের মত কঠোর ব্যবস্থা রাখি নি। আমার ও গণেশের মত বোধহয় এ বিষয়ে অভিন্ন ছিল। "বোধহয়" বলার কারণ আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের মধ্যে এই বিষয়ে কখনও আলোচনা হয় নি; তবে একসঙ্গে কাজ করেছি, যুবক সভ্যদের কাছে প্রায় সময় একসঙ্গে কথা বলেছি; তা' থেকে গণেশের আধ্যাত্মিক মতামত সম্বন্ধে একটা ধারণা করা আমার পক্ষে খুব সহজ হয়েছিল। আমার অন্ধ বিশ্বাস থেকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীতে উত্তরণের ইতিহাস খুব সংক্ষেপে বিবৃত করলাম। সর্বশেষে আমার বিনীত নিবেদন, এ আমার একান্ত নিজস্ব ধারণা ও অনুভূতি, কারো ভক্তিভাব, ভগবানে বিশ্বাস, পরব্রহ্মে আস্থা, প্রভৃতির ওপর কটাক্ষ করবার ইচ্ছায় এই অধ্যায়টি লিখি নি। ইতিহাসের একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ মনে করেই এই প্রসঙ্গে আমার আসতে হয়েছে। আমার মত একজন অন্ধ গোঁড়া ভগবদ্‌বিশ্বাসীর আধ্যাত্মিক বিবর্তন কিভাবে পুরুষকারের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে এবং বিপ্লবী সৈনিক হিসাবে ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহে

কিভাবে প্রস্তুতি ও আরম্ভপর্বে আমি অংশ গ্রহণ করি, সেই তথ্য প্রকাশ করবার জন্য যে সত্যি ঘটনা বলার প্রয়োজন তাই মাত্র বললাম। এর মধ্যে কোন উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের চেষ্টা খুঁজে বেড়ালে ভুল হবে। আমার বাস্তব জ্ঞানে বেশ বুঝতে পারি যে মাত্র এইটুকু লিখে কোন ভগবান বিশ্বাসী মনকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে এমন ক্ষমতা কারো নেই। আমার ঈশ্বর বিশ্বাসের যুগে যদি আমাকে কেউ হাজারটা যুক্তি দিয়েও মা কালীর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বোঝাতে চাইত তবে কি আমি তা' মন থেকে মেনে নিতে পারতাম? যুক্তিতে ঠকে গেলেও মন থেকে অন্ধ বিশ্বাস মুছে ফেলা যায় না। যুক্তির কাছে অন্ধ ভগবদ্ বিশ্বাস পরাস্ত হবে কি না তা' কেবল সে নিজেই বলতে পারে। আধ্যাত্মিকতার বিরাট শাস্ত্র নিয়ে আমি কখনই মাথা ঘামাতে চাই না। আমি কারুকে আমার কথায় শিক্ষা দেওয়ারও প্রয়োজন মনে করি না। বর্তমান নিয়ে আমার কাজ—যা' স্পষ্ট বুঝি, দেখি, জানি, শুনি, তাই নিয়েই চলতে চাই। অলৌকিক বা ঐশ্বরিক শক্তির অস্তিত্ব কোন যুক্তিপূর্ণ ভিত্তি ছাড়া আমি মেনে নিই নি—এখনও নিই না। দুর্বল মনের ভক্তি আমার উপাসনার বস্তু নয়। কোনমতে বেঁচে থাকার যখন আর কোন উপায় থাকে না তখন নিঃস্ব দরিদ্র মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ভগবদ্ ভক্তি ছাড়া আর উপায় কি? এই বিষয়টি এত sensitive (অনুভূতিশীল) যে এই নিয়ে সর্বদাই বিতর্কের সৃষ্টি হয়। আমার সেই বিতর্কে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ, আমি কারুকে আমার মত গ্রহণ করতে অনুরোধও করছি না বা কারো কাছ থেকে ভগবদ্‌বিশ্বাসের মত গ্রহণের জন্য প্রস্তুতও নই।

মাস্টারদার নেতৃত্বে ১৯২৮-৩০ সালে যে বৈপ্লবিক সংগঠন চট্টগ্রামে গড়ে উঠেছিল, তার চিন্তাধারা, কর্ম-পদ্ধতি এবং সাংগঠনিক নীতি ও কৌশলের মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও তার বাস্তব প্রয়োগে বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই যে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করার বা গর্বিত হওয়ার কিছু আছে তা' আমি মনে করি না। প্রায় ত্রিশ বছর ধরে ভারতের বৈপ্লবিক কার্যকলাপের বহু তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে কর্মে সফলতার জন্য বৈপ্লবিক চিন্তাধারার মধ্যে আমূল পরিবর্তন আসা একটি অনিবার্য ঘটনা। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের বৈপ্লবিক রণ-নীতি ও রণ-কৌশলের সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যে স্তর ভেদ আছে তাহা তথাকথিত সেই যুগের বিপ্লবী নেতাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মাধ্যমে বিকাশ লাভ করেনি, করা সম্ভবও ছিল না। ১৯২৮-৩০ সালে বিদেশী শাসন মুক্ত হওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে সশস্ত্র আক্রমণ বা অভ্যুত্থানের প্রয়োজনে যেরূপ গতানুগতিক সাংগঠনিক নীতি ও কৌশল বিপ্লবীরা গ্রহণ করে আসছিলেন, মাস্টারদার নেতৃত্বে তারই পরিবর্তন ঘটেছে। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সংগঠন ও রণ-কৌশলের মধ্যে যে সামান্য উচ্চমানের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তাও ভারতের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সীমিত সন্ত্রাস সৃষ্টির পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ও বিশ্লেষণের বস্তু। এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চট্টগ্রামের বৈপ্লবিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে আরো একটি ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত গবেষণার বিষয়।

আমরা ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ সালে, সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ

গ্রহণ করবার জন্য মেয়েদের বৈপ্লবিক শিক্ষা দিয়ে সংগঠিত করিনি এবং একটি মেয়েকেও অভ্যুত্থানের প্রথম স্তরে নেওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করিনি। বাংলার বিপ্লবী তরুণীদের সম্বন্ধে এইরূপ কঠোর সিদ্ধান্ত আমাদের গ্রহণ করা উচিত হয়েছিল কি না, সে বিচার আজ আমি করব না। ইতিহাসবিদ্‌রা এই ঐতিহাসিক ঘটনার বিশ্লেষণ করে তাঁদের অভিমত প্রকাশ করবেন, সেই আশা নিয়েই আমি থাকব। আমরা মেয়েদের প্রথম স্তরে অংশ গ্রহণ করবার কোন সুযোগ দিইনি—এইটেই হচ্ছে বাস্তব সত্য। কেন মেয়েদের সম্বন্ধে সেইরূপ কঠোর নীতি গ্রহণ করেছিলাম, তারই একটি বাস্তব চিত্র দিতে চেষ্টা করব।

আমার দিদি ইন্দুমতী সিংহ আমাদের বৈপ্লবিক দলে ১৯২৩-২৪ সাল থেকেই সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৮-৩০ সালে তিনি মেয়েদের নিয়ে প্রকাশ্যে ও গোপনে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করেন। মেয়েদের এই সংগঠনের সঙ্গে আমরা কি ভাবে কতটুকু যোগাযোগ রেখেছি এবং দুটি বছরের জন্য মেয়েদের এই বৈপ্লবিক দলকে ছেলেদের বৈপ্লবিক সংগঠনের সংস্পর্শে আসতে দেওয়া কেন সমীচীন মনে করিনি ও এই নিয়ে দিদির দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আমার যে পার্থক্য ছিল তা' এই বিবরণে প্রকাশ পাবে।

দিদি একদিন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন আমারই কাছে —"তুই বড় স্বার্থপর। তোরা কেবল নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আমরা তোদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাই না কেন?"

১৯২৯ সালের শেষের দিকে কোন এক সময়ে আমাদের বিরুদ্ধে দিদির এই দারুণ ক্ষোভ। ১৯২৭-২৮ সালে আমরা জেল থেকে বেরিয়ে আসি। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহের স্মরণীয় দিন। এই সময়ের মাঝখানে প্রায় দু' বছর ধরে আমরা শরীরচর্চার বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন করি। সেই সব কেন্দ্রে রীতিমত ব্যায়ামচর্চা ও বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়া-কৌশল অভ্যাস করার ব্যবস্থা ছিল। দেখতে দেখতে শহরের চারিদিকে, পাড়ায়-পাড়ায় শরীর-চর্চার ক্লাব গড়ে উঠল। চট্টগ্রাম জেলার গ্রামে গ্রামেও শরীর-চর্চার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উৎসাহী যুবকদের নিয়ে গঠিত হ'ল। পূর্ব-বঙ্গের আশে-পাশে, কুমিল্লা, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলায়ও যুবকদের শরীর-চর্চার জোয়ার এল। শহরের বিভিন্ন স্থানে ব্যায়াম ও শরীর-চর্চার নানা প্রতিযোগিতা ও বিশেষ করে শারীরিক শক্তির প্রদর্শনীর আয়োজন চলল। মহাসমারোহে সেইসব শক্তি ও কৌশলের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হ'ত। সবল-সুস্থ, শক্তিমান যুবকদের দৃঢ় ও সুগঠিত মাংস পেশী; শত্রুকে পরাজিত করার অভিপ্রায়ে তাদের যুযুৎসু (জাপানী কুস্তি), মুষ্টিযুদ্ধ (বক্সিং) ও শাণিত ছোরার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ক্রিয়া-কৌশল, লোহপাত দোমড়ানো, বুকের উপর দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা সমান করার বড় রোলার চালিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং মোটর গাড়ির গতিরোধ করার অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শনী চট্টগ্রামের জন-সাধারণের মধ্যে নব জাগরণ আনল। পিতা, মাতা ও অভিভাবকেরা তাঁদের তরুণ সন্তানদের শারীরিক ক্ষমতার প্রদর্শনী দেখে একেবারে হতবাক হয়েছেন—তাদের আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছেন, আশীর্বাদ করেছেন। প্রাচীন ও প্রাচীনারা পনেরো-বিশ বছর আগে প্রফেসর রামমূর্তির শারীরিক ক্ষমতার

কিভাবে প্রস্তুতি ও আক্রমণপর্বে আমি অংশ গ্রহণ করি, সেই তথ্য প্রকাশ করবার জন্য যে সত্যি ঘটনা বলার প্রয়োজন তাই মাত্র বললাম। এর মধ্যে কোন [illegible] প্রচারের চেস্টা খুঁজে বেড়ালে ভুল হবে। আমার বাস্তব জ্ঞানে বেশ বুঝতে পারি যে মাত্র এইটুকু লিখে কোন ভগবান বিশ্বাসী মনকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে এমন ক্ষমতা কারো নেই। আমার ঈশ্বর বিশ্বাসের যুগে যদি আমাকে কেউ হাজারটা যুক্তি দিয়েও মা কালীর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বোঝাতে চাইত তবে কি আমি তা' মন থেকে মেনে নিতে পারতাম? যুক্তিতে ঠকে গেলেও মন থেকে অন্ধ বিশ্বাস মুছে ফেলা যায় না। যুক্তির কাছে অন্ধ ভগবদ্‌ বিশ্বাস পরাস্ত হবে কি না তা' কেবল সে নিজেই বলতে পারে। আধ্যাত্মিকতার বিরাট শাস্ত্র নিয়ে আমি কখনই মাথা ঘামাতে চাই না। আমি কারুকে আমার কথায় শিক্ষা দেওয়ারও প্রয়োজন মনে করি না। বর্তমান নিয়ে আমার কাজ—যা' স্পষ্ট বুঝি, দেখি, জানি, শুনি, তাই নিয়েই চলতে চাই। অলৌকিক বা ঐশ্বরিক শক্তির অস্তিত্ব কোন যুক্তিপূর্ণ ভিত্তি ছাড়া আমি মেনে নিই নি—এখনও নিই না। দুর্বল মনের ভক্তি আমার উপাসনার বস্তু নয়। কোনমতে বেঁচে থাকার যখন আর কোন উপায় থাকে না তখন নিঃস্ব দরিদ্র মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ভগবদ্‌ ভক্তি ছাড়া আর উপায় কি? এই বিষয়টি এত sensitive (অনুভূতিশীল) যে এই নিয়ে সর্বদাই বিতর্কের সৃষ্টি হয়। আমার সেই বিতর্কে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ, আমি কারুকে আমার মত গ্রহণ করতে অনুরোধও করছি না বা কারো কাছ থেকে ভগবদ্‌বিশ্বাসের মত গ্রহণের জন্য প্রস্তুতও নই।

মাস্টারদার নেতৃত্বে ১৯২৮-৩০ সালে যে বৈপ্লবিক সংগঠন চট্টগ্রামে গড়ে উঠেছিল, তার চিন্তাধারা, কর্ম-পদ্ধতি এবং সাংগঠনিক নীতি ও কৌশলের মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও তার বাস্তব প্রয়োগে বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই যে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করার বা গর্বিত হওয়ার কিছু আছে তা' আমি মনে করি না। প্রায় ত্রিশ বছর ধরে ভারতের বৈপ্লবিক কার্যকলাপের বহু তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে কর্মে সফলতার জন্য বৈপ্লবিক চিন্তাধারার মধ্যে আমূল পরিবর্তন আসা একটি অনিবার্য ঘটনা। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের বৈপ্লবিক রণ-নীতি ও রণ-কৌশলের সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যে স্তর ভেদ আছে তাহা তথাকথিত সেই যুগের বিপ্লবী নেতাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মাধ্যমে বিকাশ লাভ করেনি, করা সম্ভবও ছিল না। ১৯২৮-৩০ সালে বিদেশী শাসন মুক্ত হওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে সশস্ত্র আক্রমণ বা অভ্যুত্থানের প্রয়োজনে যেরূপ গতানুগতিক সাংগঠনিক নীতি ও কৌশল বিপ্লবীরা গ্রহণ করে আসছিলেন, মাস্টারদার নেতৃত্বে তারই পরিবর্তন ঘটেছে। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সংগঠন ও রণ-কৌশলের মধ্যে যে সামান্য উচ্চমানের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তাও ভারতের বৈপ্লবিক প্রচেস্টার সীমিত সন্ত্রাস সৃষ্টির পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ও বিশ্লেষণের বস্তু। এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চট্টগ্রামের বৈপ্লবিক সংগঠনের [illegible] মধ্যে আরো একটি ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত গবেষণার বিষয়।

আমরা ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ সালে, সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ

গ্রহণ করবার জন্য মেয়েদের বৈপ্লবিক শিক্ষা দিয়ে সংগঠিত করিনি এবং একটি মেয়েকেও অভ্যুত্থানের প্রথম স্তরে নেওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করিনি। বাংলার বিপ্লবী তরুণীদের সম্বন্ধে এইরূপ কঠোর সিদ্ধান্ত আমাদের গ্রহণ করা উচিত হয়েছিল কি না, সে বিচার আজ আমি করব না। ইতিহাসবিদ্‌রা এই ঐতিহাসিক ঘটনার বিশ্লেষণ করে তাঁদের অভিমত প্রকাশ করবেন, সেই আশা নিয়েই আমি থাকব। আমরা মেয়েদের প্রথম স্তরে অংশ গ্রহণ করবার কোন সুযোগ দিইনি—এইটেই হচ্ছে বাস্তব সত্য। কেন মেয়েদের সম্বন্ধে সেইরূপ কঠোর নীতি গ্রহণ করেছিলাম, তারই একটি বাস্তব চিত্র দিতে চেষ্টা করব।

আমার দিদি ইন্দুমতী সিংহ আমাদের বৈপ্লবিক দলে ১৯২৩-২৪ সাল থেকেই সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৮-৩০ সালে তিনি মেয়েদের নিয়ে প্রকাশ্যে ও গোপনে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করেন। মেয়েদের এই সংগঠনের সঙ্গে আমরা কি ভাবে কতটুকু যোগাযোগ রেখেছি এবং দুটি বছরের জন্য মেয়েদের এই বৈপ্লবিক দলকে ছেলেদের বৈপ্লবিক সংগঠনের সংস্পর্শে আসতে দেওয়া কেন সমীচীন মনে করিনি ও এই নিয়ে দিদির দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আমার যে পার্থক্য ছিল তা' এই বিবরণে প্রকাশ পাবে।

দিদি একদিন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন আমারই কাছে —"তুই বড় স্বার্থপর। তোরা কেবল নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আমরা তোদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাই না কেন?"

১৯২৯ সালের শেষের দিকে কোন এক সময়ে আমাদের বিরুদ্ধে দিদির এই দারুণ ক্ষোভ। ১৯২৭-২৮ সালে আমরা জেল থেকে বেরিয়ে আসি। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহের স্মরণীয় দিন। এই সময়ের মাঝখানে প্রায় দু' বছর ধরে আমরা শরীরচর্চার বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন করি। সেই সব কেন্দ্রে রীতিমত ব্যায়ামচর্চা ও বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়া-কৌশল অভ্যাস করার ব্যবস্থা ছিল। দেখতে দেখতে শহরের চারিদিকে, পাড়ায়-পাড়ায় শরীর-চর্চার ক্লাব গড়ে উঠল। চট্টগ্রাম জেলার গ্রামে গ্রামেও শরীর-চর্চার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উৎসাহী যুবকদের নিয়ে গঠিত হ'ল। পূর্ব-বঙ্গের আশে-পাশে, কুমিল্লা, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলায়ও যুবকদের শরীর-চর্চার জোয়ার এল। শহরের বিভিন্ন স্থানে ব্যায়াম ও শরীর-চর্চার নানা প্রতিযোগিতা ও বিশেষ করে শারীরিক শক্তির প্রদর্শনীর আয়োজন চলল। মহাসমারোহে সেইসব শক্তি ও কৌশলের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হ'ত। সবল-সুস্থ, শক্তিমান যুবকদের দৃঢ় ও সুগঠিত মাংস পেশী; শত্রুকে পরাজিত করার অভিপ্রায়ে তাদের যুযুৎসু (জাপানী কুস্তি), মুষ্টিযুদ্ধ (বক্সিং) ও শাণিত ছোরার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ক্রিয়া-কৌশল, লোহপাত দোমড়ানো, বুকের উপর দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা সমান করার বড় রোলার চালিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং মোটর গাড়ির গতিরোধ করার অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শনী চট্টগ্রামের জন-সাধারণের মধ্যে নব জাগরণ আনল। পিতা, মাতা ও অভিভাবকেরা তাঁদের তরুণ সন্তানদের শারীরিক ক্ষমতার প্রদর্শনী দেখে একেবারে হতবাক্ হয়েছেন—তাদের আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছেন, আশীর্বাদ করেছেন। প্রাচীন ও প্রাচীনারা পনেরো-বিশ বছর আগে প্রফেসর রামমূর্তির শারীরিক ক্ষমতার

বিস্ময়কর প্রদর্শনীর কথা জানতেন। রামমূর্তি বুকের উপর হাতী তুলে নিতেন, লোহার শেকল ভাঙতেন, চলন্ত মোটরের গতিরোধ করতেন। রামমূর্তির বিস্ময়কর ও অদ্ভুত শারীরিক শক্তির প্রদর্শনী কেবলমাত্র চট্টগ্রামের জনসাধারণকে মুগ্ধ করেছিল তা নয়—সারা ভারতে তাঁর প্রতিভা এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেদিন কি চট্টগ্রামবাসী জানতো তাদের জেলার পাড়ায়-পাড়ায়, ঘরে-ঘরে, শক্তিশালী যুবকের দল জন্ম নেবে! তখন কি তারা ভাবতে পেরেছিল ভারতবর্ষে কেবল একটিমাত্র রামমূর্তির অস্তিত্ব যথেষ্ট নয়। ১৯২৮ সালে শরীর-চর্চা ও শক্তি প্রতিযোগিতার যে বান এসেছিল তার প্রবাহে প্রত্যেক ক্লাবেই একটি দুটি করে রামমূর্তির আবির্ভাব হ'ল—কোন কোন বড় প্রতিষ্ঠানে আরও বেশি রামমূর্তির "প্রতিদ্বন্দ্বী" জন্ম নিল। শরীর-চর্চার কেন্দ্রস্থল সদরঘাট ক্লাব। এই শরীর-চর্চার প্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রামের ব্যায়াম-কেন্দ্রগুলিকে উৎসাহ দিয়েছে, শিক্ষা দিয়েছে ও অনুপ্রাণিত করেছে। এই একটিমাত্র সদরঘাট ক্লাবে বহু শরীরবিদের সৃষ্টি হয়েছে। তারা প্রায় সবাই বুকের উপর দিয়ে রোলার পার করবার ও চলন্ত মোটরের গতিরোধ করবার শক্তি রাখতেন।

প্রথম কয়েক মাস আমাদের নিজ সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে এইসব শক্তি-কেন্দ্রগুলিকে পরিচালিত করেছি। তার পর এক সময়ে শহরের শরীর-চর্চার প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও কেন্দ্রীভূত করবার জন্য একটা চেষ্টা চল্‌ল। আমাদের প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির সভ্যদের সভায় স্থির হ'ল মোটর গাড়ি ব্যবহারের জন্য আমাকে একটা ভাতা দেবে (মাসিক পঞ্চাশ টাকা) এবং আমার তত্ত্বাবধানে শহরের শরীর-চর্চা কেন্দ্রগুলির কাজ সাধারণভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে ও সেইসব ক্লাবের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য সৃষ্টি ও যোগা-যোগ আরও ঘনিষ্ঠ করার দিকে আমি লক্ষ্য রাখব। জিম্‌নাস্টিক ও ব্যায়াম করার নানা ধরনের যন্ত্রপাতি—মুগুর, ডাম্বেল, ডেভেলেপার, প্রভৃতি কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে মজুত করার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি আরও কিছু টাকা বরাদ্দ করল। বিভিন্ন ক্লাবে সেগুলি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন অনুপাতে সরবরাহ করবার ব্যবস্থা হ'ল।

শরীর-চর্চা ও চমকপ্রদ শারীরিক ক্রিয়া-কৌশলের প্রদর্শনী চট্টগ্রামে যে সাড়া জাগিয়েছিল তার প্রভাবে মেয়েরাও অনুপ্রাণিত হয়। মেয়েদের শরীর-চর্চার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে। আমার দিদি ইন্দুমতী সিংহ কালের এই আহ্বানধ্বনি শুনতে পেয়ে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন হয়ে থাকতে পারেন নি। অনেক আগে থেকেই দিদির শরীর-চর্চার ঝোঁক ছিল। আমার কাছ থেকে দিদি মুষ্টিযুদ্ধ ও যুযুৎসুর কায়দা-কানুন ও বিভিন্ন কৌশল শিখেছিলেন। দিদির প্রতিদিনের কাজের মধ্যে ছিল মা-কালীর পুজো, তারপর ব্যায়াম করা। দিদি এইসব কাজ ভোর পাঁচটার আগেই সারতেন। তারপর বাবার বন্দুকটি নিয়ে বাড়ির অন্দরের কম্পাউণ্ডে ঘুরে বেড়াতেন। বাবার বন্দুক নিয়ে বাড়ির ভিতরকার উঠোন ছেড়ে আমাদের কারো বাইরে যাওয়ার উপায় ছিল না। তাই বাড়ীর মধ্যে এই সঙ্কীর্ণ এলাকাতেই দিদি নিজ শিক্ষা অনুযায়ী বন্দুক ছোঁড়ার অভ্যাস করতেন। প্রায় দিনই দিদি দু'একটি পাখি শিকার না করে থাকতে পারতেন না। পাখি শিকার করার চেয়েও লক্ষ্যভেদ করার ইচ্ছাই

ছিল অনেক বেশি। কেবল বাবার লাইসেন্স করা বন্দুক দিয়ে দিদি লক্ষ্যভেদ করার অভ্যাস করতেন তা' নয়, ১৯২৭-২৮ সালে আমাদের জেলভোগ করে আসার বহুপূর্বে লাইসেন্সহীন রিভলবার, পিস্তল চালাতেও দিদি শিক্ষা লাভ করেন। ছোটবেলা থেকেই দিদির এই রকম একটা "যুদ্ধং দেহি" ভাব দেখা গিয়েছিল।

১৯২৭-২৮ সালে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আমরা তখনি অস্ত্র-শস্ত্র চালনা শিক্ষা দেওয়ার কথা ভাবি নি। জনসাধারণের সামনে খোলাখুলি-ভাবে গড়তে আরম্ভ করেছি যুব-সঙ্ঘ; আর সংগঠিত করেছি ভলাণ্টিয়ার বাহিনী। ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে শরীর-চর্চার ক্লাব ও বিভিন্ন ক্রিয়া-কৌশলের প্রতিষ্ঠান। এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যে দিদি উদ্যোক্তা হয়ে আমাদের বাড়িতে পাড়ার মেয়েদের নিয়ে একটি সুগঠিত ব্যায়াম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন। দেখতে-দেখতে দিদির তত্ত্বাবধানে মেয়েদের এই ক্লাবটি বেড়ে চলল। নানা বয়সের মেয়েরা রীতিমত ব্যায়ামচর্চা ও নানাবিধ ক্রিয়াকৌশল অভ্যাস করতেন। দিদি চাইছিলেন মেয়েদের সেই ক্লাবটিকে আরও ভালো-ভাবে পরিচালিত করতে আমরা যেন সক্রিয়ভাবে সাহায্য করি। বিশেষ করে দিদি জানতেন আমি চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির নিযুক্ত একজন Physical Instructor (ব্যায়াম শিক্ষক)—তা ছাড়া, ব্যায়াম শিক্ষা সম্বন্ধে আমার কিছু দক্ষতাও আছে। সেইজন্য দিদির অভিযোগ—আমরা যুবক ভাইদের নিয়ে মেতে আছি আর বোনেদের সম্পূর্ণ অবহেলা করছি। তাঁর জিজ্ঞাসা—কেন আমরা মেয়েদের ক্লাবের প্রতি উদাসীন—কেন আমরা বোনেদের ব্যায়াম শিক্ষা ও আত্মরক্ষার বিভিন্ন কৌশল অভ্যাস করার পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান দেব না?

দিদির এই অনুযোগের মর্ম আমি তখনি বুঝলাম যখন তিনি বললেন —"তোরা খুব স্বার্থপর। নিজেদের নিয়েই মেতে আছিস।......আমাদের ক্লাবে এসে তোর কিছুটা সময় দেওয়া উচিত। বোনেদেরও ব্যায়াম ও আত্ম-রক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া কি তোর উচিত নয়?"

দিদি তখনও জানতেন না যে আমাদের উদ্দেশ্য দেশের তরুণ-তরুণীদের কেবলমাত্র স্বাস্থ্যবান করে তোলা নয়। দেশের ছেলেমেয়ে সবল সুস্থ ও দৃঢ়চিত্ত হবে, ন্যায়বান ও নৈতিক চরিত্রে আদর্শ স্থান লাভ করবে—এও কি দেশের পক্ষে গৌরবের নয়! অন্তত এইটি কি আমাদের কাম্য নয়? সাধারণের পক্ষে এইটুকু উদ্দেশ্যই হয়তো যথেষ্ট বা তাদের পক্ষে এই হয়ত কম কাম্য নয়, কিন্তু আমাদের পক্ষে তো তা নয়। জেল থেকে বেরিয়ে এসে যে সব সংগঠন—ব্যায়ামশিক্ষা, কুচকাওয়াজ শিক্ষা ও শরীর-চর্চা শিক্ষার কেন্দ্র-গুলি গঠন করি—তা' করেছি একটি মাত্র লক্ষ্যে পৌঁছবার উদ্দেশ্যে। এইসব সংগঠনের মাধ্যমে আমরা গড়তে চেয়েছিলাম সবল-সুস্থ-নির্ভীক বিপ্লবী যুবকের দল যারা Death Programme (মরণপণ কার্যক্রম) নিয়ে দু'-বছরের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রাণ দেবে। সবল-সুস্থ মাংসপেশী ও চমকপ্রদ শারীরিক শক্তির প্রদর্শনী দেখিয়ে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের কাছ থেকে অজস্র করতালি পাওয়ার মধ্যেই আমাদের উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ ছিল না। একটি পরাধীন দেশে শরীরের শক্তি, মানসিক বল, নৈতিক চরিত্র, ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতির মূল্য কতখানি—যদি সেইসব

গুণে সমৃদ্ধ হয়ে বিপ্লবী যুব-বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত হতে না পারে। দিদির সঙ্গে তখনও আমার এই বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলাপ হয় নি। তাই তাঁর তখনও সঠিক ধারণা ছিল না শরীর-চর্চা এবং শক্তি ও ক্রীড়াসঙ্ঘগুলির মাধ্যমে আমরা কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এগিয়ে চলেছি।

এইরূপ গুরুতর উদ্দেশ্য ছিল বলে আমরা আমাদের সংগঠনে মেয়েদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নেবার জন্য তৈরি করার কোন চেষ্টা করি নি। কাজেই তাদের ব্যায়াম বা ক্রীড়া-কৌশল শেখানোর দিকে আমরা বিশেষ মন দিই নি। এই কথাটা একটু ভেঙে বলি তবে বুঝতে সহজ হবে। আমাদের সম্বন্ধে—বিশেষ করে আমার ও গণেশের সম্বন্ধে বাংলার বিভিন্ন গুপ্ত বিপ্লবী পার্টিতে একটা অভিযোগ ছিল যে আমরা মেয়েদের বিপ্লবী সংগঠনে নিতে চাই নি। পৃথিবীর সব সভ্যদেশে মেয়েদের স্থান পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়—তারাও বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেছে, তারাও মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। তবে কোন্ অধিকারে আমি বা গণেশ বা আমাদের আর কেউ মেয়েদের বিপ্লবে অংশ নিতে বাধা দেব বা তাদের বিপ্লবী সংগঠনের সভ্যপদে নেব না? সত্যি যদি আমাদের সেইরূপ মনোভাব থাকত তবে কি করে আমার দিদি, আমার পিস-তুতো বোনেরা আর আমার মা আমাদের বিপ্লবী সংগঠনে স্থান পেয়েছিলেন ও নানাভাবে তাঁরা বিপ্লবী কাজে অংশ গ্রহণ করেছেন? কি করেই বা আমাদের অন্যান্য বিপ্লবী ভাইদের মা বোনেরা ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের ষড়যন্ত্রমূলক কাজের সাথী হয়েছিলেন? প্রকৃত কথা এই—আমরা স্থির করেছিলাম চট্টগ্রামে দু'বছরের মধ্যে Death Programme নিয়ে প্রস্তুতি কাজ চালিয়ে যাব। বাস্তবতার দৃষ্টি নিয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করেছি দু'বছরের মধ্যে Death Programme কার্যে পরিণত করার অর্থ কি! এইরূপ মরণপণ করা বিপ্লবী সংগঠন গড়ার পথে কত কঠিন, কত দৃঢ়, কতখানি আপোষহীন হওয়া উচিত! তাই আমাদের কথা ছিল মায়েদের বোনেদের নিশ্চয়ই আমরা দলে নেব; তবে এ বিষয়ে আমরা নিজেরা নিজেদের মা-বোনকে রিক্রুট করব তাহলেই কাজ সহজ হবে। আমাদের মনে আশঙ্কা ছিল যে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার পথে নানা ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। দু'টি বছরের Death Programme কার্যে পরিণত করতে হলে সমস্যা ও সম্ভাব্য সমস্ত প্রকার আশঙ্কা এড়িয়ে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে শরীর-চর্চা, মেলামেশা এবং সংগঠন, ক্লাব প্রভৃতিতে একসঙ্গে অংশ গ্রহণ করার সুযোগে তাদের মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই পরস্পরের প্রতি আসক্তি জন্মাবে না সেইরূপ অবাস্তব ধারণা আমাদের ছিল না। দু'টি বছরে Death Programme কার্যে পরিণত করতে চেয়েছিলাম বলে খুব কঠিনতার সঙ্গে মাত্র দু'টি বছরের জন্য মেয়েদের সংগঠনের সঙ্গে, যা সাধারণভাবে নিজের মা-বোন ছাড়া অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে সংযোগ না রাখাই শ্রেয় বলে মনে করে-ছিলাম।

আমাদের বিপ্লবীদলে কল্পনা, প্রীতিলতা ও অন্যান্য মেয়েরা ছিল। আমরা এঁদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তখন জানতামও না। যখন ১৯৩০ সালে

আমাদের বিরুদ্ধে "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" নাম দিয়ে সরকার মামলা চালাচ্ছিল তখন আমি প্রথম কল্পনা ও প্রীতিলতা সম্বন্ধে শুনতে পাই। কল্পনা, মাস্টারদা ও তারকেশ্বরের সঙ্গে অভিযুক্ত হয়। মাস্টারদা ও তারকেশ্বরের ফাঁসি হয়—কল্পনার হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

১৯৪৬ সালে মুক্তি পেয়ে আসার পর আমার সঙ্গে কল্পনার প্রথম সাক্ষাৎ। তখন কল্পনা দত্ত নয়—কল্পনা যোশী। আমার সম্বন্ধে কল্পনা কত কথাই না শুনেছে। আমিও তার সম্বন্ধে জানি, সে দেখতে কেমন তারও আন্দাজ করে নিয়েছিলাম। আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য কেউ উপস্থিত ছিল না। আমি সংবাদ পেয়েছিলাম কুইনস্ পার্কে কল্পনার সঙ্গে যেন আমি দেখা করি। তাই একদিন সকালবেলা আমি সেই বাড়িতে যাই। বেল বাজালাম। ঘরের দরজা খুলল। ভিতরে বসার ঘরে গেলাম। একটু পরেই একজন ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। বাংলা দেশের সাধারণ ঘরের মেয়েদের মত নয়। দেখেই মনে হয় বৈশিষ্ট্য আছে। একটু পরেই আমার মনে হ'ল এইই হবে কল্পনা। আমি জিজ্ঞাসা করতে যাবার আগেই দেখি ভদ্রমহিলার চোখে-মুখে আমার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জেগেছে। আমি প্রশ্ন করার আগেই ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করলেন—"অনন্তদা না?" চট্টগ্রামের intonation-এ (স্বরভঙ্গীতে) প্রশ্নটি শুনে আমার জানতে বাকী রইল না যে সেই কল্পনা।

প্রীতিলতার নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র যুবক চট্টগ্রামের উত্তর অঞ্চলে পাহাড়তলীর ক্লাবে সাহেবদের আক্রমণ করে। প্রীতিলতা সেই আক্রমণ পরিচালিত করে এবং তার সফল সমাপ্তির পর সেখানেই শহীদের মহান মৃত্যুবরণ করে। কল্পনার সঙ্গে আমার পরে সাক্ষাৎ হয় কিন্তু আমাদের সংগঠনের নেতৃস্থানীয়া, দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গিত-প্রাণ এই বিপ্লবী বোনটিকে আগে দেখার অথবা তার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হল না। আমরা জেলে চলে যাবার পর এই দুজন বিপ্লবী কর্মী আমাদের সংগঠনের অনেক গুরুদায়িত্ব বহন করেছে অথচ তার পূর্বে এদের কাউকেই আমি চিনতাম না—তাদের নাম পর্যন্ত আগে শুনি নি। কারণ, মেয়েদের সংগঠনের সঙ্গে ইচ্ছে করেই আমরা কোন যোগ রাখতাম না। আমার এই কথায় কেউ কেউ মনে করতে পারেন হয়ত মেয়েদের সম্বন্ধে আমার মনে কোন অবহেলা বা অশ্রদ্ধার ভাব ছিল। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ভুল। বাংলা দেশের মেয়েদের বিপ্লবী ঐতিহ্যের প্রতি আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান, তবু ঐ দুটি বছরে Death Programme কার্যে পরিণত করার জন্য তরুণ-তরুণীদের সংগঠন পৃথক থাকুক এবং তারা পরস্পরের প্রতি আসক্তি ও প্রেম-ভালবাসার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকুক—এই আমাদের কাম্য ছিল। এইরূপ নীতি অনুসরণের মধ্যে কোন পুরুষ ও মেয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল না, বিপ্লবী তরুণ-তরুণীদের প্রতি সমান আচরণ করেছি।

দিদি যখন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন যে আমরা বোনেদের সংগঠনকে অবহেলা করছি এবং তা আমাদের অনুচিত, তখন তাঁকে দোষ দিই নি। আমাদের আসল উদ্দেশ্য যদি দিদির জানা থাকতো তবে নিশ্চয়ই দিদি সেইরূপ অনুযোগ বা ক্ষোভ প্রকাশ করত বলে মনে হয় না। দিদিকে

সব বুঝিয়ে বলার সময় ছিল না এবং অনুকূল পরিবেশের অভাব ছিল বলেই দিদির সংগে এই নিয়ে আলোচনা করা তখনও সমীচীন মনে করি নি। তা ছাড়া আমাদের মূল উদ্দেশ্যের বিষয় যুব-বিদ্রোহের শেষ কয়টি দিন আগে পর্যন্ত মাত্র তিনজনের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল।

দিদির প্রশ্ন শুনে আমি পরিবেশটিকে খুব সহজ করে নিয়ে একটু ভেবে বললাম—"সত্যি বলছি দিদি, আমার একটুও সময় নাই। তা'ছাড়া তুমি তো আছ। তুমিই তো তাদের সব কিছু শেখাতে পার। তবে আর আমার প্রয়োজন কি?"

দিদি মোটেই খুশি হলেন না। দিদি চাইছিলেন মেয়েদের খুব ভালো-ভাবে শিক্ষা দিতে। কিছুদিনের মধ্যে চট্টগ্রামে মেয়েদের ব্যায়াম প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার জন্য দিদি চাইছিলেন তাঁর সংগঠনের মেয়েরা প্রতিযোগিতায় যেন সার্থকতার সংগে অংশ গ্রহণ করতে পারে। তাই দিদি একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন—"বেশ তো, তুই না হয় ব্যস্ত আছিস্। তবে অন্য কাউকে পাঠিয়ে দে, যে আমাদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারে। আমরা এখানে একজনকে এক্ষুণি চাই যে আমাদের ছোরার আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ ও প্রতিরোধ প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেবে। এটুকু ব্যবস্থাও কি তুই আমাদের জন্য করতে পারিস না?"

আমার এই লেখাটি পড়ে—আমাদের সংগঠনে মেয়েদের অংশটির কি ভূমিকা তা' জানবার জন্য হয়ত অনেকের মনে কৌতূহল হবে। যথাসময়ে বিশদভাবে এই বিষয় আলোচনা করব। বর্তমানে এইটুকু বললেই বোঝার পক্ষে যথেষ্ট হবে যে, আমাদের ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার অন্তর্ভুক্ত যুবক ছাত্র সংগঠকদের মধ্যে একটি উৎসাহী গ্রুপ ছিল যারা তাদের মা-বোনেদের দলভুক্ত করা ছাড়াও অন্যান্য তরুণী ও ছাত্রীদের সংগে আলাপ-আলোচনা করে তাদের গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করবার চেষ্টা করতেন। তাদের এই প্রচেষ্টার কথা আমরা জানতাম, কিন্তু আমাদের দু' বছরের Death Programme-এর অন্তর্ভুক্ত কোন কর্মীকে মেয়েদের সংগঠনের কোন কাজে কখনও নিযুক্ত করা হ'ত না, আমাদের মধ্যে একমাত্র মাস্টারদার সংগে এই সংগঠনের যোগাযোগ ছিল। সাংগঠনিক শৃঙ্খলার জন্য মাস্টারদা এই যুবক দলটির সংগে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং মেয়েদের সাংগঠনিক অংশটি সম্বন্ধে তিনি রিপোর্ট নিতেন। মাস্টারদার এই দলের নেতৃস্থানীয়া বিপ্লবী মেয়েদের সংগে সাক্ষাৎভাবে পরিচয় ছিল। গণেশ ও আমি মাস্টারদার সংগে মেয়েদের বিপ্লবী অংশ সম্বন্ধে কখনও আলোচনা করতাম না। কাজেই এই সব বিপ্লবী বোনেদের সংগে আমাদের পরিচয়ের সুযোগ হয় নি। আমাদের তিন জনের মধ্যে স্থির সিদ্ধান্ত ছিল যে আমরা যুব-বিদ্রোহের প্রথম আক্রমণ পর্যায়ে মেয়েদের অংশকে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত করব না। দু' বছরের সংক্ষিপ্ত সময় ও আমাদের সীমিত energy (কর্মশক্তি), বাস্তবতার দিক থেকে বিচার করে বুঝেছিলাম যে সফলতার লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে মেয়েদের বিপ্লবী অংশকে বা তাদের কাউকেই প্রথম সারিতে নেওয়ার কর্মসূচী বর্তমানে আমাদের পরিহার করাই যুক্তিসঙ্গত। মেয়েদের প্রতি অবহেলা নয়, আমাদের সীমিত সময় ও কর্মশক্তির জন্যই দু' বছরের

Death Programme-এ মেয়েদের অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত করে নেওয়া সম্ভব ছিল না বলেই আমরা এই কর্মসূচী পরিত্যাগ করি।

আমি একটুখানি চিন্তা করে নিয়ে দিদিকে বললাম—"আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি একজন খুব দক্ষ ছেলেকে পাঠাব। সে কিন্তু কেবল তোমাকে শেখাবে। তুমি শিখে নিয়ে অন্য মেয়েদের শেখাবে। এই কথা রইল।"

আমাদের সদরঘাট ক্লাবের সরোজ গুহ একজন সভ্য। সে সব রকম শারীরিক ক্রীড়া-কৌশল, জিমনাস্টিক চর্চা ও বিভিন্ন আত্মরক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞ ছিল। তার শরীর—পা থেকে মাথা অবধি, যেন নিপুণ শিল্পীর হাতে নিখুঁতভাবে গড়া। খুব smart (চটপটে), সবল সুস্থ মাংসপেশী ও সবগুলি মাংসপেশীই যেন স্প্রীং দিয়ে ফিট্ করা। মুষ্টি-যুদ্ধ, যুযুৎসু বা ছোরা নিয়ে আক্রমণ প্রতিরোধ অভ্যাস করার সময় দেখেছি তার শরীরের প্রত্যেকটি movement (গতি) যেন বৈদ্যুতিক ঝলকের মত অত্যন্ত গতিশীল। সরোজ ফর্সা, সুন্দর, সুশ্রী ও মিষ্টভাষী, স্কুলের ছেলে —সে বছরই স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে। দিদির সঙ্গে সরোজের পরিচয় করিয়ে দিলাম। সরোজ দিদিকে ছোরা নিয়ে আক্রমণ ও তা' প্রতিরোধ করার ব্যবহার শেখাতে লাগল।

এই সময় আমরা, যারা আশঙ্কা করতাম যে পুলিশ হয়ত আমাদের উপর হঠাৎ হামলা চালাবে, রাত্রে বাড়ীতে থাকতাম না। আমি প্রতি রাত্রে বাড়ীর বাইরে বিভিন্ন জায়গায় থাকতাম আর সকালবেলা চারিদিক ভাল করে দেখেশুনে বাড়ী আসতাম। রাত্রিবেলা রোজ এক বাড়ীতে থাকাও নিরাপদ বলে মনে করি নি। তাই পারলে প্রতিদিনই আস্তানা বদল করেছি।

ভোরবেলা, তখনও হয়ত পাঁচটা বাজে নি, আমি সাইকেলে বাড়ী ফিরে এলাম। পুলিশের কোন তৎপরতা বা ফাঁদ পাতা নেই বুঝে নিয়ে সাইকেলটি বৈঠকখানা ঘরের এক পাশে (যেখানে রাখা হ'ত) রেখে বাড়ীর ভেতরের কম্পাউণ্ডে ঢোকার মুখে দেখি আর একটি সাইকেল আছে। এত সকালে সাইকেল কেন? কার সাইকেল? ভেতরে ঢুকে দেখি দিদি দাঁড়িয়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখছেন—আর সরোজ একটি তারই সমবয়সী মেয়েকে ছোরা খেলার পদ্ধতি শেখাচ্ছে। মেয়েটি আমাদের পাড়ার—খুব সুন্দর দেখতে। মেয়েটি আমাদের খুব পরিচিতা—তাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা ছিল। মেয়েটির ভাল নাম জানতাম না। ডাক নামটি জানতাম, সেটিও আজ ভুলে গেছি। সরোজ ও মেয়েটিকে 'রণ-বেশে' শাণিত ছোরার পরিচালনা ও পাঁয়তারা কষতে দেখে যে কোন শিল্পীর চোখে ভাল লাগবে। তাছাড়া স্বয়ং দিদির উপস্থিতিতে ও অভিভাবকত্বে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা যে গাম্ভীর্যের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমি এক ঝলকে সমস্ত অবস্থাটা দেখে নিয়ে তাদের পাশ দিয়ে উঠোনটি পেরিয়ে আমার ঘরে চলে গেলাম। উঠোনটি পেরোবার সময় মাটির দিকে আমার মুখ—যেন কিছু দেখছি না। মুখ দিয়ে কেবল একটা অস্ফুট গোঁ গোঁ শব্দ বেরিয়ে এল—দিদির প্রতি আমার অভিযোগের একমাত্র প্রকাশ।

তারপর সকালবেলা চা খাওয়ার বা জল খাওয়ার (চা আমি খেতাম না) সময় আমি খুব গম্ভীর। কারও সঙ্গে কোন কথা বলি নি। সবার খাওয়া

শেষ হ'ল—সবাই উঠে গেল। দিদি তখনও বসে আছে। আমি উঠে যাওয়ার সময় দিদিকে বললাম—

"তুমি কথা রাখ নি দিদি। তোমার একার শেখবার কথা ছিল। তুমি সে চুক্তি ভঙ্গ করেছ। কাজেই সরোজ আর শেখাতে আসবে না। আমাদের প্রস্তুতির শেষ সময়ে একটি ছেলেও কোন অনিশ্চয়তার জটিল পরিস্থিতির মধ্যে থাকুক তা' আমরা চাই না। সরোজকে কাল থেকে আর আমি আসতে দেব না।"

সরোজ গুহ, প্রথম ডাকে অস্ত্র কেনার জন্য আমাদের বিপ্লবী দলে প্রায় হাজার টাকার অলঙ্কার এনে দেয়। সরোজ পুলিশ-লাইন আক্রমণের সময় আমাদের সঙ্গে প্রথম সারিতেই ছিল। জালালাবাদের যুদ্ধে সরোজ মাস্টারদা, নির্মলদা, অম্বিকাদা ও লোকনাথের পাশে দাঁড়িয়ে বীরত্বের সঙ্গে বৃটিশ মেসিনগানের বিরুদ্ধে লড়েছে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সরোজ সফলতার সঙ্গে গা ঢাকা দিয়েছিল। ১৯৩৩ সালে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট—মিঃ ডুর্নকে গুলী করে সে বেমালুম সরে পড়ে। তারপর "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের" দ্বিতীয় মামলায় অম্বিকাদার সঙ্গে যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে আন্দামানে নির্বাসিত হয়। সরোজ সম্বন্ধে এইখানে এইটুকু সামান্য পরিচিতিই সকলের মনে তার প্রতি যে শ্রদ্ধা জাগাবে তাতে সন্দেহ নেই। সেই দিনও সরোজের নৈতিক চরিত্র ও বিপ্লবী নিষ্ঠা সম্বন্ধে আমার মনে কোন প্রশ্নের অবকাশ ছিল না। তা'ছাড়া যে মেয়েটিকে দিদি সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত বলে মনে করেছিলেন তাকেই যে ছোরা ব্যবহারের বিশেষ কৌশল শেখাবার জন্য মনোনীত করেছেন তাতেও আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। মেয়েটিকেও দেখা মাত্র নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। সরোজ ও সেই মেয়েটিকে দেখলে মনে হয় যেন তারা পিঠাপিঠি ভাই-বোন। মেয়েটিকে বিপ্লবী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করলে দলেরই হয়ত গৌরব বাড়ত। তবু দু' বছরের মৃত্যু-প্রোগ্রামের কঠোরতার ব্যতিক্রম করা অনুচিত বলে মনে করেছি। তাই অপ্রিয় হলেও দিদিকে আমার বলতেই হ'ল—"সরোজ আর শেখাতে আসবে না।"

দিদিকে কোন প্রত্যুত্তর দেওয়ার সুযোগ দিই নি। আমার বিশ্বাস দিদি আমাকে ভুল বোঝে নি। এও আমার বিশ্বাস, দিদি আমাকে সমর্থন করত যদি আমাদের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তার সঠিক ধারণা থাকত।

সংগঠনের মধ্যে ছেলেমেয়েদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ এই দুটি বছর স্থগিত থাকুক—তা' আমরা চেয়েছিলাম। তা'ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশাও অন্তত দু' বছরের জন্য সবাই স্থগিত রাখুক, তাও আমাদের একান্ত ইচ্ছে ছিল। সংগঠনের মধ্যে যা' কাম্য বলে মনে করেছিলাম নিজ জীবনে তার ব্যতিক্রম হোক্ তা' সজ্ঞানে কখনও ভাবতে পারি নি। তাই আমার চলাফেরার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে মেয়েদের সঙ্গে কোনমতেই মিলতাম না। সেরকম কোন সম্ভাবনা দেখলেই সযত্নে এড়িয়ে যেতাম। অনেকের মনে হবে ভীরু কাপুরুষ ছিলাম—সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মেয়েদের সঙ্গে মেশার সাহস ছিল না। এতদিন পরে তখন কি ছিলাম তার উত্তর কি আর দেব? তবে Death Programme কার্যে পরিণত করতে হলে সেইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিপ্লবীদের পক্ষে মেয়েদের সঙ্গে মেশার মধ্যে যে একটা

অ্যাড্ভেঞ্চারের দিক আছে, তা' নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি নি বা সময়ও ছিল না।

বাবা-মা ও দিদি আমার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। পাড়ায় ও প্রতিবেশীদের কাছে আমি যেন একজন মহা-বিপ্লবী—আমার যেন কোন দুর্বলতাই থাকতে পারে না! কি মুস্কিল—আমিও যে তাদেরই মত একজন মানুষ! যতক্ষণ প্রয়োজনের তাগিদে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলব ততক্ষণ আমার বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে—তা নইলে সকলেই যা' আমিও তাই। আমার বাবার পক্ষে অত সব নিখুঁতভাবে বিচার করে দেখবার কোন কারণ ছিল না। তিনি জানতেন তাঁর অনন্তর নৈতিক চরিত্র খুব উন্নত—সবাই তাকে প্রশংসা করে। তাই সেই উচ্চ ধারণার বশবর্তী হয়ে বাবা একদিন খুব অনুযোগের সুরে আমাকে বললেন—"তোর কেবল কাজ আর কাজ। আর যেন কেউ কাজ করে না! তোর শিক্ষয়িত্রী মাসীমা কতদিন তোকে তাঁদের বাড়ী যেতে বলেছেন! কতবার বলেছেন হারানী জ্যোছ্নীকে আমাদের বাড়ী নিয়ে আসতে। তারা তোর বোনের মত—তোকে কত শ্রদ্ধা করে তারা! তাদের এখন কলেজ ছুটি। আজ গিয়ে তাদের নিয়ে আসবি? এতদিন যে যাস্ নি—কি ভাবছে বলত......?"

মাসীমা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। প্রায় আট বছর আগে অসহযোগ আন্দোলনে গা ভাসালাম, লেখাপড়া ছাড়লাম—তিনবার বাবাকে অমান্য করে বাড়ি ছেড়ে চলে যাই। সেই সময় এই মাসীমা একবার আমাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বাড়ী নিয়ে আসেন এবং বাড়ীর সবাইকে আমার স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে বারণ করেন। এ'দের সামনে আমি ম্যাজিক্ দেখিয়েছি। একবার একটি ম্যাজিকের খেলা দেখে মাসীমা খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন। সবার সামনে কাঁচের গ্লাসে একটি পয়সা রেখে দিলাম। পয়সাটির প্রাণ সঞ্চার করা হ'ল। তারপর দর্শকবৃন্দকে সম্বোধন করে বললাম—"আপনারা প্রশ্ন করুন, আমার এই মন্ত্রপূত পয়সা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে যা' জানতে চান তা' বলে দেবে।"

মাসীমা প্রশ্ন করলেন, তার চাকরীটি বজায় থাকবে, না কি তাঁরও অন্যান্যদের সঙ্গে ছাঁটাই হবে? বুঝতেই পারছেন—ম্যাজিকের পয়সা কি উত্তর দেবে? আমি সবাইকে শুনিয়ে পয়সাটিকে নির্দেশ দিলাম—"যদি মাসীমার চাকরী বজায় থাকে তবে তুমি গেলাসের মধ্যে একটিবার মাত্র লাফিয়ে উঠে শব্দ কর, যেন আমরা দেখতে ও শুনতে পাই।" সকলে অবাক হয়ে দেখলেন—পয়সাটি ভবিষ্যদ্বাণী করল—মাসীমার চাকরী বজায় থাকবে। মাসীমার পরের প্রশ্ন—তাঁর চাকরীতে মাইনে বাড়বে কি না? মন্ত্রপূত পয়সা কি কাউকে মনঃক্ষুণ্ণ করতে পারে? বিনা দ্বিধায় পূর্বপন্থা অনুযায়ী গেলাসের মধ্যে পয়সাটি লাফিয়ে উঠে জানিয়ে দিল যে মাসীমার মাইনে বাড়বে। তারপর সত্যি সত্যিই মাসীমাই চাকরীও বজায় ছিল, মাইনেও বাড়াল। খেলা দেখবার জন্য পয়সাটি মাসীমাই দিয়েছিলেন। খেলা দেখাবার পর মাসীমাকে সেটা ফেরত দিই। মাসীমা সেই পয়সাটি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে পুজোর ঠাকুরের সঙ্গে রেখেছিলেন।

মাসীমাকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করতাম, তাঁর বাড়ী যেতে আমার আপত্তি

থাকবে কেন? হারানী জোছ্‌নীকেও বোনের মতই জানতাম—যদিও তাদের সঙ্গে দু'-একটা কথা হওয়া ছাড়া বেশি কথা বলার সুযোগ কখনও হয় নি। দুটি বোনই দেখতে সুন্দর; কথাবার্তা, চাল-চলন, লেখাপড়া, সবকিছুতেই ভাল ছিল। সেই যুগে তাদের মত দুটি বোনকে বিপ্লবীদলের সভ্য করতে পারলে যে কোন বিপ্লবী পার্টিই উপকৃত হত—গর্ব অনুভব করত। তাদের ভাল নাম আজ আমার আর মনে নেই। তারা যে আজ কোথায়, তাও আমার জানা নেই। যে ডাক নামে তাদের চিনতাম সেই নাম লিখেছি বলে যদি অসৌজন্য প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে তারা যেন আমাকে ক্ষমা করে। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন তাদের দলভুক্ত করতে চেষ্টা করলাম না, তার একমাত্র কারণ—Death Programme। দু'বছরের মধ্যে প্রস্তুতি পর্ব শেষ করব তারপর যুদ্ধে প্রাণ দেব। তাই এই দুটি বছরের মধ্যে কোন তরুণীর সংস্পর্শে আসা বা মনের অগোচরে কোন মায়া বা স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়ার জন্য বিপ্লবী দায়িত্ব অনুভব করেছিলাম।

বাবা যখন সরল মনে আমাকে মাসীমাদের বাসায় যেতে বললেন—দুটি বোনকে নিয়ে আসতে বললেন, তখন বাবার মুখের ওপর আমি আপত্তি জানাতে পারলাম না। মার কাছে গেলাম। আমার ভাব গতিক দেখে মা বুঝতে পারলেন আমি যেন তাঁকে কিছু বলতে চাইছি। মা জিজ্ঞাসা করলেন—"কি রে—কিছু বলবি না কি?" আমি একটু ইতস্তত করছিলাম। কি ভাবে কথাটা পাড়বো তাই ভাবছিলাম। শেষ পর্যন্ত মা'র কাছে বললাম—"মা, দেখ, বাবা খুব অসন্তুষ্ট হচ্ছেন। আমি হারানী জোছ্‌নীদের ওখানে যাচ্ছি না, তাদের এতদিনের মধ্যে একদিনও নিয়ে আসি নি'—তাই বাবা বললেন আজ যেন ওদের নিশ্চয়ই নিয়ে আসি। আমি কিন্তু মা তাদের ওখানে যাব না। জীবনে যা ব্রত নিয়েছি তা' আমাদের পালন করতেই হবে। আমি হয়ত তোমাদের কাছে খুব ভাল ছেলে, কিন্তু সবার মত আমিও একজন সাধারণ মানুষ। আমার কতকগুলো নিয়ম মেনে চলা উচিত। যে নিয়ম আমাদের দলের অন্য ছেলেদের মেনে চলতে বলি, আমি নিজে ত কিছুতেই লঙ্ঘন করতে পারি না। নিয়মের ব্যতিক্রম করেও কর্তব্যে অটল থাকব—এইরূপ মিথ্যে ধারণা কি আমার থাকা উচিত? তাই মা, তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বলবে—আমি ওদের আনতে যেতে পারব না।"

মা আমার মুখের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চেয়েছিলেন। সব কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন। মা'র চোখ ছল ছল করে উঠ্‌ল। মা হয়ত ভাবছিলেন—কী আমার সেই ব্রত! অজানা কোন অমঙ্গল আশঙ্কায় মা'র মন ভারাক্রান্ত—চোখ দুটি ব্যাথায় ম্লান। তবু মুখে হাসি এনে আমাকে বললেন—"আচ্ছা তোর আর যেতে হবে না। তোর বাবাকে আমি বুঝিয়ে বলব।"

মা যে আমার কি ভাল ছিলেন! কত কথা মাকে বলেছি, কত জ্বালাতন করেছি, কত ব্যথা দিয়েছি মাকে! মা জানতেন আমার একগুঁয়েমীর কথা। যা সঙ্কল্প একবার করেছি তা'তে যে অটল থাকব—কোন অনুরোধ উপরোধ যে শুনব না, শত কাকুতি মিনতি যে আমাকে স্পর্শ করবে না, তা' মা জানতেন। মা বুঝেছিলেন আমার কোথায় বাধা—কেন আমি হারানী জোছ্‌নীদের বাড়ীতে যাব না! মায়ের মন বুঝত যে আমরা কি যেন একটা করছি! মাকে প্রায়ই

বলতাম—সংসার ধর্ম আমাদের জন্য নয়। পরাধীন দেশে সংসারধর্ম যাদের শোভা পাক না কেন বিপ্লবীদের জন্য তা' মহাপাপ! প্রকৃত বিপ্লবী হতে গেলে সমস্ত জীবনটাই বিপ্লবের জন্য উৎসর্গ করতে হয়। "Revolution demands not only free evenings but the whole life!"

বিপ্লব কেবল মাত্র সন্ধ্যাবেলার অবসর সময়টুকু দাবি করে না—দাবি করে জীবনের সবটুকু।

আমাদের অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে ও দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে ঘোষণাপত্র লেখা এবং তা' ছাপিয়ে বিলি করা যে অত্যন্ত জরুরী কাজ, তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না। তবুও আমাদের বিশেষ ত্রুটির কথা স্বীকার করতে হবে। এই ব্যাপারে আমরা সবাই একপ্রকার উদাসীন ছিলাম। শেষ পর্যন্ত অভ্যুত্থানের দিন পনেরো পূর্বে গণেশ আমাদের হেড কোয়ার্টারে প্রস্তাব আনল এবং সেই অনুযায়ী স্থির হ'ল যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘোষণাপত্র মারফত আমাদের উদ্দেশ্য প্রচার করব এবং দেশবাসীকে আহ্বান জানাব।

গোপনে বে-আইনীভাবে নানা ধরনের পুস্তিকা প্রভৃতি ছাপান আজকাল যেমন খুব সহজ হয়ে গেছে, সেই সময়ে আমাদের পক্ষে তা মোটেই এত সহজ ছিল না। প্রথমত, আমাদের নিজেদের কোন প্রেস ছিল না বা কোন প্রেসে গোপনে বে-আইনীভাবে ছাপাবার বন্দোবস্ত করবার মত সুবিধেও ছিল না। এইরূপ অব্যবস্থা বা উদাসীনতার একমাত্র কারণ, আমরা সেই যুগে আমাদের বাস্তব লিমিটেশনের জন্য উপলব্ধি করতে পারি নি যে প্রচার-সংগ্রামও সশস্ত্র প্রস্তুতি বা আক্রমণের চাইতে কোন অংশে কম প্রয়োজনীয় নয়। দ্বিতীয়ত, বিলম্বে হলেও যখন প্রচারপত্রের প্রয়োজন অনুভব করলাম তখন ঘোষণাপত্র রচনার চাইতে ছাপাবার সমস্যা শতগুণ বেশি মনে হ'ল। গোপনে ছাপাতে গিয়ে ধরা পড়লে কয়েক মাসের জন্য সাজা হবে—এর বেশি তো নয়? ধরা পড়ে সাজা খাটবার প্রশ্ন আমাদের কাছে তখন বড় নয়। আমাদের কাছে প্রশ্ন ছিল যে কোনমতে ঘোষণাপত্রের একটি কপিও পুলিশের হাতে গিয়ে আগেভাগে পড়বে না, যদি পুলিশ একটিও হস্তগত করতে পারে তবে ঘোষণাপত্রের বিষয়বস্তু থেকে ব্যাপক আক্রমণ সম্বন্ধে অনুমান করা তাদের পক্ষে কঠিন হবে না। সেইজন্য এক সময় এমনও মনে হয়েছিল যে, কাজ নেই আমাদের ঘোষণাপত্রের। অভ্যুত্থান যদি ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে তার চাইতে ঘোষণাপত্রের প্রয়োজনীয়তাকে বিসর্জন দেওয়া অনেকগুণে শ্রেয়। এইরূপ মারাত্মক পরাজয়ের মনোভাব থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা মুক্ত হ'লাম। কোন বাধাই আমাদের কাছে তখন আর বড় নয়। যে কোন উপায়ে ছাপাতে হবে। তাই বলে বাইরের যে কোন একটা প্রেসের সঙ্গে গোপনে সংযোগ স্থাপন করে সহজে কাজ হাসিল করাটাও যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে করি নি।

তিনটি প্রচারপত্র বা ঘোষণাপত্র রচনা করার ভার ন্যস্ত হ'ল গণেশের ওপর। তিন ধরনের প্রচারপত্র গণেশ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে রচনা করল। প্রত্যেকটির জন্য একটিমাত্র খসড়া এবং সেই তিনটি খসড়াই গণেশের কাছে রইল। তারপর প্রশ্ন এল—ছাপাবার। নীতিগতভাবে ঠিক করলাম অন্য

কোন প্রেস বা প্রিন্টারের সাহায্যে ছাপান হবে না। কাজ চলার মত ছোট 'হ্যাণ্ড প্রেস' আমাদের কিনতে হবে এবং আমাদের বিশ্বাসী বাছাই করা সদস্যদের দিয়ে ছাপাতে হবে। প্রেস কেনা, গুপ্ত স্থানে রাখা, গোপনে ছাপান এবং তারপর ছাপান ইস্তাহারগুলি সম্বন্ধে সবার চোখের অন্তরালে রাখা প্রভৃতির সব ভার স্বয়ং গণেশ নিল।

প্রেস কেনা হ'ল। সঙ্গে যা টাইপ ছিল তা' পর্যাপ্ত নয়। সেই হেতু গণেশ তার এক আত্মীয় যুবকের মারফত কোন এক প্রেস থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী টাইপ সংগ্রহ করল। বলা বাহুল্য যে, গণেশের এই যুবক আত্মীয় কোন এক বড় প্রেসে কাজ করত।

গণেশ তার সঙ্গে দু'জন বিপ্লবী সাথীকে নিয়ে ঘোষণাপত্র ছাপাতে গিয়ে এক সমস্যায় পড়ল। কত চেষ্টা করল কিন্তু কোনমতে কাগজে আর ছাপ পড়ে না। তারপর গণেশ তার যুবক আত্মীয়ের কাছে জানতে পারল যে ছাপাবার পূর্ব মুহূর্তে কাগজগুলিকে একের পর এক ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে একটু বুলিয়ে নিতে হয়। ঠিক তাই—তারপর ছাপাতে আর কষ্ট হ'ল না। তিন ধরনের ছাপাবার কাজ শেষ করে তিনটে প্যাকেটে ইস্তাহার-গুলিকে বাঁধা হ'ল। গণেশ দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে দেখল যেন একটি কপিও ভুলে পড়ে না থাকে।

নীচে তিনটি প্রচারপত্রের পূর্ণ কপি দিচ্ছি। প্রথম ঘোষণা—

"Indian Republican Army"

"The Indian Republican Army, Chittagong Branch, hereby solemnly declares it's intention to stand to-day against the agelong repression by the British people and their Government which they have followed as a cruel policy to keep the three hundred millions of Indian people subjugated for unlimited time and to eradicate the slightest trace of nationalism and their national originality amongst them.

The right of ownership of India and the control of her destiny belongs to the people of India only and the long usurpation of that right by a foreign people and Government has not extinguished that right nor it ever CAN. The Indian Republican Army proclaims to-day its intention of asserting this right in arms in the face of the world and thus put into actual practice the idea of Indian Independence declared by the Indian National Congress; and hereby pledges the life of everyone of its members to the cause of freedom, to the welfare and exaltation of the Mother Land amongst all other nations.

It remembers to-day with sorrowful indignation the inhuman massacre of the Indian people perpetrated by the

British Government on the Indian soil, the blowing up of her womanfolk in the mouth of guns, the indiscriminate hangings and cold-blooded murders of her manhood, the crushing of her infants under the cruel British foot and the complete destruction of her trade and industries and takes up the sacred vow of retaliating and avenging the blood of her late wronged children.

The Indian Republican Army, is entitled to and hereby claims the allegiance of every Indian people for the upkeep of the national cause and honour and also prays that no person who reveres this cause will dishonour it by callousness, cowardice and inhumanity. In this supreme hour the Chittagong people must, by their valour and patriotism and by the readiness of her children to sacrifice themselves for the common good, prove themselves worthy of the august destiny to which they are called.

By Order,
President in Council
Indian Republican Army,
Chittagong Branch."

—[বৃটিশ ও তাহার সরকার বহু শতাব্দী ধরিয়া ত্রিশকোটি ভারতবাসীকে চির পদানত করিয়া রাখিবার ও তাহাদের সামান্যতম জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় ঐতিহ্য নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে নিষ্পেষণের যে নিষ্ঠুর নীতি অনুসরণ করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে আজ 'ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা' সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অভিপ্রায়ে যথাবিধি গুরুত্ব সহকারে ঘোষণা করিতেছে—

ভারতের মালিকানাস্বত্ব ও ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকার একমাত্র ভারতের জনসাধারণেরই আছে; দীর্ঘকালব্যাপী বৈদেশিক রাজশক্তি সেই অধিকার খর্ব করিয়া আসিতেছে বলিয়া আমাদের স্বাধীনতা-স্পৃহাকে সে কখনও নির্বাপিত করিতে পারে নাই, কখন পারিবেও না।

অস্ত্রের সংঘাতে সমগ্র জগতের সমক্ষে আজ ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনী এই অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে এবং এইভাবে ভারতের জাতীয়কংগ্রেস ঘোষিত স্বাধীনতার আদর্শ বাস্তবে কার্যে পরিণত করিতে সংকল্প করিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মাঝখানে স্বাধীনতার মহান উদ্দেশ্য এবং মাতৃভূমির মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে প্রতিটি সভ্য আজ জীবনপণ শপথ গ্রহণ করিতেছে।

ঘৃণাভরে আজ তাহারা স্মরণ করিতেছে ভারতভূমিতে বৃটিশ সরকার অনুষ্ঠিত সেই সমস্ত হৃদয়বিদারক ঘৃণিত কার্যকলাপ—নৃশংসভাবে ও নির্বিচারে ভারতের তরুণদের হত্যা ও ফাঁসি, ভারতীয় নারীর অবমাননা, ক্রুর

বৃটিশ বুটে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের নিষ্পেষণ এবং ব্যবসা ও শিল্পের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন! সেই নিহত সন্তানদের রক্তের বিনিময়ে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আজ তাহারা পবিত্র শপথ গ্রহণ করিতেছে।

ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনী আজ এই যোগ্যতার অধিকারী এবং জাতীয় স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার প্রয়োজনে ভারতীয় জনগণের আনুগত্য দাবি করিতেছে; তাহাদের একান্ত অনুরোধ এই আদর্শে আস্থাবান কোন ভারতবাসীই নিজ শিথিলতা, ভীরুতা ও অমানুষিকতার দ্বারা ইহার অসম্মান না করে। এই মহাক্ষণে চট্টগ্রামবাসী নিশ্চয়ই বিক্রম, স্বদেশ-প্রেম এবং সর্বজনের কল্যাণার্থে আপন সন্তানদের আত্মাহুতির প্রেরণা যুগিয়ে নিজ যোগ্যতা প্রমাণ করিবে।]

আজ থেকে ছত্রিশ বৎসর পূর্বে এই প্রচারপত্র রচনা করা হয়েছে ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনী চট্টগ্রাম শাখার পক্ষ থেকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করবার আছে যে, সেই যুগেও আমরা অন্তরের বিপ্লবী প্রেরণা দিয়ে বুঝেছিলাম—'ভারতের মালিকানাস্বত্ব ও ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকার একমাত্র ভারতের জনসাধারণেরই আছে।' এই প্রচারপত্রে আরও দেখা যায় যে আমরা ভারতের জাতীয়কংগ্রেস ঘোষিত স্বাধীনতার আদর্শ, যা প্রথমে সুভাষবাবু কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে বাংলার বিপ্লবী দলের মুখপাত্র হিসাবে প্রস্তাব করেছিলেন, সেই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য অহিংস আন্দোলনের পরিবর্তে সশস্ত্র অভিযানের জন্য আহ্বান জানালাম চট্টগ্রামের সশস্ত্র যুব-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় ঘোষণাপত্রটি চট্টগ্রামের ছাত্র ও যুব-সমাজকে সম্বোধন করে করা হয়েছিল। আমাদের মামলার জাজ্‌মেন্ট কপির ৬১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে—

"The Indian Republican Army."

"To the Students and Youths of Chittagong.

"Dear Brothers,

The Indian Republican Army has made an attempt to assert its rightful claim to liberate the country from the cruel yoke and oppression of the British people and their Government and has kept up flying the ensign of free India.

The British Government during the last 200 years of their tyrannical reign in India, have crushed with very cruel hands the Indian everytime, they have tried to achieve freedom and this time also they will not spare any energy to restore their illegal establishment for predatory exploitation.

So brothers rise up to the situation, try to feel the anguish of subjugation, see to the sad plights your country has been put to do what the youths and students of Germany, Russia and China are doing, kindle up the fire of wrath and retaliation in your hearts. Enroll yourselves as

soldiers under the Indian Republican Army and make an ardent attempt to save the Motherland from the abyss of misfortune and misery.

By Order,
President in Council,
Indian Republican Army,
Chittagong Branch."

—[বৃটিশ সরকারের নিষ্ঠুর বন্ধন ও উৎপীড়ন হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য 'ভারতের গণতন্ত্র বাহিনী' আজ একটা আঘাত হানিয়াছে এবং স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রতীক পতাকা উড্ডীন করিয়াছে।

বৃটিশ সরকার, দুশ বছরের অত্যাচারে জর্জরিত ভারত-আধিপত্য কালে, প্রত্যেকবারই ভারতবাসীর স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টাকে অতি নির্দয় হস্তে বিনষ্ট করিয়াছে এবং এবারও তাহারা তাহাদের দস্যুবৃত্তির বে-আইনী সংস্থা পুনঃ স্থাপিত করিবার জন্য কোন শক্তি ব্যয় করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না।

অতএব, ভাই সব, ওঠ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে তাকাও, পরাধীনতার নিদারুণ যন্ত্রণা উপলব্ধি কর, চাহিয়া দেখ তোমার মাতৃভূমি কি করুণ লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিতা; জার্মানি, রুশ এবং চীনের যুবক ও ছাত্ররা যেরূপ অভিযান চালাইতেছে তোমরাও তাহাই কর, তোমাদের অন্তরে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার আগুন প্রজ্বলিত কর। সৈন্য হিসাবে 'ভারতের গণতন্ত্র বাহিনী' -তে ভর্তি হও এবং মাতৃভূমিকে দুঃখ দুর্ভাগ্যের অতল গহ্বর হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা কর।]

এই প্রচারপত্রে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আমরা আগে থেকেই জানতাম আমাদের সীমারেখা। বৃটিশ সরকার তার প্রচণ্ড শক্তির জোরে নৃশংসভাবে আমাদের ক্ষুদ্র যুব-অভ্যুত্থানকে সামরিক ক্ষেত্রে পরাভূত করবে। যুদ্ধে জয় হবে জেনে যুদ্ধ করা এক কথা আর নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও সমর ক্ষেত্রের বীরত্বপূর্ণ অভীপ্সা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। তবে ক্ষ্যাপার দলের ব্যর্থ প্রয়াস কেন? তারা জানত তাদের বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগ কখনও ব্যর্থ হবে না— ভারতবাসী তাদের আত্মত্যাগ, সংগঠন ও বীরত্বপূর্ণ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবে এবং ভবিষ্যতে স্বাধীনতা অর্জন করবে।

তৃতীয় প্রচারপত্রের ইংরেজী নকল জাজমেন্ট কপি থেকে উদ্ধৃত করছি—

"To the Citizens of Chittagong.

"The Indian Republican Army hereby directs and commands every man, woman and son of Chittagong to capture and produce dead or alive forthwith at the Head Qurs. of the Army all Englishmen and white-skinned Anglo-Indians who are hostile to our National aspirations.

The Indian Republican Army anounces that every body who will produce the demanded persons will be amply rewarded.

By Order,
President-in-Council,
Indian Republican Army,
Chittagong Branch."

—[চট্টগ্রামবাসীদের প্রতি—

ভারতের গণতন্ত্র বাহিনী চট্টগ্রামের প্রত্যেক স্ত্রী, পুরুষ এবং তার সন্তানদের আদেশ দিতেছে যেন তাঁহারা সকল ইংরাজ ও শ্বেতাঙ্গ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, যাহারা আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিবন্ধক, তাহাদের জীবিত বা মৃত, যে-কোন অবস্থায় যেন হেড কোয়ার্টারে উপস্থিত করেন। 'ভারতের গণতন্ত্র বাহিনী' ঘোষণা করিতেছে যে, দাবি অনুযায়ী ঐ সমস্ত লোকদের যে কেহ কোন সামরিক দপ্তরে সমর্পণ করিতে পারিবে তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে পুরস্কৃত করা হইবে।

ভারতের গণতন্ত্র বাহিনীর
চট্টগ্রাম শাখার
কাউন্সিলের সভাপতির
আদেশক্রমে।]

ইউরোপীয়ান সাহেবদের হত্যা করা আমাদের প্রোগ্রামে গৃহীত হয়েছিল। সশস্ত্র আক্রমণ করে শত্রুর সব সামরিক ঘাঁটি দখল করে নেওয়া ঠিক ছিল। তবু আমরা ভেবেছিলাম বৃটিশ প্রতিভূদের নিজেদের রক্ত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাদের এতদিনের তাণ্ডব অত্যাচারের। তাই আমরাও তাদের মত নির্দয় নিষ্ঠুর। তাই এইরূপ নির্মম ও কঠোর আদেশ—জীবিত বা মৃত ফিরিঙ্গীদের চাই! আজ ছত্রিশ বছর পরে সেদিনকার এই ঘোষণা নিয়ে গবেষণা করা চলতে পারে; কিন্তু এতখানি ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুন বুকে প্রজ্বলিত না হলে সেইদিন কি প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও যুদ্ধ করা সম্ভব হ'ত?

সাধারণভাবে আক্রমণের মোটামুটি প্ল্যান আমাদের বেশ কিছু সময় আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। প্ল্যানটি স্থির করবার পর মাস্টারদার কাছে গণেশ ও আমি তা' জানাই। এই বিষয় আগে উল্লেখ করেছি। জেনারেল (সাধারণ) প্ল্যান চোখের সামনে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু জেনারেল প্ল্যান আর একটুও বাড়তে পারে না যতক্ষণ সেই জেনারেল প্ল্যানটিকে বাস্তব ক্ষেত্রে রূপ দিতে concretise (প্রত্যক্ষভাবে মূর্ত) করে তোলা না হয়। প্ল্যানকে বাস্তব রূপ দেওয়া তখনই সম্ভব যখন শত্রুর [illegible] পূর্ণ ও যথাযথ সংবাদ পাওয়া যায়। নিজেদের শক্তি অনুযায়ী সংবাদের ওপর ভিত্তি করে সঠিক একটি আক্রমণের প্ল্যান করা সম্ভব।

আমাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং হাত বোমার সংখ্যা ও আয়োজন সম্বন্ধে হেড কোয়ার্টার নিশ্চয়ই অবগত ছিল। প্রথম আক্রমণের জন্য প্রথম সারির কতজন

নির্ভরযোগ্য সভ্য ও শত্রুঘাঁটি বিধ্বস্ত করবার পরমুহূর্তে আর কতজন তৈরি যুবক আমাদের সঙ্ঘের সভ্য তার একটা সঠিক ধারণা আমাদের নিশ্চয়ই করতে হয়েছিল। ক'জন সভ্য মোটর গাড়ি চালাতে পারে ও ক'টি প্রাইভেট গাড়ি আমাদের নিজ আওতায় আছে এবং ক'টি ট্যাক্সি আমরা বলপূর্বক হস্তগত করে আক্রমণের কাজে ব্যবহার করতে পারব তার একটা হিসেবও যে আগে থেকে করা হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। এ ছাড়া আমাদের হাতে আর কতদিন সময় আছে তাও ভাবতে হয়েছিল। অর্থাৎ পুলিশ আমাদের বিরুদ্ধে যেভাবে সজাগ ও তৎপর হয়ে উঠল সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আর কতদিন বিলম্ব করা উচিত? প্রথম initiative কে নেবে—পুলিশ না আমরা? দ্বিধাগ্রস্ততার কোন স্থান বা scope আমাদের ছিল না। আমাদের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব যদি বিলম্বের কারণ হ'ত তবে স্থির বলা যায় যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহের গৌরবময় অধ্যায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবন্ধ হ'ত না।

এই সব উপকরণ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদের আক্রমণের প্ল্যান চূড়ান্তভাবে (finalise) করতে পারি নি যতক্ষণ না আমরা শত্রুঘাঁটির বিশদ সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছি। নিজেদের সৈন্য কিভাবে mobilise করব এবং কিভাবে তাদের deploy করব যদি নাকি শত্রুর অবস্থান ও শক্তি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকে? সেইজন্য সংবাদ সংগ্রহের এই সুকঠিন কাজটি সম্পন্ন করবার পূর্ণ দায়িত্ব আমি ও গণেশ নিয়েছিলাম।

চট্টগ্রামে দু'টি প্রধান শত্রুঘাঁটি। একটি আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ব্যাটালিয়ান A.F.I.-এর হেড কোয়ার্টার; আর একটি হ'ল পুলিশ লাইন। তা'ছাড়া পাহাড়তলী ওয়ার্কশপে ও ডবল মুরিং জেটিতে দুটি ছোট ছোট আসাম-বেঙ্গল রেল ব্যাটালিয়ানের রক্ষী ঘাঁটি ছিল। শহরে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ইংরেজ আমলে), জেল, কোতোয়ালি, প্রভৃতির অবস্থান ছিল। গোটা তিনেক বন্দুকের দোকান—তার মধ্যে মাত্র একটি দোকানই বেশ বড় ও চালু ছিল। যুগপৎ ঝটিকা বেগে অতর্কিত আক্রমণে চট্টগ্রাম শহর দখল করে নেওয়ার প্ল্যানের ছকটির সঙ্গে আরও দুটি strategic বিষয়ের সমাধান একান্ত প্রয়োজন ছিল। প্রথমটি হ'ল টেলিফোন-টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস করা এবং দুটি স্থানে রেললাইন উৎপাটন করে রেলগাড়ি লাইনচ্যুত করে বহির্জগৎ হতে চট্টগ্রামকে সাময়িকভাবে সব রকম যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। আর একটি বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য স্বভাবতই ছিল। দু-একটা সমুদ্রগামী স্টীমার চট্টগ্রাম বন্দরে সব সময়েই থাকত। এইসব স্টীমারে বেতার সংবাদ চলাচলের যে ব্যবস্থা আছে তা' কারো কাছেই অজানা নেই—আমাদেরও এই প্রাথমিক জ্ঞানের অভাব হওয়ার কোন কারণ ছিল না।

আমাদের শক্তি, ক্ষমতা ও ধার্য সময়ের মধ্যে প্ল্যানের রূপ দিতে হবে। যে-সমস্ত শত্রুঘাঁটি সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা আমাদের ছিল, আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তিতে নির্ভর করে সেই সব ক'টি লক্ষ্যবস্তুর ওপর আক্রমণ চালান সম্ভব ছিল না। তাই বাছাই করতে হয়েছিল essentials first (প্রথমেই যা অপরিহার্য)। নিম্নলিখিত ক'টি অপরিহার্য বিষয় ও ঘাঁটি সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য আমরা এই ব্যবস্থা করলাম—

(১) টেলিফোন অফিস—

ত্রিপুরা সেনকে ভার দেওয়া হ'ল, সে টেলিফোন-টেলিগ্রাফ অফিসের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ সংগ্রহ করবে। বিশদভাবে তাকে শেখানো হ'ল কি ভাবে সে সংবাদ নেবে ও কি কি বিষয় সে নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করবে। কোন্ কোন্ সময় কতজন কর্মী বা অফিস বাবুরা থাকে; কখন তাদের shift; কোন্ shift-এ কতজন থাকে; কতগুলো দরজা, জানলা—তাদের আকার (size) কি? তাদের মধ্যে ক'টি কাচের, কাঠের এবং লোহার; ক'টি বারান্দা; প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে অন্য ঘরের কিরূপ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও তাদের উচ্চতা; বিজলীর আলো, পাখা, বিভিন্ন ফার্নিচার, সিঁড়ি, লন, কোয়ার্টার ইত্যাদি, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ঘরের ও টেলিফোন ট্রান্সমিশন যন্ত্র প্রভৃতির বিশদ খবর ও ঐ সবের eye sketch করে সে আমাদের দেবে। যদি ফটো তোলা প্রয়োজন মনে করে তবে তাও করবে। বিশেষ করে শিখিয়েছিলাম যেন সে আপাতদৃষ্টিতে প্রয়োজন নেই মনে করে অতি সামান্য ও তুচ্ছ জিনিসেরও বিশদ সংবাদ দিতে গাফিলতি না করে। আমরা তাকে ও অন্যান্য বন্ধুদের শিখিয়েছি ও বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে খুব তুচ্ছ সামান্য জিনিস ও অবস্থার সংবাদও বিশেষ প্রয়োজনে লাগতে পারে। একটি মাত্র ইট, ছোট একটি চারা গাছ, সিঁড়ির গা ঘেঁষে সরু একটি ছিদ্র একটা ফাটল তাও আমাদের বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আসতে পারে—কে জানে সেখানে আমরা একটা ইলেকট্রিক সুইচ, ফাটল জুড়ে ইলেকট্রিক তার, সরু ছিদ্রে ডিনামাইট বা গানকটন রাখার ব্যবস্থা করব না? আমাদের কি ধরনের বিশদ ও নিখুঁত সংবাদ প্রয়োজন ছিল তা ত্রিপুরার মত বিচক্ষণ যুবকের বুঝতে খুব সময় লাগে নি। তাকে সময় দেওয়া হয়েছিল পনেরো দিন। এরই মধ্যে পূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করার নির্দেশ ছিল।

(২) A. F. I. Hq.

সুবোধ চৌধুরীর ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল A. F. I. Hq. সম্বন্ধে সব রকম তথ্য নিখুঁতভাবে সংগ্রহ করবার এবং কি কি বিশেষ তথ্য আমাদের প্রয়োজন তা' তাকে আমরা বলেছি। তা'ছাড়া যত সামান্য খুঁটিনাটি বিষয় বা ক্ষুদ্র কোন জিনিসের অস্তিত্বই থাকুক না কেন, সব কিছুরই নিখুঁত সংবাদ 'ম্যাপ' সহ দেওয়ার জন্য তার ওপর নির্দেশ ছিল। ফটো তোলার প্রয়োজন থাকলে এবং সম্ভব হলে ফটোও তুলে আনবে। তারও সংবাদ সংগ্রহ করবার নির্দিষ্ট সময় ছিল পনেরো দিন।

A. F. I. Hq. সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদের প্রয়োজন ছিল। তার আর্মারীর দুটি দরজার সবিস্তার রিপোর্ট আমাদের চাই। এই দুটি দরজা খোলা বা ভাঙবার ব্যবস্থা না করলেই নয়। বলিষ্ঠ অতিকায় পাঠান রক্ষীরা এই A. F. I. Battalion Hq. পাহারা দিত। তা সত্ত্বেও তাদের পরাস্ত করে সুরক্ষিত গার্ডরুম দখল করা খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু গার্ডদের পরাস্ত করলেও আর্মারী খুলব কি করে? রাস্তা থেকে দেখে মনে হ'ত আর্মারীতে রক্ষিত ছিল কয়েকটি লুইস গান (এক ধরনের ছোট আগেকার দিনের মেশিন কামান, যা থেকে আড়াই সেকেণ্ডে ৪৭টি ·৩০৩ ব্যাসের টোটা 'ফায়ার' করা যেত); দশ শটের ম্যাগাজিন রাইফেল ও [illegible]। ঐ

অস্ত্রশস্ত্র আমাদের নেওয়া চাই। তাই দরজা খোলার সমস্যা আমাদের কাছে খুব বড় করে দেখা দিয়েছিল। সেই জন্য দুটি দরজার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর পাওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন ছিল। সুবোধ চৌধুরী রেলের ক্লাস কোয়ার্টারে থাকত এবং তার আসা যাওয়ার পথে এই Hq.টি পড়ত। কি করে এই Hq.টি অধিকার করবার জন্য প্ল্যান করা হ'ল, ঐ দুটি লোহার দরজা খোলা বা ভাঙবার জন্য নানা ধরনের বিকল্প ব্যবস্থা করা হ'ল তার সম্ভাব্য সবরকম তথ্যই আমরা আগে সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম।

(৩) পুলিশ লাইন—

পুলিশ লাইন—চট্টগ্রাম জেলার পুলিশ হেড কোয়ার্টার—যেখানে ব্যারাকে বন্দুকধারী পুলিশ থাকত। পাহাড়ে ঘেরা জায়গা। আর্মারী, ম্যাগাজিন, গার্ডরুম, এলার্ম ঘন্টি বাজাবার স্থান, সেপাইদের প্যারেড করবার মাঠ, অফিসার-ইন-চার্জের কোয়ার্টার প্রভৃতির বিস্তারিত সংবাদ গ্রহণের একান্ত প্রয়োজন। পুলিশ লাইনের অবস্থান একেবারে শহরের উপকণ্ঠে। কাজেই লোক চলাচল নেই বললেই চলে। পাব্‌লিকের যাতায়াত থাকলে খবর পাবার সম্ভাবনা ছিল। A. F. I. Hq. পাহাড়তলীর প্রধান রাস্তার ধারে, মাঠের মধ্যে অবস্থিত বলে পথ চলার সময়েও সামরিক রক্ষীদের ঘোরাফেরা, position, আর্মারী, গার্ডরুম, প্রভৃতি দূর থেকে লক্ষ্য করে একটা মোটামুটি আন্দাজ করা যেত। কিন্তু পুলিশ লাইন সম্বন্ধে আন্দাজ করা সম্ভব ছিল না তার পাহাড়ে ঘেরা এলাকার মধ্যে প্রবেশ না করে। পুলিশ লাইন ও A. F. I. Hq. সম্বন্ধে আমাদের বিস্তারিত নিখুঁত তথ্যের প্রয়োজন তো ছিলই তবু ঐ দুটি স্থানের চারপাশের অবস্থার সংবাদের গুরুত্বও কম ছিল না। A. F. I. Hq. খুব সুরক্ষিত। তবে সেখানে ব্যারাক ছিল না। A. F. I. সৈন্যরা আর্মারী সংলগ্ন কোন স্থানে স্থায়িভাবে থাকত না। চারপাশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে A. F. I. Hq.টি পুলিশ লাইনের অবস্থান থেকে সুবিধের ছিল। অর্থাৎ, আকস্মিক আক্রমণ করবার সুযোগ ছিল অনেক বেশি।

পুলিশ লাইনের তথ্য সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত দুঃসাধ্য বলে মনে হয়েছিল। গণেশ ও আমার এক সঙ্গে পুলিশ লাইনের সংবাদ সংগ্রহ করার ভার নিতে হ'ল। A. F. I. Hq.-এর ভার সুবোধ চৌধুরীর ওপর ন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে সে কাজ করে গেছে।

যখন পুলিশ লাইনের সংবাদ সংগ্রহের ভার আমাদের ওপর এসে পড়ল, তখন প্রথমে কাজ সুরু করবার আগে ব্যাপারটা দুরূহ ও প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। যে কোন শক্ত ও বিপদসঙ্কুল কাজের প্রারম্ভে ঐরূপ সম্ভব-অসম্ভব, আপদ-বিপদ, ভালমন্দ, পারা-না-পারা, নানা ভাবনায় মন অস্থির হয়। এই অভিজ্ঞতা ছিল, তাছাড়া মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে অনুভব করেছিলাম—যুবক বন্ধুরাও এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হবে। তাই তাদের এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে প্রথম থেকেই psychologically (মনস্তাত্ত্বিক-ভাবে) প্রস্তুত হতে সাহায্য করি। বলা বাহুল্য যখন অন্যদের psychologically প্রস্তুত হতে বলছি, তখন নিজেরাও মানসিক প্রস্তুতির দিক থেকে পিছিয়ে পড়তে চাই নি।

সংবাদ সংগ্রহ করতেই হবে। ভাবতে লাগলাম কি করা যায়! দুজনে মোটরগাড়ি করে ওয়াটার ওয়ার্কস কম্পাউণ্ডের ও পুলিশ লাইনের টিলার মাঝখান দিয়ে যে রাস্তা উত্তর দিকে গেছে, তা দিয়ে এগিয়ে গেলাম। সেইরূপভাবে আগেও অনেকবার আমরা গিয়েছি। কিন্তু গাড়িতে বা হেঁটে যাওয়ার সময় যেটুকু দেখা যায় বা বোঝা যায় তাতে পুলিশ লাইনের অস্তিত্বটাই মাত্র অনুভব করা সম্ভব। পুলিশ লাইনের মধ্যে ঢোকা প্রয়োজন এবং তাদের অফিস, গার্ডরুম, আর্মারী, ম্যাগাজিন, পুলিশের ব্যারাক, প্রভৃতির খোঁজ না পেলে এবং পুলিশের গতায়াতের বিষয় জানতে না পারলে যে আক্রমণের ট্যাকটিক্স্ ঠিক করা যাচ্ছে না! হাতে সময়ও বেশি নেই। সবাইকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য পনেরো দিন মাত্র সময় দেওয়া হয়েছে। একদিন, দুদিন, তিনদিন চলে গেল। আমরা অস্থির হয়ে উঠলাম। আগের দিন হলে হয়ত মায়ের কাছে কেঁদে প্রার্থনা জানাতাম, বলতাম—'মা তুমি মুখ ফিরিয়ে রইলে কেন? একটা উপায় কর মা!' কিন্তু এই সময়ে "মা'র" কথা মনেই পড়ে নি। এর আগেই আমি মা কালীর বিসর্জন দিয়েছি। বাধার সম্মুখীন হয়ে মায়ের কাছে কাঁদতে না বসে এবার নিজের পুরুষকারের ওপরেই নির্ভর করলাম। সমস্যা সমাধানের বাস্তব উপায় চিন্তা করতে লাগলাম।

মনে হতে লাগল যদি কোন সাধারণ কনেস্টবল বা ছোটখাট অ্যাসিস্টেন্ট ও সাব-ইন্‌স্পেক্টারকে হাত করতে পারি তবে হয়ত আমাদের সংবাদ সংগ্রহের কাজ সহজ হবে। জেলের সেপাইদের হাত করার অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যে আমরা কিছুটা লাভ করেছি। গ্রামে অন্তরীণ থাকার সময় থানার পুলিশ কনেস্টবলদের সঙ্গেও মেলামেশা করেছি। তাই সুযোগ করে পুলিশ লাইনের কোন কনেস্টবলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব না, তা' মনে হয় নি। তা হয়ত খুবই সহজ ছিল; কিন্তু ভাবছিলাম—যাকে মনোনীত করে আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রস্তাব করব সে যদি শেষ পর্যন্ত বাগ না মানে? সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্ল্যানের আভাস বুঝে নিয়ে সে আমাদের বিপদে ফেলতে পারে। কেবল তাই নয়—জেলা কর্তৃপক্ষ তৎপর হবে ও আমাদের সুযোগ না দিয়ে তারাই আক্রমণ করবে প্রথমে।

অন্য উপায় ভাবতে লাগলাম। ভিন্ন পথে চিন্তা পরিচালিত করলাম। আমাদের সংগঠনের কোন সভ্যের আত্মীয় বা বন্ধুর সঙ্গে পুলিশ লাইনের কারো আত্মীয়তা আছে কি না তার খোঁজ নিতে লাগলাম। সংগঠনের সভ্যদের কাছে নানা কথার ছলে জিজ্ঞাসাবাদ ও ব্যাপক অনুসন্ধান চালালাম। খোঁজ পেয়ে গেলাম কাজীমালী স্কুলের সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর একজন ছাত্রের বাবা—সঞ্জীববাবু পুলিশ লাইনের ইন-চার্জ। এই ছেলেটি আমাদের সঙ্ঘের কর্মী বীরেনের সঙ্গে পড়ত। বীরেনের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম, সে তার সঙ্গে প্রাথমিক বৈপ্লবিক কথাবার্তা বলেছে রিক্রুট করবার উদ্দেশ্যে। আমরা বীরেনকে বললাম ছেলেটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে দিতে।

সঞ্জীববাবুর ছেলের নাম আজ আমার মনে নেই। সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র কি বা তার বয়স? ছোটখাটো দেখতে। প্রথম দৃষ্টিতে খুব একটা আকর্ষণীয় বলে মনে হয় না। তবু যতটুকু আজ লিখতে গিয়ে মনে পড়ছে,

সে বিনয়ী নম্র ও মিষ্টভাষী ছিল। খুব চঞ্চল বলে মনে হয় নি। বিপ্লবী হওয়ার সব সুলক্ষণ ছিল কিনা তার, সে বিচার তখন আমরা করি নি; আমরা বুঝেছিলাম সে একটি ভাল ছেলে, আর তাকে দিয়ে আমাদের কাজ হবে সাময়িক ও খুব সামান্য। সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, গোপন রাখবে এবং তার সঙ্গে আমাদের নিয়ে যাবে পুলিশ লাইনটি পরিদর্শন করতে। পুলিশ লাইনের বিভিন্ন অবস্থান স্বচক্ষে দেখতে চাই, সে আমাদের মাত্র সেই-জন্য সাহায্য করবে।

সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য সফল করতে হলেও 'বালকের' মন তৈরি করতে হবে—তাকে নানাভাবে উদ্দেশ্য বুঝতে না দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে। তাই তাকে প্রেরণা দিয়ে বিপ্লব বোঝাতে চেষ্টা করলাম। সে যুগের হিংসাত্মক বিপ্লব সীমাবদ্ধ চিন্তার গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল। তাই সূক্ষ্ম যুক্তিতর্ক দিয়ে বিপ্লব-বাদ বোঝাবার মিথ্যা প্রয়াস আমাদের ছিল না। গণেশ ও আমি ভার নিলাম তাকে প্রস্তুত করবার। আমাদের প্রথম কাজ হ'ল তাকে বুঝিয়ে বলা সে যেন বীরেনকে বিভ্রান্ত করে। বলবে—বৈপ্লবিক সঙ্ঘে সে বর্তমানে যোগ দিতে প্রস্তুত নয়। আগে লেখাপড়া করবে ও পরে বড় হয়ে বুঝেসুঝে জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করবে।

বীরেনকে যথা সময়ে সে ঐরূপ বলে বিভ্রান্ত করল; আর আমরাও বীরেনকে বললাম—'একেবারে বাজে ছেলে। পুলিশের ছেলে কি কখনও ভাল হতে পারে?' বাস্তবে কিন্তু সঞ্জীববাবু—লাইন ইন্‌স্পেক্টর, অত্যন্ত ভাল লোক; একেবারে নিরীহ প্রকৃতির। যখন তাঁর ছেলের সঙ্গে আমরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তখন সঞ্জীববাবু সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। আমাদের মামলায় তাঁকে সরকারপক্ষ সাক্ষী দিতে হাজির করেছিল। তখন তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছি ও অভিভাবকদের কাছ থেকে তাঁর প্রশংসাই শুনেছি। তা' থেকে আমাদের তাঁর সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা হয়েছিল। সেই বেচারা কখনও জানতে পারেন নি যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থানে তাঁর ছেলের কতখানি অবদান আছে।

আমি আর গণেশ খুব গোপনে সঞ্জীববাবুর ছেলের সঙ্গে মিলতাম। বুঝতে চেষ্টা করতাম তার বাবার বা অন্য কোন পুলিশ অথবা পুলিশের বয়স্ক ছেলে বা আত্মীয়ের প্রভাব ওর ওপর আছে কি না! মনে হয়েছিল, না—একেবারে স্থির বুঝেছিলাম যে আমাদের প্রভাবই তখন তার ওপর সব চেয়ে বেশি কাজ করছিল। তবু তাকে আমরা আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে না দিয়ে পুলিশ লাইন ঘুরে দেখবার প্রস্তাব করলাম। লাইনবাবুর ছেলে—তাকে সবাই চেনে, যদি কেউ প্রশ্নও করে তবে তাদের আত্মীয় বলে সে আমাদের পরিচয় দেবে। এইভাবে "নাটকটি" ঠিক করা হ'ল। তারপর আমরা দু'-জনেই তার সঙ্গে রাত সাতটা-আটটার সময় পুলিশ লাইন দুই-তিন দিন ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করলাম। গার্ডরুম, আর্মারী ও ম্যাগাজিনের নানা প্রকার বিশদ খবর নিয়েছি তার কাছ থেকে। সে গণেশের হাতে পুলিশের ডিউটি চার্ট লেখা পাতা, খাতা থেকে ছিঁড়ে এনে দিয়েছে। কোন্ দিন কত পুলিশ লাইনে আছে তার খবরও তার কাছ থেকে পেয়েছি। সবই সে করেছে, তবু আমাদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারে নি। প্রথমতঃ, সে ছিল ছোট,

তাই তার অজ্ঞানতার সুযোগ নেওয়া আমাদের পক্ষে সহজ ছিল। দ্বিতীয়তঃ, তাকে বলা হ'ল ট্রেনিং-এর জন্য প্রত্যেক ছেলেরই সংবাদ সংগ্রহের কৃতিত্ব দেখাতে হবে। তাদের শিখতে হবে—কি করে সার্থকতার সঙ্গে সংবাদ সংগ্রহের কাজ করা যায়। এইরূপ কারণ দেখিয়ে তাকে কাজে লাগিয়েছি। তৃতীয়তঃ, কেউ বা কোন যুবকই সেদিন ভাবতে পারে নি যে বৃটিশের সৈন্য শিবির বা পুলিশ লাইন আমরা আক্রমণ করব। তাদের ধারণা ছিল যে আমরা বড় জোর ডাকাতি বা রাজনৈতিক হত্যা করব। এই কারণেই এই বালকটি আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারে নি।

এই উপায়ে পুলিশ লাইনের সংবাদ সংগ্রহের কাজ আমরা পনেরো দিনে সম্পন্ন করেছি।

শহরের সব ক'টি বন্দুকের দোকান সম্বন্ধে বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে সংবাদ সংগ্রহের ভারটি দেওয়া হয়েছিল রজত সেনকে। দোকানের strong room (সুরক্ষিত কক্ষ) সম্বন্ধে খোঁজ দেবে, কোথায় বা কার কাছে চাবি থাকে, ক'টি তালা, কত বারুদ এবং বিভিন্ন বোরের কত কার্তুজ আছে, কতগুলো কি কি ধরনের বন্দুক সেখানে থাকে, ইত্যাদির খবর নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বন্দুকের দোকানের সব রকম খবরেরই প্রয়োজন ছিল। কারণ, যদি কোন কারণে আমাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়—যদি পুলিশ ও A. F. I.-এর সৈন্য আমাদের প্রতি-আক্রমণ করে, তবে হয়ত আমাদের শেষ পর্যন্ত ব্রীচ-লোডার বন্দুকের উপরই নির্ভর করতে হবে।

তা'ছাড়া আমাদের পরিকল্পনায় ছিল, চট্টগ্রাম শহর দখল করে নেওয়ার পর আমরা সাময়িক বিপ্লবী গণতন্ত্র সরকার গঠন করব। এইরূপ অবস্থায় বিপ্লবী সৈন্য ভর্তি করা হবে। আমাদের যুবসমিতির ও ছাত্র-সংগঠনের যুবক ও ছাত্র দলে দলে এসে গণতন্ত্র সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেবে—এইরূপ ভরসা ছিল। যুব ও ছাত্র সমিতির Natural Leader যারা, তাদের মনোভাব আমরা জানতাম। তারা আমাদের দলকে প্রাধান্য দিত এবং সব সময় দেখেছি প্রকাশ্য আন্দোলনে আমাদের পক্ষে অংশ গ্রহণ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করেছিলাম যে আমাদের আর্মারী আক্রমণের পরের দিন, ১৯শে তারিখ, সকাল থেকেই হয়ত সক্রিয় ছাত্র ও যুবকদল ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীতে যোগ দিতে আসবে। সেই ক্ষেত্রে তাদের অস্ত্র সরবরাহের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার। রাইফেল ও পুলিশ মাস্কেট আমাদের করায়ত্ত হলেও প্রয়োজন অনুপাতে তা' দিয়ে বিপ্লবী নওজোয়ানদের চাহিদা হয়ত মেটানো যাবে না। সেই কারণে বন্দুকের দোকান তিনটির, বিশেষ করে শহরের এই বড় দোকানটির, বিশদ খবর আমাদের প্রয়োজন ছিল। রজত সেনকে ভালভাবে দায়িত্ব বুঝিয়ে এই ভারটি দিই এবং পনেরো দিনের মধ্যে তাকে রিপোর্ট করবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

চট্টগ্রামকে বাংলার অন্যান্য জেলা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য আমরা রেল লাইন দুটি জায়গায় উপড়ে ফেলবার পরিকল্পনা করেছিলাম। এই অপরিহার্য পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্য সংবাদ চাই। সেই জন্য চট্টগ্রাম স্টেশন থেকে সুরু করে লাকসাম জংসন পর্যন্ত, প্রায় আশি মাইল, ভালভাবে পরিদর্শন করার ব্যবস্থা করলাম। এই আশি মাইল রেল

লাইনের বিস্তারিত ও বিশদ সংবাদ সংগ্রহের পর সুবিধাজনক দুটি স্থান বেছে নেব ট্রেন লাইনচ্যুত করবার জন্য। এই উদ্দেশ্যে কোন বাধার সম্মুখীন না হয়ে ট্রেন লাইনচ্যুত করার জন্য তথ্য সংগ্রহের কাজ প্রথমে না হলেই নয়।

এই আশি মাইল রেল লাইন পরিদর্শনের জন্য দু'জন করে দুটি যুগ্ম গ্রুপ গঠন করা হ'ল। একটি গ্রুপে শঙ্কর ও আর একজন, অন্যটিতে হারান ও তার সঙ্গী। এক গ্রুপকে অন্য গ্রুপের অসাক্ষাতে আমাদের প্রয়োজন বুঝিয়ে লাইন পরিদর্শন করবার নির্দেশ দেওয়া হ'ল। তারা পায়ে হেঁটে যাবে এবং দিনের ও রাত্রের অবস্থা কোন্ স্থানে কিরূপ থাকে সেই রিপোর্টটিও সংগ্রহ করবে।

পরিদর্শনের ফলাফল ও তাদের তৈরি নক্সা থেকে আমাদের বোঝাবে ট্রেন লাইনচ্যুত করবার জন্য কোন্ দুটি স্থান তারা সর্বাপেক্ষা সুবিধের বলে মনে করছে। তারপর আলাদা ভাবে তাদের সঙ্গে বসে আলোচনা করার পরই চূড়ান্তভাবে স্থির করা সম্ভব—কোথায় রেল লাইন ধ্বংস করা হবে। ট্রেন লাইনচ্যুত করে বিশেষ করে সৈন্যবাহী ট্রেনের গতিরোধ করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।

আমাদের আকস্মিক আক্রমণ ও জয়ের শেষে সফলতার সঙ্গে প্রতিরোধ-ব্যূহ রচনা করবার স্ট্রাটেজীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল ট্রেন লাইনচ্যুত করা। তাই যাদের এই দায়িত্ব দেওয়া ঠিক হয়েছিল তাদের সামরিক স্ট্রাটেজীর গুরুত্বও বুঝিয়েছি। তারা বুঝেছিল, যদিও তাদের সামনাসামনি যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ নেই, তবু এইটি হ'ল টোটাল স্ট্রাটেজীর (সামগ্রিক রণনীতি) অনিবার্য গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ।

আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বিপ্লবী যুবকদের মনস্তত্ত্ব বুঝবার চেষ্টা করেছি সব সময়। তাদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে উদাসীন থাকা চলে না। বুঝে-ছিলাম তাদের আবেগভরা মনের সাড়া—'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারই লাগি তাড়াতাড়ি!' কে কোন্ আগ্নেয়াস্ত্র নেবে, অর্থাৎ যোগ্যতা অনুযায়ী কে ব্রীচলোডার বন্দুক, পিস্তল বা রিভলভার ব্যবহারের সুযোগ পাবে? কে আক্রমণের জন্য যাবে, কার দ্বিতীয় সারিতে স্থান নির্দিষ্ট হবে—এই নিয়েই যুবক বিপ্লবীরা চিন্তা করত। যদি আশানুরূপ কর্মক্ষেত্র বা অস্ত্র তার জন্য নির্ধারিত না হ'ত, তবে তার মনে যে হতাশা আসবার সম্ভাবনা সে বিষয়ে আমরা সচেতন ছিলাম। এই সমস্যা বাস্তবরূপেও দেখা দিয়েছিল। তাই অঙ্কুরে তার বিনাশ সাধন করবার জন্য রণনীতি ও রণকৌশল সম্বন্ধে তাদের মধ্যে সাধারণ ধারণা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছি। তাছাড়া সক্রিয় সামরিক ট্রেনিং ও আমাদের নিজস্ব ট্রেনিং-পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের মনে বিশ্বাস জন্মাতে পেরেছিলাম যে ব্রীচলোডার বন্দুক, হকি স্টিক, এমন কি ঘুষি ও যুযুৎসু, প্রভৃতির যথাযথ প্রয়োগ করতে জানলে রিভলভার বা পিস্তলের অভাব তারা অনুভব করবে না।

দায়িত্ব উপলব্ধি করে হাসিমুখে তারা রেল লাইন পরিদর্শনে চলে গেল এবং সব তথ্য সংগ্রহ করে পনেরো দিনের মধ্যেই রিপোর্ট দিয়েছে।

অন্যান্য ঘাঁটি সম্বন্ধে বহু পূর্ব থেকেই আমাদের সাধারণ রিপোর্ট

ছিল। জেল ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আমরা আর বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করতে কাউকে নিয়োগ করি নি। তার কারণ, প্রথমতঃ, আমাদের লোকবল ও অস্ত্রবল যা' ছিল তার ওপর নির্ভর করে এই দুটি টার্গেট প্রথম আক্রমণের পর্যায় থেকে বাদ দিয়েছিলাম। দ্বিতীয়তঃ, আমরা স্থির জানতাম যে এই দুটি স্থান থেকে সরকার কোনমতেই সশস্ত্র প্রহরী সরাতে পারবে না। তৃতীয়তঃ, আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল যে যদি আমরা শত্রুর প্রধান দুটি ঘাঁটি সম্পূর্ণভাবে দখল করতে পারি তবে এই সব ছোট ছোট কেন্দ্রগুলি বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করবে। আমরা মেগাফোনে আত্মসমর্পণ করবার আদেশ ঘোষণা করলে মুহূর্তে তারা যে তা' পালন করবে তাতে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না।

এইরূপ বাস্তব ধারণার উপর ভিত্তি করে আমাদের লোকবল ও অস্ত্রবলের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অন্যান্য ছোট ছোট কেন্দ্রগুলিকে প্রথম আক্রমণের লক্ষ্য বলে মনে করি নি।

কিন্তু পাহাড়তলী ওয়ার্কশপে ও ডবল মুরিং জেটিতে যে দুটি অস্ত্রাগার ছিল সে দুটি সম্বন্ধে আমরা উদাসীন ছিলাম না। সেই দুটি অস্ত্রাগারের নিখুঁত সংবাদ আমাদের আগে থেকে জানা ছিল। সুবোধ চৌধুরী রেলের ক্লাস কোয়ার্টারে থাকত তাই তার পক্ষে এই অস্ত্রাগার সম্বন্ধে জানা খুব সহজ ছিল। তা' ছাড়া এই আর্মারীর তথ্য আমাদের খুব ভালভাবে জানা ছিল। তার কারণ আমার দাদা, শ্রীনন্দলাল সিং, সেই ওয়ার্কশপে কাজ করতেন। তাঁর কাছ থেকে অনেক আগেই সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল।

ডবল মুরিং জেটি সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ছেলে, ননী দেব আমাদের সশস্ত্র আক্রমণে অংশ গ্রহণ করেছিল; বহু আগে থেকেই তার মারফত আমাদের এই অস্ত্রাগার সম্বন্ধে সব খবর জানা ছিল। অভ্যুত্থানের পর যখন আমাদের মামলা চলছিল তখন ও পরে অনেকের কাছে মন্তব্য শুনেছি যে ডবল মুরিং জেটির অস্ত্রাগার সম্বন্ধে আমরা কোন খোঁজ রাখি নি, তাই ১৮ই এপ্রিল রাত্রেই জেলাশাসকগোষ্ঠী প্রতি-আক্রমণ করবার সুযোগ পায়। যাঁরা এই দুটি বাস্তব তথ্য জানতেন না তাঁদের সেইরূপ ভুল ধারণা হওয়া খুবই সম্ভব। তাঁরা জানতেন না আমাদের অস্ত্রবল ও লোকবলের সঠিক অবস্থা—আর জানতেন না যে এই দুটি অস্ত্রাগারের খবর আমাদের একেবারে নখদর্পণে ছিল।

তারপর অনেকের ধারণা যে আমরা সমুদ্রগামী জাহাজের বেতারযন্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলাম। সমুদ্রগামী স্টীমারের বেতার ব্যবস্থা সম্বন্ধে সাধারণ লোকও অবিদিত নন। চট্টগ্রাম বন্দরে সচরাচর ক'টি জাহাজ থাকে ও ক'টিতে বেতার যন্ত্র আছে তার সংবাদ সংগ্রহ সুকঠিন কাজ ছিল না। তা' ছাড়া আক্রমণের ঠিক ধার্য সময়ে বেতারযন্ত্র ধ্বংস করা মোটেই একটা কঠিন কাজ নয়। প্রথম সারির একটি বিপ্লবী সৈনিককে যদি এই কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব হ'ত তবে মাত্র একটি বোমার সাহায্যে সে এই ছোট্ট কাজ সফলতার সঙ্গেই করত। স্টীমারে বেড়াতে যাওয়া খুব কঠিন কাজ ছিল না। তবে কেন আমরা স্টীমারের বেতারযন্ত্র বিকল করতে কোন ব্যবস্থা করি নি?

থিওরীতে আমাদের সব জানা থাকা সত্ত্বেও সেইরূপ ব্যবস্থা না করতে

পারার একটিমাত্র কারণ—আমাদের প্রথম পর্যায়ের শত্রুঘাঁটিগুলি আক্রমণের ব্যবস্থা করার পর ফার্স্ট র‍্যাঙ্কিং (প্রথম সারির) উপযুক্ত কর্মী আর কেউ বাকি ছিল না বা পর্যাপ্ত পরিমাণে অস্ত্রের ব্যবস্থাও আমরা করতে পারি নি।

নির্বিচারে ইংরেজ হত্যার প্রোগ্রাম—ঝটিকা বেগে আকস্মিক আক্রমণে চট্টগ্রাম শহর দখল করে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠন করার যে রণ-নীতি, তার সঙ্গে এইরূপ নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রোগ্রামের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। তবু প্রতিহিংসার বদলে প্রতিহিংসা; নির্দয় নরহত্যার বদলে তাণ্ডব হত্যালীলা; ক্ষমাহীন, দয়াহীন, মায়াহীন নরমেধ যজ্ঞে নির্মম প্রতিশোধ নেওয়ার প্রোগ্রাম আমাদের আক্রমণ প্ল্যানের অঙ্গীভূত হয়েছিল। এই সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তখনও নেওয়া হয় নি।

তবু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ, 'ক্লাবগৃহ' ও সেখানে উচ্চপদস্থ সাহেবদের গতিবিধি সম্বন্ধে বিশদ সংবাদের আমাদের প্রয়োজন ছিল। ক্লাব গৃহটি ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অবস্থান পরিদর্শন এবং সংবাদ সংগ্রহের জন্য আমরা বাছাই করে নরেশ রায়কে দায়িত্ব দিয়েছিলাম।

আমাদের পরিকল্পনা ছিল—পালাবার পথ রুদ্ধ করে বোমা, বন্দুক, রিভলভার প্রভৃতি দিয়ে আকস্মিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ক্লাবে মিলিত ইংরেজদের ওপর আক্রমণ চালাব। জালিয়ানওয়ালাবাগের পাশবিক নরহত্যার উপযুক্ত জবাব দেব। বড় ফলাওয়ালা কুঠার, ভোজালী ও তরবারি দিয়ে নির্বিচারে মরা-আধমরা সাহেবদের অতি নির্দয়ভাবে খণ্ড-বিখণ্ড করব। আজ শুনে সবাই হয়ত মনে করবেন, এ আমাদের বড় বাড়াবাড়ি। এতটা আবার সভ্যতা বিরোধী। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ—ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ভারতবর্ষ কখনও বিসর্জন দিতে পারে না। এই নীতি-কথা শুনে শুনে আমাদের কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল। আমরা বৃটিশ সরকারের নিষ্ঠুর নির্মম পাশবিক অত্যাচারের জবাবে যীশুখৃস্টের বাণী, শ্রীচৈতন্যের প্রেম বা গৌতম বুদ্ধের 'জীবে দয়া' প্রচার করা নিষ্ফল মূর্খতা বলে মনে করেছিলাম। বৃটিশ, তাদের মিশনারী মারফত যীশুর ধর্ম প্রচার করে ভারতবাসীকে 'জীবে দয়া' ও প্রেমের বাণী শেখাতে চেষ্টা করছে; আর অন্য দিকে বৃটিশ শাসন বজায় রাখার জন্য কামান, বন্দুক প্রভৃতি আমদানী করে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। প্রেম, ভালবাসা, মায়া প্রভৃতি ভারতবাসী যত পারে শিখুক, কিন্তু যীশুর সেবক ইংরেজদের অবাধ অধিকার রইল ভারতবাসীর ওপর চরম নির্যাতন চালাবার।

ইংরেজ দস্যু ভারতবর্ষকে শাসন ও শোষণ করতে এসেছে। ভারতবাসীর ওপর প্রভুত্ব বজায় রাখবার জন্য সভ্যতার আদর্শের খাতিরে তারা কখনও চরম নৃশংসতা থেকে বিরত থাকে নি। 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী', ধর্মের ভয়ে বৃটিশ শত্রুদের ক্ষমা করা আমাদের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। 'কাকুতি' 'মিনতি' 'ধর্ম' 'ক্ষমা' প্রভৃতি আপন দুর্বল মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার পক্ষে প্রযোজ্য, কিন্তু অত্যাচারী বিদেশী সরকারের নির্মম নিষ্পেষণের কাছে তা হাস্যাস্পদ—তারা অন্যের অগোচরে ভারতবাসীর মূর্খতার প্রশংসা করেছে, কিন্তু ধর্মভীরু ভারতবাসীর ধর্মপ্রাণের বিশালতাকে কখনও মর্যাদা দেয় নি। তাই প্রবল বৃটিশ শত্রু বুঝুক আমরা তাদের অত্যাচারের

বিনিময়ে সনাতন ধর্মের বাণী প্রচারের জন্য আর প্রস্তুত নই—তাদের বুকের তপ্ত শোণিতে তর্পণ করব—তাদের মনে প্রাণেও বিভীষিকার সৃষ্টি করব!

এই দৃষ্টিভঙ্গীই সেই যুগে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে নির্বিচারে ইংরেজ হত্যার সক্রিয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে। তাই 'ক্লাব গৃহটি'র সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ—দরজা, জানলা, বারান্দা, টেবিল, চেয়ার, ঘর, রান্না-ঘর, স্নানের ঘর, লোকজন, ইলেকট্রিক বাতি ও পাখা, সুইচ বোর্ড, আসা যাওয়ার বিভিন্ন পথ প্রভৃতির সব খবরই প্রয়োজন। তা' ছাড়া জেলা-প্রধানেরা কখন আসে, কতক্ষণ থাকে, কে কোন্ গাড়ি ব্যবহার করে, কতজন লোক, পাহারার কিরূপ ব্যবস্থা, বডিগার্ড থাকে কি না, কেউ রিভলভার পিস্তল সঙ্গে রাখে কি না—ইত্যাদি অনেক খবর চাই।

আমাদের মত নরেশেরও বেশ অভিজ্ঞতা হ'ল। প্রথমে তার কাছে যেন সব অন্ধকার! ইউরোপীয়ান ক্লাব —শহরের এক প্রান্তে। বড় বড় ইংরেজ মার্চেন্ট ও জেলা-প্রধানদের সমাগম এই ক্লাবে। এই এলাকায় কোন বাঙালীর যাতায়াতের কারণ ছিল না। বিশেষতঃ অপ্রত্যাশিত বাঙালী যুবকের গতি-বিধি যে সহজেই সন্দেহের উদ্রেক করবে তাতে অনিশ্চয়তার কিছু ছিল না। তবু নরেশের সেখানে যেতে হবে তথ্য সংগ্রহ করতে।

হিন্দু যুবকের বেশে সেখানে যাওয়া নরেশ যুক্তিযুক্ত মনে করে নি। একজন সাধারণ মুসলমানের বেশে সে সন্ধ্যার সময় ক্লাবের কাছে গেল। বিভিন্ন মোটর গাড়ির ড্রাইভারদের সে দূর থেকে দেখতে পায়। তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারে; সে কিন্তু হিন্দু। সেই ড্রাইভারের বাড়ীও ময়মনসিং জেলার একটি গ্রামে—নরেশের বাড়ীর কাছে। মুসলমাল বেশে নরেশকে দেখলে তার পাছে সন্দেহ হয় তাই নরেশ দূরে সরে গেল।

নরেশ বুদ্ধি আঁটলো এই ড্রাইভারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে খাতির করে নেবে—অবশ্য মুসলমান পোষাকে নিশ্চয়ই নয়। দু-একদিনের মধ্যে সফলতার সঙ্গে নরেশ ড্রাইভারের সাথে মিশে গেল এবং উদ্দেশ্য গোপন রেখে সাহেবদের 'বল ডান্স' প্রভৃতি দেখল। দিনে ও রাত্রে ড্রাইভারের সঙ্গে ক্লাব ঘর ঘুরে ঘুরে সব তথ্য সংগ্রহ করল। পনেরো দিনের মধ্যে নরেশ তার রিপোর্টও দাখিল করল।

আমাদের প্রিন্টেড জাজমেন্ট কপির ৭৩ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করছি—

"Naresh Roy was wearing a khaki shirt, khaki shorts and stockings (Ex. CCLI series). In his pocket were found two plans of the European Club, Chittagong [Ex. LVIII and LVIII (I)] showing the position of all the rooms, doors and windows. Hem Gupta showed them on the hill to Mr. Lowis (P.W. 23) and Mr. Johnson (P. W. 21)."

হেম গুপ্ত, সাব-ইন্‌স্পেক্টার, জালালাবাদ যুদ্ধে ধৃত নরেশ রায়ের পকেট হতে ইউরোপীয়ান ক্লাব ঘরটির দু'টি নক্সা উদ্ধার করেছিল। তাতে বেশ দেখানো ছিল—ক'টি ঘর, দরজা ও জানলা আছে এবং ঐগুলির অবস্থান, অর্থাৎ, কোন্ ঘরটির সঙ্গে আর একটি কিভাবে সংলগ্ন এবং জানলা দরজা

আক্রমণ করবার সময় কিভাবে সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহার করা যায়, ইত্যাদির উল্লেখ ছিল। জজসাহেব সেই নক্সাই নরেশ রায়ের পকেটে পাওয়া গেছে বলে লিখলেন।

চট্টগ্রাম শহর দখল করা ও সেখানে ভারতের প্রথম অস্থায়ী বিপ্লবী গণতন্ত্র সরকার স্থাপন করার প্ল্যানটি জেলে থাকার সময় থেকে সাধারণভাবে গণেশের মাথায় ছিল। তারপর যখন আমরা চূড়ান্তভাবে প্ল্যানটিকে কার্যকরী করে তুলতে চাইলাম, তখন অনিবার্য প্রয়োজনের তাগিদে প্রথমেই সমস্ত প্রধান প্রধান সামরিক ও পুলিশঘাঁটি এবং তৎসংশ্লিষ্ট ছোটখাটো পুলিশ ফাঁড়ি, বন্দুকের দোকান, ব্যাঙ্ক, জেল প্রভৃতির অত্যাবশ্যক বিশদ সংবাদ সংগ্রহের কাজে হাত দিলাম। পনেরো দিনের মধ্যেই এই সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন গ্রুপকে দায়িত্ব দেওয়া হ'ল, তা আগেই বলেছি। প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের লোকবল ও অস্ত্রের সংখ্যাও জানা আছে। 'লোকবল' বলতে বুঝতে হবে—

(ক) কতজন সভ্য প্রথম আক্রমণ করার জন্য প্রথম সারিতে অংশ গ্রহণের উপযুক্ত।

(খ) কতজন দ্বিতীয় সারির উপযুক্ত সভ্য।

(গ) কতজন আক্রমণের সময় খুব কাছাকাছি স্থানে রিজার্ভ ফোর্সে অংশ গ্রহণ করার জন্য তৃতীয় সারির উপযুক্ত সভ্য।

(ঘ) কতজন মিলিটেন্ট (তেজী) যুবক ও ছাত্র যুদ্ধ জয়ের পর প্রথম আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গেই এসে বিপ্লবী গণতন্ত্র বাহিনীতে যোগ দেবার মত চতুর্থ সারির উপযুক্ত সভ্য।

প্ল্যানটিকে চূড়ান্ত রূপ দিতে প্রধানতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় সারির বিপ্লবী যুবকদের সংখ্যার উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। গোপনে পর্যাপ্ত পরিমাণে অস্ত্র যোগাড় করার আর বেশি সময় ছিল না বলে তখন পর্যন্ত আমরা আর বেশি অস্ত্র যোগাড় করতে পারি নি। যা ছিল তার উপর নির্ভর করেই আমাদের গণতন্ত্র বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে কেবলমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় সারির যুবকদের সজ্জিত করা সম্ভব হয়েছিল।

তৃতীয় সারির যুবকদের, আক্রমণ ও অস্ত্রাগার দখল করার আগে কোন প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া সম্ভব হয় নি। কাছাকাছি স্থানে তাদের বিভিন্ন ছোট ছোট দলে ভাগ করে গোপনে তৈরি রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সব গোপন স্থান ছিল আক্রমণ করার ঘাঁটির চারপাশে। তন্নতন্ন করে পরি-দর্শন করার পরই চূড়ান্তভাবে স্থির করতে হয়েছিল কাদের বা কোন্ দলটিকে যোগ্যতা অনুযায়ী কোথায় থাকার ব্যবস্থা করা হবে।

চতুর্থ সারির যুবকদের সংখ্যা আমাদের আন্দাজে প্রায় পাঁচশত হবে বলে মনে হয়েছিল। কোন বাস্তব ভিত্তি ছাড়া এইরূপ আন্দাজ আমরা করি নি। সব সময় আমাদের সঙ্গে যুব সংগঠনে, শক্তিচর্চার ক্লাবে, প্রদর্শনীতে, ভলান্টিয়ারদের শিক্ষাশিবিরে, কংগ্রেসের নির্বাচন দ্বন্দ্বে ও বিভিন্ন সময় গুণ্ডাদমন ব্যাপারে যে সব ছাত্র ও যুবকদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে দেখেছি তাদেরই অগ্রণী অংশকে বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীতে পাব বলে অনুমান করেছিলাম। তাই তাদের সংখ্যার আন্দাজ পাওয়াটা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন ছিল না।

চট্টগ্রাম শহর দখল করার পর প্রথম দিন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই সংখ্যায় ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীতে সৈন্য ভর্তি করা, অস্ত্রাদি দিয়ে তাদের সুসজ্জিত করা ও তাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রচুর ও খুব কঠিন কাজ। তার জন্যও আমাদের একটা মোটামুটি ধারণা ছিল ও মনে মনে তারও একটা খসড়া করে রেখেছিলাম।

চূড়ান্তভাবে সামগ্রিক প্ল্যানটির রূপ দেওয়ার সময় আমাদের মধ্যে দুটি বিষয়ে মতভেদ দেখা দিল। প্রথম প্রশ্নটি উঠল স্ট্রাটেজী নিয়ে—সম্পূর্ণভাবে শহর দখল করার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করব, না কি এই মূল স্ট্রাটেজীতে খুঁত রেখে দিয়েও, ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করবার জন্য একটি প্রবল শক্তিশালী নির্ভীক যুবক দল deploy (অন্যত্র নিযুক্ত) করা হবে?

আমার বক্তব্য ছিল, স্ট্রাটেজীক্ প্ল্যান (চূড়ান্তভাবে শহর দখল) করার মধ্যে কোনরূপ খুঁত যেন না থাকে। আমার বন্ধু গণেশ নিজে স্ট্রাটেজীক্ প্ল্যানের স্রষ্টা। আমার চিন্তাধারা ছিল "গেরিলা যুদ্ধ" চালিয়ে যাওয়া ও যতদিন পারা যায় চট্টগ্রামের পর্বতশ্রেণী আমাদের Base (প্রধান ঘাঁটি) হিসাবে ব্যবহার করা। আজকের দিনে ভাবলে হয়ত শেষের প্রস্তাবটি অনেকের ভাল লাগবে। কিন্তু সেইদিন আমি গণেশের সঙ্গে আলোচনা করে তার প্রস্তাবেই একমত হয়েছিলাম। অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করা, যতদিন পারা যায় তাকে রক্ষা করা এবং শেষ পর্যন্ত TO DIE AT THE POST (নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে মরা)। গণেশের কাছ থেকে এই প্ল্যানটি শুনে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কী চমৎকার! একসঙ্গে তৈরি হ'লাম, একসঙ্গে আক্রমণ চালালাম, জয়ী হলাম, বিপ্লবী অস্থায়ী সরকার স্থাপিত হ'ল, চট্টগ্রাম শাখার ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনী তাকে রক্ষা করবে যতদিন পারে—তারপর একসঙ্গে দাঁড়িয়ে মরবে তাদের নিজ নিজ POST-এ! একসঙ্গে এসেছিলাম—একসঙ্গে একটি দুর্ধর্ষ বিপ্লবী দল সৃষ্টি করেছিলাম—একসঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিলাম, কেউ আর বেঁচে রইল না! বেঁচে থাকার প্ল্যান থাকলেই পেছু টান থাকবে, তারপর কে জানে বেঁচে থেকে কে কি করবে? কে কোথায় যাবে? এই প্ল্যানে দুর্বলতার সুযোগ কারো থাকবে না। যার বিশ্বাসঘাতক হওয়ার সম্ভাবনা সেও মরবে একসঙ্গে। দু'জনে একমত হয়ে মাস্টারদাকে গিয়ে গণেশের প্ল্যানটি বলেছিলাম। মাস্টারদাও বিনা দ্বিধায় তা' সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছিলেন।

সেদিন গণেশ বলল যে, ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতেই হবে, এতদিনের বৃটিশ অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতেই হবে। তারা যেন ভাবতে না পারে "কালা আদমীরা নিজেরা লড়াই করে মরছে—আমাদের গায়ে হাত তুলতে তারা সাহস পাবে না।" তাই মরুক, গণেশের দাবি ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনাটিকেও আমাদের সামগ্রিক প্ল্যানের অঙ্গীভূত করতে হবে। সেইজন্য আমরা যদি শত্রুঘাঁটি সবগুলিকে প্রথম চোটে আক্রমণ করতে নাও পারি তবুও আমাদের প্ল্যানে "ইউরোপীয়ান নিধন যজ্ঞ" যোগ করতেই হবে।

আমার মতে এই "নিধন যজ্ঞ" আরম্ভ করব পরে—আগে নয়। সব শত্রুঘাঁটি আগে আক্রমণ করে দখল করব—স্ট্রাটেজীক্ প্ল্যানে কোন খুঁত

রাখব না—যতদূর সম্ভব তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে প্রথমে। যদি আমাদের সব চেয়ে বাছাই করা দশ-বারোজনের সশস্ত্র একটি গ্রুপ ক্লাবে পাঠাতে হয়, তবে আমরা আর ডবল মুরিং জেটি (চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দরের একটি অংশ) ও পাহাড়তলীর অস্ত্রাগার দুটি আক্রমণ ও দখল করার পরিকল্পনা প্রথম আক্রমণ তালিকার অংগীভূত করতে পারছি না। গণেশ এই দুটি অস্ত্রাগার আক্রমণের ব্যবস্থা পরে করতে রাজী কিন্তু "ইউরোপীয়ান নিধন যজ্ঞ" প্রথম তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই কথাই সে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে লাগল।

আমাদের দুজনের চিন্তা দুটি ভিন্ন ধারায় বইছে। মন থেকে কোন মতেই গণেশের যুক্তি মানতে পারছিলাম না। মাস্টারদা, অম্বিকাদা, নির্মলদা আমাদের এইরূপ গুরুতর প্রশ্নে মতভেদ দেখে খুব অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। আমরা কেউই এই মূল প্রশ্নে আপোষ করতে চাইছিলাম না। এই প্রশ্ন নিয়ে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হ'ল তিন দিন ধরে অনেক সময় নিয়ে। আমাদের মধ্যে এরূপ গুরুতর আলোচনা ইতিপূর্বে বা পরে আর কখনও হয় নি। একেবারে শেষ সময়—আক্রমণের মাত্র কয়েকদিন আগে এই ধরনের স্ট্রাটেজী নিয়ে আমার ও গণেশের মতভেদ সবাইকে খুব বিচলিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবু সমস্যার সমাধান না করলেই নয়। তাই আলোচনা চলল।

গণেশের প্রধান যুক্তি হ'ল—নিখুঁতভাবে, কোন বিচ্যুতি ছাড়া প্ল্যান অনুযায়ী সমস্ত ঘাঁটি ও শহর দখল করা যাবেই—এইরূপ নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী আমরা কেউই করতে পারছি না। একেবারে ত্রুটিহীন জয়ের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে যখন ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না, তখন সেইরূপ অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃষ্টি রেখে প্ল্যানের প্রথম আক্রমণ তালিকা থেকে দু'শ বছরের ইংরেজ নৃশংসতার 'উপযুক্ত প্রতিশোধ ব্যবস্থা' কোন মতেই বাদ দেওয়া যায় না। গণেশের মতে, ধূর্ত ইংরেজ যদি একবার সচকিত হয়ে যায় তবে তাদের খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য হবে। তাই প্রথম চোটে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আক্রমণ করলে তাদের সবাইকে আমরা একসংগে একস্থানে, ইউরোপীয়ান ক্লাব গৃহে পাব। তবেই চারিদিক দেওয়ালে ঘেরা, বন্ধ-দুয়ার, জালিয়ানওয়ালাবাগের হাজার ভারতবাসীর হত্যার বদলা নিতে পারব ইংরেজের বুকের রক্তে!

এই প্রস্তাবে যেমন যুক্তি ছিল, তেমনি আবার ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও প্রতিহিংসার sentiment-ও (ভাবপ্রবণতা) প্রকাশ পাচ্ছিল এ কথা সত্য। কিন্তু সে যুগের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজের বিরুদ্ধে এই প্রতিশোধপরায়ণ ভাবপ্রবণতাও আর একটি যুক্তি; একে ভাবপ্রবণতা বলে আজ যাঁরা অস্বীকার করতে চাইবেন আমার মনে হয় তাঁরা ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের ক্রমবিকাশের ধারাটিকেই অস্বীকার করবেন।

তবু কিন্তু তখন আমার মন কোনমতেই গণেশের এই প্রস্তাবে সায় দিতে চায় নি। হতে পারে আমি একেবারে obsessed, অর্থাৎ, এই মনোভাবে আচ্ছন্ন ছিলাম যে, আক্রমণ একেবারে ত্রুটিহীন হবে, সব ঘাঁটি দখল করতে

পারব এবং শত্রুকে ঝটিকাবেগে আকস্মিক আক্রমণ করে প্রথম চোটেই পর্যুদস্ত করতে পারব।

মাস্টারদা আমাকে বহুবার একান্তে ও অনেকের সামনে জিজ্ঞাসা করেছেন—"তুই রেল কোম্পানীর অর্থ লুঠ করার সময় যেভাবে জোর দিয়ে বলেছিলি তেমন দ্বিধাহীনভাবে আমাদের সামগ্রিক আক্রমণের জয় সম্বন্ধে একবারও কি সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারিস?" আমি প্রত্যেকবার মাস্টারদাকে বিশেষ জোরের সঙ্গে উত্তর দিয়েছি—"আমার নিজের মুখ যেমন স্পষ্ট দর্পণে দেখি, ঠিক তেমনি, চোখের সামনে দেখছি প্রথম আক্রমণে আমরা জয়ী হবই। প্রত্যেকটি শত্রুঘাঁটি আমরা দখল করতে পারবই—এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে আমি বলতে পারছি না এই প্রথম জয়ের পর ঘটনার গতি কি মোড় নেবে! পরের অবস্থা এখন থেকে সঠিক বলা যাচ্ছে না। কারণ, আমাদের মধ্যে দুর্বল চিত্তের যুবকও আছে।"

মাঝে মাঝে গোপন বৈঠকে মাস্টারদা ও গণেশের কাছে আমাদের মধ্যের দু'জন যুবক সভ্যের মানসিক দুর্বলতা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি। আক্রমণের ঘাঁটিগুলির গুরুত্ব অনুযায়ী কার কতখানি যোগ্যতা আছে—বিচারের কষ্টিপাথরে তা' আমরা যাচাই করে দেখেছি। সেই সময় এই দু'জন সম্বন্ধে আমার সুনিশ্চিত মত জানিয়েছিলাম যে, জীবিত ধরা পড়লে তারা যে স্বীকারোক্তি দেবে না, তা' আমি বলতে পারছি না। তবে আমি খুব জোরের সঙ্গে প্রতিবারই জানিয়েছি যে বর্তমানে তারা পুলিশের চর নয় এবং আগে থেকে যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না সেই সম্বন্ধে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ। আমাদের সবার কাছে সেই কথাটি ছিল প্রথম—আগে ধরা পড়ছি না তো?

ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর এতজনের মধ্যে যদি কেউ জীবিত ধরা পড়ে, তখন যে যাই করুক না কেন তাতে সফলতার কোন ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। পরের অধ্যায়ে এমনও হতে পারে যে, কেবল তারা দু'জন অথবা তাদের মধ্যে কেউই নয় বরং অন্য কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করবে। বলা বাহুল্য, সেইরূপ অবস্থার জন্য বিপ্লবী সংঘ বর্তমানে ও ভবিষ্যতে সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। প্রশ্ন—আশু অভ্যুত্থানের, অর্থাৎ, আকস্মিক ব্যাপক আক্রমণের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অগোচরে সর্বতোভাবে প্রস্তুত হতে পেরেছি কি না এবং তাদের অজ্ঞতার সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে সফলতার সঙ্গে প্রথম assault (আক্রমণ) পরিচালিত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে কি না? প্রথম ব্যাপক আক্রমণের সফলতা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। তাই বোধহয় গণেশের বা আর কারও অনিশ্চয়তার আশঙ্কা আমার মনে রেখাপাত করতে পারে নি এবং সেই কারণে গণেশের স্ট্রাটেজীর আংশিক পরিবর্তন প্রস্তাব আমার পক্ষে মেনে নেওয়া কোনমতেই সম্ভব হচ্ছিল না। অম্বিকাদা ও নির্মলদা তিন দিন ধরে আমাদের সুদীর্ঘ আলোচনায় খুব সামান্যই যোগ দিয়েছিলেন। মাস্টারদা এই তিন দিনই আমাদের দু'জনের যুক্তি খুব মন দিয়ে শুনেছেন। একটিবারও তিনি আমাদের আলোচনার মাঝখানে হস্তক্ষেপ করেন নি—পাছে এই গুরুতর সমস্যার বাস্তব সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আমরা বিভ্রান্ত হই। সর্বশেষে যখন

মাস্টারদা বুঝতে পারলেন যে আমরা দু'জনের কেউই নিজ মত পরিবর্তন করতে পারছি না তখন তিনি তাঁর মত জানালেন।

খুব ধীরে ধীরে অথচ বিশেষ জোরের সঙ্গে তাঁর বক্তব্য এইভাবে বললেন—

"তিন দিন ধরে আমরা এই দীর্ঘ আলোচনা শুনলাম। এইরূপ গুরুতর রণ-নীতির প্রশ্নে তোমাদের দু'জনের খোলাখুলি আলোচনা ও তোমাদের নিজ মতের পক্ষে যুক্তি শোনা আমাদের একান্ত প্রয়োজন ছিল। সবদিক ভেবে ও বিশেষ চিন্তা করে আমি বর্তমান অবস্থায় গণেশের পরিবর্তিত স্ট্র্যাটেজীক্ প্ল্যান পুরোপুরি সমর্থন করছি।

"আমার মনে হয় গণেশ যা বলছে তাতে যুক্তি আছে। একেবারে ত্রুটিহীনভাবে প্রথম আক্রমণ চালিয়ে সফল হবই—এইরূপ ধারণার ওপর নির্ভর করে কোন স্ট্রাটেজী গ্রহণ করা উচিত নয়। ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাই গণেশের বিকল্প প্ল্যানের যৌক্তিকতা আমাদের অস্বীকার করা উচিত নয়। আমার মনে হয় বিকল্প প্ল্যানের দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও এই যুগে বর্তমানে আমাদের প্রথম চোটে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা কোনমতেই ইংরেজদের সুযোগ দেব না—পাছে তারা প্রথম আক্রমণের সংবাদ পেয়েই উধাও হয়, তাই প্রথম চোটেই 'ক্লাব' আক্রমণ করতে হবে।

"আমাদের অবর্তমানে ভবিষ্যৎ বিপ্লবী ভারতবাসীর কথা স্মরণ করেই আমি এই 'নিষ্করুণ ও নিষ্ঠুর' প্ল্যান সমর্থন করছি। ইংরেজের রক্তধারায় চট্টগ্রামের রাজপথ প্লাবিত হউক্। দু'শ বছরের পৈশাচিক হত্যা তান্ডবের প্রায়শ্চিত্ত তাদের করতেই হবে। দুষ্টের দমন চাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইংরেজ অনুচরদের প্রতি কোন ক্ষমা, একটুও অনুকম্পা, সামান্যতম করুণা প্রকাশও বিপ্লবীদের পক্ষে অপরাধ। আমরা তো মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হই নি! তাই আমাদের যুব অভ্যুত্থানের পর যদি চট্টগ্রামের ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বহালতবিয়তে বেঁচে গিয়ে নৃশংস অত্যাচারের সুযোগ পায় তবে বিপ্লবী সমাজ আমাদের ধিক্কার দেবে। কোনমতেই সে সুযোগ তাদের দেব না। মায়াহীন দয়াহীন বিভীষিকাময় ইংরেজ-হত্যা লীলার প্রয়োজন আছে। ইংরেজ দস্যুকে বুঝতে হবে চরম নিষ্ঠুরতার একচেটিয়া অধিকার কেবল তাদেরই নেই —আমাদেরও আছে। ইংরেজের সঙ্গে কোন আপোষ নেই। তাদের সঙ্গে বন্দী বিনিময় বা প্রাণ বিনিময়ের কথা ওঠে না। কে কাকে কত নৃশংসভাবে হত্যা করতে পারি তার প্রতিযোগিতা চাই। ইংরেজের পশু-শক্তির তান্ডব ক্ষমাধর্মে নির্বাপিত হবে না। সেই জঘন্য পাশবিক শক্তিকে একমাত্র চরম নিষ্ঠুরতাই স্তব্ধ করতে পারে। দুর্বল মনের ক্ষমার বিলাস আমাদের বিপ্লবী অভিধানে স্থান পায়, তা' আমার ইচ্ছে নয়। আমরা চাই গান্ধীজীর অহিংসাবাদের বেদীতে রক্তক্ষরা বিপ্লবের ইতিহাস রচনা করতে। অবাস্তব গান্ধীবাদের অহিংস নীতি আমরা কৌশল হিসাবে ব্যবহার করেছি ও করবও। কিন্তু বিপ্লবী ভারতকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংসবাদের অবাস্তব ও মিথ্যা প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে......। আশা

করি অনন্ত আমার মত সমর্থন করবে। আমার ইচ্ছা গণেশের এই বিকল্প স্ট্রাটেজী চূড়ান্তভাবে আমরা গ্রহণ করি।"

মাস্টারদা এইভাবে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। নির্মলদা ও অম্বিকাদা মাস্টারদার প্রস্তাব মেনে নিলেন—কোন প্রতিবাদ করেন নি। আমারও আর কোন প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা হ'ল না। মাস্টারদা যে দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তিধারা গণেশের প্রস্তাবের স্বপক্ষে অবতারণা করলেন তাতে নূতন কিছুই ছিল না, যা তিন দিন ধরে সুদীর্ঘ আলোচনার মধ্যে গণেশ বলে নি। তবু তাঁর ধীর স্থির সমর্থন বিকল্প প্ল্যানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনেকখানি বাড়িয়ে দিল। তাই এতক্ষণ গণেশের কথায় আমি রাজী না হলেও মাস্টারদার এই সন্ধিক্ষণের নির্দেশ দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেওয়া বিপ্লবী দায়িত্ব বলে মনে করেছিলাম। আমি বিনা দ্বিধায় মত দিলাম—বিকল্প প্ল্যান মেনে নিলাম।

আক্রমণের স্ট্রাটেজী নিয়ে এই প্রথম প্রশ্ন সমাধান হওয়ার পর দ্বিতীয় প্রশ্নটি উঠল। এই দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে সামগ্রিক আক্রমণের কৌশল সম্বন্ধীয় বিষয় বলে ধরা যায়। চট্টগ্রাম শহরকে প্রথম আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্য ছিল। বিশেষ করে সৈন্যবাহী ট্রেনের গতিপথ রুদ্ধ করে শত্রুপক্ষের প্রতি-আক্রমণকে যতদূর সম্ভব পেছিয়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। সেইজন্য Zero hour-এ (ঠিক ধার্য সময়টিতে) রেল লাইন উৎপাটন করে দুটি স্থানে ট্রেন লাইনচ্যুত করবার সব ব্যবস্থা ঠিক হওয়ার পর প্রশ্ন উঠল—আমাদের প্রথম আক্রমণের সময়কার বা ঠিক পরের ট্রেন দুটিকেই যদি লাইনচ্যুত করা হয় তবে শিকার হবে দুটো যাত্রীবাহী ট্রেন। মালবাহী ট্রেন আমাদের সামগ্রিক আক্রমণের প্রায় দু'তিন ঘন্টা পরে সেই দুটি স্থান (যেখানে রেললাইন উৎপাটিত হবে) অতিক্রম করবে। এখন আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে—যাত্রীবাহী ট্রেন অতিক্রম করে যাওয়ার পর রেল লাইন উৎপাটন করে মালবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত করবার নির্দেশ দেব, না কি সামগ্রিক আক্রমণের 'জিরো আওয়ার' অতি কঠোরতার সঙ্গে অনুসরণ করে যাত্রীবাহী ট্রেনই লাইনচ্যুত করা হবে?

সামগ্রিক আক্রমণের রণ-নীতির সঙ্গে জড়িত এই রণকৌশল নিয়েও আমার ও গণেশের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। গণেশ খুব কঠোরতার সঙ্গে 'জিরো আওয়ার' অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত বহাল রাখতে দৃঢ় মত প্রকাশ করে। তার প্রধান যুক্তি হ'ল—(১) হয়ত প্যাসেঞ্জার ট্রেন অতিক্রম করার পর সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে লাইন উৎপাটন করা নাও যেতে পারে।

(২) আমাদের সামগ্রিক আক্রমণের পরে জেলা-শাসকরা যে কোনভাবে টেলিগ্রাফে, বেতারে বা মোটর যোগে কুমিল্লা প্রভৃতি সংলগ্ন জেলা থেকে কলকাতা সরকারী দপ্তরে খবর পাঠাবে।

(৩) ধরে নেওয়া যায় যে, রেলকর্তৃপক্ষ শহর অধিকৃত হওয়ার খবর শীঘ্রই পেয়ে যাবে। তেমন ক্ষেত্রে তারা সমস্ত ইঞ্জিন ড্রাইভারকে সতর্কতার সঙ্গে ট্রেন চালাবার নির্দেশ যে দেবে না সেরূপ ভাবা আমাদের উচিত হবে না।

(৪) এই সব অনিশ্চয়তা যখন আছে, তখন আমাদের নিছক senti-

mental কারণে (ভাবপ্রবণতার জন্যে) যাত্রীবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত করার সিদ্ধান্ত বাতিল করাতে কোন যৌক্তিকতা নেই। তা'ছাড়া লাইনচ্যুত হলেই যাত্রীদের সমূহ প্রাণহানির কথা আমরা ভাবছি কেন? দুই বিপরীতগামী চলন্ত ট্রেনের সংঘর্ষ বা ডিনামাইট প্রয়োগে ট্রেন বিধ্বংস যে ভয়াবহ ক্ষতি করে, কেবল লাইনচ্যুত ট্রেনে সেরূপ ক্ষতির আশঙ্কা নেই। আমাদের সামগ্রিক প্ল্যান অনুযায়ী ট্রেন লাইনচ্যুত করাকে রণনীতি মনে না করে রণকৌশল ভাবা মূলতঃ ভুল হবে। সৈন্যবাহী ট্রেনের গতিপথ রুদ্ধ করে শত্রুর প্রতি-আক্রমণের বিলম্ব ঘটানো সামগ্রিক প্ল্যানের 'রণ-নীতি'—'রণ-কৌশল' নয়। তাই সময় মত ট্রেন লাইনচ্যুত করাটা সুনিশ্চিত করতে হবে। ভাবপ্রবণতার কারণবশতঃ কোন অনিশ্চয়তার মধ্যে আমাদের থাকা উচিত হবে না।

গণেশের এইসব যুক্তির তাৎপর্য এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমি তার সব যুক্তি বিচার করে দেখার পরও ভিন্ন মত ব্যক্ত করলাম। আমি কোনমতেই যাত্রীবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত করবার পক্ষপাতী ছিলাম না। তবে ভাবপ্রবণতা আমার মনে কখনও প্রাধান্য লাভ করে নি। এই প্রশ্নে আমার অভিমত যা ছিল নিম্নে দিলাম—

ঠিক "জিরো আওয়ারে" ট্রেন লাইনচ্যুত করাটা 'অতি অবশ্য প্রয়োজন' বলে মনে করা উচিত হবে না। সৈন্যবাহী ট্রেনের গতি রোধ করার পূর্বাহ্ণে যদি লাইন উৎপাটন সম্ভব হয় তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে। তাই আমি হিসেব করে দেখলাম, আমাদের প্রথম আক্রমণের পর কর্তৃপক্ষ যত তাড়াতাড়িই করুক না কেন, যে কোন সৈন্যবাহী ট্রেনেরই লাক্‌সাম পৌঁছতে খুব কম পক্ষে অন্তত চোদ্দ ঘণ্টা সময় লাগবে। তারপর বিনা বাধায় যদি লাক্‌সাম জংসন থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রেল লাইন অতিক্রম করে আসতে পারে তবে তাদের কম পক্ষে আরও পাঁচ ঘন্টা লাগবে। জেলা কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রথম আক্রমণের পর ছত্রভঙ্গ ও বিহ্বল হয়ে পড়বে। তারা টেলিগ্রাম বা ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে ঢাকা ও কলকাতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করবে। কিন্তু প্রথম আক্রমণের পাঁচ মিনিট পূর্বেই আমরা টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস করা সাব্যস্ত করেছি। যদি কোন আকস্মিক কারণবশতঃ টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস করা নাও হয়, তবু আমরা শহরের কয়েক স্থানে টেলিগ্রাফ তার কাটার ব্যবস্থা করেছি। সেই ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যায় কর্তৃপক্ষ নিজেদের সামলে নিয়ে স্টীমারে রক্ষিত বেতারে খবর পাঠাবার চেষ্টা করলেও দু' ঘণ্টার আগে তা' করতে পারছে না। কলকাতার কর্তৃপক্ষ খবর পাওয়ার পর প্রদেশের শাসক-প্রধানেরা মিলিত হবে এবং খবর যাচাই করবে। খবর পেয়ে তাদের পরামর্শ বৈঠক শেষ হতে অন্তত আরও দু' ঘণ্টা সময় লাগবে। এই চার ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর সৈন্য-বাহিনীর দপ্তরে আদেশ পৌঁছবে। সেই আদেশ অনুযায়ী সৈন্যদের খুব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করে যাত্রা করতে হলে অন্তত আরও দু' ঘণ্টা লাগবে। তারপর গোয়ালন্দ পর্যন্ত যাওয়ার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যদের স্পেশাল ট্রেন যোগাড় থাকবে কি না সে সম্বন্ধে খুবই সন্দেহ আছে। আর যদি ধরে নেওয়া যায় স্পেশাল ট্রেন প্রস্তুত থাকবে তবুও গোয়ালন্দ পৌঁছতে তাদের অন্তত আরও চার ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন। এই ভাবে যদি

সব ব্যবস্থা তড়িৎগতিতে সম্পন্ন করতে পারে তবুও দেখা যাচ্ছে দশ ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার আগে তারা কোনমতেই গোয়ালন্দ পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না। ইতিমধ্যে যদি কোন স্পেশাল স্টীমার গোয়ালন্দ ঘাটে প্রস্তুত রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় (যা সম্ভব নয়), তবু ট্রেন থেকে নেমে স্টীমারে ওঠার পর, স্টীমার ছাড়া পর্যন্ত, এক ঘণ্টা সময় কমপক্ষে লাগবেই। তারপর আরও এক ঘণ্টা লাগবে চাঁদপুর পৌঁছবার পর স্টীমার থেকে কোন স্পেশাল ট্রেনে সৈন্যদের স্থানান্তরিত করতে। চাঁদপুর থেকে লাক্সাম জংসন পৌঁছতে আরও দু' ঘণ্টা—এই মোট চোদ্দ ঘণ্টার আগে কোন সৈন্যবাহী ট্রেনই লাক্সাম জংসন পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না। তবে আমার সুনিশ্চিত ধারণা, যে ভাবে আমি শত্রুর দ্রুত গতিবিধির হিসাব দিলাম, তারা কোনমতে অতখানি যন্ত্রের মত কাজ করে যেতে পারে না। তবু যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, সৈন্যবাহী ট্রেন একেবারে তড়িৎবেগে এসে পড়বে, তবু হিসাবে দেখা যাচ্ছে লাক্সাম জংসন পর্যন্ত চোদ্দ ঘণ্টার আগে তাদের পৌঁছন কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। এই কারণে লাইন উৎপাটনের জন্য 'জিরো আওয়ার' প্রযোজ্য নয়।

দ্বিতীয় যুক্তি—রেল কর্তৃপক্ষ শহরের ঘটনা জানতে পেরে সমস্ত ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে পূর্বাহ্লেই সতর্ক করে দেবে। সেইক্ষেত্রে ড্রাইভারদের সতর্কতার জন্য ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়া অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। এই সম্বন্ধেও বিশ্লেষণ করে আমার মত জানালাম যে, রেল কর্তৃপক্ষ বা সরকার বা সামরিক কর্তৃপক্ষ শহরের ঘটনা জানার পর বুদ্ধি খাটিয়ে আগাম ভেবে নেবে যে ট্রেন লাইনচ্যুত করা হবে এবং তাই ট্রেন-চালকদের সতর্ক করে দেবে, এইরূপ ধারণা হওয়ার সঙ্গত কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। তা'ছাড়া যদি ধরেও নিই যে কর্তৃপক্ষ খবর পেয়ে আলোচনা সমাপ্ত করে সেইরূপ নির্দেশ ট্রেন-ড্রাইভারদের পাঠাবে, তবু তা' কি পাঁচ ছয় ঘন্টার আগে সম্ভব?

এই প্রশ্নটি নিয়ে প্রথম প্রশ্নের মত সুদীর্ঘ আলোচনা হয় নি। প্রায় তিন ঘন্টা আলোচনার পর আমার মতটি গণেশ মেনে নিল; মাস্টারদা, নির্মলদা ও অম্বিকাদাও সমর্থন করলেন।

এই প্রসঙ্গে আমার সামান্য একটু বলার আছে। জটিল প্রশ্নে ও রণ-নীতি সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ থাকা সত্ত্বেও যখন আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল, তখন মূল প্ল্যানটিকে সফল করার জন্য আমাদের কারও কোন শিথিলতা ছিল না। এইরূপ মতভেদ আমাদের কখনও দুর্বল করে নি। মরণপণ করা সক্রিয় বিপ্লবী পার্টির মধ্যে সমস্যা সমাধানের পথে প্রকৃত মতভেদ স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ত্রুটিহীন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য আমার ও গণেশের রণ-নীতি ও রণ-কৌশলের সাময়িক মত-পার্থক্য, সব বিষয়টি সব দিক থেকে দেখবার জন্য আমাদের সাহায্য করেছিল। তারপর সব বুঝে-সুঝে গৃহীত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলি মনে অসীম আস্থা আনতে সাহায্য করল।

Controversial বা আলোচনাসাপেক্ষ বিষয় নিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ মতৈক্য হওয়ার পর কোন্ কোন্ শত্রুঘাঁটি আমরা আক্রমণ করব, আর কোন্ কোন্ ঘাঁটি আক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য স্থগিত রাখতে হবে তাই স্থির

করা হ'ল। সংক্ষেপে চূড়ান্তভাবে আক্রমণের স্ট্র্যাটেজী নিম্নলিখিতভাবে স্থির করা হ'ল—

(১) যুগপৎ আক্রমণের সর্বপ্রথম কাজ হবে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস করা। তাই ব্যাপক আক্রমণের ঠিক পাঁচ মিনিট আগে এখানে আঘাত হানতে হবে। আমাদের জনবল ও অস্ত্রবলের স্বল্পতার জন্য অত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে যদি টেলিগ্রাফ্ অফিস ধ্বংস করা নাও যায়, তবু যাদের সেখানে পাঠান হবে তাদের ওপর অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ থাকবে যে, টেলিগ্রাফ্ ও টেলিফোন অফিস ধ্বংস না করে তারা যেন না ফেরে। এই কাজ সম্পন্ন করবার পর তারা নির্ধারিত পথ ধরে পুলিশ-লাইনে এসে আমাদের সংগে যোগ দেবে। ইতিমধ্যে আমরা পুলিশ-লাইন অধিকার করতে পারলাম কিনা তা' তারা আমাদের পরস্পরের মধ্যে সংকেত বিনিময়ের মাধ্যমে জেনে নেবে। সেইজন্য বিশেষ ধরনের বিশেষ বিশেষ স্লোগান, মোটরের হর্ন ও লাইটের সংকেত প্রভৃতি আগে থেকেই স্থির করে রাখা হয়েছিল।

(২) টেলিগ্রাফ্ ও টেলিফোন অফিস ধ্বংসের ঠিক পাঁচ মিনিট পরে পুলিশ লাইন আক্রমণ ও দখল করার জন্য সামরিক নিয়মে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। পুলিশলাইন দখল করে সেখানেই অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পাহাড়ে ঘেরা পুলিশ-লাইনের স্বাভাবিক অবস্থান, সামরিক অভিজ্ঞান মতে, আত্মরক্ষার ব্যূহ হিসেবে খুব উপযোগী ছিল। তাই আমাদের হেডকোয়ার্টার স্থাপনের জন্য পুলিশ-লাইনই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান বলে নির্বাচিত হয়েছিল।

আমাদের বিবেচনায় পুলিশ-লাইনটি দখল করা সবচাইতে কঠিন কাজ বলে মনে হওয়ার প্রধান কারণ ব্যারাকে প্রায় সব সময়েই কম পক্ষে দু'শ' সশস্ত্র পুলিশ উপস্থিত থাকে। পুলিশ-লাইনে কেবল আর্মারি ও ম্যাগাজিন্ কক্ষ দুটি দখল করে নেওয়া খুব একটা সমস্যার বিষয় ছিল না। এই দুইটির সংলগ্ন একটি guard room (রক্ষীদের গৃহ) আছে। এখানে জন বারো সশস্ত্র সেপাই পাহারায় থাকবার ব্যবস্থা আছে। আকস্মিক আক্রমণের মুখে বারোজন রক্ষীকে পরাস্ত করে গার্ড রুম, আর্মারি ও ম্যাগাজিন অতি সহজে দখল করা গেলেও ব্যারাকে উপস্থিত দু'শ' সেপাই তখন কি করবে? নিশ্চিন্তে বসে থাকবে, না কি প্রতিআক্রমণ চালাবে তার স্থিরতা কি? তাই, যে শত্রু ঘাঁটিতে শত্রুর লোকবল অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে এবং যেখানে আক্রমণকারীর লোকসংখ্যা ও অস্ত্রবল অনেক কম—সেখানে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় ভেবে সঠিক পন্থা নির্ধারণ করা অতি আবশ্যক।

পুলিশ-লাইন আক্রমণ ও দখল করার প্ল্যানটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার সময় এই সব সমস্যার দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

পুলিশ-লাইনে অসমান লড়াইয়ের জন্য সঠিক রণ-কৌশল প্রয়োগ না করলে পরাজয়ের সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই ক্ষেত্রে রণ-কৌশল নির্ভর করে কতখানি ELEMENT OF SURPRISE (অতর্কিত আক্রমণের সুযোগ-সুবিধা) আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে নিতে পারি। যদি আক্রমণ ও সশস্ত্র রক্ষীদের মুহূর্তে পরাস্ত করা সম্ভব হয় তবে প্রথম চোটেই দশ ভাগের নয়

ভাগ জিত হবে আমাদের। এই আকস্মিক আক্রমণ ও জয় ব্যারাকের সেপাইদের ভীত-ত্রস্ত করবে—তাদের সামরিক বল, নৈতিক বল যে বিনষ্ট করবে, তাতে আমাদের সন্দেহ ছিল না। তাই এই সামরিক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে আমরা পুলিশ-লাইন আক্রমণের প্ল্যান করি।

এইরূপ রণ-কৌশলের দিকে লক্ষ্য রেখে পুলিশ-লাইন দখল করার জন্য ঝটিকাবেগে অতর্কিত আক্রমণের যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করেছিলাম। রাতের অন্ধকারে পরোইকোরা ডাকাতির সময় ভীত-ত্রস্ত গ্রামবাসী মনে করেছিল মহাজনের বাড়ি আক্রমণ করেছে প্রায় চল্লিশজন সশস্ত্র ডাকাত, যদিও আমাদের দলে লোক ছিল মাত্র সাতজন। কেবল অতর্কিত আক্রমণ করাটাই সব নয় সঙ্গে সঙ্গে অল্পসংখ্যক লোকের অবস্থান ব্যারাকের পুলিশ-বাহিনীর দৃষ্টির অগোচরে রেখে যদি চারিদিক থেকে তাদের হাজার লোক আক্রমণ করেছে—এইরূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যায়, তবেই এই ধরনের রণ-কৌশল সফল হতে পারে। সেই হেতু আমরা ঠিক করেছিলাম আমাদের তৃতীয় সারির রিজার্ভ বিপ্লবী সৈনিক ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পুলিশ-লাইনের বিভিন্ন দিক পূর্বাহ্ণে কৌশলের সঙ্গে ঘিরে ফেলে সংকেতের জন্য গোপনে অপেক্ষা করবে।

প্রথম আক্রমণ সফল হওয়ার পর সংকেতধ্বনি ও বড় বড় টর্চের সাংকেতিক আলোর প্রদর্শনী অনুসারে আমাদের রিজার্ভ বাহিনী তাদের অর্ধ-চক্রাকার ব্যূহের বিভিন্ন স্থান থেকে একসঙ্গে, রাতের অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে জয়ধ্বনি তুলবে—এইরূপ নির্দেশ ছিল।

প্রথম আক্রমণকারী পাঁচজনের কাছে মাত্র পাঁচটি রিভলভার ছিল, বাকী দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির সৈনিকেরা সকলেই ছিল নিরস্ত্র। সেইজন্য আপেক্ষিকতায় বহুলাংশে স্বল্প সামরিক শক্তি নিয়ে পুলিশ-লাইন দখলের সমস্যা আমাদের এইভাবে সমাধান করতে হয়। এই দুরূহ সমস্যা সমাধানের মূলে ছিল অপরিসীম সাহস ও দুঃসাহসিক পরিকল্পনা। রণ-কৌশল সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও বাস্তব ধারণা না থাকলে সামান্য ক'টি রিভলভার এবং চল্লিশ জনেরও কম নিরস্ত্র বিপ্লবী সৈনিকের গোপন সমাবেশের ওপর নির্ভর করে পুলিশ-লাইন দখল করার কার্যকরী প্ল্যান সম্ভব হ'ত না।

(৩) টেলিফোন ভবন আক্রমণ করার ঠিক পাঁচ মিনিট পর পুলিশ-লাইন যে সময়টিতে আক্রমণ করার কথা, আমাদের সামরিক পরিষদের নির্দেশ ছিল যে A.F.I. Armoury-ও (ভারতের অক্‌জিলারী ফোর্স আর্মারি) ঠিক সেই সময় দখল করতে হবে।

এই আর্মারি পাহারা দেওয়ার জন্য আটজন দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পাঠান মিলিটারী সেপাই ম্যাগাজিন রাইফেল নিয়ে রক্ষীগৃহে মোতায়েন থাকার ব্যবস্থা ছিল। তারা সন্ধ্যে থেকে পালা করে সঙ্গীনআঁটা রাইফেল নিয়ে পাহারা দিত। এই আর্মারির ভার ন্যস্ত ছিল একজন সার্জেন্ট মেজরের ওপর। তাঁর কোয়ার্টারটি এই আর্মারির গা-ঘেঁষা একটি প্রাইভেট রাস্তার ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত।

যত বড় বলিষ্ঠ পাঠান-সেনা পাহারায় নিযুক্ত থাকুক না কেন বা তাদের আটজনের হাতে ম্যাগাজিন রাইফেল শোভাবর্ধন করুক না কেন, অতর্কিত আক্রমণের রণ-কৌশল ঠিক ঠিক প্রয়োগ করা গেলে এক নিমেষেই যে তাদের

পরাস্ত করা সম্ভব, সে সম্বন্ধে আমরা একেবারে নিঃসন্দেহ ছিলাম। A.F.I. আর্মারি আক্রমণ ও দখল করাটা আমরা পুলিশ-লাইন অধিকার করার চাইতে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য মনে করেছিলাম। এর বিশেষ কারণ আগেই উল্লেখ করেছি যে, পুলিশ-লাইনে প্রায় সময়েই দু'শ' সশস্ত্র পুলিশ ব্যারাকে হাজির থাকে। A. F. I. আর্মারি আক্রমণ ও অধিকারের ব্যাপারে এই বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কোন কারণ বা আশঙ্কা ছিল না।

তবে A.F.I. আর্মারিটিকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করার ব্যাপারে একটি অতি জটিল ও মারাত্মক সমস্যা ছিল। এই সমস্যার যথার্থ সমাধানের ওপর নির্ভর করছিল সান্ত্রীদের পরাস্ত করার পরও আমাদের এই স্থানের জয় সুনিশ্চিত হবে কি না।

এই আর্মারিতে দুটো খুব শক্তিশালী ভিন্ন ধরনের লোহার দরজা ছিল। মোকদ্দমার ছাপানো জাজ্‌মেন্ট কপি থেকে এই আর্মারির দরজার বিবরণ দিচ্ছি—

"The only entrance to the armoury was in the western wall of the building, facing the western verandah and was protected by double doors, an outer door of solid iron, the two halves of which opened outwards, and inner grille, the two halves of which opened inwards into the room (Vide plans Exs. 18 and 19 and photographs. Exs. XXIII and XXIV). (পশ্চিম বারান্দার দিকে মুখ করে পাকা কোঠাটির পশ্চিম দেওয়াল দিয়ে আর্মারিতে একটিমাত্র প্রবেশ পথ ডবল দরজায় সুরক্ষিত ছিল— দুটি দরজার একটি নিরেট লোহায় গড়া, যার উভয় কপাট বহির্মুখে আর লোহার গ্রীলে তৈরি, অপরটির দুটি পাল্লাই ভেতর দিকে খোলার ব্যবস্থা ছিল)।

A.F.I. আর্মারিটি অধিকার করার পরে যদি এইরূপ দুটি মজবুত লোহার দরজা খুলতে বা ভাঙতে না পারি তবে প্রায় শ' পাঁচেক দশ শট্‌ওয়ালা ম্যাগাজিন রাইফেল, লুইস মেসিনগান ও তাদের উপযোগী কার্তুজ আমরা নিতে পারব না। আর্মারির চাবি কোথায় বা কার কাছে থাকে তা' সঠিক জানা যায় নি। তবে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছিল যে, চাবি নিশ্চয়ই সার্জেন্ট মেজরের জিম্মায় থাকবে। এই A.F.I. আর্মারির ইন্‌চার্জ (জিম্মাদার), সার্জেন্ট মেজরের কোয়ার্টারটি অস্ত্রাগার গৃহের সংলগ্ন ছিল। তবু জিম্মাদারের কাছ থেকে চাবিটা আমরা যে সংগ্রহ করতে পারবই তার নিশ্চয়তা কি? তাই দুটো লৌহকপাট ভাঙবার জন্য বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থার আয়োজন আমাদের রাখতে হয়েছিল। যদি প্রথম উপায়ে সফল না হই তবে পর পর নানাভাবে চেষ্টা করেও যাতে দরজা দুটি সুনিশ্চিতভাবে ভাঙতে পারি তার জন্য আমাদের রীতিমত গবেষণা করতে হয়েছে।

বাইরের দিকে যে নিরেট লোহার দরজাটা খোলা হ'ত, সেই দরজার কপাটের ডালার ওপর ধরে খোলবার জন্য একটি মজবুত হাতল ছিল। মোটর-গাড়ি ও দরজার এই হাতলের সঙ্গে একটি দড়ির দুটি মাথা বাঁধা হবে এবং মোটরগাড়ি সম্মুখ দিকে চালিয়ে দড়িটি টান মারলেই আর্মারির দরজা ভাঙবে

ও দুটি লোহকপাটই সামনের দিকে উন্মুক্ত হতে বাধ্য। এই অভিনব পন্থার চিন্তা কার মাথা-প্রসূত তা' জানবার কৌতূহল প্রকাশ করেছেন আমাদের বন্ধুবান্ধব ও বিশেষ করে আমাদের বিচারের সময় উকিল-ব্যারিস্টাররা সবার আগে। বন্ধুবর গণেশ A.F.I. আর্মারির দরজা ভাঙার এইরূপ কৌশলের প্রয়োগ সম্বন্ধে চিন্তা করে। সকলেরই মনে হবে বাঃ কি চমৎকার! কি সহজ! কত সহজেই না দুর্ভেদ্য দরজাটি খোলা যাবে! কিন্তু যাঁদের ওপর সেই-দিনের জয় সুনিশ্চিত করবার দায়িত্ব ছিল তারা এত সামান্যতে সন্তুষ্ট হন নি। মোটরের টানে দড়িটি যদি ছিঁড়ে যায় বা হাতলটি টানের চোটে উপড়ে আসে তবে যে আমরা আরও সমস্যায় পড়ব! তাই জাহাজ বাঁধবার শক্ত মজবুত দড়ি সদর-ঘাট জেটির সন্নিকটে অবস্থিত ছোট্ট একটি ভাসা ফ্ল্যাটের ওপর থেকে আমাদের চুরি করতে হয়েছিল ঘটনার প্রায় দিন সাত পূর্বেই। কেবল তাই নয়, এই মস্ত বড় 'ম্যানিলা রোপটি'কে আমাদের সযত্নে লুকিয়ে আনা-নেওয়া ও রাখার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রশ্নের সমাধান, অর্থাৎ যদি মোটরের টানে দরজা বন্ধ অবস্থায় হাতলটি কেবল উপড়ে আসে তবে আর কি করা যায় তার জন্যেও গবেষণার প্রয়োজন ছিল। সে বিষয়েও গণেশ চিন্তা করে বলেছিল যে, মস্ত বড় চাবি ব্যবহার করার জন্য আর্মারির নিরেট লোহার দরজায় যে ছিদ্র আছে সেই ছিদ্র দিয়ে পিক্‌রিক্ পাউডার (বিস্ফোরক দ্রব্য) একটু একটু করে ভরে দেব এবং টাইম ফিউজ (ধীরে ধীরে জ্বলবার জন্য বারুদের পলতে) সংযুক্ত করে বিস্ফোরণের ব্যবস্থা করা হবে। আমাদের এইরূপ বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া যে কি ও কতখানি হবে তার সঠিক ধারণা থাকা সম্ভব ছিল না, কারণ এই বাস্তব অভিজ্ঞতার সুযোগ আমাদের আগে কখনও ঘটে নি। সেইজন্য আমাদের ভাবনারও অন্ত ছিল না—যদি এই বিস্ফোরণের কৌশলও ব্যর্থ হয়! Necessity is the mother of invention! প্রয়োজনের তাগিদই নতুন আবিষ্কারের জননী! তাই শেষ পর্যন্ত ভাবা হয়েছিল এবং ভেবে ব্যবস্থা করা হয় যে, আর্মারির ছাদ ভেঙে ঘরে ঢুকব। সেইজন্য রাস্তা খোঁড়ার গাঁইতি ও মই প্রভৃতির ব্যবস্থা রেখেছিলাম। ছাদ ভেঙে আর্মারি ঘরে ঢুকলে আমরা ভেতরের দিকের মোটা লোহার শিক্ দিয়ে তৈরি দরজাটা হাতের কাছে পাব। আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল বলে ভেতরকার দরজার তালা খোলা বা ভাঙা, একটা কোন সমস্যা বলেই মনে হয় নি। ভেতরের দরজাটি খোলার পর রেল-লাইনের তলায় পাতা কাঠের 'স্লিপার' একটিকে তিনটি দড়িতে ঝুলিয়ে নিয়ে ছয়জন লোক সেটিকে দোল দিয়ে আঘাত করবে নিরেট লোহার দরজার কপাটের ওপর। ভারী স্লিপারের প্রচণ্ড আঘাতে নিরেট লোহ-কপাট দুটিকে শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হবে—এতে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না।

বিভিন্ন সমস্যা ও সে-সবের সমাধানকল্পে যা' আমাদের করতে হয়েছিল তার খুব সামান্য নমুনাই এখানে দিলাম। সামগ্রিক আক্রমণের চূড়ান্ত স্ট্র্যাটেজী বাস্তবে যখন প্রয়োগ করতে গেছি তখন সমস্যার পর সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমস্যা সমাধানের পথ আমাদের খুঁজতে হয়েছে—কার্যকরী উপায় বা পন্থা আমাদের নির্ধারণ করতে হয়েছে। এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন

সমাধানই বাস্তব সীমিত ক্ষমতার বাইরে ভাবা ও করা সম্ভব হয় নি। তাই সমস্যার সমাধানে ত্রুটি থাকলেও বিশ্লেষণ করে বুঝতে হবে যে, আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে তারচেয়ে আর বেশি কিছু সম্ভব ছিল কি না।

(৪) টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস একই গৃহের দুই বিভিন্ন পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল টেলিফোন এক্সচেঞ্জটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করা। তার বিশদ বিস্তারিত ও নিখুঁত ব্যবস্থা আমরা করি। লোকবল ও অস্ত্রবলের অভাবে একই সঙ্গে টেলিগ্রাফ অফিসটিও ধ্বংস করতে আর একটি সজ্জিত দল আমরা নিযুক্ত করতে পারি নি। সেইজন্য আমাদের নির্দেশ ছিল যে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জটি ধ্বংস করার পর যদি সময় ও সুযোগ থাকে, তবে তারাই আবার আক্রমণ করবে টেলিগ্রাফ অফিসটি। টেলিফোন অফিস আক্রমণের জন্য আমরা পাঠাতে পারি মাত্র ছয়জনকে। সকলকে অস্ত্র দিতে পারি নি, কেবলমাত্র তিনটি রিভলভার দিতে পেরেছিলাম। এই অবস্থায় আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস না করার সম্ভাবনাই বেশি। আমাদের নির্দেশও ছিল যে টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস করা বা না করা তাদের option (স্বচ্ছাধীন); সুযোগ ও সুবিধে বুঝে তারা তা' করবে।

অবস্থা ও ক্ষমতানুযায়ী টেলিগ্রাফ অফিস আক্রমণের জন্য এইরূপে optional ব্যবস্থা করতে বাধ্য হই। কিন্তু টেলিফোন অফিস ধ্বংস করে শহরের আভ্যন্তরীণ সংবাদ ব্যবস্থা ছিন্ন করা যেমন একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, তেমনি আবার চট্টগ্রাম শহরকে তারবার্তা বিনিময়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করাও অপরিহার্য বলে মনে করি। তাই টেলিগ্রাফ অফিস যদি ধ্বংস নাও করি তবু আমরা অন্তত চারটি স্থানে টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন করবার ব্যবস্থা করব। সেইজন্য শহরের দুটি নির্জন স্থানে আমরা দুজন করে দুটি ছোট্ট দল মজুত করি টেলিগ্রাফের তার কেটে দেবার জন্য। তাদের সঙ্গে টেলিগ্রাফের তার কাটবার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়; কিন্তু তাদের আত্মরক্ষার জন্য কোন পিস্তল বা বন্দুক দেওয়া সম্ভব হয় নি। তাদের আত্মরক্ষার অস্ত্রের অভাব পূরণ করা হ'ল নির্জন স্থান দু'টি বেছে নিয়ে। তাদের ওপর নির্দেশ ছিল যে, শহরের মধ্যে প্রধান প্রধান শত্রু ঘাঁটিগুলি আমাদের দখলে আসবার পনের মিনিট পরে তারা টেলিগ্রাফ তার কেটে দেবে।

শহরের বাইরে যে দুটি স্থানে রেল লাইন উপড়ে ফেলে ট্রেন লাইনচ্যুত করে সৈন্যবাহী ট্রেনের গতিরোধ করবার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেই দুটি স্থানে টেলিগ্রাফ তার কেটে দেওয়ারও নির্দেশ ছিল। রেল লাইনচ্যুত করা ও টেলিগ্রাফ তার কাটার জন্য উপযোগী যন্ত্রপাতি তাদের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। যদিও রেল লাইন ও টেলিগ্রাফ তার বিনষ্ট করবার জন্য আমরা তাদের বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করি, তবু তাদের আত্মরক্ষার জন্য আমরা যে পিস্তল বা বন্দুক বরাদ্দ করতে পারি নি তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, আমাদের মূল অস্ত্রভাণ্ডারে অস্ত্রের স্বল্পতা। মুখ্য ঘাঁটিগুলি আক্রমণের জন্য অস্ত্র বরাদ্দ করবার পর এই গ্রুপ দুটির সঙ্গে অতিরিক্ত অস্ত্র দেওয়ার মত আমাদের সংগতি ছিল না।

আবার সেই একই কথা—যখন আত্মরক্ষার ব্যবস্থার অভাব ছিল তখন

ধ্বংস কার্যের জন্য আমাদের এমন স্থান বেছে নিতে হ'ল যেন শত্রুপক্ষীয় কোন আক্রমণের সম্ভাবনা না থাকে। দেশ জুড়ে টেলিগ্রাফ তার ও রেল লাইন বিস্তৃত রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে বিপ্লবী সৈনিকদের সবাইকে অস্ত্রে সজ্জিত করে আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা করতে পারছি না বলে টেলিগ্রাফ ও রেল লাইন ধ্বংস করা হবে না বা করা যাবে না—এইরূপ পরাজিত মনোভাব থেকে আমরা মুক্ত ছিলাম। সীমিত শক্তি নিয়ে চট্টগ্রাম শহর দখল করে সাময়িক বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করবার সামগ্রিক প্ল্যান রূপায়িত করবার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর ছিলাম। তাই অপর্যাপ্ত অস্ত্র সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত সামগ্রিক প্ল্যানটিকে কার্যকরী করবার ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকব, না কি প্রধান প্রধান সব ঘাঁটি আক্রমণের জন্য মাত্র "পর্যাপ্ত অস্ত্র" সংগ্রহ করা হলেই বিলম্ব না করে আমরা সাহসিকতার সঙ্গে আক্রমণের নির্দেশ দেব—এই প্রশ্ন নিয়ে আমাদের হেড কোয়ার্টারে আলোচনা হয় এবং তাতে আমরা বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে, নিষ্ক্রিয়তা বা বিলম্ব করা, কোনটাই আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই সামগ্রিকভাবে শহর দখল করবার মূল রণ-নীতির প্রয়োজনে ছোট ছোট স্থানে আক্রমণ চালানোর জন্য বিপ্লবী সৈন্যদের যদি অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত নাও করে থাকি তবু আমরা সেই সব ছোট ছোট কেন্দ্রে সফল হওয়ার জন্য বাস্তবতার ভিত্তিতে যা' করা প্রয়োজন তা' করেছিলাম। বিকল্প ব্যবস্থানুযায়ী চারটি বিভিন্ন স্থানে টেলিগ্রাফ লাইন ছিন্ন করার জন্য আমরা দুটি ছোট ছোট দল গঠন করি। প্রত্যেকটিতে দু'জন করে নিয়োজিত করি এবং এই দু'টি দল শহরের দু'টি স্থানে টেলিগ্রাফ তার কাটবে—এইরূপ নির্দেশ দিই। আর রেল লাইনের ধারে দুটি স্থান বেছে নিই যেখানে চারজন করে দু'টি বড় দল লাইন ধ্বংস করতে পাঠিয়েছিলাম।

(৫) আমাদের সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে দু'টি স্থানে রেল লাইন উপড়ে ফেলবার ব্যবস্থা করা হয়। এই কাজের জন্য ধুম ও লাঙলকোট স্টেশনের সন্নিকটস্থ স্থান দু'টি খুব উপযোগী বলে মনে হয়েছিল। চারজন করে দু'টি দলে আটজনকে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়। তাদের সঙ্গে রেল লাইন উপড়াবার জন্য মস্ত বড় ও ভারী ভারী লোহার যন্ত্রপাতি ছিল। সে-গুলিকে গোপনে যোগাড় করতে হয়েছিল। Shalimar (শালিমার) কোম্পানীর লোহার কারখানা থেকে গোপনে তৈরি করিয়ে আনতে হয় রেল-লাইনের সঙ্গে আঁটা বড় পেরেক তোলবার জন্য 'ক্রোবার' (Crowbar)। এইসব যন্ত্রপাতি নিরাপদ স্থানে রাখা এবং সাধারণের দৃষ্টির অগোচরে ধুম ও লাঙলকোট স্টেশনের কাছে গোপন আস্তানায় নিয়ে যাওয়া খুব সহজ ছিল না। পুলিশের কথা ছেড়েই দিলাম—যদি সাধারণ লোকের চোখেও Crowbar-টি পড়ে তবে তারা সেই নিয়ে যে বিভ্রাট ঘটাবে না তার কোন স্থিরতা ছিল না। সেইজন্য আমরা সব সময়ে সজাগ ও সাবধান ছিলাম। তবু আমাদের চিন্তার অবধি ছিল না—যদি কোন কারণে আমাদের কোন একটি দলও আগে ধরা পড়ে যায়! তাদের পাঠাতে হয়েছিল একদিন আগে —অর্থাৎ ১৭ই তারিখে। আমাদের আক্রমণের দিন এবং সময় স্থির হয়েছিল ১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যা আটটার সময়। একদিন আগে যদি তারা কেউ ধরা পড়ত তাহলে তাদের মধ্যে কোন বিশ্বাসঘাতক না থাকলেও রেল ও টেলিগ্রাফ লাইন

ধ্বংস করার মারাত্মক যন্ত্রপাতিই আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে সাক্ষ্য দিত। অবশ্য আমরা সবরকম সাবধানতাই অবলম্বন করেছিলাম, যেন তারা কোনরকমে ধরা না পড়ে। আর যদি ধরা পড়ে তবে তাদের মধ্যে কেউ স্বীকারোক্তি করলেও যেন আমাদের আসল উদ্দেশ্য বা সামগ্রিক প্ল্যানের বিন্দু-বিসর্গও না বলতে পারে, তার জন্য সব রকমে তাদের কাছে গোপনীয়তা রক্ষা করেছি; খুব চালাকি করে আমাদের প্ল্যান সম্বন্ধে তাদের মনে নানারকম ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছি।

(৬) গ্রামে ও শহরের বিভিন্ন স্থানে আমাদের তিনরকম প্রচারপত্র ('উদ্দেশ্য ঘোষণা'; 'যুবকদের প্রতি আহ্বান'; 'জয়ের পরে শহরবাসীর প্রতি নির্দেশ') বিলি করবার দায়িত্ব অর্ধেন্দু দস্তিদার, শৈলেশ্বর চক্রবর্তী, দীনেশ চক্রবর্তী ও সুখেন্দু দস্তিদারের উপর দেওয়া হয়েছিল। তাদের উপর আরও নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে ঘোষণাপত্র ডাকে পাঠায়। যদিও এই কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ, তবু যাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তাদের সচেতন করে দিই যেন এই সহজ কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে তারা উদাসীন না থাকে। এই প্রচারপত্রের কোন একটিও যদি সামগ্রিক আক্রমণের পূর্বাহ্ণে ধরা পড়ত তবে যে আমাদের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'ত তা'তে কোন সন্দেহ ছিল না। তাই কাজটি সহজ হলেও তার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা আমাদের ছিল এবং সেইরূপ গুরুত্ব অনুযায়ী বিপ্লবী সৈনিকদের মানসিক প্রস্তুতির বিষয়ে যথেষ্ট নজর দিই। বেআইনী প্রচারপত্র বিলি করার ব্যাপারে কেবল মানসিক প্রস্তুতি থাকলেই যথেষ্ট হয় বলে আমরা মনে করি নি। ধরা না পড়ে পুলিশ ও শত্রুপক্ষীয় লোকেদের বোকা বানিয়ে বে-আইনী প্রচারপত্র বিলি করার পদ্ধতি ও উপায় সম্বন্ধে বিপ্লবী সৈনিকদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। আমাদের সামগ্রিক প্ল্যানের মধ্যে ঘোষণাপত্র প্রভৃতি বিলি করার পরিকল্পনা অপরিহার্যভাবে অঙ্গীভূত ছিল।

(৭) প্রধান প্রধান শত্রুঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাবার পূর্ব মুহূর্তে আমাদের গণতন্ত্র-বাহিনীর দ্রুত সমাবেশের প্রয়োজন ছিল। সেইরূপ দ্রুত সমাবেশ ও তাদের বিভিন্ন ঘাঁটির দিকে দ্রুত পরিচালিত করার জন্য মোটর গাড়ির ব্যবস্থা রাখা একান্ত আবশ্যক। আমাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল, যত কম জোর-জবরদস্তি করে যত কম সংখ্যক মোটর গাড়ি আমাদের কর্তৃত্বাধীনে আনতে হয় ততই ভাল। মোটর ড্রাইভারদের পরাভূত করে, তাদের হাত-পা বেঁধে অথবা অজ্ঞান করে রেখে গাড়ি নিয়ে উধাও হবার মধ্যে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। ড্রাইভার প্রতিআক্রমণ করতে পারে, চীৎকার করতে পারে, কেউ হয়ত চেঁচিয়ে প্রতিবেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। কোন ড্রাইভারকে যেখানে বেঁধে রেখে আসা হবে সেখানে হঠাৎ কেউ গিয়ে উপস্থিত হতে পারে, কোন ড্রাইভার হয়ত জ্ঞান ফিরে পেয়ে গুরুতর অনর্থ ঘটাতে পারে অথবা আমাদের অনভিজ্ঞতার জন্য ক্লোরফরম্ করার সময় ড্রাইভারের প্রাণ নাশের আশঙ্কা থাকতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি বহু সমস্যা রয়েছে; এর কোন-টিকেই উপেক্ষা করা যায় নি। আক্রমণ আরম্ভ করার অন্তত তিন ঘণ্টা আগে ড্রাইভারদের বলপূর্বক বেঁধে রেখে মোটর গাড়ি যোগাড় করার কথা। কারণ,

আমাদের 'সাধারণভাবে পরীক্ষা' (general check up) করে দেখার প্রয়োজন ছিল যে, সব ক'টি মোটর গাড়ি আমাদের কর্তৃত্বাধীনে এসে গেছে এবং সেগুলি সাজসরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র ও বিপ্লবী গণতন্ত্র-বাহিনীর সৈনিকদের যথা সময়ে যথা স্থানে পৌঁছে দেবার কাজে লেগে গেছে। এই কারণে আক্রমণের তিন ঘন্টা পূর্বে ড্রাইভারদের কাবু করে মোটর গাড়িগুলি বে-আইনীভাবে আমাদের দখলে রাখার সময় যদি পুলিশ সন্ধান পেয়ে যায় তবে সমস্ত প্ল্যানটির অপঘাত-মৃত্যু হবে! সেইজন্য যদিও কোন একজন ড্রাইভারকে কাবু করে তার মোটর গাড়ি নিয়ে আসা খুব একটা কঠিন কাজ নয়, তবু যেখানে অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কার অনেক কারণ বর্তমান সেখানে এইরূপ সামান্য কাজকেও অবহেলা করা যায় না। তাই বলপূর্বক ড্রাইভারকে বন্দী করে মোটর গাড়ি নিজের আয়ত্তে আনবার জন্য আমরা ভার দিয়েছিলাম মাত্র দু'টি দলকে। নির্মলদা ও লোকনাথের দল একটি মোটর গাড়ি দখল করবে ও অপরটি অধিকার করার ভার আমার ও গণেশের উপর ন্যস্ত হয়েছিল। ইউরোপীয়ান-ক্লাব গৃহ আক্রমণ করার জন্য যে ছয়জন সশস্ত্র বিপ্লবী যুবককে নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের উপর মোটর গাড়ি দখল করার ভার দেওয়া গেলে তা'রা যে অতি সহজে তা' করতে সমর্থ হ'ত তা'তে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। তবু নীতিগত কারণে আমরা মনে করেছিলাম যে, ঝুঁকি যত কম নেওয়া যায় ততই ভাল। তাই ইউরোপীয়ান-ক্লাব আক্রমণের জন্য যে ছয়জনকে নিযুক্ত করেছিলাম তা'দের অস্ত্র-শস্ত্র (বন্দুক, খড়্গ, কুড়ুল, হাত-বোমা, প্রভৃতি) সবই আমাদের বাড়ির মোটর গাড়ি—বেবি-অস্টিনে করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। তারপর টেলিগ্রাফ্ ও টেলিফোন অফিস আক্রমণ করবার দলটির জন্য আরও একটি মোটর গাড়ি অতি আবশ্যক ছিল। এই গাড়িটি জোর-জবরদস্তি করে দখল করতে আমরা কোনমতেই চাই নি। তাই কিস্তি করে (Hire Purchase) একটি নতুন 'সেভ্রোলে টুরার' গাড়ি কিনি। অম্বিকাদার নামে গাড়িটি কেনা হয়। আজকের ছেলে-মেয়েদের মনে হবে Hire Purchase-এ সেভ্রোলে গাড়ি কিনলেও আমাদের বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা লেগেছিল। কিন্তু সেই সময় মোটর গাড়ি খুব সস্তা দামে বিক্রি হ'ত। সেভ্রোলে টুরারের দামও তখন তিন হাজারের কম ছিল। বারো শ' তেরো শ' টাকা প্রথম এককালীন দিয়ে কিস্তিতে গাড়িটি কেনা হ'ল। ১৮ই এপ্রিল সকালবেলা গাড়িটি কিনেছি আর রাত্রে সেইটি আমরা ব্যবহার করি টেলিগ্রাফ অফিস আক্রমণ করবার সময়। এ ছাড়া আমরা দু'টি গাড়ি Reserve-এ রেখেছিলাম। একটি ছিল মাখনদের বাড়ির গাড়ি—এসেক্স (Essex), আর একটি ডজ্ গাড়ি—যেটি হেরম্ব বল ট্যাক্সি খাটাত। যদি কোন কারণে এই দু'টি গাড়ির একটিও অচল অবস্থায় থাকে তবে অন্তত অপরটি আমরা সব সময় পাওয়ার আশা করেছি। এইভাবে মোটর গাড়ির সামগ্রিক ব্যবস্থা আমরা করি। তবু শেষ মুহূর্তে মোটর গাড়ির বিভ্রাটের জন্য আমাদের আক্রমণের সময় দু' ঘন্টা পিছিয়ে দিতে হয়েছিল। যথাস্থানে এই গুরুতর পরিস্থিতি সম্বন্ধে বলব।

(৮) আর একটি অত্যন্ত জরুরী ব্যবস্থা আমাদের করতে হয়েছিল। গণেশ ঘোষ আমাদের হেড কোয়ার্টারে সিগন্যাল ব্যবস্থা করার জন্য এক

প্রস্তাব উত্থাপন করল। পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য এবং রাত্রি-বেলা অন্ধকারে আমরা পরস্পরকে চিনতে ভুল করে গুলী বিনিময় না করি—সেই জন্যে গণেশ বল্‌ল যে, আমাদের সবার মিলিটারী পোষাকের বুকে পিঠে, দূর থেকে চোখে পড়ার মত, দু'টো ব্যাজ (Badge) লাগাতে হবে। ভেল্‌ভেটের ওপর জরি দিয়ে এই ব্যাজের ডিজাইন তৈরি করা হ'ল। তা'তে দু'টো জাতীয় পতাকাও বসান হয়। আমার মাকে গিয়ে বললাম—"আমরা ভলান্টিয়ারদের নিয়ে সীতাকুণ্ডের মেলায় যাত্রীদের সাহায্যে যাব। মা, তুমি খুব তাড়াতাড়ি এই ব্যাজগুলি সেলাইয়ের কলে তৈরি করে দাও।" গণেশ আমার সঙ্গে ছিল, সেও বল্‌ল—"মাসিমা, আপনার কষ্ট হবে—তবু এগুলি তৈরি করে না দিলেই নয়..............।" বেচারী মা! বুঝতেই পারলেন না আমাদের মূল উদ্দেশ্যটি কি? মা, সময়ের আগেই, তাড়াতাড়ি সব তৈরি করে দিলেন। যতদূর মনে পড়ে ১৬০টি ব্যাজ তৈরি করার জন্য মা'র কাছে ভেল্‌ভেট্‌, জরি প্রভৃতি দিয়েছিলাম। যখন ব্যাজগুলি তৈরি হল তখন দেখতে কী অপূর্ব লাগছিল! আমাদের মামলার ছাপানো জাজ্‌মেন্ট কপির ৪৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—

"(8) Badges and parts of Uniform—(a) A black velvet badge with silver embroidery and two small Swaraj flags (Ex, DCXLVIII)." এখানে বলা হয়েছে—রুপোলি জরিতে কাজ করা এবং দু'টো স্বরাজ পতাকা যুক্ত ভেল্‌ভেট ব্যাজ পোষাকের অঙ্গীভূত ছিল।

সেই একই জাজ্‌মেন্টের ৫৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে—

"(I) Uniform—

(a) A khaki military tunic with brass buttoms, blue and silver tabs on the collar and *black velvet badges,* with *silver* embroidery and *small Swaraj tri-colour ribbons on them, on the chest and back*............"

মামলার রায়ে দ্বিতীয়বারে উল্লেখ আছে যে, ঐরূপ পূর্ববর্ণিত ভেল্‌ভেট ব্যাজ খাকী পোষাকের বুকে ও পিঠে আঁটা ছিল। আমরা পরীক্ষা করে দেখে-ছিলাম যে, দূর থেকে এই ব্যাজগুলো জ্বলজ্বল করে দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

(৯) আমরা শত্রুপক্ষের খাকী পোষাকের অনুকরণে uniform ব্যবহার করা সাব্যস্ত করেছিলাম। সেইজন্য প্রথম থেকেই আমরা বৃটিশ সৈন্যের অনুকরণে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন করি। আমাদের গণতন্ত্র-বাহিনীর জন্য খাকী পোষাক তৈরি করা হয় এবং রণ-কৌশলের জন্য সেইরূপ সামরিক পোষাকে আক্রমণ চালাব বলে স্থির করি।

খাকী পোষাক পরে আমরা শহরে ঘোরাফেরা করতাম এবং কুচকাওয়াজের সময় তা' ব্যবহার করতাম। এই কারণে, আক্রমণের আগে আমাদের সেইরূপ পোষাকে যাতায়াত করতে দেখলে কেউ সন্দেহ করবে না। দ্বিতীয়ত, কৌশলের দিক থেকে ভেবেছিলাম যে খাকী পোষাকে আর্মারি আক্রমণ করতে গেলে সান্ত্রীরা প্রথমে আমাদের সন্দেহ করতে পারবে না—তা'দের ওপরওয়ালা তদারক করতে গেছে বলে ভাবাটা স্বাভাবিক। প্রত্যেকের পদ (Rank) অনুযায়ী খাকী সামরিক পোষাক তৈরি হ'ল। এই ব্যাপারে আমাদের গোপনীয়তা

অগ্নিগর্ভ : প্রথম ২৩ [I]

অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল না, কারণ, আমরা মিলিটারী পোষাক ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলাম এবং প্রায় দু' বছর আমরা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিচালনা করেছি সকলের চোখের সামনে—পুলিশের নাকের ডগায়। এই সুযোগ আমরা ১৯৩০ সালে, ১৮ই এপ্রিল, পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করি।

(১০) অন্যান্য আরো বহু ব্যবস্থার মধ্যে দুটি জরুরী অবস্থার জন্য আমরা প্রত্যেকের জন্য water-bottle (সঙ্গে নিয়ে চলার জন্য জল-পাত্র) এবং প্রত্যেকের আগ্নেয়াস্ত্র চালু রাখার জন্য Lubricating oil-can (তৈল-পাত্র)-এর ব্যবস্থা করি। শেষপর্যন্ত আমরা সবাইকে water-bottle দিতে পারি নি; কারণ পুলিশ আমাদের টিনের তৈরি জলপাত্রগুলি একটি খালি বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। পুলিশ বলেছিল—'water-bottle-গুলি আমাদের জিনিস'—এইরূপ একটি লিখিত রসিদ দিয়ে নিয়ে আসতে। আমরা তাদের সুপরামর্শকে খুব ভালভাবে নিতে পারি নি। সেই জন্য জলপাত্রগুলি আর আনা হল না। একেবারে শেষ সময় বলে তৈরি করবার সুযোগও ছিল না।

Lubricating oil-can, প্রত্যেকের সঙ্গে দেওয়ার জন্য যোগাড় করা হল। নাগারখানা পাহাড়ে যুদ্ধের সময় নিদারুণ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম। দশ-বারোবার গুলী ছোঁড়ার পর রিভলভারের চেম্বার একেবারে আঠা আঠা হয়ে যায় এবং চেম্বারে কার্তুজ ঢোকান অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই তৈল-পাত্র জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে অপরিহার্য বলে সবার মনে হয়েছিল। পুলিশ মাস্কেট (একরকম সাধারণ বন্দুক) থেকে বার পাঁচ-ছয় গুলী ছুঁড়লেই ব্যস্, আর তা'তে টোটা ঢোকান যাবে না। এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে পারি মনে করে আগে থেকেই প্রত্যেকের জন্য oil-can সরবরাহ করা হল। এই সামান্য তুচ্ছ জিনিসও যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আজ মনে হচ্ছে যদি জালালাবাদে oil-can না থাকত তবে কয়েক রাউণ্ড গুলী ছোঁড়ার পর বিপ্লবীদের বন্দুক সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ত। নাগারখানা লড়াই-এর অভিজ্ঞতার পর এই অত্যাবশ্যক oil-can-এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের কখনও গাফিলতি হয় নি'।

৭

—আসন্ন ঝড়ের প্রাক্কালে—

—"We believe that it is an inalienable right of the Indian people as of any other people to have freedom and enjoy the fruits of their toil and have necessities of life so that they may have full opportunities of growth. We believe also that if any Government deprives a people of these rights and oppresses them, the people have a further right to alter it or to abolish it."

—Independence Pledge
Indian National Congress.
January, 1942.

আমাদের প্রস্তুতি-পর্ব প্রায় শেষ করেছি। সামগ্রিক আক্রমণের স্ট্র্যাটেজী (রণনীতি) ও কৌশল আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ঠিক করে ফেলা হয়েছে। এখন আক্রমণের দিন ধার্য করা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। কিন্তু দিন স্থির করার পথে বাধার পর বাধা আসছে, সমস্যার পর সমস্যা দেখা দিচ্ছে, একটার পর একটা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। তবু ঘনিয়ে আসা সময় ও পরিবর্তিত বাস্তব অবস্থার সঙ্গে যে কোন উপায়ে সমন্বয় রেখে সামগ্রিক প্ল্যানটিকে কার্যে পরিণত করবার জন্য আমাদের প্রাণপাত চেষ্টা করতে হয়েছে।

আগে উল্লেখ করেছি যে, চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের রাজনৈতিক কন্‌-ফারেন্সে গোলযোগ ও মারামারির ব্যাপারে নিম্ন আদালতে ১৯২৯ সালের ২৩শে অক্টোবর, চার মাসের জন্য আমার সশ্রম কারাদণ্ড হয়। স্বভাবতই জেলা জজের আদালতে পুনর্বিচার প্রার্থনা করা হয়। জজ কোর্টে আপীলের সুযোগ পাওয়া গেল। আমি জামিনে মুক্ত অবস্থায় বাইরে আছি।

দ্রুতগতিতে প্রস্তুতিকার্য চলছে। এখন আমার জেলে যাওয়া কোন-মতেই চলে না। মাস্টারদা, গণেশ, অম্বিকাদা, নির্মলদা সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন—যদি জজসাহেব দণ্ড বহাল রাখেন। অম্বিকাদা খুব জোর দিয়ে বললেন যে, তিনি সুভাষবাবু ও শরৎবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করবেন এবং জজ কোর্টে পুনর্বিচারের জন্য আপীল করার ব্যবস্থা করবেন। শরৎবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী ভাল ব্যারিস্টারও নিযুক্ত করবেন। অম্বিকাদা কলকাতায় চলে গেলেন—শরৎবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মিঃ এন. আর. দাশগুপ্তকে (সাহিত্যিক নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত) আমার পক্ষে আপীলে সওয়াল করবার জন্য নিযুক্ত করলেন। মিঃ এন. আর. দাশগুপ্ত চট্টগ্রামে এলেন। জেলা ও সেসন জজ মিঃ লজ-এর কোর্টে আমার পক্ষ সমর্থন করে আপীলে সওয়াল করলেন। কিছুতেই কিছু হ'ল না। আমার দণ্ড বহাল রইল। ১৯৩০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী সেসন জজ আমার বিরুদ্ধে রায় দিলেন। জজ কোর্টে দণ্ড বহাল রইল বলে নিয়ম অনুযায়ী আমাকে নির্ধারিত দিনে প্রথম বিচারপতির নিম্ন আদালতে, যেখানে আমার প্রথম সাজা হয়, সেখানে উপস্থিত হওয়া চাই। যতদূর মনে পড়ে, দিন তিন-চারের মধ্যে নিম্ন কোর্টে আমার উপস্থিত হওয়ার আদেশ ছিল।

আর মাত্র দু' মাস পরে ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের যুব-অভ্যুত্থান হয়েছিল। কাজেই অনুমান করা সম্ভব আমাদের প্রস্তুতি কতখানি এগিয়ে গিয়েছিল। আমার দণ্ড বহাল রয়েছে। দিন তিনেক পরে জেলে যেতেই হবে। এই অবস্থায় কি করা যায়, তা স্থির করার জন্য হেড্‌ কোয়ার্টারে সভা বসল। দারুণ সমস্যা—যদি আমি এখন চার মাসের জন্য জেলে যাই, তবে আমাদের প্রস্তুতি সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কি অনিশ্চয়তার মধ্যে আমার মুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? চার মাস তো বটেই, তা ছাড়া আরও দু'এক মাস—যদি মুক্তি পাওয়ার পর প্রস্তুতির জন্য আরও কিছু সময় নিই, বেশি দেরি হতে পারে। এইরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে সামগ্রিক আক্রমণের প্ল্যান কি স্থগিত রাখা যুক্তিসঙ্গত হবে, না কি এখনই আমার আত্মগোপন করা উচিত?

সবার মনে হবে—এই প্রশ্ন আসবেই বা কেন? এটা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, আমার আত্মগোপন করতেই হবে। আপাতদৃষ্টিতে আমার আত্মগোপনকে সমস্যার সহজ সমাধান বলে মনে হবে। আমরা কিন্তু অত সহজে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি। এই সময় যখন আমাদের উপর পুলিশের প্রখর দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে এবং আমাদের সন্দেহজনক চলাফেরার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রতি মুহূর্তে তারা উদ্বেগের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে, এইরূপ অবস্থায় সামান্য চারটি মাসের কারাদণ্ড ভোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য যদি আত্মগোপন করি, তবে পুলিশের পক্ষে তাকে কোন এক আসন্ন ঝড়ের লক্ষণ বলে অনুমান করা কি অসম্ভব হবে?

এই কারণে আমার আত্মগোপন করা কেউ-ই সমীচীন মনে করে নি। অবশ্য দু'-তিন দিনের মধ্যে কোর্টে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে সামগ্রিক আক্রমণ চালানো সম্ভবও ছিল না। এইরূপ পরিস্থিতিতে দু'টি পথ আমাদের কাছে খোলা ছিল। কলকাতা হাইকোর্টে পুনর্বিচারের আবেদন করা। সেই ক্ষেত্রে যদি একবার হাইকোর্ট আপীল মঞ্জুর করে তবে আমাকে আবার জামিনে মুক্ত করে আনা সম্ভব। তাহলে সমস্যার সমাধান খুব ভালভাবেই হয়। আর যদি আপীল নামঞ্জুর হয় এবং অগত্যা আমাকে চার মাস কারাদণ্ড ভোগ করতেই হয়, তবে সেই অবস্থায় বসে না থেকে, সামগ্রিক প্ল্যানটিকে একটু রদ-বদল করে নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে—একটি ছোট দলকে অতর্কিতে জেলের উপর হাম্‌লা চালিয়ে আমাকে মুক্ত করে আনতে হবে, যাতে আমিও সামগ্রিক আক্রমণে অংশগ্রহণ করতে পারি। আমাদের সংগৃহীত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রথম শ্রেণীর সমস্ত কর্মীদেরই কাজ ভাগ করে দিয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেওয়া হয়ে গেছে। এখন জেল ভাঙার জন্য আবার নতুন কর্মীদল কোথায় পাব! কাজেই এদের মধ্য থেকে কোন একটি দলকে সরিয়ে এনে জেল ভাঙার কাজে নিযুক্ত করতে হবে। অনেক আলোচনার পর ঠিক হল ইউরোপীয়ান ক্লাব হাউস আক্রমণ স্থগিত রেখে সেই ছয়জনের দলটি জেল ভাঙার দায়িত্ব নেবে এবং ইতিমধ্যে সেইভাবে তারা উপযুক্ত রণকৌশল শিক্ষা করে প্রস্তুত থাকবে। টেলিফোনভবন, পুলিশ লাইন, এ. এফ. আই. আর্মারী—এই তিনটি প্রধান শত্রুঘাঁটি আক্রমণ করবার জন্য যাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের কাকেও প্রত্যাহার করা সম্ভব ছিল না।

অম্বিকাদা খুব জোরের সঙ্গে জানালেন, আপীলের ব্যবস্থা তিনি করবেনই এবং আরও বেশি জোর দিয়ে বললেন যে, কলকাতা হাইকোর্টে পুনর্বিচারের আবেদন গ্রাহ্য হবেই। মাস্টারদা প্রশ্ন করলেন—"কি করে আপনি এত জোর দিয়ে বলছেন?" অম্বিকাদা বললেন—"কি করে বলছি তা তো জানি না, তবে মনে হচ্ছে আপীলের শুনানী গ্রাহ্য হবেই।"

আমি নির্ধারিত দিনে নিম্ন আদালতে উপস্থিত হলাম। আমাকে রীতি অনুযায়ী জেলে পাঠান হ'ল—এখন আমি জেলের কয়েদী। অম্বিকাদা কলকাতায় গেলেন। তিনি খুব গর্ব করে বলে এসেছেন আপীল শুনানীর ব্যবস্থা তিনি যে-কোনভাবেই হোক করবেনই। তাঁর মুখে আমি পরে শুনেছিলাম যে, তিনি ক'টি রাত ঘুমুতে পারেন নি এই ভেবে, যদি কোন

অনিশ্চয়তার জন্য শেষ পর্যন্ত আপীলের শুনানী হাইকোর্ট অগ্রাহ্য করে, আর আমাকে জামিনে মুক্ত করা সম্ভব না হয়! এদিকে আমি জেলে বসে বসে বাইরের অবস্থা ভাবছি—কোন কিছু স্থির করতে পারছি না। কেবল মনে হচ্ছিল—যদি আপীল নামঞ্জুর হয়, তবে যে আমাদের স্ট্রাটেজীর রদ-বদল হবে! সেটা কোনমতেই ভাল লাগছিল না।

জেল সুপারিনটেনডেন্ট শ্রীজ্ঞান চ্যাটার্জী (সরকারী হাসপাতালের ইনচার্জ, সিভিল সার্জন) আমাদের পরিবারেরও ডাক্তার। তিনি জেলে আমাকে কোন কাজ করতে দিলেন না। তখনও জেলে কয়েদীদের জন্য কোন শ্রেণী-ভাগ হয় নি। সবাই Division III, অর্থাৎ জাঙিয়া কুর্তা পরতে হবে, সাধারণ কয়েদীদের মত আহারের ব্যবস্থা, লাইনে দাঁড়ান, লাইনে সেলাম, প্রভৃতি নিয়মকানুন মেনে চলার কাঠিন্যের মধ্যে থাকার নাম হ'ল তৃতীয় শ্রেণীর দণ্ডিত আসামী। যা হোক, আমার আর এইসব করার প্রয়োজন হ'ল না। আমাকে সুপারিনটেনডেন্ট বললেন—"তোর কাজ হল—নিজে রাঁধবি আর খাবি।" তিনি বয়সে আমাদের চেয়ে বড় আর পারিবারিক ডাক্তার হিসাবে তিনি আমাকে এইভাবেই সম্বোধন করতেন। জ্ঞানবাবু বিশ্বাস করতেন না যে, আমি রাধিকাবাবুকে লাঠি দিয়ে নিজে আঘাত করেছি। আমার সামনেই তাঁকে অনেকবার জেলারকে বলতে শুনেছি—"আমি বিশ্বাস করি না যে, অনন্ত নিজে কখনও রাধিকাবাবুকে লাঠি দিয়ে আঘাত করেছে।" আমাদের সম্বন্ধে জ্ঞানবাবুর সব সময়ে উচ্চ ধারণা ছিল।

একদিন, দুদিন, তিনদিন হয়ে গেল কোন খবরই নেই। রোজই মনে করছি, আজই বোধ হয় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে টেলিগ্রাম এল—আজই বোধ হয় জামিনে মুক্তি পাব! এইভাবে আরও তিনদিন আশা-নিরাশায় কাটল। সাতদিনের দিন দোলের ছুটি। সুপারিনটেনডেন্ট রোজকার মত আজ আর জেল পরিদর্শন করতে এলেন না—ছুটির দিন সাধারণত জেল পরিদর্শন করা হয় না। এই ছুটির দিনে যে আমাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হবে না বা কলকাতা হাইকোর্ট থেকেও কোন খবর আসার সম্ভাবনা নেই, তা স্থির বুঝেছিলাম। যদি কোন সুখবর আসে, তাও আগামীকালের পূর্বে কোনমতে জানার উপায় নাই। তাই দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষ করে, নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিলাম, আর প্রতিদিনের মত আগামীকালের অপেক্ষায় ছিলাম —যদি জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ পায়!

প্রায় একটার সময় হঠাৎ পাহারায় রত জেল ওয়ার্ডার খবর দিল যে, আমাকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার আদেশনামা জেল অফিসে এসেছে এবং আমি যেন তার সঙ্গে তখনই যাই—জেলার বসে আছেন।

জামিনে মুক্তি পাব—আর কি তর সয়! মুহূর্তে তৈরি হয়ে জেল গেটে এলাম। দেখি, লোকনাথ বল ও আমাদের দলের দশ-পনেরো জন কর্মী এসেছে আমাকে জামিনে মুক্ত করে নিয়ে যেতে। তাদের দেখে আমার আনন্দের সীমা নেই। মনে মনে অম্বিকাদার প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম। তাঁর একান্ত চেষ্টায় এটা সম্ভব হয়েছে। পরে যখন অম্বিকাদার সঙ্গে দেখা হ'ল তখন তাঁর কাছে শুনেছি যে হাইকোর্ট আমার আপীলের দরখাস্ত প্রথমে সরাসরি

নামঞ্জুর করে। যখন আপীল নামঞ্জুর হল তখন অম্বিকাদা যেন একেবারে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। কি যে হবে, কি যে করবেন তা যেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। আরও অনেক চেষ্টার পর নাকি 'Motion accepted' হয়। এই Technical terms-এর অর্থ কি এবং Appeal ও Motion-এ পার্থক্য কি তা আমি আজও জানি না। অবশ্য এই বিষয়ে আমাদের জানার কোন প্রয়োজনই ছিল না—প্রয়োজন ছিল মাত্র একটি—আমি কোনমতে আইন-আদালতের মারফত জেলের বাইরে আসতে পারছি কি না!

সেই ক'টি দিন আমাদের সকলের যে কি গভীর উৎকণ্ঠায় কেটেছে তা আমরা ছাড়া আর কেউ জানে না। জেল গেটে এসে লোকনাথ এবং অন্য বন্ধুদের দেখে আমার আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইল না। লোকনাথের কাছে শুনলাম সে পাহাড়ের উপরে জ্ঞান চ্যাটার্জীর বাংলোতে গিয়ে জামিনে মুক্তি দেওয়ার আদেশনামা তৈরি করিয়ে নিয়ে এসেছে। তারপর যা হয় আর কি—'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়!' জেলারবাবু খেয়ে-দেয়ে ঘুমাতে গেছেন। তাঁর ঘুমাবার সময়—তিনি এখন উঠবেন কেন? চারটার সময় যখন জেল অফিসে আসবেন, তখন যা করার করবেন। তিনি লোকনাথদের সঙ্গে দেখাও করলেন না। সেপাইকে দিয়ে খবর পাঠালেন, তারা যেন চারটার সময় আসে। জেলারবাবু তখনও এইরূপ উপেক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি—তাদের ঐভাবে চারটার সময় ফিরে আসতে বললে তার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তাও আন্দাজ করতে পারেন নি। জেল-সেপাই এসে যেই বলল—জেলারবাবুর নিদ্রায় ব্যাঘাত হবে, এখন তিনি কিছু করতে পারবেন না, তা'রা যেন আবার চারটার সময় আসে, তখন লোকনাথ গর্জন করে উঠল এবং জেলারবাবুর বাড়ীর বন্ধ দরজায় সজোরে করাঘাত করতে লাগল—সেপাই-এর কোন বাধাই মানল না। জেলারবাবু বিরক্ত হয়ে বাইরে এলেন—রাগ করে কিছু বলতে যাবেন—কিন্তু লোকনাথের সঙ্গে অতজন বলিষ্ঠ যুবককে দেখে নিজেকে সামলে নিলেন। লোকনাথ জেলারবাবুকে বলল যে, জামিনে মুক্তি দেওয়ার আদেশ এখুনি দিয়ে দিতে হবে—তারা কেউ এখনও খায় নি—দেরি তাদের সহ্য হচ্ছে না। জেলারবাবু কোনরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা করতে ভরসা পেলেন না—কারণ, সবারই তখন উগ্রমূর্তি।

আমি মুক্তি পেয়ে জেল গেটের বাইরে এলাম। সবাই উল্লাসের সঙ্গে আমাকে অভ্যর্থনা করল। আমিও তাদের অভ্যর্থনার উপযুক্ত জবাব দিলাম। তারা সবাই আবীর ও রং খেলেছে—আজ যে দোলের দিন! আমার দোল খেলা—রং দেওয়া, আবীর মাখা ইত্যাদি কোনদিনই ভাল লাগত না। আমার বন্ধুরাও খুব একটা রং খেলতো না—অত্যন্ত খুব দোল খেলতো বলে শুনি নি। তবে সেই বিশেষ দিনটিতে তারা কেউ হয়ত আমাকে রং দিয়েছিল। আমি পাল্টা আবীর বা রং কাউকে দিয়েছি কিনা মনে পড়ছে না—আমি তখন খবরের জন্য ব্যস্ত। মাস্টারদা, গণেশ ও অন্যান্যদের খবরাদি নিলাম। তারপর মোটরে সোজা আমার বাড়ি চলে এলাম। আমাদের বাড়ি বোধ হয় জেলখানা থেকে আধ মাইলের মধ্যে হবে।

মা, বাবা, দাদা, দিদি, বৌদির সঙ্গে দেখা হল। দোল-পূর্ণিমার শুভদিনে ছাড়া পেয়েছি বলে সংস্কারগ্রস্ত মনে বাবা, মা আশ্বস্ত হয়ে-

ছিলেন সত্য—কিন্তু এই দোলপূর্ণিমার শুভদিনটি কি সবার জন্য সমান মঙ্গলজনক!

বাইরে বসার ঘরে আমাদের দলের প্রথম সারির চার-পাঁচ জন তরুণ বন্ধু উপস্থিত ছিল। তাদের বসিয়ে রেখে বাড়ির ভিতর এসেছিলাম। স্নান সেরে নিয়ে তৈরী হয়ে তাদের সঙ্গে বেরিয়ে যাব সেই ইচ্ছা ছিল। গণেশের বাড়ি গিয়ে সব খবর আগে নিতে হবে—কোথাও কোন অসুবিধা, বাধা-বিঘ্ন বা কাজে কোন অন্তরায়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে কি না।

আমি তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে যাচ্ছি, এমন সময় খুব ব্যস্ত হয়ে বসার ঘর থেকে একজন বন্ধু ডাকল—যেন দ্বিরুক্তি না করে আমি তক্ষুণি বাইরে চলে আসি—আমার জন্য একজন অপেক্ষা করছে। এভাবে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আমাকে ডেকে পাঠানোতে আমি অত্যন্ত বিচলিত হলাম। স্নানের ঘরে আর যাওয়া হল না। ছুটে বাইরে এলাম কি ব্যাপার জানতে।

এক ঘণ্টাও হয় নি আমি জামিনে মুক্তি পেয়ে বাড়ী ফিরে এসেছি। প্রস্তুতিপর্বের শেষ মুহূর্তে এত বড় সঙ্কট কাটিয়ে উঠেছি—এরই মধ্যে আবার হ'ল কি? কে একেবারে অধীর হয়ে আমাকে ডেকে পাঠাল?

বাইরে এসে দেখি একজন ভগ্নদূত দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয় সে খুব বিচলিত। সারা মুখে তার ভীতির চিহ্ন। ভালভাবে কথাও যেন বলতে পারছে না। কথা ভালভাবে বলতে না পারার কারণ বোধ হয় আমিই। সেই আগন্তুক বন্ধুকে আমি ঠিক চিনি না। যারা আমার বাড়িতে উপস্থিত ছিল তারাও তাকে কেউ চেনে না। আমি ঠিক মনে করতে পারছিলাম না তাকে আগে কোথাও দেখেছি কিনা। আর দেখলেও বা—কোথায় ও কোন সময়ে দেখেছি তা মনে পড়ছিল না। তাই আমি ঘন ঘন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছিলাম। যত না বুঝতে চেষ্টা করছিলাম তার চেয়েও বেশি লক্ষ্য করতে চাইছিলাম আমার ঐরূপ উগ্র ও তীব্র দৃষ্টির সামনে তার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। বোধ হয় তাকে মাস্টারদার বাড়িতে, অর্থাৎ কংগ্রেস অফিসে কখনও দেখেছি। খুব আবছা আবছা মনে পড়ছে কিন্তু পুরোপুরি কিছু বুঝতে পারছিলাম না সে আমাদের দলের কোন্ স্তরের ছেলে। গ্রামের ছেলেরা, যাদের সঙ্গে তারকেশ্বর, রামকৃষ্ণদের বেশি যোগাযোগ ছিল, তাদের সঙ্গে আমরা, অর্থাৎ আমি গণেশ লোকনাথ প্রভৃতি খুব মিশতাম না—তার কারণ সংগঠনের সেই অংশকে আমরা পুলিশের চোখের অন্তরালে রাখতে চাইছিলাম। শহরের প্রায় সব ছেলেরা আমাদের সঙ্গে খোলাখুলি মিশত বলে তাদের সম্বন্ধে পুলিশ খবর রাখত। এই প্রকাশ্য অংশের সঙ্গে আমরা গ্রামের গোপন বিভাগের খোলা-খুলি যোগাযোগ সব রকমে পরিহার করে চলতাম। সেই জন্য এই বন্ধুকে ঠিক চিনে উঠতে পারছিলাম না।

আমি প্রশ্ন করলাম—"তোমাকে আমি কোথায় দেখেছি? তুমি বাড়ী চিনলে কি করে? কে তোমাকে পাঠিয়েছে? তোমাকে এত বিচলিত মনে হচ্ছে কেন?" ইত্যাদি ইত্যাদি—।

সে অবশ্য আমার সব প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছিল। দেখতে পাচ্ছিলাম সে অস্থির হয়ে উঠেছে, আগে সংবাদটি দিতে। সেটি সে আমাকে গোপনে

বলতে চাইছিল। আমি তাকে নিয়ে অন্য একটি ঘরে গেলাম খবরটি শোনবার জন্য। লেখাটি পড়তে হয়ত দেরি হবে কিন্তু তখন আমি শুধু শুধু সময় নষ্ট করি নি। যত তাড়াতাড়ি পারি আমার প্রশ্ন শেষ করেছি, তাকে বুঝে নিতে চেষ্টা করেছি এবং তৎক্ষণাৎ তাকে একান্তে ডেকে এনেছি। সে যা বলল তাতে আমি খুব শঙ্কিত, বিচলিত ও দুর্ভাবনায় পড়লাম।

সে বলল যে তার নাম শঙ্কর। খবরটা এই—রামকৃষ্ণ ও সে পাথরঘাটায় রামকৃষ্ণের ভগ্নীপতির বাড়িতে Percussion Cap (আঘাতে বিস্ফোরিত হবার মত ক্যাপ) তৈরি করার জন্য বিস্ফোরক দ্রব্য সংমিশ্রণ করছিল। তাদের অসাবধানতার জন্য দারুণ বিস্ফোরণ হয়েছে আর তাতে রামকৃষ্ণের বুক হাতমুখ ভীষণভাবে পুড়ে গেছে। রামকৃষ্ণ খুব বিপন্ন—সেখানে সে একা আছে। বাড়ি থেকে এক্ষুণি রামকৃষ্ণকে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। আর বেআইনী সব বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরি করার যন্ত্রপাতিও কালবিলম্ব না করে সরিয়ে ফেলা অত্যাবশ্যক। রামকৃষ্ণ তাকে এই বলে আমার কাছে পাঠিয়েছে। আরও বলল যত শীঘ্র সম্ভব রামকৃষ্ণকে First aid দিতে হবে এবং ডাক্তার দেখাবার বন্দোবস্ত না করলেই নয়।

আমি নিশ্বাস বন্ধ করে সব শুনলাম। কি ভয়ানক কাণ্ড! কি সংকট-পূর্ণ মুহূর্ত! এইমাত্র জেল থেকে এলাম। এখনও শেষ প্রস্তুতির জন্য যা যা বাকি সে সব আমাদের দ্রুত সারতে হবে। এখন আবার এই এক নতুন বিপদ। মনে মনে বললাম—আসুক বিপদ, আমরা ভয় করব না। বিপদ আছে, আঘাত আছে—তাইত বক্ষে পরাণ নাচে! বিপদ আসুক, বাধা আসুক—আসুক শত বিঘ্ন; তারই মধ্যে পথ করে নিয়ে যেতে হবে। এইরূপ কঠিন পরীক্ষার মধ্যে আমাদের এগোতে হবে—তাই তো জানতাম এবং আমাদের সাথীদের এতদিন তাই শিখিয়েছি। যখন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে তখন তার সম্মুখীন হতেই হবে—এ বিষয়ে কোন দ্বিধাই থাকতে পারে না।

তবে দ্বিধা এসেছিল—এবং ভাবছিলাম পুলিশের কোন ফাঁদ নয় তো? সে কি করে জানল যে আমি আজ এক্ষুণি ছাড়া পেয়ে এসেছি? কেন সে গণেশের বাড়ি গেল না? এই সব প্রশ্ন একটার পর একটা খুব দ্রুতভাবে মনকে আলোড়িত করছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করকে আমি তন্ন তন্ন করে দেখতে চেষ্টা করছিলাম। খবর যে রকম সাংঘাতিক তাতে যেমন দ্বিরুক্তি বা বিলম্বের অবকাশ ছিল না, তেমনি আবার বোকার মত পুলিশের ফাঁদ বা খপ্পরে গিয়ে পড়ি, তাও ভাবতে পারছিলাম না। তবু যতই বিপদের সম্ভাবনা থাকুক না কেন রামকৃষ্ণের অবস্থা ও ঐরূপ দুর্ঘটনা সম্বন্ধে জানার পর স্থির থাকা সম্ভব ছিল না। তাই মনে সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও বিপদের সম্মুখীন হতেই হল।

আমার সাতদিনের অনুপস্থিতিতে আমার পিস্তলটি দিদির হেফাজতে আমার বাক্সে রেখে গিয়েছিলাম। ছুটে বাড়ির ভিতর গেলাম—পিস্তলটি নিয়ে তক্ষুণি ফিরে এলাম। শঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে মোটরে গণেশের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম। গণেশকে সব জানালাম, নরেশ আর বিধুকে তাদের নিজ নিজ রিভলভার নিয়ে আমার সঙ্গে আসতে বললাম। গণেশকে সাবধানে থাকতে বলে

ও এটা যদি পুলিশের কোন ফাঁদ হয় তবে ভবিষ্যৎ সামলাতে বলে আমরা চারজন—নরেশ, বিধু, শঙ্কর ও আমি পাথরঘাটার বাড়ির (দুর্ঘটনা যেখানে ঘটেছে) উদ্দেশ্যে রওনা হ'লাম। পথে তাদের সঙ্গে প্ল্যান করে ফেললাম—শঙ্কর প্রথমে দেখে আসবে এবং আমাদের নির্দেশ মত রামকৃষ্ণকে গাড়িতে তুলে দেবে। শঙ্কর গাড়ি থেকে নামলেই নরেশ, বিধু ও আমি আমাদের কৌশল অনুযায়ী position নিয়ে অপেক্ষা করব। যদি পুলিশের ফাঁদ হয় তবে যেন তাদের কৌশল পরাভূত করে আমরা উধাও হতে পারি তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকব। শঙ্কর চলে গেল। আমরা অপেক্ষা করছি। শঙ্কর খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসে সংকেত দিল। আমরা ইঙ্গিতে জানালাম রামকৃষ্ণকে নিয়ে আসতে।

অর্ধদগ্ধ অবস্থায় দিনের বেলায়—দুপুর তিনটে নাগাদ রামকৃষ্ণ আমার গাড়িতে এসে উঠল। আশে-পাশে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। আমি কেবল রামকৃষ্ণ ও নরেশকে সঙ্গে নিলাম। বিধুকে পাঠালাম গণেশের কাছে সব খবর জানাতে। রামকৃষ্ণকে গাড়িতে নিয়ে আমরা তক্ষুণি সে স্থান ত্যাগ করলাম। কিন্তু যাব কোথায়? আগে থেকে গোপন Shelter (আশ্রয় স্থান) ঠিক করে না রাখলে ঐ রকম অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় আত্মগোপন করে থাকতে পারবে তেমন কোন নিরাপদ বাড়ি তক্ষুণি পাব কোথায়? যেভাবে শরীরের উপরের অর্ধেক পুড়ে গেছে তা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখাও সম্ভব নয়। পোড়া স্থানের এক বীভৎস দৃশ্য। ক্ষতস্থান ঢাকা দেওয়া সম্ভব নয়—ব্যাণ্ডেজ করে রাখাও যায় না। ঐ অবস্থায় কার বাড়িতে আশ্রয়ের আশায় যাব? কোন্ ডাক্তারকে দিয়েই বা চিকিৎসা করাব? সমস্যার আর অন্ত নেই! বর্তমানে রামকৃষ্ণের আশ্রয়স্থল হল আমার গাড়ি আর ডাক্তার হল আমাদের দুইজন প্রথম শ্রেণীর সদস্য নরেশ আর বিধু। দু'জনই চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুল থেকে সবে মাত্র কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছে। বিধু স্বর্ণ-পদকও পুরস্কার পেয়েছিল। রামকৃষ্ণের প্রাথমিক চিকিৎসা নরেশ ও বিধুই করেছে। কিন্তু তারাও অবস্থার গুরুত্ব বুঝে কোন বড় ডাক্তার এনে চিকিৎসা করা যায় কিনা তার চেষ্টা করতে বলল আমাদের।

গাড়িতে নিয়ে আর কতক্ষণ ঘোরা যায়? কোন আশ্রয়ে গিয়ে তো উঠতেই হবে! দু'-একটি জায়গায় খোঁজ করা হল কিন্তু তাদের অমত থাকাতে কোন সাহায্য পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত মাত্র দু'দিনের জন্য একটা আশ্রয় পাওয়া গেল এক Sympathiser (সহানুভূতিশীল ব্যক্তি)-এর বাড়িতে। সেই বাড়িটি কার ছিল তা আজ আর মনে পড়ছে না। সেই বাড়িতে রাম-কৃষ্ণকে নামিয়ে দিয়ে সোজা গণেশের বাড়ি চলে গেলাম। গণেশ, মাস্টারদা ও আমি পরামর্শ করে ঠিক করলাম যে, আমাদের সংগঠনের প্রকাশ্য অংশের সভ্যদের উপর রামকৃষ্ণকে দেখা শোনার ভার না থাকাই উচিৎ। তাই সবরকম তত্ত্বাবধানের প্রত্যক্ষ ভার দেওয়া হল তারকেশ্বর দস্তিদারের উপর। তারক সংগঠনের গোপন অংশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখে চলত। তারকেশ্বর দস্তিদার তখন খুব সম্ভব B. Sc. Final পরীক্ষা দিয়েছে। তার গতিবিধি খুব গোপন ছিল অর্থাৎ শরীরচর্চার ক্লাবে বা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগঠনে সে যোগ দিত না। মাস্টারদার সাথে এক সঙ্গে তারকেশ্বর দস্তিদারের একই দিনে

ফাঁসী হয়েছে। সে মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ এই কাহিনীর যথাস্থানে বিবৃত করব।

তারকেশ্বর দস্তিদারের মত দায়িত্বশীল কর্মীর উপর এই গুরুভার ন্যস্ত হ'ল। অন্যান্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তারককে বললাম—সে যেন একদিনের মধ্যেই একটি বাড়ি ভাড়া করে এবং কোন উপযুক্ত বিশ্বাসী সভ্যকে সেই বাড়িতে রামকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করে। এদিকে চিকিৎসার জন্য বড় ডাক্তার দেখান প্রয়োজন। কে ভার নেবে? গণেশ স্বয়ং ভার নিল—রামকৃষ্ণকে চিকিৎসা করবার জন্য কোন বড় ডাক্তারকে অনুরোধ করবে। স্বর্গীয় জগদারঞ্জন বিশ্বাস চট্টগ্রামে তখন নাম করা ডাক্তার। গণেশের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ডাক্তারবাবু আমাদের প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলেন—আমাদের শরীর গঠন, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি দেখে তিনি খুব আনন্দ পেতেন—আমাদের উৎসাহ দিতেন। যতটুকু জানা ছিল, তিনি আমাদের একজন সমর্থক ও আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আমাদের সঙ্গে তিনি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করবেন বলে মনে করি নি। যদি কোন কারণে আমাদের সঙ্গে তিনি একমত হতে নাও পারেন তবু বিরুদ্ধে যাবেন বলে কখনও ভাবি নি। গণেশের বিশ্বাস ছিল—জগদাবাবুর কাছে গিয়ে যদি এই বিপদে সাহায্য চাওয়া যায়, তবে তিনি কখনও বিমুখ করবেন না। গণেশ জগদাবাবুর কাছে সাহায্য চাইল। সব খুলেই তাঁকে বলা হ'ল —কারণ, তিনি ডাক্তার এবং আমাদের দরদী বন্ধু। তিনি যদি মনে করেন যে, তাঁকে মিথ্যা বলছি এবং বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়েছে সে কথা গোপন করছি, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া আমাদের অনুকূলে না গিয়ে বরং বিরুদ্ধে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই তাঁর কাছে গোপন না করাই বাঞ্ছনীয় বলে গণেশ মনে করে-ছিল। তাতে আমাদের পক্ষে ফল যে খুবই ভাল হয়েছিল সে কথা পরে বলছি।

জগদাবাবু গণেশের সঙ্গে এসে রামকৃষ্ণের চিকিৎসার ভার নিলেন। ডাক্তারবাবুকে আনার ও নেওয়ার ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হ'ত যেন রাম-কৃষ্ণের অবস্থান সংবাদ গোপন থাকে। আমাদের খুব কঠোর নির্দেশ ছিল—রামকৃষ্ণকে যে বাড়িতে আমরা রেখেছি সেই বাড়িতে যেন ডাক্তারবাবুকে কখনও নেওয়া না হয়। তিনি অন্য কোন একটি বাড়ীতে রামকৃষ্ণকে পরীক্ষা করবেন এবং অবস্থা অনুযায়ী ঔষধ পথ্য প্রভৃতির নির্দেশ দিয়ে চলে যাবেন। আর ডাক্তারবাবু চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী রামকৃষ্ণকে তার স্থায়ী আশ্রয়ে স্থানান্তরিত করতে হবে। এই ভাবে খুব সন্তর্পণে এবং সব দিকে কড়া নজর রেখে আমাদের চলতে হয়েছিল। কারণ, রামকৃষ্ণের ভগ্নীপতি সরকারী চাকরী করতেন এবং তার উপরও উন্নতির আশায় সব কিছু করতে পারেন বলে আমাদের ধারণা ছিল।......ধারণা আমাদের ভুল হয় নি—প্রথম সুযোগেই রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ভগ্নীপতি কালী-প্রসন্নবাবু অফিস থেকে বাড়ি ফিরে সমস্ত ঘটনা তাঁর ছোট মেয়েটির কাছে শুনলেন। আর কাল বিলম্ব করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না—পাছে তাঁর পদোন্নতিতে ব্যাঘাত ঘটে বা চাকরী যায়! তিনি সোজা গিয়ে পুলিশের কাছে ঘটনার আদ্যোপান্ত বিবরণ দিলেন। তারপর পরবর্তী অধ্যায়টি সুরু

হ'ল—প্নলিশ ও আমাদের মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতায়—কে কাকে পরাস্ত করতে পারে।

নিজ মুখে না বলে সরকারী পক্ষের ভাষ্য থেকেই আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। আমাদের মামলার রায়ে লিপিবদ্ধ আছে—

"The circumstances in which Ramkrishna's injuries were caused, his hasty removal from his brother-in-law's house and concealment in one house after another in different parts of the town, the arrangements made for his medical treatment and nursing by Ganesh Ghosh and associates, his subsequent complete disappearance, all indicate according to the prosecution that Ramkrishna had been injured while engaged in a criminal activity on behalf of the party, viz, the preparation of a bomb." (Judgement Copy Page 11, of Armoury Raid case No. 1 of 1930).

জজসাহেব সাক্ষ্য-প্রমাণ আলোচনার পর উপরের ক'টি লাইনে ব্যক্ত করলেন—রামকৃষ্ণকে যেভাবে আমরা নিমেষে সরিয়ে নিয়ে গেলাম, তার পর একটার পর একটা বাড়ি বদল করে ও সর্বশেষে তাকে সম্পূর্ণভাবে লুকিয়ে রাখতে সমর্থ হলাম, এবং লুকিয়ে রেখে ডাক্তার ও নার্সের ব্যবস্থা যেভাবে গণেশ ও আমরা সফলতার সঙ্গে করেছি তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না যে, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস আমাদের দলের জন্যই সেই বাড়ীতে বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরি করছিল।

জজসাহেবের আক্ষেপ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। সেই আক্ষেপ তিনি পক্ষান্তরে করেছেনও। কিন্তু এইখানেই এই পর্ব শেষ হয় নি—আমাদের সমস্যা আরও বেড়ে যেতে লাগল এবং পুলিশের কর্মতৎপরতাকে বার বার পরাস্ত করে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

রামকৃষ্ণের ভগ্নীপতি কালীপ্রসন্নবাবু প্রাণ খুলে মনের সাধে পুলিশের কাছে আমাদের বিরুদ্ধে সব বললেন। পুলিশ প্রাথমিক তথ্য পাওয়ার পর গোপনে রীতিমত অনুসন্ধান করতে লাগল। চট্টগ্রামের বিভিন্ন ডাক্তারখানায়ও ডাক্তারবাবুদের বার বার প্রশ্ন করে জানতে চাইছিল—১৪ই মার্চ দোলযাত্রার দিনে তাঁদের ডিসপেনসারীতে বা কারো বাড়িতে গিয়ে তাঁরা কেউ বিস্ফোরণে আহত কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসা করেছেন কিনা। এইভাবে অনুসন্ধান করতে করতে প্রায় ১০।১২ দিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা পুলিশ, ডাক্তার জগদা বিশ্বাসের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। জগদাবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারল যে তিনি দোলযাত্রার পরের দিন অগ্নিদগ্ধ এক ব্যক্তিকে চিকিৎসা করেছেন। সেই আহত ব্যক্তিটির কাছে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, লুচি-ভাজার সময় দুর্ঘটনায় সে পুড়ে গেছে। কোন্ বাড়ীতে রামকৃষ্ণকে চিকিৎসা করেছেন জগদাবাবুকে তাও বলতে হ'ল। অবশ্য তাঁর পক্ষে অস্বীকার করার কথাই ওঠে না।

জগদাবাবুর সঙ্গে সন্ধ্যার সময় পুলিশের এই সব কথা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া যায়, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—না হয় কিছু-

ক্ষণের মধ্যেই পুলিশ সেই নির্দিষ্ট বাড়িতে হানা দেবে—বা সেই রাত্রেই তারা নিশ্চয়ই রামকৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করবে। আমরা কিন্তু তখনও জানি না যে অবস্থা এতদূরে গড়িয়েছে। যাদের ওপর রামকৃষ্ণের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার ছিল তারা যে আমাদের সম্পূর্ণ অগোচরে, আমাদের নির্দেশের গুরুত্ব অবহেলা করে, চিকিৎসা করাবার জন্য রামকৃষ্ণের স্থায়ী আশ্রয়স্থলে জগদাবাবুকে নিয়ে যাবে—এ আমরা ভাবতেই পারি নি। ক্ষতি যা হওয়ার তাতো হয়েছেই! তবু মন্দের ভাল—সন্ধ্যা গেল, রাত গেল, তারপর খুব ভোরে ভোরে জগদাবাবুর লোক গণেশের বাড়ি গিয়ে—পুলিশের সঙ্গে গত সন্ধ্যায় জগদাবাবুর যা যা কথাবার্তা হয়েছে, গণেশকে সব জানাল। কি সর্বনাশ! এত সময় অতিবাহিত হয়েছে! এখন কি আর কিছু করবার আছে! হয়ত এতক্ষণে রামকৃষ্ণ ধরা পড়েছে—হয়ত পুলিশ বেরিয়ে পড়েছে আমাদের বন্দী করবার জন্য।

যা হোক—অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিষ্ক্রিয় থাকা যায় না। গণেশ আমার কাছে তৎক্ষণাৎ খবর পাঠাল। আমি ছোট গাড়িটি নিয়ে তখনি তার কাছে হাজির হলাম। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে গণেশ গাড়িতে উঠল এবং আমাকে দ্রুত জগদাবাবুর বাড়িতে যেতে বলল। পথে গাড়িতে গণেশ আমাকে সব কথা জানিয়ে গুরুতর পরিস্থিতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করল। জগদাবাবুর বাড়ি ছুটে চলেছি—তাঁর মুখে বিবরণের খুঁটিনাটি সব জেনে নেওয়ার জন্য। খুব ভোরেই জগদাবাবুকে ঘুম থেকে তুলে তাঁর কাছে শুনলাম যে, পুলিশ রামকৃষ্ণের বর্তমান বাসার ঠিকানা জেনে নিয়েছে।

জগদাবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম কংগ্রেস অফিসের দিকে—মাস্টারদার সঙ্গে পরামর্শ করতে। যাওয়ার সময় পথে মেডিকেল স্কুলের বোর্ডিং-এ নরেশ রায় ও বিধু ভট্টাচার্যকে জানালাম—তারা যেন এই মুহূর্তেই প্রস্তুত হয়ে আসে—আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। তারা নিজ নিজ রিভলভার নিয়ে দ্রুত আমাদের গাড়িতে এসে উঠল। আমাদের চারজনের সঙ্গেই রিভলভার। শোঁ শোঁ করে গাড়ি ছুটেছে কংগ্রেস অফিসের দিকে—মাস্টারদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে এবং কালক্ষয় না করে মারাত্মক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলেই নয়।

মাস্টারদাকে আমরা এই জটিল পরিস্থিতির আদ্যোপান্ত বিবরণ খুব সংক্ষেপে দিলাম এবং প্রস্তাব করলাম যে, দেরি না করে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের বাসায় আমাদের যাওয়া চাই। তারপর যদি সম্ভব হয়, এবং যদি পুলিশ তখনও তাকে গ্রেপ্তার না করে থাকে, তবে সাদা বা খাকী পোশাক পরিহিত পুলিশ বেষ্টনী উপেক্ষা করেও রামকৃষ্ণকে নিয়ে চলে আসা আমাদের উচিত। যদি পুলিশ তাকে দগ্ধ অবস্থায় বন্দী করতে পারে তবে সাক্ষীসাবুদ দিয়ে মামলা রুজু করা সম্ভব হবে। আর যাকে নিয়ে তাদের মামলা উপস্থিত করতে হবে সেই যদি পুলিশের আওতার বাইরে থাকতে পারে তবে কেবল শোনা কথার উপর নির্ভর করে কোন মামলা চলতে পারে না। মাস্টারদাও আমাদের প্রস্তাবে মত দিলেন এবং আমরা আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। কেউ বলতে পারে না রামকৃষ্ণকে কি অবস্থায় পাওয়া যাবে! এখন

সকাল ছয়টা সাড়ে ছয়টা হবে। চারিদিকে দিনের আলো। গতকাল সন্ধ্যার সময় পুলিশ এই বাসস্থানের সন্ধান পেয়েছে।

কংগ্রেস অফিসটি ছিল আস্‌কর খাঁ দীঘির পশ্চিম পাড়ে। আর রামকৃষ্ণের গোপন বাড়িটি কংগ্রেস অফিসের পাঁচশ গজের মধ্যে আস্‌কর খাঁ দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পাহাড়ের ঢালু স্থানে অবস্থিত। আমরা যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গে সেই বাড়ির খুব কাছাকাছি গেলাম। দূর থেকে দেখে খুব ভাল বোঝা গেল না। বুঝতে পারলাম না পুলিশ ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার পর দলের অন্য লোকদের ধরবার জন্য বাসার ভিতর ঘাপটি মেরে বসে আছে কিনা! বাংলাদেশে এইরূপ শোচনীয় পরিণতির বহু নজীর আছে যে, পুলিশ গোপনে সংবাদ পেয়ে বাড়ি খানাতল্লাসী করেছে এবং বিপ্লবী যুবকদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার পরও গোপনে সেই স্থানে ওৎপেতে বসে থেকেছে, আর পর পর দলের অন্যান্য যুবকেরা সেখানে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করেছে।

১৯২৯ সালে, আমাদের সশস্ত্র যুব-অভ্যুত্থানের প্রায় বছরখানেক আগে —নিরঞ্জন সেনের নেতৃত্বে মেছুয়াবাজারের এক বাড়িতে বিপ্লবী যুবকেরা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত। তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল গণেশের মারফত। গণেশ তাদের কাছে গোপনে চট্টগ্রামে সুবোধ চৌধুরীর ঠিকানাটি দিয়েছিল সাংকেতিক চিঠি মারফত যোগাযোগ রাখার জন্য। সেই গোপন বাড়ীতে পুলিশ নিরঞ্জন সেনকে বন্দী করে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে প্রথম একজন বা দুইজন যুবককে পুলিশ রিভলভার ও তাজা বোমা সহ গ্রেপ্তার করল। দলের একজন বিশ্বাসী যুবক বোমা ও পিস্তলটিকে সযত্নে তরিতরকারী ও মাছ ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে নিয়ে এই মেছুয়াবাজারের বাড়িতে আসছিল। "ঘ্রাণ পেয়ে" পুলিশ তাকে বন্দী করে সেখান থেকে সরিয়ে নিল এবং বেশ প্রস্তুত হয়েই ঘরের ভিতর আত্মগোপন করে অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর একের পর এক তাদের দলের অন্য যুবকেরা যখনই এসেছে তক্ষুণি ধরা পড়েছে। তারপর সেই গোপন ঠিকানার সূত্র ধরে চট্টগ্রামে রেলওয়ে ক্লাস কোয়ার্টারে সুবোধ চৌধুরীর বাড়ীও খানাতল্লাসী হ'ল। তাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে কিন্তু গ্রেপ্তার করে নি। পরে সুবোধ চৌধুরী চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থানে প্রথম সারিতে অংশ নিয়েছিল, জালালাবাদ যুদ্ধে গণতন্ত্র বাহিনীর অংশীদার হয়ে শত্রুকে পরাস্ত করার গৌরব অর্জন করেছে। কালারপোল যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে শত্রুপক্ষীয়দের সে নিহত করেছে ও নিজে বন্দী হয়েছে; তারপর আমাদের সঙ্গে দ্বীপান্তরের সাজা নিয়ে গেল কালাপানি। সুবোধ চৌধুরী বর্তমানে বাম কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ও একজন এম-এল-এ।

রামকৃষ্ণের গোপন আস্তানার কাছে পেঁছে কিছুদিন আগেকার মেছুয়াবাজারের বাড়ির নিদারুণ ও শোচনীয় পরিণতির কথা মনে পড়ল। আমাদের বন্ধু নিরঞ্জন সেন মেছুয়াবাজারের বাড়িতে পুলিশের ফাঁদে পড়ে যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সেই শোচনীয় স্মৃতি আমাদের মন থেকে তখনও মুছে যায় নি—তাই চট করে রামকৃষ্ণের বাসার ভিতরে ঢুকে পড়া যুক্তিযুক্ত মনে করি নি। আমি গাড়ি নিয়ে রাস্তার উপর রইলাম। নরেশ

একজন বন্ধুর সংগে সন্তর্পণে রামকৃষ্ণের বাসায় গেল তাকে ডেকে আনতে। দিনের আলোতে মুখ বুক ও হাতের দগ্ধ চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও লোকের দৃষ্টি উপেক্ষা করে রামকৃষ্ণকে গাড়িতে চলে আসতে নির্দেশ দিলাম। রিভলভার হাতে গণেশ ও বিধু পুলিশের অতর্কিত আক্রমণ ব্যাহত করার জন্য সুবিধে-জনক স্থানে প্রস্তুত হয়ে রইল। সাদা পোষাকে দুই তিন জন লোককে দেখতে পেলাম। তাদের সবাই বা কেউ কেউ যে পুলিশের লোক তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। অন্য কোথাও দৃষ্টির অগোচরে ঘাপটি মেরে পুলিশ অপেক্ষা করছিল কিনা তা ভাববার সময় ছিল না। পাছে সেইরূপ কোন আকস্মিক অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তার জন্য আমাদের আত্মরক্ষার পাল্টা ব্যবস্থা করে নিয়ে আমরা নরেশকে পাঠালাম রামকৃষ্ণকে নিয়ে আসতে।

Initiative কে আগে নেবে—আমরা না পুলিশ? অনেক ক্ষেত্রেই রণকৌশলের সার্থক ও সফল প্রয়োগ বিবেচিত হয়, যদি শত্রু প্রস্তুত হওয়ার আগেই initiative থাকে অন্য পক্ষের অধিকারে। জগদাবাবুর কাছে পুলিশ এই বাড়ির খোঁজ পেয়েছে প্রায় ১২ ঘন্টা পূর্বে—আগের দিন সন্ধ্যাবেলা, আর আমরা খবরটি শুনেছি পরের দিন ভোরে। সময়ের যেখানে এতখানি ব্যবধান, সেখানে বৃটিশ আমলের সুগঠিত পুলিশ বাহিনীর পক্ষে initiative নেওয়া যে আমাদের গোপন বিপ্লবী দলের সীমিত শক্তির চাইতে অনেক গুণ বেশি তা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। তবু—তবু একেবারে শেষ সময়ের সংক্ষিপ্ত মুহূর্তে সুযোগ নেওয়ার জন্য ক্ষিপ্রতার সংগে আমাদেরই initiative নেওয়া উচিত মনে করে সাহসের সংগে সেইরূপ কৌশলই গ্রহণ করলাম।

আশ্চর্য! দিনের আলো, পুলিশের প্রহরা, লোকের দৃষ্টি, সব উপেক্ষা করে নরেশ রামকৃষ্ণকে গাড়িতে তুলে দিল। সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল —সকলেই নিষ্ক্রিয়—কেউই কোন বাধা দিল না। সংগে সংগে আমি একা রামকৃষ্ণকে নিয়ে উধাও হলাম। এইরূপ ব্যবস্থা করেছিলাম, কারণ, যদি গাড়িতে ধরা পড়ি তবু যেন সংখ্যায় আমরা কম থাকি। যখন গাড়ি নিয়ে আমি দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলাম তখনও জানি না কোন নির্দিষ্ট আশ্রয়ে রাম-কৃষ্ণকে নিয়ে তোলা যাবে কিনা! আমার উপর নির্দেশ ছিল—শহরের বাইরে পথে পথে রামকৃষ্ণকে গাড়িতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রায় তিন ঘন্টা সময় কাটাব এবং ইতিমধ্যে গণেশ এবং মাস্টারদা আলোচনা ও বিবেচনা করে ঠিক করবেন, রামকৃষ্ণকে শহরের কোন্ বাসায় অথবা নৌকা করে নদীপথে গ্রামের কোন্ নির্জন বাড়িতে পাঠাবেন। এইরূপ নতুন পরিস্থিতির জন্য মানসিক প্রস্তুতি থাকা এক কথা, আর গুপ্ত বিপ্লবী দলের সীমিত শক্তির মধ্যে নতুন নতুন আকস্মিক পরিস্থিতির জন্য বাস্তব সাংগঠনিক প্রস্তুতির ব্যবস্থা আগে থেকে করে রাখা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস! এইরূপ অবস্থায় রামকৃষ্ণকে তৎক্ষণাৎ কোথাও নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের আগে থেকে ছিল না। তাই তেমন কোন ব্যবস্থা করার জন্য অন্তত কয়েক ঘন্টা সময় চাই। মাস্টারদা ও গণেশ সব ঠিকঠাক করে তিন ঘন্টা পরে একটি নির্দিষ্ট সময়ে (৯৷৷টা নাগাদ্ হবে) ডবজ মুরিং-এর কাছাকাছি নদীর ধারে নির্দিষ্ট স্থানে কোন এক সদস্যকে পাঠাবেন বলে ঠিক করা হয়েছিল। সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী আমি গাড়িতে

তিন ঘণ্টা ধরে পথে পথে ঘুরে নির্দিষ্ট সময়ে—সেই নির্দিষ্ট স্থানে গেলাম। আমাদের একজন সাথী সেখানে উপস্থিত ছিল। সে গণেশ ও মাস্টারদার নির্দেশ মত ইতিমধ্যে একটি নৌকা ভাড়া করে নৌকার জিম্মা একজনকে দিয়ে এসেছে। নৌকার ঘাটটি খুব কাছেই। রামকৃষ্ণকে নিয়ে সে চলে গেল, আর আমি গণেশের বাড়ির উদ্দেশ্যে চললাম।

পুলিশের দৃষ্টির অগোচরে রামকৃষ্ণকে নিয়ে এই আকস্মিক ঘটনার জন্য আমাদের যে কি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার সামান্য তথ্যই আমরা সরকারী দলিলে পাই। আমাদের মামলার মুদ্রিত জাজমেন্ট কপির ১০ ও ১১ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিতভাবে বিষয়টির উল্লেখ আছে—

"The next evening about 6 P. M. Ganesh Ghosh arrived in a Baby Austin Car at the house of Dr. Jagada Biswas (P.W. 170) and asked him to attend a case of burning injuries.. Dr. Biswas found Ramkrishna suffering from burning injuries on his face, hands and chest....about 8 or 10 days later, a youth whom he did not know, came to P. W. 170's dispensary and took him in a Tikka gharry to the house on the left side of the lane which runs north from the main road at the bottom of the Collectors' hill. There he found the patient to be Ramkrishna....One or two other youths were present but he (P. W. 170) did not know any of them....On the 26th March Abdul Azim had drawn up a first information (Ex 268) and started a case against Ramkrishna under the explosive substance act. He searched for Ramkrishna at the house of his brother-in-law, at his home in Saroatali, at the house in the lane under Collectors' hill and else where but could not find him. Ramkrishna remained untraced until 1st December 1930, when he was arrested (sic) on the Chandpur-Laksam Road along with Kalipada Chakravarti (another absconding accused in the case) in possession of arms and ammunition in connection wth the murder that morning at Chandpur of Inspector Tarini Mukherjee—for which he was subsequently convicted and hanged."

মামলার রায়ে জজসাহেব লিখছেন—পরের দিন সন্ধ্যাবেলা, অর্থাৎ ১৫ই মার্চ, গণেশ ঘোষ একটা বেবী অস্টিন গাড়ি করে ডাক্তার জগদাবাবুকে নিয়ে যায়। জগদাবাবু সেখানে গিয়ে দেখেন যে, রামকৃষ্ণের বুক ও হাত-মুখ আগুনে পুড়ে গেছে।......তারপর প্রায় ৮ বা ১০ দিন পরে একজন যুবক ডাক্তারবাবুকে তাঁর ডিসপেনসারী থেকে ঠিকা গাড়ি করে নিয়ে যায়। ডাক্তারবাবু সেই যুবককে চেনেন না বলে বলেছেন। (আমরা জানি তিনি তাকে চিনতেন।) যে বাড়িতে ডাক্তারকে নিয়ে গেল সেটি কালেক্টার সাহেবের

পাহাড়ের উত্তর দিক সংলগ্ন গলির মধ্যে ছিল। (এই বাসাটি ভাড়া নিয়ে রামকৃষ্ণকে স্থায়িভাবে রাখার ব্যবস্থা করেছিলাম। প্রাথমিক নিয়ম অনুসারে এই বাসায় ডাক্তারবাবুকে না আনবার জন্য নির্দেশ দেওয়া ছিল। রামকৃষ্ণকে অন্য স্থানে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে আবার এখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কথা ছিল। কিন্তু এই নির্দেশ অবহেলিত হয়েছে বলে আমাদের এক অসম্ভব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল।) এই বাসায় ডাক্তারবাবু আরও দু'তিন জনকে দেখেছেন। তিনি তাদেরও চেনেন না বলেছেন। (কিন্তু তিনি তাদের প্রত্যেককেই চিনতেন।) ......২৬শে মার্চ আবদুল আজীম Explosive Substance act (বিস্ফোরক দ্রব্য আইন) অনুযায়ী প্রাথমিক সংবাদের ভিত্তিতে মামলা আরম্ভ করল। জজসাহেব সাক্ষীদের বিভিন্ন উক্তি হতে বলছেন যে, আজীম সাহেব (কোতোয়ালির ইন্-চার্জ) রামকৃষ্ণের ভগ্নী-পতির বাড়ি, সারওয়াতলীতে রামকৃষ্ণের নিজের বাড়ি ও জেলা শাসকের পাহাড় সংলগ্ন গলির ভিতরকার বাড়িটি খানাতল্লাসী করে। কিন্তু রাম-কৃষ্ণকে কোথাও পাওয়া যায় নি। রামকৃষ্ণ ১৯৩০ সালের ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করেছিল। কিন্তু আগের দিন ভোর রাত্রে চাঁদপুরে ইন্সপেক্টার তারিণী মুখার্জীর হত্যাপরাধে—১লা ডিসেম্বর তারিখে চাঁদপুর-লাকসাম রাস্তায় অস্ত্রশস্ত্র সহ রামকৃষ্ণ ও কালীপদ চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই মামলায় রামকৃষ্ণের মৃত্যু দণ্ড হয়।

রামকৃষ্ণকে আমরা এইভাবে পুলিশবেষ্টিত বাড়ি থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এলাম বটে, কিন্তু সমস্যার সমাধান তাতে কি হ'ল? পুলিশ হয়ত আমাদের তখন বাধা দেওয়ার মত অবস্থায় ছিল না, আর তাই হয়ত আমরা প্রথম initiative নিয়েছিলাম বলে, তাদের নাকের ডগায় রামকৃষ্ণকে নিয়ে প্রস্থান করা সম্ভব হয়েছিল। আমরা দৃঢ়তা, সাহস ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করেছি বলে পুলিশ নিষ্ক্রিয় ও নির্বাক দর্শকের মত হতভম্ব হয়ে পড়ে। যা' হোক পরাজয়ের এই সাময়িক ধাক্কা সামলে নিয়ে পুলিশ যে হামলা চালাবে সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন ছিলাম। নদীর ঘাটে রামকৃষ্ণকে বিদায় দিয়ে আমি প্রথমে গণেশের বাড়ি যাই, তারপর আমরা দু'জনে মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করি। আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হ'ল—যাদের উপর পুলিশের সন্দেহ আছে, সেই মুহূর্ত থেকে তারা কেউ বাড়িতে থাকবে না। আর যারা সন্দেহের বাইরে আছে তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বাছাই করে সংবাদ সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করা হবে। তারা পুলিশের কার্যকলাপের সংবাদ যথাসময়ে ও যথাস্থানে আমাদের পাঠিয়ে দেবে। আর আমরা—মাস্টারদা, নির্মলদা, গণেশ, অম্বিকাদা ও আমি—রাত দশটায় কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হয়ে তথ্যাদির ভিত্তিতে পরবর্তী প্রোগ্রাম নেব। এইটুকু প্রোগ্রাম ঠিক করে আমরা নিজ নিজ এলাকায় চলে গেলাম।

আজ যাঁরা এই সব ঘটনা ও অবস্থার কথা পড়বেন তাঁদের কাছে এটা গল্পের মত মনে হবে। কিন্তু যাঁরা একটু চিন্তা করবেন তাঁরা বুঝবেন কি দুশ্চিন্তা, কি নিদারুণ ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে আমাদের দিন ও সময় কাটাতে হয়েছে।

১৯৩০ সালের ২৬শে মার্চ আবদুল আজীম রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে মামলা

আরম্ভ করতে চেষ্টা করল এবং সেই অনুযায়ী ব্যাপক অনুসন্ধান ও খানা-তল্লাসী চালাতে লাগল।

মাত্র বাইশ দিনব্যাপী, ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ সালে, আমাদের যুব-অভ্যুত্থান সংগঠিত হবে। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এইরূপ একটি ঘটনা সামাল দিয়ে চলা ও প্রতিমুহূর্তে পুলিশের প্রতি-আক্রমণের কোন না কোন ব্যবস্থাকে প্রতিহত করা যে কি দুরূহ ব্যাপার ছিল, তা, যাঁরা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু বিপ্লবী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। আমার তরুণ পাঠক-পাঠিকাদের উপলব্ধির জন্যে, এখানে সামান্য একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। একদিন একটি বাড়িতে গোটা তিনেক automatic fire arms (স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র) আনা হল। আমার হাতে, নিচের দিকে মুখ করা অবস্থায়, আগ্নেয়াস্ত্রগুলির একটি থেকে একটা accidental fire হয়ে গেল। যখন ঐরূপ পরীক্ষা করছিলাম, তখন, আগ্নেয়াস্ত্রের সামনের দিকে কাউকে থাকতে দিই নি, তাই accidental fire হয়ে গেলেও কেউ জখম হয় নি। সেই ঘরে আরও দুজন ভবিষ্যৎ বিপ্লবী নেতা ছিলেন। ঐ বাড়িতে প্রায়ই আমরা বন্দুক ছুঁড়তাম কয়েকটি লাইসেন্স করা বন্দুক দিয়ে। তাই এই বিশেষ বাড়িতে একটি সাধারণ আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ যদি হয়েই থাকে তাতে কি আসে যায়! সেই ভদ্রলোকের স্ত্রীও সেইখানে উপস্থিত ছিলেন—তিনি কিন্তু ঐরূপ একটু accidental fire-এর আওয়াজে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন। কিন্তু দেখেছি ভাবী বিপ্লবী নেতারা ঐ ঘটনায় যেন ভীতিবিহ্বল হয়ে গেলেন; কি করবেন, কোথায় যাবেন, ঐ আগ্নেয়াস্ত্র তিনটিকে কি ভাবে, কোথায় সরিয়ে ফেলা হবে, এই চিন্তায় একেবারে বিচলিত হয়ে পড়লেন। কি আর করেন তখন, গৃহস্বামী নিজে ভাবী বিপ্লবী নেতাদের তাঁর বাড়িতে শান্তভাবে অপেক্ষা করতে বলে, অস্ত্রগুলি নিয়ে নিজেই গাড়ি চালিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। আমি তাঁর সঙ্গে গাড়িতে রইলাম।

এই সামান্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি একবার তুলনা করে দেখা যায়, তাহ'লে আমাদের সেই সময়কার মানসিক অবস্থা কিছুটা বোঝা যায়। সশস্ত্র যুব-অভ্যুত্থানের তখন বাকী আছে মাত্র ২২ দিন। সেই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে যখন পুলিশ আমাদের খবর পেয়েছে, ও রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রাথমিক সংবাদের ভিত্তিতে, Explosive substance Act-এ মামলা রুজু করেছে, তখন আমাদের ওপর রামকৃষ্ণের ঘটনার জন্যে কী ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। স্নায়বিক দুর্বলতা নিয়ে ভীত ত্রস্ত হয়ে পড়লে মাত্র ২২ দিনের মধ্যে প্রস্তুতি শেষ করে চট্টগ্রাম সশস্ত্র যুব-অভ্যুত্থান চালানো সম্ভবপর হ'ত না। বইয়ের পাতায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চিন্তা নিবদ্ধ থাকা এক কথা, আর বাস্তবে সমস্ত বিপ্লবের প্রস্তুতি ও তা পরিচালনা করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। সেই জন্যে চাই ধারাবাহিকভাবে ভিন্ন ধরনের মানসিক, শারীরিক, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সাংগঠনিক প্রস্তুতি। সেরূপ সামগ্রিক প্রস্তুতি দু-একদিনের কাজ নয়। পূর্বের প্রায় আট বছরের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ভিত্তিতে—চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থানের আগে পুরো দুটি বছর ধরে 'মৃত্যু প্রোগ্রাম' সম্মুখে রেখে, কঠোর মানসিক ও শারীরিক training-এর

মধ্যে নিজেদের তৈরি করতে হয়েছিল বলেই, আমরা পুলিশের বিভিন্ন প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলাম।

আগের কথায় আসা যাক—রামকৃষ্ণকে নদীপথে রওনা করে দিয়ে, মাস্টারদার সঙ্গে গণেশ ও আমি পরামর্শ করার পর আমরা যে যার গোপন জায়গায় গা ঢাকা দিয়ে আছি। প্রায় দুটোর সময় দুপুরে আমার কাছে খবর এল, রামকৃষ্ণের সেই বাড়িতে পুলিশ হানা দিয়েছে। বাড়ি খালি ছিল—দরজার তালা ভেঙে পুলিশ ঘর তল্লাসী করেছে। শহরের আরও দু-একটি বাড়িতেও ঐ সঙ্গে খানাতল্লাসী করেছে। আমি যেমন বার্তাবাহকের কাছে খবর পেয়েছিলাম, সেরূপ খবর অন্যরাও নিশ্চয়ই পেয়েছেন ততক্ষণে। যাই হোক, পূর্ব নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে আমরা রাত দশটায় একত্রিত হলাম। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় স্থির হল, আমাদের আরো কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থেকে পুলিশের কার্যপদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে; আমরা আরও সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমাদের আসন্ন যুব-অভ্যুত্থানের জন্যে যত শীঘ্র সম্ভব চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

আমরা, যাদের উপরে পুলিশের আক্রমণ আসা সম্ভব, সবাই নিজের নিজের গোপন আস্তানায় চলে গেলাম এবং সেইখান থেকেই সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম। পুলিশের অনুসন্ধান পদ্ধতি ও তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু কি বা কোন দিকে, তারও সংবাদ সংগ্রহ করতে লাগলাম। কলকাতায় মেছুয়াবাজারের বাড়িতে সকালে খানাতল্লাসী হয়। তারপর কলকাতার বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ পুলিশের "ইণ্টেলিজেন্স বিভাগ" নতুন পদ্ধতিতে আকস্মিকভাবে ও অতর্কিতে সন্দেহজনক সব বাড়ি দিনের বেলাতেই যখন তখন খানাতল্লাসী করতে লাগল। কলকাতা পুলিশের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চট্টগ্রাম পুলিশও প্রতিদিনই একটি দুটি বাড়িতে দিনের বেলায় হঠাৎ গিয়ে খানাতল্লাসীর মহড়া অব্যাহত রাখল। পুলিশ কিন্তু আমাদের বাড়ি, অর্থাৎ গণেশ, মাস্টারদা, নির্মলদা, নরেশ, বিধু ও আমার বাড়ির দিকে নজর দিল না। কারণ বুঝলাম, পুলিশ প্রথম প্রমাণ হিসেবে রামকৃষ্ণকে দগ্ধ অবস্থায় চিহ্ন নিয়ে হাতে নাতে ধরতে চায়, এবং তারপর যাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক সংবাদ পেয়েছে তাদের গ্রেপ্তার করবে। রামকৃষ্ণকে যতক্ষণ দগ্ধ অবস্থায় ধরতে পারছে না ততক্ষণ আমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই।

বাংলার নতুন লাট, সার্ স্ট্যানলী জ্যাক্‌সন্, দুবছর আগে বিনা বিচারে আটক রাখার অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করেছেন। কাজেই বিনা বিচারে ও সঠিক সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া পুলিশ আমাদের বর্তমানে গ্রেপ্তার করা বা আমাদের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণ চালানো যুক্তিযুক্ত বোধ করে নি।

অবস্থার এইরূপ গতি লক্ষ্য করে, আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সবাই আবার নিজ নিজ বাড়িতে আগের মত সাবধানতার সঙ্গে থাকব এবং শহরেও সাবধানতার সঙ্গে স্বাভাবিক গতিবিধি বজায় রাখব। পরোইকোরা ডাকাতির পর যেমন আমরা নিজেদের নিরীহ প্রমাণ করার জন্যে প্রায় দেড় বছর একেবারে নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করেছিলাম সেইরূপ পরাজয়ের মনোভাব এই সময় ছিল না। আমরা স্বাভাবিক ঘোরাফেরার সুযোগ নিতে চাইলাম—তার একমাত্র

কারণ নিষ্ক্রিয়তা নয়—কারণ এই যে, যেন সক্রিয়ভাবে দ্রুত প্রস্তুতি কাজ আমরা সারতে পারি।

পুলিশ এতদিন ধরে ক্রমাগত প্রায় ২০।৩০টি বাড়ি খানাতল্লাসী করেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও বিফল মনোরথ হয়ে ফিরেছে। তার একমাত্র কারণ আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে বিচক্ষণতার সঙ্গে পুলিশি তৎপরতাকে ব্যাহত করে, রামকৃষ্ণকে সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থানে রাখার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত পুলিশ হার মানল। আর না পেরে আমাদের কোতোয়ালিতে ডেকে পাঠাল। আমাদের ট্রাইব্যুনালের ইংরেজ জজ, তাঁর মামলার রায়েতে লিখেছেনঃ—"On 5th April, Azim called Ganesh Ghosh and Ananta and Bidhu Bhattacharjee to Kotowali P.S. and questioned them about Ramkrishna's whereabouts. They came accompanied by Naresh Roy and Lokanath Ball. Ganesh said he knew Ramkrishna, but did not know where he was, or whether he had been injured, while Ananta alleged that he did not know him at all. From Kotowali, Ganesh, Ananta, Lokanath and Naresh Roy went on to the D.I.B. Inspector and questioned him regarding the policy of the Government towards them (P.W.S. 70 and 314)."

জজসাহেব লিখছেন যে ৫ই এপ্রিল আজীম সাহেব গণেশ, বিধু ও অনন্তকে সদর কোতোয়ালিতে ডেকে পাঠান। নরেশ ও লোকনাথ বলও তাদের সঙ্গে গেল। আজীম সাহেব তাদের প্রশ্ন করে রামকৃষ্ণের দগ্ধ হওয়ার বিবরণ জানতে চাইলেন এবং সে কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করলেন। গণেশ রামকৃষ্ণকে যে চেনে তা অস্বীকার করে নি—কিন্তু সে কোথায় থাকে বা কি হয়েছে কিছুই জানে না বলল। অনন্ত বলল রামকৃষ্ণকে সে মোটে চেনেই না। তারপর এই সব জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে যাওয়ার পর তারা চারজন—গণেশ, লোকনাথ, নরেশ ও অনন্ত—ডি, আই, বি ইন্‌স্‌পেক্টরের বাড়ি গিয়ে ইন্‌স্‌-পেক্টারমহাশয়কে পাল্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে সরকারের কি পরিকল্পনা বা নীতি অনুসরণ করার ইচ্ছা আছে তা জানতে চায়।

আমাদের যখন কোতোয়ালিতে ডেকে পাঠাল, তখন আমরা চারজন স্থির উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়েছিলাম। যাওয়ার আগে একটু আলোচনা করে বুঝতে চেষ্টা করলাম এই 'ডাকার' পেছনে পুলিশের কি অভিপ্রায় থাকতে পারে! তারা কি আমাদের সেখানে ডেকে নিয়ে গিয়ে বন্দী করবে, না কি জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেবে? সব দিক বিবেচনা করে মনে হচ্ছিল গ্রেফতার করবে না—যদি গ্রেফতার করবার ইচ্ছা থাকত তবে আমাদের অনেকের বাড়ি একসঙ্গে খানাতল্লাসী করত ও বাড়ি থেকেই ধরে নিয়ে যেত। পুলিশ যখন সেই পদ্ধতিতে চলে নি, তখন ডেকে নিয়ে গিয়ে বন্দী করবে বলে মনে হল না। তবু যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে! সেইরূপ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়ে আমরা চারজন সঙ্গে রিভলভার নিয়েই কোতোয়ালিতে যাই। অগত্যা যদি আমাদের গ্রেফ্‌তার করার অভিসন্ধিই তাদের থাকে তবে কি আমরা বন্দিত্ব বরণ করব?

মাত্র দু' সপ্তাহও বাকী নেই—১৮ই এপ্রিলের যুব-অভ্যুত্থান সংঘটিত হতে। যদি আমাদের জেল-হাজতে আটকে ফেলে তবে সমস্ত প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও হয়ত অনিশ্চয়তার মধ্যে আসন্ন যুব-অভ্যুত্থানের অকাল মৃত্যু ঘটবে।

কোতোয়ালিতে ডাকার পর যদি আমরা তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করতাম তাহলে খুব সম্ভব আমাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্ট বেরোত এবং আমাদের বন্দী করে জেল-হাজতে পাঠাত। অবস্থা আরও অধিক জটিল ও ঘোরালো হোক তা আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি নি। একটা chance নিতে চেয়েছিলাম—যদি সহজে পার পেয়ে যাই। আর যদি তেমন চূড়ান্ত ঝুঁকি নিতেও হয়—তা নেবার জন্যও প্রস্তুত ছিলাম। অর্থাৎ যদি আমাদের হঠাৎ বন্দী করার মতলব করে তবে সদর কোতোয়ালিকে চমকে দিয়ে আমাদের চারটি রিভলভার গর্জন করে উঠবে। আমাদের কাছ থেকে সেইরূপ অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক আক্রমণ কোতোয়ালির কল্পনারও বাইরে—ভীত, বিহ্বল, বিমূঢ় সেপাইদের চমক ভাঙার আগেই আমরা সে স্থান পরিত্যাগ করতে পারব সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম। এখন প্রশ্ন হল—এইরূপ অবাঞ্ছিত ঘটনার একটুও আশঙ্কা যখন ছিল তখন এইরূপ adventure-এর ঝুঁকি নেওয়া কি আমাদের অনুচিত হয় নি? বেশি লাভের জন্য সামান্য ঝুঁকি নেওয়াটা শ্রেয় মনে করি। আর যদি কোন কারণে হিসাবে ভুল হয় এবং আজীম সাহেব আমাদের বন্দী করতে উদ্যত হন তবে সেই ক্ষেত্রে ঐরূপ চূড়ান্ত প্রতি-আক্রমণের পরিকল্পনা বাঞ্ছনীয় মনে করি এই জন্য যে, আমরা বাইরে আত্মগোপন করে থেকেও, সামগ্রিক প্ল্যানের সামান্য রদ-বদল করে যুব-বিদ্রোহকে সফল করে তুলতে পারব।

তারপর যখন দেখি আমাদের হিসেব ঠিক হল—পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করা ছাড়া আর কিছু করল না তখন মনে ভাবলাম পুলিশের বিরুদ্ধে আমাদের কূটনৈতিক counter offensive (প্রতি-আক্রমণ) নেওয়া প্রয়োজন। তাই আমরা আই, বি, ইন্‌স্‌পেক্টার সারদা ভট্টাচার্যের কাছে গিয়ে খুব হম্বি-তম্বি করে আসি এবং নানাভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ করি। তাঁকে ভালোভাবে বোঝাই, যদি সরকার বা তাঁরা আমাদের এমনিভাবে harass (হয়রান) করেন বা আমাদের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করেন তবে আমরা তা সহ্য করব না—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইরূপ demonstration-এ, সাময়িক শক্তি বা অভিব্যক্তি প্রদর্শনে তখন আমাদের কি লাভ হয়েছিল তা বলা সম্ভব নয়। তবে হয়ত পুলিশ ও জেলা কর্তৃপক্ষ বুঝেছিল যে আমরা চুপ করে তাদের আক্রমণ সহ্য করব না। এইরূপ বোঝার পর কর্তৃপক্ষ হয়ত বিবেচনা করেছে—আমাদের উত্তেজিত করে তক্ষুণি তারা ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করবে না, তখনও তাদের ধৈর্য ধরা উচিত। কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত কি ভেবেছিল জানি না—তবে আমরা চেয়েছিলাম অন্তত ব্যক্তিগতভাবে পুলিশ অফিসারেরা অতীত বিপ্লবী কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে যেন একটু মনে মনে ভাবেন যে, আমাদের বিরুদ্ধে যদি তাঁরা হয়রানি করার নীতি গ্রহণ করেন তবে তাঁদের পৈতৃক প্রাণটি হারাবার যথেষ্ট কারণ ঘটবে। মৃত্যু ভয়—বড় ভয়! এইরূপ মৃত্যু বিভীষিকা থাকা সত্ত্বেও রায়বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর খেতাব লাভের আশায় এবং পুরস্কার ও পদোন্নতির লোভে পুলিশ

অফিসারদের 'আত্মত্যাগের' বহু নজীর আছে। তবু যদি বেঁচে থেকেই খেতাব, চাকরির উন্নতি, পুরস্কার প্রভৃতির অধিকারী হওয়া যায় তবে মন্দ কি! মৃত্যু বিভীষিকা খুব সাহসীকেও ভাবতে শেখায়! Prudence is better than Valour! (বিজ্ঞতা বিক্রমের চাইতে শ্রেয়!) আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ডি, আই, বি, ইন্সপেক্টারের কাছে ক্ষুব্ধভাব প্রদর্শন করে জেলা কর্তৃপক্ষকে ভাবাতে চেষ্টা করব যে, বর্তমানে তাদের বিচক্ষণতা বিক্রমের চাইতে অধিকতর বাঞ্ছনীয়!

আমাদের প্রস্তুতির একটি প্রধান কাজ তখনও বাকি। আমাদের কাছে বোমার সতেরোটি লোহার খালি খোল বহুকাল পূর্ব থেকে সযত্নে রাখা ছিল। ঐ ক'টি বোমাই আমাদের সম্বল হবে যদি পিক্রিক্ পাউডার দিয়ে ভর্তি করে নিতে পারি। তাই একদিকে রামকৃষ্ণ 'পারকাশান ক্যাপ' (ফেটে গিয়ে আগুন ধরাবার ক্যাপ) তৈরি করছিল আর অন্য দিকে তারকেশ্বর দস্তিদার পিক্রিক্ পাউডার বানাবার কাজে ব্যস্ত ছিল। রামকৃষ্ণ বিস্ফোরণে গুরুতর-ভাবে আহত হওয়ার পর তাকে পুলিশের চোখের অন্তরালে নিরাপদে রাখার জন্য যেভাবে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়লাম তাতে বুঝেছিলাম যে, 'পারকাশান ক্যাপ' অল্প সময়ের মধ্যে আর তৈরি করা সম্ভব হবে না। 'পারকাশান ক্যাপ'-এর পরিবর্তে আমরা বিদেশে তৈরি ডিনামাইট ফাটাবার ফিউজ (বারুদের পল্তে) ব্যবহার করব বলে ঠিক করলাম। এই সব বিদেশে তৈরি ফিউজ মাপমত ছোট ছোট করে কেটে 'টাইম ফিউজের' মত ব্যবহার করা যায়—অর্থাৎ যে ক' সেকেণ্ডের মধ্যে বোমা ফাটাতে চাই সেই মাপে কেটে নিলেই হয়। আমরা সতেরোটি 'টাইম বোমা' এইরূপ ফিউজ দিয়ে তৈরি করা সাব্যস্ত করলাম। কিন্তু আসল কাজই বাকি থাকবে যদি বোমার খোল পিক্রিক্ পাউডারে ভর্তি করা না হয়। সারা রাত জেগে তারকেশ্বর ও অর্ধেন্দু পিক্-রিক্ অ্যাসিড তৈরি করতে লাগল। এখন বোধহয় ঠিক মনে নেই, প্রায় দশ-বারো পাউণ্ড নাইট্রিক ও সালফিউরিক্ অ্যাসিড রাসায়নিক পদ্ধতিতে সংমিশ্রণের পর পিক্রিক অ্যাসিডের খুব মিহি পাউডার প্রস্তুত হয়। গোপন স্থানে খুব সংকীর্ণ অবস্থার মধ্যে সারা রাত চেষ্টা করেও এক আউন্সের বেশি পিক্রিক্ অ্যাসিড তৈরি করা সম্ভব হয় নি। তবু অক্লান্ত পরিশ্রম করে খুব ধীরে হলেও অপ্রতিহত গতিতে পিক্রিক্ অ্যাসিড তৈরির কাজ চলছিল।

যুব-বিদ্রোহের সময় আসন্ন। হাতে মাত্র দু' সপ্তাহ সময় বাকি। সেই আসন্ন ঝড়ের প্রাক্কালে আরও ভয়ঙ্কর বিপদ এসেছে—তবু লঙ্ঘিতে হয়েছে রাত্রি নিশীথে দুস্তর পারাবার!

আমি সেইদিন দুপুরে নিজ বাড়িতে বিশ্রাম করছি। আর কেউ উপস্থিত ছিল কি না মনে নেই। প্রায় দুটো-তিনটের সময় আমাদের দলের একজন কর্মী সাইকেলে ছুটে এল। তাকে পাঠিয়েছেন মাস্টারদা। সে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল যে—কংগ্রেস অফিসে 'পিক্রিক্ পাউডার' প্রস্তুত করার সময় ভয়ঙ্কর এক বিস্ফোরণ হয়েছে। তারকেশ্বর (দস্তিদার) ও অর্ধেন্দু (দস্তিদার) দারুণভাবে আহত হয়েছে। তারকেশ্বরের হয়ত বাঁচবারই আশা নেই। মাস্টারদা আমাকে গণেশের সঙ্গে তক্ষুণি যেতে বলেছেন।

আমি ও গণেশ জানতাম, 'পিক্রিক্ পাউডার' তৈরি করবার সময় যদি সেই পাউডারে আগুন না লাগে তবে ঘর্ষণে বা আঘাতে কোনরূপ

বিস্ফোরণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। পিক্‌রিক অ্যাসিড (হলুদ মিহি গুঁড়ো) তৈরি হয় নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের সংমিশ্রণে। তারপর অ্যামনকার্ব-এর সঙ্গে বেশি পরিমাণ জলে মাপ মত পিক্‌রিক অ্যাসিডের crystal সিদ্ধ করতে হয়। তারপর এইভাবে ধোওয়ার পর তাকে 'অ্যামন-পিকরেট' বলা হয়। অ্যামন-পিক্‌রেটের সঙ্গে পটাস-ক্লোরার্স বিভিন্ন পরিমাণে মিশিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শক্তিশালী 'পিক্‌রিক পাউডার' তৈরি হয়। আমরা পঞ্চাশ ভাগ অ্যামন-পিকরেট ও অর্ধভাগ পটাস-ক্লোরার্স মিশিয়ে পাউডার তৈরি করা ঠিক করেছিলাম। তারকেশ্বর ও অর্ধেন্দু সেইরূপ পাউডার তৈরি করবার কাজে নিযুক্ত ছিল। তারা অন্য কোন বিস্ফোরক দ্রব্য, যা ঘর্ষণে ফেটে পড়ে, তা' যে তৈরি করছিল না, সেই সম্বন্ধে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ ছিলাম। তা' ছাড়া আমাদের মধ্যে কারও ধূমপানের অভ্যেস ছিল না—তারা কেউ সিগারেট বা বিড়ি কখনই খেত না। তবে কি করে বিস্ফোরণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে! এ আমার কাছে একেবারে দুর্বোধ্য—সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হল।

সংবাদটি শোনার পর আমি একেবারে যেন ক্ষেপে গেলাম। যে সংবাদ দিতে এসেছিল তার ওপর রাগের কোন কারণ ছিল না। কিন্তু কেন, কিসের জন্য, কিভাবে, বা কার গাফিলতিতে ঐরূপ দুর্ঘটনা পিক্‌রিক পাউডার তৈরি করার সময় ঘটতে পারে? আগুন না লাগলে তো পিক্‌রিক পাউডার বিস্ফোরিত হতে পারে না! তাদের মধ্যে তো কেউ ধূমপান করে না! তবে কে সেখানে স্টোভ ধরাল বা কেন আগুন নিয়ে গেল? দারুণ বিরক্তির সঙ্গে প্রশ্ন করলাম—"কিভাবে বিস্ফোরণ সম্ভব হল? কে দায়ী? কে আগুন নিয়ে গিয়েছিল? কে স্টোভ ধরিয়েছে?"

—"কেউ আগুন ধরায় নি। পটাস-ক্লোরার্সের সঙ্গে পিক্‌রিক অ্যাসিড মেশাবার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।"

—"আমি বিশ্বাস করি না। খুব জোর সংঘর্ষণে বা হাতুড়ির আঘাতেও পিক্‌রিক পাউডার কখন বিস্ফোরিত হয় না। তা' হতে পারে না।"

—"কিসে কি হতে পারে তা আমার জানা নেই। তবে যা' ঘটেছে তা' আমি জানি। এই পাউডার 'মর্টার ও পেসেলে' (ডাক্তারদের ওষুধ তৈরি করবার পাথরের বাটি ও একটি ছোট মুষল) সংমিশ্রণ করা হচ্ছিল এবং মিশ্রণ ও ঘর্ষণের সময় হঠাৎ ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হয়েছে। মর্টারটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে আর পেসেলটি উড়ে গেছে। ফটুদা (তারকেশ্বর) ও অর্ধেন্দু বিস্ফোরণের ঝাপটায় পাঁচ-ছয় হাত দূরে ছিট্‌কে পড়েছে ও গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।"

আমরা এইভাবে দুজনে কথা বলছিলাম ও সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিকে (নাম মনে নেই) নিয়ে বেবী-অস্টিনে করে গণেশের বাড়ির উদ্দেশে ছুটলাম। গণেশের সঙ্গে দেখা করে সব বললাম। সেও বিশ্বাস করতে পারল না পিক্‌রিক পাউডার তৈরি করার সময় ঘর্ষণে বিস্ফোরণ হতে পারে। বিন্দুমাত্র দেরি না করে গণেশও আমাদের সঙ্গে রওনা হল। পথে আমরা মাখনকে (জীবন ঘোষালকে) খবর দিলাম সে যেন তাদের ছয় সিলেণ্ডার যুক্ত বড় নতুন 'এসাক্স' মোটর গাড়িটি নিয়ে খুব শীঘ্র কংগ্রেস অফিসে চলে আসে।

কংগ্রেস অফিসে এসে দেখি যে মাস্টারদা ও দু-একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মী সেখানে উপস্থিত। সংক্ষিপ্ত সংবাদ শুনে নিয়ে আমরা পাশের ঘরে গেলাম। কি ভীষণ দৃশ্য! তারক ও অর্ধেন্দুর বুক হাত মুখ কেবল যে পুড়ে গেছে তা' নয়—শরীরের খণ্ড খণ্ড মাংস উড়ে গিয়ে হাড় বেরিয়ে পড়েছে। অসহ্য মৃত্যুযন্ত্রণায় দুজনে ছট্‌ফট্‌ করছিল। অর্ধেন্দুর অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। সে যন্ত্রণায় থাকতে না পেরে এক-একবার উঠে একটু পায়চারী করে আবার বসে পড়ছে। প্রাণভরে চেঁচাতে পারলে হয়ত শান্তি পেত, কিন্তু তার উপায় নেই। দুজনেই প্রাণপণে চেষ্টা করছিল অসহ্য যন্ত্রণায় গোঙানির শব্দও যেন ঘরের বাইরে না যায়। তারকের নড়বার শক্তি ছিল না। সমস্ত শরীর তার থরথর করে কাঁপছিল। তার গোঙানির শব্দও কেঁপে কেঁপে গলা দিয়ে বার হচ্ছিল। কেবল শুনতে পাচ্ছিলাম—উঃ—উঃ, ইঃ ইঃ ইঃ—। মনে হচ্ছিল তারকেশ্বর বুঝি তক্ষুণি collapse করবে—চরম অবসাদে ভেঙে পড়বে—আর বাঁচবে না!

আমি ও গণেশ ঘরে ঢুকলাম। আমাদের ঠিক পেছনে মাস্টারদাও এলেন। সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কিছু বলেছিলাম কি না তা' মনে নেই। আমার গলার শব্দ শুনতে পেয়ে তারক দুঃসহ যন্ত্রণায় অধীর কণ্ঠে বলল—"অনন্তদা, অনন্তদা আপনি আমাকে গুলী করুন! আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না! আমি সহ্য করতে পারছি না—আমাকে গুলী করুন...।" এভাবে তারক কাতর মিনতি জানাতে লাগল। তারক ও অর্ধেন্দু দুজনেই জানে রামকৃষ্ণকে নিয়ে আমাদের কি ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। প্রতিদিনই রামকৃষ্ণকে ধরবার জন্য পুলিশ শহরে ও গ্রামে হানা দিচ্ছে। তাই বোধ হয় তারক আরও বেশি করে চাইছিল যে তাকে গুলী করে মেরে ফেলি—তাতে সে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে আর সংগঠনও বাঁচবে।

আমরা সেই ঘরে এক মিনিটের বেশি ছিলাম না। ঐ সাংঘাতিক অবস্থা দাঁড়িয়ে দেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়, অবিলম্বে প্রতিকার করা দরকার। মাস্টারদা, গণেশ ও আমি দ্বিতীয় কামরায় এলাম। আমি বললাম—"দেরি না করে গুলী করে মেরে ফেলি!" কি নিদারুণ, কি নিষ্ঠুর—কি নিষ্করুণ মনোভাব! তবু আমি তাই ভেবেছিলাম—তাই বলেছিলাম। সেইদিন এইরূপ ভাবার পেছনে ঠিক কি ছিল তা' এতদিন পরে বলা সম্ভব নয়। হয়ত ভেবেছিলাম, বাঁচবে তো না-ই, তবে আর ওদের অনর্থক কষ্ট দিয়ে এবং সংগঠনের পক্ষে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দরকার কি?

তখন আমি খুব অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। বাধার পর বাধা আসছে। কোন্‌দিক সামলাব? আমরা কি তাহলে সামগ্রিক আক্রমণের প্ল্যান কাজে পরিণত করবার আগেই ধরা পড়ব? আমাদের এত দিনের এত আয়োজন, এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম—সবই কি তীরে পোঁছবার আগেই বিনষ্ট হবে? এক রামকৃষ্ণকে নিয়েই এত বিপদ—তাকেই লুকিয়ে রাখার ভাল ব্যবস্থা নেই—তারপর তারক ও অর্ধেন্দুকে রাখবার নিরাপদ আশ্রয় কোথায় খুঁজে পাব? তা'ছাড়া ডাক্তার, ওষুধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যে সময় ও সামগ্রিক শক্তির ওপর নির্ভর করে। আমাদের সময় কোথায়—দুটি সপ্তাহও সময় নেই। এইরকম সাতপাঁচ ভেবে, আমাদের এত বড়—এত পরিশ্রমের আয়োজন তারক ও অর্ধেন্দুর

এই আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার চাইতে তাদের বাঁচাবার বিফল প্রচেষ্টায় সময় ও শক্তি ক্ষয় না করে যদি তাদের এখনই গুলী করে মেরে ফেলে গুম্ করে দেওয়া হয় তবে হয়ত আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে চরম আঘাত হানতে পারব, এই মনে করেই বলেছিলাম—"দেরি না করে গুলী করে মেরে ফেলি!"

আমার মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই গণেশ বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে বলল—"কেন বাজে কথা বলছ? ঘাবড়াবার কি আছে? বিপদ এসেছে, বিপদকে রুখতে হবে।" সেই সময়—সেই সন্ধিক্ষণে এইরূপ দৃঢ়তার সংগে নেতৃত্বের একান্ত প্রয়োজন ছিল। মনের অক্ষমতা, অন্তরে পরাজয়ের চিন্তা আমাকে ঐরূপ দৃঢ় বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পথে বাধা দিয়েছে; সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত যখনই এই ঘটনাটি কোন উপলক্ষে আমার মনে হয়েছে তখনই আমি পীড়া অনুভব করেছি এই ভেবে—আমি কেন গণেশের মত একইভাবে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলাম না?

বিপদকে রুখতে হবে। যত বাধা আসুক না কেন, তবুও এগোতে হবে। আর দেরি নয়, যত শীঘ্র পারা যায় দু'জন বিস্ফোরণে আহত সাথীকে কংগ্রেস অফিস থেকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে হবে। রামকৃষ্ণকে তার ভগ্নীপতির বাড়ি থেকে বেবী-অস্টিনে করে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এখন দু'জনকে নিতে হবে। তা'ছাড়া তাদের বসে থাকার ক্ষমতাও ছিল না। এরা দুজন যেভাবে পুড়ে গেছে তাকে Second stage Burning (দ্বিতীয় স্তরের পোড়া) বলা হয়। তাদের শরীরের মাংস খণ্ড খণ্ড হয়ে উড়ে গিয়ে হাড় বেরিয়ে পড়েছিল। "প্রথম stage পোড়া" তাকেই বলে, যখন মাংসের ওপরে চামড়া পর্যন্ত পুড়ে যায়। রামকৃষ্ণের ক্ষত প্রথম stage-এর পোড়া। আর তৃতীয় stage-এর পোড়া হচ্ছে যখন septic হয়ে যায়। সবেমাত্র দুর্ঘটনা ঘটেছে—septic হওয়ার পর্যায়ে এখনও আসে নি। তবে ডাক্তারদের বিবেচনার বিষয় যাতে septic না হয় তার জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা করা। আমরা নিজেরা ডাক্তার নই কাজেই septic নিবারণ করবার আগে safety ও Security-র (নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার) ব্যবস্থার জন্য ব্যস্ত হলাম। First Aid (প্রাথমিক চিকিৎসা) আমরা যা জানতাম সেটুকুর ত্রুটি অবশ্য করি নি। "Borafex" মলম ছোট ছোট টিউবে পাওয়া যায়। তা আমরা রামকৃষ্ণের চিকিৎসায় ব্যবহার করেছি। পোড়া স্থানের নিরাময়ের জন্য পিক্‌রিক্‌ লোশন ও Borafex ব্যবহার আমরা শিখেছিলাম। তা দিয়েই প্রাথমিক চিকিৎসা করা হল।

ইতিমধ্যে মাখন ঘোষাল তাদের বাড়ির বড় নতুন Essax (এসাক্স) টুরারটি নিয়ে এল। খুব সাবধানতার সংগে ও অন্যান্যদের দৃষ্টির অগোচরে তারক ও অর্ধেন্দুকে গাড়িতে তোলা হ'ল। পেছনের বসবার গদির ওপর অর্ধেন্দুকে শুইয়ে দিলাম। তার ক্ষত অপেক্ষাকৃত কম, তাই গাড়ি চলার সময় লোকের চোখে পড়ার সম্ভাবনাও সেই অনুপাতে কম। তারক ছট্‌ফট্‌ করছিল ও তাকে পোড়া অবস্থায় 'বীভৎস' দেখাচ্ছিল। তার সেইরূপ অবস্থা সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এই আশঙ্কায় আমরা তাকে পেছনের সিটের নিচে পা রাখবার জায়গায়, একটা তোষকের ওপর শুইয়ে দিলাম।

যখন আমরা তাদের সরাবার ব্যবস্থা করছিলাম তখন মাস্টারদা নানা-ভাবে সামাল দিচ্ছিলেন যেন আশেপাশের লোকেরা কিছু সন্দেহ করতে না পারে। ভয়ানক শব্দ করে বিস্ফোরণ হয়েছিল এবং বিস্ফোরণের পর ঘন ধোঁয়া দুর্ঘটনার স্থানটির অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছিল। কংগ্রেস অফিসে আমাদের ছেলেরা ও সমর্থকরাই আসত বেশি। তাই বলে সাধারণ সভ্য ও সমর্থকদের কাছে গুপ্ত বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের তথ্য উদ্ঘাটিত হতে দিতে পারি না। সেজন্য বনবিহারী দত্ত দু-চারজনকে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেস অফিসের সংলগ্ন ছোট্ট মাঠে বসে গান ও বাঁশী বাজাবার এক 'আসর' বসাল। যারাই আসছে তাদেরই ডেকে নিয়ে সেখানে বসাচ্ছে। এই "গানের আসরে"র অন্তরালে আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারক ও অর্ধেন্দুকে গাড়িতে তুলে নিলাম। একা আমি গাড়িতে তাদের দু'জনকে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। রামকৃষ্ণের বেলায়ও এই একই নীতি অনুসরণ করি। একসঙ্গে যেন অনেকে ধরা না পড়ি।

বেবী-অস্টিন নিয়ে গণেশ চলে গেল ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে। ঠিক হ'ল আমি তারক ও অর্ধেন্দুকে গাড়িতে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়াব যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিরাপদে রাখার মত কোন বাড়ি ঠিক না হয়। এও ঠিক হ'ল যে বেবী-অস্টিনে করে আমার গাড়িতে টিনে ভর্তি পেট্রোল দিয়ে যাবে। কারণ, আহতদের সঙ্গে নিয়ে কোন পেট্রোল পাম্পে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কংগ্রেস অফিস থেকে চলে আসবার সময় আমার সঙ্গে যোগা-যোগ রাখার ব্যবস্থা কিরূপে হবে তাও ঠিক করা হয়েছিল।

প্রায় পাঁচটার সময় রেলের ক্লাস কোয়ার্টারের বড় রাস্তায় সুবোধ চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাকে কাছে ডেকে সব ব্যাপারটা বললাম। সে তো তারক ও অর্ধেন্দুকে সেইরূপ গুরুতর আহত অবস্থায় দেখে খুব বিচলিত হয়ে উঠ্‌ল। তখনও বেবী-অস্টিন ফিরে আসে নি। অথচ আমার গাড়িতে পেট্রোল নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাই সুবোধ চৌধুরীকে একটি পেট্রোলের দোকানের সামনে নামিয়ে একটু দূরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সুবোধ দু' গ্যালন পেট্রোল সিল করা টিনে নিয়ে এল। তা' ছাড়া সুবোধকে তার বাড়ি থেকে দু'টি বিছানার চাদর ও ধুতি নিয়ে আসতে বলি। সুবোধ তার ক্লাস কোয়ার্টারের বাসা থেকে ধুতি ও চাদর নিয়ে এল। টুরার গাড়ির দু'পাশের খোলা দিক কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলাম—যেন পেছনে কোন পর্দানসীন মুসলমান মহিলা আছেন। আমি নিজে খুব সামান্যই বেশ পরিবর্তন করলাম। যারা চেনে না তারা যেন মনে করে যে আমি একজন মুসলমান ড্রাইভার; আর চেনা লোক দেখলে যেন সন্দেহ না করে যে আমি বেশ পরিবর্তন করেছি।

যে সব পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম সেই সব নির্জন রাস্তায় সাধারণতঃ আশঙ্কার কারণ ছিল না বললেই হয়। অনেক ঘণ্টা অতিবাহিত হ'ল তবু খবর নেই। সন্ধ্যা প্রায় ছ'টা নাগাদ বেবী-অস্টিন করে গণেশ পেট্রোল দিয়ে গেল। জানলাম তখনও বাড়ি ঠিক হয় নি—যেখানে তাদের নিয়ে যেতে পারি। রাত আটটার সময় আবার খবর পেলাম, তখনও বাড়ি ঠিক হয় নি। চিন্তা-ভাবনা ও উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে উঠ্‌ছিলাম। তারপর রাত দশটার সময় গণেশ বেবী-অস্টিন করে এসে খবর দিল যে, বাড়ি সাময়িকভাবে ঠিক হয়েছে এবং ডাক্তারবাবুকেও আনবার ব্যবস্থা করেছে। আমি তাকে অনুসরণ করলাম।

প্রায় সাড়ে দশটার সময় লোকনাথের শহরের বাসা পাথরঘাটায় গেলাম। বাড়ির দরজা ঘেঁষে গাড়িটি দাঁড় করালাম। তারপর নানা সাবধানতা অবলম্বন করে তারক ও অর্ধেন্দুকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। এইটুকু টানা-হেঁচড়া করবার সময় তারক একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ে—মনে হচ্ছিল যেন তক্ষুণি তার হৃদ্‌যন্ত্র চিরকালের মত স্তব্ধ হয়ে যাবে! গণেশ এদিকে ডাক্তার জগদাবাবুর বাড়ি যায় এবং তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। ডাক্তারবাবু ও গণেশ প্রায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভেতর এসে ঢুক্‌ল। তারকের ঐরূপ সঙ্গিন অবস্থা লক্ষ্য করে ডাক্তারবাবু বোধহয় কোরামিন দিয়েছিলেন। তারপর ইন্‌জেক্‌শন প্রভৃতি দিয়ে, আমাদের দুই ডাক্তারকর্মী—নরেশ রায় ও বিধু ভট্টাচার্যকে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন ও নির্দেশ দিয়ে গেলেন। লোকনাথের বাড়িতে এই প্রাথমিক চিকিৎসার পর তারক ও অর্ধেন্দুকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে আমি ও গণেশ ডাক্তারবাবুকে পেঁাছে দিতে গেলাম। ডাক্তারবাবুকে এর কিছুদিন আগে পুলিশ রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কোথায় রামকৃষ্ণকে চিকিৎসা করেছেন তাও তিনি পুলিশকে বলেছিলেন। কিন্তু কারও নাম বলেন নি। ডাক্তারবাবুর প্রতি আমাদের আস্থা ছিল। তিনিও আমাদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন—তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, আমরা তাঁকে কোন বিপদে ফেলব না। ডাক্তারবাবু যখন আমাদের খুব একান্তে পেলেন তখন তিনি অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী অভিভাবকের মত আবেগভরে বললেন—"দেখ, একটার পর একটা তোমাদের উপর বিপদ আসছে। এ যেন কোন অমঙ্গল সূচনার ইঙ্গিত। তোমরা এই পথ ছেড়ে দাও। ভগবানের বোধহয় ইচ্ছে নয় যে, তোমরা আর এই বিপদসঙ্কুল পথে থাক।"

ডাক্তারবাবুর স্নেহপরবশ মনের অভিব্যক্তি পেলাম। তাঁর সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম। তবু তাঁকে বিনীতভাবে জবাব দিলাম, "দেখুন ডাক্তারবাবু! বিপদকে ভয় করা আমাদের শোভা পায় না। আর ভগবানের কথা বলছেন? তিনি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখেন বিপদে আমরা স্থির থাকতে পারি কি না। আমাদের চলার পথে দুর্বলতার সঙ্গে কোন আপোষ নেই। আশীর্বাদ করুন যেন আমরা আমাদের লক্ষ্যে অচল-অটল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকতে পারি।"

ডাক্তারবাবুকে বাড়ি পেঁাছে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চলে এলাম। এতদিন ধরে একটানা পুলিশের সঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতা চলেছিল রামকৃষ্ণকে তাদের হামলার বাইরে নিরাপদ স্থানে কি করে রাখা যায় তাই নিয়ে। বৃটিশের বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের কতখানিই বা সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল যে বহুদিন ধরে পুলিশের চাতুর্যকে পরাস্ত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব? সংক্ষিপ্ত সময় ও নির্দিষ্ট সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে যখন দলের অস্তিত্ব বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল তখন এর উপর এল আরও জটিল সমস্যা। পুলিশ প্রতিদিনই রামকৃষ্ণের খোঁজে বাড়ি বাড়ি তল্লাসী করছে। তারা তো জানে না যে আমাদের পক্ষে দু-একটি উপযুক্ত বাড়িও যোগাড় করা কত কঠিন ছিল! তার উপর এখন বিস্ফোরণে আহত আরও দুজনকে নিরাপদ স্থানে—ক্রমাগত বাড়ি পরিবর্তন করে নতুন নতুন বাড়িতে রাখতে হবে। কাজেই অতগুলি বাড়ি যোগাড় ও ক্রমাগত বাড়ি বদলানোর মধ্যে

ধরা পড়বার সম্ভাবনাও অনেক বেশি দেখা দিল। ইতিমধ্যে আমরা রামকৃষ্ণকে গ্রামে পাঠিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম। পুলিশ শহরে যতই খানাতল্লাসী করুক না কেন আমাদের তাতে ভয় ছিল না—বরং আমরা খুব আনন্দ পেতাম মূর্খের দলকে শহরে মাথা খুঁড়ে মরতে দেখে। কিন্তু এখন আমাদের প্রতিকূল অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। পুলিশ রামকৃষ্ণকে না পেলেও তার পরিবর্তে আর দু'জনকে হয়ত দগ্ধ অবস্থায় পেয়ে যাবে। তবু তারক এবং অর্ধেন্দুকেও যে আমরা প্রথম সুযোগেই গ্রামের কোন বাড়িতে নিরাপদে থাকার জন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করব তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শহরে কিছুদিন চিকিৎসা করাবার পর তারা একটু সুস্থ হলেই তবে তাদের গ্রামে কোন আশ্রয়ে পাঠানো সম্ভব। সেইজন্য আরও কিছু দিন তাদের শহরে রাখতে হয়েছিল।

কয়েকটি নিরাপদ বাড়ি যোগাড় করেই আমরা নিরাপত্তার ব্যাপারে ক্ষান্ত হই নি। খানাতল্লাসী করার পূর্বে পুলিশের বিশেষ ধরনের কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করার জন্য আমরা বাছাই করা সভ্যদের নিযুক্ত করি। খুব সামান্যভাবে হলেও পুলিশের বিরুদ্ধে আমাদের পাল্টা-গোয়েন্দাগিরি (counter espionage) করবার ব্যবস্থা সব সময়েই রেখেছিলাম। কিন্তু এই বিশেষ অবস্থার জন্য—অর্থাৎ বিস্ফোরণে দগ্ধ ও আহত সাথীদের নিরাপত্তা বজায় রাখবার জন্য—একটি বিশেষ বিভাগ আমাদের সংগঠিত করতে হ'ল যাতে খানাতল্লাসী করতে যাওয়ার পূর্বাহ্ণে পুলিশের গতিবিধি সম্বন্ধে আমরা তড়িৎ খবর পেয়ে যাই। সেইজন্য কোতোয়ালি, পুলিশ বিট্, ডি-আই-বি ইনস্পেক্টার ও সাব-ইন্স্পেক্টারদের বাড়ি প্রভৃতি স্থানে নজর রাখার জন্য আমরা আমাদের কর্মীদের মোতায়েন করি। পুলিশের যে সমস্ত বিশেষ ধরনের আনাগোনা ও তৎপরতা লক্ষ্য করলেই অনুমান করা যাবে যে খানাতল্লাসীর উদ্দেশ্যেই তাদের সেই কর্মচঞ্চলতা—আমাদের কর্মীদের এই সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা জন্মাবার জন্য তাদের সঙ্গে বহু আলোচনা করেছি।

পুলিশের গতিবিধির সংবাদ পাওয়ার ব্যবস্থা খুব সফলতার সঙ্গে যদি চালাতে না পারতাম তবে নিঃসন্দেহে আজ বলা যায় যে, চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠার আগেই নিভে যেত, এবং আজ ভারতের বিপ্লবী ইতিহাসের এই পাতাটিও সমুজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকত না। পুলিশের ওপর নজর রাখার পরিকল্পনার সঙ্গে আমাদের আরও তিনটি অত্যন্ত জরুরী ব্যবস্থার আয়োজন করতে হ'ল। পুলিশের সন্দেহজনক কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করবার পর যদি তৎক্ষণাৎ আমরা হেড্ কোয়ার্টারে, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে, খবর নাই পেলাম তবে তো সবই ব্যর্থ। আর খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি পুলিশের গতির পূর্বে আমরা তীব্রতর গতিতে তারক বা অর্ধেন্দুকে অন্যত্র নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলতে না পারি তবে খবর পেয়েই বা লাভ কি? পুলিশের সমাবেশ (mobilisation) লক্ষ্য করবার পর তা'রা কোন পথে কোথায় যাওয়ার মতলব করছে তারও সন্ধান দিতে আমাদের যুবক কর্মীদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। পুলিশ mobilisation-এর খবর পেয়েই আমরা, যারা নিজেদের পুলিশী আক্রমণের লক্ষ্য (target) বলে মনে করতাম, পরবর্তী সংবাদের জন্য নিরাপদ স্থানে গোপনে অপেক্ষা করে পুলিশ কোন্ দিকে ও কোন্ পথে

অগ্রসর হচ্ছে জেনে নিয়ে আমাদের কর্ম-কৌশল স্থির করতাম। যখন জানতে পেরেছি তারক বা অর্ধেন্দু যেখানে আত্মগোপন করে আছে পুলিশের গন্তব্য পথ আমাদের সেই সব আশ্রয়স্থলের দিকে নয়, তখন আমরা অনর্থক কোন সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন অনুভব করি নি। অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সংবাদ পৌঁছনোর জন্য আমরা কতকগুলি টেলিফোন ও সাইকেলের বন্দোবস্ত করে রেখেছিলাম। দ্বিতীয়ত, পুলিশের সমাবেশ ও গতিবিধির সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মোটরগাড়ি ব্যবহারের সুযোগ থাকা—এই অপরিহার্য ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি নি। তৃতীয়ত, সেইরূপ আকস্মিক পরিস্থিতিতে আহত সাথীদের যদি স্থানান্তরিত করতেই হয় তবে অন্তত সাময়িক আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা রাখা চাইই। এই সাময়িক ব্যবস্থা খুব সুবিধের না হলেও চলবে; কারণ, যদি দেখি শেষ পর্যন্ত পুলিশ আমাদের গোপন বাড়ির সঠিক সংবাদ পায় নি তবে আবার সেই স্থানেই আহত বন্ধুদের ফিরিয়ে নিয়ে যাব। আমাদের এই ব্যাপক ব্যবস্থার কার্যকরী সুফল পাওয়া তখনই সম্ভব ছিল, যদি পুলিশের ক্ষিপ্রতা ও গতিকে পরাস্ত করে আমরা অধিকতর তৎপরতা ও দ্রুতবেগে কাজ সম্পন্ন করতে পারি। যে সংগঠন বেশি গতিশীল হবে সেইটিই জয়ী হবে। তখনকার দিনে বৃটিশ পুলিশ-অর্গেনিজেশন বিপ্লবী সংগঠন সম্বন্ধে যেটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, সেই ভিত্তিতে তারা ভাবতেও পারে নি তাদের জ্ঞানবুদ্ধির অগোচরে ও দৃষ্টির অন্তরালে আমরা তাদেরই বিরুদ্ধে পাল্টা-গোয়েন্দাগিরি করছি এবং টেলিফোন, সাইকেল ও মোটরের সমাবেশে এমনভাবে সারাক্ষণ প্রস্তুত হয়ে আছি যে, তাদের খানাতল্লাসীর অভিযানকে প্রতিহত করবই।

পুলিশ অবশ্য অনেক পরে বুঝেছিল যে, আমরা তাদের ওপরে নজর রাখি। তবু তারা জানতে পারে নি কতখানি গুরুত্ব দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ অবস্থায় আমরা কি কি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। তাদের পক্ষে এটা জানা সম্ভব ছিল না। তারা আমাদের তৎপরতা সম্বন্ধে কিছুটা যে আন্দাজ করেছিল তার নজীর পাই সরকারী তথ্য থেকে। ট্রাইব্যুনালের জজ্ সাহেব আমাদের মামলার রায়ে ৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন—

"....It was noticed also that youths were deputed to watch the houses of the D. I. B. officers and note their movements—by way of counter-espionage."

জজ্ সাহেব বল্ছেন—এটা পরিলক্ষিত হয়েছিল যে পাল্টা-গোয়েন্দাগিরি করবার উদ্দেশ্যে ডি-আই-বি অফিসারদের বাড়ির ওপর নজর ও তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে নোট রাখবার জন্য লোক নিয়োগ করা হয়।

পাল্টা-গোয়েন্দাগিরি করে সংবাদ সংগ্রহের পর আমাদের তৎপরতার একটু আভাস পাওয়া যায় এই মামলায় অভিযুক্ত কারও স্বীকারোক্তিতে—

"....Hari Gopal told me that, while preparing a bomb Ramkrishna met with an accident, and his face, etc., were burnt. A few days after, Hari Gopal told me that Ramkrishna had been removed from the town, where—I do not know. I knew him to belong with this secret revolutionary

party and found him at Ganesh Ghosh's house on many days. After this accident, Hari Gopal, Amarendra and myself were deputed as guards to watch the movements of the police. I kept watch at the basha of Sarada Babu of the C.I.D., Kotwali, Sadarghat and Baxi Hat beat, in order to ascertain whether they were going anywhere to make arrests or where they were going or what they were doing? Only one day we found that Hem Daroga, Siddik, Sachin Babu, and constables were passing through a lane in Jamalkhan. Except this we noticed no other movements of the police in this connection." (From the Printed Judgment in Armoury Raid Case No. I of 1930—page 85.).

উপরে উদ্ধৃত বিষয়ের সারমর্ম এইরূপ—হরিগোপাল তাকে বলেছিল, রামকৃষ্ণ বোমা নির্মাণ করার সময় বিস্ফোরণে আহত হয়—তার মুখ প্রভৃতি পুড়ে গেছে। কিছুদিন পর হরিগোপাল তাকে আবার বলেছিল, রামকৃষ্ণকে শহর থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে—কোথায়, তা' অবশ্য সে জানে না। সে রামকৃষ্ণকে গণেশ ঘোষের বাড়িতে দেখেছে এবং তাকে বিপ্লবী দলের একজন বলেই জানত। এই দুর্ঘটনার পর হরিগোপাল, অমরেন্দ্র ও সে পুলিশের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল। সি-আই-ডি সারদাবাবুর বাড়ি, কোতোয়ালি এবং সদরঘাট ও বক্সিহাট পুলিশ বিট্ দু'টির উপর নজর রাখবার ভার তার উপর পড়েছিল। পুলিশ-দল গ্রেপ্তার করতে কোথায় যাচ্ছে ও কি করছে এইসব তথ্যাদির সত্যতা যাচাই করার নির্দেশ ছিল তার উপর। তারা মাত্র একদিন হেম দারোগা, সিদ্দিক, শচীনবাবু ও কনেস্টবলদের জামাল খাঁর একটি গলিতে ঢুকতে দেখে। পুলিশের এই একটি গতিবিধির কথা ছাড়া তারা আর কিছুই জানে না।

এই বিবরণ থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে আমাদের কৌশল-প্রতিযোগিতার সামান্য আভাস মাত্র পাওয়া যায়। বিভিন্ন ছোট ছোট দল গঠন করে counter-espionage করার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়েছে বিশেষ পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য। এইরূপ সক্রিয় ব্যবস্থা ছিল বলেই আমরা ঠিক সময়মত খবর পেয়ে পাঁচ-ছয় বার ঘোর বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি।

সেই দিন রাত্রের শো-তে আমরা প্রায় আট-দশজন সিনেমায় গেছি। একজন দু'জন করে আলাদাভাবে টিকিট করে ছড়িয়ে বসেছি। সিনেমার নামটি এখন ঠিক আমার মনে পড়ছে না—সিনেমা হাউসের নাম বোধহয় "লোটাস্"। চট্টগ্রাম জেলা আদালতগৃহ যে পাহাড়ের উপর অবস্থিত তারই পূর্ব দিকে পুরোনো পোস্ট অফিসের দক্ষিণে ছিল এই সিনেমা হলটি। সেদিন কি ছবি দেখেছিলাম—বাংলা না ইংরেজী, তাও মনে নেই। তরুণ পাঠক-পাঠিকারা সেই যুগের চলচ্চিত্র সম্বন্ধে হয়ত খুব কমই জানেন। ১৯৩০ সালেও পুরোদস্তুর সবাক্ চলচ্চিত্র (Talkies) ভারতে আমদানী আরম্ভ হয় নি। কলকাতার কোন কোন হলে অর্ধ বা আংশিক সবাক্ চলচ্চিত্র দেখতে পাওয়া যেত। চট্টগ্রামে তখন নির্বাক চলচ্চিত্রই দেখেছি।

পর্দায় ছবি চলছে। দর্শকেরা নিবিষ্ট মনে ছবি দেখছে। আমরাও হয়ত ছবিটি উপভোগ করছিলাম। এমন সময় প্রহরায় রত আমাদের এক যুবক কর্মী ছুটে এসে আমাদের একজনকে সাঙ্কেতিকভাবে বিপদ সঙ্কেত দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের কাছে চুপি চুপি মৃদুস্বরে সঙ্কেতটি পৌঁছে গেল। ছবির মাঝখানে নিঃশব্দে আমরা একের পর এক সিনেমা হল ছেড়ে বাইরে এলাম এবং দু'একজন করে যত শীঘ্র পারি গণেশের বাড়ি পৌঁছলাম। সেখানে মাঝে মাঝে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গান-কটন্, পিক্‌রিক পাউডার প্রভৃতি আনা হ'ত। সেইদিন আবার তিন-চারটি তরবারি (sword) শাণ দিয়ে ধার করে আনা হয়েছিল। সেইগুলিও গণেশের বাড়িতেই ছিল। খবর পেয়েছিলাম ডি-আই-বি সাব-ইন্‌স্পেক্টর রোহিণী ভৌমিকের বাড়িতে রাত দশটা থেকে অস্বাভাবিক রকম পুলিশের আনাগোনা চলছে। তাদের গতি-বিধির লক্ষণ খুব সন্দেহজনক মনে হওয়ায় আমাদের কাছে সেই সংবাদ পৌঁছয়। তাড়িৎগতিতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করলেই নয়। বলাই বাহুল্য, এইরূপ পরিস্থিতির জন্য আমরা সদাসর্বদা প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। কাজেই ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে চলার পদ্ধতিতে (clock-like-precision) আমাদের আসন্ন কাজ সমাপ্ত করি। গণেশের বাড়িতে যত সব বে-আইনী বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রমূলক জিনিসপত্র ছিল সব সরিয়ে ফেলা হ'ল। তারক ও অর্ধেন্দুর বাড়ির দিকে পুলিশ ফোর্সের মুখ্য গতি কি না তা' লক্ষ্য করছে অন্য দু' একজন যুবক বন্ধু। তাদের পরবর্তী সংবাদের অপেক্ষায় আছি আমরা—গাড়িও তৈরি আছে। খবর পাওয়া মাত্রই প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তৈরি হয়ে রইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর এল পুলিশ পার্টি যে রাস্তা ধরেছে তাতে মনে হয় অর্ধেন্দুর বাড়ির দিকেই যাচ্ছে। মুহূর্তে আমাদের গাড়ি ছুটল। পুলিশ সেই পাড়ায় পৌঁছবার আগেই আমরা উপস্থিত হ'লাম এবং পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী অর্ধেন্দু সঙ্কেত পেয়েই গাড়িতে এসে উঠল। ওই বাড়িতে আমাদের যে তরুণ বিপ্লবী বন্ধু ছিল, সেই অর্ধেন্দুর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেছে। আমরা সেই রাত্রে অর্ধেন্দুকে গাড়িতে নিয়ে প্রায় ঘণ্টা দুই ঘুরে বেড়াই। তারপর আবার খবর পেলাম পুলিশ অন্য একটি বাড়িতে হানা দিয়ে ফিরে এসেছে। তখন যথারীতি অর্ধেন্দুকে আবার সেই আশ্রয়স্থলে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলাম।

আর একদিনের ঘটনা। দুপুর বেলা প্রায় দু'টো হবে। গণেশ আমাকে চন্দনপুরাতে হিমাংশুদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে বেবী-অস্টিনটি নিয়ে কোন কাজে গেল। প্রায় দু'তিন ঘণ্টা পরে এসে আমাকে তুলে নেবে কথা ছিল। গণেশ চলে যাওয়ার পর, পনেরো মিনিটও হয় নি, আবার অস্টিন গাড়ির হর্ন শুনতে পেলাম। এ কি! এ যে বিপদ-সঙ্কেত! হর্নের শব্দের বিশেষত্ব লক্ষ্য করে নিশ্চিত হলাম যে বিপদ গুরুতর ও আসন্ন। মুহূর্তে লাফিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। বলাই বাহুল্য, আমাদের দু'জনের কাছেই গুলী-ভর্তি রিভলভার সব সময়েই থাকত। গণেশ উর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি চালাতে চালাতে বলল যে চরচাকতাইয়ের দিকে পুলিশ ফোর্স যাচ্ছে। সেই এলাকার একটা বাসায় আমরা তারকের একা থাকবার ব্যবস্থা করেছিলাম। এই বিশেষ বাসাটির অস্তিত্ব এবং এখানে যে তারক দগ্ধ অবস্থায় ডাক্তারের চিকিৎসায় আছে, তা

আমরা মাত্র ক'জন জানতাম।* গণেশকে যে খবর দিয়েছে পুলিশের গতিপথ সম্বন্ধে, সেও জানত না এই বাড়ির অবস্থান। তাই ওর খবরের গুরুত্ব বুঝেছিল একমাত্র গণেশ।

আমরা দু'জনে চলন্ত গাড়ির মধ্যে আলোচনা করে দেখলাম যে, সময় খুব সংক্ষেপ। পুলিশ হয়ত ইতিমধ্যেই পেঁৗছে গেছে, নয়ত আমাদের পেঁৗছবার আগেই সেখানে উপস্থিত হবে। বড় গাড়ির ব্যবস্থা করতে গেলে আরও সময় যাবে। এখন পুলিশের সংগে প্রতিযোগিতা—কে আগে লক্ষ্য-স্থলে গিয়ে পেঁৗছবে? তখন সমর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের অ-আ-ক-খ জ্ঞানও ছিল না। নেপোলিয়নের War of Movement (গতিশীল যুদ্ধ প্রণালী) সম্বন্ধে কিছুই পড়ি নি। ছত্রপতি শিবাজীর ঝটিকাবেগে রণ-কৌশল প্রয়োগ সম্বন্ধে কিই বা জানতাম! তবে 'ঝটিকাবেগে আক্রমণ চালাতে হবে', 'তড়িৎ গতিতে স্থান পরিবর্তন করতে হবে', 'আকস্মিক আক্রমণের সুযোগ নিতে হবে'—ইত্যাদি আমরা শ্লোগানের মত বুঝেছিলাম আর তা' বুদ্ধি ও সাহসের সংগে প্রয়োগও করেছি।

হাতে সময় খুব কম—একেবারে নেই বললেই হয়। এখন চাই প্রবল বেগ (Dash), প্রচণ্ড শক্তি ও দুর্দান্ত সাহস! We must race for time! সময়ের প্রতিযোগিতায় আমাদের জেতা চাই-ই। যদি পুলিশের আগে গিয়ে পেঁৗছতে পারি তবে হয়ত সংঘর্ষ এড়ান যাবে—নির্বিঘ্নে তারককে নিয়ে আসতে পারব। তাই আর বড় গাড়ি বা অন্য কোন প্রথম সারির সাথীদের সংগে নেওয়ার চেষ্টা করি নি। পথ থেকে একজন সাথীকে তুলে নিলাম, যে সেই বাড়িটি আমাদের মত আগে থেকেই চেনে। আগে থেকে এই ব্যবস্থা ছিল বলেই ছেলেটিকে সংগে নিতে সময় নষ্ট হয় নি। আমরা অস্টিন গাড়িটি একেবারে পাথরঘাটা ইঁটখোলার মাঠের শেষ প্রান্তে নিয়ে গেলাম। সেখান থেকে প্রায় পোয়া মাইল মাঠ, বিল ও কাদা পেরিয়ে চরচাক্তাই যাওয়া যায়। এই পথে লোকজনের যাওয়া-আসার রেওয়াজ নেই। আমরা পেছন দিকের এই অব্যবহৃত, অপ্রচলিত, সহজ ও স্বল্প দূরত্বের রাস্তাটি ব্যবহার করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে করলাম।

গাড়িতে আমরা দুজন—গণেশ ও আমি, বসে রইলাম। আমাদের যুবক বন্ধুকে এই পেছনের পথে পাঠালাম, তারককে সংগে করে সেই রাস্তাতেই যেন দ্রুত ফিরে আসে। তারকের পক্ষে এতদূর হেঁটে আসা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। তবু বিপ্লবীদের প্রয়োজনের খাতিরে সব কষ্ট সহ্য করতে হবে—সব ঝুঁকি নিতেই হবে। বর্তমানে তারকের হাঁটবার ক্ষমতা অবশ্য হয়েছিল। তবে এতটা হাঁটবার তার প্রয়োজন হয় নি। বাড়িতে এক আধটু নড়াচড়া করত, বাথ্রুমে যেতে পারত। সেই ভরসায় তারককে এই পথে আনতে বল্লাম। স্বল্প সময়ের মধ্যে এই পথটির সুযোগ নিলে হয়ত শেষ পর্যন্ত আমরা জয়ী হতেও পারি—এই আশায় তখনকার মত এই tactical route নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

আমাদের যুবক বন্ধু অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রায় দৌড়ে তারককে আনতে গেল। দশ-বারো মিনিটের মধ্যেই দূর থেকে দেখতে পেলাম তারক ও সে মাঠের অপর প্রান্তে এসে পেঁৗছেছে এবং বিল ও কাদা অতিক্রম

করে আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের দেখতে পেয়ে আশা হ'ল—বোধহয় এ যাত্রাও রক্ষা পেলাম। কিন্তু তখনও বিপদসীমারেখা (Danger Zone) উত্তীর্ণ হতে পারি নি। তাই আশার ক্ষণিক আলো দেখে আনন্দিত হয়েছি —উৎফুল্ল হই নি।

তারক ও আমাদের যুবক বন্ধুটি গাড়িতে এসে উঠল। তারক খুব হাঁপিয়ে পড়েছে। তবু মনের জোরের কমতি ছিল না। আমরা বড় রাস্তায় সুবিধেমত স্থানে যুবক বন্ধুটিকে নামিয়ে দিলাম। গাড়িতে তখন আমরা তিনজন—গণেশ, আমি ও তারক। পরিষ্কার দিনের আলো, বোধহয় চারটে বা সাড়ে চারটে হবে। উপায় নেই—তারকের দগ্ধস্থান কোন আবরণে ঢেকে রাখাও সম্ভব ছিল না। সেই অবস্থায় দিনেরবেলা বেবী-অস্টিন চেপে শহরের রাস্তা অতিক্রম করে চলেছি। পথে অনেকেরই যে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে তা'তে সন্দেহ নেই। সেজন্য অবশ্য ভাববার কিছু ছিল না। কিন্তু যদি কোন পরিচিত পুলিশের নজরে পড়তাম তাহলে যে কি সর্বনাশ হ'ত, সেইটিই ছিল ভাবনার। যতদূর সম্ভব বড় রাস্তা বা ভিড়ের রাস্তা পরিহার করেই চলেছি।

আমরা ঠিক করেছিলাম তারককে সাময়িকভাবে আনন্দ ও দেবুর বাড়িতে নিয়ে তুলব। এই বাড়িটি গভর্নমেন্ট কলেজের অপর দিকে একটি ছোট টিলার ওপরে। আনন্দের পড়বার ঘরটি প্রধান দালান থেকে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ ফুট দূরে, বাড়ির লনের অন্য প্রান্তে। এই টিলার ওপর মোটর যাওয়ার কোন পথ ছিল না। টিলার নিচে গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে ওপরে উঠতে হ'ত। আমরা অবশ্য অস্টিন গাড়িটি মাঝে মাঝে তাদের বাড়ি ওঠার পথ ধরে প্রায় অর্ধেক ওপরে উঠিয়ে আনতাম। সেখানেই গাড়ি পার্ক করে রাখতে হ'ত—তার ওপরে আর যাওয়া যেত না।

গাড়ি নিচে রেখে তারককে ঐ অবস্থায় সবার দৃষ্টির মধ্যে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া কোনমতেই চলতে পারে না। তাই এক নতুন পথে আনন্দদের বাড়ির লনের ওপর গাড়ি নিয়ে যাব ঠিক করলাম। অপ্রচলিত রাস্তায়, অর্থাৎ, কোন রাস্তাই নেই তবু সেই পথে—এক পাদ্রী সাহেবের বাড়ির টিলার মাঝখান দিয়ে গাড়ি চালালাম। এক বৃদ্ধা মেমসাহেব খুব তেড়ে এলেন—চেঁচিয়ে কি কি যেন বলছিলেন। সেদিকে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে নিমেষে পাদ্রী সাহেবের পাহাড় অতিক্রম করে বেবী অস্টিনটি নিয়ে আনন্দদের বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়ে কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করলাম। গাড়িটি একেবারে তাদের পড়ার ঘরের সঙ্গে লাগিয়ে দাঁড় করালাম। তারক টুপ্ করে নেমে ঘরের মধ্যে চলে গেল। আনন্দের মা, দিদি, কেউই টের পেলেন না। তবে অপ্রত্যাশিতভাবে এই প্রথম তাদের টিলাটির ওপর দালানের সামনে মোটর গাড়ি এসেছে দেখে অবাক হলেন, কিন্তু খুশি হয়েছেন বলেই মনে হ'ল।

তারককে সেখানে আনার সঙ্গে সঙ্গে সব রাস্তার ওপরে আমাদের 'প্রহরী' মোতায়েন করলাম, যেন অনেক দূর থেকেও পুলিশ ফোর্সকে আসতে দেখলেই 'রিলে' করে টিলার ওপর সংবাদ দিতে পারে। এই টিলার পশ্চিমে লাগান ছোট-বড় পাহাড়ের সারি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। তাই

একটু আগে পুলিশের আগমনবার্তা পেলেই তারক অতি সহজে পাহাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করতে পারবে। এই বাড়িটিকে এইভাবে নানান ষড়যন্ত্র-মূলক কাজে ব্যবহার করেছি আমরা। যথাস্থানে সে-সব বিবরণ দেওয়া হবে।

তারক ও অর্ধেন্দু বেঁচে আছে তখনও। আর তাদের যন্ত্রণার উপশমের জন্য এবং সর্বোপরি চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থানকে অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে আমি তাদের মৃত্যুই শ্রেয় বলে মনে করেছিলাম—তাদের গুলী করে মারবার প্রস্তাব আমিই করি! তারক ও অর্ধেন্দু, দু'জনেই বেঁচে আছে—এখন অনেক সুস্থ তারা। কিছুদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হবে। কত বড় একটি অন্যায় করতে যাচ্ছিলাম! গণেশ যদি ঐরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে বিপদকে উপেক্ষা করার সাহস না দিত, তবে জীবনের সেই মহা ভুলের কোন প্রায়শ্চিত্তই হয়ত আমার পক্ষে যথেষ্ট হ'ত না। প্রতি মুহূর্তে আমি পীড়া অনুভব করেছি এই ভেবে—যারা সশরীরে বেঁচে আছে, সুস্থ হয়ে উঠছে, তাদেরই মুমূর্ষু অবস্থায় চিরকালের জন্য স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলাম। আর আনন্দ হয়েছে গণেশের কথা ভেবে, তারই জন্য আমি এতবড় একটা অন্যায়ের হাত থেকে বেঁচে গেছি।

দু-তিন দিনের মধ্যে তারক ও অর্ধেন্দুকে আমরা গ্রামের আশ্রয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। রাত বারোটায় জোয়ার আসবে। সেই সময় নৌকো ছাড়বে। নৌকো ভাড়া করা হয়েছে। আব্দুর রহমানের খেয়াঘাটে নৌকো বাঁধা থাকবে। শঙ্কর আমাদের সঙ্গে সেই ঘাটের কাছে, রাস্তায় দেখা করবে। আমরা মোটরে করে রাত বারোটায় তারককে তার জিম্মায় দিয়ে আসব—এটাই ঠিক ছিল। সেই মত রাত বারোটার সময় আমরা ঘাটের রাস্তা পর্যন্ত গেলাম। গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা হেঁটে তারপর ঘাটে যাওয়া যায়। গলির মত ছোট একটি রাস্তা। আলো ছিল না। ঘুট্ ঘুটে অন্ধকার! শঙ্কর অপেক্ষা করছিল। আমাদের কাছে এসে সে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বল্‌ল—"দুই টেঁয়া দুই আনা!" (দুই টাকা দু' আনা)। এই কথা ক'টি সে দু'তিনবার সেইরূপ ফিস্ ফিস্ করে বল্‌ল। তার গলার স্বর, চাহনি, চলাফেরা—সবই যেন একটি ভীষণ ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করছে বলে প্রমাণ দিচ্ছে। আমি বিরক্ত হয়ে খুব জোরে জোরে বললাম—"দুই টেঁয়া, দুই আনা", "দুই টেঁয়া দুই আনা!" তারপর সেইরূপ উচ্চস্বরে বললাম—"তোমার এখানে ভয় কিসের? তোমার গলার স্বর, চলাফেরা এমন করছ যে সন্দেহ করার না থাকলেও লোকে সন্দেহ করবে।" যা' হোক্, তারককে নিয়ে সে চলে গেল। তার পরদিন মাস্টারদার কাছে 'দুই টেঁয়া, দুই আনার' গল্পটা বলে আমরা খুব হাসাহাসি করলাম। সেই থেকে কাউকে ঘাবড়াতে দেখলে আমরা বলতাম—"এই খেয়েছে! আবার দুই টেঁয়া দুই আনা!"

ষড়যন্ত্রমূলক কাজ সফলতার সঙ্গে করতে হলে কথাবার্তা, চলাফেরা খুব স্বাভাবিক হওয়া উচিত। তাই আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতিতে এটার ওপর বিশেষ নজর রেখেছিলাম যেন কোন চক্রান্তমূলক কাজ করবার সময় কোন অস্বাভাবিক কিছু করে না বসি। চালচলনে, কথাবার্তায়, মুখের চেহারা বা

বাহিনীর মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য যেন দেখা না যায়, তার জন্য চেষ্টা করে সহজ, সরল ও স্বাভাবিক ভাব বজায় রাখতে চেষ্টা করি। এই পরিপ্রেক্ষিতে "দুই টেঁয়া দুই আনা!"—অর্থাৎ, নৌকো ভাড়া করা হয়েছে দু' টাকা দু' আনা দিয়ে, এই সহজ কথাটাও সহজভাবে বলতে না পারাটা একটা উদাহরণ হয়ে রইল আমাদের সংগঠনে এবং এই ধরনের কারও স্নায়বিক দৌর্বল্য প্রকাশ পেলে উদাহরণটি উল্লেখ করতাম—'দুই টেঁয়া দুই আনা।'

আগেই বলেছি, ঢালাই লোহার তৈরী সতেরোটি হাত বোমার (Hand granade) খালি খোল আমাদের কাছে রক্ষিত ছিল। এই ঢালাই লোহার (cast-iron) খালি খোলগুলি চট্টগ্রামে আমাদের দলের হাতে যখন আসে, তখন আমি, ১৯২৪ সালে, অর্ডিন্যান্সে বন্দী হয়ে জেলে আছি। cast-iron এ তৈরি হাত-বোমার খালি খোলগুলো আমরা পেয়েছিলাম হরিদার (হরিনারায়ণ চন্দ্র) কাছ থেকে। ভারতের গণতন্ত্র-বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা, ১৯৩০ সালে যুব-অভ্যুত্থানের যে পরিকল্পনা করেছিল তাতে প্রচুর পরিমাণে হাত-বোমার প্রয়োজন অনুভব করে নি। আকস্মিকভাবে প্রথম আক্রমণ চালিয়ে শত্রুর প্রধান প্রধান অস্ত্রঘাঁটি দখল করে নিতে পারলে অস্ত্রের অভাব থাকে না। তাই আমাদের প্রয়োজন ছিল প্রথম আক্রমণের জন্য কতগুলো tactical arms—অর্থাৎ, কতগুলো রিভলবার ও পিস্তল। যেহেতু ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ সামগ্রিক প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেই জন্যই আমরা হাতবোমার প্রয়োজন অনুভব করি। এই একটি বিশেষ লক্ষ্যবস্তুর জন্য সতেরোটি হাতবোমাই যথেষ্ট ছিল। ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের জন্য দশটির বেশি হাত-বোমার প্রয়োজন মনে করি নি। বাকি সাতটি অন্যান্য গ্রুপের সঙ্গে দিয়েছিলাম।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সতেরোটি হাত-বোমাই আমাদের সামগ্রিক প্ল্যানের জন্য পর্যাপ্ত বলে মনে করি। কিন্তু এই সতেরোটি শক্তিশালী হাত-বোমা আমাদের অবশ্যই চাই। ঐ সব ঢালাই লোহার খালি খোলগুলি যত শক্তিশালী বিস্ফোরক পাউডার দিয়ে ভর্তি করা হবে ততই শক্তিশালী হাত-বোমা তৈরি হতে পারে। T. N. T. পাউডার পিক্‌রিক্‌ পাউডারের চাইতে বেশি শক্তিশালী। কিন্তু তখন আমাদের T. N. T. পাউডার তৈরি করবার ব্যবস্থা ছিল না। সেই হেতু অন্তত পিক্‌রিক্‌ পাউডার দিয়েই সেই হাত-বোমার খোলগুলি ভর্তি করতে চেয়েছিলাম। পিক্‌রিক্‌ অ্যাসিড্‌ তৈরি করা আমাদের পক্ষে সহজ ছিল।

দশটি হাত-বোমা নির্মাণের জন্য যে পরিমাণ পিক্‌রিক্‌ অ্যাসিড্‌ (অর্থাৎ পিক্‌রিকের মিহি গুঁড়ো) প্রয়োজন, তা' ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছিল। রামকৃষ্ণ দুর্ঘটনায় আহত হবার পর যখন পুলিশের তৎপরতা বহুল পরিমাণে বেড়ে গেল, তখন প্রস্তুতিপর্ব ত্বরান্বিত করতে চেষ্টা করি। বহু পরিশ্রমের পর দশটা হাত-বোমার জন্য পিক্‌রিক্‌ অ্যাসিড্‌ আমাদের হাতে জমা হ'ল। আমরা যেরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম তাতে আমাদের সত্যিই ভাবনা হয়েছিল যে প্রস্তুত হওয়ার সময় পাব কিনা! এইরূপ সন্ধিক্ষণে আমরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে দশটা হাতবোমা পিক্‌রিক্‌ পাউডার দিয়ে ভর্তি করব, আর বাকি সাতটা

বন্দুকের smokeless (ধোঁয়াবিহীন) বিলেতী পাউডার দিয়ে ভর্তি করা হবে।

পিক্‌রিক্‌ অ্যাসিডের সঙ্গে পটাস্‌ ক্লোরাস্‌ সংমিশ্রণের সময় শোচনীয় দুর্ঘটনায় তারক ও অর্ধেন্দু আহত হ'ল। প্রথম দিনেই, পিক্‌রিক্‌ পাউডার তৈরি করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। পিক্‌রিক্‌ অ্যাসিড্‌ তৈরি করা সম্ভব হলে পিক্‌রিক্‌ পাউডার তৈরি করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। অ্যামন-পিক্‌রেট্‌ তো জমাই আছে। এর অর্ধভাগ পটাস্‌ ক্লোরাসের সঙ্গে মেশালেই শক্তিশালী বিস্ফোরক পাউডারে পরিণত হবে। কিন্তু অ্যামন-পিক্‌রেট ও পটাস্‌ ক্লোরাস্‌ পড়ে রইল—বিস্ফোরক পাউডারে পরিণত হওয়ার আগেই তারক ও অর্ধেন্দু গুরুতরভাবে আহত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় গোপন স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ল।

আমাদের সময় আরও সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। গণেশের রাসায়নিক বিদ্যা সম্বন্ধে পারদর্শিতা ছিল। তারই ওপর "পারকাশান ক্যাপ", পিক্‌রিক্‌ অ্যাসিড্‌, পিক্‌রিক্‌ পাউডার, হাত-বোমা প্রভৃতির প্রস্তুতি কাজ তদারক করা ও তা' সমাপ্ত করার ভার ছিল। দলের বাছাই করা সদস্য—তারক, রামকৃষ্ণ, অর্ধেন্দু প্রমুখ বিজ্ঞানের ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে বিস্ফোরক দ্রব্য ও হাত-বোমা নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ করে আনা সত্ত্বেও পিক্‌রিক্‌ পাউডার তৈরি করবার সময় যে মারাত্মক অ্যাক্‌সিডেন্ট হ'ল তাতে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হয়েছি। কারণ, অতীতের প্রচুর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, ঐরূপ পাউডার তৈরি করার সময় কখনও অ্যাক্‌সিডেন্ট হতে পারে না।

একটার পর একটা অ্যাক্‌সিডেন্ট। পারকাশান ক্যাপ্‌ তৈরি করবার সময় রামকৃষ্ণ সাংঘাতিকভাবে আহত হ'ল। তারপর পারকাশান ক্যাপের পরিবর্তে বোমা ফাটাবার বিকল্প ব্যবস্থা করলাম—বিলেতী টাইম ফিউজের সাহায্যে। দ্বিতীয় অ্যাক্‌সিডেন্ট হওয়ার পরে আমাদের মনে প্রশ্ন এল—পিক্‌রিক পাউডার ব্যবহারের পরিবর্তে দশটি হাত-বোমার খোলগুলি কি কম শক্তিশালী 'ধোঁয়াবিহীন বন্দুকের কাল পাউডার' (Smokeless Black Gun Powder) দিয়ে ভর্তি করে নেব? কিন্তু অহেতুক ও ভৌতিক অ্যাক্‌সিডেন্টের ভয়েও আমরা পিক্‌রিক পাউডার তৈরির কাজ বর্জন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি নি। দশটি খোল আমরা পিক্‌রিক পাউডার দিয়ে ভর্তি করাই ঠিক করলাম।

অ্যামন-পিক্‌রেট ও পটাস্‌ ক্লোরাস্‌ সংমিশ্রণের সময় আমাদের বিগত অভিজ্ঞতাকে হতবুদ্ধি করে যে ভৌতিক অ্যাক্‌সিডেন্ট হয়ে গেল তার নিগূঢ় কারণ আমরা শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করেছিলাম। প্রচুর মূল্যে আমরা যে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার তথ্য শেষ পর্যন্ত জানতে পেরেছিলাম সেটি রসায়নবিদ্‌দেরও জেনে রাখা প্রয়োজন। তারকেশ্বর দস্তিদার একটু সুস্থ হওয়ার পর নানা কেমিস্ট্রীর বই থেকে অনুসন্ধান করে বিস্ফোরণের কারণটা জেনেছিল এবং আমাদের জানিয়েছিল যে, অ্যামন-কার্বের সঙ্গে পিক্‌রিক্‌ অ্যাসিডের কৃস্টাল (খুব মিহি গুঁড়ো) জলে ফুটিয়ে ধোঁয়ার প্রণালীতে ছোট ছোট গন্ধকের (Sulpher) ঢেলার মত (Clod) আকার পরিগ্রহণ করে। গন্ধকের ছোট ছোট টুকরোগুলি পিক্‌রিক্‌ অ্যাসিড বা অ্যামন-পিক্‌রেটের মত

একই রকম হলদে দেখতে হয়। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার এইটুকু তথ্য জানবার পর সেই ভৌতিক অ্যাকসিডেন্টের কারণ মুহূর্তে আবিষ্কার করতে পারলাম। এ আমরা সবাই জানি যে গন্ধক ও পটাস ক্লোরাস দিয়ে পটকা তৈরি হয়। তাই মর্টার পেসেল্‌সে যেমনি পটাস ক্লোরাসের সঙ্গে গন্ধকের টুকরোগুলিকে অজান্তে ঘষা হয়েছে তখনই মিশ্রিত বা অর্ধমিশ্রিত পিক্‌রিক্‌ পাউডার সশব্দে বিস্ফোরিত হয়ে বিভ্রাট ঘটাল।

গণেশ, অর্ধেন্দুরা কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ছাত্র। তাদের Theoritical ও Practical জ্ঞান ছিল। আমার সামান্যই প্র্যাক্‌টিক্যাল জ্ঞান ছিল—হাতে-কলমে বহু ধরনের Explosives আমি ব্যবহার করতে শিখেছি। বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করবার সময় তিন তিনটি মারাত্মক অ্যাক্‌-সিডেন্ট হওয়ার পর দলের আর কোন অনভিজ্ঞ ছেলেদের হাতে যা মজুদ পিক্‌রিক্‌ অ্যাসিড ছিল তার সঙ্গে পটাস্‌ ক্লোরাস সংমিশ্রণে পিক্‌রিক্‌ পাউডার তৈরির কাজ দিতে সাহস হ'ল না। গণেশ ও আমি নিজে আমাদের কাছে যে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষিত ছিল তা' দিয়ে দশটি হাত-বোমার প্রয়োজন অনুপাতে পিক্‌রিক্‌ পাউডার তৈরি করার ভার নিলাম।

পিক্‌রিক্‌ পাউডার তৈরি করবার পদ্ধতিতে সামান্যতম ত্রুটির পথও রুদ্ধ করে নানা ব্যবস্থা ও সাবধানতা অবলম্বন করলাম। টিন দিয়ে বর্ম তৈরি করা হ'ল। বুক, বাহু, মাথা ও মুখ সব টিন প্লেট দিয়ে ঢাকা; কেবল দেখবার জন্য দু'টা খুব সরু পেরেকের ছিদ্র রাখা হয়েছে। ইলেকট্রিকের কাজ করবার সময় যেরূপ মোটা রবারের গ্লাবস হাতে পরা হয়—তাই ব্যবহার করলাম।

টিলার ওপর আনন্দদের পড়বার ঘরটি সাময়িকভাবে ল্যাবরেটারীতে পরিণত হ'ল। টেবিলের ওপর পুরু কাঁচের চাদর পেতে দিলাম। আকস্মিক দুর্ঘটনার আশঙ্কায় দু' বালতি ভর্তি জল রাখতেও ভুলি নি। স্টকে রক্ষিত পটাস্‌ ক্লোরাসের প্যাকেট ও পিক্‌রিক্‌ ভর্তি পাত্র আলাদা করে অন্য কামরায় রাখা হয়। ভিন্ন দু'টি পাত্র থেকে প্রতিবার অর্ধ আউন্স করে পিক্‌-রিক অ্যাসিড ও পটাস ক্লোরাস টেবিলের ওপর আনা হ'ত এবং খুব হালকা হাতে পোস্ট কার্ডের মত পাতলা পেস্ট বোর্ডের দুই ইঞ্চি সাইজের একটি টুকরো দিয়ে ঐ দুই রসায়ন দ্রব্যের সংমিশ্রণ করি। পাউডার তৈরি হওয়ার পর ঐগুলি একেবারে আলাদা করে কাঁচের বোয়ামে রাখা হয়। যাঁরা নিজে পিক্‌রিক্‌ পাউডার তৈরি করেছেন, তাঁরা আমাদের এইরূপ অহেতুক সাব-ধানতার কথা শুনে হাসবেন—কারণ, অতখানি সাবধানতার কোনই প্রয়োজন ছিল না। আমরা এইসব রসায়ন দ্রব্যের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নই। তবু অতখানি সাবধানতার প্রয়োজন নেই জেনেও তা' নিয়েছিলাম নীতিগত-ভাবে—কারণ, Explosiveকে কখনও বিশ্বাস করতে নেই।

বিস্ফোরক পাউডার তৈরির কাজ এইভাবে নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হ'ল। এখন পরের অধ্যায়ের জন্য সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করে কাজ সুরু করলাম। হাত-বোমার খালি খোলগুলি পিক্‌রিক্‌ পাউডার দিয়ে ভর্তি করতে হবে আর বোমায় টাইম ফিউজ জুড়তে হবে। খালি খোলে প্রথম টাইম ফিউজ জুড়বার সময় কোন অ্যাক্‌সিডেন্টের সম্ভাবনা নেই। কারণ, ধীরে ধীরে

প্যাঁচ বা সাত সেকেণ্ড ধরে যদি বারুদের পলতে জ্বলতে থাকে তবে ভয়ের কিছুই থাকে না। তারপর যখন ঢালাই লোহার খালি খোল শক্তিশালী বারুদ ঠেসে ভর্তি করা হয় তখন প্যাঁচ কষে লোহার ছিপি বন্ধ করবার সময় পিক্‌রিক্‌ পাউডার বা বারুদ হয়ত ফেটে যেতে পারে। পিক্‌রিক্‌ পাউডার তৈরি করার সময় ঘষা লেগেই তো বিস্ফোরণ হ'ল এবং তাতে তারক ও অর্ধেন্দু আহত হয়। সেই একই জাতীয় তৈরি পাউডার দিয়ে হাত-বোমার খালি খোল ভর্তি করে লোহার ছিপি কষতে হবে। যদি কোন-মতে খালি খোল ভর্তি করার সময় ঘর্ষণে বোমাটি ফেটে যায় তবে অবশ্য সেই ঘরে জীবন্ত কারোকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে শুধু শুধু ঘাবড়াবার কারণ নেই। যাঁরা Explosive নাড়াচাড়া করতে অভ্যস্ত এবং Explosive-এর বিভিন্ন গুণ ও প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জানেন ও বোঝেন, তাঁরা যদি সতর্ক ও সচেতন থাকেন তবে বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহারের সময় তাঁদের অনাবশ্যক আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণই থাকে না।

হাত-বোমার খালি খোলগুলিতে পিক্‌রিক্‌ পাউডার ভর্তি করা আমাদের কাছে কোন সমস্যাই নয়। তবে এতদিন যেমন অ্যাকসিডেন্টের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবহেলা করে বিস্ফোরক দ্রব্যের প্রয়োগ ও ব্যবহার-কার্য সমাপ্ত করেছি তা' আর করতে প্রস্তুত নই। আনন্দদের পড়ার ঘরে টেবিলের সঙ্গে একটা 'ভাইস' (Vice) ফিট্‌ করি। এই যন্ত্র দিয়ে কোন জিনিষ খুব শক্ত করে চেপে ধরা যায়। পাউডার ভর্তি হাত-বোমাটিকে ভাইসের চাপে স্থির করে রাখা হ'ল। পাউডার ভর্তি করবার পর পেস্ট বোর্ডের গোলাকার করে কাটা চাক্‌তি দিয়ে পাউডার ভাল করে ঢেকে দিই এবং লোহার খোলের সঙ্গে ছিপি আঁটবার জন্য যে প্যাঁচ কাটা ছিল তা অতি সযত্নে তুলি দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করে দেওয়া হয় যা'তে পাউডারের সামান্যতম পরিশেষও প্যাঁচের মধ্যে না থাকে। তারপর খুব আস্তে আস্তে প্যাঁচ কষে ছিপি আঁটতে থাকি। শেষ কটি প্যাঁচ 'রেঞ্চ' দিয়ে খুব জোরে কষতে হয়। এই সময় জোর ঘষা পড়া বা fiction-এ অ্যাক্‌সিডেন্টের সম্ভাবনা থাকে। সেইরূপ সম্ভাবনাকেও নির্মূল করার ব্যবস্থা করলাম।

প্যাঁচ কষার জন্য বেশ বড় একটি 'রেঞ্চ' ছিপির মাথায় লাগালাম। 'রেঞ্চের' হাতলের শেষ দিকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হ'ল। সেই দড়ির অপর মাথা পাশের কামরায় নিয়ে যাই। তারপর নিজেকে দেওয়ালের আড়ালে রেখে দড়ি ধরে টান দিয়ে একটা একটা করে প্যাঁচ কষি—প্রতিবারই একটি প্যাঁচ ঘোরার পর 'রেঞ্চটি' পুনরায় ঠিক করে বসিয়েছি পরের প্যাঁচটি কষার জন্যে।

এইভাবে 'দুর্বোধ্য ভৌতিক' অ্যাক্‌সিডেন্টকে আমরা পরাস্ত করেছি। ডাক্তার জগদাবাবুর উক্তি—'ভগবানের ইঙ্গিতে অমঙ্গলের সূচনা দেখা যাচ্ছে, তাই তোমরা এই পথ পরিহার কর'—আমরা মানতে পারি নি। ঐশ্বরিক, অলৌকিক শক্তি, প্রভৃতির মিথ্যা দার্শনিকতাকে উপেক্ষা করে আমরা হাত-বোমা তৈরি করেছি।

চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থানের প্রায় ছ' মাস আগে থেকেই আমাদের ব্যায়াম কেন্দ্রগুলি একটু শিথিল হয়ে পড়ল। তার কারণ, আমাদের সশস্ত্র প্রস্তুতির জন্য মোটর শিক্ষা, ঘোড়ায় চড়া, চাঁদমারি প্র্যাক্‌টিস্‌, বোমা তৈরির কাজ,

রিভলভার প্রভৃতি কেনা, তিনজন বিস্ফোরণে আহত বন্ধুকে লুকিয়ে রাখা, পুলিশের তৎপরতার বিরুদ্ধে পাল্টা গোয়েন্দাগিরি (counter espionage) চালু রাখা, সামরিক ঘাঁটিগুলির তথ্য সংগ্রহ করা এবং নানাজাতীয় যন্ত্রপাতি, পেট্রোল, জাহাজ বাঁধার দড়ি প্রভৃতি জোগাড় করা ও গোপনে ঐগুলির বিলি ব্যবস্থার কাজে আমাদের প্রথম শ্রেণীর কর্মীদের নিযুক্ত করতে হয়। আমরা দিন-রাত এইসব ষড়যন্ত্রমূলক কাজে নানাভাবে ব্যাপৃত হয়ে পড়লাম। অভিভাবকরা আমাদের উপর ক্রমেই বিরক্ত হতে লাগলেন। তাঁরা ইতিপূর্বে আমাদের নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যায়াম করতে দেখেছেন, খুব নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে যে চলাফেরা করতাম তা' লক্ষ্য করেছেন। লেখাপড়া সবাই মনোযোগের সঙ্গেই করত; স্কুলে, পাড়ায়, ও নিজ বাড়িতে আমাদের যুবক সাথীরা তাদের ব্যবহারে ও চলা-ফেরার বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সবার কাছে প্রচুর সুনাম ও প্রশংসা অর্জন করেছে এতদিন। কিন্তু শেষের কয়েক মাস আমাদের চলাফেরার কোন উপযুক্ত কৈফিয়ৎ ছিল না—আত্মপক্ষ সমর্থন করার মত কিছুই ছিল না আমাদের। যখন তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ছি, বিভিন্ন পোষাক ব্যবহার করছি—কখনও টাই-স্যুট, কখনও বা ধুতি-সার্ট আর কখনও হয়ত সামরিক খাকী পোষাকে সুসজ্জিত হয়েছি। মোটর গাড়ি ও সাইকেলে তড়িৎবেগে যখন তখন ছুটে চলেছি—যেন সর্বদাই অতি ব্যস্ত। কোন কোন দিন ছেলেরা রাত্রেও বাড়ি থাকত না; লেখা-পড়ায় কারও মন নেই, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রেও আমরা আগের মত নিয়মিত যাচ্ছি না আর অভিভাবকদের সমানে অমান্য করে চলেছি। কেন হঠাৎ এইরূপ বদলে গেলাম তার কারণ আমরা ছাড়া আর কেই বা জানবে! যুব-বিদ্রোহের আগে কয়েকটি মাস আমরা এমন অবস্থার সম্মুখীন হ'লাম যে, তা'তে অভিভাবক ও জনসাধারণের কাছে আমাদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখা একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠল। চারিদিকে আমাদের বিরুদ্ধে অনেক কুৎসা রটতে লাগল কিন্তু কোন নির্ভরযোগ্য কৈফিয়ৎ দেওয়া গেল না! অভিভাবকেরা প্রতিবাদ জানালেন, কঠোর হ'লেন, বাধা দিলেন—আমরা তা মানতে পারলাম না, উপেক্ষা করলাম। সারা শহরে আমাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা চলতে লাগল। বিরুদ্ধপক্ষীয় অনেকে আমার সম্বন্ধে যা তা বলেছে—এমন কি অনেকে আমাকে গুণ্ডা নামে অভিহিত করেও আত্ম-প্রসাদ লাভ করেছে। তাও মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে। এ এক কঠোর পরীক্ষা! নিষ্ঠার সঙ্গে মহান্ আদর্শকে রূপ দেবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলাম বলেই হয়ত ঐসব কুৎসা অপবাদ উপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

যতক্ষণ আমাদের অবস্থা শুধু বিরুদ্ধ সমালোচনার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, ততক্ষণ অসহ্য হলেও মুখ বুজে সব সহ্য করেছি। কিন্তু সমস্যা খুব জটিল হয়ে দেখা দিল, যখন আমাদের বিরুদ্ধে নানাদিক থেকে সক্রিয়ভাবে আঘাত আসতে লাগল।

পুলিশও এই অবস্থার সুযোগ নিল। তারা কোন কোন অভিভাবকদের জানাল যে তারা যেন তাদের ছেলেদের আমাদের প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আমাদের বিরুদ্ধে মামলার জাজ্‌মেন্ট থেকে edit না করে হুবহু নকল নীচে উদ্ধৃত করা হ'ল—

"....From the beginning of 1930 the activities and movements of the six ex-detenus and their associates began to increase in a manner which intensified the suspicions of the police. They were seen to be constantly meeting together at all hours of the day at Ganesh Ghosh's shop, the Congress office and the Sadarghat Club and also moving about the town either on foot or in Ananta Lal Singh's Baby Austin Car No. 24666......Members of the Party were seen from time to time wearing different styles of dress, sometimes Khaki uniform, sometimes European dress and sometimes Indian dress. ....The D.I.B. Inspector Sarada Bhattacharya spoke to several parents and guardians about the undesirability of allowing their boys to abandon their studies and spend their days associating with these six ex-detenus. Among those whom he thus warned were Jogendra alias Mona Gupta, father of accd. Ananda Gupta and Debu Gupta (killed at Julda), Rasik Nandy, father of Amarendra Nandy (killed on 24th April) and uncle of accd. Phanindra Nandy and Jatra Mohan Das uncle of Haripada Mahajan (absconding accd.), Siddik Dewan (P.W 220) similarly warned Ranjan Lal Sen, pleader, about his son Rajat Sen (subsequently killed at Julda). On 27th February, Ganesh Ghosh and Ananta accompanied by Jiban Ghoshal and Bidhu Bhattacharji came to Sarada Babu and demonstrated with him for warning guardians against them (P.W. 70, 220 and 149)."
[Page—9; Chittagong Armoury Raid Case No. 1, 1930].

জজসাহেব তাঁর রায়ে যেরূপ মন্তব্য করেছেন তার সারমর্ম এইরূপ দাঁড়ায়—১৯৩০ সালের প্রথম দিক থেকেই ছয়জন প্রাক্তন ডেটিনিউ (গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল, নির্মল সেন, অনন্ত সিং ও সূর্য সেন) তাদের কর্মতৎপরতা খুব বাড়িয়ে ফেলল। তাতে পুলিশের সন্দেহও অনেক গুণ বেড়ে গেল (যুব বিদ্রোহের তখন মাত্র সাড়ে তিন মাস বাকি আছে) তাদের ওপর। সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে জজসাহেব পেয়েছেন, দলের সভ্যরা সবাই রাতে ও দিনে গণেশ ঘোষের দোকানে, কংগ্রেস অফিসে ও সদরঘাট ক্লাবে মেলামেশা করত। তাছাড়া দলের যুবকেরা পায়ে হেঁটে বা অনন্ত সিং-এর ২৪৬৬৬ নম্বর বেবী অস্টিন করে সারা শহর চষে বেড়াত।...দলের সভ্যদের বিভিন্ন স্টাইলের পোষাক পরতে দেখা যেত—কখনও খাকী সামরিক পোষাকে, কখনও বা ইউরোপীয়ান বেশে আর কখনও হয়ত ভারতীয় পরিচ্ছদে।...... এই সব দেখেশুনে ডি, আই, বি, ইনস্পেক্টর সারদাবাবু কোন কোন অভিভাবক ও পিতামাতাদের হুঁসিয়ার করে দিলেন যেন তাঁরা ছেলেদের লেখা-

পড়ায় মনোযোগী হতে চাপ দেন এবং তাঁদের ছেলেরা সেই ছয়জন প্রাক্তন [illegible]দের সংসর্গ যাতে পরিত্যাগ করে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখেন। সারদা-বাবু, আনন্দ ও দেবু গুপ্তের বাবাকে, অমরেন্দ্র নন্দী ও ফণীন্দ্র নন্দীর বাবা রসিক নন্দীকে, হরিপদ মহাজনের মামা যাত্রামোহন দাস মহাশয়কে, ওঁদের ছেলেদের সম্বন্ধে হুঁসিয়ার করে দেন। এই দিকে আবার সাব-ইন্‌স্পেক্টর সিন্দিক দেওয়ান রজত সেনের পিতা—উকিল রঞ্জনলাল সেনকে তাঁর পুত্র সম্বন্ধে সচেতন করে দেন। যে সব ছেলেদের কথা জজসাহেব উল্লেখ করেছেন, তাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে গুরুত্ব আরোপ করার উদ্দেশ্যে একটু রেফারেন্স দিয়েছেন। যেমন নাকি বলেছেন—আনন্দ, ফণীন্দ্র এই মামলার আসামী, অমরেন্দ্র পুলিশের গুলীতে নিহত হয়, হরিপদ মহাজন এই মামলার আসামী আত্মগোপন করে আছে এবং রজত সেন ও দেবু গুপ্ত, জুলুদা (কালারপোল) রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে। তারপর জজসাহেব লিখলেন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী গণেশ ঘোষ এবং অনন্ত মাখন ঘোষাল ও বিধুকে সঙ্গে নিয়ে সারদাবাবুর বাড়ি গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিভাবকদের কাছে সারদা-বাবুর হুঁসিয়ারির ঘোর প্রতিবাদ জানিয়ে এল।

থানায় বা পুলিশের বাড়ি গিয়েও মাঝে মাঝে বিরক্তি প্রকাশ এবং প্রতিবাদ জানান প্রয়োজন বলে আমরা তখন মনে করতাম। আমাদের ক্রোধ যে তাদের ব্যক্তিগত জীবনে আশঙ্কার কারণ, এটা তারা অনুধাবন করুক, এই আমাদের ইচ্ছে ছিল। এতে ফল কি হয়েছিল বলা শক্ত। উপরমহল থেকে যদি কোন সরকারী নীতি প্রবর্তিত হয় তবে জেলা পুলিশের যে তা পালন করতেই হবে এটা অবশ্য আমরা জানতাম। কিন্তু স্থানীয়ভাবে প্রথম কাজ আরম্ভ করার ভার (Local initiative) দিতে জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ যেন বিশেষভাবে ভেবে চিন্তে কাজ করে সেই উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে আমাদের প্রতিবাদ জানানো ও বিক্রম জাহির করা হ'ত।

কিছুদিন আগে আমাকে একজন প্রশ্ন করলেন—"আচ্ছা, রিভলভার সাইজে কত বড়? পুলিশের কাছে যা' দেখা যায় তা'তো বেশ বড় বলেই মনে হয়। তোমরা কি করে তা' তোমাদের পোষাকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে? পুলিশের চোখে পড়ত না? তোমরা কোতোয়ালি ও আই-বি-ইন্‌স্পেক্টরের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার সময়ে সঙ্গে রিভলভার নিয়ে যেতে তোমাদের আশঙ্কা হয় নি যে, তোমাদের সঙ্গের রিভলভারের অস্তিত্ব তাদের নজরে পড়তে পারে?"

আর একজন আমাকে অন্য ধরনের প্রশ্ন করেছেন। তাঁর জিজ্ঞাস্য হ'ল—"রামকৃষ্ণকে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় সকালবেলা আপনারা সাদা পোষাক পরিহিত পুলিশ watcher-দের সামনে দিয়ে নিয়ে এলেন আর তারা চুপ করে রইল? আপনাদের বাধা দিল না? ধরতে চেষ্টা করল না?"

যখন এই ধরনের প্রশ্ন কারও মনে একবার উদয় হয়েছে, তখন আমার বিশ্বাস আরও অনেক পাঠক-পাঠিকাদের মনেও অনুরূপ প্রশ্ন দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। আমি বুঝতে পারছি বাস্তব অবস্থার একটা চিত্র সামনে না থাকলে এইরূপ প্রশ্ন অজ্ঞতাবশতঃ সরল মনে উঠবেই। এ যেন ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথা—বিস্ফোরণে আহত রামকৃষ্ণকে নিয়ে সাদা পোষাক পরিহিত

পুলিশ পাহারাদারদের উপেক্ষা করে, তাদের চোখের সামনে দিয়ে উধাও হলাম! আবার সঙ্গে লুকিয়ে রিভলভার নিয়ে কোতোয়ালি ও পুলিশ অফিসারদের বাড়ি গিয়ে চোটপাট করে চলে এলাম! এই সব 'গল্প' রূপকথার মত শোনালেও তা' একেবারে বাস্তব সত্য।

বিভিন্ন আকারের পিস্তল ও রিভলভার আছে। Colt বা Webly-র আর্মি রিভলভার আমরা সচরাচর পুলিশদের কোমরে, চামড়ার খাপে (Holster) বেল্টের সঙ্গে বাঁধা দেখতে পাই। এই ধরনের "পুলিশ পোস্টিভ" রিভলভার আকারে ছোট হয়—বোধ করি ইঞ্চি দশেক হতে পারে। "পুলিশ পোস্টিভ" রিভলভারের চাইতে বড় আকারের রিভলভার আমাদের কাছে ছিল না। তবে তার চাইতে অনেক ছোট রিভলভার আমাদের কাছে ছিল। পিস্তল এমনিতেই আয়তনে ছোট হয়—চেপ্টা নোট বইয়ের মত। যেমন নাকি ছোটদের খেলার জন্য পিস্তল বাজারে পাওয়া যায়। আমাদের কাছে তখন নয়শট্‌ওয়ালা মাঝারি ধরনের ৫" বা ৫½" ইঞ্চি লম্বা পিস্তল ছিল। এইরূপ পিস্তল বা রিভলভার চামড়ার ব্যাগ ছাড়া আমরা কোমরের সঙ্গে বেল্ট দিয়ে চেপে বেঁধে রাখতাম। গেঞ্জি ও সার্ট দিয়ে কোমরে বাঁধা এই পিস্তল বা রিভলভার ঢেকে রাখতাম। শীতকাল হ'লে তো কোন কথাই ছিল না। গ্রীষ্মকালেও চেপে বেল্ট বেঁধে ভালভাবেই ঐগুলিকে শরীরের সঙ্গে রাখা হ'ত—পুলিশের নজরে পড়া সম্ভব ছিল না। তা'ছাড়া প্রয়োজন হলে বাঁ হাতটি এমনভাবে লুকানো রিভলভারের ওপরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাখতাম যে পুলিশের নজরে পড়া অসম্ভব ছিল। পুলিশ অবশ্য গণৎকার বা জ্যোতিষী হ'লে থড়িগুণেই আমাদের সঙ্গে গোপনে রক্ষিত রিভলভারের সন্ধান তক্ষুণি পেয়ে যেত। পুলিশ যখন ব্রহ্মজ্ঞানী নয় এবং আমাদের যুবক বন্ধুদের মধ্যেও কেউ যখন পুলিশের চর নয়, তখন সঙ্গে রিভলভার রাখা কোন সমস্যাই নয়। তা'ছাড়া তখন রিভলভার-পিস্তল আমাদের কাছে সব সময়ের খেলার সামগ্রী। বাড়িতে ছোট ছেলেরা যেমন টয়-রিভলভার ও পিস্তল নিয়ে খেলাধুলো করে, আমরা তেমনি বে-আইনী অস্ত্র নিয়ে সব সময় বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করেছি। সেইজন্য আমাদের হাব-ভাব, চোখ-মুখ ও চাহনিতে কখনও কোন অস্বাভাবিক কিছু ফুটে উঠত না। ধরা না পড়ে রিভলভার ও পিস্তল সঙ্গে বহন করার মূল মন্ত্র হ'ল—খুব সহজ ও স্বাভাবিকভাবে চলতে পারা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—সাদা পোষাকের পুলিশ আমাদের বাধা দিল না কেন? চট্টগ্রামে আমাদের দলের প্রভাব বা প্রতাপ ছিল অপ্রতিহত। এমন দিন হয়ত যায় নি, যে দিন নাকি সাদা পোষাকের পুলিশ ওয়াচারদের আমরা ধমকাই নি। বাড়িতে বসবার ঘরে হয়ত বসে আছি, এমন সময় দেখতে পেলাম যে দু'জন সাদা পোষাকের পুলিশ বাড়ির সামনে ঘোরাফেরা করছে। আর যায় কোথায়? তক্ষুণি তাদের ডাকলাম—"এই, কে তোমরা? কি করছ এখানে? এদিকে এস।" সুড় সুড় করে সুবোধ বালকের মত তারা আমাদের ডাকে বাড়িতে এসেছে। তারপর আরও গলা চড়িয়ে ধমকের সুরে কখনও বলেছি—"দেখ, এইরকম বোকার মত পেছু লেগেছ কেন? মারও খাবে চাকরিও যাবে। পালাও এখান থেকে!" কেউ কখনও বলেছে—"না বাবু, আমি পুলিশের

লোক নই।" আবার কেউ কাতরকণ্ঠে নিবেদন করেছে—"বাব্, আমরা গরীব, হ্কুমের চাকর! আমাদের মাপ করবেন।"

কখনও হেঁটে চলার সময় যদি ব্ঝতে পারলাম যে আমাদের কেউ অন্সরণ করছে, তখন হঠাৎ একটা রাস্তার মোড় ঘ্রে দাঁড়িয়েছি, আর যেমনি অন্সরণকারী, সাদা পোষাকের প্লিশ, সামনে এসে পড়েছে তখনই তাকে ধমক দিয়েছি—"খবরদার পেছ্ নেবে না! যাও ফিরে যাও!" কারও প্রতিবাদ করবার মত সাহস বা শক্তি দেখি নি। আমাদের হ্কুম তাকে মানতেই হয়েছে। শহরে প্রায় সকলেই আমাদের চিনত। শারীরিক শক্তির ক্রিয়া-কৌশল তারা দেখেছে। আমাদের দেখেছে চলন্ত মোটরের গতিরোধ করতে, ব্কের ওপর দিয়ে বড় রোলার চালাতে, লোহার পাত দ্মড়ানো, লাঠিখেলা, ছ্রিখেলা, ম্ষ্টিয্দ্ধ ও জাপানী কুস্তি প্রভৃতি ক্রিয়া-কৌশলের আমরা যে বিশেষ অধিকারী তা'ও জানত। ঐদিকে আবার আমরা ব্টিশ সৈন্যের অন্করণে খাকী পোষাক পরিহিত ভলান্টিয়ার বাহিনী সংগঠিত করেছি। তা'ছাড়া জেলা কন্ফারেন্স ও কংগ্রেস নির্বাচন প্রতিযোগিতায় আমাদের অখণ্ড প্রতাপের সংবাদ প্লিশ মহলের কাছে অবিদিত ছিল না। প্লিশ আরও জানে যে, আমাদের লাঠি আর ঘ্ষি চট্টগ্রামের গ্ণ্ডা সম্প্রদায়কে শায়েস্তা করেছে। প্লিশের ফর্দেই আছে—রেলের টাকা ডাকাতি, নাগার-খানা য্দ্ধ ও আমাকে যে সাবইন্স্পেক্টর (প্রফ্ল্ল রায়) গ্রেফতার করেছে, তার হত্যা। এক কথায়, আমাদের দাপটকে চট্টগ্রামের রাজশক্তি সত্যিই ভয় পেত। চট্টগ্রামের প্লিশ প্রবল ব্টিশ সরকারের একটি অংশ হলেও আমাদের প্রচণ্ড শক্তি ও প্রভাব তাদের ক্ষমতাকে সাময়িকভাবে নিশ্চল করতে সফল হয়েছিল।

আমাদের সম্বন্ধে তাই ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জে ইউনী লিখেছেন—

"This incident and that of Radhika Dutta indicate according to the prosecution the existence of a mentality prone to violence and that even then these ex-detenus had gathered round them a number of followers and were prepared to deal violently and summarily with anybody offering any kind of opposition to them, either individually or collectively."

সাহেব জজ এক হাজার সাক্ষীর বহ্ জবানবন্দী ঘেঁটে অনেক তথ্য আবিষ্কার করে তাঁর মন্তব্যে বলছেন যে, সরকারী অভিযোগ অন্সারে রাধিকা দত্তের ঘটনা ও এই ঘটনা হতে প্রকাশ পাচ্ছে আমাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের মনোভাব। তব্ও বহ্ য্বক আমাদের অন্গামী হ'ল। 'এই ঘটনা' বলে জজ সাহেব যা বল্ছেন এখানে সেই সম্বন্ধে তিনি আগেই উল্লেখ করেছেন। রহিমদাদ প্রম্খ ক'জন আমাদের এক য্বক বন্ধ্র সাইকেল কেড়ে নেয়। সেই সাইকেল তারা আবার কোতোয়ালিতে জমা দেয়। কাজেই আমাদের লাঠি ও ঘ্ষির শিকার হ'ল রহিমদাদেরা। তারপর আমরা কোতোয়ালিতে গিয়ে যথারীতি আমাদের সাইকেল দাবি করি। কোতোয়ালির

ভারপ্রাপ্ত অফিসার আমাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করতে সাহস পেলেন না—সাইকেলটি তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিলেন। আমরা কারও কাছ থেকে কোন প্রকার বিরুদ্ধতা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলাম না। সেইরূপ একক বা সমষ্টিগত বাধা যখনই এসেছে তখনই সঙ্গে সঙ্গে বলপ্রয়োগ করে তা' ধ্বংস করবার জন্য আমরা সদাসর্বদা প্রস্তুত ছিলাম—এই বলে জজসাহেব তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

চট্টগ্রামে যুব-বিদ্রোহের পূর্বে রাজশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের সাংগঠনিক শক্তি এবং ভারতীয় গণতন্ত্র-বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সভ্যদের বেপরোয়া ও আপোষহীন মনোভাব এবং তাদের সক্রিয় প্রতিক্রিয়ার বাস্তব চিত্রটি চোখের সামনে না থাকলে ধারণা করা কঠিন হয়ে পড়ে যে, কি করে সব সময় সব জায়গায় আমরা রিভলভার নিয়ে চলাফেরা করতাম ও কি কারণেই বা বেচারা সাদা পোষাকধারী পুলিশরা সব দেখেও না দেখার ভান করে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকাটাই বিবেচকের কাজ বলে মনে করত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যাবে, কি করে আমাদের বিরুদ্ধে অভি-ভাবকদের কাছে নালিশ করার জন্য আমরা তৎক্ষণাৎ আই-বি-ইন্‌স্পেক্টর, সারদাবাবুর কাছে জোর প্রতিবাদ জানাতে পেরেছি। আমাদের ঐ ধরনের প্রতিবাদের অর্থ তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন—আমরা ঐ সব বাড়াবাড়ি মুখ বুজে সহ্য করতে প্রস্তুত নই। সারদাবাবু কিছুটা শঙ্কিত হলেন—মনে হ'ল ভবিষ্যতে হয়ত আমাদের বিরুদ্ধে সেইরূপ পন্থা নিতে বিবেচনা করবেন।

আমাদের বিরুদ্ধে পুলিশের চক্রান্তকে সাময়িকভাবে হলেও ঠেকিয়ে রাখার জন্য নানাপ্রকার পাল্টা ব্যবস্থা করেছিলাম—কিছুটা সক্ষমও হয়েছিলাম।

কিন্তু অভিভাবকদের অপ্রত্যাশিত বিরূপ মনোভাবের সক্রিয় প্রতিক্রিয়ার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা মহা বিপদে পড়লাম যখন অভিভাবকেরাও সক্রিয়ভাবে তাঁদের সন্তানদের মঙ্গলের জন্য আমাদের বিরুদ্ধে আসরে নামলেন। সত্যিই আমরা তাঁদের কোন দোষ দিই না। কি করবেন তাঁরা? ছেলেরা রাত্রে দিনে, কোন সময়েই বাড়ি থাকে না, স্কুল-কলেজের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে, বাড়ি থেকে যে যা' পারছে—টাকা বা গয়নাপত্র, সব নিয়ে আসছে। বাড়ির থেকে চুরি হাতেনাতে ধরা না পড়লেও, অভিভাবকদের সন্দেহ উদ্রেক করার যথেষ্ট কারণ ছিল। এই অবস্থায় যাঁরা একদিন আমাদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন তাঁরা যদি আজকের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তাঁদের ছেলেদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশও করেন তবু দোষ দেওয়া যায় না। আমরা তাঁদের দোষী না ভাবলেও তাঁরা আমাদের মূল উদ্দেশ্য না জেনে যখন কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করলেন তখন আমাদের অবস্থা আরও সঙ্কটজনক হ'ল।

যুব-বিদ্রোহের আর মাত্র দশ দিন বাকি। মাধববাবু একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর ছেলে ফকির সেনের বিরুদ্ধে পুলিশে খবর দিলেন এবং ছেলের বিরুদ্ধেই ৩৮০ ধারায় এক মামলা রুজু করলেন। আমাদের মামলার রায়ের একটা অংশ থেকে উদ্ধৃত করছি—

"Then on 8th April Madhab Sen (P. W. 306), father of accd. Fakir Sen, made a complaint to the Deputy Superintendent of Police (P. W. 52) which was treated as a first information (Ex. 46) and case under section 380 I.P.C. was instituted against Fakir. The complaint runs thus :—

'I am a comparing clerk in the District Judge's Court, Chittagong. My son Fakir Chand Sen alias Khoka, aged 16 years has left off his studies from January last and has joined the gang of Ganesh Ghosh, Ananta Singh, Lokanath Bal and others and is associating with them in the shop of Ganesh Ghosh at Sadarghat. He also visits the houses of Ananta Singh and Lokanath Bal. I see 40 or 50 youths to assemble in Ganesh Ghosh's shop. I see there Ganesh, Ananta, Lokanath and his brother Harigopal, and the sons of Nanda Lal Guha, pleader Ranjan Lal Sen and of Rasik Chandra Nandi, Copyist, District Judge's Office. The other youths are not known to me. My boy has stolen 8 or 10 times money from my wife's box to the extent of Rs. 300 during the period. For the past one month he generally remains away from my house. I asked my boy what he did with the money but he never gave me any satisfactory reply. I believe that my boy made over the amount to Ananta, Ganesh and Lokanath."

জজ সাহেবের উপরোক্ত রায় থেকে মোটামুটি জানতে পারছি যে, ফকির সেনের পিতা মাধববাবু, পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন এবং এইটিকে প্রথম সংবাদের ভিত্তি করে ফকির সেনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০ ধারা অনুসারে তিনি মামলা রুজু করলেন।

মাধববাবু তাঁর বিবৃতিতে জানালেন যে, তিনি জজকোর্টে একজন কম্পেয়ারিং ক্লার্ক। তাঁর ছেলে ফকিরচাঁদ সেনের ষোল বছর বয়স। সে জানুয়ারী থেকে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়েছে। তারপর তিনি খুব রেগে জানালেন যে, তাঁর ছেলে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল প্রমুখ ব্যক্তিদের কুদলে (gang-এ) যোগ দেয় এবং তাদের বাড়িতেও যাওয়া-আসা করত। তিনি আরও বললেন যে, গণেশ ঘোষের দোকানে ৪০/৫০ জন যুবককে দেখেছেন। গণেশ ঘোষের দোকানে অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল ও তার ভাই হরিগোপাল বলকেও তিনি মেলামেশা করতে দেখতে পেয়েছেন। তিনি এও জানালেন যে, উকিল নন্দলাল গুহ, রঞ্জনলাল সেনের ছেলেদের এবং জজকোর্টের copyist রসিক নন্দীর পুত্রকেও সেখানে দেখতে পেয়েছেন। অন্যান্যদের তিনি চিনতে পারেন নি। তাঁর ছেলে তাঁর স্ত্রীর বাক্স থেকে

প্রায় ৩০০্ টাকা আট-দশ দফায় চুরি করেছে। এক মাস ধরে তাঁর ছেলে বাড়িতে থাকে না। তিনি অভিযোগে আরও জানান যে, টাকা নিয়ে কি করেছে, এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর তাঁর ছেলে দেয় নি। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন যে, তাঁর বিশ্বাস তাঁর ছেলে সেই টাকা লোকনাথ, গণেশ ও অনন্তকে দিয়েছে।

আমাদের মামলার রায়ে জজসাহেব উল্লেখ করেছেন—'গণেশ ঘোষের দোকান'। আরও অন্যান্য স্থানে 'গণেশ ঘোষের দোকানের' উল্লেখ আছে ও পরে আরও পাওয়া যাবে। সরকার পক্ষ 'গণেশ ঘোষের দোকানটিকে' আমাদের হেড কোয়ার্টার বলে বর্ণনা করেছে। কংগ্রেস অফিস—যেখানে মাস্টারদা থাকতেন, সেটিকে আমরা সেন্ট্রাল হেড কোয়ার্টার বলে মনে করতাম। আর গণেশের এই ঐতিহাসিক দোকানটিকে আমাদের Field Head Quarter (যুদ্ধক্ষেত্রের সন্নিকটে অস্থায়ী হেড কোয়ার্টার) হিসাবে দিনে রাত্রে ব্যবহার করেছি।

এই ঐতিহাসিক 'গণেশ ঘোষের দোকানের' সামান্য একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। গণেশের পিতা বিপিনবিহারী ঘোষ, সিনিয়র স্টেশন মাস্টারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। স্টেশন মাস্টার হিসাবে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর খ্যাতি ও সুনাম ছিল প্রচুর এবং সেই জন্য ডবলমুড়িং-এর মত গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশনের চার্জ তাঁর ওপরেই ন্যস্ত ছিল।

১৯২১ সালে, ভারতপ্রসিদ্ধ আসাম-বেঙ্গল রেল ধর্মঘটের সময়, গণেশের বাবা স্ট্রাইকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিন মাস ধরে প্রতিদিন তিনি ধর্মঘটীদের কাছে গিয়ে উৎসাহ দিয়েছেন—তাঁরা যেন অবসাদে ভেঙে না পড়েন। প্রতিদিন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের বাড়িতে স্ট্রাইক পরিচালনার বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিতে তিনি আলোচনা করেছেন। প্রায় দিনই তিনি ধর্মঘটীদের সভায় ও সাধারণ সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। ভারী, উচ্চকণ্ঠে তিনি অপূর্ব বক্তৃতা দিতেন। সবল সুস্থ দেহ তাঁর। চালচলন কথাবার্তায় অসামান্য ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত। সে যুগে চট্টগ্রামবাসীর কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। কংগ্রেস আন্দোলনে তাঁর স্বার্থত্যাগ কারও থেকে কম নয়।

গণেশের বাড়িতে আমার অবাধ গতি। গণেশের মা-বাবা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁদের আমি মাসিমা ও মেসোমশাই বলতাম এবং খুব শ্রদ্ধা করতাম। আমার মনে হ'ত আমি যেন তাঁদের পরিবারেরই একজন। বাবার সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায়, বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর, একবার মাসিমা ও মেসোমশাই আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন—আমার মা-বাবার কাছে। সেই সময় থেকে আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে খুব মধুর সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল।

মেসোমশাই (গণেশের বাবা) আমার সঙ্গে খুব রাজনৈতিক আলোচনা করতেন। রেল ধর্মঘট আর যখন মিটবার নয় মনে হচ্ছিল, তখন মেসোমশাই আমাকে বলতেন—"বুঝলে অনন্ত, যখন চাকরী একবার ছেড়েছি তখন গোলামীতে আর ফিরে যাব না।" তাঁর দৃঢ় মনোভাব ও বেপরোয়া কথা শুনে আমার খুব ভাল লাগত। সত্যি সত্যি একদিন দেখা গেল আসাম-বেঙ্গল রেল ধর্মঘট সফল হ'ল না। মেসোমশাই পরাজয় মেনে নিলেন না—মাথা নত করতে তিনি কোনমতেই প্রস্তুত নন—আরও বেপরোয়া, আরও অনমনীয়

মনোভাব নিলেন। তিনি আর গোলামী করতে ফিরে গেলেন না। ছোট করে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরতেন, গায়ে খদ্দরের চাদর, হাতে শক্ত মজবুত একটি লাঠি ও পায়ে সাধারণ একজোড়া শক্ত জুতো। এই ছিল তাঁর সব সময়ের পোষাক।

মেসোমশাই অদম্য উৎসাহে ১৯২১ সালে এই খদ্দরের দোকান প্রতিষ্ঠা করলেন। সামনের দিকে রাস্তার ওপরে দোকান আর ভেতরের দিকে চার-পাঁচটি ঘরে নিজেরা থাকতেন। পরে তাঁতের দেশী কাপড়ও রাখতেন। চাকরি ছেড়ে খুব যে আর্থিক অসুবিধা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তার জন্য কোনদিন তাঁকে বা মাসিমাকে আক্ষেপ করতে দেখি নি। কার্তিকদা (গণেশের দাদা) ও গণেশ মেসোমশাইয়ের অনুপস্থিতিতে দোকানে বসে কেনাবেচার তদারক করত। তারাও অসহযোগ আন্দোলনে কলেজ ছেড়েছে। তাই তাদের তখন দোকান দেখাশোনা করবার সময় ছিল।

পরে, ১৯২৮—৩০ সালে, এই দোকানটি এক ঐতিহাসিক দোকানে পরিণত হ'ল। সামনের দিকে দোকান—খদ্দের আসছে, কেনাবেচা হচ্ছে, আমাদের ছেলেরাও যাওয়া-আসা করছে এবং পুলিশও সব সময় পাহারা দিচ্ছে; আর ঘরের ভেতর আমরা নানাপ্রকার রিভলভার, পিস্তল ও বন্দুকের ব্যবহার শিখছি, নানা ষড়যন্ত্রমূলক কাজ চালাচ্ছি। সদর কোতোয়ালি এই দোকান থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়। শত্রু শিবিরের যত কাছে থাকা যায় এবং কাজকর্ম যতই পুলিশের নাকের ডগায় চালাকির সঙ্গে করা যায় ততই তাদের বোকা বানানো সম্ভব। "গণেশের দোকান" বলে জজ সাহেব যে দোকানটিকে আখ্যা দিয়েছেন সেটি ছিল সদর কোতোয়ালির খুব নিকটে এবং সেই কারণেই পুলিশ বিভ্রান্ত হ'ল—তারা ভাবতে পারল না যে তাদের এত কাছে বসে আমরা এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের হেড কোয়ার্টার, এই দোকানটি, অভিভাবকদের অনুযোগের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

এই দোকানের মালিক সেই সময় গণেশ একা। তার বাবা-মা কার্তিকদার কাছে চলে গিয়েছিলেন। কার্তিকদা বোধহয় তখন আসামের কোন স্থানে ডাক্তারের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রধান ঘাঁটি—এই দোকান সম্বন্ধে ও আমাদের মেলামেশা এবং আনাগোনার বিরুদ্ধে এল আঘাত। ফকির সেনের বাবা আর সহ্য করতে না পেরে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০ ধারা অনুযায়ী তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে দিলেন।

এইভাবে চারিদিক থেকে বিপদ ক্রমেই ঘনিয়ে আসতে লাগল। কোন্ দিক সামলাব? পুলিশকে না হয় ধমকান গেল, কিন্তু আ[illegible] গিয়ে কি বলি? যদি তাঁদের সব কথা খুলে বলা সম্ভব হ'ত, তবে হয়ত তাঁরা আমাদের ক্ষমা করতেন। কিন্তু বাহ্যিক উচ্ছৃঙ্খলতার অন্তরালে আমাদের যুববিদ্রোহের যে আয়োজন চল্‌ছে তার বিন্দুমাত্র আভাসও তাঁদের দেবার যখন উপায় ছিল না তখন আমাদের ঐরূপ অস্বাভাবিক চালচলন সম্বন্ধে বিরক্তি ও রাগ ছাড়া আর কি হতে পারে?

এই তো গেল একজন সরকারী কর্মচারী, যিনি তাঁর ছেলে সম্বন্ধে

অন্যদের জড়িয়ে অভিযোগ আনলেন। আমাদের পক্ষে তবু না হয় কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়ার ছিল যে উনি একজন সরকারী কর্মচারী—অনেক কিছুই বলতে পারেন! কিন্তু আমাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কিছুই আর রইল না যখন সদরঘাট ক্লাবের প্রেসিডেন্ট *সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় খুব বিরক্তির সংগে তাঁর পদত্যাগপত্র দাখিল করার ভয় দেখালেন। গণেশ এই শক্তিচর্চা ক্লাবের সম্পাদক ছিল। ১৯২৭ সালে এই ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় থেকেই *সুরেশবাবু ক্লাবটির সভাপতি। তিনি চট্টগ্রামে একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। বহু প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের সংগে তাঁর যোগাযোগ ছিল। যুবকদের শরীর ও শক্তিচর্চার দিকে তাঁর সক্রিয় সমর্থন আমরা সব সময় দেখেছি। তিনি যখন আমাদের প্রতি বিরূপ হলেন এবং তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁর পদত্যাগের কারণ দেখিয়ে গণেশকে চিঠি দিলেন, তখন সত্যিই আমাদের দুঃখ রাখার জায়গা ছিল না। সুরেশবাবুর মত লোকও যখন আমাদের প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণ করছেন তখন অন্যান্য অভিভাবকদের পক্ষে আমাদের সমর্থন করা খুবই শক্ত বই কি। এটা আমরা জানতাম, যদি একবার যুব-বিদ্রোহ প্ল্যান অনুযায়ী ঘটাতে সক্ষম হই, তবে তাঁদের সবার কাছ থেকে কেবল যে ক্ষমা ও সমর্থন পাব তা নয়, তখন ভুল বুঝে যে রূঢ় ব্যবহার তাঁরা আমাদের প্রতি করেছেন, সেইজন্য নিজেরাই অনুতপ্ত হবেন।

যুব-বিদ্রোহের আসন্ন ঝড়ের পূর্বে সুরেশবাবুর বিরূপ মনোভাব ও তাঁর সেই চিঠি আমাদের খুব অসুবিধায় ফেলে। তবু আমাদের মুখ বুজেই সব সহ্য করতে হয়েছে। আমরা কেবল দিন গুনেছি কবে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের প্রকৃত মূর্তি প্রকাশ করতে পারব! সুরেশবাবুর সেই চিঠি যুববিদ্রোহের পূর্বে অভিভাবকেরা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে কসুর করেন নি। আবার মামলার সময় আমাদের বিরুদ্ধে সেই চিঠি উপস্থিত করল সরকারী পক্ষের উকিল। শেষে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট ফলাও করে সেই চিঠির উল্লেখ করলেন তাঁর জাজ্‌মেন্টে ঃ—

"The letter (Ex. CCCXL) runs as follows :—

'It has been brought to my notice by the guardians of a number of members of the Institution that their wards do not attend schools and colleges, do not obey their guardians, do not even stay at home at night and sometimes do such things which are against principles of morality. Some of guardians directly accused me and institution for the present state of affairs with regard to their wards. Personally and as President of your institution I am not prepared to accept the above accusations. Although I have every sympathy for physical culture, I have no sympathy for indiscipline, disobedience to parents and guardians and leaving present schools and colleges before such time as it may be absolutely necessary for the

interest of the country, or until educational institutions have been established on national needs.

'I do therefore ask you to call a general meeting of the institution at an early date to explain my position and if need be to tender my resignation which of course I shall do with very heavy heart." (P. 10, Judgement in Armoury Raid Case No. I of 1930).

গণেশের কাছে চিঠিতে সুরেশবাবু লিখলেন যে, ক্লাবের বহু সভ্যের অভিভাবকেরা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই বলে—ছেলেরা স্কুল-কলেজে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, অভিভাবকদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করছে, তারা রাত্রিতেও বাড়ি থাকে না এবং সময় সময় এমন সব কাজ করে যা নৈতিক নীতিবিরুদ্ধ। কোন কোন অভিভাবক এইরূপ বিশৃঙ্খলার জন্য তাঁকে এবং ঐ প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করছে। সুরেশবাবু তাই জানালেন যে, ব্যক্তিগতভাবে ঐরূপ দোষারোপ তিনি নিজ স্কন্ধে বহন করতে প্রস্তুত নন। তিনি চিঠিতে আরও লিখলেন, যদিও যুবকদের শক্তি ও শরীরচর্চা সব সময় তিনি পছন্দ করেন, তাই বলে বিশৃঙ্খলা ও পিতামাতার অবাধ্যতার প্রতি তাঁর কোন সহানুভূতি নেই। আর এই অল্প বয়সে ছেলেদের স্কুল-কলেজ যাওয়া বন্ধ করা কোন প্রকারেই সমর্থনযোগ্য নয়—যতদিন না জাতীয় আদর্শে ও প্রয়োজন অনুযায়ী আর কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেশে গড়ে না উঠছে।

সুরেশবাবু গণেশ ঘোষকে অনুরোধ জানালেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব তিনি যেন ক্লাবের সাধারণ সভা আহ্বান করেন। সেখানে সুরেশবাবু পদ-ত্যাগের কারণ জানাবেন এবং প্রয়োজন হলে অতি বেদনার সঙ্গে তাঁকে পদত্যাগপত্র দাখিল করতে হবে।

সঙ্কট একেবারে চরমে পেঁছেছে। সমস্যার পর সমস্যা, বাধার পর বাধা, বিপদের পর বিপদ এসেছে। প্রস্তুতির চরম মুহূর্তে, যখন আমরা প্রবীণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নৈতিক সমর্থন লাভের চেষ্টা করব বলে ঠিক করেছি, তখনিই সদরঘাট ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট, প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও প্রগতিশীল প্রখ্যাত নাগরিক—সুরেশবাবুর পদত্যাগের হুমকি ও আমাদের বিরুদ্ধে তাঁর লিখিত তীব্র সমালোচনা, আমাদের এতদিনের সাধনা ও নিষ্ঠার দ্বারা অর্জিত ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত সুনামের ওপর কঠোর আঘাত হানল। আমাদের বিরুদ্ধে সুযোগ নিলেন অভিভাবকেরা। পুলিশ তাদের সমর্থনে সুরেশবাবুর চিঠি ব্যবহার করতে কসুর করল না।

যুব-বিদ্রোহের পূর্বাহ্নে—আসন্ন ঝড়ের প্রাক্কালে, এই সব ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের বহুমুখী আঘাত ও আক্রমণ জোট বেঁধে আমাদের বিরুদ্ধে যে প্রবল প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করল, তার নিষ্পেষণে সাংগঠনিক অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ল। বুঝতে পারছি এক-একটি দিন গত হচ্ছে আর আমরা অধিকতর বিপদের সম্মুখীন হচ্ছি। সময়ের জন্য তীব্র প্রতি-যোগিতা। সরকারী পুলিশদপ্তর প্রস্তুত হয়ে আমাদের সামরিক প্ল্যান সম্বন্ধে আন্দাজ পাবার আগেই আমরা আঘাত হানতে পারব কি?

এইরূপ সন্ধিক্ষণে দ্বিধা, বিলম্ব, দীর্ঘসূত্রতা, অকারণ আশঙ্কায়

চিন্তা, ইত্যাদি যদি মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তবে সুনিশ্চিত জয়ের পরিকল্পনাও যে শোচনীয়ভাবে অকাল-মৃত্যুর অভিশপ্ত ক্রোড়ে চির-নিদ্রা লাভ করবে, তাতে সন্দেহ নেই। অবস্থার গুরুত্ব, সংক্ষিপ্ত সময়ের চেতনা, যে কোন মুহূর্তে শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা—এই সব যে কি পরিমাণে স্নায়বিক শক্তির ওপর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা' বলে বোঝান যায় না। নিজের অজ্ঞান্তে ঐ সব দুর্বলতা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে—আর একটু দেরি করি, আরও একটু প্রস্তুতির কাজ চালাই, আরও কিছুদিন বাদে চরম মুহূর্তটি আসুক—আরও কিছুদিন বিপদের মধ্যেও বেঁচে থাকি!

আমাদের চারিদিকেই এখন বহু বিপদ—যে কোন সময়ে ধরা পড়তে পারি—যে কোন সময়ে এই ব্যাপক আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। তবু তখনও কেন আমরা অভ্যুত্থানের জন্য একটি দিন ধার্য করছিলাম না? সত্যিই খুঁটিনাটি প্রস্তুতির কাজ কিছু না কিছু বাকি ছিল। কিন্তু যদি দিন ধার্য করা হ'ত এবং স্থির হ'ত যে সেই বিশেষ দিনটিতেই আমাদের আক্রমণ করতে হবে, তবে ঐসব ছোট ছোট কাজ—তেলের টিন, ঝকমকে ব্যাজ, তরবারিগুলি ধার দেওয়া, রেল-লাইন উপড়ে ফেলবার জন্য 'ক্রো-বার' (crow-bar) তৈরি করা, প্রভৃতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই যে সমাপ্ত হ'ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। আসল কথা, যদিও আক্রমণের দিনটি ধার্য করা একান্ত প্রয়োজন ছিল, তবু কোন্ এক অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিতে নিজ জীবনের অন্তিম দিনটি স্থির করতে কোথায় যেন বাধা পাচ্ছিলাম।

যারা তরুণ, যাদের সংসারের প্রতি আকর্ষণ ও লোভ অপেক্ষাকৃত অনেক কম—তাদের পক্ষে আদর্শের জন্য প্রাণ দেওয়া যত সহজ আমাদের মত যারা একটু বড় যাদের অতীত বৈপ্লবিক কাজে কিছু খ্যাতি হয়েছে, যারা প্রাক্তন রাজবন্দী বা রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা অর্জন করেছে তাদের পক্ষে মরণের নেশা ক্ষ্যাপা তরুণ দলের চাইতে অনেক কম। এই সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক তারতম্য নিজ বিশ্লেষণী মন দিয়েই বুঝতে হয়। আমি নিজের মন দিয়ে পর্যালোচনা করে নিজেকে বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম। আরও বুঝেছিলাম আমার মন দিয়ে অন্যের মনোভাব। আমাদের প্রস্তুতির সব কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে জেনেও, অভ্যুত্থানের দিনটি ধার্য করার কর্মসূচী নিয়ে কয়েকবার আলোচনা করেও শেষ পর্যন্ত বিষয়টি এড়িয়ে গেছি—সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছি।

১৯২৩ সালে, রেলওয়ে ডাকাতির আগে, ঠিক এমনি ধরনের নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিয়েছিল—সব আয়োজন থাকা সত্ত্বেও দিনটি স্থির করতে কোথায় যেন বাধা ছিল। এখন ১৯30 সালে, আমাদের সেইরূপ নিষ্ক্রিয়তার অবশ্য কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবু যেন কোথায় কি একটা পিছুটান আছে, যার জন্য মৃত্যুর চরম দিনটি স্থির করতে গিয়েও বার বার ফিরে আসছি!

এই সময় একদিন দুপুর বেলা আমি মাস্টারদার কাছে একা গেলাম। দুপুর বেলাটাই মাস্টারদাকে একান্তে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অন্য সব সময়েই মাস্টারদার কাছে কেউ না কেউ থাকত। দুপুর বেলা ঐরূপ বিশেষ সময়টিতে আমি সাধারণতঃ মাস্টারদার কাছে যেতাম না। আমাকে দুপুর বেলা দেখতে পেয়ে তিনি অনুমান করলেন আমি কোন বিশেষ পরামর্শ করতে

গেছি। তিনি প্রশ্ন করলেন—"কি হে, ব্যাপার কি, কোন বিশেষ খবর আছে?" আমি বললাম—"খবর কিছু নেই, তবে কিছু আলোচনা করতে চাই।"

আমার ভাব দেখে মাস্টারদা বুঝেছিলেন যে আমি কোন গুরুতর বিষয়ের সমাধান চাই। তিনি শুয়েছিলেন, উঠে বসলেন। কথাটা আমি পাড়লাম। এইভাবে কথাগুলি বলতে সুরু করি—

"সবার আগে আলোচনা আমার নিজকে নিয়ে—আমার মনের গভীরতম প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে।" আমার কাছে মাস্টারদা এই ধরনের ভূমিকা আগেও অনেক বার শুনেছেন। তাই এই ভূমিকার বিশেষত্ব তাঁকে আকৃষ্ট করে নি। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন আমার মূল বিষয়টি শোনবার জন্য। আমি বলে গেলাম—"মাস্টারদা, যতই সাহস থাকুক না কেন, যতই না কেন মৃত্যু সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাই, তবু যেন আরও কিছু দিন বিপদ ও দুঃসাহসিকতার (adventure) মধ্যেও বাঁচতে ইচ্ছে করে! মনের অতলে 'বাঁচবার লোভ'—'ক্ষণিক বেঁচে থাকার লোভ'ও নিজেদের অগোচরে প্রভাব বিস্তার করে নি তা' আমার বিশ্বাস হয় না। প্রতিবারই বিপদসঙ্কুল কাজের আগে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, জড়তা আমাদের মনে এসেছে। একেবারে প্রথমে, পরোইকোরা রাজনৈতিক ডাকাতির আগে, তারপর কোম্পানীর টাকা হস্তগত করার ব্যাপারে সশস্ত্র প্রস্তুতির পথে আমাদের মধ্যে দেখেছি হতাশা, নিষ্ক্রিয়তা, দ্বিধা ও সংশয়। এই সমস্ত অতীত অভিজ্ঞতা ও বর্তমানে আমার মনের অতি সূক্ষ্মতম প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে মনে হচ্ছে, 'মরণের শেষ দিনটি' চূড়ান্তভাবে স্থির করতে যেন আমরা ইতস্ততঃ করছি।"

মাস্টারদা খুব মনোযোগের সঙ্গে আমার কথাগুলো শুনছিলেন। দেখছিলাম মাঝে মাঝে তিনি সম্মতিসূচকভাবে মাথা নেড়ে যাচ্ছেন আর কখনও বা চক্ষু বিস্ফারিত করে আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন—যেন আমার অন্তরের কথা বুঝতে চেষ্টা করছেন। তখনও তিনি কোন কথা বলেন নি। আমার কথাও শেষ হয় নি। আমি আবার বলতে লাগলাম—

"মাস্টারদা, বিপদ খুব ঘনিয়ে এসেছে, এত আয়োজন সব ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি শত্রুকে সুবিধে দিয়ে আমরা আগে আক্রমণ না চালাই। আমার মনে হয়, বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা বিলম্ব আমাদের পক্ষে অপরাধ। নিশ্চিত মৃত্যুর দিনটি ধার্য করা ও বৃটিশ শত্রুকে আক্রমণ করা সম্বন্ধে আমাদের বিলম্বের আর অবকাশ নেই। (একটু থেমে কি একটা ভেবে নিয়ে আবার বলতে লাগলাম) এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে সেই দিনটির আর দেরি নেই। ভবিষ্যতের আশা, আনন্দ, প্রিয়জনের স্নেহ, মমতা সব এই মুহূর্তে ত্যাগ করতে হবে। জীবনের শেষ দিনটির সঙ্গে এই সবই শেষ হয়ে যাবে। মাস্টারদা, বেঁচে থাকার লোভ খুব বেশি। সব শেষ হয়ে যাবে?—আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, কিছুই আর জানতে পারব না? মনটা যেন কি রকম করে উঠছে, আমি আপনাকে আমার মনের কথা বলতে পারলাম কিনা জানি না। তবে এই সম্বন্ধে আপনার আত্মবিশ্লেষণ শুনতে খুব ইচ্ছে করছে।"

মাস্টারদা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমিও কোন কথা বলি নি।

ঘরে মাত্র আমরা দু'জন। এবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন মাস্টারদা। বেশি কথা তিনি বললেন না। কেবল এই বলে সমর্থন জানালেন—

"খুব ভাল হ'ল তোর কথা শুনে। আমার অবচেতন মনের খোঁজ নিলাম। তোর সঙ্গে আমিও একমত। বর্তমানে বিলম্বের একমাত্র কারণ—অবচেতন মনে বাঁচবার বাসনা!"

আমি উৎসাহ পেয়ে মাস্টারদাকে বললাম,—"চলুন শপথ গ্রহণ করি, পরের সভায় আমরা যুব-বিদ্রোহের দিনটি স্থির করবই। তারপর আর একদিনও অপেক্ষা করা চলবে না।"

আবার সব নিস্তব্ধ। দু'জনেই নীরব। তারপর আমরা শপথ নিলাম, দু'দিনের মধ্যে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির (হেড কোয়ার্টারের) সভায় অভ্যুত্থানের zero hour (সামরিক আক্রমণের নির্দিষ্ট সময়) ধার্য করা হবে।

এই শপথ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের সামনে বাস্তবতার রূপ নিয়ে ভেসে উঠল একটি ছবি—রক্তপাত, মৃত্যু, তারপর সব শেষ! সমস্ত শরীরে শিহরণ জাগল। আসন্ন মৃত্যুর ছবি আতঙ্ক সৃষ্টি করে নি কখনও। মরণ পাগল হয়েও মরণটাকে আর একটু ধীরে আসতে দিলে মন্দ কি? বাঁচার সেই শেষ ক'টি দিনের আশ্বাস থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে যখন শপথ নিলাম, তখনই মনের গভীর পর্দায় দেখলাম আসন্ন যুদ্ধের বাস্তব ছবি—রক্তপাত, মৃত্যু—সব শেষ!

মাস্টারদাকে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলাম—"এখন কেমন মনে হচ্ছে?"

মাস্টারদা বললেন—"সব কিছু শেষ হয়ে যাবে! এত তাড়াতাড়ি! ঠিক বোঝাতে পারছি না কি রকম মনে হচ্ছে!—তারপর......তারপর...... আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে কি হবে আর কিছু জানতে পারব না......। জীবন কত মধুর! কিন্তু দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া আরও মধুর!"

মাস্টারদার সঙ্গে সামগ্রিক আক্রমণের দিন ধার্য করার ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা হওয়ার পরদিনই বোধহয় হেডকোয়ার্টারে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সভা বসল। উপস্থিত ছিলাম—মাস্টারদা, গণেশ, নির্মলদা, আমি ও অম্বিকাদা। আমাদের সামনে Mobilisation Chart (সৈন্য ও শক্তি সমাবেশের নক্সা) খোলা আছে। দেওয়াল-মানচিত্রের মত বড় কাগজের ওপর এই "নক্সা" বিভিন্ন আলোচনার পর চূড়ান্তভাবে গণেশ প্রস্তুত করে। শেষের দিকে "চূড়ান্ত প্ল্যানের" রিহার্সেলের নক্সা আমাদের হেডকোয়ার্টারের টেবিলের ওপর সামনে রেখে দিয়েছি। যে কোন আক্রমণের পূর্বে সমর বিজ্ঞান অনুসারে সামরিক বাহিনীর পরিচালকবর্গ এইরূপ রিহার্সেল নক্সা সামনে রেখে আক্রমণের প্ল্যান ঠিক করেন। এই অত্যাবশ্যক কাজটি আমরা তখন Military Mannual (সামরিক গ্রন্থ) পড়ে শিখি নি। 'Necessity is the mother of invention'—এইরূপ রিহার্সেল প্রয়োজনের তাগিদেই আমাদের দিতে হয়েছিল।

এই Mobilisation Chart-টিতে—(১) মোটর গাড়ির সমন্বয়, (২) বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সংরক্ষণ ও বিলি-ব্যবস্থা, (৩) অস্ত্রশস্ত্র ও হাত-বোমার উপযুক্ত প্রয়োগের জন্য বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যবস্তুর উল্লেখ, (৪) প্রথম শ্রেণীর উপযুক্ত গণতন্ত্রবাহিনীর সভ্যদের প্রথম আক্রমণের জন্য বাছাই ও প্রয়োজনীয়

সংখ্যায় তাদের নিয়োগ, (৫) আক্রমণের পূর্বে বিভিন্ন ছোট ছোট দলের নির্ধারিত পথ ও গোপন অবস্থানের নির্দেশ, (৬) গণতন্ত্রবাহিনীর সৈন্যরা কাঁধে ঝোলানো থলিতে করে কি কি জিনিষ সঙ্গে নেবে, (৭) ব্রীচ্‌লোডার বন্দুক কে কখন তাদের বাড়ি থেকে আনবে, (৮) কোন্ ব্রীচ্‌লোডার বন্দুক কোন্ সভ্য নেবে—ইত্যাদি, ইত্যাদি আমাদের বোঝবার মত সংক্ষেপে শিরোনামা দিয়ে পরিষ্কার আদেশ ও উপদেশ দেওয়া ছিল।

এই Mobilisation Chart আমরা ১৭ই তারিখ রাত্রে পুড়িয়ে ফেলি। এই chart-টিকে একটু একটু করে আমরা প্রায় এক মাস ধরে আলোচনা করে চূড়ান্ত রূপ দিতে সমর্থ হয়েছিলাম। অবশ্য চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা ছোটখাটো কাগজে অনেক সময় বিভিন্ন নোট প্রস্তুত করেছি। বলাই বাহুল্য, এইসব কাগজ আমরা সব সময় নষ্ট করে ফেলেছি। কিন্তু শত চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কোথা থেকে যেন কি ভুল হয়ে যায়!

গণেশের সাবধানতা ও সতর্কতার কোন তুলনা ছিল না। আগে আমরা দেখেছি গণেশ কিরূপ সতর্কতার সঙ্গে "প্রচারপত্রগুলি" নিজ তত্ত্বাবধানে গোপন ছাপাখানায় মুদ্রিত করেছে এবং বিন্দুমাত্র চিহ্ন না রেখে, সেগুলি গোপন জায়গায় ছাপা হওয়ার পর নিরাপদে রাখার ব্যবস্থাও করেছে। এত সাবধানী গণেশ, ষড়যন্ত্রমূলক প্রতিটি কাজে ও বিষয়ে প্রতি পদে পদে সতর্কতা অবলম্বন করাই যার অভ্যাস, তারও কিন্তু অজান্তে সামান্য ত্রুটি হয়ে গেল। কতকগুলো টুক্‌রো কাগজে Mobilisation Chart-এর কিছু খসড়া করা হয়েছিল কোন সময়ে। সেই কাগজগুলি কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে সে বা আর কেউ হয়ত তার বিছানার তোষকের নিচে রেখেছে; কথা বলার সময় সেইগুলি ব্যবহার করার হয়ত কোন প্রয়োজনই হয় নি। ফলে, পরে সেই টুক্‌রো কাগজগুলিকে বিনষ্ট করার কথা কারো মনে হয় নি।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার অনেক পরে গণেশের বাড়ি তল্লাসীর সময় সেই টুক্‌রো কাগজগুলি পুলিশ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। সেগুলি থেকে যেসব বিষয় পুলিশ জানতে পেরেছে তা' থেকে তারা ঐ কাগজ-গুলিকে Mobilisation List বলে মামলায় প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে।

ত্রুটি ত্রুটিই। গণেশ তার ত্রুটি কখনও ঢাকতে চেষ্টা করে নি। যে ইতিহাস আজ আমি লিখছি, সেটি লেখার জন্য গণেশই সবার চাইতে উপযুক্ত বলে আমার মনে হয়। আমি খুব নিশ্চিতভাবে জানি যে, যদি গণেশ নিজে এই ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লিখে যেত তবে সে এইরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয় সবার আগে সামনে তুলে ধরত। আজ আমাদের জানবার প্রয়োজন—কত সাবধানতা, কত সতর্কতা অবলম্বন করেছি আমরা, কত সচেতন ছিলাম সব সময়—তবু কোথায় একটু ত্রুটি রয়ে গেল! কেবল এইটি বুঝতে পারলেই চলবে না—হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন যে, গণেশের মত বিচক্ষণ ও সাবধানী ব্যক্তিরও অসতর্ক মুহূর্তে ভুল হয়! গণেশের এই বিচ্যুতির নজির খাড়া করে আত্মপক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা বৈপ্লবিক চরিত্রের পরিপন্থী। এইরূপ ত্রুটির নজির থেকে এই শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত যে, ষড়যন্ত্রমূলক কাজে সতর্কতার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। এটা অবধারিত সত্য, যে পরিমাণে যা যত বেশি সতর্কতা অবলম্বন করব তত কম ভুল বা ত্রুটির পুনরাবৃত্তি হবে।

আমি নিজে এই ত্রুটি হতে শিক্ষা গ্রহণ করেছি এবং পরবর্তীকালে বৃটিশ কারাগারে বছরের পর বছর ষড়যন্ত্রমূলক কাজ সফলতার সঙ্গে চালিয়ে গেছি। যথাস্থানে সম্ভব হলে বিস্তারিতভাবে তা' ব্যক্ত করব।

ষড়যন্ত্রমূলক কাজে ত্রুটির গুরুত্ব, ত্রুটি 'সামান্য' বা 'প্রকাণ্ড' তার ওপর নির্ভর করে না। খুব সামান্য ত্রুটিও বৃহৎ ক্ষতিসাধন করতে পারে আবার খুব প্রকাণ্ড ভুলেও বিন্দুমাত্র অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। আমাদের সামান্য ভুলের জন্য ঐ ক'টি টুকরো কাগজ থেকে যা' খসড়া পুলিশ উদ্ধার করেছে, তাই দিয়ে মামলার সময় তাদের কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা খুব হৈচৈ করতে চেষ্টা করল। আমাদের পক্ষের উকিল-ব্যারিস্টাররা ভাবলেন, আবার কেউ কেউ আমাদের বললেন,—"ঐটি আপনাদের বড় ভুল হয়ে গেছে।"

তাঁদের ঐরূপ মন্তব্য করার পক্ষে যে চিন্তাধারা কাজ করেছে তা' কোর্ট-কাছারী, সাক্ষী-সাবুদ, মামলা-মোকদ্দমার গণ্ডীতে নিবদ্ধ ছিল এবং সেই জন্যই বাস্তবতার দিকে তাঁদের লক্ষ্য স্থির থাকা সম্ভব হয় নি। বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তাঁদের একটু পরিচয় করাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা উপলব্ধি করলেন, তাঁদের সেইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল—তথাকথিত বা সত্যিকার Mobilisation List-ও যদি সরকার পক্ষ মামলায় উপস্থিত করে থাকে তবু তাতে আমাদের আর বেশি ক্ষতিসাধন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কথাটা তাঁদের পরিষ্কার করেই বললাম—

"দেখুন, আমরা সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছি যেন সামগ্রিক আক্রমণ করার আগে আমাদের পরিকল্পনা পুলিশের কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়। নানা বিপদের সম্মুখীন হয়েও আমরা পুলিশকে বিভ্রান্ত ও পরাস্ত করে তাদের অগোচরে সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে সামগ্রিক আক্রমণ চালাতে সমর্থ হই। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর পুলিশ যেন কোন হদিস না পায় তার জন্য ব্যবস্থা করেছিলাম পয়োইকোরা বা রেল কোম্পানীর টাকা ডাকাতি করে নেওয়ার পর। কিন্তু যুব-বিদ্রোহের পর আমাদের প্রকাশ্য অংশের কার্যকলাপের গোপনীয়তার কোন প্রয়োজন ছিল বলে আমরা মনে করি নি। সামগ্রিক আক্রমণের পর অস্থায়ী স্বাধীন গণতন্ত্রী সরকার একবার স্থাপন করা গেলে, পুলিশ আমাদের আর চিনতে পারবে না—এইরূপ মিথ্যা ধারণা থাকার কোন বাস্তব কারণ তখনও ছিল না। আমাদের প্রোগ্রামই ছিল—'মৃত্যুবরণ'। তাই পরে কে কি করবে, বা কারা [illegible] দেবে, পুলিশ কি কি তথ্য সংগ্রহ করে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা সাজাবে, তার জন্য অনর্থক ব্যস্ততার কারণ অনুভব করি নি।

"বিভিন্ন শরীরচর্চার ক্লাবের ছেলেরা সবাই এক রাত্রে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল; বাড়ির গাড়ি আক্রমণের কাজে ব্যবহার করলাম। বিভিন্ন বাড়ির বন্দুক নিয়ে ছেলেরা 'অভ্যুত্থানে' অংশ গ্রহণ করতে চলে এসেছে। তিন-চারটি বন্দুককে শেষ মুহূর্তে যখন দেখা গেল যে কার্তুজ ঠাসা যাচ্ছে না—চেম্বার ছোট, তখন সেগুলি গণেশের বাড়িতে ফেলে যাওয়া হ'ল। একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে হাত-পা বেঁধে গণেশের বাড়িতেই আমরা রেখে যাই। জালালাবাদ যুদ্ধে এই সব ক্লাবের ছেলেরা, যারা আমাদের সর্ব কাজের ও সর্ব সময়ের সঙ্গী, তারা অনেকে প্রাণ দিয়েছে। তাদের মৃতদেহ নিয়েই বৃটিশ সরকারী মহল আনন্দ পেয়েছে—এই ভেবে যে, আমাদের বিরুদ্ধে তারা অকাট্য প্রমাণ সহ মামলা রুজু

করবেই! এইসব নির্বোধ পুলিশমহল ঐসব টুক্‌রো কাগজ নিয়ে আজ হয়ত আত্মপ্রসাদ লাভ করছে। বাস্তব ক্ষেত্রে যখন অত সব প্রত্যক্ষ প্রমাণকে তুচ্ছ মনে করে আমাদের Death Programme-কেই আমরা প্রাধান্য দিয়েছি, তখন ঐ সব টুক্‌রো কাগজের নজির উপস্থিত করে পুলিশ তাদের মনকে সান্ত্বনা দিলেও আমাদের তা'তে ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়নি। সমুদ্রে যাদের বাস, শিশিরবিন্দু তুল্য Mobilisation List-টিকে তাদের ভয় করার কিছু আছে কি?"

আমাদের উত্তর শুনে সম্মানিত আইনবিশারদেরা উপলব্ধি করেছিলেন— সশস্ত্র বিদ্রোহ আর বৃটিশ সরকারের আইন-আদালতের প্রহসন এক বস্তু নয়। পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য আইন-কানুন বাঁচিয়ে ব্যাপক সশস্ত্র আক্রমণের প্রস্তুতি আমরা করি নি—বরং আইন-কানুনের মতবাদ সম্পূর্ণ বর্জন করে, বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য পুলিশী চক্রান্তকে ব্যর্থ করে বিচক্ষণতা, সাহসিকতা ও গোপনীয়তার সংগে প্রস্তুতির কাজ সমাপ্ত করেছি।

এই বাস্তব চিত্রটি থেকে বুঝতে পারা যাবে যে, ঐসব টুক্‌রো কাগজে লেখা খসড়া, সশস্ত্র আক্রমণ পর্ব ঘটে যাওয়ার পর সরকারীমহলের মিথ্যা সান্ত্বনা ছাড়া আমাদের বিরুদ্ধে সেগুলি প্রকৃতপক্ষে কোন কাজে আসে নি। আজ, এই সুদীর্ঘ ছত্রিশ বছর পরে, আমার এই ইতিহাস লেখার সময় এটি কাজে লাগল। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে মনে হবে আমাদের ঐ সামান্য অসতর্কতার ত্রুটি মোটে ত্রুটিই নয়। কিন্তু পরবর্তী জীবনে বৃটিশের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার কাজে এই সামান্য ত্রুটিও গণেশ ও আমার কাছে এক অসামান্য শিক্ষণীয় বস্তু ছিল। আমরা এই 'সামান্য ত্রুটিকে' ত্রুটি জেনে ভবিষ্যতে এর প্রতিকারের জন্য সজাগ ও সচেষ্ট ছিলাম বলে, জেলে নানা ষড়যন্ত্রমূলক কাজ সফলতার সংগে করতে পেরেছি।

আমাদের আসল Mobilisation Chart-এ কি কি বিষয়বস্তু সন্নিবদ্ধ ছিল পূর্বে তার একটু আভাস মাত্র দিয়েছি। শুধুমাত্র এই আভাসটুকুই আমরা পাব সরকারী তথ্য থেকে। কারণ, আমাদের প্রকৃত Mobilisation Chart-এর অস্তিত্ব আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছি। সরকারীপক্ষ Mobilisation Chart-এর পরিবর্তে Mobilisation 'List' বলে উল্লেখ করেছে; কারণ, ঐসব টুক্‌রো কাগজে কতগুলি তালিকার ওপর 'Mobilisation List' শিরোনামা লেখা ছিল। একশ' থেকে একশ' ছাব্বিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কেবল Mobilisation List সম্বন্ধে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট তাঁর জাজ্‌মেন্টে উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করেছেন। নিম্নে সেখান থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

"We turn now to the socalled mobilisation list (Ex. LIX). This consists of a number of loose sheets of paper of various sizes which have already been stated were found lying folded to-gether on a taktaposh under a quilt at the house of Ganesh Ghosh. ......According to the prosecution they contain notes and memoranda of draft arrangements and dispositions as regards personnel, transport,

equipment, etc, to be employed by the conspirators in the execution of their criminal design." (Ibd. p. 118).

জজসাহেব বল্‌ছেন যে—আমাদের 'তথা কথিত' Mobilisation List গণেশের বাড়িতে কোন এক তক্তপোষের উপরে, তোষকের তলায়, বিভিন্ন মাপের ছোট টুক্‌রো কাগজে ভাঁজ করা অবস্থায় পড়ে ছিল। জজসাহেবের মন্তব্যে প্রকাশ পাচ্ছে যে, বাদীপক্ষের অভিমতে ঐ টুক্‌রো কাগজগুলিতে আমাদের অপরাধজনিত ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে দলের সভ্য, যানবাহন, সরঞ্জাম প্রভৃতির টীকা ও স্মারকলিপির খসড়া দেখতে পাওয়া যায়।

প্রেসিডেন্ট (জজসাহেব) 'M IV' চিহ্নিত Exhibit থেকে copy করে এইভাবে সাজিয়ে তাঁর জাজ্‌মেন্ট লিখলেন—

"The contents of these papers may be summarised as follows :—

"On the slip (M IV) is written in pencil :—'equipments'

"T. O. Hammer (small)	..	..	4
" (big)	..	..	2
Axe	..	..	1
Petrol	..	..	1 tin
"V. B. Hammer big	..	..	2
Chheni	..	..	4
Gaiti	..	..	2
Axe	..	..	1
Rope	..	..	1
Saw	..	..	2
Blade	..	..	12
Chheni clip	..	..	4
Steel Rod	..	..	2
Petrol	..	..	3 tins"
"C. H. Axe.	..	..	1
P. B. Hammer	..	..	2
Chheni	..	..	4
Axe	..	..	
Saw	..	..	
Blade	..	..	
Chheni clip	..	..	
Steel rod	..	..	
Petrol	..	..	3 tins"

(Ibd. P. 119).

Mobilisation-এর খসড়া যেটুকু ঐ টুকরো কাগজে পেয়েছে সেটিকে আদালত—'M IV' বলে চিহ্নিত করেছে। সেইরূপভাবে আদালত ঐ সবগুলি টুকরো কাগজের ওপর exhibit নম্বর দিয়েছে।

আর একটি টুকরো কাগজের বিষয় জজসাহেব অনুরূপভাবে সাজিয়ে লিখলেন ঃ—

"Again in sheet M VII which is headed 'Mobilisation' we find—

First Mobilisation	Final Mobilisation
T. O. office (scored through in pencil).	At the junction of the T. O. Road in the Katapahar.
V. B. Headquarters (Scored through and Lokanath's house written over it in pencil).	Nizam Paltan corner.
First Mobilisation	Final Mobilisation
"C. H. Office	X
"P. B. Debu's	(Part of the sheet torn away".) (Ibd. P-120).

জজসাহেব ব্যাখ্যা করে অভিমত প্রকাশ করলেন—

"This indicates therefore that first mobilisation in respect of V.B. is to be at Lokanath's house and final mobilisation at Nizam Paltan corner—that is at the point where the Tiger Pass road leads off towards the police lines from the Pahartali road at the corner of the polo ground. This point is quite near the A. F. I. armoury." (Ibd. P. 120).

'প্রথম মবিলিজেশন' ও 'ফাইনাল মবিলিজেশনের অর্থ বা তাৎপর্য জজসাহেব বিশ্লেষণ করে বোঝাতে চাইলেন যে, Volunteer Barracks আক্রমণের জন্য প্রথমে আমাদের মিলিত হওয়ার কেন্দ্রস্থল ছিল লোকনাথের বাড়ি ও সর্বশেষে একত্রিত হওয়ার ব্যবস্থা ছিল সেইরূপ একটি স্থানে যেখানে পুলিশ লাইনের দিকে 'টাইগার পাস' রাস্তাটি বিস্তৃত হয়ে পাহাড়তলীর রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। তারপর তিনি মন্তব্য করলেন—এই স্থানটি অর্থাৎ পোলো খেলার মাঠ, A. F. I. আর্মারীর খুব সন্নিকটে।

নয় নম্বর 'M' চিহ্নিত ছেঁড়া কাগজে কেবল লোকনাথের নাম এইভাবে লেখা ছিল—শিরোনামা ঃ 'Mobilisation' ও নিচে 'V. B.—Lokanath.'

জজসাহেব তারপর নম্বর-বিহীন 'M' চিহ্নিত স্লিপ কাগজটির উল্লেখ করেছেন—

"Then again in the small slip 'M', at the top of which is written 'Lokanath's house' we find written :—

"2 gaitis (i. e. pick axes).

2 handles

3 chhenis

2 cast steel rods.

2 saws and 12 blades

"And in the small slip M I at the head of which is written 'Already sent' we find written :—

"2 gaitis.

3 chhenis.

2 rods.

2 saws.

12 blades."

জজসাহেব এইভাবে দু'টি তালিকা ভাগ করে দেখিয়ে বলছেন যে, দু'টি তালিকাই এক; তবে 'Already sent'-এর অর্থ অনুযায়ী 'M I'-এর তালিকার জিনিষপত্র আগেই লোকনাথের বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল।

টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস করার ব্যাপারে আমরা কিরূপ ব্যবস্থা করেছিলাম তা' দেখবার জন্য জজসাহেব "Mobilisation List"-এর 'M-VII ও 'M-IX' চিহ্নিত স্লিপ দু'টি পর্যালোচনা করেছেন—

"And in MVII we have—

Final Mobilisation.	First Mobilisation.
"T. O. Office (scored out).	At the junction of the T. O.
and in M—IX	Road in the Katapahar.
"T. O. chaukbazar	

"Again in M VII we find—

"T. O.—Manindra to escort Binkoo and Biren to the junction of the T. O. Road within the Katapahar'."

(Ibd. P. 121)

জজসাহেব তারপর বিশদ পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, 'M-IV' চিহ্ন কাগজে যেসব জিনিষের উল্লেখ আছে সেই সব জিনিষই পুলিশ লাইনে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

ছাপান মামলার রায়ে পুস্তকটিতে C. H. (অর্থাৎ Club House) সম্বন্ধে চার, সাত ও নয় নম্বরের 'M' চিহ্ন কাগজ তিনটি এইভাবে পরিবেশন করা হয়েছে—

"Again in M IV we have—C. H.......Axe 1.

"and in 'M' VII

First Mobilisation	Final Mobilisation
"C. H. office	X
and in M IX	Near Tea garden."
C. H. office	Ibd. Page 121)

জাজ্‌মেন্ট কপির ১২২ পৃষ্ঠায় M—IX চিহ্ন টুক্‌রো কাগজ উল্লেখ করে জজসাহেব লিখলেন—

"In M IX there is a pencil note 'to buy four more bhojalis' (dagger)......"

তারপর আমাদের মোটর গাড়ি ও প্রচারপত্র বিলি সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা ছিল, তাও জজসাহেব 'M VII' চিহ্ন তালিকা থেকে উদ্ধৃত করলেন—

"Then in M VII under the heading 'Car Arrangement' is written :—

T. O. (1) Buick (1) V. B. (1) Essex (1) easily obtainable.
C. H. (1) P. B. (1) Chevrolet (1)

"P. distribution

Ardhendu Guha,	Sadarghat Quarter.		
Sukhendu Dastidar	Dewan Bazar, Chandanpura		
Dinesh Chakravarti	Chaukbazar.		
Saileshwar Chakravarti—to go elsewhere and post it to the different people of the country—		.. 400	each
	Village	.. 200	each
	Town	.. 400	each

"T. O.—Essex (Heramba)

V. B.—Buick (or Essex)—to hire at 8 P.M. and to go towards..

C. H.—to engage two coolies and take the articles to some fixed place where the next five men to go and equip themselves.

P. B.—Essex—to hire and take near Chatteswari-bari where to be bound.

"Equipments to carry by coolies before hand to place of final mobilisation.

V. B.—Car to take under hire to Lokanath Babu's house and bind him there.

"And on the back of the same sheet (M VIII) under the heading 'Mobilisation' is written :—

"a group—Crossing of W. W. Road and Chatteswaribari.

b group—Crossing of P. B. Road and Club House Road.

c group—Maiden infront of W. W.

d group—on the road after passing the P. B.
e group—near the tea-garden.
"Bags to take :—
(1) Water carrier (2) Torch (3) Oil phial (4) Bandages (5) Cleaning rods. (6) Chhenis (7) Bhojali (8) Bombs (9) Cartriges. (Ibd. P—122)

আট নম্বর টুকরো কাগজ থেকে আবিষ্কার করে জজসাহেব বলতে চাইলেন যে, আমরা T. O. (Telegraph office), V. B. (Volunteer Barrack), C. H. (Club House) ও P. B. (Police Barrack বা line) আক্রমণ করবার জন্য 'বুইক', 'এসাক্স' 'সেভ্রোলেট্', প্রভৃতি মোটর গাড়ি ব্যবহার করা মনস্থ করি এবং Club House-এ কোন্ গাড়ি যাবে সেইটি আমরা খসড়ায় উহ্য রেখেছি। (বুঝবার সুবিধার জন্য T. O., V. B., C. H., P. B. প্রভৃতির ব্যাখ্যা আমি এখানে করে দিলাম। জাজ্মেন্টে এই সবের অর্থ অন্যান্য বহু স্থানে পাওয়া যাবে)। এই আট নম্বর তালিকায় আরও আছে, কোথায় বা কার কাছ থেকে ঐসব মোটর গাড়ি উদ্ধার করা হবে এবং কোন্ স্থানে ড্রাইভারদের বেঁধে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে, ইত্যাদি।

P. Distribution, অর্থাৎ Pamphlet (প্রচারপত্র) বিতরণের ভার যাদের ওপরে ন্যস্ত করা হবে, তারা কে কোথায় কতগুলো বিলি করবে তারও উল্লেখ খস্ড়ায় ছিল।

এই আট নম্বর স্লিপটির অপর পৃষ্ঠায় লেখা ছিল—গণতন্ত্রবাহিনীর সভ্যরা a, b, c, d, ও e—পাঁচটা গ্রুপে ভাগ হয়ে পুলিশ লাইনের কাছাকাছি মোতায়েন থাকবে। সেই একই পৃষ্ঠায় ব্যাগে করে যেসব জিনিষ নেওয়া হবে তারও একটা তালিকা ছিল।

এইসব বিষয় বিশদভাবে উল্লেখ করার পর জজসাহেব জাজ্মেন্টে সংক্ষেপে লিখলেন—

"The prosecution point out that at least four cars were used in the raids, that the drivers of two taxis were seized, bound and left not at the places mentioned in M VIII but at Ganesh Ghosh's house and in the field near Faujdarhat, that the places noted against the five groups are all in the vicinity of the police lines and were apparently the places where all the attacking parties were to meet and that articles of the kind mentioned as to be taken in bags (haversacks) were actually found at the lines." (Ibd. Page—122)

বহু 'সাক্ষ্য-প্রমাণ' ঘেঁটে জজসাহেব অবশেষে সংক্ষেপে মূল বক্তব্যটি এইভাবে রাখলেন—কমপক্ষে অন্তত চারটি মোটর গাড়ি আক্রমণের সময় ব্যবহৃত হয় ও দু'জন মোটর চালককে বেঁধে রাখা হয়। ৮নং খসড়ায় যা লেখা ছিল সেই স্থানে যদিও ড্রাইভারদের বেঁধে রাখা হয় নি, তবু দেখা যায় একজন ড্রাইভার গণেশের বাড়িতে ও অপরজন ফৌজদারহাটের সন্নিকটে

কোন এক মাঠে বন্দী অবস্থায় ছিল। আর দেখা যাচ্ছে পাঁচটি গ্রুপ পুলিশ লাইনের চারপাশের অঞ্চলে যাতে অবস্থান করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সব তথ্য আলোচনা করার পর জজসাহেব স্থির সিদ্ধান্তে পেঁাছলেন এবং মন্তব্য করলেন যে, দৃশ্যত তাঁর মনে হচ্ছে ঐসব স্থানে আক্রমণকারী সব দলগুলিই একত্রিত হয়েছিল এবং তাদের খসড়ায় উল্লিখিত সরঞ্জামগুলিই পুলিশ লাইনে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

সর্বশেষে কারা ব্যাপক আক্রমণে অংশ গ্রহণ করেছিল তা জজসাহেব উদ্ধার করলেন ছয় নম্বর টুক্‌রো কাগজ থেকে। তিনি লিখলেন—

"Masterda

Jiten
Binode Chow.
Dipti
Sitaram
Sushil
Kali Chakra.
Bhola
Ranadhir
Madhu Sr.

Pandit
Santi
Probhash
Barkhoka
Suresh
Binkoo
Nibaran

Benode
Nani
Kali
Pulin
Malin

Sankar
Upendra
Probodh
Haran
Subodh

"Nirmalda

Mati
Sahai
Banbehari
Birendra
Subodh

"Ambikada

Dhona
Sushil
Madhoo
Durga
Bejoy
Manindra
Bidhu Sen

Debu
Toone
Andoo
Narayan Sen
Lal Mohan
Prafulla

"Mobilisation
"(Reverse of M VI)
"Ananta and Ganesh.

"Lokanath	Rajat	Naresh	Tripura	Subodh Bal
Phanindra	Tegra	Makhan	Subodh	Gopal
Amarendra	Mona	Bidhu	Kshirode	Aswini
Saroj	Fakir	Sudhangshu	Narayan	
Bocha		Haripada	Nitai	

The list contains 71 names altogether." (Ibd. p. 124)

নামের তালিকা যেভাবে সাজান ছিল, ঠিক সেই মতই জজসাহেব সেই-গুলিকে লিপিবন্ধ করেছেন। প্রায় সব নামেরই এখানে পদবী ছাড়া উল্লেখ আছে, তাই তাদের সঠিক পরিচয় পাওয়ার ইচ্ছে পাঠক-পাঠিকার থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়া এ'দের মধ্যে যাঁরা এখনও জীবিত আছেন তাঁদের অনেকে আমার কাছে ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন, যেন আমি কারও নাম বা পরিচয় দিতে কৃপণতা না করি। এতদিন পরে বন্ধুদের পদবী সঠিকভাবে মনে করতে পারছি না—তাঁদের ডাক নামের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় ছিল অনেক বেশি। এই বইয়ের পরিশিষ্টতে যতদূর সম্ভব তাঁদের ও অন্যান্যদের পরিচিতি দেওয়া হ'ল।

দেওয়াল মানচিত্রের আকারে আমাদের Mobilisation Chart সামনে রেখে কথাবার্তা ঠিক হ'ল, সব চেকআপ করা হ'ল এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আরও নতুন ব্যবস্থা করা হবে স্থির হ'ল। এইরূপ ভাবে প্রায় আমরা চার্টটি বারে বারে দেখতাম যাতে প্ল্যানটি আরও ত্রুটিহীন করা সম্ভব হয়। যে Mobilisation Listআমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে সরকার-পক্ষ উপস্থিত করেছিল সেটি যে নেহাৎ একটি খসড়া, তা' তারাও স্বীকার করেছে।

মামলার রায় থেকে উদ্ধৃত করছি—

"Thus to recapitulate briefly we get details of equipment in MM I and M IV, car arrangements in M VIII, places of mobilisation in M VII and M IX and disposition of groups in M VIII. The prosecution claim, that even apart from the confessions, it has been conclusively established by the other evidence on record that these papers contain draft arrangements for the raids which took place on the night of 18th April 1930....."

(Ibd. p. 124)

সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করে জজসাহেব বললেন যে, যন্ত্রপাতি M MI ও M IV-এ, মোটর গাড়ির ব্যবস্থা M VIII-এ, একত্র হওয়ার স্থান নির্দেশ M VII ও M IX-এ, এবং দলসমূহের নিয়োগ M VIII-এ পাওয়া যাচ্ছে। জজসাহেব আরও অভিমত প্রকাশ করলেন, বাদীপক্ষ দাবি করছে স্বীকারোক্তি ছাড়াও অন্যান্য সাক্ষী-সাবুদ দ্বারা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ঐ সব টুকরো কাগজে ১৮ই এপ্রিল আক্রমণ চালাবার বিভিন্ন খসড়া করা ছিল।

আজকের সভায় Mobilisation Chart অনুযায়ী final check-up-এর পর আমরা একেবারে নিশ্চিত হ'লাম যে, আমাদের সব বন্দোবস্ত সমাপ্ত হয়েছে। এর আগেও দু-তিনবার আমরা ব্যাপক বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়েছিলাম এবং দু-তিনবারই আমাদের মধ্যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে যে, সামগ্রিক আক্রমণের দিনটি ও সঠিক ঘণ্টাটি স্থির করা হোক্। কিন্তু প্রস্তাব পর্যন্তই হয়েছে—গুরুত্ব দেওয়া হয় নি; তাই কোন স্থির সিদ্ধান্তেও পেঁছাই নি। আজ সভায় আসবার আগে স্থির করেই এসেছিলাম, আক্রমণের দিন ও ঘণ্টা নির্ধারিত না করে যাব না।

আমার সবচেয়ে বেশি জানবার প্রয়োজন ছিল গণেশের মত—যুব-বিদ্রোহের দিনক্ষণ আজই স্থির করতে সে প্রস্তুত আছে কিনা। মাস্টারদা ও আমি অপেক্ষা করছিলাম—যদি কেউ অভ্যুত্থানের দিন ও মুহূর্তটি ধার্য করার প্রস্তাব দেয়। জানি না মানসিক যোগাযোগ কোন কাজ করেছিল কিনা—আমার মনের ওপর থেকে একটি বোঝা মুহূর্তে নেমে গেল যখন গণেশই আজ সর্বপ্রথম খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলল—

"দিন ও ক্ষণ নির্ভুলভাবে আজই ঠিক করতে হবে—কখন আমরা যুগপৎ সশস্ত্র আক্রমণ করব। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দিন ও ক্ষণ সম্বন্ধে সঠিক জানতে না পারছি ততক্ষণ এমনিভাবে দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়ে যাবে। মাস্টারদা, শেষ দিনটি ধার্য করা হোক্—সেই দিন আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে, তারপরের আর একদিনও আমরা অপেক্ষা করব না।"

আমাদের একমত হতে আর বেশি সময় লাগল না। মাস্টারদা ও আমার মত তো ছিলই। নির্মলদা ও অম্বিকাদা অমত করেন নি। তখনই আলোচনা আরম্ভ হ'ল—ক'দিন পর আক্রমণের নির্দেশ দেওয়া হবে। যতদূর মনে পড়ছে আমাদের মধ্যে কেউ একজন বৃহস্পতিবার ১৭ই এপ্রিল ১৯৩০ সাল, যুব-বিদ্রোহের দিন ধার্য করতে প্রস্তাব করল। কে এই প্রস্তাব করেছিল, তা' আজ ঠিক মনে করতে পারছি না। এই দিনটি ধার্য করার সময় আমাদের প্রধান বিবেচনার বিষয় ছিল—খুঁটিনাটি সব প্রস্তুতি শেষ হবে কখন? যখন সব কাজ শেষ হবে, তখন আর কালবিলম্ব না করে আক্রমণ করা সাব্যস্ত করতে হবে—কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ থাকলে চলবে না। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী সামনে রেখে ১৭ই এপ্রিল আক্রমণের দিন ধার্য করার ব্যাপারে কারও কোন আপত্তি ছিল না কারণ, তার আগেই খুঁটিনাটি কাজ যে শেষ হবে, সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমি প্রস্তাব করলাম, আর একটি দিন পরে, ১৮ই তারিখ—শুক্রবার দিনটি ধার্য করলে ভাল হয়। কি কারণে একটি দিন বিলম্ব করা হবে বলে আমার মনে হয়েছিল? একটি দিন বেশি অপেক্ষা করার পেছনে, সত্যি বলতে কি, কোন কারণ বা যুক্তি ছিল না—ছিল আমার পূর্বসংস্কার। অলৌকিক শক্তি, ভৌতিক ক্ষমতা, করুণাময়ী মা'র সব 'পুতুল খেলা', প্রভৃতি সংস্কার থেকে তখন আমি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলাম। অন্ধ ভগবৎ বিশ্বাস থেকে যুক্তিবাদ ক্রমে ক্রমে কিভাবে আমাকে মুক্ত করল তা' আগে লিখেছি। আশ্চর্য! তবু আমি তখনও সামান্য একটি পূর্ব-সংস্কার থেকে মুক্তি পেলাম না। 'শুক্রবার' আমার জীবনে একটি শুভদিন—বহু কাজে সফলতা পেয়েছি সেই দিনটিতে। আর একেবারে

ছোটবেলা থেকেই বৃহস্পতিবারটিকে আমি, কাজ-কর্মের জন্য, বর্জন করে চলতাম। কারণ, হয়ত কোন কাজের সূচনা বৃহস্পতিবারে আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হয় নি। সেই কারণে মনের অগোচরে এইরূপ সংস্কার বদ্ধমূল হয়েছিল। তাই এই সংস্কারের প্রভাবমুক্ত হতে পারলাম না।

আমার এই সংস্কারের কথা বন্ধুরা প্রায় সকলেই জানতেন। একজন সাথীর যখন এইরূপ একটি সংস্কার আছে এবং তা' যখন হুকুম দিলেই মন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, তখন মাস্টারদা অভ্যুত্থানের জন্য ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ সাল—এই দিনটিই অনুমোদন করলেন। আমার মতে দলের একজন সৈনিক যদি দ্বিধাগ্রস্ত মনে যুব-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করতে যায় তবে তাতে আশানুরূপ ফললাভে ব্যাঘাত ঘটতে পারে, বোধহয় এই ভেবেই তাঁরা সেইদিন বিতর্ক না করে ১৮ই এপ্রিল-- শুক্রবার দিনটি অভ্যুত্থানের জন্য স্থির করলেন।

আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে 'ইস্টার বিদ্রোহ' একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা। ইস্টার বিদ্রোহের দিনটিও ছিল ১৮ই এপ্রিল, শুক্রবার —Good Friday। এই দিনটি যীশুর ক্রুশ-বিদ্ধ হওয়ার স্মরণ দিবস—খৃস্ট-ধর্মাবলম্বীদের কাছে দিনটি যীশুর কবর হতে পুনরভ্যুত্থানের পর্ব-বিশেষ। এই উৎসবের দিনে ইউরোপীয়ান ক্লাবে উচ্চপদস্থ সাহেবদের এক-সঙ্গে আমোদ-বিভোর অবস্থায় পাওয়া যাবে। যীশুর পবিত্র নামের সুযোগ নিয়ে তারা এতদিন যে পাশবিক অত্যাচারে ভারতবাসীকে জর্জরিত করেছে তারই প্রায়শ্চিত্ত তাদের করতে হবে নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে এবং তা' করাবো আমরা আমাদের শাণিত তরবারির আঘাতে। সময়, অর্থাৎ আক্রমণের জন্য সঠিক ঘণ্টা ধার্য হ'ল—রাত আটটা!

Good Friday! রাত আটটা! শুক্রবার—১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ সাল। চট্টগ্রামের বুকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত হবে। আমরা পাঁচজন পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় করলাম। প্রত্যেকের চোখে দৃঢ়তা ব্যক্ত হ'ল। কোন উত্তেজনার প্রকাশ ছিল না। ধীর মস্তিষ্কে শান্ত পরিবেশে আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন মাস্টারদা—"যুব-বিদ্রোহের রণভেরী বেজে উঠবে—শুক্রবার রাত আটটা, ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ সাল।"

আমাদের হেডকোয়ার্টারের যে-বৈঠকে যুব-বিদ্রোহের চূড়ান্ত দিন ও ঘণ্টা ধার্য হয়ে গেল, সেই সময় থেকে আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি অভ্যুত্থানের। সামনে অসংখ্য খুটিনাটি কাজ—খুব শক্ত নাহলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্ল্যান অনুযায়ী টিন ভর্তি পেট্রোল কিনে নির্ধারিত বিভিন্ন স্থানে রাখা, অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম গোপন সংরক্ষিত স্থান থেকে বার করে লোকচক্ষুর অন্তরালে লক্ষ্যবস্তুর সন্নিকটে স্থানান্তরিত করা, সবার কাঁধে ঝোলান থলেগুলিতে ফর্দ অনুযায়ী সব জিনিসপত্র ভর্তি করে বিভিন্ন গ্রুপ পরিচালকদের তত্ত্বাব-ধানে রাখার ব্যবস্থা করা; যে সব সভ্য বাড়ী থেকে বন্দুক নিয়ে আসবে (প্রায় ১২/১৪টি বন্দুক হবে) সেগুলিকে বিভিন্ন সময় ও সুযোগে বাড়ি থেকে সরানো এবং প্রয়োজন অনুসারে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুর সান্নিধ্যে সেগুলিকে পাঠানো; আগে থেকে মোটর গাড়ি ভাড়া করে রাখা, প্রভৃতি অসংখ্য কাজের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের কর্ম-চাঞ্চল্যের অন্ত ছিল না। এই শেষ ক'টি

দিন আমরা ও আমাদের প্রথম সারির সভ্যরা অস্বাভাবিকভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমাদের সদাচঞ্চল, সদা-ব্যগ্র ও অধীর গতিবিধির সঠিক কারণ বোঝার ক্ষমতা কারও ছিল না। তাই অভিভাবকেরা হলেন বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট, আর পুলিশ হ'ল সন্দিগ্ধ সচকিত ও জাগ্রত।

সেই শেষ ক'টি দিনে পুলিশ ও আমাদের কর্মব্যস্ততার একটি বাস্তব চিত্র দেখতে পাওয়া যাবে সরকারী তথ্যের মধ্যে। ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট মিঃ জে. ইউনীর জাজ্‌মেন্ট—ফুলস্কেপ সাইজের কাগজের ২০৪ পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে মুদ্রিত হয়েছে। সাদা পোষাক পরিহিত পুলিশ প্রহরীরা দিবা-রাত্রি সর্বক্ষণ আমাদের গতিবিধির উপর কিরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে তার কিছুটা নমুনা ঐ বই-এর চৌদ্দ থেকে পঁচিশ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। সেই এগারো পৃষ্ঠার মাঝখান থেকে আমি জাজ্‌মেন্ট কপির মাত্র দু'টি পৃষ্ঠার বিষয়বস্তুর উল্লেখ করে পাঠক-পাঠিকাদের মনে একটি বাস্তব চিত্র উপস্থিত করতে চেষ্টা করছি যে, পুলিশের কিরকম সজাগ দৃষ্টির সামনে আমাদের সর্বদা সতর্ক হয়ে কাজ করতে হয়েছিল! কোন সামান্য ত্রুটিও উপেক্ষার বস্তু বলে মনে করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অতি সামান্যতম ত্রুটির প্রতি অবহেলাও হয়ত আমাদের সমস্ত আয়োজনকে ব্যর্থ করে দিত।

আমাদের বিরুদ্ধে মামলার রায় থেকে উদ্ধৃত করছি—

"A. S. I. Sasanka Bhattacharjee (P. W. 82) says—

'On 14th April 1930, at 7-20 a.m. I saw Surjya Sen, Nirmal Sen and Ambika Chakravarti come to the house of Ganesh Ghosh. Ganesh, Tripura Sen, Amarendra Nandi and Bhabatosh Bhattacharjee were already in the shop. At 7-30 a.m. Rajat Lal Sen and Monoranjan Sen came to the shop. At 7-35 a.m. Ambika Chakravarti, Nirmal and Surjya left the shop and went towards the north in a tikka gharry by Nandan kanan and Paltan road. I followed them. They went to the congress office. At 7-45 a.m. I saw Lokanath Bal, Naresh Roy, Saroj Kr. Guha coming out of the house of Ananta Singh and going south on foot. I saw them as I was following the gharry. At 8-42 a.m. Surjya, Ambika and Nirmal reached the Congress Office. At about 8-50 a.m. I saw Ananta Singh, Makhan Ghosal and Himangshu Bimal Sen going in a car No. 24666 to the Congress Office where they talked with others.

'At 6-30 p.m. I saw Lokanath Bal, Tripura Sen, Bidhu Bhattacharjee, Ardhendu Guha, Makhan Ghosal, Monoranjan Sen, Rajat Sen, Naresh Rai, Harigopal Bal, Saroj Kanti Guha talking together at the Sadarghat jetty. At about 7-20 p.m. Lokanath , Tripura, Bidhu and Naresh

Rai left the jetty and went towards the north. At about 7-25 p.m. Bhabatosh, Makhan, Monoranjan, Rajat, Harigopal, Sarojkanti and Ardhendu left the jetty and went into the house of Ganesh Gosh'." (Ibd. P—10).

এই উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যাচ্ছে, বাদীপক্ষের ৮২ নং সাক্ষী A. S. I. (অ্যাসিস্টেন্ট-সাব-ইন্‌স্পেক্টর) শশাঙ্ক ভট্টাচার্য, ১৯৩০ সালের ১৪ই এপ্রিলের রিপোর্টে বলছে—সকাল ৭-২০ মিনিটে সে মাস্টারদা, নির্মলদা ও অম্বিকাদাকে গণেশের বাড়ি আসতে দেখেছে। গণেশ, ত্রিপুরা, অমরেন্দ্র ও ভবতোষ আগে থেকেই দোকানে ছিল। আবার সকাল ৭-৩০ মিনিটে সেখানে মনোরঞ্জন সেনকেও আসতে দেখেছে। এর পাঁচ মিনিট পরে, ৭-৩৫ মিনিটে, অম্বিকাদা, মাস্টারদা ও নির্মলদা, গণেশের দোকান থেকে বেরিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে নন্দনকানন ও পল্টনের রাস্তার দিকে এগোলেন। সে তাদের পিছু নিতে ছাড়ল না। দেখতে পেল, তাঁরা কংগ্রেস অফিসের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। মাস্টারদাদের ঘোড়ার গাড়ি অনুসরণ করবার সময় ৭-৪৫ মিনিটে, A. S. I. শশাঙ্ক লোকনাথবাবু, নরেশ রায় ও সরোজকান্তি গুহকে অনন্ত সিংহের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দক্ষিণের দিকে যেতে দেখল। কিছুক্ষণের মধ্যে ৮-৪২ মিনিটের সময়, মাস্টারদা, অম্বিকাদা ও নির্মলদাকে আবার কংগ্রেস অফিসে এসে পেঁছিতে দেখেছে। ঠিক আট মিনিট পরে, ৮-৫০ মিনিটে, মাখন ঘোষাল ও হিমাংশুর সঙ্গে অনন্ত সিংহকে ২৪৬৬৬ নম্বরের মোটর-গাড়ি করে কংগ্রেস অফিসে আসতে ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথাবার্তায় যোগ দিতে দেখেছে।

পুলিশ গুপ্তচর শশাঙ্ক ভট্টাচার্য, তার ১৪ই তারিখের রিপোর্টে আরও বলেছে—সন্ধ্যে ৬-৩০ মিনিটের সময় সে লোকনাথ প্রমুখ আমাদের এগারো-জন সাথীকে সদরঘাট জেটির ওপর দেখে কিছুক্ষণ বাদে, সন্ধ্যে ৭-২০ মিনিটের সময়, জেটি পরিত্যাগ করে লোকনাথের সঙ্গে তিনজন চলে গেল উত্তরে। পাঁচ মিনিট পরে, ৭-২৫ মিনিটে, বাকি সাতজন গণেশ ঘোষের বাড়ির ভেতর প্রবেশ করে।

জজসাহেব আর একজন সাদা পোষাক পরিহিত পুলিশ প্রহরীর সেই একই দিনের রিপোর্ট উল্লেখ করে এই রিপোর্টের সত্যতা প্রমাণ করতে চাইলেন।

আবার জাজ্‌মেন্ট থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"With this may be compared the evidence of A. S. I. Sanatan Karmakar (P. W. 71) for the same day:—

'On 14th April at 8-15 a.m. Surjya Sen, Ambika Chakravarti and Nirmal Sen came to the Congress Office in a Tikka gharry. At 8-55 a.m. Ananta Singh, Himangshu Bimal and Makhan Ghosal came along the Paltan road to the Congress Office in Car No. 24666. Then at 10 a.m. Ananta Singh, Nirmal Sen, Makhan Ghosal and Himangshu left the Congress Office and went off south by the Paltan Road in the same car. At 4 p.m. Surjya Sen and Ambika

Chakravarti left the Congress Office and went southwards. At 6 p.m. Nanda Lal Singh came along the Paltan Road to the Congress Office in car No. 24666. He had a boy servant with him. He left half an hour later'." (Ibd. P—17).

এখানে বলা হচ্ছে, অ্যাসিস্টেন্ট-সাব-ইন্‌স্পেক্টর—সনাতন কর্মকার সেই দিনে, অর্থাৎ ১৪ই তারিখে রিপোর্ট দেয়। সেও সকাল ৮-৪৫ মিনিটের সময় মাস্টারদা, অম্বিকাদা ও নির্মলদাকে ঘোড়ার গাড়ি করে কংগ্রেস অফিসে আসতে দেখেছে। আবার ১০ মিনিট পর, ৮-৫৫ মিনিটের সময়, তার রিপোর্টে বলা হচ্ছে, মোটরগাড়ি নং ২৪৬৬৬ করে পল্টনের রাস্তা ধরে অনন্ত সিংহ, নির্মল সেন, হিমাংশু ও মাখন ঘোষাল কংগ্রেস অফিসে এসে উপস্থিত হয়েছে। তারপর সকাল দশটার সময় সে বলছে এরা চারজন আবার সেই গাড়ি করেই পল্টনের রাস্তা ধরে চলে গেল। বিকেল চারটার সময় মাস্টারদা ও অম্বিকাদাকে কংগ্রেস অফিস থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে যেতে দেখেছে। নন্দলাল সিংহ (আমার দাদা) একজন চাকরকে সঙ্গে নিয়ে ছ'টার সময় ২৪৬৬৬ নম্বরের মোটরগাড়ি করে কংগ্রেস অফিসে আসেন ও আধঘণ্টা পরে ফিরে যান।

১৪ই এপ্রিলের মাত্র দু'তিনটি পুলিশ রিপোর্ট উল্লেখ করে তাদের তৎপরতার একটু আভাস দেওয়া গেল। এইরূপ বহু পুলিশ প্রহরী আমাদের সব সময় ঘিরে থাকত। আর মাত্র তিনদিন সময় আমাদের হাতে আছে। তারপর, ১৮ই এপ্রিল, সশস্ত্র আক্রমণের দিন! কাজেই আমাদের কর্মব্যস্ততা কমবার কথা নয়। পুলিশও আমাদের ঐরূপ কর্মচঞ্চলতা দেখে যে খুবই বিচলিত হয়েছিল, তা'তে কোন সন্দেহ নেই। তবু বৃটিশ আমলের পুলিশ 'Rowlat Committee'র রিপোর্টের অভিজ্ঞতার বাইরে আমাদের বৈপ্লবিক সংগঠনের প্রকৃত শক্তি ও ব্যাপক পরিকল্পনা সম্বন্ধে আর বেশি কিছু ভাবতে পারে নি। তাই আমাদের কর্মচঞ্চলতার বাস্তব কারণও তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। আগেও বলেছি—এখনও বলছি, দলে বিশ্বাসঘাতক না থাকলে পুলিশ খড়ি গুণে কিছু জানতে পারে না।

১৪ই তারিখের গুপ্তচর বিভাগের পুলিশ রিপোর্ট থেকে এইটুকু দেওয়া হ'ল। সেইরূপ ১৭ই তারিখের আর একটু বিবরণ দিচ্ছি। সেখানে দেখতে পাওয়া যাবে পুলিশ আরও কত বেশি তৎপর হয়ে উঠেছিল এবং আমরা কতখানি কর্মব্যস্ততার মধ্যে ছিলাম।

জাজ্‌মেন্ট থেকে উদ্ধৃত করছি:—

"The watch evidence for 17th and 18th April discloses intense and (regarded in the light of subsequent events) extremely significant activity among the six ex-detenus and their associates, which is best described in the 'watcher's own language.—

'17th April.

'At about 7 a.m. I saw Lokanath Bal and Ardhendu Dastidar coming out of the house of Lokanath Bal on the

Patharghata road and going towards the house of Ganesh Ghosh. I followed them. They entered the house of Ganesh Ghosh. At 8 a.m. I saw Lokanath Bal, Ananda Gupta, Harigopal Bal and Tripura Sen taking tea in a Mohammedan tea-shop near the Graduates' High School. After taking tea they returned to Ganesh Ghosh's shop and at 8-30 a.m. Lokanath Bal and Ardhendu Dastidar returned to Lokanath's basha. From Lokanath's house I went back to the fixed point and from there to Ganesh Ghosh's shop about 9 a.m. Inside I saw Ananta Singh, Ganesh Ghosh, Tripura Sen and Harigopal Bal talking together. After 10 or 15 minutes Jiban Ghoshal came to the door of the shop and then Ganesh Ghosh and Ananta Singh came out to him and all three got into the car No. 24666 which was standing infront of the shop and went along the Court Road and towards the Congress Office. I followed them on a cycle and saw them go inside the Congress Office. I remained standing nearby. About half an hour later they came out and got into the car and went to the house of Lokanath Bal. I followed them on my cycle. Lokanath Bal came out of his house and got into the car and they proceeded towards Ganesh Ghosh's shop. I followed them and seeing the car stop infront of the shop I returned to the fixed point. About 9-45 a.m. I saw Ananta Singh and Ambika Chakravarti come out of Ganesh Ghosh's shop and get into a new car which was standing on the road a little to the west of Ganesh Ghosh's shop. I have not noted the number of the car. They went towards the south (P. W. 83).

'At about 4-30 p.m. I saw Bidhu Bhattacharjee going to the Congress Office in car No. 246A. The car was driven by Umesh. At 5 p.m. Bidhu Bhattacharjee and Ambika Chakravarti left the Congress Office and went east in that car along the Empress Road. (P.W. 71).

'At about 5-10 p.m. Naresh Rai went to Ganesh Ghosh's shop where I saw Ganesh Ghosh, Nanda Lal Singh, Bhabatosh Bhattacharjee, Harigopal Bal and Bidhu Bhattacharjee sitting talking together. In front of the shop the car No. 24666 was standing waiting.' (P. W. 81).

'On 17th April at about 1 a.m. I saw motor car No.

24666 at the junction of Dewanhat and Pahartali Road (i.e. near the A. F. I. armoury). There were three persons in the car of whom I recognised Ganesh Ghosh and Makhan Ghosal. It was coming from Pahartali side and went eastwards towards the Railway Building. I followed it on my Cycle up the Town Inspector's Bunglow when they put on speed and I could not follow further. It went on eastwards in the direction of the Congress Office'." (P. W. 82). (Ibd. P—24).

জজসাহেব তাঁর রায় লিখতে গিয়ে মন্তব্য করছেন—১৭ই তারিখ ও ১৮ই তারিখ গুপ্তবিভাগের পুলিশ প্রহরীদের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ছয়-জন প্রাক্তন ডেটিনিউ ও তাদের দলীয় সহকর্মীদের গতিবিধি কতখানি গুরুত্ব-পূর্ণ ও তীব্রতর আকার ধারণ করেছিল! তারপর তিনি লিখলেন, প্রহরী-দের নিজ ভাষায় তা' প্রকাশ করলেই সব চেয়ে ভাল বোঝা যাবে। প্রথমে তাঁর মন্তব্যে এইটুকু বলে তারপর তিনি চারজন সাদা পোষাক পরিহিত পুলিশ প্রহরীর ১৭ই তারিখের রিপোর্ট তাঁর জাজ্‌মেন্টে উল্লেখ করেছেন—বিবাদীপক্ষের ৮৩ নম্বরের পুলিশ-সাক্ষীর রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে সকাল ৭টার সময় সে লোকনাথ ও অর্ধেন্দুকে, লোকনাথের বাসা থেকে গণেশের বাসায় যেতে দেখেছে। সে তাদের অনুসরণ করে তাদের গণেশের বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখল। এক ঘণ্টা পরে, ৮টার সময়, গ্র্যাজুয়েট স্কুলের সামনে একটি মুসলমানের দোকানে বসে লোকনাথ, আনন্দ, হরিগোপাল ও ত্রিপুরাকে চা খেতে দেখেছে। তারা চা খেয়ে গণেশের দোকানে এল এবং ৮-৩০ মিনিটের সময় লোকনাথ ও অর্ধেন্দু, লোকনাথের বাসায় ফিরে গেল। সেই গুপ্ত-প্রহরীও তখন সেখান থেকে তার নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে গেল এবং সকাল ৯টা থেকে গণেশ ঘোষের দোকানের প্রতি নজর রাখছিল। দোকানে অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, ত্রিপুরা সেন এবং হরিগোপালকে সে একসঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেখেছে। দশ-পনেরো মিনিট পর জীবন ঘোষাল দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে গণেশ ও অনন্ত সিংহ, মাখনকে নিয়ে ২৪৬৬৬ নম্বরের মোটরগাড়ি করে কংগ্রেস অফিসের দিকে ছুটল। সাইকেলে সে তাদের গাড়ি অনুসরণ করে এবং শেষ পর্যন্ত দেখে যে, তারা কংগ্রেস অফিসে ঢুকে পড়েছে। সে তাদের পাহারা দিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। আধঘন্টা পর, তার রিপোর্ট অনুযায়ী, আমরা গাড়ি করে লোকনাথের বাড়িতে হাজির হ'লাম। সে তখনও সাইকেলে অনুসরণ করেছে এবং দেখেছে, আমরা লোকনাথকে সঙ্গে নিয়ে গণেশের বাসায় এলাম। আমাদের গাড়ি গণেশের দোকানের সামনে দেখে সে তার নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে গেল। ৯-৪৫ মিনিটের সময় সে দেখল অম্বিকাদা ও আমি গণেশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটু দূরে একটি নতুন গাড়িতে উঠে দক্ষিণের দিকে রওনা হলাম।

৭১ নম্বরের সরকারী সাক্ষীও একজন গুপ্ত-পুলিশ-প্রহরী। তার রিপোর্টটিতে সে বলেছে, ৪-৩০ মিনিটের সময় ২৪৬-এ নম্বরের মোটরে করে বিধুবাবু কংগ্রেস অফিসের দিকে গেলেন। আবার আধঘণ্টা পর, ৫টার সময়,

তাকে অম্বিকাদার সঙ্গে কংগ্রেস অফিস থেকে বেরিয়ে এম্প্রেস রাস্তা দিয়ে পূর্ব দিকে যেতে দেখা গেল। ৮১ নম্বরের বাদীপক্ষের সাক্ষী, পুলিশ প্রহরীর রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে, ৫-১০ মিনিটের সময় সে নরেশ রায়কে গণেশের বাড়িতে যেতে এবং গণেশের দোকানে নন্দলাল সিংহ, ভবতোষ, হরিগোপাল এবং বিধু ভট্টাচার্যকে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত থাকতে দেখেছে। ২৪৬৬৬ নম্বরের গাড়িটিও দোকানের সামনে দাঁড়ানো ছিল বলে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

তারপর পাচ্ছি, ৮২ নম্বরের সরকারী পুলিশ সাক্ষীর রিপোর্ট। সে বলছে—১৭ই তারিখ রাত একটায় A. F. I. অস্ত্রাগারের কাছে ২৪৬৬৬ নম্বরের গাড়িতে গণেশ, মাখন ও আরও একজনকে দেখতে পায়। জজসাহেব গুরুত্ব বোঝাবার জন্য ইটালিকস্-এ, অর্থাৎ বাঁকা অক্ষরে এই কটা কথা ছাপলেন—*at about 1 a.m.* সেই গাড়িটি পাহাড়তলীর দিক থেকে এসে রেল-কোয়ার্টার অভিমুখে চলে গেল। টাউন ইন্স্পেক্টরের বাংলো পর্যন্ত সে তার সাইকেলে পেছু ধাওয়া করে থেমে পড়ল। আমাদের গাড়ি পূর্বে, কংগ্রেস অফিসের দিকে যেতে যেতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর জজসাহেব ১৮ই তারিখে আমাদের উপর পুলিশের দৃষ্টি কতখানি প্রখর ছিল তার কিছুটা বর্ণনা পুলিশ প্রহরীর নিজ ভাষায় দিলেন। ১৮ই এপ্রিল আমাদের অভ্যুত্থানের দিন ছিল। আক্রমণের ঘণ্টাটি নির্ধারিত ছিল রাত আটটায়। পুলিশ প্রহরীর রিপোর্ট আমরা এখানে সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত পাচ্ছি। জজসাহেব এইভাবে রিপোর্টটি উল্লেখ করলেন—

"18th April.

'At 8 a.m. while I was passing along Sadarghat Road I saw Lokanath Bal standing on the threshold of Ganesh Ghosh's shop'." (P. W. 83).

৮৩ নম্বর সাক্ষী, ১৮ই এপ্রিল সকাল ৮টার সময় লোকনাথকে গণেশের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

'About 8 a.m. I saw Ananta Lal Singh and Ganesh Ghosh coming out of Ganesh Ghosh's shop. They went north in car No. 24666 along Court Road and Paltan Road. I followed them. They went to the Congress Office and there met Surjya Sen, Nirmal Sen and Ambika Chakravarti. At about 8-50 a.m. Ananta, Ganesh, Nirmal and Ambika left the Congress Office and proceeded south along Paltan Road in car No. 24666. I followed them. They went into the house of Ganesh Ghosh." (P. W. 82).

পুলিশের গুপ্ত-প্রহরী (৮২ নম্বরের বিবাদীপক্ষের সাক্ষী) গণেশ ও আমাকে সকাল ৮টার সময় গণেশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে। সদর আদালত ও পল্টনের রাস্তা দিয়ে ২৪৬৬৬ নম্বরের মোটরগাড়ি করে আমাদের যেতে দেখে সে সাইকেলে অনুসরণ করে। সে বলছে, আমরা কংগ্রেস অফিসে

সূর্য সেন, নির্মল সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর সংগে একত্র হ'লাম। তার কথা মত জানা যাচ্ছে যে, ৮-৫০ মিনিট নাগাদ আমরা চারজন—নির্মলদা, অম্বিকাদা, গণেশ ও আমি সেই গাড়িতেই পল্টনের রাস্তা দিয়ে ফিরে গেলাম। যথারীতি সে সাইকেলে আমাদের অনুসরণ করেছে এবং গণেশের বাড়ির ভেতর আমাদের প্রবেশ করতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

পাঠকদের বোঝবার সুবিধার জন্য একটু বলা প্রয়োজন, নইলে সেই সব পুলিশ রিপোর্ট (তারা সাইকেলে মোটরগাড়ি অনুসরণ করেই আমাদের গতি-বিধি ও গন্তব্যস্থল জানতে সমর্থ হয়েছে) নিছক বানানো গল্প বলে মনে হবে। সাইকেলে অনুসরণ করে গাড়ির গন্তব্যস্থল ক্ষেত্র বিশেষে জেনে ফেলা যদি অসম্ভবই হ'ত তবে সেরূপ মিথ্যা সাক্ষীর বিরুদ্ধে আদালতের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। চট্টগ্রাম শহর খুব ছোট। আমাদের সাধারণ গন্তব্য-স্থলগুলি গুপ্ত-পুলিশ-দলের প্রায় একেবারে মুখস্থ ছিল। তা'ছাড়া আমাদের সাধারণ গতিবিধির গন্ডিটিও এক থেকে তিন মাইলের অধিক ছিল না। তাই ছোট শহরের সরু রাস্তা দিয়ে ভিড় ঠেলে খুব দ্রুতগতিতে গাড়ি চালান সব সময় সম্ভব হ'ত না এবং তার দরকারও ছিল না। এই কারণে পরিচিত পথে এইটুকু দূরত্ব সাইকেলে অতিক্রম করে পূর্ব-চিহ্নিত স্থানগুলির সন্ধান রাখা পুলিশের পক্ষে খুব শক্ত ছিল না।

১৮ই এপ্রিল আবার ৭১ নম্বর সাক্ষী, আর একজন পুলিশ প্রহরী, তার রিপোর্টে বলছে—

"At 9-15 a.m. Jiban Ghosal came to the Congress Office in car No. 24666. Five minutes later he left the Congress Office and went off along Paltan Road with three others in the car. I was at a distance and could not make out who they were." (P. W. 71) (Ibd. P—24).

এই পুলিশ প্রহরী সকাল ৯-১৫ মিনিটের সময় জীবন ঘোষালকে ২৪৬৬৬ নম্বরের মোটরে করে কংগ্রেস অফিসে যেতে দেখেছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে অন্য তিনজনের সঙ্গে মোটরগাড়িতেই পল্টনের রাস্তা দিয়ে চলে গেল। এই গুপ্ত-পুলিশটি দূরে থাকায় বাকি তিনজনকে চিনতে পারে নি বলে রিপোর্টে উল্লেখ আছে। পনেরো মিনিট পরে, আবার ৯-৩০ মিনিটের সময় আর একজন পুলিশ প্রহরী—৮১ নম্বরের সাক্ষী, পল্টনের রাস্তায় নরেশ রায়কে সাইকেলে উত্তর থেকে দক্ষিণে যেতে দেখেছে—

"At 9-30 a.m. I saw Naresh Rai coming along the Paltan Road from north to south on a Cycle." (P. W. 81).

৮৩ নম্বর সরকারী পক্ষের সাক্ষী, আর একজন পুলিশ ওয়াচার, তার রিপোর্টে বলেছে—সকাল দশটার সময় অর্থাৎ. ৮১ নম্বর সাক্ষী লক্ষ্য করবার আধঘন্টা পরে, সে সদর কোতোয়ালির পশ্চিমদিকের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় 246-A নম্বরের একটি নতুন মোটরগাড়ি করে অনন্ত সিংহকে উত্তর-দিকে যেতে সে দেখেছে—

"At 10 a.m. I was standing on the road to the west of Kotwali when I saw Ananta Singh going north in a new

motor car No. 246-A. He was alone in the car." (P. W. 83).

এই সবই কিন্তু ১৮ই এপ্রিলের রিপোর্ট, যেদিন আমরা সশস্ত্র অভিযান চালিয়েছি। ৮২ নম্বরের সাক্ষী, গুপ্ত-পুলিশ, তার রিপোর্ট দিয়েছে। সে বলেছে, সাড়ে বারোটার সময় রজত, হরিগোপাল এবং ভবতোষকে সরসীকুঞ্জ থেকে আসতে দেখেছে। তারপর রজত ফিরিঙ্গিবাজারের দিকে চলে গেছে আর হরিগোপাল ও ভবতোষ গণেশের দোকানে অনন্ত সিংহ, জীবন ঘোষাল ও গণেশের সঙ্গে একত্র হয়েছে। পাঁচ মিনিট পরে হিমাংশু এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আরও প্রায় মিনিট পাঁচেক পর গণেশ, অনন্ত, হিমাংশু এবং হরিগোপাল ২৪৬এ গাড়ি করে অমরচাঁদ ও পল্টনের রাস্তা ধরে উত্তর দিকে গেল। হিমাংশুর হাতে একটি ছোট লাঠি ছিল। হিমাংশু সেই লাঠিটি বন্দুকের মত করে তার দিকে বাগিয়ে ধরে। পুলিশ ক্লাবের কাছে সেই প্রহরীটি যখন তাদের অনুসরণ করছিল, তখন হিমাংশু তার দিকে লাঠিটি তুলে তাক্ করে। সে রিপোর্টটি শেষ করেছে এই বলে যে, তারা সবাই অনন্ত সিংহের বাড়ি গেল। মামলার রায়েতে বাংলায় লেখা বিবরণটি এইভাবে ইংরেজীতে মুদ্রিত আছে—

"At about 12-30 p.m. I saw Rajat Lal Sen, Harigopal Bal and Bhabatosh Bhattacharjee coming out of Sarasikunja. Rajat Sen went towards Feringhee Bazar side. Harigopal and Bhabatosh went to the shop of Ganesh Ghosh where Ananta Singh, Ganesh Ghosh and Jiban Ghosal were already sitting. About five minutes later, Himangshu Bimal Sen came to the shop and joined them. About five minutes after that Ananta Singh, Ganesh Ghosh, Harigopal Bal and Himangshu Sen left the shop and went North by Amarchand Road and Paltan Road in car No. 246-A. Himangshu had a stick in his hand which he aimed at me as if it were a gun he was levelling at me and laughed at me. This was while I was following them—near the police club. They all went into the house of Ananta Singh." (P. W. 82). (Ibd. P-25).

৮১ নম্বরের পুলিশসাক্ষী তার ১৮ই এপ্রিলের রিপোর্টে আবার লিখেছে—বিকেল ৩-৩০ মিনিটের সময় জীবন ঘোষাল ও ভবতোষ আন্দরকিল্লার রাস্তা দিয়ে ২৪৬৬৬ নম্বরের গাড়ি করে উত্তর থেকে দক্ষিণে যাচ্ছিল। তারা বাঁক ঘুরে টেরীবাজারের দিকে চলে গেল।

ইংরেজীতে মূল বিষয়টি এইরূপ—

"At 3-30 p.m. I saw Jiban Ghosal on the Anderkilla Road coming from north to south in car No. 24666 along with Bhabatosh Bhattacharjee. They went towards the east along Teri Bazar Road." (P. W. 81). (Ibd. P—25).

আবার ৮৩ নম্বরের সাক্ষীর ভাষ্য থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে, আধঘন্টা পরে বিকেল ৪টার সময় সদর থানার পশ্চিমে কোর্ট রোডে সে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় লোকনাথ ও জীবন ঘোষালকে ২৪৬৬৬ নম্বরের মোটরগাড়ি চড়ে গণেশের দোকানের দিক থেকে এসে উত্তরে যেতে দেখেছে।

আসল বিবরণটি এই—

"At 4 p.m. I was standing on the road west of Kotowali (Court Road) and saw Lokanath Bal and Jiban Ghosal going north in a car No. 24666 from the direction of Ganesh Ghosh's shop." (P. W. 83; Ibd. Page—25).

এই বিবরণের পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে, অর্থাৎ, বিকেলে ৪-৪৫ মিনিটের সময় ৮২ নম্বরের সাক্ষীর রিপোর্টটি হচ্ছে, সে জেলাশাসকের পাহাড়স্থিত বাংলোর নিচে অনন্ত সিংহ, নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী ও ভবতোষকে একত্রে দেখতে পায়। তা'রা ২৪৬-এ নম্বরের গাড়ি করে পূর্বদিক থেকে এসে জামাল খাঁ রাস্তা ধরে উত্তরে গেল। সে সাইকেলে অনুসরণ করে দেখতে পেল যে, তারা কংগ্রেস অফিসে প্রবেশ করেছে। সে আবার দেখতে পায় যে, ৫-৩০ মিনিটের সময় ২৪৬-এ নম্বরের গাড়ি নিয়ে অনন্ত সিংহ ও ভবতোষ পল্টনের রাস্তা দিয়ে উধাও হ'ল। সে কিন্তু অনুসরণ করে দেখে, তারা গণেশের দোকানের ভেতরে ঢুকল। অবশেষে ৫-৩০ মিনিটের সময় সে চলে গেল। (আর মাত্র আড়াই ঘন্টা পর আমাদের আক্রমণের জন্য সবুজ আলো জ্বলে ওঠার কথা)।

জাজ্‌মেন্ট থেকে উদ্ধৃত করছি—

"At about 4-45 p.m. I saw Ananta Singh, Nirmal Sen, Ambika Chakravarti and Bhabatosh Bhattacharjee at the foot of the hill on which stands the District Magistrate's Bunglow. They were coming from the east and proceeded towards the north by Jamalkhan Road in car No. 246-A. I followed them on my Cycle up to the Congress Office which they entered. At about 5-30 p.m. Ananta Singh and Bhabatosh left the Congress Office and went along Paltan Road in Car No. 246-A. I followed them. They went to the shop of Ganesh Ghosh and entered. I then went away." (P. W. 82; Ibd. P—25).

তারপর জজসাহেব বাদীপক্ষের ৮৩ নম্বরের সাক্ষীর অর্থাৎ, সেই গুপ্তবিভাগের পুলিশ রিপোর্টটি থেকে ব্যক্ত করতে চাইলেন, ১৮ই এপ্রিল রাত্রে, যে সময়ে আমরা শহর অধিকার করি, তার মাত্র ক'এক ঘন্টা আগে, বিকেল ৫টার সময় সেই পুলিশ প্রহরী যখন উত্তর দিকে টহল দিচ্ছিল তখন লালদীঘির কাছে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে লোকনাথ ও জীবন ঘোষালকে ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে কথা বলতে দেখে সেই দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যখন তারা কথা বলায় ব্যস্ত, তখন সারি দেওয়া ট্যাক্সিগুলিকে ছাড়িয়ে একটু দূরে একটি বাদাম গাছতলায় ২৪৬৬৬ নম্বরের গাড়িটি অপেক্ষা করছিল। ক'এক মিনিট কথা বলার পর

২৪৬৬৬ নম্বরের গাড়িটি করে তারা গণেশ ঘোষের দোকানের দিকে চলে গেল।

মূল ইংরেজী ভাষ্যটি নিচে দেওয়া হ'ল—

"At about 5 p.m. I was walking north along the Court Road when I saw Lokanath Bal and Jiban Ghosal standing at the taxi-stand near the Laldighi, talking with taxi-walla. While they were talking the small car No. 24666 was standing under the almond tree just to the west of the taxi-rank. After a few minutes talk they got into the car No. 24666 and went back in the direction of Ganesh Ghosh's house." (P. W. 83, Ibd. Page—25).

চোদ্দ, সতেরো ও আঠারো তারিখের সজাগ পুলিশ পাহারার রিপোর্ট আমরা সরকারী তথ্য থেকে একটুখানি পেলাম। পুলিশের এইরূপ তৎপরতার বিষয় তা'রা প্রকাশ করেছে আমাদের যুব-অভ্যুত্থানের অনেক পরে—মামলার সময়। কিন্তু মামলার সময় তাদের সজাগ পাহারা ও তৎপরতার কথা জানবার জন্য আমাদের কোন মাথা ব্যথা ছিল না। পুলিশের গতিবিধি জানবার প্রয়োজন ছিল আমাদের ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল যুব-অভ্যুত্থানের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। পুলিশ আমাদের বাহ্যিক গতিবিধি নিরবচ্ছিন্নভাবে দিবারাত্রি লক্ষ্য করে কেবলমাত্র মামলার সময় তাদের তথাকথিত কতকগুলি রিপোর্ট দাখিল করা ছাড়া আর কি করেছিল জানি না, তবে তাদের তৎপরতা ও কার্যকলাপের উপরে আমরা যেভাবে কড়া নজর রেখেছিলাম তাতে তাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে প্রস্তুত হতে পেরেছি ও সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহ সফল করতে সমর্থ হয়েছি। পুলিশের কার্যকলাপের সামান্য বর্ণনা দেওয়া হ'ল। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরে বুঝতে সুবিধে হবে আমরা কিভাবে সমানে পাঁয়তারা কষেছি তাদের বিভ্রান্ত করে বিপথে চালিত করতে।

আমাদের খুঁটিনাটি ছোট ছোট কাজ একেবারে শেষে যা' বাকি ছিল তার একটু আভাস দিয়েছি। তা'ছাড়া উপরের কয়েকটি পাতায় সরকারী তথ্য থেকেই বর্ণনা দিয়েছি যে, চট্টগ্রামের মত ছোট একটি শহরে, ১৮ই এপ্রিল, যুব-বিদ্রোহের দিনটির কয়েকদিন আগেও পুলিশের গুপ্ত বাহিনী দিন রাত কিভাবে জোঁকের মত আমাদের পেছনে লেগে থেকে অনুসরণ করেছে ও পাহারা দিয়েছে। যদি ঘরের শত্রু বিভীষণের অস্তিত্ব না থাকে তবে বাহ্যিক পাহারার ব্যবস্থা করে পুলিশ কি বা কতটুকু বুঝতে পারে? পুলিশের বাহ্যিক পাহারার ব্যবস্থা ও দূর থেকে লক্ষ্য রেখে আমাদের তৎপরতার সন্ধান পাওয়ার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য দুটি সহজ পাল্টা পন্থা অবলম্বন করেছি। একটি ব্যবস্থার কথা আগেই বলেছি—আমরা তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা গোয়েন্দাগিরি করবার সক্রিয় পরিকল্পনা গ্রহণ করি। সরকারী তথ্য থেকেও সেই কথা আগে উল্লেখ করেছি। এখানে আর একটু উল্লেখ করছি—

"..both the Inspectors (P. W. 70) and S. I. Ramani Majumder (P. W. 149) state that it was noticed that members of the party were being deputed to keep an eye on their

movements and (P. W. 149) adds that he had personally seen Himangshu Bimal Sen watching Saroda Babu's house..." (P. 139-140; Judgement in Armoury Raid case No. 1 of 1930. Chittagong.) সরকারী সাক্ষী, ইন্‌স্পেক্টার ও সাব-ইন্‌স্পেক্টার, দুজনেই বলেছে যে, পুলিশের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য আমাদের দলের সদস্যদের নিযুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া সাব-ইন্‌স্পেক্টার রমণী মজুমদার, হিমাংশুকে আই-বি-ইন্‌স্পেক্টার সারদাবাবুর বাড়ির ওপর লক্ষ্য রাখতে স্বচক্ষে দেখেছে।

সত্যি বলতে কি আমাদের পক্ষেও বাইরে থেকে লক্ষ্য রেখেই তাদের গতিবিধির পূর্বাভাস পাওয়া ছাড়া আর বেশি কিছু ফল লাভের আশা ছিল না। আগে থেকে তাদের গতিবিধির তৎপরতা দেখে তাদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যস্থল আন্দাজ করা সম্ভব হয়েছে বলেই হয়ত আমরা অনেক ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ, তারক ও অর্ধেন্দুকে সময় মত স্থানান্তরিত করতে পেরেছি এবং নিজেরাও যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করেছি। খুব ছোট শহর বলেই দুই পক্ষেরই পরস্পর ঐরূপ বাহ্যিক গতিবিধির ওপর প্রখর ও সজাগ দৃষ্টি রাখা সম্ভব হয়েছিল।

আমরা খুব ভাল করেই জানতাম যে, যতদিন পর্যন্ত তাদের সুদৃঢ় ব্যূহ ভেদ করে উপরমহলের কোন অফিসারকে হাত করতে সমর্থ না হ'ব, ততদিন আমাদের ঐ ব্যাপক কষ্টসাধ্য process-এর ওপর নির্ভর করেই সাংগঠনিক নিরাপত্তা বজায় রাখতে চেষ্টা করতে হবে। আমাদের জনৈক স্কুলের বন্ধু ও সহপাঠী কোন এক অ্যাসিস্‌টেন্ট সাব-ইন্‌স্পেক্টারের পদে নিযুক্ত ছিল। তার সঙ্গে গণেশের ও আমার সামান্য যোগাযোগ ছিল। তার মারফৎ আমাদের দলের মাত্র একজন সভ্য সম্বন্ধে সঠিক ও নির্ভুল সংবাদ জানতে পেরেছিলাম। এ ছাড়া উপরওয়ালা কোন পুলিশ অফিসার বা পলিটিক্যাল সেক্রেটারিয়েট্‌ ডিপার্টমেন্টের বড় কারোকে হাত করতে পারি নি।

এইরূপ অবস্থায় কেবলমাত্র সক্রিয় বাহ্যিক পাহারার ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে সন্তুষ্ট না থেকে আমরা একেবারে প্রথম থেকেই Strategic Diversion-এর জন্য, অর্থাৎ, শত্রুকে বিপথে পরিচালনা করার জন্য সুদক্ষ পন্থা নিলাম। অভ্যুত্থানের মাস দু'তিন আগে থেকে আমাদের চাল-চলন ঘোরাফেরা সব হাল্কা ধরনের করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে পুলিশকে বিভ্রান্ত করবার জন্যই আমরা বিভিন্ন বিলাসবহুল পোষাক পরিচ্ছদে সব সময় সেজে চলতে লাগলাম। ক্রীম, স্নো, পাউডার পুলিশের নজরে পড়বার জন্য 'কোঠারীর' ও 'ইজীক্যালের' দোকান থেকেই সব সময় কিনেছি। এই দুটি দোকান, গণেশের দোকান ও কোতোয়ালির মাঝপথে ছিল। কেবল যে ঐ সব কিনেছি তা নয়, স্নো-পাউডার যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহারও করেছি। রেস্টুরেন্টে খাওয়া, সিনেমা যাওয়া, থিয়েটার দেখা, গানের আসর বা যাত্রাগানে যোগ দেওয়া আমাদের কর্তব্যের মধ্যে নির্ধারিত ছিল। ঐরূপ কোন সুযোগ থাকলেই তা' যেন আমাদের যুবক-সাথীরা গ্রহণ করে তার জন্য নির্দেশ দেওয়া ছিল। এই সব না করে উপায়ও ছিল না। ঐগুলির অন্তরালেই ষড়যন্ত্রমূলক কাজ ও পুলিশের উপর নজর রাখা—

দুই-ই করতে হ'ত। বিশেষ করে এই কারণেই আমাদের প্রথম সারির সভ্যরা বাড়িতে থাকত না—এমন কি যাদের বয়স খুব কম তারাও রাত্রে বাড়ি ছেড়ে চলে আসত। এ ছাড়াও রাস্তায় চলা-ফেরা, গণেশের দোকানে বসে কথা বলা বা ক্লাবে ব্যায়াম করার সময় হৈ-হুল্লোড়, হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে অত্যন্ত হালকা পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করার প্রতি সব সময় লক্ষ্য ছিল আমাদের।

Diversion সৃষ্টির ওজর দেখিয়ে পান, তামাক, সিগারেট বা বিড়ি ব্যবহার করার সুযোগ যেন কোন সাথী না নেয় তার জন্য কিন্তু কঠোর নির্দেশ ছিল। হাল্কা জীবনযাত্রার অভিনয় করতে গিয়ে পাছে নিষ্ক্রিয় ও শিথিল জীবনের শিকার হয়ে পড়ি সেই দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখেছিলাম। আমাদের মধ্যে এই বিষয়ে মানসিক প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা হ'ত। মনে রাখা প্রয়োজন দু-বছরের মৃত্যু-সংকল্প নিয়ে যে সবুজ ও তরুণ বিপ্লবী যুবকদল সুসংগঠিত হয়ে উঠেছিল, তাদের পক্ষে পুলিশকে বিভ্রান্ত করার জন্য যেরূপ অভিনয় করা সম্ভব হয়েছিল, বাইরে লেবেল আঁটা তথাকথিত বিপ্লবী সংগঠনের প্রাপ্তবয়স্ক সভ্যদের পক্ষে সেরূপ অভিনয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মধ্যে ভয়াবহ ও শোচনীয় পরিণতির আশঙ্কা ছিল—মদ ও আনুষঙ্গিক প্রভাবের প্রাধান্যজনিত বিচ্যুতির বহু নজির আছে।

আমাদের এইরূপ অভিনয় করে চলা ছাড়া কোন উপায় ছিল না—কারণ, আমাদের এই অস্বাভাবিক জীবন-যাত্রার মাধ্যমে প্রমাণ হ'ত যে, আমরা বৈপ্লবিক কাজ-কর্মের ধার ধারি না—সব বখে যাওয়া ছেলের দল। পুলিশ মামলার সময় তাদের রিপোর্ট জাহির করে আমাদের ব্যাপক ষড়যন্ত্রের তীব্রতা প্রমাণ করতে গিয়েছিল, কিন্তু যুব-বিদ্রোহ ঘটে যাওয়ার পূর্বে কি পুলিশ সত্যি সত্যি আমাদের অস্বাভাবিক হাল্কা ধরনের জীবনযাত্রাকে কোন গুরুত্ব দিয়েছিল? সদরঘাট ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ও জনপ্রিয় নেতা, পদত্যাগের ভয় দেখিয়ে গণেশ ঘোষের কাছে চিঠি লিখলেন—
"..their wards..do not even stay at home at night and sometimes do such things which are against principles of morality.." (Judgement of our case. Page—10).

সুরেশবাবু লিখলেন, ছেলেরা রাত্রেও বাড়ি থাকে না এবং এমন সব কাজ করছে যা নৈতিক চরিত্রবিরুদ্ধ।

চট্টগ্রামের আই-বি পুলিশও যে বিভ্রান্ত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। তারা এই টোপটি গলাধঃকরণ করে বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্রমূলক কাজের সংবাদ সংগ্রহ করার চাইতে চট্টগ্রামের যুবকদের ভাল করার জন্য নিজেরাই নিজেদের moral sentry-র (নৈতিক চরিত্রের অতন্দ্র প্রহরী) পদে বহাল করা শ্রেয়ঃ মনে করলেন। তাই তাঁরা অভিভাবকদের কাছে গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বললেন ও তাঁদের ছেলেদের আমাদের প্রভাব মুক্ত করে নিতে উপদেশ দিলেন। পুলিশের অভিজ্ঞতা সীমার বাইরে—সাধারণের ধারণারও বহুদূরে—কি করে তারা ভাববে যে সারাদিন হৈ-চৈ, সিনেমা, থিয়েটার, রেস্টুরেন্টে খাওয়া, হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজবে মত্ত বখে যাওয়া একদল যুবক অতখানি দৃঢ়তার সঙ্গে চট্টগ্রাম শহরে বৃটিশ সরকারী

ঘাঁটি সব দখল করে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করার ষড়যন্ত্রে ব্যাপৃত আছে? এত হাল্কা চরিত্রের ছেলেরা কি কখনও মৃত্যু-সঙ্কল্প নিয়ে চরম আঘাত হানতে পারে? চরম আত্মত্যাগ করতে পারে?

সাধারণভাবে পুলিশের কাছে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবার জন্য সর্বপ্রথম এই পন্থা অবলম্বন করি। যদিও অভিভাবকদের কাছে তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হয়েছি সাময়িকভাবে, তবু চট্টগ্রামের সুদক্ষ ও বিচক্ষণ বৃটিশ পুলিশকে সফলতার সঙ্গে বিপথে পরিচালিত করতে যে আমরা সক্ষম হয়েছি তার ব্যাখ্যা করা আজ নিষ্প্রয়োজন। বাহ্যিক গতিবিধির রিপোর্টের ওপর পুলিশের নির্ভর করতে হয়েছিল বলে, আসল ষড়যন্ত্রমূলক কাজের সন্ধান স্থগিত রেখে moral sentry-র কর্তব্যে বেশি ব্যাপৃত থেকেই তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে।

পৃথিবীর কোন পুলিশই নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না, যে পর্যন্ত না তারা ষড়যন্ত্রমূলক বিপ্লবী সংগঠনের আভ্যন্তরীণ সংবাদের জন্য দলের কোন সভ্যকে এজেন্ট হিসেবে সংগ্রহ করতে না পারছে। চট্টগ্রামের বৃটিশ আমলের সুদক্ষ পুলিশ আমাদের সংগঠনের সুদৃঢ় প্রাচীর লঙ্ঘন করে প্রথম সারির কোন সভ্যকে বিশ্বাসঘাতকরূপে পাওয়ার চেষ্টা করেও বার বার বিফল হয়েছে।

পুলিশ প্রাথমিক সংবাদ সংগ্রহের কাজ শেষ করার পর আমাদের দলের কয়েকজন সভ্যের আর্থিক অবস্থা ও তাদের সাংগঠনিক উচ্চপদ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করেছে। তারপর চট্টগ্রামের পুলিশ কর্তারা নিয়মিতভাবে চেষ্টা করে চলেছিল আমাদের দলের ছেলেদের অর্থের লোভ দেখিয়ে হাত করার জন্য। পুলিশ তখনও জানে না যে, আমরা সশস্ত্র যুব-অভ্যুত্থানের প্রায় ছয় মাস পূর্ব থেকেই কোন নতুন ছেলেকে দলভুক্ত না করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। প্রথম থেকে যারা দলে ছিল তারা সবাই তখন নানা ধরনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে।

আই-বি সাব-ইন্‌স্পেক্টার রোহিণী ভৌমিক, আমাদের এক অতি দরিদ্র সাথী—সারদা শীলকে হাত করার চেষ্টা করল। সারদা শীল তখন বি-এ, (প্রথম বর্ষ) পড়ত। রোহিণীবাবু, কলেজ যাওয়ার কিছু আগে থেকেই, সারদা শীলের বাড়ির সামনে পাহারায় ব্যস্ত থাকত। কলেজ যাওয়ার সময় নানাভাবে সুযোগ করে সারদা শীলের সঙ্গে রোহিণীবাবু কথা ফাঁদলেন। তিনি সারদা শীলের আর্থিক দুরবস্থার কথা তুলে তার অভাবের জন্য সমবেদনা জানালেন—একটি টিউশানি তাকে দিতে চেষ্টা করবেন, তারপর অন্যান্যভাবেও সাহায্য করতে প্রস্তুত, ইত্যাদি ইত্যাদি বলার পর সারদা শীলের সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা দেখা করবার সময় ও স্থান ঠিক করলেন। সারদা শীল তখনই কলেজে গিয়ে তারকেশ্বর দস্তিদারকে সব কথা বল্‌ল। সে একটু বিচলিত হ'ল। তারককে সে আরও বল্‌ল যে, বোধহয় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করবে এবং সেই মনে করে তারকের কাছ থেকে সারদা শীল বিদায়ও চেয়ে নিল। সারদা শীলের মত তারকও অনভিজ্ঞ। তবু তারকের সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা ও বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা সারদা শীলের চাইতে অনেক বেশি প্রখর ও স্বাভাবিক। তারক যুক্তি দিয়ে সারদা শীলকে

বোঝাতে চেষ্টা করল, পুলিশ তাকে কোনমতেই গ্রেপ্তার করতে পারে না—তারা তাকে অর্থলোভ দেখিয়ে বশ করতে চায় ও গুপ্তচরের পদে বহাল করবার চেষ্টা করবে। সারদা শীল আমাদের দলের বিশ্বাসী সদস্য কিন্তু ভীতু প্রকৃতির। তারক তার স্নায়বিক দুর্বলতা উপলব্ধি করে আমাকে গিয়ে এই রিপোর্ট দিল। আমি তখন অর্ধেন্দু দস্তের বাসায় ছিলাম। সুখেন্দু দস্তিদারের বাড়িতে অর্ধেন্দু থাকত। সে তারকের সহপাঠী—কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র তারা। অর্ধেন্দুর বাড়িটি চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের একেবারে সন্নিকটে। তারক আমাকে এই রিপোর্টটি দেওয়ার পর জানাল যে, সারদা শীলকে সে এখানে আসতে বলেছে এবং এলে আমি যেন তাকে একটু চাঙ্গা ও হুঁশিয়ার করে দিই।

একটু পরেই সারদা শীল এল। আমি পুলিশের নানাপ্রকার কৌশল ও বিভিন্ন পন্থার কথা বলে তাকে সজাগ করে দিলাম। রোহিণীবাবু সারদা শীলের সঙ্গে কথা মত নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে দেখা করলেন এবং তাকে নিয়ে সোজা ডি-আই-বি ইন্‌স্পেক্টার সারদাবাবুর বাসায় গেলেন। সারদা শীল একটু বাদেই বুঝতে পারল যে, তাকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্য তাদের ছিল না—চেয়েছিল এজেন্ট হিসেবে পেতে। সারদা শীলের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর ডি-আই-বি মহাশয়রা বুঝতে পারলেন ঐটি বড় শক্ত ঠাঁই—সেখানে কিছু হওয়ার নয়।

তারপর এল মনোরঞ্জন সেনের পালা। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মনোরঞ্জন আমার প্রথম 'রিক্রুট'—অর্থাৎ, সমস্ত সুলক্ষণ দেখে প্রথম তাকেই দলভুক্ত করি। এই মনোরঞ্জনই জালালাবাদ যুদ্ধের পর কালার পোল (জুল্‌দা) যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। হেম দারোগা সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে জবানবন্দীতে বলেছে যে, যখন চোঙ্গা মুখে দিয়ে চিৎকার করে মনোরঞ্জনদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়, তখন এই চির-উন্নত শির বিপ্লবী বীর উত্তর দিল—'Monoranjan doesn't know how to surrender! Monoranjan wants to be a Jatin Mukherjee of Balassore!' (মনোরঞ্জন জানে না আত্মসমর্পণ কাকে বলে—মনোরঞ্জন বালেশ্বর খ্যাত যতীন মুখার্জীর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে)। পরক্ষণে হেম দারোগা তার বিবৃতিতে বলল—'দু'বার পর পর পিস্তলের আওয়াজ শোনা গেল! তারপর সব শান্ত নিস্তব্ধ! মনোরঞ্জন নিজের গুলীতে প্রাণ দিল!'

ডি-আই-বি ইনস্‌পেক্টার সারদাবাবু মনোরঞ্জনদের আর্থিক দুরবস্থার সুযোগ নেবার উদ্দেশ্যে একজন পুলিশে চাকুরে আত্মীয়কে খুঁজে বার করলেন। মনোরঞ্জনের বাবার কাছে টোপ ফেলতে সারদাবাবু সেই আত্মীয় পুলিশকে পাঠালেন। সংসারের অভাব-অনটন ও কঠিন দারিদ্র সহ্য করতে না পেরে অর্থের বিনিময়ে মনোরঞ্জনের বাবা তাঁর আত্মীয় পুলিশের কাছে স্বীকার করলেন তিনি তাঁর ছেলেকে রাজী করাতে চেষ্টা করবেন। পুলিশের প্রস্তাব ছিল—তাঁর ছেলে মনোরঞ্জন, অনন্ত সিংহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে এবং এই কারণে অনন্ত সিংহদের বৈপ্লবিক চক্রান্তের সংবাদ সে অতি সহজেই সরবরাহ করতে পারে। সে যদি পুলিশকে এইভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকে তবে পুলিশও তাদের যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করবে।

মনোরঞ্জনের বাবা কাতর হয়ে তাঁর ছেলের কাছে নিদারুণ অভাবের কথা জানালেন। মনোরঞ্জনই বাড়ির বড় ছেলে। পিতা, পুত্রের কাছে পুলিশের প্রস্তাবটি বিবৃত করে অর্থের বিনিময়ে মনোরঞ্জনকে আমাদের ষড়যন্ত্রমূলক কাজের গুপ্ত সংবাদ সরকারকে সরবরাহ করতে "অনুরোধ" করলেন।

মনোরঞ্জনের পিতা একি করলেন! মূর্খ সারদাবাবু, ততোধিক মোহ-গ্রস্ত ও ভ্রান্ত মনোরঞ্জনের পিতা! স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকের কাছে তাঁর একি প্রস্তাব! তখনই হয়ত এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, যদি সেইদিন সেই সময়ে মনোরঞ্জনের কাছে পিস্তলটি থাকত। তার বাবার কাছ থেকে এইরূপ জঘন্য প্রস্তাব সে কোনদিন শুনবে বলে আশা করে নি। পিতা—যাকে মনোরঞ্জন শ্রদ্ধা করেছে, অন্তরে পূজো করেছে, ভক্তি করেছে—সেই পিতা তাকে আজ বলছেন বিশ্বাসঘাতকতা করে অর্থ উপার্জন করতে! আগুনে ঘি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুন যেমন তীব্রভাবে জ্বলে ওঠে, ভয়ানক আকার ধারণ করে, মনোরঞ্জন তার পিতার থেকে ঐ প্রস্তাব শোনামাত্র রাগে, অভিমানে, দুঃখে, লজ্জায় ও ক্ষোভে এক ভীষণ মূর্তি ধারণ করল। তীব্র ভাষায় তার বাবাকে তিরস্কার না করে সে পারে নি। তৎক্ষণাৎ সে তার বাবাকে শাসিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল—বলে গেল, তাঁকে সে গুলী করবে!

সকাল দশটা, আমি তখন আমার নিজ বাড়িতে ছিলাম। মনোরঞ্জন ছুটে আমার কাছে এল। সে খুব উত্তেজিত—অশান্ত, অধীর! ক্রোধে তার কপালের শিরাগুলি ফুলে ফুলে উঠেছে। চোখ থেকে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসছে। সে আমার কাছে এসেই খুব অসংযত ও উত্তেজিত স্বরে বলল—

"আমাকে এক্ষুণি একটা পিস্তল দিন। আমার বাবাকে খুন করতে হবে!" এক নিঃশ্বাসে সে সবই বল্‌ল। তারপর অভিমানে দুঃখে সে একেবারে কেঁদে ফেল্‌ল। অভাব-অনটন, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ তার বাবাকে আজ কতখানি নিচে টেনে নামিয়েছে। তার অভিযোগ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, তার অন্তরের ক্ষোভ ক্রূর বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে, তার প্রকাণ্ড নালিশ পিতার অসহায় নীচ মনোভাবের বিরুদ্ধে!

মনোরঞ্জন বল্‌ল—"বাবাকে তাঁর দেশদ্রোহিতা করার নীচ প্রস্তাবের জন্য আজ আমার হাতেই মৃত্যু-বরণ করতে হবে—তাঁর প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন আছে, আমাকে এক্ষুণি একটি পিস্তল দিন। দেশদ্রোহী পিতারও পুত্রের হাতে নিষ্কৃতি নেই—এইটি ভবিষ্যৎ বিপ্লবী ভারতের কাছে আদর্শ হয়ে থাকুক। আমাকে একটি পিস্তল দিন!"

যা হোক্, মনোরঞ্জনকে শান্ত করতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত হয়ত আমার যুক্তি সে মন থেকেই মেনে নিয়েছিল। বললাম,—"অসহায় পিতা দারিদ্র্যের তাড়নায় হয়ত দুর্বল মুহূর্তে তোমাকে ঐরূপ ঘৃণ্য প্রস্তাব করে ফেলেছেন। কিন্তু তোমার স্বদেশপ্রেমের নিষ্ঠা ও আদর্শকে তাঁর একদিন শ্রদ্ধা করতেই হবে। সময়ে তিনি তাঁর ভুল বুঝবেনই। সেইদিন পুত্রের স্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ তাঁকে শিক্ষা দেবে—নতুন আলোর সন্ধান দিয়ে পথ দেখাবে।"

তারপর তাকে বললাম—"চল আজই একবার সারদাবাবুর ওখান থেকে ঘুরে আসি। তোমাকে আমাদের সঙ্গে দেখে বুঝবে যে, তুমি আমার কাছে সব ফাঁস করে দিয়েছ। তাহলে আর সেদিকে ঘেঁষতে সাহস করবে না।"

তাই করা হ'ল। সাপের মুখে 'জাড়ি' ছোঁয়ালে যা হয়—সারদাবাবুর মাথা নুয়ে পড়ল!

মনোরঞ্জনের বাবা সদর আদালতের একজন উকিল। দুর্বল মুহূর্তে ছেলের কাছে এক অপরাধ করেছেন। সেই অপরাধের কি ক্ষমা নেই? কোন প্রায়শ্চিত্তই কি তাঁকে সেই পাপ থেকে মুক্তি দেবে না? দেশদ্রোহিতার ক্ষণিক চিন্তাও বা মনে কেন এল? শত দুঃখ দারিদ্র যদি নিজের ছেলে হাসিমুখে মেনে নিতে পারে তবে বাপ হয়ে তা' তিনি পারবেন না কেন? তাঁর দুর্বল মুহূর্তের ভুল তিনি বুঝেছিলেন। যুব-বিদ্রোহের দিন থেকে বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অবধি ছিল না। তাঁর বীর ছেলের মহান্ আদর্শের পথ-নির্দেশ তাঁকে বিপ্লবীদের প্রতি আসক্ত করেছে—অনুপ্রাণিত করেছে। জুলদা (কালার পোল) যুদ্ধ প্রাঙ্গণে মনোরঞ্জনের মহান্ আত্মত্যাগের আদর্শ তাঁকে অনুভূতির চরম প্রান্তে নিয়ে গেছে। মনোরঞ্জনের বাবার স্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের কঠোর পরীক্ষার দিনও ঘনিয়ে এল।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার অম্বিকাদার গ্রেপ্তারের বিনিময়ে "খাঁ-বাহাদুর" পুরস্কারে ভূষিত করল পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার আসানুল্লাকে। এই খাঁ-বাহাদুর পুরস্কারের যাদুমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শত্রু আসানুল্লাকে প্ররোচিত করেছে চট্টগ্রামের বুকে অত্যাচার ও নিষ্পেষণের তাণ্ডব নির্বিবাদে চালাতে। তারই প্রতিশোধ নেওয়া হ'ল—আসানুল্লাকে হরিপদ ভট্টাচার্যের পিস্তলের মুখে প্রাণ দিয়ে তার অভিশপ্ত জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ল।

আসানুল্লার হত্যাকাণ্ডের পর চট্টগ্রামের শাসকবর্গ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল। নির্বিচারে সকলের ওপর বর্বরোচিত অত্যাচার চালিয়েছে। আসানুল্লার হত্যার পরদিন সকালে যখন সারা চট্টগ্রাম জুড়ে মর্মান্তিক অত্যাচারের বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়েছে, তখন একদল পুলিশ পাথরঘাটায় মনোরঞ্জনের বাড়িতে প্রবেশ করে। কোন বিশেষ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে পুলিশ মনোরঞ্জনের বাড়িতে ঢোকে নি। তারা সেইদিন যেখানে বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগের একটুও গন্ধ পেয়েছে, সেখানেই হানা দিয়ে বাড়ির সব জিনিষপত্র তছ্‌নছ্ করেছে এবং মনের আনন্দে তরুণ ও যুবকদের বিনা কারণে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেছে। মনোরঞ্জনের ছোট ভাই তখন মাত্র অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। তাকে, অর্থাৎ মনোরঞ্জনের ছোট ভাইকে, তার বাবার সামনে নিষ্ঠুরভাবে বেদম প্রহার করতে লাগল। এই নিদারুণ দৃশ্য দেখে বৃদ্ধ পিতা রুখে দাঁড়ালেন। আজই তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুলিশের সঙ্গে মোকাবিলা করবেন বলে মনস্থির করলেন। মুহূর্তে তিনি তাঁর পুত্রকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। কঠোর স্বরে তিনি পুলিশদের কাছে ঘোষণা করলেন—"প্রাণ থাকতে তোমাদের আমি আমার ছেলের একটি কেশও স্পর্শ করতে দেব না!"

মনোরঞ্জন সে সময় বেঁচে নেই। যদি বেঁচে থাকত তবে মনোরঞ্জন তার

পিতার এই বলিষ্ঠ মনের পরিচয় পেয়ে তাঁর সেই দিনের ক্ষণিক দুর্বলতাকে ভুলে গিয়ে গর্ব অনুভব করত নিশ্চয়ই।

মনোরঞ্জনের বাবার রোষদৃপ্ত চক্ষু, কঠিন প্রতিজ্ঞা, ক্রোধকম্পিত অধর দুটি পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছিল যে, প্রাণ থাকতে তিনি পুলিশের অত্যাচার প্রতিরোধ করবেন। পুলিশের সামনে ছেলেকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন—যেন সুদৃঢ় প্রাচীর! মনোরঞ্জনের বাবার 'বৃদ্ধং দেহি' ভাব বৃটিশ পুলিশের সম্মানে ও ঔদ্ধত্যে কঠোর আঘাত হানল। সার্জেন্ট কেলী সাহেবের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করল। পিতা নিরপরাধ ছেলের প্রতি বর্বরোচিত পুলিশ অত্যাচার স্বচক্ষে দেখতে অস্বীকার করেছেন—অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষীণ প্রতিবাদ মাত্র মুখে জানিয়েছেন! বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি 'গোলাম ভারতবর্ষের' প্রতিবাদ শুনতে অভ্যস্ত নয়—বৃহদাকার সার্জেন্ট কেলী, মনোরঞ্জনের বাবার বুক লক্ষ্য করে সজোরে বুটের লাথি বসিয়ে দিলেন। মনোরঞ্জনের বৃদ্ধ বাবার দুর্বল দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তিনি তখনই মারা গেলেন।

মনোরঞ্জন স্বদেশপ্রেমের একনিষ্ঠ আদর্শে তার পিতাকে দীক্ষা দিয়েছিল। বৃদ্ধ পিতা ক্ষ্যাপা আক্রমণমুখী পুলিশদের পিস্তল, রাইফেল দেখেও সেদিন ভয় পান নি। প্রতিবাদ করেছেন, সংগ্রামে তাদের আহ্বান করেছেন; ছেলের জীবন রক্ষার্থে পুলিশের সামনে নিজের বুক পেতে দিয়েছেন। শহীদ পুত্রের ধন্য শহীদ পিতা!

সারদা শীল আমাদের যুবক সাথী।' তাকে প্রলোভন দেখিয়ে দলের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে প্ররোচিত করতে গিয়ে ডি-আই-বি সাব-ইন্‌স্পেক্টার রোহিণীবাবু শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হলেন। তারপর স্বয়ং ডি-আই-বি ইন্‌স্পেক্টার সারদাবাবু আসরে নামলেন। সারদাবাবু কোন এক আত্মীয় পুলিশ অফিসার মারফৎ মনোরঞ্জনের বাবার কাছে মনোরঞ্জনকে উপযুক্ত মূল্যে তাঁদের কাছে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য 'বিক্রি' করবার প্রস্তাব পাঠালেন। সারদাবাবুও এই ক্ষেত্রে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করলেন—দেশপ্রেমের দুর্ভেদ্য প্রাচীর লঙ্ঘন করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব হ'ল না।

তবুও সরকারী চাকরীর খাতিরে ও উন্নতির আশায় উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী কি নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে? তারাও কি ছেলেবেলা থেকে স্কুলে মুখস্থ করে আসে নি—"Failure is the piller of success!" অকৃতকার্যতা ভবিষ্যৎ সাফল্যের স্তম্ভস্বরূপ! সারদাবাবু এবার আমাদের তরুণ সদস্য ভবতোষ ভট্টাচার্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। ভবতোষ ও আশুতোষ দুই ভাই। ভবতোষ—ছোট ভাই, সংগঠনের প্রথম সারির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই দুই ভাইয়ের পিতা সদরঘাট কালীবাড়ির মালিক ও পূজারী বা মোহন্ত। এরা আবার ডি-আই-বি ইন্‌স্পেক্টার সারদাবাবুর আত্মীয়। আমাদের দলের সঙ্গে ভবতোষ ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা করা তাদের পক্ষে খুব কঠিন ছিল না। ব্যায়ামচর্চা ক্লাবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে, মার্কামারা মোটর গাড়িতে, গণেশের দোকান প্রভৃতি স্থানে ভবতোষের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা তা'রা লক্ষ্য করেছে।

সারদাবাবু তাঁর নিজের আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে ভবতোষের বাবা, মা, দাদা ও বোনেদের সবাইকে কোন-এক ছুটির দিনে নেমন্তন্ন করলেন। আপন-

ছেলেকে নেমন্তন্ন করবেন তাতে আপত্তির কি আছে। আপত্তি যদি কারো থাকেও বা তা' তিনি শুনবেন কেন? আমাদের অবশ্য আপত্তি নয়, তবে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল। ভেবে নিয়েছিলাম গুপ্ত বিভাগের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার সারদাবাবু, এবারে অন্তত খুব আটঘাট বেঁধে অতি সন্তর্পণে ও সতর্কতার সঙ্গে পা বাড়াবেন। এবং সেই জন্যই ভবতোষদের বাড়ির সকলের তাঁর বাড়িতে এই সামাজিক নেমন্তন্ন।

আমরা এই নেমন্তন্নের কথা ভবতোষ ও তার দাদা—আশুতোষের কাছে জেনেছিলাম। ভবতোষেরা কালীবাড়ির পেছনে, তাদের নিজেদের বাড়িতে থাকত। কালীবাড়িটি আবার মাখন ঘোষালদের বাড়ির উল্টোদিকে, রাস্তার অপর পারে। গণেশের দোকান এই বাড়ি থেকে হাঁটা পথে প্রায় দু' মিনিটের রাস্তা। সারদাবাবুর বাড়িতে নেমন্তন্নের দিন যে সময়ে ভবতোষেরা সেখানে যাবে ও সেখান থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরে আসবে, সেই সময়টা লক্ষ্য রাখবার জন্য মাখনকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম যে, ঐ সময়ে আমি গণেশের দোকানে উপস্থিত থাকব, যাতে ভবতোষেরা ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে মাখন আমাকে খবর দিতে পারে।

এটা বোঝা কঠিন নয় যে, ভবতোষ ঘুণাক্ষরেও এইরূপ বন্দোবস্ত সম্বন্ধে জানতে পারে নি। ভবতোষ আমাদের প্রথম সারির সদস্য। তাই বলে mutual vigilence (পারস্পরিক সজাগ দৃষ্টি) রাখব না, তা' কখনও হতে পারে না। এই বিষয় ভবতোষ জানতে পারলেও সে যে আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হ'ত না, সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। যারা বয়সে বড় ও অভিজ্ঞ ছিল তারাও তাদের প্রতি এইরূপ সতর্ক দৃষ্টি রাখবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। আমরা সকলেই mutual vigilence system-কে মেনে চলেছি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কাজ সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করবার জন্য mutual vigilence system আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের সংগঠনে প্রচলিত করেছি। এতে আপত্তি বা ভয়ের কি আছে? আমার বিপ্লবী বন্ধুরা আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখুক, আমাকে পরীক্ষা করে নিক—এই আমাদের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী হওয়া উচিত। তাই এইরূপ পারস্পরিক সতর্কতা ও সজাগ দৃষ্টি রাখবার জন্য আমরা, যারা প্রথম আক্রমণ-ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করবার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলাম, স্বেচ্ছায় ও আনন্দের সঙ্গে mutual vigilence system-কে ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠনের এক অপরিহার্য অঙ্গ বলে মেনে নিয়েছিলাম।

ভবতোষ ও তাদের বাড়ির সবাই 'সামাজিক নিমন্ত্রণ' রক্ষা করতে আই-বি-ইন্‌স্পেক্টার সারদাবাবুর বাড়িতে যথা সময়ে গেলেন ও ফিরে এলেন এবং যথা সময়েই, পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী, মাখন আমার কাছে খবর পৌঁছে দিল—ভবতোষ ফিরে এসেছে। তখন বেলা প্রায় দুটো-তিনটে হবে। আমি কাল-বিলম্ব না করে সাইকেলে কালীবাড়ি গিয়ে ভবতোষকে ডেকে পাঠালাম। সে হাসতে হাসতে আমার কাছে এল। সব সময়েই তার হাসি মুখ। এখনও সেই একই হাসি না কি তাতে কোন পার্থক্য আছে, তা' আমি নিরীক্ষণ করছিলাম। ভবতোষের কি-ই বা বয়স—স্কুলে পড়ছে তখনও। পুলিশের কাছে সে যদি কোন দুর্বল মুহূর্তে তাদের জঘন্য প্রস্তাবে মত দিয়ে থাকে, তবে এই

অল্পক্ষণ সময়ের ব্যবধানে আমার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে হাসি ও সহজভাব বজায় রাখা তার পক্ষে সম্ভব হ'ত না।

ভবতোষকে আরও পরীক্ষা করে দেখবার জন্য নানা প্রকার প্রশ্ন করলাম—কতক্ষণ ছিল, কখন খাওয়া হ'ল, পাতে বসার আগে কার সঙ্গে কথা হয়েছে, নেমন্তন্ন শেষ হওয়ার পর কে কি বল্‌ল, সারদাবাবু সবচেয়ে বেশি কথা কা'র সঙ্গে বলেছেন, বিশেষভাবে তার সঙ্গে সারদাবাবু কতক্ষণ কি কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন, একান্তে তার সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগ সারদাবাবু নিয়েছেন কি না, তাকে সারদাবাবু আবার তাঁদের বাড়ি যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কি,—ইত্যাদি, ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন করেছি ভবতোষকে। প্রশ্ন করা ও তার বিভিন্ন উত্তর দেওয়ার সময় আমার তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ভবতোষের ওপর। তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছিলাম। বিশেষ বিশেষ প্রশ্নে তার ভাববৈলক্ষণ্য ঘটে কি না বা কোন সন্দেহের উদ্রেক করে কি না, মনে মনে তার দ্রুত বিশ্লেষণ করে যাচ্ছিলাম।

সারদাবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই পরীক্ষায় ভবতোষ সন্দেহাতীতভাবে উত্তীর্ণ হ'ল। তার কাছে জানলাম, সারদাবাবু, বিশেষ করে তার সঙ্গে, খুব হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ করেছেন। ভবতোষকে তাঁদের বাড়িতে বেড়াতে যেতে বলেছেন ও মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি যে খুব খুশি ও আনন্দিত হবেন তাঁও বার বার জানিয়েছেন।

সেইদিনই ভবতোষকে সারদাবাবুর "মহৎ উদ্দেশ্যের" কথা ভালভাবে বুঝিয়ে দিলাম এবং সারদাবাবুর আমন্ত্রণ ভবিষ্যতে কিভাবে সে চালাকি করে এড়িয়ে যাবে সেই সম্বন্ধেও কতকগুলো উপদেশ দিলাম। এই ঘটনার পর, দিন সাতেকের মধ্যে, যুব-বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। তাই সারদাবাবুর "মহৎ উদ্দেশ্য" কাজে পরিণত হওয়ার সুযোগ আর আসে নি।

আগেই বলেছি, যুব-বিদ্রোহের প্রায় ছয় মাস পূর্বে, যখন থেকে আমরা সশস্ত্র প্রস্তুতির কাজ আরম্ভ করলাম, তখন থেকেই নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, নতুন আর কাউকে দলে গ্রহণ করব না। প্রথম সারিতে মনোরঞ্জনের মত সক্রিয় সভ্যদের শিক্ষা দিয়ে ও বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করে গ্রহণ করেছি। তাদের বিশ্বস্ততার দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাচীর ভেদ করা শত্রু-পক্ষের কাছে সম্ভব ছিল না। তা' ছাড়া পুলিশ জানত না যে, আমরা যখন থেকে সক্রিয় সশস্ত্র প্রস্তুতির কাজ আরম্ভ করেছি, তখন থেকে আর নতুন রিক্রুট দলে নিচ্ছি না। এই কারণে দলের সভ্যদের টাকা দিয়ে ও নানা প্রলোভন দেখিয়ে হাত করতে গিয়ে নিষ্ফল হওয়ার পর পুলিশ এক নতুন কৌশল নিল।

সদরঘাট ক্লাবে বিকেলবেলা ব্যায়াম চর্চা প্রতিদিনই হ'ত। তবে যুব-অভ্যুত্থানের পূর্বে ছয়টি মাস ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে আগের মত উৎসাহ ছিল না। কারণ, প্রথম সারির সক্রিয় যুবক সভ্যরা নানা ধরনের গুপ্ত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ল, আর আমরাও প্রতিদিন ঠিক সময় ক্লাবে হাজির হতে পারতাম না। তবু প্রায় সব দিনই নিয়ম রক্ষার্থে ক্লাবে যেতাম এবং নিয়মিত নুন্যতম ব্যায়াম করতাম। পুলিশ ও অভিভাবকদের কাছে ক্লাবের বহিঃপ্রকাশটি বজায়

কাজের জন্য যেটুকু না করলে নয়, তা আমাদের শেষদিন পর্যন্ত করতে হয়েছে।

দু' তিন-দিন ধরে ক্লাবে একটি নতুন ছেলে আসতে আরম্ভ করেছে। সুন্দর স্বাস্থ্য, ছোট ছোট করে চুল কাটা, খদ্দরের পাঞ্জাবী পরা। ছেলেটি খুব চটপটে আর মুখে হাসি লেগেই আছে। এই ছেলেটির নাম ভুলে গেছি। এককথায় বলতে গেলে আপাতদৃষ্টিতে তাকে দেখে আমার মনে হচ্ছিল সে যেন দ্বিতীয় মনোরঞ্জন সেন। নতুন কাউকে রিক্রুট করা হবে না বলে যদি নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া না হ'ত তবে ক্লাবের এই নতুন আগন্তুকটিকে দলে নেওয়ার জন্য আমি নিশ্চয়ই সচেষ্ট হ'তাম। এই ছেলেটি, বিশেষ করে আমার সঙ্গে, অদ্ভুত ব্যবহার করতে লাগল। সব সময় আমার কাছে কাছে আছে, নানাভাবে তার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য সে চেষ্টা করছে—কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, জিমনাস্টিক্ প্রভৃতিতে তার পারদর্শিতা দেখিয়ে। ব্যায়াম করবার পর প্রায় দিনই আমরা নদীর ধারে বা সদরঘাট জেটিতে বেড়াতে যেতাম। এই সময়েও সেই ছেলেটি আমার পাশে পাশে হেঁটে চলেছে—কখনও ছেলেমানুষের মত উৎসাহ ভরে আমার হাত ধরেছে—কত কথা, কত গল্প, কত তার হাসি!

জানি না এই ছেলেটির প্রতি অজান্তে কোন অবিচার করেছি কি না! বাহ্যত ছেলেটির সব রকম বিপ্লবী সুলক্ষণ থাকা সত্ত্বেও আমার মনে হ'ল সে যেন ডি-আই-বি সাব-ইন্‌স্পেক্টার রোহিণীবাবুর একজন trained (শিক্ষিত) ছেলে; সে আমাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে চায় যাতে আমি তাকে রিক্রুট করে নিজেই ফাঁদে পড়ি। সেই ছেলেকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কেন আমার মনে হয়েছিল যে, অত পুলিশ অফিসার থাকা সত্ত্বেও সে রোহিণীবাবুরই লোক হবে—এর কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ নেই। Intutively আমার তাই মনে হয়েছিল। হয়ত সেই ছেলে সত্যিই খুব ভাল ছিল—সেও হয়ত আজ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদ বা যোদ্ধা নামে পরিচিত হ'ত। কে জানে হয়ত সেই ছেলে কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছে এবং দেশের একজন বরেণ্য নেতা হয়েছে! কর্তব্যের খাতিরে আমাকে কঠোর হতে হয়েছে—পুলিশ টোপ ফেলেছে মনে করে আমি তাকে বর্জন করেছি। এতদিন পরে নানা ঘটনা ও পুলিশের কৌশলাদির উল্লেখ করতে গিয়ে এই ছেলেটির বিষয় আমি লিখলাম। আমার অনিচ্ছায় যদি তার প্রতি ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ কোন অন্যায় বা অবিচার সেইদিন হয়েও থাকে, তবে তার জন্য আমাকে দেশবাসী ক্ষমা নিশ্চয়ই করবে।

অ-নামী এই ছেলেটি সম্বন্ধে এত কথা লিখলাম তার কারণ—এইরূপ আর একটি ঘটনা থেকে প্রমাণ করেছিল যে, নীতিগতভাবে যাকে দলভুক্ত করিনি সে-ই আজ জলুদার (কালার পোল) রণক্ষেত্রে অমর হয়ে আছে। সে হচ্ছে স্বদেশ রায়, দেবপ্রসাদ গুপ্ত প্রমথের সহপাঠী। দেবু ও নরেশ রায়দের সঙ্গে সে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশত। নরেশ রায় তার সঙ্গে বিশেষ ভাবে মিশেছে। দলভুক্ত করবার জন্য যেভাবে সে যুগে কথা বলতাম, নরেশ স্বদেশ রায়ের সঙ্গে দিনের পর দিন সেভাবে আলোচনা করেছে। নরেশ বুঝতে পেরেছিল যে, স্বদেশ রায় প্রথম শ্রেণীভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত এবং সে নিশ্চয়ই

অনায়াসে যুব-অভ্যুত্থানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে। নরেশ একদিন খুব সঙ্কোচের সঙ্গে আমার কাছে প্রস্তাব করল—"দেখুন আমি জানি নতুন রিক্রুট এখন আর গ্রহণ করা হবে না। আমি স্বদেশ রায়ের সঙ্গে প্রায় চার মাস খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি—অনেক কথা হয়েছে। আমার মনে হয় সে দলভুক্ত হওয়ার উপযুক্ততা অর্জন করেছে। সেই কারণে আমার ইচ্ছা আপনি নিজে তার সঙ্গে মিশে তাকে একটু পরীক্ষা করে দেখুন। যদি আপনি মনে করেন তাকে সভ্যপদ দেওয়া যায় এবং সশস্ত্র আক্রমণের জন্য তার উপযুক্ততার অভাব নেই, তবেই তাকে আমরা গ্রহণ করব।"

নরেশ তার প্রস্তাব শেষ করবার পর আমি বল্‌লাম—"দেখ নরেশ, আমি চাই না নতুন কাউকে আর দলে নেওয়া হোক্‌। আমার বিশ্বাস পুলিশ শিখিয়ে-পড়িয়ে যুবকদের আমাদের কাছে পাঠাচ্ছে, যেন আমরা তাদের টোপ গিলি। স্বদেশ রায় কলেজের পড়া ছেড়ে এখন তার দাদার সঙ্গে বাড়ি তৈরি করার কনট্রাক্‌টারী ব্যবসা করছে। সে টাকা উপার্জন করতে শিখেছে। এ রকম যুবকদের এখন দলের গুপ্ত কাজে নেওয়া মারাত্মক ভুল হবে।"

হোক্‌ না কেন স্বদেশ রায় একজন কনট্রাক্‌টার—নরেশ যে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে! নরেশ আমার কঠোর নীতিগত প্রশ্নকে উপেক্ষা করতে পারছিল না বটে, কিন্তু কোনমতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছিল না যে, স্বদেশ রায় পুলিশের চর। নরেশের মনোভাব আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তাই নরেশকে আমি বল্‌লাম—"দেখ নরেশ, তুমি যদি দায়িত্ব নাও, তবে স্বদেশকে অভ্যুত্থানে অংশ নিতে নির্বাচন করতে পার, তাতে আমার আপত্তি নেই।" নরেশ রায়ের দায়িত্বজ্ঞান, বিচক্ষণতা ও বিচারবুদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণ আস্থা ছিল বলেই স্বদেশ রায়ের ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম করতে রাজী ছিলাম যদি নরেশ নিজে ব্যক্তিগতভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিত।

কিন্তু নরেশ উত্তর দিল,—"সে দায়িত্ব আমি তো নিতে পারব না। আপনারই সে বিবেচনা করতে হবে। তাই আপনাকে তার সঙ্গে একবার একটু মিশে দেখতে বলছি।" নরেশের আগ্রহের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তার প্রস্তাবে আমি রাজী হতে পারলাম না। তাকে বল্‌লাম—"আমার বিন্দুমাত্র সময় নেই। একটু মিশলাম আর স্বদেশকে বুঝে নিলাম—এইরূপ ভাবা তোমার ভুল। তার সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত দিতে হলে আমার বেশ কিছুদিন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হবে। সেই সময় আমার কোথায়? তাই তোমার একার দায়িত্বে তাকে নিতে হবে, আর নইলে স্বদেশ রায়কে আমরা গ্রহণ করতে পারি না।" শেষ পর্যন্ত অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করতে স্বদেশকে নির্বাচন করা হ'ল না।

বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতিতে বাছাই করার সময় একজনও ভুল নির্বাচিত হওয়ার চাইতে সহস্র বিশ্বাসী বাদ পড়াও সহস্রগুণে শ্রেয়—এই কঠোর নীতি অনুযায়ী স্বদেশ রায়ও বাদ পড়ে গেল।

প্রত্যক্ষভাবে এই ক'টি ঘটনা বা পুলিশের চক্রান্তের কথা আমরা জানতাম এবং সেইসব চক্রান্তকে আমাদের যুবক-সাথীরা ব্যর্থ করেছে। সারদা শীল, মনোরঞ্জন সেন ও ভবতোষ ভট্টাচার্য পুলিশী চক্রান্তকে নিষ্ফল করে দিল। সদরঘাট ক্লাবে নতুন আমদানী 'সেই ছেলেটি' আমাকে আকৃষ্ট

করতে চেয়েছিল, পারে নি। নীতিগতভাবে আর কাউকে নেওয়া হবে না বলে স্বদেশ রায়কে আমরা বাদ দিলাম। এইভাবে আমাদের সাংগঠনিক দুর্গের প্রাচীর আমরা আরও দৃঢ় করে তুললাম। এমন সময় গণেশ ও আমি অত্যন্ত বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেলাম, প্রকাশ্য ফ্রণ্টে আমাদের দলের একজন বিশিষ্ট যুবক-সাথী ডি-এস-পি'র সঙ্গে গোপনে সংযোগ রক্ষা করে চল্‌ছে। আমাদের এক সহপাঠী আই-বি বিভাগে এ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট সাব-ইন্‌স্পেক্টারের পদে নিযুক্ত ছিল। প্রথমে গণেশ তার মারফৎ এই খবরটি পায়। পরে গণেশ ও আমি এক সঙ্গে তার কাছ থেকে আমাদের দলের যুবকসাথীটির নাম-ধাম সব পেলাম। আমাদের সহপাঠী পুলিশ কর্মচারী আমাদের আরও জানাল, কোন্‌ কোন্‌ সময় ও কোথায় সচরাচর যুবকটি ডি-এস-পি মহাশয়ের সঙ্গে গোপনে মিলিত হয়। কর্ণফুলী নদীর তীরে কয়েকটি জায়গায় এবং ইউরোপীয়ান পল্টনে সাহেবদের টেনিস্‌ খেলার মাঠ-সংলগ্ন ছোট্ট ঘরটিতে—যেখানে সাহেবরা পোষাক বদলাত এবং চা, সোডা, লেমনেড, হুইস্কি প্রভৃতি পান করত, সেইসব স্থানে তারা গোপনে মিলিত হ'ত। এই ঘরটি, খেলার পর, সন্ধ্যায় খালি পড়ে থাকত। সন্দেহ ভঞ্জন করবার জন্য নিজের চোখে দেখব বলে স্থির করলাম। গণেশ ও আমি সেই বিশিষ্ট যুবক-সাথীকে ডি-এস-পি'র সঙ্গে মিশতে দেখেছি।

সারদাবাবু ও রোহিণীবাবু যদি আমাদের দলের একজনকেও তাদের চর হিসেবে ব্যবহার করতে পারতেন, তবে আমাদের অজান্তে হয়ত অনেক গোপন তথ্যই সংগ্রহ করতে তাঁরা সমর্থ হতেন। যদি দলের এই বিশিষ্ট যুবকের সংবাদ আমরা পূর্বাহ্নে জানতে না পারতাম তবে যে আমাদের অনেক ক্ষতি হ'ত—এমন কি চট্টগ্রামে যুব-বিদ্রোহও যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হ'ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন আগেই আমরা তার স্বরূপ জেনে ফেললাম, তখন তাকেই আবার পুলিশী চক্রান্ত ব্যর্থ করবার কাজে খুব সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহার করলাম। এই যুবকটি কংগ্রেস অফিসের কাছেই থাকত। মাস্টারদার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে সে চল্‌ত। বলা বাহুল্য, আমরা মাস্টারদাকে সঙ্গে সঙ্গে তার আসল স্বরূপ জানিয়ে দিলাম।

পুলিশের সঙ্গে তার গোপন সম্পর্কের কথা জানবার পর আমরা সেই যুবকটির সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করবার অভিনয় করতে থাকি। তাকে আমরা নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করি যে, তার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে এবং অনেক গোপন কথাও তার সঙ্গে বিশ্বাস করে আলাপ করি।

১২ই মার্চ, ১৯৩০ সাল। গান্ধীজীর সেই জগদ্বিখ্যাত 'ডাণ্ডী অভিযান' সুরু হ'ল। উনআশিজন বাছাই করা সত্যাগ্রহী গান্ধীজীর নেতৃত্বে দু' শ' মাইল পথ চব্বিশ দিনে অতিক্রম করে ৫ই এপ্রিল ডাণ্ডী পৌঁছলেন। ইতিমধ্যে সারা ভারত জুড়ে লবণ-আইন ভঙ্গ করবার জন্য প্রস্তুতি চলেছে। ৬ই এপ্রিল ডাণ্ডী সমুদ্র উপকূলে গান্ধীজীর নেতৃত্বে প্রথম লবণআইন ভঙ্গ করা হ'ল। লবণ-আইন ভঙ্গ করার এই সংগ্রামী সঙ্কেত সারা ভারতের বিক্ষুব্ধ জনতাকে উদ্বুদ্ধ করে তুল্‌ল। চট্টগ্রামে অনুশীলন পার্টির নেতৃত্বে কংগ্রেসের এক অংশ লবণ-আইন অমান্য করার জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন

স্বেচ্ছাসেবক শিবির স্থাপন করে এবং লবণ-আইন ভঙ্গ করতে সুরু করে।

মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম জেলা-কংগ্রেসের আর একটি অংশ, সুভাষ-পন্থীরা, তখনও লবণ-আইন ভাঙবার জন্য প্রস্তুত হয় নি। আমরা তখন সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত। লবণ-আইন ভঙ্গের কথা আমরা সেই সময় ভাবতেও পারি নি। কিন্তু তাই বলে সারা ভারত যেখানে লবণ-আইন অমান্য করবার অভিযান সুরু করেছে সেখানে জেলা-কংগ্রেস সেক্রেটারী সূর্য সেনের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ না হলে আমাদের বিরুদ্ধে পুলিশের সন্দেহ উদ্রেকে আরও বেশি সাহায্য করা হবে।

সেইজন্য এই সময়ে ও এই পরিপ্রেক্ষিতে দলের সেই বিশিষ্ট পুলিশ-প্রভাবান্বিত যুবকটিকে বিভ্রান্ত করবার জন্য আমরা তার সঙ্গে খুব গুরুত্ব দিয়ে আইন-অমান্য সংগ্রাম চালাবার নীতি ও কৌশল স্থির করার ব্যাপারে গোপন মন্ত্রণাকক্ষের এক অভিনয় করলাম। বলা বাহুল্য, তাকে আমরা বিপথে পরিচালিত করতে চেয়েছিলাম—সে যেন আমাদের আইন-অমান্য সংগ্রামের মিথ্যে প্ল্যানটি সম্বন্ধে তার ডি-এস-পি প্রভুকে রিপোর্ট করে। আমরা তাকে আমাদের "গোপন প্ল্যান" ও "সিদ্ধান্ত" এইভাবে জানালাম—"আমরা লবণ-আইন অমান্য করবার কর্মসূচী বর্জন করছি এবং তৎপরিবর্তে রাজ-দ্রোহাত্মক আইন-অমান্য করবার প্রোগ্রাম গ্রহণ করব। আমরা চাই আমাদের বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রচার। গান্ধীজীর অহিংসাবাদকে আমাদের expose (উদ্ঘাটন) করতে হবে। রক্তাক্ত বিপ্লব ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা লাভ করা যাবে না—এইরূপ প্রচাব করবাব সুযোগ আমাদের নিতে হবে। গান্ধীজী Sedition Law (রাজদ্রোহাত্মক-আইন) ভাঙবারও নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমরা ঠিক করছি সভা ডাকব, আইনতঃ নিষিদ্ধ সব বই জনসাধারণের সামনে পড়া হবে ও আমরা বাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতা দিয়ে কারাবরণ করব। সেইজন্য আমাদের স্বেচ্ছাসেবক শিবির স্থাপন করতে হবে ও জেলে যাওয়ার জন্য ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহ করবার সক্রিয় কর্মপন্থা নেওয়া অপরিহার্য। গোপনে রিজার্ভ বাহিনীও গঠন করতে হবে তা' নইলে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া যাবে না। রিজার্ভ বাহিনীব চার্জ বিশেষ করে তোমাকেই নিতে হবে।"

আজ দ্বিধাহীনচিত্তে জোর করে বলতে পারি ডি-এস-পি মহাশয় আমাদের ফাঁদে ফেলতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেই আমাদের চালে পরাস্ত হয়েছেন ও তাঁকে যে আমরা বিপথে পরিচালিত করতে পেরেছিলাম তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

পুলিশকে বিভ্রান্ত করবার এই চাল ও কৌশলকে আরও বিশ্বাসযোগ্য-ভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী জেলা-শাসকদের কাছে পরিবেশন করতে চেয়েছি। আমাদের হেড কোয়ার্টারের সভায় গণেশ প্রস্তাব করল যে, রণ-নীতির প্রয়োজনে জেলা-শাসকদের বোকা বানাতে হবে—তাদের সফলতার সঙ্গে বিপথে পরিচালিত করতে হবে। গণেশের প্রস্তাব মতে ডি-এস-পি মহাশয়কে আমরা লবণ-আইন ভাঙবার সংগ্রামকে মিথ্যা সাজিয়ে রাজদ্রোহাত্মক আইন-অমান্য সংগ্রামে পরিণত করবার রণকৌশলের গোপন কর্মসূচী তাঁরই চর মারফত জানিয়েছি। এই মিথ্যা কর্মসূচী আরও বেশি বিশ্বাস করবার জন্য গণেশ

প্রস্তাব করল যে খুব তাড়াতাড়ি একটি অনুরূপ প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিলি করা হোক্। আমরা সবাই গণেশের এই প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিলাম।

গণেশকে এই প্রচারপত্র লিখে ছাপাবার ভার দেওয়া হ'ল বা সে নিজেই সেই ভার নিল। দু-এক দিনের মধ্যেই সে প্রচারপত্র লিখে ছেপে ফেল্‌ল। সেই সবগুলি আমরা এমন ভাবে বিলি করলাম যাতে জনসাধারণ সেগুলি পাক আর নাই পাক, পুলিশ যেন নিশ্চয়ই পায়। আমরা নিজেরাই যেচে-সেই বিশেষ প্রচারপত্রটি কোন কোন পুলিশকে দিয়ে দিলাম।

আমাদের মামলার রায় থেকে এই বিষয় সম্বন্ধে একটু উদ্ধৃত করছি—

"On 17th April printed leaflets with the heading CHATTAL BASHIDER PRATI (to the people of Chittagong) and the names of Surjya Sen, Ambika Chakravarti and Ganesh Ghosh as signatories were distributed in the town. The following morning Abdul Azim obtained one from Ganesh Ghosh [Exh. CDLV (4)]. The leaflet states that the trumpet call of independence has been heard throughout the land, and on every side the war of Civil Disobedience has commenced, that it is a matter of regret and shame that Chittagong, the pioneer of independence in 1921 should lay behind in the struggle; and that about a month previously a Satyagraha Committee had been formed for the purpose of disobeying the Salt Law.

"'We shall wait some days more', the leaflet goes on, 'to see what that Committee does. But in Calcutta and other places disobedience of laws other than the Salt Law —for example, the law of sedition—has begun. We want to commence disobedience of the sedition law in Chittagong also without delay.

"'For this purpose we require the sympathy of the public of all classes—we want Satyagrahi soldiers. We hope the public will help us with men and money. Those willing to be volunteers should see any of the undersigned by 21st April next.'"

(Judgement in Armoury Raid Case, No. 1 of 1930. PP. 11 & 12).

'চট্টলবাসীদের প্রতি'—শিরোনামা দিয়ে বাংলায় লিফ্‌লেট্ ছাপান হয়েছিল। সেই প্রচারপত্রের স্বাক্ষরকারী ছিলেন সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী ও গণেশ ঘোষ। সদর কোতোয়ালির ইনচার্জ—আব্দুল আজিম সাহেব, ১৮ই তারিখ সকালবেলা এই প্রচারপত্রের একটি শ্রীগণেশ ঘোষের নিকট হ'তে পান। জজসাহেব প্রচারপত্রের প্রথম দিকের সারাংশ তাঁর ভাষায় ব্যক্ত করে দিয়েছেন—প্যাম্ফ্লেটে লেখা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষাণ বেজে উঠেছে

এবং দিকে দিকে আইন-অমান্য সংগ্রাম সুরু হয়েছে। কিন্তু ১৯২১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত চট্টগ্রামবাসীর পক্ষে খুব দুঃখ ও লজ্জাকর কথা যে আজ তাঁরা সংগ্রামে পেঁছিয়ে আছেন। প্রায় এক মাস আগে লবণ-আইন অমান্য করার জন্য চট্টগ্রামে সত্যাগ্রহ কমিটি গঠিত হয়েছে। জাজ্‌মেন্টে প্রথম দিকের সারাংশটুকু এইভাবে লেখবার পর ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট প্রচারপত্রের বাকিটুকু যা' লিখেছিলেন তার অনুবাদ—

'সত্যাগ্রহ কমিটি কি করে তা' আমরা আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখব। কিন্তু ইতিমধ্যে কলকাতা এবং অন্যান্য স্থানে লবণ-আইন অমান্য করা ছাড়াও রাজদ্রোহাত্মক-আইন ভঙ্গ করা আরম্ভ হয়েছে। চট্টগ্রামে আমরা কালবিলম্ব না করে রাজদ্রোহাত্মক আইন-অমান্য সুরু করা মনস্থ করেছি।

'এই উদ্দেশ্যে আমরা সর্বশ্রেণীর কাছ থেকে সহানুভূতি পেতে চাই—আমরা চাই সত্যাগ্রহী সৈনিক। আমরা আশা করি দেশবাসী আমাদের লোক-বল ও অর্থবল দিয়ে সাহায্য করবে। যাঁরা সত্যাগ্রহী সৈনিক হওয়ার বাসনা রাখেন তাঁরা ২১শে এপ্রিলের মধ্যে যে কোন একজন স্বাক্ষরকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।'

এই প্রচারপত্রে লক্ষ্য করবার আছে—আমরা ১৮ই এপ্রিল, যুব-বিদ্রোহের দিনটিকে খুব সযত্নে গোপন রাখতে চেষ্টা করেছি। ১৭ই এপ্রিল প্রচারপত্র ছাপান ও বিলি করা হ'ল। ১৮ই এপ্রিল সকালে পুলিশকে একটি প্রচারপত্র দেওয়া হ'ল। প্রচারপত্রে ছিল ২১শে এপ্রিলের মধ্যে স্বেচ্ছা-সৈনিকেরা যেন স্বাক্ষরকারীদের সঙ্গে দেখা করে—অর্থাৎ, বোঝাতে চাইলাম যে, ২১শে এপ্রিলের পর আমরা রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতা দিয়ে আইন-অমান্য করব। পুলিশ কর্তারা, যাঁরা আমাদের সন্দেহজনক চলাফেরায় শঙ্কিত হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন, তাঁরা আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছুটা হদিস পেলেন। ভেবেছিলেন কিছু-দিন আমাদের জেলে আটক রাখবার সুযোগ পাবেন এবং সেই সময় হয়ত ভবিষ্যতে গুপ্তচর বৃত্তির জন্য কাউকে হাত করতে পারবেন। এইভাবে তাঁরা এরকম কোন আশার স্বপ্ন দেখেছিলেন কিনা তা' অবশ্য সঠিক বলা যায় না। তবে এটুকু খুব জোরের সঙ্গেই বলা যায়, আমরা বৃটিশ শক্তিকে পরাভূত করে, চট্টগ্রাম শহর দখল করে সাময়িক গণতন্ত্র বিপ্লবী সরকার গঠন করার যে এক বিপুল আয়োজন করেছি, এটা তাঁরা বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করতে পারেন নি। আবার বলে রাখি—বিভ্রান্তিমূলক প্রচারপত্র আমাদের সংগঠন ও সক্রিয় যুব-বিদ্রোহের প্ল্যানকে রক্ষা করতে কখনই সক্ষম হ'ত না যদি গুপ্ত-বিপ্লবী দলে বিশ্বাসঘাতকের প্রবেশ সম্ভব হ'ত। একজন বিশ্বাসঘাতক থাকা সত্ত্বেও এবং তার অবাধ প্রকাশ্য মেলামেশার সুযোগ থাকাতেও সে কখনই আমাদের গোপন প্রস্তুতি সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পারে নি। তাই বলি, পুলিশ বাইরে থেকে প্রকাশ্য কার্যকলাপ দেখে কতটুকুই বা বুঝতে পারে, যদি না দলের লোক বিশ্বাস-ঘাতকতা করে? বিশ্বাসঘাতককে আগে চিনে ফেলেছিলাম বলে তাকে হত্যা না করে বিপ্লবের কাজে লাগালাম—ডি-এস-পি-কে তার মারফৎ "সংবাদ" পাঠালাম রাজদ্রোহাত্মক-আইন ভঙ্গ করে আমরা জেলে যাব। আর এই সংবাদটিকে প্রচারপত্রের মাধ্যমে সমর্থন করলাম। শত্রু পক্ষকে কাবু করবার জন্য এই Strategic Diversion (বিপথে পরিচালনা করবার রণনীতি)

সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে পেরেছিলাম বলেই চরম সঙ্কটের শেষ মুহূর্তেও আমরা সংগঠনকে বাঁচিয়ে রেখে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহকে সফল করেছি।

বন্ধুবেশী বিশ্বাসঘাতককে চিনে ফেলেছিলাম বলে ডি-এস-পি, মহাশয়কে বিভ্রান্ত করবার সুযোগ পেলাম। কিন্তু এটাই আমাদের শেষ পরীক্ষা ও কার্যকরী নেতৃত্বের চূড়ান্ত সফলতার ইতিহাস নয়।

আমাদের বিরুদ্ধে পুলিশের গুপ্ত-অভিসারের যেরূপ বর্ণনা এতক্ষণ দেওয়া হয়েছে তা' একেবারে ম্লান হয়ে পড়বে যখন জানা যাবে যে, মাত্র সপ্তাহ-কাল আগে আমরা কি এক ভীষণ পুলিশী-চক্রান্তের সম্মুখীন হয়েছিলাম। এই বিশেষ তথ্যটি প্রকাশ করবার আগে মাস্টারদার সম্বন্ধে একটু বলে নেওয়া প্রয়োজন মনে করছি।

সাপ্তাহিক বসুমতীতে আমার এই লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার সময়, আমাদের সঙ্গে চট্টগ্রামের পূর্ব পরিচয় দিয়ে, এক বন্ধু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন যেন মাস্টারদার ভূমিকার যথাযথ প্রকাশ আমার লেখার মধ্যে থাকে। তিনি হাবভাবে জানালেন আমার লেখায় সেই অভাব আছে। পাছে অনুরূপ ধারণা আর কারও থাকে সেইজন্য এ বিষয়ে একটু লিখছি।

আমার লেখার জন্য অনেকে আমাকে চিঠি লিখেছেন, টেলিফোন করেছেন, সাক্ষাতেও বলেছেন। সবার কাছ থেকে উৎসাহ ও সমর্থন পেয়েছি। তবু সামান্যতম ত্রুটিও যদি আমার লেখার মধ্যে থাকে তবে তা' আমার অক্ষমতা বলেই মনে করব। সেইজন্য মাস্টারদার সম্বন্ধে অনেক বেশি জানবার আগ্রহে একজনের টেলিফোনের উত্তরে মাস্টারদার প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত দিচ্ছি।

যদি কেউ দেখতে চান মাস্টারদা চলন্ত মোটরের গতিরোধ বা মুষ্টিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ অথবা ইউনিফরম্ পরে সৈনিক বেশে অশ্বপৃষ্ঠে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী পরিচালনা করছেন, তাহলে সত্যিই তাঁকে হতাশ হতে হবে। আবার চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহে মাস্টারদার অপরিহার্য ভূমিকার নিদর্শন হিসাবে যদি কেউ দেখতে চান যে, তিনি রাজনৈতিক ডাকাতিতে ব্যক্তিগতভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কি না বা দলের সভ্যদের অস্ত্রশিক্ষা তিনি দিতেন কি না অথবা স্মাগ্লারদের কাছ থেকে গোপনে অস্ত্র কিনেছেন কি না, তবে তাঁকেও আমার নিরাশ করতে হবে। মাস্টারদার প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে কাল্পনিক চোখে যদি তাঁর বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার সক্রিয় বিকাশ—গুণ্ডাদমন বা রামকৃষ্ণ ও তারকেশ্বরকে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় পুলিশের নাকের ডগার ওপর দিয়ে নিয়ে উধাও হওয়া বা পুলিশ কর্তাদের বাড়ি গিয়ে ধমকাধমকি করার বিভিন্ন চমক-প্রদ 'ঔপন্যাসিক' ঘটনার মধ্যে পরিব্যাপ্ত আছে বলে কেউ মনে করেন তবে তা হবে নিতান্তই কল্পনাবিলাস।

ভ্রান্ত-কল্পনা বশতঃ অনাড়ম্বর বাস্তবতার বৈপ্লবিক কষ্টিপাথরে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সন্ধিক্ষণে মাস্টারদার অপরিহার্য নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব যাঁরা আমার লেখার মধ্যে খুঁজে পান নি, আমার মনে হয় তাঁরা অজান্তে আমার প্রতি অবিচার করেছেন।

মাস্টারদার বৈপ্লবিক চরিত্রের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য আমরা দেখেছি যখন তিনি তরুণ বিপ্লবীকে আকৃষ্ট করবার জন্য মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে সুস্পষ্টভাবে

জানালেন—তিনি একটি পিস্তলও তাকে দিতে পারবেন না বা তিনি নিজে একটিও স্বদেশী ডাকাতি করেন নি; আমাদের সশস্ত্র প্রস্তুতির কাজে পৌঁছিয়ে থাকার মূল কারণ কি—জলুদার এই প্রশ্নের উত্তরে যখন মাস্টারদা তাঁর অন্তরের গভীর বাণী 'Want of realisation of our Goal'—মাত্র এই ক'টি শব্দ প্রকাশ করেছিলেন, তখনই তাঁর বৈপ্লবিক শ্রেষ্ঠত্বের যে ভূমিকা প্রকাশ পেয়েছিল, তার সন্ধান যদি আমার লেখার মধ্যে কেউ না পেয়ে থাকেন, তবে সেই ত্রুটির জন্য হয়ত আমার প্রকাশের অক্ষমতাই দায়ী। অবশ্য একথাও সত্য, আমাদের সকলের ওপরে মাস্টারদার যেখানে শ্রেষ্ঠত্ব, যেখানে তিনি natural leader, সেটা বুঝতে হলে সহানুভূতিশীল মন এবং একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন।

নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন থেকেও মাস্টারদা শুধুমাত্র নেতৃত্বের মোহে বিভোর না থেকে যখন তাঁরই একজন শিষ্যকে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করছেন, তখন খাঁটি বৈপ্লবিক নেতৃত্বের যে বিরাটত্ব প্রকাশ পেয়েছিল সেইটি হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলে আমরা মাস্টারদার অপরিহার্য ভূমিকা যে কি, তা' হারিয়ে ফেলব। চট্টগ্রাম জেলে প্রেমানন্দর কাছ থেকে অস্বাভাবিক চিঠি পেয়ে যখন বার বার স্বগতোক্তি করছিলেন—'আই, বি, ইন্‌স্পেক্টার প্রফুল্ল রায় কেন বা কিসের আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রেমানন্দর সঙ্গে আলাপ করত ?'—তখন সেই সুদূর-প্রসারী দৃষ্টির গুরুত্ব, যা' আবিষ্কার করা আমার বা অম্বিকাদার পক্ষে সম্ভব হয় নি, তা'র পরিপ্রেক্ষিতে মাস্টারদার সাংগঠনিক ভূমিকার শ্রেষ্ঠত্ব যদি আমার লেখা থেকে সন্ধান পাওয়া কারও পক্ষে কষ্টকর হয় তবে আমার অনিপুণ হাতের অক্ষমতাই দায়ী বলে আমাকে ক্ষমা করতে হবে। আমাদের আলোচনা যখন সামগ্রিক যুব-বিদ্রোহের রণ-নীতি—সীমিত শক্তির কারণবশতঃ 'ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের' পরিবর্তে জেটির ও পাহাড়তলীর অস্ত্রাগার দু'টি দখল করা হোক্—এই নিয়ে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তখন, সেই সন্ধিক্ষণে, যাঁর নির্দেশ সবার কাছে স্বীকৃত হ'ল, তিনিই মাস্টারদা—অনাড়ম্বর নীরব অথচ নির্ভীক দৃঢ় নেতৃত্বের জীবন্ত প্রতীক মাস্টারদা! তাঁর সেই শ্রেষ্ঠত্ব যদি রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহে পাঠকমনে হারিয়ে যায় তবে তা' অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

মাস্টারদাকে বুঝতে হলে তাঁর চারপাশের আমাদের সকলকে নিয়েই তাঁকে বুঝতে হবে—জানতে হবে। আমাদের সকলের সমষ্টি—মাস্টারদা। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র—মাস্টারদা। বহুবিধ সক্রিয় প্রস্তুতির কাজে—অস্ত্র শিক্ষা, রণকৌশল শিক্ষা, প্রভৃতির মধ্যে মাস্টারদার ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের আড়ম্বরপূর্ণ কাহিনীর অভাব বলে যাঁরা ব্যথিত হয়েছেন তাঁদের কাছে আমার বক্তব্য হচ্ছে, তাঁরা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করে মাস্টারদার অবিসংবাদী বৈপ্লবিক নেতৃত্বের গভীরতা যেন আমার লেখার মধ্যে অনুসন্ধান করেন।

আমরা সবাই মাস্টারদাকে নেতা বলে নির্বাচিত করলাম কেন? এটা আমাদের লোক-দেখান আনুগত্য নয়। বিপ্লবী দলে চক্ষুলজ্জা বা সাময়িক মিলনের খাতিরে নেতা মনোনয়ন করা সম্ভব নয়। চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহে নেতৃত্ব-পদে কাউকেই নির্বাচিত করা সম্ভব ছিল না যদি তিনি একজন

Natural Leader (নিজগুণে নেতা) হওয়ার বৈপ্লবিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী না হতেন। কেন অম্বিকাদাকে আমরা সেই পদে নির্বাচন করলাম না? গণেশ ঘোষকে নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত করতে কেন আমাদের দ্বিধা ছিল? নির্মলদাই বা কেন আমাদের সকলের বৈপ্লবিক আনুগত্যলাভ করলেন না? আমাকেই বা কেন সকলে নেতা বলে মেনে নিতে রাজী হলেন না? এই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে মাস্টারদার সূক্ষ্ম ও গভীর বৈপ্লবিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি, যা' আমাদের সকলকে আকৃষ্ট করেছিল। সন্ধিক্ষণে মাস্টারদার সিদ্ধান্ত ও বিভিন্ন নির্দেশ সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে ও বুঝতে হবে। আমার একমাত্র চেষ্টা ও লক্ষ্য হচ্ছে মাস্টারদার অপরিহার্য নেতৃত্বের ভূমিকা যেন আমার লেখায় কোন প্রকারে বাদ পড়ে না যায়। মাস্টারদার সূক্ষ্ম ও গভীর বৈপ্লবিক চরিত্রের মাধুর্য, যা' আমার কাছে প্রকট হয়ে উঠেছিল, সেই বিশেষ বিশেষ দিকের পরিচয় আরও অনেকে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যে দেখেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁরাই সেই সব লিখতে পারেন—সেইরূপ সূক্ষ্ম বিষয় ধার করে লেখা যায় না, তাতে লেখার মূল উদ্দেশ্যে পৌঁছান সম্ভব নয়।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের দিন দশ পূর্বে গণেশ আমার ও মাস্টারদার কাছে একটি প্রস্তাব করল—"আমার সঙ্গে প্রতুলবাবুর (শ্রীপ্রতুল ভট্টাচার্য) ব্যক্তিগতভাবে একরকম কথাই ছিল যে, যদি আমরা কোন অ্যাক্‌শনে নামি তাহলে তাঁকে আমাদের সঙ্গে নেব। এই কারণে আমার ইচ্ছে, লোক মারফৎ তাঁকে সংবাদ পাঠাই আমাদের সঙ্গে এসে দেখা করতে। তিনি যদি রাজী থাকেন তবে তাঁকে সঙ্গে নিলে ভাল হয়। তাঁর সামরিক জ্ঞান আছে, ক্ষমতা আছে—অ্যাক্‌শনে নেতৃত্ব করবার উপযুক্ততা আছে............।"

সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাবে আমার প্রতিক্রিয়া গণেশকে বললাম—"আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই যদি প্রতুলবাবু একেবারে একা আমাদের সঙ্গে অ্যাক্‌শনে (যুব-বিদ্রোহে) যোগ দেন। যদি তাঁদের সংগঠনের আর কারও সঙ্গে পরামর্শ করেন তবে তাঁর যোগ দেওয়ার কথা ওঠে না—আমার তাতে আপত্তি আছে.........।"

আমি যখন কলকাতায় যুব-বিদ্রোহের চার-পাঁচ মাস আগে স্মাগ্‌লারদের কাছ থেকে রিভলভার পিস্তল কিনছি, তখন গণেশ প্রতুলবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তাঁকে আমার খুবই ভাল লেগেছিল। গণেশের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব খুবই ঘনিষ্ঠ। তাই গণেশের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে আমার মন তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। তিনি কখনও কখনও আমার থেকে অস্ত্র কেনবার জন্য টাকা নিয়ে গেছেন এবং কেনা না হওয়ায় আবার টাকা ফেরত দেন। যদিও আমার সঙ্গে সামান্যই চেনা, তবু তারই মধ্যে যেটুকু ধারণা হয়েছিল তা'তে বিশ্বাস করেছি যে, চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহে প্রতুলবাবু সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলে ভাল ছাড়া মন্দ হবে না। কিন্তু যেহেতু তাঁর সংগঠনের আর কারও সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে তখনও বিশেষ পরিচয়ের সুযোগ হয় নি, তাই অ্যাক্‌শনে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে তিনি তাঁর সংগঠনের অন্য কারও সঙ্গে আলোচনা করুন, এটা আমি কখনও অনুমোদন করতে পারি

নি—পাছে আমাদের যুব-বিদ্রোহের প্ল্যান আগে থেকে কোন ছিদ্র দিয়ে শত্রুর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

গণেশ আমার যুক্তি অনুমোদন করল। তারও মত কেবল প্রতুলবাবুই আসবেন—তিনি কারও সঙ্গে আলোচনা না করেই অ্যাক্শনে যোগ দেবেন। এইটি যদি সম্ভব হয় তবে প্রতুলবাবুকে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের সঙ্গে অ্যাক্শনে যোগ দিতে অনুরোধ করব।

মাস্টারদা আমাদের দু'জনের কথা শোনার পর বিশেষভাবে আমাকে লক্ষ্য করেই যেন আচম্‌কা কথাটা পাড়লেন—"আচ্ছা, ভেবে দেখেছিস্ কি, যদি আমাদের সংগঠনের বাইরের বিশেষ একজন যুব-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে তবে তার অর্থ কি? তা'তে কি বাংলার বিভিন্ন দলের প্রতিক্রিয়া এই হবে না যে, চট্টগ্রামে এই যুব-বিদ্রোহ পরিচালনা করবার উপযুক্ত আর কেউ ছিল না—তোরা কেউ-ই না, এবং সেই জন্যই প্রতুলবাবুকে আনা হয়েছে?"

গণেশের বন্ধু প্রতুলবাবু, সে চায় তিনি যুব-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করুন। মাস্টারদা নিজে কখনই ভাবে নি যে, তাঁর নেতৃত্বের বড়াই করবার কোন প্রয়োজন আছে। তাঁর নিজের বিশেষ ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। নেতৃত্বের লোভ ছিল না বলেই তিনি Natural Leader; তাই ঐ প্রশ্নের প্রকৃত অর্থ কি, তা' সঙ্গে সঙ্গেই বুঝেছিলাম। আমার কি পরে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া আসতে পারে—নেতৃত্বের লোভ কি যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে আমাকে প্রতুলবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলার কোন সম্ভাবনা আছে? আমি মাস্টারদাকে যতদূর জানতাম, তা' থেকে বুঝেছিলাম যে, ভবিষ্যতের দূর-দৃষ্টিই তাঁকে ঐরূপ প্রশ্ন সামনে তুলে ধরতে প্ররোচিত করেছিল।

মাস্টারদার কথার উত্তর আমিই দিলাম—"মাস্টারদা, যুব-বিদ্রোহের সফলতাই আমার এখন একমাত্র কামনা। জয়যুক্ত হওয়ার জন্য শক্তি বৃদ্ধি আমাদের করতেই হবে। প্রতুলবাবুর মত উপযুক্ত বিপ্লবী নেতার অংশ গ্রহণ করাতে যদি বিপ্লবের ইতিহাসে আমার নাম মলিন হয়ে যায়, তবু তা'তে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। মৃত্যুপণ করেছি—মরে যাব। তারপর, মরে যাওয়ার পর, কার নাম হ'ল কি না হ'ল তা'তে কি আসে যায়? আমাদের যুব-বিদ্রোহ জয়যুক্ত হতেই হবে—এইটিই সর্বপ্রথম ও একমাত্র লক্ষ্য। তার জন্য প্রতুলবাবুকে নিশ্চয়ই খবর পাঠান হোক্।"

দেবুকে (জালালাবাদের বীর, কালার পোল যুদ্ধের শহীদ—দেবপ্রসাদ গুপ্ত) প্রতুলবাবুর কাছে পাঠান হ'ল। গণেশ চিঠি দিল যেন পত্রপাঠ তিনি পরের ট্রেনেই চলে আসেন—খুব জরুরী। প্রতুলবাবু এলেন। আমরা তিন-জনেই একমত ছিলাম যে, তাঁকে নিয়ে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে মোটরে ঘুরে বেড়াব। অস্ত্রাগারগুলির অবস্থানও তাঁকে দেখাব, কিন্তু প্রকৃত সামগ্রিক প্ল্যানটি না বলে আগে নানাভাবে তাঁর কাছে জানতে চাইব কয়েকদিনের মধ্যে ক্ষমতা অনুযায়ী একটা অ্যাক্শন করে ফেললে কি হয়—তিনি কি তাতে যোগ দিতে প্রস্তুত আছেন?

আমরা চারজন—মাস্টারদা, প্রতুলবাবু, আমি ও গণেশ, তিন-চার ঘণ্টা গাড়িতে ঘুরে ঘুরে সব স্থানগুলি পরিদর্শন করলাম। আগাগোড়া মাস্টারদা ও গণেশ তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে। নানাভাবে তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন প্রতুল-

বাব্‌ যেন আর ফিরে না যান এবং একটা প্ল্যান করে আমাদের সঙ্গে কাজে নেমে পড়েন। প্রতুলবাব্‌, তাঁর পক্ষে যা স্বাভাবিক তাই বললেন—"সাংগঠনিক দায়িত্ব আছে। কারোকে না বলে এখনই এখানে প্ল্যান করে যদি কিছ্‌ করে ফেলি তবে সেটা ভাল হবে না। কয়েকজনের সঙ্গে অন্তত আলাপ করে আসতে হবে.........।"

কাজেই শেষ পর্যন্ত আমরা চট্টগ্রাম য্‌ব-বিদ্রোহের সময় প্রতুলবাব্‌র সঙ্গ পেলাম না বা আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হ'ল না।

এবার আমাদের শেষ পরীক্ষার দিন উপস্থিত। তখন য্‌ব-বিদ্রোহের বোধহয় সাতদিন বাকি। এমন সময় আমাদেরই একজন "প্রবীণ দাদা", 'যাঁর' সঙ্গে আমাদের ক' বছর ধরে কোন যোগাযোগই ছিল না. হঠাৎ চট্টগ্রামে বেড়াতে এলেন। বর্তমানে 'তাঁর' সঙ্গে যোগস্‌ত্র না থাকলেও অতীতের যে গভীর সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিল, তা' আমরা কেউ ভুলি নি। চট্টগ্রামে 'তাঁর' আগমন-বার্তা শ্‌নে আমাদের সবার মনে হ'ল এ যেন বৈপ্লবিক হৃদয়ের আকর্ষণ—intution! না হলে এমন সময়, আমাদের য্‌ব-বিদ্রোহের প্‌র্বাহ্নে, কেন 'তিনি' এলেন? 'তাঁর' এই শ্‌ভ আগমন আমাদের অন্তরে সত্যিই আলোড়ন স্‌ষ্টি করেছিল- দার্‌ণ উৎসাহ ও প্রেরণা জাগিয়েছিল। সর্বপ্রথম নির্মলদা 'তাঁর' আগমন সংবাদ শ্‌নে উৎফ্‌ল্ল হয়ে উঠলেন। আমার কাছে নির্মলদা সরল আবেগভরা বিপ্লবী মন নিয়ে চট্টগ্রামের ভাষায় "বাইরে বাই", (অর্থাৎ ভাই রে ভাই) বলে আরম্ভ করলেন বলতে, যার শ্‌দ্ধ পরিভাষা—"ভাই রে ভাই......দাদা এসেছেন। আমাদের সঙ্গে দেখা করেছেন। চল, আমরা সবাই 'তাঁকে' আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলি। 'তাঁর' সঙ্গে চল রজত, মনা, টেগরা, ত্রিপ্‌রা, নরেশ, বিধ্‌—এদের সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র সব তাঁর command-এ (আধিপত্যে) দিয়ে দিই—আমাদের প্রস্তুতি ও সামগ্রিক প্ল্যানটিও তাঁর কাছে চল আমরা সব বলি। এত সব আয়োজন দেখে নিশ্চয়ই 'তিনি' আমাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারবেন না।"

নির্মলদা উৎসাহ ও আবেগের সঙ্গে এই সব কথা এক নিশ্বাসে বলে গেলেন। সত্যি বলতে কি আমার অন্তরের আবেগ নির্মলদার চাইতে বেশি ছাড়া কম ছিল না। আমিও অন্‌ভব করছিলাম, যদি সমস্ত আয়োজন, সামগ্রিক প্ল্যান, আর সবল স্‌স্থ একদল দ্‌ঢ়সঙ্কল্প য্‌বককে দেখতে পান, তবে নিশ্চয়ই 'তিনি' য্‌ব-বিদ্রোহের পরিচালনার ভার গ্রহণ করবেন। যদি আমাদের সঙ্গে 'তাঁকে' সক্রিয়ভাবে পেতেই হয়, তবে স্পষ্টই ব্‌ঝেছিলাম যে, 'তাঁর' কাছে সব খ্‌লে না বললে, সব না জানালে এবং ম্‌ত্যুপণ করা য্‌বকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে না দিলে 'তাঁকে', এত বছর নিষ্ক্রিয় থাকার পর, আকর্ষণ করা সম্ভব হবে না।

গ্‌প্ত-সমিতির নীতি অন্‌যায়ী ইংরেজ শাসকের বির্‌দ্ধে এত বড় একটা ষড়যন্ত্রের প্ল্যান কাউকে প্‌র্বাহ্নে জানান সম্প্‌র্ণ নীতি বহির্ভূত—এই উপলব্ধির ব্যতিক্রম আমার জীবনে এই ক্ষেত্রেই প্রথম হ'ল।

আমি নির্মলদাকে বললাম—"চল্‌ন এক্ষ্‌ণি গণেশ ও অম্বিকাদাকে ডেকে নিয়ে মাস্টারদার কাছে যাই। তাঁর কাছে আমরা দ্‌'জনে প্রস্তাব করি

—এমন শুভমুহূর্তে যখন 'তিনি' আমাদের কাছে এসেই পড়েছেন, তখন আমাদের এর সুযোগ নেওয়া উচিত।"

আমরা দু'জনে তখন গণেশের কাছে যাই। তাকেও আমাদের মত জানাই। গণেশও উৎসাহভরে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল—যে কোনমতে 'তাঁকে' আমাদের সঙ্গে পেতেই হবে, এই উদ্দেশ্যে মাস্টারদার সঙ্গে তক্ষুণি দেখা করতে চলল। আন্দার খাঁ-র দীঘির পাড়ে কংগ্রেস অফিসে মাস্টারদা থাকতেন। আমরা সেখানে গেলাম। অম্বিকাদা সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। আমাদের তিনজনকে একসঙ্গে দেখে মাস্টারদা ও অম্বিকাদা আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন—ভেবেছিলেন আমাদের কোন বিশেষ বক্তব্য আছে। একটু পরেই জানতে পারলেন আমাদের তিনজনের প্রস্তাব—আমাদের যে দাদাটি এসেছেন 'তাঁর' কাছে সব কিছু জানিয়ে দিয়ে আমাদের পরিচালনার ভার নিতে 'তাঁকে' অনুরোধ করব। অম্বিকাদাও একমত। আমাদের সবার দৃঢ় ধারণা, যদি সব আয়োজনের কথা 'তাঁকে' বলা হয় তবে 'তিনি' উৎসাহিত হবেন এবং নিশ্চয়ই সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করবেন।

মাস্টারদা কিন্তু তখনও তাঁর নিজ মত জানান নি। আমরা সকলেই ধরে নিয়েছিলাম যে মাস্টারদা এই প্রস্তাবে কখনই ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন না। 'আগন্তুক দাদার' ওপরেই যুব-বিদ্রোহ পরিচালনার ভার ন্যস্ত হবে—এইটি যেন আপনা থেকেই আমাদের মধ্যে ঠিকই হয়ে গেল এবং 'তাঁকে' এখানে বিকেলবেলা ডেকে আনা হবে—এও যেন একরকম স্থির করে ফেললাম। আমাদের কারও মনেই হয় নি যে, মাস্টারদার এতে বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকতে পারে। তাই সব একরকম ঠিকঠাক—নির্মলদা 'তাঁকে' নিয়ে বিকেলে আসবেন।

এমন সময় মাস্টারদা সবাইকে চমকে দিয়ে ধীর শান্তকণ্ঠে আমাদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন—

"আপনারা সবাই যেমন আগ্রহ করে 'তাঁকে' যুব-বিদ্রোহ পরিচালনার ভার দিতে চাইছেন, আমিও ঠিক আপনাদের মতই তাই চাই—যোগ্য ব্যক্তির ওপরই পরিচালনার ভার দেওয়া উচিত। তবে 'তাঁর' কাছে সব আয়োজনের বিষয় আগে প্রকাশ করে দিয়ে তারপর 'তাঁকে' আকৃষ্ট করার নিয়মবিরুদ্ধ পদ্ধতিতে আমার ঘোর আপত্তি আছে। বহু বছর 'তাঁর' অবর্তমানে কি কোন কাজ অসমাপ্ত আছে? অবশ্য আজ যদি 'তাঁকে' পাওয়া যায় তবে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি বলি, 'তাঁর' কাছে গোপন আয়োজনের কথা বিন্দুমাত্রও প্রকাশ না করে আমাদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে পাওয়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা হোক্। 'তাঁকে' আকৃষ্ট করবার জন্য ঐরূপ 'মারাত্মক পদ্ধতি'র আমি ঘোর বিরোধী। আমার প্রস্তাব —'তাঁকে' আমাদের মধ্যে ডেকে আনা হোক্ আজই বিকেলে। আমরা সবাই মিলে 'তাঁর' সঙ্গে কথা বলি, 'তাঁকে' বুঝতে চেষ্টা করি, 'তাঁর' কাছে আমাদের কোন একটি বিকল্প মিথ্যা প্ল্যানও বলা হোক্—কিন্তু বর্তমানে আমরা যে সাংগঠনিকভাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত তা' সম্বন্ধে গোপন রাখতে হবে। 'তিনি' যদি আমাদের বিভিন্ন প্রস্তাব শোনার পর সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে স্তরে স্তরে পরীক্ষার

মাধ্যমে 'তাঁকে' নিশ্চয়ই আমরা যুব-বিদ্রোহের পরিচালন-ভার দেব। এই দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার পর আজ 'তাঁকে' আমাদের পরখ করে নিতে হবে। 'তাঁকে' আমাদের মধ্যে পাওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ sentiment বা emotion (ভাবপ্রবণতা) না থাকা উচিত। ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে ধীর স্থির ভাবে চিন্তার প্রয়োজন—কি পদ্ধতিতে 'তাঁকে' প্রকৃতভাবে পরখ ও যাচাই করে দেখা সম্ভব। সেই হেতু আমার বক্তব্য—তাঁকে আনা হোক্; গোপন প্রস্তুতির কোন কথা বলা হবে না; অন্যান্য কথার মাধ্যমে 'তাঁকে' বুঝতে হবে 'তিনি' প্রস্তুত কি না; তারপর ধীরে ধীরে সব বলা হবে—যদি মরণ-পণ করে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে 'তিনি' প্রস্তুত থাকেন।"

মাস্টারদার এই প্রস্তাব না মানার কারও কোন যুক্তি ছিল না। সবাই মাস্টারদার প্রস্তাবটি মেনে নিলাম।

আজ বলতে বাধা নেই—মাস্টারদার এই সিদ্ধান্ত আমার নিজ অন্তরের কথা। তবু কেন এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমার চরিত্রের ব্যতিক্রম ঘটল? আমি যে পরখ না করে কারোকেই বিশ্বাস করতে পারি না! বন্ধু প্রেমানন্দ আমাকে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সাহায্য করেছিল তা' বাস্তব ক্ষেত্রে কোন কাজেই লাগল না! পুলিশের বিরুদ্ধে অত পাল্টা গোয়েন্দাগিরির ব্যবস্থা সবই পণ্ড হতে চলেছিল! আমাদের দলে পুলিশের বন্ধুবেশে অনুপ্রবেশ চেষ্টা ব্যর্থ করা সত্ত্বেও আমার এই পরিণতি?

মানুষের মনস্তত্ত্ব কত যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণে বিপথে পরিচালিত হয় তার ঠিক নেই। আমি 'তাঁকে' আমাদের মধ্যে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার মনের গভীরে কখনও চাই নি 'তাঁর' কাছে সবকিছু প্রকাশ করতে। সেই সময় আমার মধ্যে এক অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছিল—আমি 'তাঁকে' সব বলে দিতে চাইছি না কেন?' গুপ্ত-সমিতির নীতি অনুযায়ী 'না বলা প্রয়োজন', সত্যিই কি সেইজন্যই আমার মনে বাধা, না কি 'সব বললে' 'তিনি' পাছে আকৃষ্ট হয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বসেন আর পরিচালনার ভার তাঁরই ওপর ন্যস্ত হয়? তাঁর সঙ্গে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুপ্ত অহঙ্কার কি আমাকে বাধা দিচ্ছে তাঁকে সব বলার জন্য? 'তাঁকে' বিরত করবার অভিপ্রায় কি আমার মনকে প্রভাবান্বিত করছে 'তাঁকে' বাস্তব প্ল্যান সম্বন্ধে কিছু না জানাবার জন্য? এই 'অহঙ্কার'—নেতৃত্বের লোভ থেকে আমাকে বাঁচতে হবে! আমি চাই সুনিশ্চিত জয়। কে নেতৃত্ব দেবে, কার নাম হবে—এ সব ভাববার আমার অধিকার কোথায়? হায় রে! কি অদ্ভুত! পাছে আমি অহঙ্কারের ক্রীতদাস হয়ে পড়ি—তাই অহঙ্কারের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক হিসেবে নির্মলদার সঙ্গে একমত হয়ে সেই বন্ধুটিকে সব আগে বলে আকৃষ্ট করবার মারাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করতে রাজী হলাম!

আজ আমি খুব ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করে জানাচ্ছি যদি 'তাঁকে' আমরা আমাদের প্ল্যান এবং পূর্ণ প্রস্তুতির কথা জানাতাম তবে ভারতের ইতিহাসে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের ইতিহাসের উল্লেখ পাওয়া যেত না। এ আমার একার কথা নয়—বহু তথ্যের বিশ্লেষণ করে আমাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে।

সেইদিন বিকেলবেলা মাস্টারদার ওখানে আমরা (অম্বিকাদা, নির্মলদা,

আমি, মাস্টারদা ও গণেশ) 'তাঁর' সঙ্গে একত্রে আলোচনায় বসলাম। আমরা সবাই নানাভাবে—কেউ আবেগভরে, কেউ যুক্তি দেখিয়ে, কেউ বা উদাহরণ স্বরূপ কোন পরিকল্পনার উল্লেখ করে অথবা গান্ধীজীর অহিংসা আন্দোলন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণে ধ্বংস হওয়ার পর সশস্ত্র খণ্ড খণ্ড অভিযান যদি আমরা সারা বাংলায় অন্তত চালাতে না পারি তবে তরুণদের কাছে বাংলার বিপ্লবী দলের কোন উত্তরই থাকবে না—প্রভৃতি বলে এবং মাস্টারদা সম্পূর্ণ প্ল্যানটি ও বাস্তব আয়োজনের কথা গোপন রেখে 'তাঁর' মত পাওয়ার জন্য খুব স্পষ্টভাবে 'তাঁর' কাছে বক্তব্য পেশ করলেন।

মাস্টারদার প্রস্তাবের উত্তরে 'তাঁর' মোটামুটি বক্তব্য ছিল—"আপনাদের সুভাষের নেতৃত্বে বাংলার যুগান্তর দলের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে কাজ করা উচিত। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের ব্যর্থতা প্রমাণ হওয়ার পর যুগান্তর দলের সঙ্গে মিলে মিশে আপনাদের কার্যকরী বৈপ্লবিক প্রোগ্রাম নিতে হবে। এলোমেলোভাবে, যে যার নিজের মত, অ্যাক্শন করার যুগ আর নেই......" ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্বভাবতই 'তাঁকে' আমাদের সঙ্গে পাওয়া গেল না। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, 'তাঁর' কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার কোন সম্ভাবনাই ছিল না তবু সব আয়োজন ও প্ল্যানটি 'তাঁর' কাছে ব্যক্ত করলে কি 'তাঁকে' আমাদের সঙ্গে পাওয়া যেত? বৈপ্লবিক কোন দলের সঙ্গেই বহু বছর ধরে কোন সম্পর্ক না রেখে যিনি এতদিন চলেছেন—ঘোর সংসারী হয়ে, 'তাঁকে' কোন কারণেই মৃত্যু-পণ করে আমাদের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য পাওয়া যেত না। এই সামান্য জ্ঞানও তখন আমাদের ছিল না। ভাবপ্রবণতা দিয়ে কর্তব্য স্থির করা যায় না।

গুপ্তচরবৃত্তির অভিসন্ধি নিয়ে যদিও পুলিশ 'তাঁকে' আমাদের সাংগঠনিক কর্মতৎপরতার খোঁজখবর নিতে পাঠিয়ে ছিল, তবু 'তিনি' জানতেন 'গায়ে পড়ে' এত বছর পর সেইরূপ অনুসন্ধিৎসা 'তাঁর' কাছ থেকে প্রকাশ পেলে আমরা 'তাঁকেই' সন্দেহ করে বসব। 'তিনি' নিশ্চয়ই আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার জানার খুব আশা করেন নি। যদি গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যই 'তাঁর' শুভাগমন হয়েছিল তবে কেন 'তিনি' আমাদের প্রস্তাবে সায় দিলেন না? আভ্যন্তরীণ ব্যাপার জানতে 'তিনি' আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন না? না, তা' করা 'তাঁর' পক্ষে সম্ভব ছিল না—কারণ বহু বছর পরে হঠাৎ এসে দলে যোগ দিয়ে পুলিশের কাছে অল্প সময়ের মধ্যে সব ধরিয়ে দিলে 'তাঁর' আসল রূপ যে আমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে, এটা 'তাঁর' মত প্রাক্তন বিপ্লবী 'দাদার' পক্ষে বোঝা খুবই সহজ ছিল।

'তিনি' Commissioned হয়ে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন আমাদের ভাবগতিক বুঝতে ও আমাদের শান্ত করতে, যেন আমরা এ-সময়ে বৈপ্লবিক অ্যাক্শন না করে বসি। এইটুকু mission-ই 'তাঁর' ছিল। কিন্তু 'তিনি' যদি সমস্ত তথ্যের অধিকারী হতেন, তবে সেই তথ্য সরবরাহের বিনিময়ে যে লোভনীয় ব্যক্তিগত সুবিধার সুযোগ ছিল তা' উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ত না বলেই আমাদের ধারণা হ'ল।

আমাদের আড়ম্বরপূর্ণ কার্যকলাপের মূল্য নিশ্চয়ই স্বীকার্য, কিন্তু

অনাড়ম্বরপূর্ণ এই সন্ধিক্ষণে মাস্টারদার নির্ভুল নির্দেশ যদি আমাদের সংগঠনকে পরিচালনা না করত, তবে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের ভরা জাহাজ তীরে পৌঁছবার আগেই সাগরের অতল গহ্বরে চিরকালের মত তলিয়ে যেত। আমাদের সমস্ত শিক্ষা, পাল্টা গোয়েন্দাগিরি, অস্ত্রশস্ত্র যোগাড়, বোমা তৈরি, মবিলিজেশন চার্ট, সমস্ত আয়োজন ও বহু চমকপ্রদ অ্যাক্‌শন—সব কিছুই ফুৎকারে উড়ে যেত, যদি 'তাঁকে' 'পরখ' না করে নেওয়ার বিরুদ্ধে মাস্টারদা ধীর শান্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা না করতেন। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সফলতার জন্য মাস্টারদার নেতৃত্বের এইটি হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

সমর-বিজ্ঞান অপরিহার্যভাবে সময়ের—ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ডের, গুরুত্ব অর্পণ করে থাকে। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে বড় বড় যুদ্ধের ফলাফলও অনুকূলে বা প্রতিকূলে যেতে পারে—অতি সামান্য সময়ের তারতম্যে রিজার্ভ ফোর্স এসে না পৌঁছানতে ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়ানের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছিল। আমাদের সংগঠনে প্রথম থেকেই 'সময়ানুবর্তিতা' খুব কঠোরতার সঙ্গে পালন করা হ'ত। আমাদের একজন যুবক সাথী, যার প্রতি আমাদের সকলেরই আস্থা ছিল, তার সময়জ্ঞান শেষ পর্যন্ত আর হ'লই না। এই একটি প্রধান দোষের জন্য তাকে যুব-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয় নি। সময় মত সে কোনদিনও কোন কাজে বা গোপন সভায় হাজির হতে পারত না। তাকে সময়ের গুরুত্ব বুঝিয়েছি, তবু সে তা' হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। সে বলত—"দেখবেন, কাজের দিন আমি ঠিক সময়েই উপস্থিত হব।" দুঃখের বিষয়, সে কোনমতেই বুঝতে পারত না যে তাকে আগে থেকে 'কোন্ দিনটি কাজের' তা' জানানো সম্ভব হবে না। তা' ছাড়া যে কোনদিনই সময়মত হাজির হতে পারে না, সে কাজের দিনটিতেই যে নিশ্চিত নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হবেই তার স্থিরতা কোথায়? কাজেই বাধ্য হয়ে বলিষ্ঠ, শক্তিশালী, প্রায় পাঁচফুট দশ ইঞ্চি লম্বা, প্রশস্ত বুক, দৃঢ়চেতা যুবক সাথীকে আমাদের খুব দুঃখের সঙ্গে বাদ দিতে হ'ল।

দিন ঘনিয়ে এল। মাত্র চার-পাঁচ দিন বাকি—আমাদের ঝটিকাবেগে আক্রমণ করে সমস্ত চট্টগ্রাম শহর দখল করতে হবে। সমস্ত কাজ ঠিক সময় মত—clock-like precision-এ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সময় রাখবার শিক্ষা ও পরীক্ষা আমাদের আগে হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন, ১৭ই এপ্রিল রাত আটটা থেকে ১৮ই এপ্রিল রাত আটটা পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজ প্রত্যেকে এবং প্রতিটি দলে ঠিক ঠিক সময়ে করে যাবে। তার জন্য প্রত্যেকের কাছে আমাদের ঘড়ি দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমরা সকলকে ঘড়ি সরবরাহ করতে পারি নি। তবে প্রতিটি ছোট ছোট দলে অন্তত দু'টি করে ঘড়ি যেন থাকে তার ব্যবস্থা করেছি। কেবল ঘড়ির ব্যবস্থা করেই আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি—নি। ঘড়ি যদি বেঠিক চলে তবে ঘড়ি থাকলেই বিপদ বেশি—সে-ক্ষেত্রে ঘড়ি না থাকাই অনেক ভাল। কিন্তু আসল প্রশ্ন হ'ল, ঘড়ি না থাকলেও চলবে না, আবার বেঠিক টাইম দিলেও আমাদের কাজে লাগবে না—অতএব কি করা যায়?

এ প্রশ্নের সমাধান সাংগঠনিকভাবে আমাদের করতে হয়েছিল। সংগঠনে যাদের ঘড়ি ছিল তাদের টাইম মিলিয়ে ঠিক করে নিতে বললেই তারা তাই

করত। কিন্তু সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য আমরা চার-পাঁচ দিন আগে সবার কাছ থেকে ঘড়িগুলি সংগ্রহ করে নিই। ত্রিপুরা সেনকে ভার দেওয়া হয়েছিল সে সব ঘড়িগুলিতে টাইম মত চাবি দেবে এবং খুব নিখুঁতভাবে রেগুলেট্ করবে। সব ক'টার টাইম লিখে লিখে মিলিয়ে দেখবে। যদি কোন ঘড়ি অচল বলে মনে হয়, তবে সেটিকে বাতিল করবে। গণেশের বাড়িতে সব ঘড়িগুলি আনা হ'ল এবং ত্রিপুরা সেন ঘড়িগুলিকে regulate করবার ভার নিল।

আমাদের মামলার মুদ্রিত রায়ের ১২৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—

"In M II we have a list of watches of various makes with notes against each of the number of minutes. They were fast or slow on Wednesday 7-35 p.m. Thursday 6-15 p.m. and Friday 8 a.m. The prosecution suggest that the object of this meticulous comparison was to ensure that the raids should be simultaneous.

"One watch with the words 'Indian Time' on the dial was found on Amarendra Nandi and 'Indian Time' is one of the watches mentioned in M II."

জজসাহেব লিখছেন যে, M II মার্কা মারা স্লিপ কাগজে বিভিন্ন কোম্পানীর ঘড়ির একটি লিস্ট দেখা যায় এবং তাতে প্রত্যেক ঘড়ির সাথে সাথে কত মিনিট ব্যতিক্রম তাও লেখা ছিল। বুধবার সন্ধ্যে ৭-৩৫ মিনিট, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে ৬-১৫ মিনিট ও শুক্রবার সকাল ৮টার সময় ঘড়িগুলি fast বা slow যাচ্ছে তা' নোট করা ছিল। যেরূপ সতর্কতার সঙ্গে ও নির্ভুলভাবে ঘড়িগুলির টাইম পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে তা' থেকে সরকারী পক্ষের যুক্তি হচ্ছে—নিশ্চিতভাবে একই সঙ্গে যুগপৎ আক্রমণ করবার জন্যই আমরা এই ব্যবস্থা করেছি।

ডায়ালের ওপরে 'Indian Time' লেখা একটি ঘড়ি অমরেন্দ্র নন্দীর সঙ্গে পাওয়া গেছে। (অমরেন্দ্র নন্দী যুব-বিদ্রোহের ছয় দিন পরে, ২৪-৪-৩০ তারিখে, চট্টগ্রাম শহরের ফিরিঙ্গি বাজার এলাকায় পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দেয়)। এই তথ্যের থেকে জজসাহেব বলতে চাইছেন, যে-সব ঘড়ি গণেশের বাড়িতে রেগুলেট্ করা হয়েছে সেই ঘড়িগুলিই আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকেরা ব্যবহার করেছে।

সত্যিই আমরা ঘড়িগুলি খুব ভালভাবে রেগুলেট্ করার পর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে অন্তত দু'টি করে ঘড়ি দিয়েছিলাম।

আমাদের শেষ কাজটি হ'ল গণতন্ত্র বাহিনীর সভ্যদের ১৭ই তারিখ রাত ৮টা থেকে ১৮ই তারিখ রাত ৮টা পর্যন্ত—অর্থাৎ, আক্রমণের ঠিক আগের মুহূর্ত অবধি—ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় প্রত্যেকের গতিবিধি ও যার যেটুকু নির্ধারিত কাজ তা' নিয়ন্ত্রিত করা। আগের দিন রাত্রে, অর্থাৎ ১৭ই তারিখ রাত্রে, ৮টার সময় প্রত্যেকে বাড়ি ফিরবে। ৯টার সময়ে রাত্রের খাওয়া খেয়ে ১০টার সময় বিছানায় ঘুমোতে যাবে। ভোর ছ'টায় ঘুম থেকে বা বিছানা ছেড়ে উঠবে। তারপর কখন কি খাবে, কখন কতক্ষণ বিশ্রাম করবে, কোথায়

কোথায় যাবে, কিভাবে বা কোন্ রাস্তা ব্যবহার করবে, কি কি কাজ করবে, কাকে কি বলবে, কোন্ বন্দুক বা পিস্তল কখন নেবে, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে Direction (নির্দেশ) দেওয়া ছিল। গ্রুপ নেতারা প্রত্যেকের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তার ব্যক্তিগত ও দলের কাজের তালিকা অনুযায়ী রিহার্সাল দিয়েছে এবং কে কোথায় কোন্ সময় থাকবে তার সঠিক অবস্থানের বিষয় জেনে রেখেছে। কাউকে যেন চোখের বাইরে যেতে দেওয়া না হয় তার জন্য কঠিন ব্যবস্থা ছিল। এই সমস্ত ব্যবস্থার ভার গ্রুপ নেতাদের দেওয়া হয়েছিল এবং আমরা ঘুরে ঘুরে প্রয়োজন মত check-up করেছি।

১৭ই এপ্রিল রাত ৮টায় সবাই ভাল ছেলের মত বাড়ি ফিরেছে। সুবোধ বালকের দল সেদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত ১০টার সময় নিজ নিজ বিছানায় শুতে গেছে। এই নির্দেশ আমাদের প্রতিও প্রযোজ্য ছিল। আমিও নির্দেশ মত ১০টায় শুতে গেলাম। তার-পরদিন ৬টায় উঠব। ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ সাল, রাত্রি আটটার সময় যুগপৎ আক্রমণ করব। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় রাত ৮টার সময় আক্রমণ।

তথ্যপঞ্জী

পৃষ্ঠা ১ ॥ লালোর (Lalor, James Fintan—1807-1849)

তিনি ইয়ং আয়ারল্যান্ড গ্রুপের সদস্য ছিলেন। ১৮৪৭-৪৮ সালে Irish Felon (আইরিশ ফেলান) ও Nation (নেশন) পত্রিকায় তাঁর লেখার মাধ্যমে আমরা তাঁর চিন্তাধারার পরিচয় পাই। তিনি আয়ারল্যান্ডের পৃথক সত্তা রক্ষার দাবি তোলেন। ভূমি জাতীয়করণও তাঁর কর্মসূচীর মধ্যে বিশেষ স্থান লাভ করে; তিনিই শ্লোগান তোলেন—"The land of Ireland for the People of Ireland!" (আয়ারল্যান্ডের ভূমির একমাত্র উত্তরাধিকারী আয়ারল্যান্ডের জনসাধারণ!')। জমিদারের খাজনা বন্ধ করবার জন্য তিনি প্রজাদের সংঘবদ্ধ করেন এবং প্রজার স্বার্থে জমি পরিত্যাগ করার জন্য জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালান। পরবর্তীকালে আয়ার-ল্যান্ডের বিপ্লবী নেতা মাইকেল ডেভিড্ লালোরের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে লালোরের বিভিন্ন কর্মসূচী আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামে সময়োপযোগী করে প্রয়োগ করেন।

পৃষ্ঠা ৩৬ ॥ সিন্ ফিন্ (Sinn Fien)

ইংরেজীতে 'Sinn Fien'-এর অর্থ 'we ourselves' (নিজের তরে আমরা)। ১৯০০-র বহু পূর্ব হতেই আয়ারল্যান্ডের জাতীয় আন্দোলন বিভিন্ন ভাবে চলেছে ও বিভিন্ন স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৭২-১৯২২ সালে গ্রীফিথ্ (Griffith) আইরিশ জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি Passive Resistance-এর (অসহযোগ আন্দোলনের) পক্ষপাতী ছিলেন। সিন্ফিন্ গুপ্ত বিপ্লবী সংঘ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ডাক দিল। তারা আইরিশ ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার সংগঠিত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আয়ারল্যান্ড বৃটিশের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিতে অস্বীকার করে। সিন্ফিন্ সংঘ ১৯১৬ সালে আইরিশ রিপাব্লিকান আর্মি গঠন করে এবং তাদের নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালায়। ডি ভ্যালেরা (Eamon De Valera) এই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব করেন। ১৯২১ সালের ৬ই ডিসেম্বর ইংলন্ডেশ্বর বাধ্য হয়ে আয়ার-ল্যান্ডের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করে।

পৃষ্ঠা ৩৬ ॥ নিহিলিস্ট (Nihilist)

ব্রিটিশ শাসকরা যেমন ভারতের বিপ্লবীদের 'টেররিস্ট' (সন্ত্রাসবাদী) আখ্যা দিয়ে সর্বদা তাদের হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছে, তেমনি রুশ দেশে ১৯শ' শতাব্দীর 'নিহিলিস্টদের প্রকৃত আদর্শকে আড়ালে রেখে জার-তন্ত্র বিশ্বের দরবারে তাদের ছোট করার প্রয়াস পেয়েছে। জার-তন্ত্রের সরকারী প্রচারে প্রভাবান্বিত হয়ে অনেকে নিহিলিজমের যথার্থ আদর্শকে বুঝতে সক্ষম হননি অথবা শ্রেণী বা ব্যক্তিগত স্বার্থে তাঁদের মহান্ আদর্শকে বিকৃত করে বোঝাতে চেয়েছেন। বাস্তবে নিহিলিস্ট আদর্শের মূল বক্তব্য ছিল : সরকারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; অতীতের সব জরাগ্রস্ত তথাকথিত চল্তি নৈতিক তত্ত্বের প্রত্যাখ্যান; এবং প্রত্যেক মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রত্যেক জিনিসের যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করা। দার্শনিক পিসারেভের ভাবধারায়

অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন নিহিলিষ্টরা। পিসারেভ তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন—"What can be smashed must be smashed, whatever will stand the blow is sound, and what flies into smithereens is rubbish, at any rate, hit out right and left, no harm will or can come out of it." (যা' ভাঙ্গা যায় তাকে চুরমার কর, আঘাত সহ্য করেও যা' টিকে থাকবে তাই নিখুঁত ও বলিষ্ঠ, এবং যা' হাওয়ায় উড়ে যায় তা' আবর্জনা মাত্র, যে ভাবে পার ডাইনে বাঁয়ে আঘাত করে যাও, ত'তে কোন ক্ষতি হবে না, হতে পারে না)।

নিহিলিষ্ট পার্টির সভ্যবৃন্দ—'New men' (নতুন মানুষ) বা 'Thinking Realist' (চিন্তাশীল বাস্তববাদী) বলে নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করতেন। মার্কস্, এঙ্গেল্স্, লেনিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কখনও নিহিলিষ্টদের বিপ্লবী-নিষ্ঠা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। লেনিন তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নিহিলিষ্টদের ঐতিহাসিক অবদানের যে মূল্যায়ন করেছেন, তা'তে তিনি বলেছেন, সে যুগের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে নিহিলিষ্টরা শ্রেণী সংগ্রামের অপরিহার্য ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে পারেন নি। তাই তাঁরা তাঁদের সশস্ত্র বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত করতে অক্ষম হয়েছেন—ফলে তাঁরা বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং তারই পরিণতি হিসেবে দেখা যায়, যদিও তাঁদের "ব্যক্তিগত আক্রমণ" প্রোগ্রামে দ্বিতীয় জার নিহত হয়েছেন, তবু তাঁরা তাঁদের উচ্চ আদর্শের লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন নি—তাঁদের পার্টি কেবলমাত্র ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠনে পর্যবসিত হয় এবং অচিরেই তার বিলুপ্তি ঘটে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে তাদের অকাল মৃত্যু হয় বটে, কিন্তু তাই বলে লেনিন নিহিলিষ্টদের 'ষড়যন্ত্র-মূলক সংগঠনের' অপরিহার্য দিক্‌টি কখনও উপেক্ষা করেন নি; বরং সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের অনিবার্যতাবশতঃ কম্যুনিষ্ট পার্টিকে আরও প্রবল, দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য 'ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠন' গড়ে তোলবার নির্দেশ দিয়েছেন।

পৃষ্ঠা ৩৬ ॥ চৌরীচৌরা

উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম—চৌরীচৌরা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—এই গ্রামের একটা তুচ্ছ হিংসাত্মক ঘটনার জন্য গান্ধীজী সারা ভারতের বিপুল অসহযোগ আন্দোলনকে এক মুহূর্তে বন্ধ করে দিলেন। জাতীয়তাবাদী বহু নেতা, বিপ্লবী ভারত গান্ধীজীর এইরূপ সিদ্ধান্তে বিক্ষুব্ধ হয়েছে এবং এই ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা—কেন গান্ধীজী সারা ভারতের সংগ্রামকে নিশ্চল করে দিলেন—এর সদুত্তর কোন দিনই পাওয়া যায় নি। এই নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের ভেতরেও মতদ্বৈধ দেখা দেয়। ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২২ সালে, গান্ধীজীর আদেশে বারদোলীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে এবং Constructive Programme (গঠনমূলক কর্মসূচী) গ্রহণ করে। জাতীয় স্কুল, চর্‌কার গুণ-কীর্তন, কংগ্রেসে সদস্য গ্রহণ, প্রভৃতি কাজ শুরু হয়। ২৪।২৫শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধি-বেশনেও বারদোলী প্রস্তাব অনুমোদন লাভ করে। মোতিলাল ও লালা লাজপত রায় গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে জেল থেকে এক সুবৃহৎ চিঠি লেখেন। তাঁরা গান্ধীজীকে তিক্ত সমালোচনা করে বলেন, একটি স্থানের সামান্য গণ্ডগোলে সারা ভারতের সংগ্রামী জনতাকে এইরূপ নির্মম শাস্তি

দেওয়ার কোন অধিকার তাঁর নেই। গান্ধীজী এই চিঠির উত্তরে লিখলেন—'যাঁরা জেলে আবদ্ধ আছেন তাঁরা বাইরের অবস্থায় অংশ গ্রহণের ব্যাপারে একেবারে মৃতের ন্যায়।' সেই সভায় বাংলা ও মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দও গান্ধীজীকে তীব্র সমালোচনায় জর্জরিত করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে গান্ধীজীর "সংগ্রাম" প্রত্যাহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে Censor (নিন্দাসূচক) প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গান্ধীজী সংগ্রাম প্রত্যাহার ও স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে তখন লিখেছেন—"The tragedy of All India Congress Committee is really the index-finger. It shows the way India may easily go for violence if drastic precautions be not taken. If we are not to evolve violence out of non-violence it is quite clear that we must hastily retrace our steps and re-establish an atmosphere of peace and re-arrange our programme and not think of starting mass Civil Disobedience movement until we are sure of peace being retained inspite of Government provocation."

কংগ্রেসে গান্ধীজীর ভক্তবৃন্দেরা তাঁর যুক্তি ও নেতৃত্ব বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিয়েছেন সত্য, কিন্তু সবাই বিশ্লেষণী দৃষ্টি ও সমালোচনার মনোভাব পরিত্যাগ করতে পারেন নি। হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'Life of Myself' পুস্তকের প্রথম খন্ডে, ১৯১ পৃষ্ঠায়, লিখেছেন—"Gandhiji at the Belgum Congress while seated in a tent surrounded by leaders including Ali Brothers, remarked to the Younger: 'Shaukat, if I had not called off the Civil Disobidence Movement for which people blame me, you and I would not have been sitting here to-day.' I was there, I heard it. It was most revealing!" বাংলার ও ভারতের বিপ্লবীরা এবং "অগ্নিগর্ভ-চট্টগ্রামের" লেখক নিজে মনে করে চৌরীচৌরা গ্রামের ঐরূপ একটি সামান্য বিচ্ছিন্ন হিংসাত্মক ঘটনার অজুহাতে গান্ধীজীর সমগ্র ভারতের গণ-আন্দোলনকে গলা টিপে মারার পেছনে ধনিক-শ্রেণী স্বার্থের প্রতি তাঁর দুর্বলতার যে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে, তা' অস্বীকার করা যায় না।

পৃষ্ঠা ৩৮ ॥ বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স (Bengal Ordinance)

বাংলার লাট লর্ড লিটন্ ১৯২৪ সাল, ২৪শে অক্টোবর, Bengal Ordinance No. I of 1924 জারী করেন। ১৯২১-২২ সালে চৌরীচৌরার হত্যাকাণ্ডের পর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হ'লে বাংলা দেশে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির সশস্ত্র কার্যকলাপ আবার প্রচন্ড আকার ধারণ করে। সাধারণ আইনের সাহায্যে ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারছেন না—এই অজুহাতে বিনা বিচারে, কেবলমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বিপ্লবীদের জেলে আটক, গ্রামে ও বাড়ীতে অন্তরীণ বা নজরবন্দী করে রাখবার উদ্দেশ্যে এই অর্ডিন্যান্স ঘোষিত হয়। এই অর্ডিন্যান্সের বলে, ঘোষণার প্রথম দিনেই, প্রায় তিরাশিজনকে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে বিনা বিচারে আটক করা হয়। প্রায় চার বৎসর বাংলার বিভিন্ন জেলে যুবকদের বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। অতঃপর বাংলার গভর্ণর লর্ড লিটন্ বদলী হলেন এবং তাঁর শূন্য স্থান স্যার স্ট্যান্লী জ্যাক্সন্ দ্বারা পূরণ করা হ'ল। নতুন গভর্ণর নীতি

পরিবর্তন করে প্রথমেই সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দিলেন এবং পর পর ধৃত সকলকেই কারাগার ও অন্তরীণ থেকে মুক্তির আদেশ দেন। কিন্তু Bengal Ordinance No. I of 1924 ভবিষ্যতের জন্য তখনও বহাল রইল।

পৃষ্ঠা ৪৪, ২২৯ ॥ হোম রুল (Home Rule)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪—১৯১৮) ভারতবর্ষে হোম রুল আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ইংরেজ মহিলা, মিসেস অ্যানি বেসান্ট (Annie Besant), ভারতে Home Rule প্রবর্তন করার জন্য ইংরেজ সরকারের কাছে দাবি জানান। 'আইরিশ হোম রুল লীগের' অনুকরণে বাল গঙ্গাধর তিলক অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারতে Home Rule League সংগঠিত করেন। ১৯১৬ সালে Home Rule আন্দোলনের প্রভাবে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস অধিবেশনে মুসলিম্ লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে যুক্তভাবে আন্দোলন পরিচালিত করার কর্মসূচীর ভিত্তিতে একটা চুক্তি সম্পাদিত হয়। আইরিশ লীগের অনুরূপ ভারতের হোম রুল লীগও দাবি তোলে—ভারত যখন বৃটিশ সরকারের একান্ত অনুগত বিশ্বস্ত সহচর, তখন ভারতকেও বৃটিশ-সাম্রাজ্য-অন্তর্ভুক্ত-স্বায়ত্ত শাসিত অন্যান্য দেশের মত Home Rule-এর অধিকার দেওয়া হোক্। চরম-পন্থীরা আয়ারল্যান্ডের বিপ্লবী সিন্‌ফিন্‌ সংঘের বৈপ্লবিক বাণী নানা ধরনের ছাপানো প্রচারপত্র মারফত বিলি করে। চরম-পন্থীদের সঙ্গে আইরিশ হোম রুল লীগের যোগাযোগ ছিল এবং তাঁদের কাছ থেকে চরমপন্থীরা সময় ও সুযোগমত পরামর্শ নিতেন।

পৃষ্ঠা ৪৪ ॥ ভার্সাই সন্ধি (Treaty of Versailles)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪—১৮ সালে) জার্মানি পরাজিত হ'ল। মিত্র শক্তি জয় লাভ করে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরে, ১৯৩৯ সালের প্রথম ভাগে, বিশ্ব শান্তি কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। রাশিয়া ও জার্মানী ব্যতিরেকে অন্যান্য সব দেশের প্রতিনিধিরাই সেই কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন। চার-প্রধান—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উইলসন্, ফ্রান্সের ক্লেমেনস্যু, বৃটেনের লয়েড্ জর্জ এবং ইতালীর ওরলেন্ড, আলোচনার মাধ্যমে জার্মানীর সঙ্গে সন্ধি-চুক্তির সর্ত স্থির করেন। আমেরিকা তার ১৪ দফা সর্তের দাবি শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করে; কিন্তু প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের প্রভাবে আমেরিকা সন্ধি-চুক্তির সঙ্গে League of Nations-এর Covenant (চুক্তিবন্ধ নিয়মাবলী) ভার্সাই সন্ধি-সর্তের সঙ্গে যুক্ত করে নেয়। এই সন্ধি-চুক্তি জার্মানীর ওপর জোর করে চাপানো হয়। পরাজিত জার্মানী এটা মেনে নিতে বাধ্য হয়। মিত্র পক্ষের ক্ষতি পূরণের জন্য জার্মানীর ওপর প্রচুর টাকা ধার্য করা হ'ল। সর্ত মত Alsace ও Lorraine ফ্রান্সকে প্রত্যার্পণ করতে হয়। Prussian Poland এবং Prussia-র পশ্চিমাংশের অনেকখানি সন্ধি সর্তে পোল্যান্ডকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় জার্মানী। ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী Upper Silesia-কে গণভোটে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হ'ল; Saar অঞ্চল ফরাসী শাসনের অধীনে গেল; জার্মান সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলি League of Nations-এর আজ্ঞাধীনে পরিচালিত হওয়ার সিদ্ধান্ত হ'ল; ডানজিগ স্বাধীন নগরের শাসন ক্ষমতা লাভ করে; জার্মানীর সৈন্য ও অস্ত্রবল বহুল পরিমাণে হ্রাস করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং রাইনল্যান্ড প্রথমে মিত্রশক্তির অধীনে থাকার পর সেই বিস্তীর্ণ এলাকাকে সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করার অধিকার থেকে জার্মানী

চিরকালের জন্য বঞ্চিত হ'ল। যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট কিন্তু ভার্সাই-চুক্তি অনুমোদন করতে অস্বীকার করে। ১৯৩৫ সালের পর হিট্‌লার একের পর এক-এক করে ভার্সাই চুক্তির সর্তগুলি ভঙ্গ করেন বা মেনে চলতে অস্বীকার করেন। এই চুক্তি ভঙ্গে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড হিট্‌লারকে কোন প্রকার বাধা তো দেয়ইনি বরং পরোক্ষভাবে সাহায্যই করেছে ভবিষ্যতে যাতে হিট্‌লারের সমর-অভিযান কম্যুনিস্ট সোভিয়েট দেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। কিন্তু হিটলার শক্তিশালী হয়ে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের আগেই এই দেশগুলির উপর আক্রমণ চালায়।

সূত্রা ৪৪ ॥ মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট (Montague-Chelmsfored) ভারত সরকারের নীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টের অধীনে ইংলণ্ডে The Secretary of State for India অফিস বহাল ছিল। ১৯১৪—১৭ সালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, ভারত সরকার তুরস্কের বিরুদ্ধে মেসোপটেমিয়াতে যুদ্ধ চালায়। এই সময় চেম্বারলেন্ ছিলেন The Secretary of State for India। মণ্টেগু তুর্কীর বিরুদ্ধে মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ-নীতিকে কঠোর সমালোচনা করেন। চেম্বারলেন তখন পদত্যাগ করেন। তাঁর স্থলে মণ্টেগু কার্যভার গ্রহণ করেন। ভারত সরকারের ভুল নীতির জন্য মুস্‌লিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে Home Rule আন্দোলনের যুক্তফ্রন্ট আরও সুদৃঢ় হ'ল। মিঃ মণ্টেগু ইণ্ডিয়া হাউসের কার্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ১৯১৭ সালের ২০শে অগাস্ট ভারতের প্রতি এক উদার নীতি ঘোষণা করেন এবং এইটিই হ'ল সেই প্রসিদ্ধ "Montague Declaration", যার সারমর্ম—"The policy of His Magesty's Government, with which the Government of India is in complete accords is that of increasing association of Indians in every branch of administration and the gradual development of self-government institution with a view to the progressive realisation of responsible Government in India as an integral part of the British Empire."—অর্থাৎ, ইংরেজ সরকার ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষকে Dominion Status পর্যন্ত দানের মনোবাসনা পোষণ করে! ভারতবর্ষে moderate-রা (নরমপন্থীরা) আনন্দে নৃত্য করলেন—এই ঘোষণাকেই তাঁরা আখ্যা দিলেন—Magna Carta of India (Magna Carta—The Great Charter of Liberty)—১২১৫ সালের ১৫ই জুন ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারী ব্যারনরা তাঁদের রাজা জনকে দিয়ে জোর করে Magna Carta সই করিয়ে নিয়েছিল। এই ঘোষণার পর, ১৯১৮ সালে, ভারতের গভর্নর-জেনারেল লর্ড চেমস্‌ফোর্ড ও মিঃ মণ্টেগু সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ভারতের প্রকৃত সমস্যাগুলি অনুধাবন করলেন। তারপর তাঁরা একটি যুক্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করেন—কি ভাবে কতখানি স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার ভারতকে দেওয়া সম্ভব। এই রিপোর্টটি Montague-Chelmsford Report of 1918 নামে পরিচিত। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই পার্লামেণ্ট আইন পাশ করলো, যার নাম—The Government of India Act 1919. অ্যানি বেসাণ্ট এই আইন সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—'Unworthy of England to offer and India to accept'. তিলক ক্ষুব্ধ হয়ে তীব্র ভাষায় এই আইনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন—"a sunless dawn!"—যার কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যত নেই। গান্ধীজী প্রথমে এই Reform-টি কার্যে পরিণত করার জন্য

সরকারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। পরে রাউলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, প্রভৃতির কারণে গান্ধীজী Montague-Chelmsford Reform-এর বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হন।

পৃষ্ঠা ৪৪ ॥ রাউলাট্ অ্যাক্ট (Rawlatt Act)

প্রায় ১৯০০ সাল থেকেই বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বহু বৈপ্লবিক সংঘ ও সমিতি গড়ে ওঠে। তাদের ইংরেজ বিরুদ্ধ সশস্ত্র কার্যকলাপ, রাজকর্মচারী হত্যা, স্বদেশী ডাকাতির সাহায্যে অর্থসংগ্রহ, অভ্যুত্থানের চেষ্টা, ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র ও বালাসোর যুদ্ধ, কোমাগাটামারু জাহাজে প্রত্যাবর্তন কালে গদর পার্টির সশস্ত্র শিখদের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যের লড়াই, প্রভৃতি ইংরেজ সরকারকে খুব ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলে। পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের হাতে আরও অধিক ক্ষমতা ন্যস্ত করার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হ'ল। Sir Sidney Rawlat of the King's Bench in England এই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হলেন। এই কমিটির একটা বিল ১৯১৯ সালের ১৭ই মার্চ পাশ করা হয়। এই বিলটিকে ভারতবাসী Black Bill আখ্যা দিল। এই আইন-বলে পুলিশ ও আমলাতন্ত্র বিনা বিচারে যে কোন কাউকে যতদিন ইচ্ছে বন্দী করে রাখতে পারবে। এর প্রতিবাদে গান্ধীজী ৬ই এপ্রিল হরতালের ডাক দিলেন। কিন্তু তার আগেই দিল্লীতে ১৩ই মার্চ এই বিলকে রুখবার জন্য জনসাধারণ হরতাল পালন করে। নেতারা গান্ধীজীর উপস্থিতিতে জনতাকে শান্ত রাখার অভিপ্রায়ে তাঁকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ জানালেন। সরকার দিল্লীর পথে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে। জনসাধারণ এতে আরো বেশী বিক্ষুব্ধ হ'ল এবং তারা গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার, Rowlatt Act এবং পুলিশের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে জালিয়ানওয়ালাবাগে সভা আহ্বান করে। এই সভাতেই জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঘটে।

পৃষ্ঠা ৯৯ ॥ জালিয়ানওয়ালাবাগ

রাউলাট্ অ্যাক্ট (তথ্যপঞ্জীর অন্যত্র দেখুন) পাশ হ'ল। এই কুখ্যাত কালা আইনের প্রতিবাদে দিল্লীতে ১৩ই মার্চ এক হরতাল আহ্বান করা হয়। এই হরতালে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে গান্ধীজীকে দিল্লীর পথে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯১৯ সালের ১০ই এপ্রিল পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ নেতা ডাক্তার সত্যপাল ও ডাক্তার কিচ্‌লুকে পাঞ্জাব থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়। এই আদেশের বিরুদ্ধে জনসাধারণ সভা আহ্বান করে। পুলিশ বাধা দেয় এবং বিনা প্ররোচনায় অবাধে গুলী চালিয়ে বহু লোককে হত ও আহত করে। বিক্ষুব্ধ জনতা এই সব মৃতদেহ নিয়ে মিছিল করে এবং তাদের ক্রোধানলে কয়েকজন ইংরেজকে প্রাণ দিতে হয়। জেনারেল ডায়ার স্বয়ং সেই এলাকাকে আয়ত্তে আনতে "রণে" অবতীর্ণ হয়ে নিরীহ লোকদের ওপর চরম অত্যাচার ও নিপীড়ন চালায়। তারই প্রতিবাদে ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে সভা আহুত হয়। জেঃ ডায়ার এই সভা বানচাল করার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারী করে। বিক্ষুব্ধ জনতা তবু সভা বর্জন করলো না। জেঃ ডায়ার উন্মত্ত পশুর মত প্রচুর সৈন্য নিয়ে নিরস্ত্র জনসাধারণের সেই সভা আক্রমণ করে। বেপরোয়া গুলী চালাতে হুকুম দেওয়া হয়। মেসিনগানের অজস্র গুলীতে রক্তগঙ্গা বয়ে গেল। ৩৭০ জন প্রাণ হারালো এবং ১১৩৭ জন আহত হ'ল। অমৃতসরে ও আরো কয়েকটি স্থানে সামরিক আইন জারী হ'ল। জনসাধারণের ওপর

অত্যাচার ও নিষ্পেষণের সীমা অতিক্রম করলো। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সারা ভারতে ঘোর প্রতিবাদ উঠলো। কিন্তু ইংলণ্ডে জেনারেল ডায়ারকে এই "বীরত্বের" জন্য সম্বর্ধনা জানানো হয়। রবীন্দ্রনাথ এই নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে তাঁর 'নাইট' উপাধি ঘৃণাভরে বর্জন করেন এবং স্যর শঙ্করণ নায়ার বড় লাটের Executive Council থেকে ইস্তফা দেন। ভারত সরকার নিজেদের দুর্নাম ঢাকার জন্য ছয় মাস পরে ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে Hunter Committee নিযুক্ত করে। এই কমিটি জেনারেল ডায়ারকে অপরাধের দায় থেকে মুক্তি দিল। তারা লিখলো "an error of judgement"—জেনারেল ডায়ারের সিদ্ধান্তে ভুল হয়েছে এই যা! জাতীয় কংগ্রেস ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য কমিটি নিযুক্ত করে এবং তাদের সিদ্ধান্ত—জেনারেল ডায়ারই সর্বতোভাবে দায়ী "for a cold blooded, calculated massacre of innocent, unoffending, unarmed men, women and children, unparalled for its heartlessness and cowardly brutality in modern times."

পৃষ্ঠা ২৮২ ॥ ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডীর বিপ্লবী ইতিহাস

Guissepe Mazzini (১৮০৫-৭৫) এবং Guiseppe Garibaldi (১৮০৭-৮২)—এই দুই নেতার নাম ইতালীর বিপ্লবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইতালী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ইতালীর একতার জন্য ম্যাৎসিনির অবদানের তুলনা হয় না। ১৮৩১ সালের পর তাঁকে ইতালীর বাইরে থেকে বিপ্লব পরিচালনা করতে হয়েছে। বেশীর ভাগ সময় তিনি লণ্ডনে থাকতেন। কিছুকাল তিনি কার্লমার্ক্সের সঙ্গে লণ্ডনে International Working Men's Association-এ কাজ করেন। তিনি সংবাদপত্রে, পার্টিপত্রিকায় ও বিভিন্ন পুস্তকে ইতালীকে এক অখণ্ড রাজ্যে পরিণত করবার নৈতিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যুক্তির বুনিয়াদ সৃষ্টি করেছিলেন। তাছাড়া প্রত্যক্ষভাবে বৈপ্লবিক সংগ্রামে অংশ গ্রহণের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে মৌলিক তত্ত্ব তিনিই ইতালীর জনসাধারণকে সুনিপুণভাবে পরিবেশন করেছিলেন। ১৮৪৮ সালে মিলানের বিপ্লবে তিনি প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর আদর্শের মূল বাণী—'Italia Uni' (Italy Unite) শ্লোগানে পরিণত হয়েছিল। ভারতে বিভিন্ন ভাষায় ম্যাৎসিনির জীবনচরিত ছাপা হয়েছে। ভারতের বিপ্লবীদের কাছে ম্যাৎসিনির দর্শন অনুকরণীয় ছিল। ম্যাৎসিনি ইতালীর বিপ্লবের "soul" বা প্রাণকেন্দ্র আর গ্যারিবল্ডী ছিলেন কর্মকেন্দ্রের প্রাণ। ১৮৩৫ সালে নীস্ শহরে বিপ্লবের এক বিফল চেষ্টার পর গ্যারিবল্ডীকে সেখান থেকে পলাতক হতে হয়। ১৮৩৫-৪৬ সালে গ্যারিবল্ডী ব্রেজিল ও উরুগুয়ের গৃহযুদ্ধে বিপ্লবীদের পক্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে যুদ্ধ করেছেন। তারপর আবার ইতালীতে ফিরে এলেন। ১৮৪৮-৪৯ সালে সার্দিনিয়ার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ১৮৪৯ সালে তিনি ম্যাৎসিনি পরিচালিত রোম গণতন্ত্র-বাহিনীতে যোগ দিলেন ও ইতালীর স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেন। এক হাজার "Red shirts" ভলাণ্টিয়ার নিয়ে গ্যারিবল্ডী সিসিল ও সার্দিনিয়া অধিকার করেন। তারপর স্বেচ্ছায় সেই বিজিত প্রদেশ দু'টির তত্ত্বাবধানের ভার ভিক্টর এমানুয়েলকে দিয়ে তিনি আবার কেপেরেরা দ্বীপে পর্বতশ্রেণী বেষ্টিত নিজ বাসভবনে ফিরে যান।

নির্ঘণ্ট